নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :
১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদসজ্জা
বিভূতি সেনগুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজয়ন্ত বসু
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

কল্যাণময়ী সুধীরাকে—

কথা প্রসঙ্গে

জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের জন্যে চিন্তা হয় না। তখন অতীতটা যেন সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে। অন্ততঃ বর্তমানের দিনগুলিতে আমার কাছে তো সেইটাই স্পষ্ট। অতীত আমার কাছে কোনো স্বপ্ন নয়, কিংবা কল্পনাও নয়। অতীত আমার কাছে ধ্রুব সত্য।

অভিনেতার জীবন—এক বিচিত্র জীবন ; যে জীবনকে জানবার জন্যে মানুষের অদম্য কৌতূহল। সত্যি কথা বলতে কি, আমিও অভিনেতা—আমার জীবনের পটভূমিকাতেও বিচিত্র ঘটনার স্পর্শ। সেই আলো-আঁধারের দিনগুলিতে আমি অভিনয় করেছি। কত রঙ মেখেছি, কত সংলাপ উচ্চারণ করেছি—সে এক সত্য ইতিহাস, যে ইতিহাস আমার কাছে ধ্রুব সত্য।

আজ সেই ধ্রুব সত্যটা আমার চিন্তার রাজ্যে স্থির হয়ে আছে। এর পরেও বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে যা কিছু আছে, তা-ও অতীত-নির্ভর। 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'-র দ্বিতীয় পর্ব সেই অতীতের সত্য-চারণা। আমার চিন্তার সত্য যদি পাঠক-পাঠিকার চিত্তকে স্পর্শ করে, তবে সেই হবে সত্যের সার্থকতা।

এই প্রসঙ্গে আজ সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ছে, আমার জীবন-সহচরী শ্রীমতী সুধীরাকে। যে আজ মর্তের আলোয় নেই, কিন্তু আমার হৃদয়ে সে আজও অধিষ্ঠিতা।

'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'-র দ্বিতীয় পর্বের জন্যে কয়েক জনকে সাধুবাদ না জানালে আমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রথমেই সাধুবাদ জানাই, 'অমৃত'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষকে, যাঁর ইচ্ছায় এই রচনা 'অমৃত' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়কেও মনে করছি—এই বইয়ের ব্যাপারে যাঁরা আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। এরপর আমার পুত্র প্রীতিন্দ্র, কন্যা মীরা বসু, এবং শ্রীমান পরেশ ভট্টাচার্যকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি—যারা শেষপর্যন্ত এই গ্রন্থের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছে।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর শ্রীযুক্ত ত্রিদিবেশ বসুকে—এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে তাঁরও উৎসাহ লক্ষ্য করেছি।

যাই হোক, আজ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' প্রসঙ্গে সবশেষে একটি কথাই বলবো—আমার জীবনের সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছি এই গ্রন্থে। যদি নাট্য-প্রেমিক মানুষদের খুশী করতে পারে, তাতেই আমার এই গ্রন্থের সার্থকতা।

৩১।১এ, গোপালনগর রোড,
কলিকাতা-২৭

অহীন্দ্র চৌধুরী

ডীন অফ দি ফ্যাকাল্টি অব ড্রামা,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের গিরীশ লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;
মেম্বার, বোর্ড অফ স্টাডিস্ ইন থিয়েটার আর্টস্, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্গতা সুধীরা চৌধুরী

দর্পণে মুখ দেখি। নিজের মুখ। চুয়াত্তর বছর বয়সের একজন পরিণত পুরুষের মুখ।

তবু কেমন যেন অপরিচিত মনে হয়, মনে হয় অচেনা, অজানা কারো মুখ দর্পণে ভাসছে।

কেন এ বিভ্রান্তি!

চেয়ে থাকি অবাক বিস্ময়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুখের প্রতিটি রেখা লক্ষ্য করি। তারপর এক সময় প্রতিবিম্বের মধ্যে থেকে নিজেকেই আবিষ্কার করি। প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই বলি, আমিই তো অহীন্দ্র চৌধুরী।

বিস্মৃতির আগল খুলে যায়। স্মৃতির পর্দায় প্রতিফলিত হয় একটি সুন্দর শিশুর মুখ। যে শিশুটি বাঁশী বাজাবে বলে বায়না ধরেছিল।

—হ্যাঁরে খোকা, বাঁশী কী হবে?

—কেন, বাজাবো।

—বাঁশী বাজাতে নেই, ফুসফুস খারাপ হয়।

—না, আমায় বাঁশী কিনে দাও।

একটা খেলনার বাঁশী এনে দিয়েছিলেন বাবা। শিশু অহীন সেই খেলনার বাঁশীতেও সুর ফুটিয়েছিল।

সেই বাঁশীর সুরটা এখনো কান পেতে শুনি। অনেক দূর থেকে ভেসে-আসা সেই সুর। অথচ স্পষ্ট।

সেই বাঁশী নেই, কিন্তু সুর আছে। সেই শিশুর অবয়ব নেই, কিন্তু তার মনটা আছে আমার মধ্যে।

সেই মন এখনো খেলনার বাঁশী খুজে বেড়ায়।

জীবনে কি চেয়েছিলাম জানি না। তবে পেয়েছি অনেক। যা চাই নি, তাও পেয়েছি। তবে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব কোনোদিন রাখি নি। হিসেব রেখে কী হবে! জীবনটা তো অঙ্ক নয়।

আজ অপরাহ্ণের আলোয় দাঁড়িয়ে একটা কথাই ভাবি যে, একদিন আমার পৃথিবীতে সূর্য উঠেছিল। যে সূর্য এখনো আলো দিচ্ছে।

জানি, ওই সূর্য হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিন শেষ হবে। কিন্তু ওইখানেই তো শেষ নয়। অন্ধকার পেরিয়ে আবার সূর্যসারথি আলোর খবর নিয়ে আসবে।

আমিও তো ভেবেছিলাম, আর নয়—এবার হারিয়ে যাবো। কিন্তু সত্যি কি হারিয়ে যেতে পেরেছি? পারি নি। হারিয়েই যদি যাবো, তবে নিজেকে খুঁজে বার করবো কেমন করে!

শুধু আজই নয়, জীবনে নিজেকে নিয়ে বার-বার লুকোচুরি খেলা খেলেছি। ভেবেছি এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকবো—কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু খেলায় হার মেনেছি আমি, নিজেই ধরা দিয়েছি। লুকিয়ে থাকতে পারি নি।

সেই সব কথাই আজ মনে পড়ে, যেসব কথার মধ্যে শুনতে পাই আমার কণ্ঠস্বর, সেই সব ছবিই আমার স্মৃতির পর্দায় ভাসে, যেসব ছবির মধ্যে দেখতে পাই আমারই প্রতিচ্ছবি। এক আমি অজস্র আমির মধ্যে ছড়িয়ে আছি। সে এক বিচিত্র ছায়া-নাটক। এক অহীন্দ্র চৌধুরী কতো রূপে এসে দাঁড়িয়েছে পাদপ্রদীপের আলোয়। নিজেই ভাবি, এ-আমি কি দেখছি!

পরমুহূর্তে মনে হয়, আমি নট, আমি অভিনেতা। এই বিচিত্র রূপসজ্জায়, বহু-বিচিত্র রূপ দেওয়াই তো আমার ধর্ম।

আজ যখন অভিনয় ছেড়েছি, চার দেয়ালের ঘরের মধ্যে আমার পৃথিবীটাকে বন্দী করেছি, তখনো বিস্মৃতির আগলটা সন্তর্পণে খুলে দিয়ে স্মৃতির দরজায় মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। দেখতে পাই, আমারই সামনে দিয়ে বিচিত্র এক মিছিল চলেছে। পুরাণ, ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে এই শতাব্দীর মানুষেরাও রয়েছে সে মিছিলে। কতো বিচিত্র তাদের রূপসজ্জা, কতো বৈচিত্র্য তাদের কণ্ঠস্বরে, কতো বৈচিত্র্য তাদের সংলাপে।

এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই তো মিশে আছি আমি।

আমি নট, আমি অভিনেতা। আমার যতো কথা সে তো নাটক আর অভিনয়ের কথা। এই নাটক আর অভিনয় নিয়েই তো আমার জীবন।

জীবনের সেই কথাই আমি বলতে চেয়েছি 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'তে। বলেছিও এর আগে, যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সব কথা তো বলা হয়নি। সেই না-বলা কথাই এবারে বলবো।

আমার মধ্যে প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণি ছিল। যা আমাকে মাঝে মাঝে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতো। জানি, ভুল করছি, তবুও নিজের রাশ নিজে টেনে ধরতে পারতাম না। নয়তো এমন হবে কেন।

মনে পড়ে, সেবারে হঠাৎ কি খেয়াল হলো, স্টার থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। পিছনের দিকে ফিরে চাই নি একথা বলবো না, তবে পিছন ফিরে তাকিয়েও পিছুটানে থমকে দাঁড়াই নি।

কোথায় যাবো, কি করবো—ঠিক-ঠিকানা একেবারে নেই, তা নয়—তবে নির্দিষ্ট কোনো পথ আমার সামনে ছিল না। নির্দিষ্ট ঠিকানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম অনির্দিষ্ট ঠিকানায়।

এ-যেন নিজের কাছ থেকে নিজের হারিয়ে যাওয়া।

হারিয়ে যাওয়াই বটে।

একদিকে আমার ঘর-সংসার, অন্যদিকে আমার কর্মক্ষেত্র—সমস্ত কিছু থেকেই আমাকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলেছে আমার ভাগ্য, আমার ভবিতব্য, আমার নিয়তি। সেই যে 'কর্ণার্জুনে' একটা গান আছে না—'আমি কখন গড়ি, কখন ভাঙি নেইকো ঠিকানা'। আমার তখন ভাঙার পালা, বিলুপ্তির পালা, ছুটে ছুটে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর পালা। আজ ভাবি এসব ভবিতব্য ছাড়া আর কী? নইলে তখন যদি নিজের মনকে শক্ত করে বলতাম, ঠিক আছে, আর্ট থিয়েটার যদি 'কেস' করে করুক, আমি যা ভালো বুঝেছি তাই করেছি। আমি নট, আমি শিল্পী, আমার কর্মান্তর গ্রহণ তো ভূমিকান্তর গ্রহণেরই সামিল। আমি স্টার ছেড়ে মিত্র থিয়েটারে যেতে চাই, ওখানে যেতেই আমার প্রাণ চাইছে—এতে বাপু অন্য লোকের মাথাব্যথা কেন?

কিন্তু মুস্কিলটা হলো যে, আমি যে মনে মনে স্টারকেও ভালোবাসতাম—এদিকে মিত্রদের সাদর আহ্বানও উপেক্ষা করার শক্তি আমার ছিল না। এই দোটানার মধ্যে পড়ে মনের মধ্যে এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব—এতে ক্ষতবিক্ষত হতে-হতে মানুষের দৃঢ়চিত্ততা কেমন যেন স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যায়—আমার ঠিক সেই অবস্থা। আমার মনটা যেন তখন দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একজন আরেকজনকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে দেখছে আর অদ্ভুত কৌতুক অনুভব করছে। এক মন দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবার নেশায় মেতেছে, আরেক মন সুচতুর গোয়েন্দার মতো চুপি চুপি তাকে অনুসরণ করে চলেছে। কখন যে এ-মন সে-মনকে গ্রেপ্তার করে জানি না।

আপাতত মনের এই বিচিত্র লীলাখেলা চলেছে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি সেটা হল ১৯২৭ সাল।

স্টার থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' থেকে শুরু করে 'চিরকুমার সভা' পর্যন্ত বহু নাটকই হয়ে গেছে এবং 'অহীন্দ্র চৌধুরী' বলে একটি নাম নাট্যরসপিপাসুদের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। এমন কি কেউ যদি পুরনো দিনের পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে দেখেন তবে দেখতে পাবেন যে, শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও অহীন্দ্র চৌধুরীকে নিয়ে যেন তুলনামূলক সমালোচনাও শুরু হয়ে গেছে।

এমন দিনে সেই 'অহীন্দ্র চৌধুরী' হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল। হারিয়ে গিয়েছিল পাদপ্রদীপের সামনে থেকে, কিন্তু জেগে ছিল গুণগ্রাহী দর্শকসাধারণের মনে। 'মিত্র থিয়েটার' বলে একটি প্রতিষ্ঠান তখন গড়ে উঠেছে, তাঁরা আমাকে তাঁদের মধ্যে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলেন। অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা এবং নতুন নতুন নাটকে বিভিন্ন রসাশ্রয়ী চরিত্রে অভিনয়ের নেশায় আমার মন মিত্র থিয়েটারের দিকেই ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের জটিলতা-কুটিলতা যে কত গভীর তা তখন বোধগম্য হয় নি—শিল্পীরা এইভাবেই বিপদে পড়ে আর বুদ্ধিজীবীদের হাতের হাতিয়ার হয়ে পড়ে।

'মিত্ররা' আমাকে চাইলেও 'স্টার' আমাকে ছাড়বেন কেন? অতএব 'মিত্ররা' বললেন—আপনি আপাতত কিছুদিনের জন্য স্রেফ গা-ঢাকা দিন।

স্টার-এর প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের সঙ্গে আমার এমন একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে যে, আইনের দিক থেকে জয়লাভ করা অতিসহজ হলেও হৃদয়ের জাল থেকে পলায়ন করা সহজ ছিল না। ছেলে যেমন বাপ-মা-দাদার কাছ থেকে অভিমান করে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, আবার বেশকিছুদিন পরে ফিরে আসে—আমারও হয়েছিল প্রায় তেমনি অবস্থা।

একদিন 'মিত্রদের'ই লোক শিশির মিত্র মশাই আমাকে নিয়ে 'রেলে' করে পাড়ি দিলেন। অথচ, আমার যদি বাস্তব বুদ্ধি তখন পরিণত হতো, তাহলে বুঝতাম, এ পলায়নের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ স্টারের সঙ্গে কনট্রাক্ট নিয়ে যে গোলমালের সম্ভাবনার কথা মিত্ররা মনে করছিলেন তাতে সাক্ষ্য ও প্রমাণসাপেক্ষ জয়লাভ আমার সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু আমার প্রকৃত মনের ভাব ছিল অন্য। যদি একবার কোনো-রকমে প্রবোধবাবুর সামনা-সামনি পড়ে যাই, আর তিনি তাঁর সম্মোহিনী ভঙ্গীতে বলেন স্টারে ফিরে যেতে—তখন আমি কিছুতেই না বলতে পারব না—সুড়সুড় করে তাঁর পিছন পিছন স্টারে গিয়ে ঢুকতে হবে—মাইনে বাড়ানোর কথা পর্যন্ত তখন মুখ দিয়ে বেরুবে না। মিত্ররা আমার এ দুর্বলতার কথা জানতেন, তাই তাঁরা আমাকে কলকাতায় না রেখে বাইরে বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

অবশ্য ঘুরে বেড়ানোটা আমার একটা নেশা—একথা হয়তো অনেকেই জানেন না। যখনই সময় পেয়েছি—এখান-ওখান ভ্রমণ করেছি আর এই ভ্রমণ থেকে কত বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছি এবং তা থেকে কতভাবে যে নিজেকে শিল্পকর্মে প্রস্তুত করতে পেরেছি, সে শুধু আমিই জানি।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম।

চৈত্র মাস হবে সে সময়টা। কলকাতার বাইরে পশ্চিম অঞ্চলে তখন কিরকম গরম পড়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে দিনের বেলাটায় গরম হলেও রাত্রের শেষের দিকটা বেশ শীত-শীত করে।

শিশির মিত্রের সঙ্গে আমি একদিন হাওড়া স্টেশনে এসে একটি ট্রেনে চেপে বসলুম —অধিকার করলুম দুজনে দুখানি বেঞ্চ সেকেণ্ড ক্লাস কামরায়। ট্রেনে উঠবার আগে জিজ্ঞেস করেছিলুম : কোথায় যাচ্ছি আমরা?

সংক্ষিপ্ত উত্তর এলো শিশির মিত্রের কাছ থেকে : দেখা যাক।

যাক। আমার আর কোনো কৌতূহল রইল না। আমার মন তখন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পাগল। যাযাবর মন আমার তখন 'ভ্রমণের নেশা'য় প্রমত্ত। চলুক না যেখানে খুশী—দিল্লী, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ। নইলে শিশিরবাবুকে চেপে ধরলে কি আর তিনি না বলে পারতেন!

যাই হোক, ট্রেনটা ফাঁকাই ছিল—আমরা দুজনে দুখানি বেঞ্চিতে বিছানাটি বিছিয়ে বেশ দিব্যি টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লুম। রাত্রের ট্রেন, বাড়ী থেকে খাওয়া-দাওয়া করেই বেরিয়েছিলুম—সুতরাং সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

গাড়ী ছুটে চলল অন্ধকারের বুক চিরে। জানালার বাইরে অন্ধকার ধূ-ধূ প্রান্তর, কিম্বা গাছপালা, কিম্বা ঘরবাড়ী সব একের পর এক মিলিয়ে যাচ্ছে—তারপর এক এক করে ভেসে উঠছে প্রবোধ গুহমশাইয়ের মুখ, অপরেশবাবুর মুখ, স্টার থিয়েটারের আর-সব সহকর্মীদের মুখ—আর অন্যদিকে ম্যাডান কোম্পানীর ফ্রামজী, রুস্তমজী প্রভৃতির মুখও ভেসে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে তাদের মুখগুলিও ঝাপসা, অস্পষ্ট হয়ে গেল—আমি আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম গভীর ঘুমে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন আবছা-আবছা ভোর হয়েছে—কী একটা স্টেশনে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে দেখি শিশিরবাবুও উঠে বসেছেন। বাইরে হকাররা হেঁকে যাচ্ছে—চা—চাই, চা—গরম চা।

শিশিরবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—চা খাবেন নাকি?

—মন্দ কী?—বলতে বলতে উঠে বসলাম, জিজ্ঞাসা করলাম—কী স্টেশন এটা?

শিশিরবাবু বললেন—রাণীগঞ্জ।

বেঞ্চি থেকে নেমে বাথরুম ঘুরে আসতে আসতে ট্রেন ছেড়ে দিল, চা খাওয়া আর হলো না।

শিশিরবাবু বললেন—ঠিক আছে, আসানসোলে খাওয়া যাবে'খন। সামনেই আসানসোল।

এলো আসানসোল। চায়ের হকারকে ডাকবার জন্যে উসখুস করছি, এমন সময় হঠাৎ শিশিরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন—এই কুলী।

আমি চমকে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললুম—কুলী! কুলী কি হবে?

শিশিরবাবু বললেন—আসুন, এইখানে নেমে পড়া যাক।

—এই আসানসোলেই?

—হ্যাঁ।

কুলী এসে জিনিসপত্র নামাল—সামান্যই জিনিস, ছোট্ট একটা বিছানা আর সুটকেশ।

আসানসোল অপরিচিত জায়গা নয় আমার। প্রতি সীজনেই আসানসোল—ধানবাদ—শিউড়ী এসব জায়গায় আর্ট থিয়েটারের হয়ে বহুবার থিয়েটার করতে এসেছি। সুতরাং আমাকে তো অনেকেই চেনে। এখন চেনাজানা লোক বেরিয়ে পড়লে মুস্কিল, আমার এখানে থাকার ব্যাপারটা আর গোপন থাকবে না—রাষ্ট্র হয়ে পড়বে চতুর্দিকে। একবার রাষ্ট্র হয়ে পড়লে আর প্রবোধবাবুর কানে পৌঁছুতে কতক্ষণ? তার পর একবার তিনি এসে দাঁড়ালে পরে কি আর শিশিরবাবুরা আমাকে আটকাতে পারবেন?

শিশিরবাবু সবকিছু শুনলেন, একটু চিন্তাও করলেন, কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই সব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে নিয়ে প্লাটফর্মে নেমে বললেন: আসুন না! ঠিক লুকিয়ে রাখব আপনাকে। কাক-কোকিলেও টের পাবে না।

কোনোরকমে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে, যথাসম্ভব নিজের পরিচিতিটাকে গোপন করার চেষ্টা করে শিশিরবাবুর পিছন পিছন প্লাটফর্মের বাইরে এলাম। উঠলাম গিয়ে একটা গাড়ীতে। কিন্তু যাওয়া যাবে কোথায়? হোটেল-ফোটেলে থাকা মানেই তো বিপদ!

ট্যাক্সিয়ালাকে শিশিরবাবু বললেন—সার্কিট হাউস চলো।

আমি সন্দিগ্ধচিত্তে বললাম: খালি পাবেন?

—দেখাই যাক!

চুপ করে রইলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন! সার্কিট হাউস একেবারে খালি। লোক-জন কেউ নেই। অনেক ডাকাডাকির পর বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

আসানসোলের যে রাস্তাটা যেতে-যেতে হঠাৎ বার্নপুরের দিকে বেঁকে গেছে সেই

রাস্তার মোড়েই হলো আসানসোলের সার্কিট হাউস। সামনেই বড় রাস্তা—লোকজনের যাতায়াতের অভাব নেই। মুস্কিল হলো, সামনের বারান্দায় গিয়ে যে বসব তার উপায় রইল না—কারণ যদি প্রবোধবাবুর লোক আমাদের দেখে ফেলে! প্রবোধ গুহ ভীতিটা মনের মধ্যে এমনভাবে জমাট বেঁধে গিয়েছিল যে অপরিচিত কোনো লোককে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেই ভয় হতো। (প্রবোধবাবুর চর নয়তো!)

যাই হোক, ভয়ে আমরা আর সামনের বারান্দার দিকে বেরুতামই না। ভিতরের দিকটা ছিল বাগানের মতো বেশ নির্জন। সামনে চাতাল, তারপর খানিকটা খোলা জায়গা, বাগানের মতো। ঐ বাগানেই ঘুরে বেড়াতাম। যতো বেলা বাড়তে থাকে, গরমও ততো বাড়ে। রাত্রে অবশ্য একটু ঠাণ্ডা পড়ত। করতাম কী, একটা খাটিয়া চাতালে টেনে নিয়ে এসে ঘুমোতাম।

শোওয়া বসা খাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। একটু যে বাইরে বেরিয়ে আসানসোল শহরটা একটু ঘুরে আসব তারও উপায় নেই। রীতিমত বন্দী-জীবন।

দিন-তুয়েক এইভাবে কাটল। দ্বিতীয় দিন শিশিরবাবু বেরিয়ে গেলেন আমাকে একা বসিয়ে, পোস্ট অফিসে। বোধ হয় কলকাতায় টেলিগ্রাম করতে।

কলকাতার খবরটাও তো জানা দরকার। কিন্তু ঠিকানার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। তাই সার্কিট হাউসের ঠিকানা না দিয়ে 'কেয়ার অফ পোস্ট-মাস্টার' ছিল ঠিকানা। শিশিরবাবুকে তাই রোজ ডাক আসবার সময় পোস্ট অফিসে যেতে হতো।

তুদিন কেটে গেল এইখানে। তৃতীয় দিনও যথারীতি পোস্ট অফিসে বেরিয়েছেন শিশিরবাবু, আমি সার্কিট হাউসের চাতালে খাটিয়াশ্রয়ী হয়ে অলস বিশ্রামমুহূর্ত যাপন করছি, এমন সময় একটা ট্যাক্সির আওয়াজ একেবারে সার্কিট হাউসের সামনে। সর্বনাশ, প্রবোধবাবুর কোনো লোক নয়তো! চট্ করে উঠে দাঁড়ালাম—কি করব ভাবছি এমন সময় দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে আসছেন শিশিরবাবু। যাক, বাঁচা গেল।

ভদ্রলোক যেন হাঁফাচ্ছেন। বললেন, জানেন ট্রেনটা একটু লেট ছিল। দূর থেকে ট্রেনটাকে লক্ষ্য করছি—হঠাৎ দেখি বিজয় মুখুজ্যে।

—সর্বনাশ!—বলে উঠলাম—নির্ঘাৎ প্রবোধবাবুরা ওকে পাঠিয়েছেন আমাকে খুঁজে বার করতে। কী হবে?

উনি বললেন,—দেখি, বিজয় মুখুজ্যে গাড়ী থেকে নেমে চা খাচ্ছে স্টলে দাঁড়িয়ে। প্রথমে ভাবলাম যে বিজয় এইখানে নামছে—তখনই ছুটে চলে আসছিলাম, কিন্তু ট্রেন

ছাড়ার বাঁশী বাজল, বিজয়ও আস্তে আস্তে গিয়ে তার কামরায় উঠল। বোধ হয় সীতারামপুরের দিকে কোথাও গেল।

রুদ্ধশ্বাসে কথাগুলি শুনছিলাম শিশিরবাবুর। শুনতে শুনতে সত্যি কথা বলতে কি, রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। বলে উঠলাম, ও আর দেখতে হবে না। নির্ঘাত আমায় খুঁজতে বেরিয়েছে।

—কিন্তু আসানসোলে নামলো না কেন?

বললাম—সীতারামপুর গিয়ে খুঁজবে আগে। হয়তো ধানবাদ বা মধুপুরেও যেতে পারে। ফেরার পথে নামবে আসানসোলে। তখন আর সার্কিট হাউস খুঁজে বার করতে কতক্ষণ। ব্যস, তখন একেবারে হাতে-নাতে—

শিশিরবাবুর মনেও ভয়টা বেশ সংক্রামিত হয়েছে মনে হলো। উনি বললেন—কী করা যায় বলুন তো!

বললাম—করবেন আর কী! চলো মুসাফির, বাঁধো গাঁটরী।

শিশিরবাবু বললেন—তাই হোক, দেরী নয়। আজই বেরিয়ে পড়া যাক।

দুপুরবেলা একটা গাড়ী ছিল কলকাতা যাবার। এক্সপ্রেস না কী ঐ ধরনের একটা দ্রুতগামী ট্রেন। কিন্তু ভয় হলো! কি জানি যদি সীতারামপুর থেকেই বিজয় ফিরে আসে? তাহলে তো এই গাড়ীতেই আসার সম্ভাবনা বেশী। কী করা যায়? অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক হলো, বিকেলের দিকে একটা গাড়ী আছে—সেটা সোজা হাওড়া না গিয়ে নৈহাটী হয়ে শেয়ালদা'য় যায়। সেই গাড়ীটাতেই যাওয়া হবে।

উঃ, সে কী বুক-ধড়ফড়ানি! যতক্ষণ না ট্রেন আসানসোল ছেড়েছে, ততক্ষণ মনের অস্বস্তি দূর হয়নি। স্টেশনে যে লোকটিই আমার দিকে তাকিয়েছে তাকেই মনে হয়েছে বিজয় নাকি!

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আসল ব্যাপারটা জানলে আর এরকম খামখা আতঙ্কিত হতে হতো না। পরে শুনেছিলাম, বিজয় গিয়েছিল মধুপুরে নেমে গিরিডিতে। সে আমার খোঁজে মোটেই যায়নি। স্টারের অন্যতম ডিরেক্টার কুমারকৃষ্ণ মিত্রের বাড়ী ছিল গিরিডিতে। আমরা যখন জলপাইগুড়ি 'টুর' শেষ করে কলকাতায় ফিরেছিলাম, তখনই কুমারবাবু বলেছিলেন—একবার আমার বাড়ী গিরিডিতে 'শো' করলে হয় না?

এখন স্থির হয়েছে গিরিডিতে স্টার থিয়েটারের 'শো' হবে, আর তার তদারকিতেই বিজয় তখন যাচ্ছিল মধুপুর হয়ে গিরিডি।

এই বিজয় মুখুজ্যে লোকটি কে? এই সম্বন্ধে অনেকেরই মনে একটা জিজ্ঞাসা-

চিহ্ন ফুটে ওঠা স্বাভাবিক। এক কথায় চলতি ভাষায় যাকে বলা হয় সর্বঘটের কাঁটালী কলা। আসলে সে ছিল একজন অভিনেতা এবং সামান্য মধ্যবিত্ত ঘরের লোক। ছোট ছোট ভূমিকায় যখন কেউ অনুপস্থিত হতো সে নেমে যেতো। কখনো তাকে দেখা যেতো দৌবারিক, কখনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কখনো সৈন্য, কখনো প্রহরী ইত্যাদি। তা ছাড়া কর্তৃপক্ষের খুবই বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছিল সে, সেজন্য কর্তৃপক্ষ অভিনয় ছাড়াও অন্যান্য কাজকর্মে পাঠাতেন তাকে। লোকজনের সঙ্গে আলাপ ক'রে কাজ আদায় করার ক্ষমতাও ছিল তার বেশ। আবার পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও তার দহরম-মহরম ছিল যথেষ্ট।

যাক, যে কথা বলছিলাম!

তখন কি আর ছাই জানতাম এ-সব কথা? জানলে মিছিমিছি এত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কলকাতায় ফিরে আসতাম না আসানসোল থেকে।

যাক, সন্ধ্যার পর দমদম স্টেশনে এসে তো পৌছুলুম—শিশিরবাবুর পরামর্শে শেয়ালদহে নামলুম না যদি কেউ চিনে ফেলে এই ভয়ে।

মনটা কিরকম করে উঠলে। বললাম—সে কী হে? কলকাতা যাবো না? একবার বাড়ী যাবো না?

শিশিরবাবু বললেন: দাঁড়ান, সব হবে। তবে সোজাসুজি যাওয়া চলবে না। আসুন তো আমার সঙ্গে। আপনাকে আগে ফার্স্ট-ক্লাস ওয়েটিং-রুমে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। কি জানি বাপু, যদি চেনাশোনা লোক কেউ দেখে ফেলে!

আমার অবস্থা তখন হয়েছে যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রের মতো। ওঁর কথামতো জনবিরল ওয়েটিং-রুমে গিয়ে বসে রইলাম। শিশির খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে-টুরে ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলাম—এখন কি করবো? এমন ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে বসে থাকব আর কতক্ষণ?

শিশিরবাবু বললেন—ঘাবড়াবেন না। একটা প্রাইভেট কারের বন্দোবস্ত করেছি। কলকাতা যাবো, আবার রাত্তিরেই ফিরে আসব।

—বাড়ী একবার যাবো না? উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

শিশিরবাবু বললেন—বাড়ীতেই তো যাবো। একবার দেখা করে চট্ করে চলে আসতে হবে।

তাই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কালো রং-এর গাড়ীতে উঠে বসলাম। শিশিরবাবু আমার পাশে বসে ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন: চলো কলকাতায়।

প্রথমেই বাড়ী যাওয়া হলো না। গাড়ী ঘুরে ঘুরে গিয়ে পৌছুলো মিত্র

থিয়েটারে (অর্থাৎ পুরনো মনোমোহন থিয়েটারে)। সেখানে জ্ঞান মিত্র, শিশির বোস—এঁদের সঙ্গে দেখা হলো। শিশির বোস ছিলেন 'ভগ্নদূত' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'মিত্র'দের আত্মীয়। সেখানে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম —সঙ্গে রইলেন এবার আর শিশির মিত্র নয়, শিশির বোস।

বাবা কোনো খবর না পেয়ে স্বভাবতই একটু উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁকে সব কথা খুলে বললুম। পালিয়ে পালিয়ে কেন বেড়াতে হচ্ছে সে কথাটাও তিনি বুঝলেন সম্ভবত। বললুম: কিছু ভাববেন না—সঙ্গে শিশির রয়েছে—ও আমার কোনো কষ্টই হতে দেবে না।

শিশিরও বাবাকে অনেক করে বুঝিয়ে বললে—কোনো ভয় নেই। সেরকম দরকার মনে করলে থিয়েটারে খবর করবেন। ওখানে মালিক জ্ঞান মিত্র রইলেন। পার্টনার শিশির মিত্র রইলেন। কখন কোথায় থাকি-না-থাকি—ওঁরা ঠিক খবরাখবর পাবেন।

বাড়ীতে দেখা-সাক্ষাৎ করে কিছুক্ষণ পরেই আবার রওনা—সেই মোটরেই। গাড়ীতে উঠে শিশিরকে বললাম—ভালো ভালো জায়গায় ঘুরব, একটা ছোটখাটো ক্যামেরা কিনে নিলে হতো।

ও বললে—তা মন্দ কী?

বললাম—চৌরঙ্গীতে ক্যালকাটা ক্যামেরা হাউসে গাড়ীটা একটু দাঁড় করাবে?

—চেনাশোনা দোকান?

আমি বললাম—হ্যাঁ—তা বলতে পারো।

শিশির বললে—চেনাশোনা থাকলেই তো বিপদ! প্রবোধবাবু আবার খবর পেয়ে যাবে না তো!

হেসে বললাম—আরে না, না। সন্ন্যাসীবাবুকে টিপে দিলেই হবে—কাক-কোকিলও টের পাবে না।

—তাহলে চলো।

সন্ন্যাসীবাবু দোকানে ছিলেন। পছন্দমতো ছোটখাটো একটা ক্যামেরা কিনে নিয়ে আবার গাড়ীতে উঠলাম। বললাম—ভোঁস, এবার আমি তোমার হাতে। চল এবার কোথায় যাবে।

শিশির বোসকে আমি ভোঁস বলে ডাকতাম। ও হেসে উত্তর দিলে—সোজা এবার দমদম। ওখান থেকে রাত দশটার গাড়ীতে সোজা একেবারে খুলনা।

—খুলনা?

—হ্যাঁ।

—বেশ। তাই সই। খুলনাই চলো। কোনোদিন যাইনি—দেখাও হবে জায়গাটা।

রাত্রি দশটা নাগাদ খুলনা ট্রেনে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে পড়া গেল।

সকাল বেলা খুলনা পৌঁছে নেমে জিজ্ঞেস করলুম : কোথায় থাকবে হে ?

ভোঁস উত্তর দিলে—কেন, ডাকবাংলো।

বেশ খোলামেলা জায়গাটা। মনটাও নিশ্চিন্ত। এখানে বেশ ঘুরে-টুরে দেখা যাবে সব। এখানে আর আমাকে চিনছে কে ?

কিন্তু বিধি বাম। দেখি বাইরে একজন দুজন করে লোক জমতে শুরু করেছে—আর এদিক থেকে ওদিক থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে।

শিশিরকে বললাম—সে কি হে, চিনে ফেলেছে নাকি ?

মনে পড়লো খুলনায় একবার কোনো একটা দল এসেছিল 'প্লে' করতে। আমি দলের মধ্যে ছিলাম না, আমি তাদের চিনি না পর্যন্ত—অথচ তারা পোস্টারে আমার নাম দিয়েছিল। আমার অনুপস্থিতি আবিষ্কার করতে এখানকার লোকের দেরী হল না, কারণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার ছবির সঙ্গে লোকে ততদিন পরিচিত হয়ে গেছে। আর যায় কোথায়! অভিনয়ের সময় ইঁট-পাটকেল ছোঁড়া-ছুঁড়ি—সে এক কাণ্ড !! তাই বলছি, এখানে আমাকে চিনে ফেলাটা খুব আশ্চর্যের কথা নয়।

শিশির বললে : হতে পারে। তোমার ছবি তো আমরা আমাদের কাগজে নিয়মিতই ছাপছি।

ওদের কাগজ মানে 'ভগ্নদূত' সাপ্তাহিক। ভগ্নদূতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি খুব ছাপা হতো। তখন ক'খানাই বা কাগজ ছিল—ভগ্নদূত ছাড়া ছিল সচিত্র শিশির, বাংলা, আত্মশক্তি ও নাচঘর। এঁরাই সাধারণত নাট্যজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

যাই হোক, শিশিরের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। যদি আমার আসার খবরটা রটে যায়, আর সেকথা গিয়ে যদি প্রবোধবাবুর কাছে পৌঁছয়, তাহলে তাঁর আর এখানে ছুটে আসতে কতক্ষণ ?

শিশির সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ একটা ছ্যাকড়া গাড়ী নিয়ে এলো। সেই গাড়ীতে চুপিচুপি উঠে খড়খড়ি তুলে দিয়ে চারদিক ঢেকে-ঢুকে ঘাটের দিকে চললুম—জেনানা

সোয়ারীর মতো। তারপর গাড়ী থেকে উঠলাম একটা বড় নৌকোয়। শিশির একটা গোটা নৌকোই ভাড়া করে ফেলল আমাদের জন্যে। গ্রীষ্মকাল—জলের ওপরে বেশ আরামে থাকা যাবে। যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—ঘাট পর্যন্ত আর কে ধাওয়া করছে—নৌকো থেকে না নামলেই হলো।

রাত তো কাটলো। দিনও যায় যায়। দিনের বেলায় আমরা নৌকো খুলে দিয়ে মন্থর গতিতে ভাসতে লাগলুম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই একটা দুরন্ত কালবৈশাখী ঝড় উঠলো। অতিকায় দুটো ডানা মেলে যেন একটা প্রকাণ্ড কালো পাখী ঝাঁপ দিয়ে পড়ল নদীর ওপর। প্রবল কল্লোলে নদীর রূপও হয়ে উঠল ভয়ঙ্করী।

নদীর পাড়গুলো বেশ উঁচু, মাঝে মাঝে সেই উঁচু পাড় ভেদ করে খালের রেখা চলে গেছে। আমাদের মাঝি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নৌকোখানা খালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। ঝড়টা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি—তা হলেও মাঝির দক্ষতার জন্যই নৌকোর বা আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

ঝড় থেমে যাবার পর পাড়ে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা দিয়ে অনেক ছবি তুললাম। নানান দৃশ্যের মনোমত ছবি—যেমন, নৌকো পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আকাশের বুকে ভেসে চলেছে এক ঝাঁক বক, নৌকোর সারি চলেছে নদীর বুকে, ইত্যাদি।

নৌকোয় বসেই রাত্রে লাল আলোয় ডেভেলাপ করলাম। সলিউশন মিশিয়ে ডিসে ঢাললাম, তাতে কাট ফিল্ম ছেড়ে দিলাম। সময়টা হচ্ছে বৈশাখ মাস, দারুণ গরম। বরফ দেওয়া থাকলে ভালো হতো। কিন্তু বরফ পাবো কোথায় এখানে ?

তাই ডেভেলাপ করতে করতে দেখা গেল, সলিউশনের ওপরে কালিমতন কী-সব যেন ভাসছে। এই সেরেছে, বরফ না হলে তো চলবে না। গেল—সব নষ্ট হয়ে গেল।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। শুয়ে আছি চুপচাপ। আশেপাশে আরো নৌকো এসে জমেছে। মাঝিরা করছে কী! নৌকোগুলোর চালের ওপর দিয়ে যাতায়াত করছে। এবং সেই যাতায়াতটা আবার ধীরেসুস্থে নয়, রীতিমত লাফিয়ে লাফিয়ে চলা। ছইয়ের ওপর দিয়ে অমন করে চললে মাথার ওপর একটা মড়মড় শব্দ হবেই। হয়তো একটু ঘুম এসেছে অমনি ঘুমটা ভেঙে গেল, মড়মড় শব্দের সঙ্গে নৌকোটাও আবার টলে গেল। ব্যাপারটা তো বুঝতে পারিনি, তাই ভয় পেয়ে উঠে বসলুম। কী হলো ?

মাঝি আমাদের অবস্থা দেখে হেসে বলল—ও কিছু না বাবু, লোক যাতিছে।

শুনে আশ্বস্ত হলাম।

শিশিরকে বললাম—আমরা কি নদীর এক জায়গাতেই পড়ে থাকব নাকি? তাহলে নৌকো-ভ্রমণের মজাটা কি হলো?

শিশির বলল—ঠিক কথা—চলো রূপসার দিকে যাই।

নৌকো চললো। রূপসা নদীতে ঢুকে বাজার-হাটের দিকে চলে গেলাম খানিকটা। স্কুলবাড়ী কি কলেজবাড়ী, ঠিক মনে নেই—নদীর ঠিক ওপরেই গাছ আছে বাড়ীর লাগোয়া। সেই গাছে দেখি একখানা পোস্টার লাগানো আছে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে দেখি—সর্বনাশ! পোস্টারে যে আমার নাম রয়েছে! সেই যে খুলনায় এর কিছুদিন আগে স্টার থিয়েটার এসেছিল তখনকার পোস্টার—এখনও লাগানো রয়েছে। আমরা কিন্তু পোস্টার দেখে মনে মনে চমকে উঠলুম। নৌকো বাঁধা রইল বটে ঘাটে, কিন্তু মনটা অস্বস্তিতে ভরে রইল। অহীন্দ্র চৌধুরী নামটা যে এরা শুনেছে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, এখন চেহারা দেখে না চিনে ফেলে! কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম, কয়েকজন ছেলে নৌকো দেখে ঘুর ঘুর করতে শুরু করেছে। কার নৌকো—এটা জানাই তাদের কৌতূহল না অন্য কিছু? উঁকি-ঝুকি যেভাবে দিচ্ছে তাতে কি আমাকে চিনে ফেলেছে নাকি?

রাত শেষ হলে সকালে উঠে চলে গেলাম রূপসাঘাট থেকে বাগেরহাট। এখানে 'বঙ্গে বর্গী', 'পথের শেষে' প্রভৃতি নাটকের বিখ্যাত লেখক নিশিকান্ত বসুরায়ের বাড়ী। ভদ্রলোক ছিলেন ওখানকার নামকরা উকিল শিশির বোসদের খুব জানাশোনা। শিশির বললে—চলো দেখা করে আসি। উনি আমাদের লোক, কোনো ভয় নেই।

গেলাম দু'জনে তাঁর বাড়ীতে। তিনি তখন বাগেরহাটে ছিলেন না, কর্মব্যপদেশে বাইরে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না। আমরা তখন গেলুম বাগেরহাটের কাছাকাছি সুবিখ্যাত 'ষাট গম্বুজ' দেখতে। ষাটটি বড়ো বড়ো গম্বুজওয়ালা বহু প্রাচীন মসজিদ। রেলপথে বাগেরহাটের আগের স্টেশন এটি। এই মসজিদটির বিশেষত্ব হলো, হাঁক দিলে সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি হয়। এর কারুকার্যও দেখবার মতো। বাগেরহাটে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। এখানে প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তাতে সুদৃশ্য ঘাটও আছে বাঁধানো। কুমীর আছে দীঘিতে। তাদের নিয়মিত 'মুর্গী' ভোগ দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকেরা বলে—"কুমীর কবেন না বাবু, বলেন 'দেওতা'।"

মুরগীর পায়ে দড়ি বেঁধে জলের ধারে খোঁটা বেঁধে রাখে। তারপর 'দেওতার'

উদ্দেশ্যে হাঁক দেয়—আয়, আয়। সঙ্গে সঙ্গে দীঘির বুকে ভুস্ করে ভেসে ওঠে 'দেওতা'। তারপরে সোঁ করে ডুব দিয়ে একেবারে মুরগীটার কাছে এসে ভেসে উঠে হাঁ করে মুরগীটাকে লুফে নিলে। নিয়ে এমন একটা ঘুর দিলে যে দড়িটা পট করে ছিঁড়ে গেল। ব্যস, তারপরই দীঘির অতল তলে তলিয়ে গেল সেই 'দেওতা'।

বাগেরহাট সম্বন্ধে যখনই ভাবি তখনই ঐ বিপুলদেহ 'দেওতা'র কথাই আগে মনে পড়ে। এরপর আমরা নৌকোয় ফিরে এলাম বটে, কিন্তু 'দেওতা'র দৃশ্য মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। সব সময় মনে হতে লাগল নৌকোর পাশেই বুঝি কোনো সময় ভুস্ করে ভেসে উঠবে 'দেওতা' আর নৌকোর গলুই ধরে এমন কামড় দেবে যে নৌকো যাবে উল্টে। তারপর আমাদের কি অবস্থা হবে তা ভাবতেও শিউড়ে উঠতে হয়।

ভোরে উঠে শিশির প্রস্তাব করলে—চলো শ্রীরামপুর যাওয়া যাক—ওখানকার বাবুদের আমি চিনি, বেশ থাকা যাবে ওখানে।

—চলো, যেখানে তোমার খুশী।

শ্রীরামপুরে এসে 'বাবুদের' বাড়ীর কাছে একটা খালের ধারে নৌকো ভিড়িয়ে দিয়ে তোফা ছিলাম। তাঁরা অবশ্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন বাড়ীতে থাকার জন্য। আমরাই রাজী হইনি। আমি বললাম—এই তো বেশ আছি—কেমন সুন্দর খোলামেলা। খাওয়া-দাওয়ার সে এক এলাহী ব্যাপার। সকাল বেলায় প্রচুর তপসে মাছ ভাজা আর দুপুরে বহুবিধ ব্যঞ্জনাদির সঙ্গে শোল মাছের কালিয়া। এইসব ভুরিভোজের পর নদীপথে একটু বেড়াই, ঝড়জল দেখলে খাড়ির মধ্যে ঢুকে যাই। খোলা হাওয়ায় থাকতে থাকতে ক্ষিদেও পেতে লাগল প্রচুর। বিকেলে জলখাবারের পর বেড়াতে বেরুই—তখন মনে করি রাত্রে আর খাব না—কিন্তু রাত্রিবেলায় যখন বেড়িয়ে ফিরি তখন আবার বেশ ক্ষিদে পায়। রাত্রিবেলার খাওয়াটা আসতো বাবুদের বাড়ী থেকে। এইভাবে শুয়ে বসে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে প্রায় সাত-আট দিন কাটিয়ে দিলুম।

একদিন শিশির বললে—আর তো ভালো লাগছে না—বড্ড একঘেয়ে। চলো দেশে যাই। কলকাতা থেকেও কোনো চিঠি আসছে না। তার চেয়ে বরং দেশে যাই, সেখান থেকে চিঠিপত্র লেখা যাবে। কি বলো?

আমি আর কি বলব! আমার তো তখন

('হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি তো পথ চিনি না—
তোমারই উপর করিনু নির্ভর—তোমা বই কিছু জানি না—')

শিশির বোসদের আদি নিবাস বরিশালের একটি গ্রামে। দেশে যাবার জন্যে

শিশির বোসের চিত্ত মেতে ওঠা খুব স্বাভাবিক। সে আর দেরী করল না—সেই রাত্রেই টিকিট কেটে বরিশাল এক্সপ্রেস স্টীমারে উঠে বসলাম।

স্টীমার ছাড়তে তখনো কিছু দেরী আছে, চুপচাপ ডেক-চেয়ারে বসে আছি সামনের দিকে তাকিয়ে। একখানা নৌকো ছাড়লো ঘাট থেকে। তাতে হ্যাজাকের আলোয় দেখলুম নতুন স্টীলের ট্রাঙ্ক, ঝকঝকে কাঁসার ঘড়া ইত্যাদি। টোপর মাথায় সিল্কের জামা গায়ে বর, গাঁটছড়া বাঁধা লাল বেনারসী পরা নববধূ মুখটি নীচু করে গুটিসুটি বসে আছে। তার লাল বেনারসীর আভা অল্পক্ষণের জন্য দেখার পরই অবশেষে নৌকোটা এক সময় বাঁক নিয়ে বিশাল নদীর বুকে পাড়ি জমাল।

মনটা ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দুপদাপ আওয়াজে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম। কে যেন একজন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে একটু যেন হাঁপ ছাড়ল সে।

আমি তাঁকে দেখে কম অবাক হইনি। তাঁকে যে এখানে এমনি ভাবে দেখতে পাবো, এ আমি ভাবতেই পারি নি।

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে উনি বললেন—বেশ মশাই।

আমিও একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বললুম—কী ব্যাপার?

বললেন—খুলনায় রইলেন অথচ বিন্দুবিসর্গ জানতে পারলুম না। ভাগ্যিস, মৃগনাভির গন্ধ লুকোনো যায় না। ছেলেরা ঘুর ঘুর করে ঠিকই সন্দেহ করেছিল দেখি। তাই ছেলেরা যখন এসে বললে—অহীন্দ্র চৌধুরী স্টীমারে উঠেছেন—তারা স্বচক্ষে দেখেছে—তখন বেরিয়ে পড়লুম আমার নিত্যসঙ্গী সাইকেলখানা নিয়ে। দেখে এসে একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করি। শীগগির নেমে আসুন। কাছেই আমার বাড়ী, পেট্রোল ডিপোর কাছে।

এ মানুষটির নামও 'বিজয়', তবে মুখুজ্যে নয়, ভাদুড়ী। বিজয় ভাদুড়ী—মোহনবাগানের ১৯১১ সালের আই. এফ. এ. শীল্ডবিজয়ী টীমের অন্যতম কৃতী সদস্য। স্টারে আসতেন থিয়েটার দেখতে, সেই থেকে পরিচয়টা ঘনীভূত হয়েছিল। তবে আলাপ ছিল আগে থেকেই। ১৯১১ সালে ইলিয়ট শীল্ড খেলতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছিলুম। যখন আমাকে ধরাধরি করে তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এই বিজয় ভাদুড়ী তাঁবুতে বসে ছিলেন। যাঁরা আমাকে 'ফার্স্ট এড' দিয়েছিলেন বিজয় ভাদুড়ী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

ওর কথার উত্তরে বললাম—বরিশাল যাচ্ছি, সঙ্গে বন্ধু রয়েছে। এখন আপনার বাড়ী যাই কি করে?

বিজয় বললেন—রিফাণ্ড নিন টিকিট।

বললাম—তা কি হয়? বরং ফিরবার মুখে খুলনায় যখন আসব তখন আপনার বাড়ী যাবো।

উনি আর তখন কি করেন। বললেন—ঠিক? কথা দিচ্ছেন তো?

ওঁর হাত দুটো ধরে বললাম—হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।

স্টীমার ততক্ষণে হুইসেল দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি ওঁকে নেমে যেতে হলো। স্টীমার ছেড়ে দিলো একটু পরেই।

সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি স্টীমার একটা স্টেশনঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনটার নাম হলো—'হুলারহাট'। রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে দেখি পন্টন ব্রীজের টিন উড়ে গেছে। স্ট্রাকচার বেঁকে গেছে। অর্থাৎ কালবৈশাখী তার তাণ্ডব-নৃত্যের কিছু স্বাক্ষর রেখে গেছে।

এই 'হুলারহাটেই' আমাদের নামতে হলো স্টীমার থেকে। স্টীমারের পর এবার নৌকো।

শিশির বললে—স্থলপথেও যাওয়া যায়, তবে হেঁটে নয় পাল্কীতে। অন্য কোনো যানবাহন নেই। তুমি অতদূর হাঁটবে কি করে হে? পাল্কীরও ব্যবস্থা করা নেই—তাই নৌকোই ভাড়া করলাম। বেশ চওড়া খাল—নৌকো করে দিব্যি যাওয়া যাবে। খালটা গেছে বরাবর পিরোজপুর পর্যন্ত। পিরোজপুর একটা মহকুমা শহর।

আমি বললাম—তথাস্তু।

শিশির বললে—এবার একটু আরাম করে নৌকোয় পা ছড়িয়ে বসো।

চওড়া খালটা বেয়ে অনেকখানি এলুম আমরা। তারপর এক জায়গায় নৌকোটা ডানদিকে বেঁকে একটু সরু খালে গিয়ে পড়লো। ঝোপ-ঝোপ সব বেত-গাছ খালের পাড়ে। বেতগাছগুলো সব বেড়ে উঠে জলের ধারে ঝুঁকে পড়েছে। মাঝে মাঝে মাথার ওপর বাঁশের সাঁকো পড়ছে। খালের এপার-ওপার উঁচু করে খানকতক পাশাপাশি বাঁশ ফেলা আছে, তার সঙ্গে ধ'রে পার হবার জন্যে বাঁশের রেলিং—তাও আবার দুদিকে নয়, মাত্র একদিকে। আমি পার হতে পারতুম কি না জানি না—তবে দেখলাম ওখানকার লোক দিব্যি পার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের নৌকো এই রকম গুটিকয়েক বাঁশের সাঁকোর নীচে দিয়ে চলে এলো। বেশ কিছুদূর আসার পর নৌকোটি যেখানে থামল সে গ্রামের নাম হচ্ছে 'রায়ের কাঠি'। সামনেই নব-রত্নের মন্দির। বহু প্রাচীনকালের মন্দির, জীর্ণ, ভগ্নপ্রায়। সেখান থেকে হাঁটা-পথে গ্রামে ঢুকলাম।

শিশির বোসের পিতার নাম ছিল শ্রীঅশ্বিনী বোস, তিনি ছিলেন 'ডেপুটি রেঞ্জার অফ কাস্টম', তখন রিটায়ার করেছেন, অধুনা স্বর্গগত।

উঠলুম গিয়ে ওঁদের বাড়ী। খাওয়াদাওয়া সেরে বিকেলের দিকে গ্রাম ঘুরতে বেরুলাম। সুন্দর একটি পুষ্করিণী আছে গ্রামে। তার বসবার ঘাটটি সুন্দরভাবে বাঁধানো—তার ওপর বসবার ঘাটের দুদিকেই সাঁকো আছে। আমার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ উপেন মিত্র ও শিশির মিত্র মহাশয়ের পৈত্রিক বাড়ীও এই গ্রামে। শিশির বোস নিয়ে গিয়ে দেখালে। বাড়ীতে তালা বন্ধ। বিরাট বাড়ী, 'মিত্র বাড়ী' বলতে এককালে এক-ডাকে সবাই চিনতো—এখন সব ভাগ হয়ে গিয়েছে। শুনেছি 'মিত্ররা' দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। তাহলে এই পূর্ববঙ্গের মাঝখানে এলেন কি করে? হয়তো কার্যোপলক্ষে এঁদের কোনো পূর্বপুরুষ এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। সেই থেকে ক্রমে ক্রমে 'মিত্র বাড়ী' গড়ে উঠেছে।

গ্রামটি কিন্তু ভারী সুন্দর—ঠিক ছবির মতো। বেশ কয়েকটা ছবি তুলে ফেললাম—কিন্তু ডেভেলাপ করব কি করে? বরফ নেই—যদি গরমে আবার নষ্ট হয়ে যায়? তাই রেখে দিলাম কলকাতায় গিয়ে ডেভেলাপ করব বলে। (হায়, আজ তার একখানা ছবিও কাছে নেই, কোথায় কবে হারিয়ে গেছে কে জানে?)

দিন তিনেক আমরা এই গ্রামে ছিলাম। আরও হয়তো থাকতাম কিন্তু কলকাতা থেকে কী একটা চিঠি পেয়ে শিশির বোস মত বদলে ফেলল। চিঠিটা অবশ্য আমাকে দেখায়নি, তবে বাপের সঙ্গে যেটুকু ফিসফাস করেছিল শিশির বোস তাই থেকে বুঝেছিলাম মিত্র থিয়েটারের অবস্থা খারাপের দিকে, স্টারের সঙ্গে যে মামলা চলছিল, তা আজও মেটেনি। এদিকে স্টারের সঙ্গে 'মিত্র'রা যে বেশীদিন মামলা চালাতে পারবেন—তাও মনে হচ্ছে না। তাই এই সব গুরুতর ব্যাপারের জন্যই কলকাতা যাওয়া দরকার অবিলম্বেই।

হ্যাঁ, এর মধ্যে একদিন পিরোজপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম। ভাঁটার টান ছিল সেদিন, সে সময় খালের ধারে ধারে এক হাঁটু কাদা। কাদা পার হলে ঈষৎ উঁচু পাড়। সেই পাড় ঘেঁসে ঘেঁসে উকিলদের বসবার জায়গা। শিশিরের ইচ্ছে ছিল এখানকার জানাশোনা কোনো উকিলের সঙ্গে ওদের জমিজায়গার বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করে। নিজে কাদায় নেমে আমাকেও ডাকতে লাগল।

কিন্তু জল-কাদার অবস্থা দেখে আমার আর নামতে ইচ্ছে করল না। আমি নৌকোতেই বসে রইলাম, ও চলে গেল।

কী পরামর্শ করলে জানি না, কিন্তু ওর মুখ দেখেই বুঝলাম ব্যাপার খুব সুবিধের

নয়। সেসব কথা কিছু না ভেঙে আমার কাছে এসে মুখে জোর করে একটা হাসির রেখা টেনে বললে—বাড়ীর জন্যে মন-কেমন করছে তো। এবার চলো, ফিরে যাওয়া যাক।

মন-কেমন করার কথাটা মিথ্যে নয়। তাই বাড়ী ফেরার কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। এমন কি খুলনায় নেমে যে প্রতিশ্রুতি মতো বিজয় ভাতুড়ীর বাড়ী যাবো—সে ইচ্ছাও হলো না। বাড়ী তখন আমাকে প্রবল টানে আকর্ষণ করছে।

ফিরলাম কলকাতায়—কিন্তু শিয়ালদহতে না নেমে শিশির জোর করে নামালে দমদমে। বললে—বাইরে গাড়ী আছে, বসবে চল

আমাকে প্লাটফর্মে রেখে মুহূর্তের জন্য একবার বাইরে গিয়েছিল বটে, হয়তো সেই সময়ই সে গাড়ী ঠিক করে থাকবে। বাইরে গিয়ে দেখি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে বটে, তবে সে গাড়ীর ভিতরে বসে আছেন মিত্র থিয়েটারের ছোটবাবু জ্ঞান মিত্র মশাই। বুঝলাম, শিশির চিঠি (এমন কি টেলিগ্রামও হতে পারে) লিখে-টিখে আগে থাকতেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল 'মিত্র'দের সঙ্গে

তা করুক, আমার আর আপত্তি কিসের? এখন তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছুতে পারলেই হয়। কিন্তু এ কি? গাড়ী চলছে কোনদিকে?

শিশির বললে—রাজারহাট-বিষ্ণুপুর।

—কেন? ওখানে কেন?

জ্ঞানবাবু বললেন—ওখানেই আপাততঃ তোমরা লুকিয়ে থাকো। মামলা চলছে, প্রবোধবাবু যদি হঠাৎ তোমাদের কলকাতায় দেখে ফেলে?

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, আর উলু-খড়ের প্রাণ যায়। মামলা হচ্ছে স্টার থিয়েটারের সঙ্গে মিত্র থিয়েটারের—আমি ফেরারী আসামী নই, কিছু নই—আমার ব্যক্তিগতভাবে ভয়টা কিসের? ভয় আমার নয়—ভয়টা ওঁদের। প্রবোধবাবুর সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে প্রবোধবাবুর খপ্পরে একবার পড়লে তিনি আমাকে দিয়ে যা-খুশী-তাই করিয়ে নিতে পারেন। হয়তো আগেকার তারিখ দিয়ে একটা কণ্ট্রাকট সই করিয়ে নিলেন—তখন? তখন 'মিত্র'রা যাবেন কোথায়?

যাই হোক, চুপ করে রইলাম। গাড়ী গিয়ে থামলো রাজারহাট-বিষ্ণুপুর স্টেশন থেকে এক ফার্লং-এর মধ্যে মনোরম ডাকবাংলোটির সামনে।

বাংলোয় নেমে একটু সুস্থ হয়ে জ্ঞানবাবুর কাছে মামলার বিষয় বুঝতে চেষ্টা করলাম। তখন যদি বুঝতাম যে, মামলার জন্যে আসলে আমার লুকিয়ে থাকার কোনো দরকার নেই—তাহলে কি এত কষ্ট করে ফেরারী আসামীর মতো লুকিয়ে

থাকি? এঁরা আমার অপরিণত বাস্তব বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে মামলার বিষয় আমাকে জানতেই দিতেন না—এখনও এড়িয়ে গেলেন। বললেন—মামলার খুঁটিনাটি বোঝার মতো বুদ্ধি এখনও হয়নি। যা বলছি শোন, এখানে দিনকতক লুকিয়ে থাকো।

অগত্যা থাকতেই হলো রাজারহাট ডাক-বাংলোয়। একদিন রাত্রে ঘুমুচ্ছি,—রাত—দুটো-আড়াইটের কম হবে না—হঠাৎ একটা গাড়ীর হর্নের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ক্রমাগত হর্নের আওয়াজ শুনে ভাবলাম এত রাত্রে গাড়ী নিয়ে আসবার মতো কে আছে? তারপর ভাবলুম—হয়তো অন্য কোনো লোক হবে ডাক-বাংলোর সন্ধানে এসেছে।

খানিকক্ষণ পরেই দরজায় প্রবল ধাক্কা। ঘুমের ঘোর তখনো যেটুকু চোখে লেগে ছিল, এই ধাক্কায় সেটুকুও ছুটে গেল। সাড়া দিয়ে বললাম—কে?

বাইরে থেকে বাজখাঁই দরোয়ানী গলায় হিন্দীতে হেঁকে সে বললে—দরওয়াজা খুলিয়ে।

পাশের জানালা দিয়ে দেখি, দূরে একটা মোটরগাড়ী দাঁড়িয়ে, রাস্তায় পড়েছে তার হেড-লাইট।

শিশির চিৎকার করে বললে—কৌন হ্যায়? দরওয়াজা খুলেগা কাহে?

সেই বাজখাঁই দরোয়ানী গলায় উত্তর এল: প্রবোধবাবু হ্যায়। প্রবোধ গুহ।

আর যায় কোথায়? যার ভয়ে আসানসোল-খুলনা-বরিশাল ঘুরে নিজের বাড়ী থাকতেও রাজারহাট ডাক-বাংলোয় পড়ে আছি—সে মানুষ একেবারে এখানে—বন্ধ দরজার ওপারে? কী করে টের পেলেন? সর্বনাশ! কী করা যায় এখন?

শিশির বললে—শিগগীর বাথরুমে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও।

তাই করলুম—দুরু-দুরু বক্ষে দাঁড়িয়ে রইলুম বাথরুমের ভেতরে। সে এক মহা অস্বস্তিকর ব্যাপার!

ওদিকে কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোনো সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ রাত্রের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে দুজনের বিকট উচ্চহাস্যের শব্দে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল। দুটি মানুষই প্রাণখোলা উচ্চ হাসিতে শহরতলীর নৈশ নির্জনতাকে যেন ভেঙেচুরে খান-খান করে দিচ্ছে।

ব্যাপারটা কি? উৎসুক হয়ে উঠল মনটা জানবার জন্যে।

ঠিক সেই সময় বাথরুমের দরজায় ঘা পড়তে লাগল। শিশিরেরই গলা শুনলুম—অহীন, বেরিয়ে এসো।

বেরিয়ে এসে দেখি কোথায় প্রবোধবাবু? তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন

জ্ঞান মিত্র মশাই—অর্থাৎ ছোটবাবু—মুখে একগাল হাসি। বললাম—প্রবোধবাবু কোথায় ?

আবার হাসি। হো-হো করে হাসতে হাসতে জ্ঞানবাবু বললেন—প্রবোধবাবু এখানে আসবেন কোথা থেকে ? আমি দেখতে এলাম তোমরা সাবধানে আছো কিনা।

এতক্ষণে বুঝলাম—এ দরোয়ানী গলা জ্ঞানবাবুর !

তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—থিয়েটার ভাঙার পর ইচ্ছে হল তোমাদের একবার দেখে আসি—তাই চলে এলাম।

বলা বাহুল্য, বাকী রাতটুকু আর ঘুম হলো না—বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে নানা গল্প-গুজবে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। সকাল বেলায় উনি বললেন—তোমরা সাবাধানে থেকো, আমি চললাম।

আমি বললাম—আপনিও থাকুন না। খাওয়া-দাওয়া করুন। মালী রাঁধবে'খন।

ছোটবাবুর আবার নিজের রাঁধবার শখ ছিল। একটু ভেবে নিয়ে বললেন—তা মন্দ কথা নয়—রাঁধতে যদি হয় তবে মালী কেন, আমি নিজে রাঁধব।

সারাদিনটা এভাবেই কাটল, বিকেলের দিকে উনি রওনা দিলেন। যাবার আগে বললেন—এত দূরে কষ্ট হচ্ছে অবশ্যই। এক কাজ করুন বরং। বোসের বাড়ীতে গিয়ে থাকুন। কি হে বোস, তোমার স্ত্রী তো এখন রায়ের কাঠিতে ?

শিশির বললে—হঁ্যা।

জ্ঞানবাবু বললেন—ব্যস, সেই কথাই রইলো। অহীন্দ্রবাবুকে তুমি তোমার বাড়ীতে নিয়েই রাখো, এখানে থাকবার দরকার নেই। বাড়ীর বার না হলে আর কে টের পাচ্ছে ?

শিশির বোস তখন ভাড়া থাকত রাজা রাজকিষেণ স্ট্রীটে একটু গলির ভিতর। নামজাদা কণ্ট্রাকটর ছিল আদিত্যরা, সেই আদিত্যদের বাড়ী ছিল ওটা। আদিত্যকে আমি চিনতাম, আদিত্যটা পদবী, ওর আসল নামটা আজ অবশ্য মনে করতে পারছি না। আমি গিয়ে ওর অতিথি হলাম। শিশির বোসকে তখন মিত্রদের খুব দরকার ছিল বুঝলাম। এ অবস্থায় লাভ হলো এই যে, আমিও বন্দী রইলাম, সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকেও পাওয়া গেল। শিশির করিৎকর্মা লোক, থিয়েটার সংক্রান্ত গোলযোগের ব্যাপারে শিশিরের কর্মদক্ষতা 'মিত্র'দের অবশ্যই তখন কাজে লাগবে।

দু-একদিনের মধ্যেই দেখি মণিমোহন এসে হাজির। প্রম্পটার মণিমোহন, অমর দত্ত মশাইয়ের আমলের লোক, শিশির ভাদুড়ী মশাইয়ের থিয়েটারে গোড়া থেকেই ছিল, এখন আছে মিত্র থিয়েটারে।

—কী ব্যাপার ?

ও বললে—হাতে 'পার্ট' দেখছেন না ? বাবুরা বলেছেন আপনাকে পার্ট বলাতে, তাই এসেছি।

—বেশ, বলাও।

দু-একদিন পার্ট বলার পর একদিন বললাম—ওহে মণিমোহন, পার্টতো বলাচ্ছ, ওদিকে থিয়েটারের অবস্থা কিরকম ?

মণিমোহন নীচু গলায় জবাব দিলে—অবস্থা খুব খারাপ। খুব সম্ভব উঠে যাবে।

—বলো কী ?

—হ্যাঁ স্যর। আপনার ওপর তো ইনজাংশন জারী হয়েছে কোনো পক্ষেই যোগ দিতে পারবেন না।

বললাম—তাহলে ? পার্ট বলাচ্ছ যে মিছিমিছি ?

মণিমোহন বললে—ঐ একটা আশায়। ইনজাংশনের পর তো আসল মামলা স্থরু হচ্ছে। মামলার রায় তো যাহোক কিছু একটা হবেই। তখন হয় আপনাকে স্টারে যেতে হবে, নয় মিত্র থিয়েটারে। তাই পার্ট বলাচ্ছি যদি আপনাকে মিত্র থিয়েটারে আসতেই হয়। অবশ্য ততদিন যদি থিয়েটারও টিঁকে থাকে।

মামলার তদ্বিরের জন্যই 'মিত্র'দের দরকার শিশির বোসকে। যদি দাঁড় করাতে পারে কেসটা।

মণিমোহনের কাছ থেকে আরও কাহিনী শুনি। প্রবোধবাবু মামলা নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন। শুধু এ-মামলাই নয়—এছাড়া আরও আছে। 'জনা'র রয়্যালটি নিয়ে শিশির ভাদুড়ী মশাইয়ের সঙ্গেও মামলা জুড়ে দিয়েছেন। 'জনা' গিরীশচন্দ্র ঘোষের বিখ্যাত নাটক। গিরীশবাবুর একমাত্র পুত্র স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)। দানীবাবু ছিলেন খুব সাদাসিধে ধরনের মানুষ, কোনো ঘোর-প্যাঁচ বুঝতেন না কোনোদিনই। দানীবাবু যখন স্টারে ছিলেন তখন প্রবোধবাবু ওঁকে দিয়ে 'জনা'র 'রাইট' লিখিয়ে নেন। ওদিকে এর অনেক আগেই যে 'জনা' শিশিরবাবুকে দানীবাবু দিয়েছিলেন তা তাঁর মনেই ছিল না। সম্ভবতঃ প্রবোধবাবুর ব্যাপারটা জানা ছিল, তাই লিখিত শর্তের মধ্যে এ কথা উল্লেখ করা ছিল যে যে-কেউ 'জনা'র অভিনয় করুক 'রয়্যালটি' প্রবোধবাবুকে দিতে হবে। শিশির ভাদুড়ী মশাই অত জানতেন না—তিনি হঠাৎ 'জনা' খুলে দিলেন। গোটা-চারেক রাত্রি অভিনয় হয়ে গেল—প্রবোধবাবু কিছু বললেন না, কিন্তু তারপর বই জমে উঠতেই শিশিরবাবুর শিরে এসে পড়লো উকিলের চিঠি আর মামলার খড়্গ।

কিন্তু এদিকে আমার যে জীবন অসহ্য হয়ে উঠল। 'বন্দী' জীবন যাপন করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলাম। শিশির বোসকে একদিন ধরে বললামঃ 'ভোঁস', ইনজাংশন যখন জারী হয়ে গেছে, তখন আর আমাকে আটকাচ্ছো কেন? এখন প্রবোধবাবু ধরলেও স্টারে যোগ দিতে পারছি না, মামলার রায় না বেরুনো পর্যন্ত, ওদিকে বাড়ীতে আমার বুড়ো বাবা—স্ত্রীপুত্রকন্যা। ভাবো দেখি কথাটা?

ও ভেবে বললে—আচ্ছা, ঠিক আছে।

'মুক্তি' পেলাম, তাও দিন দুই পরে। বাবাকে বললাম সব খুলে একে একে। বাবা বললেন—কাগজে পড়েছি। তা এখন আর লুকিয়ে থাকা কেন?

বললাম—না, এখন বাড়ীতেই থাকব। বেরুলেই তো হাজার লোকের হাজার প্রশ্ন। তার চেয়ে চুপচাপ বাড়ীতে বসে থাকাই ভালো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর। আমার কথা শুনে আমার ভাগ্যবিধাতা নিশ্চয়ই মনে মনে হেসেছিলেন।

বোধহয় ঠিক তার পরের দিনের ঘটনাই হবে। তৎকালীন ম্যাডান থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টার জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই এসে হাজির।

মনে পড়লো বাবা একবার বলেছিলেন বটে। কে যেন ম্যাডান থেকে খুঁজতে এসেছিল—আমি তাই আমতা করে বললাম—হ্যাঁ—বাবা বলছিলেন বটে—

জ্যোতিষবাবু বললেন—আপনি যে ফিরেছেন তা আমি জানার আগেই সাহেব নিজে শুনেছে। আমি যেতেই বললে—এখুনি গিয়ে চৌধুরীকে নিয়ে এস। কী ব্যাপার মশাই আপনার? সেবার যখন এলাম আপনার বাবা বললেনঃ ওর ঠিকানা আমাদের জানা নেই। এমন উধাও হয়েছিলেন যে বাড়ীতে একটা ঠিকানা পর্যন্ত দেননি?

হেসে বললাম—উধাও হয়েছিলাম কি আর সাধ করে!

জ্যোতিষবাবু আর কথা বাড়ালেন না, বললেন, যাই হোক, চলুন বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে।

—এখুনি যেতে হবে?

—হ্যাঁ। ভীষণ দরকার। গিয়েই শুনবেন।

মনে মনে অবাক হলুম এই ভেবে যে ম্যাডানের সাহেব আমার আসার খবর জানলেন কি করে? পরক্ষণেই মনে পড়লো—আমাদের বাড়ীর ঠিক সামনেই ম্যাডানের অফিসের এক মাদ্রাজী কর্মচারী ভাড়া থাকতো—'মণি' তার নাম—ছোকরা বয়েস, সুদর্শন চেহারা আর স্মার্ট—সে-ই হয়তো খবরটা দিয়ে থাকবে সাহেবকে।

এখানে বলা দরকার যে 'সাহেব' কে? তিনি হলেন ফ্রামজী ম্যাডান—জে. এফ. ম্যাডানের মেজো ছেলে।

গেলাম সাহেবের কাছে। সাহেব একদিন আমাকে দেখে হেসে বললেন—কোথায় ছিলে?

আমতা আমতা করে বললাম—এই কাজকর্মে—

সাহেব হাসতে হাসতেই বললেন—আমাকে আর লুকোতে হবে না—আমি সব জানি। কেন যে ওসব হাঙ্গামের মধ্যে যাও—!

—এ হাঙ্গামের জন্যে কি আমি দায়ী?

সাহেব বললে—দায়ী তোমার নসীব। মামলা-মোকর্দমা সব নসীবেই করায়। যাক, এখন কেন ডেকেছি শোনো—

—বলুন।

সাহেব বললেন—তোমার মামলা চলুক—তোমাকে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি মনের আনন্দে নিজের কাজ করে যাও। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' ছবি তুলছি—'রাজসিংহের' ভূমিকা তোমার। কাল রাত্রেই জ্যোতিষ ব্যানার্জি মশাই তাঁর সমস্ত ইউনিট নিয়ে 'চরখেরী' যাচ্ছেন আউটডোর স্যুটিং-এর জন্যে। তোমাকেও যেতে হবে। শিয়ালদ থেকে যে এক্সপ্রেস ট্রেনটা দিল্লী যায়, সেই ট্রেনে যেতে হবে।

মনটা কিরকম হয়ে গেল—এই এত ঘুরে বাড়ী এসে বসলাম—অমনি রওনা!

—কী ভাবছো?

আমতা আমতা করে বললাম—সাহেব, হাতে টাকাকড়ি নেই। বাড়ীতে টাকা দিয়ে যাওয়া দরকার। মাইনে পাইনি তো? তাই বলছিলাম—

সাহেব তাড়াতাড়ি বললেন—এই কথা? কাল সকালেই কেশিয়ারের কাছ থেকে মাইনে নিয়ে যেও। যদি আর কিছু বেশী দরকার থাকে—স্লিপে লিখে দিও—

বললাম—সাহেব, তাহলে কালকেই রওনা হতে হবে?

সাহেব বললেন—নিশ্চয়ই, 'রাজসিংহ' ছবি তোলা হবে, অথচ রাজসিংহ না থাকলে চলে? এত ভাবনা কিসের? কালই একটা ফার্স্ট-ক্লাশ কামরা রিজার্ভ করিয়ে দিচ্ছি। কোনো অসুবিধা নেই, কালই চলে যাও।

বাড়ী এসে বাবাকে বললাম। বাবার মুখখানা বিমর্ষ হয়ে গেল, বললেন—এই তো বাড়ীতে ফিরলে, আবার এখুনি বাইরে যেতে হবে?

—কী করা যায় বলুন? চাকরী তো! তার ওপর ম্যাডান কোম্পানীর চাকরী। বাবা আর কিছু বললেন না।

পরদিন সকালে গিয়ে টাকা নিয়ে এলাম। রাত্রে ট্রেনে চেপে বসলাম।

দিল্লীগামী সেই এক্সপ্রেস গাড়ীর একটা বড়ো রিজার্ভড্ কম্পার্টমেণ্টে ছিলাম আমি, জ্যোতিষ ব্যানার্জি, মিন্থু কুপার ও জাল। মিন্থু কুপার কোরিস্থিয়ানে অভিনয় করে—কিন্তু আসলে সে ছিল নামকরা স্টেজ-ম্যানেজার। স্টেজ-ম্যানেজার হিসাবে সে যে নাম করেছিল তার কারণ হচ্ছে সে ছিল একজন ম্যাজিসিয়ান। ম্যাজিসিয়ান হওয়ার দরুন স্টেজের উপর ট্রিক সিন (যাকে বলে স্টেজ ইল্যুশন)-গুলি সে সুন্দর করতো। পৌরাণিক বই কোরিন্থিয়ানে প্রায়ই হতো, এবং কথায় কথায় সব অলৌকিক দৃশ্য দেখাতে হতো। এই কার মুণ্ড কাটা গেল, ঐ কে অদৃশ্য হয়ে গেল—এইসব নানান ম্যাজিক আর কি? আমার সঙ্গে আগে থাকতেই আলাপ ছিল। ও স্টারে প্রায়ই আসতো, আমার কাছ থেকে পাশ নিয়ে আমাদের অভিনয় দেখত। তখন পার্শীরা যথেষ্ট পরিমাণে বাংলা নাটক দেখত। এখন অবশ্য সে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে অভিনেতা হয়ে—ওকে দেওয়া হয়েছে মানিকলালের ভূমিকা। তখন তো নির্বাক যুগ—সুতরাং ভাষা-সমস্যা ছিল না।

আর চতুর্থ ব্যক্তি জাল (আসল পদবীটা মনে নেই) ছিল ইউনিট ম্যানেজার। ওর কর্মীদল আগেই চলে গেছে চরখেরীতে—এখন ও নিজে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। বাকী সব লোক উঠেছে সেকেণ্ড ক্লাসে। তাদের মধ্যে ছিল পালনজী, প্রোডাকসন ম্যানেজার। পালনজী ছিল কোরিন্থয়ানে প্রধান শিফটার। আর ঐ কামরায় ছিল ক্যামেরাম্যান হানিফ ও তার জুড়ী মংলু। এই দুজনেই আগে ম্যাডানের প্রভিশন স্টোর্স দোকানে বয়ের কাজ করতো—বিশ্বস্ত কর্মচারী। ফ্রামজী ম্যাডান এদের দুজনকে হাতে ধরে ক্যামেরার কাজ শিখিয়েছিলেন। এখন ওরা দুজনেই ফুল-ফ্লেজেড ক্যামেরাম্যান—দুটি ভিন্ন ইউনিটে প্রধান ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করছে।

দলের বাকী সকলে অর্থাৎ টেকনিসিয়ানরা, বাবুর্চি ইত্যাদি তারা সব আগেই চলে গেছে চরখেরী স্টেটে।

গাড়ী ব্যাণ্ডেল হয়ে ই. আই. আর.-এর পথ ধরলো। পরদিন দুপুর নাগাদ এলাহাবাদ পৌছলাম। দুপুরের খাওয়া সারলাম রিফ্রেসমেণ্ট রুমে। ঐখানে আমাদের ট্রেন বদল করতে হলো। আমাদের ট্রেন আবার ছাড়বে প্রায় সন্ধ্যার সময়। ট্রেনটা মানিকপুর হয়ে ঝাঁসি চলে যায়। ঝাঁসির পথে পড়ে মাহোবা—ঐ মাহোবাতেই আমাদের নামতে হলো। মাহোবা তখন ছিল বুন্দেলখণ্ড রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই মাহোবা থেকে সুবিখ্যাত খাজুরাহো যাওয়া যায়। খাজুরাহো যাবার আর একটা পথ আছে, হরপালপুর হয়ে।

শেষরাত্রের দিকে মাহোরা পৌঁছলাম, দেখি যে চরখেরী স্টেটের লোকজন সব এসে গেছে গাড়ী আর লরী নিয়ে। আমরা ক'জন গাড়ীতেই উঠলাম। গ্রীষ্মকাল—তায় শেষ রাত্রি—গাড়ী করে উঁচু-নীচু পথ দিয়ে যেতে বেশ চমৎকার লাগে।

ভোর হয়ে আসছে—বেশ সুন্দর ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে—পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে—আবছা আবছা অন্ধকার তখনো মিলিয়ে যায়নি—এইরকম সময় আমরা গিয়ে পৌছলাম চরখেরীতে। একটি বিরাট বাড়ীর সামনে এসে গাড়ীটা দাঁড়ালো—শুনলাম ঐটেই স্টেটের গেস্টহাউস। সামনে ফটক, ফটক পার হয়ে গাড়ী ঢোকবার রাস্তা। দোতলায় উঠে গেলুম, চারদিকে ঢাকা বারান্দা, মাঝখানে বড়ো হল। দুদিকে দুটি ঘর। অদূরে দেখা যাচ্ছে সাত-আটশো ফিট উঁচু পাহাড়ের ওপর একটা দুর্গ—র‍্যামপার্ট বা প্রাকার দিয়ে ঘেরা। নীচে চরখেরী শহর—বড় বড় জলাশয় রয়েছে এদিকে-সেদিকে। আমাদের অতিথি-নিবাসের পিছনেই রয়েছে একটি কৃত্রিক হ্রদ। বাড়ীর সেদিকটার অংশের সবটাই সিঁড়ি বলা যায়—ওপর থেকে একেবারে জলের মধ্যে নেমে এসেছে। পাড়গুলি রেলিং দিয়ে ঘেরা। দুটি প্রকাণ্ড বকুল গাছ, তারই ছায়ায় যেন অতিথি-নিবাসটি দাঁড়িয়ে আছে। এই বকুল গাছদুটি থেকে অজস্র ফুল ঝরে পড়ে সমস্ত পরিবেশটাকে আমোদিত করে রেখেছে। ভোরবেলার কথা বলছি—তাই মনে হলো যেন এরকম চমৎকার স্থান বোধহয় ভূভারতে নেই। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্তণ্ড-দেবের তেজ যখন দুঃসহ হয়ে উঠল, তখনই বুঝলাম যে, 'মর্নিং শোজ দি ডে' বলে যে প্রবাদ-বাক্যটি চলে আসছে, সেটা সব সময় স্বতঃসিদ্ধ নয়।

এই অতিথি-নিবাসের নীচে থাকতেন এক সাহেব—নাম ক্যাপ্টেন পেট্রি—আগে তিনি মিলিটারীতে ছিলেন, এখন স্টেটের পুলিশসুপার। বছর চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে। সাহেবের স্ত্রীও থাকতেন সঙ্গে। খুব ভালো লোক—আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। আমাদের বললেন—আপনাদের দেখাশোনার জন্য দারোগা মুন্সী আছেন, আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। তিনিও রইলেন, আমিও রইলাম। যা দরকার হবে আমাদের বলবেন।

—ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

সকাল হলো। ইতিমধ্যে জিনিসপত্র-সমেত লরীও এসে গেল। আমরা ওপরের বড়ো হলটাই নিলাম। আমি জ্যোতিষবাবু মীনু ও জাল। পাশের ঘরে রইল পালনজী ও হানিফ। আউট-হাউসে থাকল ড্রেসার, বাবুর্চি ও অন্যান্য সকলে। আমরা বাবুর্চিকে ডেকে রান্না কি হবে তার নির্দেশ দিচ্ছি, এমন সময় দারোগা মুন্সী ছুটে এলেন হাঁ-হাঁ করে। বললেন—সে কী কথা। রান্নাবান্না করবেন কি? আপনারা হলেন সব

স্টেটের অতিথি। না না, ওসব করবেন না। আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত ভার আমাদের।

—ঠিক আছে। আপনাদের যা মর্জি।

এরপর আমরা গেস্ট-হাউসের বাথরুমে স্নান না করে সকলে মিলে গেলাম লেকে স্নান করতে। ওরা সকলেই বেশ সাঁতার কেটে লেকে স্নানের আনন্দটা পুরোমাত্রায় উপভোগ করল—আর আমি তো সাঁতার জানি না, জলের ধারে দাঁড়িয়ে মগে করে মাথায় জল ঢেলে স্নান সারলুম।

ফিরে এসে দেখি রাজকীয় ব্রেকফাস্ট। নানান উপাদেয় খাবার ডিসের পর ডিসে সাজানো। সেগুলি সব সদ্ব্যবহার করে খাটিয়ার ওপরে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। মুন্সীজী সব তদারক করছিলেন। ঘরের দরজাগুলি সব কাঁচের। তারপর আছে একটা জালের দরজা। বাইরের ঘোরানো ঢাকা-বারান্দার দরজা সব মজবুত কাঠের। উনি লোক দিয়ে একে একে সব কাঠের দরজা বন্ধ করিয়ে দিলেন। তারপর কাছে এসে বললেন—কাঁচের দরজা ব্যবহার করবেন। এখানে মাছির ভীষণ উৎপাত, মাছি আটকাবার জন্যেই এই জালের দরজা। কাঠের দরজাগুলো খুলবেন না—বাইরে রোদের তাপ বাড়ছে, এখুনি 'লু' চলবে—খুব কষ্ট হবে। এই 'লু' লাগালেই বিপদ। জ্বর হবে, আর বেশী লাগালে মৃত্যুও হতে পারে।

শুনে তো চক্ষু ছানাবড়া। ভোর চারটের পর এখানকার কেল্লায় একটা তোপ পড়ে। এই তোপধ্বনি শোনা যায় বহুদূর থেকে। এই সময়ে চাষীমজুররা সব উঠে কাজে বেরিয়ে যায়। তারপর বেলা ন'টার সময় আবার একটা তোপধ্বনি হয়, তখন সব কাজ থেকে ঘরে ফিরে আসে। তারপর সমস্ত দিন আর ঘর থেকে কেউ বার হয় না। শুনলাম যে, আমাদেরও কাজ করতে হবে এই নিয়মে।

বেলা যত বাড়তে লাগলো, তত মনে হতে লাগলো বাইরে প্রচণ্ড ঝড় চলেছে। আসলে এইটাই হলো 'লু'। এই 'লু' লাগলে আর দেখতে হবে না। যাই হোক ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে খাটিয়ার ওপর আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকলুম।

দুপুরবেলা কাঁচের দরজা ঠেলে খানসামারা এলো 'লাঞ্চ' নিয়ে। চেয়ে দেখি সে এক এলাহী কাণ্ড। মাংস, পোলাও, কোর্মা, কাবাব—যাকে বলে একেবারে মোগলাই খানা।

কিন্তু এত গরমে কি এইসব মোগলাই খানা খাওয়া যায়? জল খাচ্ছি, তাও গরম গরম লাগছে। খানসামাকে জিজ্ঞেস করলাম—বরফ আছে?

—নেই হুজুর। মুন্সীজী এলে তাঁকে বলব।

আমরা সামান্য কিছু খেয়ে বাকী সব খাবার ফেরত দিলাম। এইভাবে আই-ঢাই করতে করতে দুপুরটা কাটল। বেলা পড়ে আসতে দেখি মুন্সীজী আসছেন, তার পিছনে চারজন ভিস্তিওয়ালা 'মশকে' (চামড়ার থলে) করে জল তুলে আনছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—কী ব্যাপার ?

মুন্সীজী বললেন—ছাদ ভিজুতে হবে জল ঢেলে। ঘণ্টাখানেক জলে ভিজলে তবে ছাদ ঠাণ্ডা হবে। তারপর ছাদে রাত্রে খাটিয়া পেতে শোবেন।

—ঘরে শোয়া যাবে না ?

মুন্সীজী হেসে বললেন—আরে বাপ—এই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ? তারপর একটু থেমে আবার বললেন—খানসামার কাছে শুনলুম আপনারা কেউ কিছু খাননি—খানা প্রায় সবই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে !

বললাম—এই গরমে অত মাংস-টাংস কি খাওয়া যায়, আপনিই বলুন ?

উনি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন—এখানে তো মাছ-টাছ বড়-একটা পাওয়া যায় না। আচ্ছা, আমি দেখছি কিছু যোগাড করা যায় কি না। এখন বলুন, হুইস্কি আপনাদের ক' বোতল করে লাগবে রোজ।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম। লোক তো আমরা মোটে চারটি—রোজ ক' বোতল মানে ?

জ্যোতিষবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—না না, আমাদের ওসব লাগবে না !

পরে ক্যামেরাম্যান হানিফ আমাদের বলেছিল—চরখেরীতে আগেও শুটিং হয়েছিল। স্টেটের নিয়ম, প্রতিদিন 'গেস্টদে'র জন্য মাথাপিছু এক বোতল করে হুইস্কি। আর যায় কোথায়? খেয়ে কারা সব খুব মাতলামি করেছিল। তাই ফ্রামজী সাহেব হুকুম জারী করেছেন, না, ওসব চলবে না।

বিকেলবেলায় একটু ঘুরে আসব মনে করে বেরুবার উদ্যোগ করছি এমন সময় ক্যাপ্টেন পেট্রির সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন—কোথায় যাচ্ছেন ?

—এই একটু বেরিয়ে আসি।

—যান, কিন্তু বেশী ঘুরবেন না। কষ্ট হবে।

রোদ্দুর পড়ে গেছে—এখন আবার কষ্ট হবে কেন ? রাস্তায় বেরিয়ে বুঝলুম ক্যাপ্টেন কেন ও-কথাটা বলেছিলেন। হাওয়া বইছে মন্দ নয় এবং হাওয়া গরমও নয়। কিন্তু যাতে কষ্ট হয় সে হচ্ছে রাস্তার ভাপ। রাস্তার ভাপ উঠে মুখটা যেন আগুনে ঝলসে যাচ্ছে। যাই হোক এই অবস্থাতেই রাজকীয় বাগান, শহর খানিকটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পাহাড়ের উপরের দুর্গটি ছাড়া বিশেষতঃ এমন কিছু নেই।

বাজারের এক জায়গায় একটা ফলওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফলগুলো সব গরমের চোটে ঝলসে গেছে। একটা জিনিসের দিকে আমার দৃষ্টিটা আকৃষ্ট হলো—লম্বা লম্বা প্রায় আমসির মতোই চুপসে যাওয়া এক বস্তু—রঙটি ঠিক ধরতে পারা যায় না—বেতের বারকোশে সাজানো রয়েছে। এ আবার কী মেওয়া রে বাবা? দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলুম—ইয়ে কৌন চিজ হ্যায়?

দোকানী বললে—এ এক মেওয়া হ্যায়—বায়গন!

—কেয়া!

আমাদের এরকম অবাক হতে দেখে দোকানীও অবাক হলো, বললে—পয়ছানা নেহি? বায়গন?

মানে বেগুন। কী আশ্চর্য, তাই তো! লম্বা সরু সরু বেগুন—গরমে চুপসে গিয়ে ঐ রকম চেহারা হয়েছে। এদেশে বেগুন কি-না মেওয়ার পর্যায়ে পড়ল! শুনলুম এদেশে বেগুন নাকি মেওয়া হিসেবে বিক্রি হয়।

বাঙালী বলতে আমি আর জ্যোতিষবাবু। আমরা দুজনে হেসে বাঁচিনে! বেগুনের কি খাতির!!

বেড়িয়ে ফিরে এসে আবার সেই লেকে স্নান করা গেল। মুন্সীর সঙ্গে দেখা করে বরফের কথা বললাম। সে বললে, দেখছি চেষ্টা করে।

ক্যাপ্টেন সাহেব কাছেই ছিলেন, তিনি বললেন, একদিন অন্তর বরফ পেলেও পেতে পারেন। ঝাঁসি থেকে আসে। একদিন পাবে রাজার পাত্র-মিত্ররা, অন্যদিন আপনারা। আর না আসে তো কেউ পাবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি নিজে বরফ পাও না?

—না।

—গ্রীষ্মকালে চলে কি করে তোমার?

—খাই না। এমনি জলই খাই।

—গরম লাগে না জল?

সাহেব হেসে বললে—না। বরফ-জল তৈরী করে খাই।

—কী রকম?

—দেখবে এসো। বলে সাহেব তার ঘরে আমাদের নিয়ে গেলো। পেল্লায় একটা কাঠের বাক্স। তার ডালাটা সে খুলে ফেললো। ঘাসের চাপড়া দিয়ে জলের বোতল সব ঢাকা রয়েছে। জলে ভেজানো। ডালার ওপরে অনেক ফুটো আছে, তাই দিয়ে জল ঢালতে হয়। বাক্সের নীচেও ফুটো আছে, সেখান দিয়ে জল বেরিয়ে যায়।

ঘাসের চাপড়া, তার নীচে সারি সারি জলের বোতল, আবার ঘাসের চাপড়া, আবার জলের বোতল, সব থেকে নীচে পুরু বালির আস্তরণ।

সাহেব কয়েকটা জলের বোতল বের করলে, বোতলগুলো সব frosted। জল খেয়ে দেখলুম, একেবারে ফ্রিজিডেয়ারে বরফ-গলা জল যেন।

বললাম—ওয়াণ্ডারফুল!

সাহেব সেই থেকে তার 'ফ্রিজিডেয়ার' থেকে আমাদের জল খেতে দিত। আমাদের জন্যে যেদিন বরফ আসত, সেদিন তার কিছু অংশ তাকে দিতাম। কিন্তু পিপাসার জলের ঋণ কি এত সহজে শোধ করা যায়?

ক্রমশঃ সাহেবের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা বেড়েই গিয়েছিল। একদিন সাহেব বললে—তোমরা কেউ হুইস্কি খেলে না—ও ঠিক মুন্সী চুরি করবে। খাও বা না-খাও ও ঠিক খাতায় লেখাবে, আর স্টেটও পাঠিয়ে যাবে নিয়মিত।

আমাদের মনে হলো—এ কী নিয়ম রে বাবা!

রাত্রে ছাদের কোণে এক কুঁজো জল রেখে যে-যার খাটিয়ায় শুয়ে পড়লাম। পায়ের কাছে একটা বাড়তি চাদর রইলো—শেষ রাত্রে দরকার হতে পারে বলে।

এখানে বলা দরকার যে মুন্সীজী চার বোতলের জায়গায় এক বোতল হুইস্কি ও সোডা আমাদের কাছে রেখে দিয়ে গেল। যারা খাবার, তারা অল্প অল্প খেল—আর বাকী তিনটে বোতল চলে গেল মুন্সীজীর বাড়ীতে।

রাত্রে ঘুম আসতে চায় না—এদিকে বকুল ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। কিন্তু ক্রমশঃ হাওয়াও পড়ে গেল, আবার শুরু হলো গুমোট। নীচের ঘরে ঢুকে দেখলাম —মনে হলো যেন 'ফার্নেস'।

রাত্রি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল এবং ঘুমও বেশ জমে এল। কিন্তু জমলে কি হবে, যেই চারটে বাজল অমনি তোপধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও খতম।

দুই-একদিনের মধ্যে নিজেকে ওদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলাম। সকালে লেকে স্নান, বিকেলে বাথরুমের নর্দমা বন্ধ করে চৌবাচ্ছার মতো জল জমিয়ে তাতে গা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকতুম। তাতেও কী গরম যায়? সকালবেলায় যা শ্যুটিং হতো তা ২।৩ ঘণ্টার বেশী নয়।

ভোরবেলা পাহাড়ের ধারে গিয়ে পৌছোতাম। গ্রীজ পেণ্ট, তার ওপর রাজসিংহের রাজপুত স্টাইলের চাপদাড়ি এবং রাজসিংহের ভারী পোশাক—এই গরমে

যে কি কষ্টকর তা ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারবেন। একদিন তো সেজে-গুজে বসে রইলাম, শ্যুটিং আর হলো না, কারণ বেলা বেড়ে গেল।

রাজসিংহ সৈন্য পরিচালনা করবে, বিপুল সেনাবাহিনী চাই—অশ্বারোহী সৈন্য। ফ্রামজীর অনুরোধে স্টেটের রাজাবাহাদুরই সৈন্য-সামন্ত সব ধার দিয়েছিলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ অবশ্য ম্যাডানের। ঘোড়া ও সৈন্যদের সাজিয়ে নিয়ে লোকেশানে আনতে হিমসিম খেতে হচ্ছে পরিচালক জ্যোতিষবাবুকে।

দূরে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে—রাজাবাহাদুর পাত্র-মিত্রদের নিয়ে আসেন শ্যুটিং দেখতে। শ্যুটিং দেখাও উদ্দেশ্য, আবার যাতে সৈন্যদের বেশী খাটানো না হয় সেটা দেখাও উদ্দেশ্য। রাজাবাহাদুরের নিজের আবার থিয়েটার করানোর সখ ছিল। তাঁর ওখানে কিছুদিন আগে থিয়েটার হয়ে গেছে, স্টেজের কাঠামো তখনো দাঁড়িয়ে।

রাজাবাহাদুরের সখের থিয়েটার দলের দুজন আবার আমাদের পরিচিত বেরিয়ে পড়লো। তারা দুজনেই এক সময় করিন্থিয়ানে ছিল। দুটি ভাই—নর্মদাশঙ্কর আর ভোলাশঙ্কর। নর্মদা 'হিরো' সাজে, আর ভোলা করে ফিমেল পার্ট। ফিমেল পার্ট করার মতোই সুন্দর চেহারা তার—সব সময় সেজেগুজে রাজার পাশে পাশে থাকে—যেন সত্যিই রাজপুত্তুরটি।

একদিন আমরা শ্যুটিংয়ে যাচ্ছি গাড়ী করে, এমন সময় দেখি এক বুড়ো রাজপুত একটি জলাশয়ের ধারে বন্দুক নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে চুপচাপ। কাছে-পিঠে আর জনপ্রাণী নেই। কৌতূহলী হয়ে গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কী করছো এখানে?

সাধারণ পথচারী হলে হয়তো উত্তর দিত না, কিন্তু গাড়ী করে যাচ্ছি, ভাবলে কোনো 'রেইস আদমী' হবে বোধহয়—তাই ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিলে—ডিউটি করছি।

—কিসের ডিউটি?

লোকটি জলের দিকে নিশানা রেখে সেদিকে মুখ রেখেই বলতে লাগল—কলকাতা থেকে যে বাবুরা এসেছে—তারা মছলী খায়। এখানে তো মছলী পাওয়া যায় না, এই ঝিলে মছলী আছে, তাই বন্দুক দিয়ে মছলী মারব বলে বসে আছি।

বন্দুক দিয়ে মাছ ধরা? কি বিচিত্র দেশ রে বাবা!

কিন্তু লোকটা যে বাজে কথা বলছে না, একটু বাদেই তা টের পেলাম। ভাগ্যক্রমে চোখের সামনেই ঘটল ঘটনাটা। জলের ওপর কালো-কালো হঠাৎ কী দেখতে পেয়ে তার বন্দুক গর্জে উঠল: গুড়ুম।

সত্যিই মছলী মারা পড়লো বন্দুকের গুলিতে। নিজে আবার সে মছলী ছোঁবে না। দুজন চাকর ছুটে এসে মৃত ভাসমান মাছটাকে ধরে নিয়ে এলো—মাছ বেশ

বড়োই, সুপক্ক রোহিত মৎস্য। রাত্রে খাবার সময় মনেই হল না যে মাছ খাচ্ছি—মনে হল যেন মাংস খাচ্ছি।

এইবার শ্যুটিং-এর কথায় আসি। প্রথম যেদিন আমার শ্যুটিং হল, সেদিনই হল ভারী মজা। রাজসিংহের ঘোড়া দরকার এবং যেহেতু রাজসিংহের ঘোড়া, সেই জন্য তার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এ জন্যে এল একটা সাদা ধবধবে ঘোড়া। দেখতে সুন্দর, তাকে সাজানোও হয়েছে ভালো, পায়ে আবার 'মল' দেওয়া। লাল শালুর পটি, তার উপর মল। পিঠের ওপর জমকালো জাজিম তো আছেই। ঘোড়ায় চড়তে আগেই কিছু কিছু শিখেছিলাম। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তো উঠলুম ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু চড়ার পর ঘোড়ার কাণ্ড-কারখানা দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। ঘোড়া সামনের দিকে না এগিয়ে নাচতে শুরু করে দিল। আসলে নাচিয়ে ঘোড়া আর কী! সামনে এগোয় না, খালি ঘুরপাক খায়—আর সামনের দিকে পা তুলে দিয়ে ঠমকে ঠমকে নাচে। পেছনে হাজার চাবুক মারলেও কিম্বা পেটের দু পাশে গুঁতো মারলেও ঘোড়া চলতে চায় না। তাড়া দিলেও দৌড়য় না। মিস্ কুপার, যে মানিকলাল সেজেছিল, সে তো হেসেই খুন। ওখানে আমার সমস্ত 'সিন'ই ছিল তার সঙ্গে। এ ছাড়া ছিল কয়েকটা যুদ্ধের দৃশ্য—পাহাড়ে ওঠা-নামা এই সব।

জ্যোতিষবাবু এই দেখে হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে সেটুকুই তুলে নিই, বাকীটা কলকাতায় গিয়ে মিলিয়ে নেবো। বললাম—এ ঘোড়া কলকাতায় পাবেন কোথায় যে মেলাবেন?

সত্যিই তো—এই কথায় জ্যোতিষবাবুর হুঁস হলো। সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়ে ঘোটকী বরবাদ হয়ে অন্য ঘোড়া এল। এটি বেশ সুন্দর সাদা ঘোড়া। দ্রুত ছোটে। সুতরাং জ্যোতিষবাবু আর সময় নষ্ট না করে ক্যামেরাম্যান এবং আমাদের কি কি করতে হবে সব বুঝিয়ে দিয়ে বললে—স্টার্ট ক্যামেরা।

স্টার্ট আমি নিলুম, ঘোড়াও ছুটল। কিন্তু হলো আর এক বিপদ। পিছনে যে সৈন্য-সামন্তরা ছিল তাদের ঘোড়াগুলো সামনের দিকে না ছুটে সব আমার ঘোড়াটাকে চারদিক থেকে এসে ছেঁকে ধরলো। আমার তো এদিকে প্রাণান্ত ব্যাপার।

জ্যোতিষবাবু ক্যামেরার পাশ থেকে চিৎকার করলেন—কাট, কাট।

কী ব্যাপার? পরে দেখা গেল, আমি যেটিতে চড়েছিলাম সেটি ঘোড়া নয়, ঘোটকী এবং অশ্বকুলে সম্ভবত সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। নইলে সব অশ্বরাই এর পেছনে একযোগে ছুটে আসবে কেন?

যাই হোক, আবার ঘোড়া পরিবর্তন করে শুটিং-এর কাজ চলল এবং তিন সপ্তাহ পুরো চরখেরীতে কাটিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

রাত্রে একটা ট্রেনে উঠে আমরা সবাই নামলুম এলাহাবাদে। সবাই চলে গেল, কিন্তু জ্যোতিষবাবু ও আমি এলাহাবাদে নেমে গেলুম—উদ্দেশ্য গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম দেখব—সেখানে স্নান করব। বাকী সকলে চলে গেল।

এলাহাবাদ আমার জানা শহর, এখানে একবার থিয়েটার করতে এসেছিলাম। স্নান-টান সেরে একটু ঘুরে-ঘারে স্টেশনে এসেছি ট্রেন ধরব বলে—হঠাৎ জ্যোতিষ-বাবু বলে বসলেন—না মশাই, কলকাতা ফিরছি না এখন।

—সে কী?

—কাশী যাবো। কখনো যাই নি। সেখানে তে-রাত্তির থাকবো।

আমি বললাম—কোথায় উঠবেন ওখানে? জানাশোনা কেউ আছে ওখানে?

উনি হেসে বললেন—আছে মশাই, আছে। ম্যাডানদের সিনেমা হাউস আছে ওখানে, তার ম্যানেজারের সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও বললাম—ব্যস, তাহলে আর ভাবনা কি? আমিও রইলাম আপনার সঙ্গে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে দিচ্ছি না। তার ওপর নতুন জায়গা—আপনাকে আগলাবার জন্যে একজন লোক দরকার তো। যা গুণ্ডা-বদমায়েসের জায়গা কাশী—

জ্যোতিষবাবু হেসে বললেন—আচ্ছা বেশ তো। আপনিও চলুন না।

রাত্রের গাড়ীতে ভায়া মোগলসরাই এলাহাবাদ-বেনারস এক থ্রু ট্রেনে ভোরবেলায় এসে পৌছলাম গঙ্গা পেরিয়ে কাশীর রাজঘাট। মালপত্তর নিয়ে নেমে পড়লাম। জ্যোতিষবাবু ছুটলেন টাঙ্গা ভাড়া করতে, আমাকে এদিকে ছেঁকে ধরল বজরাওলার দল।

বজরায় থাকাটা আমার বেশ ভালোই লাগত। জ্যোতিষবাবুকে বললাম—দরকার কি হোটেলে গিয়ে—এই দিন-তিনেক আমরা বজরাতেই থাকি। গরমকাল, বেশ আরামে থাকা যাবে।

জ্যোতিষবাবু খুশী মনে বললেন—কথাটা মন্দ বলেন নি। তাই করা যাক।

যাক, বজরা নিয়ে আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটে একটা বটগাছের ছায়ার নীচে বেঁধে রাখলুম।

জ্যোতিষবাবু বললেন—হোটেলে তো উঠলাম না, এখন মধ্যাহ্নভোজনের কি হবে?

আমি বললাম—চরখেরীতে তো একদিন খুব মুরগী, পাঠা ইত্যাদি খাওয়া গেছে, এবার এ তিন দিন সাত্ত্বিক আহার মানে ফলার করে কাটিয়ে দিই।

রাজী হলেন জ্যোতিষবাবু। মোণ্ডা, মুড়কি, কলা, দই দিয়ে দিব্যি ফলার করা গেল। তারপর বিকেলবেলায় বেরুলাম বেড়াতে। জ্যোতিষবাবু গেলেন সেই সিনেমার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে—আমিও সঙ্গে ছিলাম। ম্যানেজারের বয়স কম, সুদর্শন চেহারা—এদিকে খুব চালু। অতিথি সৎকারের সুযোগ না পেয়ে সে একটু ক্ষুণ্ণ হলো অবশ্য। সন্ধ্যায় আমরা বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতি দেখে ফেরবার পথে পুরী, ভাজী, চাটনি, রাবড়ি আর কিছু ঘিয়ের খাবার নিয়ে বজরায় ফিরে এলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে বজরার ছাদে শুয়ে তোফা ঘুম দিলাম। বজরাওলা এপারে ব্যাসকাশীতে এসে নৌকো বাঁধলো। ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে ফুটতে আবার ওপারে ফিরে গেলাম। ফলটল কেনা হলো। জ্যোতিষবাবুর পছন্দ পানিফল আর ক্ষীর।

কাশীতে তে-রাত্তির কাটিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে এলুম। কতদিন পরে রাস্তায় আসতে আসতে বাংলা দেশের প্রকৃতির সবুজ সমারোহ দেখে শরীর ও মন দুই-ই জুড়িয়ে গেল।

কলকাতায় এসে শুনলাম, যে থিয়েটারকে কেন্দ্র করে আমার পালিয়ে বেড়ানো, সেই মিত্র থিয়েটারই উঠে গেছে। মনোমোহন চলে গেছে স্টার থিয়েটারের অধীনে। বাবা! এই ক'দিনে এতসব বিপর্যয় ঘটে গেছে!

ম্যাডানের অফিসে অর্থাৎ ৫নং ধর্মতলা স্ট্রীটে, যেখানে আগে ছিল কোরিন্থিয়ান থিয়েটার, এখন অপেরা সিনেমা, গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে কিছু টাকার কথা বললাম। তিনি বললেন—ক্যাশিয়ারের কাছে যাও, আমি বলে দিচ্ছি।

ক্যাশিয়ারের কাউন্টারে তখন বেজায় ভিড়। ভিড় দেখে আমি গেলাম মুখুজ্যে-মশাইয়ের ঘরে, মুখুজ্যেমশাই হচ্ছেন আমাদের সেই ফটো-প্লে সিণ্ডিকেটের 'সোল অব এ স্লেভ'-এর পরিচালক মিঃ হেম মুখার্জি। এখানে এখন তিনি পাবলিসিটি অফিসারের কাজ করেন। ফটো-প্লে উঠে যাওয়ার শোক আমাদের যতটা না লেগেছিল ওঁর লেগেছিল তার চেয়ে বেশী।

এইসব সুখ-দুঃখের কথা বলতে বলতে থিয়েটারের কথা উঠল। উনি বললেন—মিত্র থিয়েটার তো উঠে গেল, মনোমোহন নিয়ে নিল স্টার—এবার স্টারেই জয়েন করুন আর কি! আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো কেন?

বললাম—দিন কতক দেখি, আবহাওয়াটা একটু বুঝে নিই—তারপর দেখি কি হয়। আমাদের সময়ে পাবলিক থিয়েটারে মোটামুটি কিছু যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে

পারলে শিল্পী নির্ভাবনায় থাকতে পারতো বলা যায়। হয়তো কোনো-কোনো সময় দুই-এক মাস বসে থাকতে হতো, কিন্তু তার মধ্যে কোনো-না-কোনো থিয়েটার তাকে ডেকে নিতই।

তবে এক্ষেত্রে আমার ব্যাপারটা ছিল একটু আলাদা। মিত্র থিয়েটার উঠে স্টারের কবলে গেল বলে স্টারের আধিপত্য বেশী হওয়াটা স্বাভাবিক। তাছাড়া আমার ওপর স্টারের একটা রাগ থাকাটা অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমার অন্য থিয়েটারে কাজ পাওয়াটা সহজ হবে বলে মনে হয় না। তখন শুধু ছবির জগৎকে অবলম্বন করেই কাটাতে হবে। হেমবাবুর সঙ্গে খানিকটা কথাবার্তা বলার পর গেলাম ক্যাশিয়ারের ঘরে—দেখলাম ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে।

ক্যাশিয়ার লোকটি ভাল—জাতে গুজরাঠী, নাম ঘনশ্যাম। আমি টাকা নিতে গেলেই আমার হাতে একটি চিরকুট ও একটি পেন্সিল ধরিয়ে দিতো—আর আঙুল দিয়ে দেখাতো এক না দুই, না তিন, না চার। অর্থাৎ কোনো থিয়েটারের পাশ লিখে দিতে হবে। আজ অবশ্য পাশের প্রশ্নই উঠল না। আমি টাকা নিযে আবাব মুখুজ্যে-মশায়ের ঘরের দিকে আসছি—এমন সময় ঘটে গেল এক অঘটন।

আমি ক্যাশঘর থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে ধর্মতলার দিকে ফুটপাথের ওপর দিকের চওডা বারান্দা দিযে মুখুজ্যের ঘরের দিকে যাচ্ছি এমন সময় সামনেই এমন একজনকে দেখলুম, যাকে দেখে হঠাৎ ভূত দেখার মতোই চমকে উঠলুম। মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হলো না—আমাকে দেখে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ঘাডটি ডানদিকে হেলিযে মৃদু মৃদু হাসছেন। অর্থাৎ ভাবটা হলো এই যে এইবার যাদু কোথায় যাবে। এ ক'দিন আমাকে তুমি বড্ড জ্বালাতন করেছো। তিনি মুখে কিছু না বললেও মনের ভাবটা যেন এই রকমই ছিল। মানুষটি হলেন স্টারের স্বনামধন্য প্রবোধচন্দ্র গুহ। আমি যেন 'হিপনোটাইজড্' হয়ে গেলাম।

উনি কোনো কথা বললেন না—শুধু এসে খপ করে আমার হাতটা ধরলেন এবং সেটা বেশ জোরেই।

তারপরেই মুখখানা পাশে ফিরিয়ে মুখুজ্যেমশাইকে বললেন—আসামী গ্রেপ্তার।

হেমবাবু হাসতে লাগলেন। প্রবোধবাবু আমার হাত ধরেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখি সামনেই সেই স্টারের 'টি' মার্কা ফোর্ড গাডী। বললেন—ওঠো।

উঠলাম। উনি আমার পাশে বসলেন। গাডী চলতে লাগলো সোজা সার্কুলার রোডের দিকে। কোনো কথা নেই, কোনো রাগ নেই, কটূক্তি নয়। উনিও চুপচাপ,

আমিও চুপচাপ। আমি যেন কোনো নতুন জায়গায় এসেছি এইভাবে কলকাতা শহরের বাড়ীঘর সব দেখতে দেখতে চললাম—বরাবরই ডানদিকে তাকিয়ে ছিলাম, বাঁদিকে আর তাকাবার সাহস হয়নি, কারণ ওদিকটায় প্রবোধবাবু বসেছিলেন। গাড়ী বাঁক নিয়ে শেয়ালদহ এলো—তারপর শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড ঘুরে ডানদিকে বেলগাছিযার পাশ দিয়ে যশোর রোডের দিকে চলতে লাগল। বুঝলাম গাড়ী চলেছে কোথায়—গদাইবাবুর বাগানবাড়ী।

বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। গাড়ী গিয়ে ঢুকল ফটকের মধ্যে। এই ফোর্ড-গাড়ীখানার আওয়াজ হতো ভীষণ, আর সেই আওয়াজ শুনেই লোকজন বেরিয়ে আসতো। আজ কিন্তু কেউ এলো না। মনে মনে ভাবছি—এবার এরা আমাকে এখানে জোর করে আটকে রেখে দেবে নাকি!·· না, তা পারবে না—পাঁচিল আছে বটে তবে এমন কিছু উঁচু নয় যে টপকাতে পারবো না।

গাড়ী থেকে নেমে দুজনে প্রথমেই প্রায় একতলা-সমান সিঁড়ি ভেঙে শ্বেতপাথরের দালানটা পেরুলাম। বড়ো বড়ো থাম—ঝিলমিল আর রেলিংদেওয়া বারান্দা—তারপর ঘরগুলো। বারান্দা দিয়ে উঠে এসে আমরা একটা ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। ছোট ঘর, সব সময় ফরাস পাতা থাকতো সেখানে, তাস-টাস খেলা হতো। এখন দেখলাম দুটি ভদ্রলোক খুব একাগ্রতা সহকারে কি কাজ করে চলেছেন। একজন গড়গডার নল মুখে দিয়ে কি সব বলে যাচ্ছেন, আর অপরজন তাই লিখে চলেছেন মন দিয়ে মাথা নীচু করে।

প্রবোধবাবু বললেন—দেখুন কাকে ধরে এনেছি।

নিজেদের কাজে তাঁরা এত তন্ময় ছিলেন যে, প্রবোধবাবুর গলা শুনে যেন তাঁদের চমক ভাঙলো। তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে যেন আরও চমকে গেলেন। কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র। তারপর হাসিমুখে বলে উঠলেন—এই যে, এসেছেন? আপনাকেই তো আমরা খুঁজে মরছি।

মুখে গড়গড়ার নল-দেওয়া লোকটি হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর লেখকটি হলেন জানকীবাবু—অপরেশবাবুর 'গণেশ'।

অপরেশবাবু উৎসাহের সঙ্গে বললেন—জানেন তো মনোমোহন আমরা নিয়েছি? সেজন্য নতুন নাটক লিখছি 'শ্রীরামচন্দ্র'। আপনার ভালো পার্ট আছে মশাই—দুটো পার্ট।

বললাম—দুটো পার্ট? আমার জন্যে?

—হ্যাঁ

—করা যাবে একসঙ্গে ?

—কেন যাবে না? গোড়ার দিকে দশরথ, আর শেষের দিকে রাবণ ?

বললাম—কিন্তু পাবলিক থিয়েটারে একসঙ্গে দুটো পার্ট ?

অপরেশবাবু বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ—এরকম খুব হয়। মেক-আপ করে ভোল ফিরিয়ে দিতে পারবেন না ?

'না'-এর উপর এমন টান দিলেন যে, আর না বলতে পারলুম না, সত্যি সত্যিই।

উনি বলে চললেন—আপনিই পারবেন মশাই—নইলে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি কেন ?

প্রবোধবাবু বললেন—আর ছেলেমানুষী না করে রাজী হয়ে যাও। আমি তো স্টার নিয়ে রয়েছি, ওটার দেখাশোনা তেমন করতে পারব না। সুতরাং মনোমোহনের সবকিছু দেখাশোনার ভার তোমাকেই নিতে হবে। অর্থাৎ তুমিই হবে ওখানকার সর্বেসর্বা।

অদ্ভুত করিৎকর্মা মানুষ এই প্রবোধবাবু। আমাকে তখুনি নিয়ে বেরুলেন হাইকোর্টে, টেম্পল চেম্বার্সে—অ্যাটর্নী দত্ত অ্যাণ্ড সেনের অফিসে। সেন অর্থাৎ সতীশ সেন স্বয়ং বসে ছিলেন অফিসে—ওঁর পার্টনাররাও ছিল। আমাকে দেখে সতীশবাবু প্রথমটা খুবই অবাক হয়েছিলেন, কয়েক মুহূর্ত কোনো কথাই বলতে পারলেন না—তারপর বিস্ময়ের ঘোর কাটলে বললেন—আসুন।

নমস্কারাদি করে গিয়ে বসলাম। প্রবোধবাবু বললেন—কাগজপত্র সব তৈরী করে রাখবেন—ও কাল এসে সই করে দিয়ে যাবে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—কাল তোমাকে আবার নিয়ে আসব—বাড়ী থেকে তুলে—থেকো যেন বাড়ীতে। বুঝলে !

মাথা নেড়ে জানালাম—আচ্ছা।

বাড়ী এসে আগাগোড়া ব্যাপারটা সব তলিয়ে দেখতে লাগলাম। এ যে কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল, কে জানে। আমি গেলাম ম্যাডানে, টাকা আনতে, সেই সময় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মুখুজ্যের সঙ্গে প্রবোধবাবুর টেলিফোনে কি কথাবার্তা হলো—যার ফলে আমার জীবনে এত বড়ো একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। এত কাণ্ডের পরেও স্টার কর্তৃপক্ষ নিজে থেকে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন সসম্মানে, আমাকে কোনো-রকম কৈফিয়ত তলব বা কটূক্তি না করে—সেইটেই সবথেকে আশ্চর্য লাগল। বিধাতার কি অদ্ভুত বিধান! আবার স্টারেই আসতে হলো শেষপর্যন্ত—তবে সর্বোচ্চ ক্ষমতায়,

এই যা সান্ত্বনা। কিন্তু প্রবোধবাবু ম্যাডানের অফিসে এসে যে আমাকে পাকড়াও করলেন—তিনি খবর পেলেন কি করে?

তারপর একটু ভাবতেই মনে হলো—এ নিশ্চয়ই মুখুজ্যেমশায়ের কাণ্ড। তিনিই নিশ্চয় ফোন করে দিয়েছিলেন প্রবোধবাবুকে। আমি যখন প্রথমবার ঘনশ্যামের কাছে গেলাম টাকা নেবার জন্যে, সেই সময়ই তিনি থিয়েটারে ফোন করে শুধু বলেছিলেন ঃ এসেছে। আর উনিও কালবিলম্ব না করে এসে হাজির।

যাই হোক, এ একরকম ভালোই হলো। তার পরদিন যথানির্দিষ্ট প্রবোধবাবু গাড়ী নিয়ে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন দত্ত-সেনের অফিসে। আমাকে সই করতে দিলেন এক লিখিত কণ্ট্রাক্ট—একেবারে তিন বছরের কণ্ট্রাক্ট। সই করে দিলাম।

প্রবোধবাবু বললেন—আগের থেকে তোমার মাইনে বাড়লো—এই নাও কণ্ট্রাক্টের কপিটা রেখে দাও।

এরপর আবার একটা কাগজ সই করতে দিয়ে প্রবোধবাবু বললেন—তোমার নামে মামলা ঝুলছিল তো! কিন্তু ও-পার্টি তো অক্কা পেয়েছে। তোমার ওপর যে ইনজাংশনটা ছিল তাও মিটে গেল। এটা তারই ডকুমেণ্ট। পড়ে দেখ।

পড়ে আর দেখিনি, সই করে দিয়েছিলাম। কাউকে তখন অবিশ্বাস করিনি, সকলের ওপরই নির্ভর করেছি। এই যে তখন কাগজখানা পড়ে দেখিনি, তার জন্যে আমায় যথেষ্ট বিব্রত হতে হয়েছিল তিন বছর পরে। সে-কথা যথাসময়ে বলব। পরে অবশ্য ঘা খেয়ে খেয়ে এসব বিষয়ে পোক্ত হয়ে উঠেছিলাম। না হয়ে উপায় নেই—নইলে হতে হবে "unfit for professionalism".

আমার মনটা বেশ নরম হয়ে গিয়েছিল। এরা তো আমার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করলেন না—এমনকি একটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা কটু কথা পর্যন্ত বললেন না। প্রবোধবাবু নিজে বাড়ী পৌছে দিয়ে গেলেন। সেই ঠিক আগের মতোই ব্যবহার। যাবার সময় প্রবোধবাবু বলে গেলেন—কাল 'মনোমোহনে' এসো—কাল থেকেই কাজ শুরু হোক। তোমাকে সব বুঝে নিতে হবে তো!

—আচ্ছা। বলে বাড়ীর ভেতর চলে গেলাম।

বাবাকে গিয়ে সব ব্যাপারটা বললাম। তিনি শুনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—যাক বাবা, নিশ্চিন্দি হওয়া গেল। আমি খুশী মন নিয়ে উঠতে যাব এমন সময় দেখি দরজার পাশ থেকে একটা ছায়ামূর্তি যেন চকিতে সরে গেল।

বুঝলাম, এ-ছায়ামূর্তি কার? তখনকার দিনে শ্বশুরের সামনে পুত্রবধূ স্বামীর সামনে এসে কথা বলবে—এটা রক্ষণশীল পরিবারের পক্ষে একটা দারুণ অভাবনীয়

ব্যাপার। এমন কি চাকর-বাকরের সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলবে—তাও অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে এবং আস্তে আস্তে যাতে দূরের লোক না শুনতে পায়। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যা-কিছু বাক্যালাপ সব শয়নের পূর্বে দরজায় অর্গল বন্ধ করে।

আশ্চর্য মহিলা ছিলেন আমার স্ত্রী সুধীরা। কোনোদিন তাঁকে মুখ ফুটে কিছু চাইতে দেখিনি আমাকে। আমাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, ভক্তি করতেন, আমি রাত্রে যতক্ষণ না বাড়ী ফিরতাম ততক্ষণ তিনি জেগে বসে থাকতেন। তার জন্যে একদিনের জন্যেও তিনি কোনোরকম অনুযোগ বা অভিযোগ করেননি। আমাদের ভালোবাসার মধ্যে উত্তাপ ছিল কিন্তু উচ্ছ্বাস ছিল না।

তাঁর চরিত্রের আর একটা বড়ো দিক ছিল যে, শ্বশুরের সঙ্গে অর্থাৎ আমার বাবার সঙ্গে তাঁর একটা অপূর্ব স্নেহের সম্পর্ক। দুজনকে দেখলে মনে হতো, বাবা যেন নতুন করে তাঁর মাকে ফিরে পেয়েছেন, আর সুধীরাও যেন তার নিজের পিতারই সেবা করছে। বাবাও যেমন শেষজীবনে সম্পূর্ণভাবে পুত্রবধূর উপর নির্ভর করেছিলেন, তেমনি পুত্রবধূরও শ্বশুরমহাশয়ের যাতে কোনোরকম কষ্ট না হয় তার দিকে তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি ছিল।

রাত্রে শোবার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে সুধীরা বললে: যাক বাবা, এতদিনে নিশ্চিন্দি হওয়া গেল।

আমি প্রশ্ন করলাম—তুমি দরজার আড়ালে থেকে সব শুনলে বুঝি?

—হ্যাঁ। কাল বাবাকে বলব কালীঘাটে গিয়ে পুজো পাঠিয়ে দিতে। মা-কালী মুখ রেখেছেন।

এই রকম সরল ও ভগবদ্বিশ্বাসী ছিল তার মন।

পরের দিন মনোমোহনে যেতেই দেখি প্রবোধবাবু গেটের কাছেই সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

মনোমোহনের বাইরেটাই এযাবৎ দেখে এসেছি—ভিতরটা তেমন জানা নেই। বহুদিন আগে সেই যে বান্ধব-সমাজের হয়ে 'পার্থপ্রতিজ্ঞা' (অভিমন্যু-বধ) নাটক অভিনয় করেছিলাম স্টেজ ভাড়া নিয়ে। তখন স্টেজের ভিতরটা কিরকম যেন ঘুপসী মতো মনে হয়েছিল।

মনোমোহনের সামনেটা ছিল একটু উঁচু, দুদিকে দুটো সিঁড়ি উঠে গেছে। আর তাদের মাঝখানে ছিল একটা ফোয়ারা। উপর থেকে ফোয়ারার জল উপচে পড়ছে, আর নীচে সান-বাঁধানো গোলাকার জলাধারে বড়ো বড়ো লাল মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। জলের ওপর শ্বেতপদ্মের পাতা ভাসছে। মাঝে মাঝে শ্যাওলা জমে আছে। স্বচ্ছ

জলের মধ্যে দিয়ে মাছেদের নিঃশব্দ যাতায়াত দেখতে আমার খুব ভালো লাগত। মাঝে মাঝে অবসর মুহূর্তে ময়দার টোপ ফেলে মাছগুলিকে খাওয়াতাম। মাছগুলো বড়ো ছিল বলেই ধরা সহজ ছিল না—আর বোধ হয় সেইজন্যেই চুরিও যেতো না। এতো বড়ো-বড়ো লাল মাছ এক পরেশনাথের মন্দির ছাড়া আর কোথাও নজরে পড়েনি।

মনোমোহনের সেই স্টেজ আর অডিটোরিয়াম কবে ভেঙে গুড়িয়ে গেছে। সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে বিস্তৃত চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু, যেখান দিয়ে আজ ছুটে চলেছে সবরকম যানবাহন। এই থিয়েটারের সব স্মৃতিটুকুই মুছে গেছে, শুধু জেগে আছে মনোমোহনের শিবালয়টি। এই শিবালয়ের উত্তর গা দিয়ে তিন ধাপের সিঁড়ি পেরিয়ে পড়তে হতো চাতালে। তারপরই ছিল দানীবাবুর ড্রেসিং-রুম। ঘরজোড়া একখানা নীচু তক্তপোষ পড়ে রয়েছে দেখলাম—তক্তপোষের ওপর সতরঞ্চি পাতা, তার ওপর চাদর আর তাকিয়া। টেবিলে আয়না বসানো থাকতো, ড্রেসাররা সাজিয়ে দিতো। চোখ খারাপ ছিল বলে তিনি দেখতে পেতেন না ভালো। তামাক খেতেন, এক পাশে থাকতো তামাকের সব সরঞ্জাম। এখন অবশ্য সেসব আর কিছু নেই। এখানে এখন থেকে ডিরেক্টররা বসবেন বলে স্থির হয়েছে।

দোতলায় ছিল মনোমোহনবাবুর নিজস্ব বৈঠকখানা। সমস্ত থিয়েটার-বাড়ীটা ভাড়া দিলেও উক্ত বৈঠকখানাটি কিন্তু নিজের অধিকারেই রেখেছিলেন মনোমোহনবাবু। সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে পাশাখেলার আসর বসাতেন তিনি। আর মাঝে মাঝে খেলার উৎসাহে সব ভুলে কেউ কেউ চিৎকার করে উঠত—'কচ্চে বারো'। তখন যে মঞ্চে প্লে চলছে সে হুঁশ তাদের থাকতো না। মঞ্চ-কর্মীরা বা অভিনেত্রীরা মাঝে মাঝে অসুবিধা বোধ করতেন। সময়ে সময়ে দর্শকদের কানেও সে-চিৎকার গিয়ে পৌঁছুত। হয়তো মঞ্চে কোনো একটা দারুণ নাটকীয় মুহূর্তের সময় সোল্লাস চিৎকার ভেসে এল 'কচ্চে বারো'—অমনি সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ থেকে দর্শকরা চিৎকার করে উঠতো, 'আস্তে', 'চুপ করুন', 'সাইলেন্স' প্রভৃতি। মনোমোহনবাবু নিজেও যখন থিয়েটার চালাতেন, তখনও এ-ব্যাপার চলতো।

শিশির ভাদুড়ীমশাই যখন এখানে 'মনোমোহন নাট্যমন্দির' করেছিলেন তখনো চলতো। শিশিরবাবু এ নিয়ে বহুবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও যখন মনোমোহনবাবুর পাশাখেলা বন্ধ হলো না, তখন শিশিরবাবু ওখান থেকে উঠেই গেলেন। শিশিরবাবু চলে যাওয়ার পর আর কেউ চট করে এ-থিয়েটারে আসতে চাননি। মনোমোহনবাবু নিজেও আর চালাতে পারতেন না—অবশেষে স্টারের এ আগমন।

যাই হোক, স্টেজের ওপর রিহার্সালের ব্যবস্থা হয়েছে—প্রবোধবাবু আমাকে

একেবারে সেইখানেই নিয়ে গেলেন। দানীবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে গেলাম, তারপর অভিনেতাদের সাজবার ঘর। সেটা পেরিয়ে স্টেজে যাবার পথ, এই পথের পাশেই মেয়েদের সাজবার ঘর। এরপর মস্ত চৌবাচ্চা, কল ইত্যাদি। এ-সবের পূবদিকে গোটাতিনেক ছোট ছোট দোতলা বাড়ী ছিল সারি সারি। যখন শিশিরবাবু মনোমোহনে অভিনয় করতেন, তখন এরই একখানি বাড়ী সম্পূর্ণ ভাড়া নিয়ে থাকতেন বলে শুনেছিলাম। এই বাড়ীর একখানা ঘর স্টার কর্তৃপক্ষ ভাড়া নিয়েছেন প্রবোধবাবুর জন্যে। ঘরখানায় খাট পাতা আছে, টেবিল-চেয়ারও আছে।

এ তো গেল পূবদিকের কথা। পশ্চিমদিকে অর্থাৎ স্টেজের ডানদিকে প্রথমেই একখানা ঘর—সিঁড়ির নীচেটা যে-রকম থাকে, সেইরকম আর কী। পার্টিশন করা—খুবই ছোট্ট ঘর—সাজবার টেবিল ছাড়া একখানা ইজিচেয়ার মাত্র ধরে। মেক-আপ করার পর ভালোভাবে দাঁড়িয়ে পোষাক পরা যায় না, বাইরে বেরিয়ে পরতে হয়। এই ঘরটা ছিল নির্মলেন্দু লাহিড়ীর। প্রবোধবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই ঘরটাই তুমি নাও।

আমি বললাম—বড্ড ছোট ঘর—একেবারে হাত-পা মেলবার জায়গা নেই।

প্রবোধবাবু বললেন—আপাততঃ এইখানেই সাজো—তারপর আমার ঘর তো রইলই।

আমি আর কিছু বললাম না। ঘরখানার পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে একেবারে বক্স-এ চলে গেছে। নীচে জাল দেওয়া আলমারী সব রয়েছে—আর তারপরেই স্টেজ-ম্যানেজার কালীবাবুর ঘর। কালীবাবুর পুরো নামটা ছিল—আমার যতদূর মনে পড়ে—কালীচরণ দাস। পরে ইনি চলে যেতে অন্য অভিনেতারা এসে ঘরখানা দখল করেছিলেন। এর পরে ছিল স্টোর-রুম, সিন-ডক ইত্যাদি। সেখানে বড়ো বড়ো ইঁদুর এসে বাসা বেঁধেছে। ইঁদুরগুলো আকৃতিতে এমনই বিরাট যে তাদের মনে হতো বেড়ালের মতো। তাড়া দিলে আমাদেরই দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসত। তারপরে ছিল বিরাট চৌবাচ্চা, তারপরে পাঁচিল। তার পিছনে একটা বড় পুকুর—তার পাশে ঘন বস্তী।

এ গেল স্টেজের উত্তরদিকের কথা, যেখানে তখন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। পশ্চিমদিকেও ছিল বিরাট এক বস্তী। সারি সারি চালাঘর আর ছোট ছোট গলি। সবটাই প্রায় বেশ্যাপল্লী। অনেক চাটের দোকান, মদও দুর্লভ ছিল না। আমাদের সময় এইসব বস্তী ভাঙতে আরম্ভ করেছে, তবু কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে। চারদিকে সব পরিষ্কার হচ্ছে, মাঝখানে শুধু মনোমোহনের থিয়েটার-বাড়ীটি দাঁড়িয়ে আছে।

এটিও ভেঙে ফেলা হতো, কিন্তু খেসারৎ হিসেবে মালিক কি পাবেন সেটা নির্ধারিত হয়নি বলে যা দেরী।

যাই হোক আমাকে স্টেজের ওপর নিয়ে দলের স্টাফের অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম—আমার ড্রেসার কে হবে? কুঞ্জ এবং কানা শুকুর (তার একটা চোখ কানা ছিল বলে সবাই তাকে কানা শুকুর বলে ডাকত—যদিও এটা খুব নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, তবু মানুষ ঐভাবে ডাকে এবং যাকে ডাকে তারও ক্রমশ সয়ে যায়)—ওরা দু'জন স্টারেই রয়ে গেছে। এখানে আমার ড্রেসিং-মেক-আপ যে করবে, তার নাম হলো মণি মিত্র। বয়স্ক লোক, অমর দত্তমশাইয়ের আমল থেকে সে এই কাজ করছে। স্টারে ছিল মেয়েদের জন্যে—এখন এখানে এসেছে। অমরবাবুর কাছে এসেছিল অভিনয় করার জন্য শিক্ষানবীশ হয়ে—শেষপর্যন্ত হয়ে গেল ড্রেসার।

ধীরে ধীরে স্টেজে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুরানো যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—এই যে, আসুন, অসুন।

সকলকে নমস্কার জানিয়ে বসলাম। প্রবোধবাবু একটু পরে উঠে গিয়ে একটি সুদর্শন ছেলেকে ডেকে নিয়ে এলেন। তারপর তাকে দেখিয়ে আমাকে বললেন—এর নাম জয়নারায়ণ মুখুজ্যে—আজ থেকে তোমার অনেক কাজ করে দিতে পারবে। এর আগে নাট্যমন্দিরে ছিল। ফাঁকিবাজ নয়—বেশ খাটিয়ে ছেলে।

ছেলেটিকে আমার ভালোই লাগল। চেহারাটি সুন্দর, স্বভাবটিও নম্র।

এর কিছুক্ষণ পরেই এলেন অপরেশবাবু। 'শ্রীরামচন্দ্র' নাটক যতদূর লেখা হয়েছিল, ততদূর পড়ে শোনালেন। সকলকে পার্ট বণ্টন করা হয়ে গেল। কালীবাবু ছিলেন গিরিশবাবুর আমল থেকে স্টেজ-ম্যানেজার—খুব বিচক্ষণ, ভদ্র এবং কাজের লোক। আমি যে ওখানে কি পজিশনে গেছি, তা উনি প্রথম আলাপেই বুঝে নিয়েছিলেন। আমাকে নিয়ে গিয়ে সব দেখাতে লাগলেন, কি stage, illusion উনি করছেন বা করবার ইচ্ছা করেছেন। যেসব 'সিন' এঁকেছেন তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাতে লাগলেন। প্রবোধবাবু আবার বলে দিলেন—সিন-টিন যা করবেন সব অহীনকে দেখিয়ে নেবেন, এসব বিষয়ে ওর ভালো জ্ঞান আছে।

তারপর আবার স্টেজে ফিরে আসতেই অপরেশবাবু আমাকে ডেকে বললেন—বই রইলো। রিহার্সাল আপনি শুরু করে দিন। তারপর বাকীটা শেষ করে আমি এসে বসবো'খন।

তাই হলো। প্রচুর উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে কাজে লেগে পড়লুম। স্টার

থেকে এলো দুর্গাদাস আর ইন্দু। ওরা আমাকে কাছে পেয়ে খুব খুশী। ইন্দু বললে—শুনলাম তুমি বাড়ী ফিরেছ, কিন্তু নানান ঝামেলায় আর দেখা করতে পারিনি।

দুর্গা বললে—আর কি, এবার পুরোদমে লেগে পড়ো।

স্টার থেকে আরও এলেন দুর্গাপ্রসন্ন বসু, নরেশ ঘোষ (গৌর), সুশীলাসুন্দরী (ছোট), আশ্চর্যময়ী, রাণীসুন্দরী প্রভৃতি।

পরদিন থেকে মহলা শুরু করে দিলাম। প্রথম প্রথম সকলেরই উৎসাহ খুব বেশী। ডিরেক্টররা সকলেই ও-থিয়েটার থেকে এখানে আসেন রিহার্সাল দেখতে। দিনের বেলা দানীবাবুর ঘরে বিশ্রাম করি, রাত্রে মহলা।

কিছুদিন পর অপরেশবাবুর বই লেখা হলো। কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক) তখন নাট্যমন্দির ছেড়ে দিয়েছেন—তিনি এখানে চলে এলেন। তারপর ছিলেন আশ্চর্যময়ী। দুজনেই কৃতী গায়ক-গায়িকা। এই সময় এক তরুণ গায়ক এসে যোগদান করলেন। গলায় যেমন দরদ, তেমনি মিষ্টতা। ছেলেটির নাম হলো মৃণালকান্তি ঘোষ। এক-একদিন সে এমন দরদ দিয়ে গাইত যে অভিনয় শেষ হবার পরই সে 'ফিট' হয়ে পড়তো। সুতরাং গানের দিক থেকে আমাদের দল রীতিমত শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ালো।

আমি আগে স্টারে যেমন সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম এখানেও তাই করতে লাগলাম। এখানকার অডিটোরিয়ামটি একটু নীচু, স্টারের মতো নয়। তবে এখানে একটা জিনিস ছিল, যেটা স্টারে ছিল না। সেটা হলো বিখ্যাত নট-নটীদের বড়ো বড়ো অয়েলপেন্টিং-করা ছবি দেয়ালে সারি সারি সাজানো ছিল—সেগুলি সব কালীবাবুর হাতে আঁকা। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্র বসু প্রভৃতি। কর্পোরেশন যখন বাড়ী ভেঙে ফেলে, তখন মনোমোহনবাবু ছবিগুলি সব নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখেন। ১৯২৫ সালে যখন নতুন মিনার্ভা হলো, তখন সেখানেও ছিল কুঞ্জবাবু, হাঁদুবাবু, কার্তিকবাবুর ছবি। সেগুলি পরেশবাবুর (পটল) আঁকা। এসব আজ কোথায় আছে জানি না, থাকলে তো ন্যাশনাল গ্যালারী হয়ে যায়। স্টার এত বড়ো থিয়েটার, দশ বছর চালালো, কিন্তু একটিও অয়েলপেন্টিং করায়নি। এর কারণ আর কিছু নয়, হয়তো কোনো উৎসাহী স্টেজ-ম্যানেজার ছিলেন না, কিংবা কর্তৃপক্ষ এদিকে মোটেই সচেতন ছিলেন না।

তখন থিয়েটার একটা প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউশন বলে মনে করা হতো—এখন আর ঠিক সে-জিনিসটি নেই। অমর দত্তমশাই প্রথম 'বেনিফিট নাইট' বা 'শিল্পীর সম্মান-রজনী'র প্রবর্তন করেন, এখন আর তা নেই। সেই রজনীর সমুদয় বিক্রয়লব্ধ অর্থ (খরচ না কেটে) সেই উদ্দিষ্ট শিল্পীকে দিয়ে দেওয়া হতো। তখন শিল্পীরা অবসর

সময়ে বা যেদিন প্লে থাকতো না, সেদিন গোল হয়ে তামাক খেতে খেতে গল্পগুজব করতেন—তাঁদের বিপদে-আপদে মালিকরা এসে তাঁদের পাশে দাঁড়াতেন। মনোমোহন পাঁড়েমশাই যে কতো অভিনেতাদের ধরে ধরে বিয়ে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তারা কেউ গাঁইগুঁই করলে ধমক দিয়ে বলতেন—বয়ে যাবি যে রে! কে আর আছে তোর দেখবার-শোনবার?

পুরনো স্টারের কথাই বলি—এঁর মালিক তখন চারজন। যে-কোনো একজনের কাছে গিয়ে কোনো শিল্পী বা মঞ্চকর্মী মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়ালেন, হাত কচলে বললেন--অমুক দিন স্যর আমার মেয়ের বিয়ে। আপনি স্যর একটু সাহায্য না করলে তো কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না।

প্রথমটা হয়তো খুব রূঢ়ভাবে তাকে হাঁকিয়ে দিলেন, কিন্তু বিবাহের আগের দিন কিংবা বিবাহের দিন প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী বাজার করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন স্বয়ং হরিবাবু, অন্যতম মালিক।

অনেক মালিক কন্যাকে গহনাপত্রও যৌতুক দিতেন।

একজন সামান্য কর্মচারীর পক্ষে এ কি কম ভরসার কথা! মালিক আর কর্মীর মধ্যে এই যে হৃদয়ের যোগাযোগ—একের বিপদে অন্যের এসে দাঁড়ানো—এটা কি কম কথা! এইরকম হৃদয়ানুভূতির মধ্যে দিয়েই তখন গড়ে উঠেছিল তদানীন্তন নাট্যসমাজ। আজ কোথায় সেই সম্প্রীতিবোধ, আর কোথায় সেই কর্মীর জন্য মালিকের মমত্ববোধ!

যাক ওসব কথা। মনোমোহনের মতো অত চওড়া স্টেজ সারা কলকাতায় আর ছিল না বললেই হয়। স্টেজের ওপেনিংটা ছিল বিরাট। স্টেজের ভিতরটাও ছিল বেশ বড়, অভিনয় করতে কোনো কষ্ট হতো না। কিন্তু ছিল বড় নোংরা। স্টারের মতো পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন নয়। আজকের সুসংস্কৃত শীততাপনিয়ন্ত্রিত স্টারের কথা বলছি না—আমরা যেসময় অভিনয় করেছি, তখনও স্টার ছিল ঝকঝকে-তকতকে।

মনোমোহনে ঢুকতাম বিডন স্ট্রীট দিয়ে, ঢুকেই পড়ত শিবালয়—নটরাজ শিবকে প্রণাম করে আমরা সাজঘরে যেতাম।

সন্ধ্যার সময় আমাদের রিহার্সাল চলে নিয়মিত। ওদিকে মনোমোহনবাবুদের পাশা-খেলাও রীতিমত চলে। কালীবাবু ধুতি পরতেন কিন্তু কাজের সময়, অর্থাৎ সিন পেন্টিংয়ের সময়ই একটা খাকি প্যাণ্ট পরে নিতেন। নিয়ে নিজেই তুলি ধরে কাজ শুরু করে দিতেন। এটা যে শুধু ওঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল তা নয়, সেযুগের প্রায় সকলেই এইভাবে কাজ করতেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাতেন এবং দরকার হলে নিজেও কাজ করতেন।

সন্ধ্যার পর একে একে সবাই আসতেন। প্রবোধবাবু আসতেন দিনে ত্বার—সকালে আর বিকেলে। অপরেশবাবুর লেখা তখনও একেবারে শেষ হয় নি, তাই তিনি যেদিন আসতেন, সেদিন সকাল-সকাল চলে যেতেন। তিনি এলেও মহলা চলতো, না এলেও চলতো। রাত বারোটার আগে কোনোদিন মহলা শেষ করতাম না। কস্টিউমের ব্যাপারে প্রবোধবাবু বিভিন্ন ডিজাইন নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কালীবাবুকে ডেকে বলতেন: 'রাবণের মুকুট এমন হওয়া চাই, কাপড়ের পাড এ-রকম। কালীবাবু যেখান থেকে পারেন এইসব জিনিস যোগাড় করে দিন।'

কাপড় পরানোর ধরনটা আমরা নিয়েছিলাম রবি বর্মার ছবি দেখে। আমার ড্রেসার মণিই একমাত্র পারত গুছিয়ে পরিয়ে দিতে। অতো বড়ো বারো হাত কাপড় সামলে পরাও মুস্কিল। মেক-আপ-এর ঘরটা ছোট বলে বাইরে এসে পরতে হতো।

ইতিমধ্যে অপরেশবাবুর লেখা শেষ হল, আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হল। অপরেশবাবু পাঁজি দেখে শুভদিন স্থির করলেন ১লা জুলাই ১৯২৭ [১৬ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৩৪), ঐদিন 'শ্রীরামচন্দ্রের'ও প্রথম আবির্ভাব হবে। স্টার ও মনোমোহনের দুই থিয়েটারের বিজ্ঞাপন একসঙ্গে বেরুল সমস্ত শিল্পীদের নাম দিয়ে। 'শ্রীরামচন্দ্রে'র ভূমিকালিপি হলো—রাবণ ও দশরথ—আমি, রামচন্দ্র—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কৈকেয়ী—সুশীলাসুন্দরী, সীতা—সুশীলাবালা (ছোট), শবরী ও রাজলক্ষ্মী—আশ্চর্যময়ী, রাজা জনক—কনকনারায়ণ ভূপ, বিভীষণ—নরেশচন্দ্র ঘোষ, (গৌর), ইন্দ্রজিৎ—জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, মারুতি—তুলসী চক্রবর্তী, মন্দোদরী—রাণীসুন্দরী, নারিক—মৃণালকান্তি ঘোষ। মৃণালের গান ছিল—'সোনা দিয়ে ভোলাবে কী, আমি তাতে ভুলবো না'—আর, 'ঠাকুর কী আর বলো বলা তোমায়'।

বইটির লেখা খুব জমাট। প্রত্যেকটি দৃশ্যই চমৎকার জমে যেত। পাকা লোক সব, অভিনয়ও সকলে করতেন চমৎকার। দশরথ যতটা বৃদ্ধ হওয়া উচিত, আমি ততোধিক বৃদ্ধ করতাম, 'রাবণ' চরিত্রের বিপরীতার্থক চিত্রায়ণ হিসাবে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য যেখানে শেষ হচ্ছে তার কথা বলি। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে চেয়ে নিয়ে তাড়কা বধ করতে রওনা হলেন, আর শূন্যমঞ্চে উচ্চ সিংহাসন থেকে মূর্ছিত দশরথ সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে এসে পড়লেন—নিস্পন্দ নিথর। সংলাপটা ছিল—'ও রে নয়নের মণি, রামচন্দ্র, মণিহারা বাঁচিব কেমনে?'

এর পরে দ্বিতীয় অঙ্কের সম্ভবত শেষ দৃশ্যের মাঝামাঝি জায়গায় কৈকেয়ীকে বরদানের পর উন্মাদের মতো দশরথ বেরিয়ে গেলেন অন্তঃপুর থেকে। দশরথের পুরো

ভূমিকাটাই লোকে খুব নিয়েছিল—বিশেষ করে এই দুটি দৃশ্য। এর পরেই তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এল 'রাবণ'—দণ্ডকারণ্যে মারীচের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঢুকছে—

'সম্বন্ধে মাতুল তুমি মম অহিতকারী
তাই কহি মিনতি করিয়ে তোমা,
নহে অন্য কেহ হলে,
এতক্ষণে
নিভাতেম রোষবহ্নি শোণিতে তাহারে।'

হাঁটা-চলা (ইংরাজীতে যাকে বলে গেইট) সেটা খুব ভারিক্কী অর্থাৎ হেভি হতো। ভারী পদবিক্ষেপে মঞ্চের কাঠ পর্যন্ত দুলে উঠত। বড়ো বড়ো চুল, মাথায় মুকুট, বাঁকানো গোঁফ, চোখ দুটো ভাঁটার মতো, কপালে লাল বক্ররেখা। এই ছিল ত্রিভুবন-বিজয়ী রক্ষরাজ রাবণের রূপসজ্জা। লোকে অবাক বিস্ময়ে দেখতো। প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রাবণ দর্শকদের মনে গভীর দাগ কেটে ফেলল। বুঝলাম আর ভয় নেই—অভিনেতা তার নিজের স্থান করে নিয়েছে, এখন নাটক 'ফেল' না করলেই হলো। তার বাক্য ও কার্যাবলী চরিত্রানুগ হলেই সাফল্য অনিবার্য।

হলোও তাই। দর্শক নিলো। দশরথ ও রাবণ দুটি চরিত্রই দর্শকদের মনে গভীর ছাপ রেখে দিল। আমি চরিত্র দুটির জন্য সাংঘাতিক খেটেছিলাম। খুব ভয় ছিল আমার রাবণের জন্য—যদি দর্শক অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ না করে তাহলে তো আমারও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রাবণ যেখানে সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাবে সে 'সিন'টার জন্যে সুশীলার ভয়ের অন্ত ছিল না। মেয়েটা একটু ভীতু আর লাজুক। ভয়-ভয়-করা চোখ দুটো নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতো—কী হবে সীতাহরণের সিনটা? যদি না পারি?

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতাম—খুব পারবে, ভয় কী?

নীহারের কথা বলতাম—তার নিষ্ঠার কথা বলতাম। পরে তাকে উৎসাহ দিয়ে বলতাম—আমার সিনে আমার সঙ্গে অভিনয় করতে কোনো মেয়েই কোনোদিন কোনো অসুবিধেয় পড়ে নি। বা পড়ে-টড়ে গিয়ে আঘাতও পায় নি। তুমি কেন ভয় পাচ্ছ মিছিমিছি? এসো, এই সিনটা রিহার্সাল করে দেখিয়ে দিচ্ছি—দেখবে, কোনো ভয় নেই।

ঐ দিনে ওকে কি কি করতে হবে সব বুঝিয়ে দিলাম, বললাম—তুমি কুটীর থেকে বেরিয়ে আমাকে ভিক্ষা দিতে আসছ তো? চোখ নীচু করে থাকবে, সীতা কখনো পরপুরুষের দিকে তাকাবে না। চোখ নীচু করেই ভিক্ষা ঢেলে দেবে আমার ঝুলিতে।

আমি তখন করবো কী, একটু নীচু হবো মুহূর্তের জন্য। বাঁ হাতটা পেতে দেবো, যাতে ঠিক চেয়ারের মতো তুমি বসতে পারো। বসবে, আমি ঠিক ভর রাখতে পারবো। আমি ডান হাত দিয়ে বেষ্টন করে তোমার বাঁ হাতটা ধরবো। মুখ তোমার ফেরানো থাকবে দর্শকের দিকে, ডান হাতখানা তোমার খোলা, চুলের রাশি ঝুলে থাকবে, তুমি চিৎকার করবে। আর আমি ঐ অবস্থায় তোমাকে নিয়ে ছুটে 'উইঙ্গস' দিয়ে বেরিয়ে যাবো, বুঝলে?

সে মাথা নেড়ে জানালো—বুঝেছে।

তখন আমি বললাম: আসলে তোমাকে কিছুই করতে হবে না, আমি ঠিক করিয়ে নেবো। এসো দেখিয়ে দিই।

দুর্গা ছিল 'ডেয়ার-ডেভিল' প্রকৃতির। নাটকের শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে রাম ও রাবণের যুদ্ধ ছিল, পরিণতি রাবণের মৃত্যু, তার সঙ্গে প্রতি রাত্রেই রুটিনমাফিক তরবারি যুদ্ধ করি। একদিন হয়েছে কি, হয় আমারই মারার জোর হয়ে থাকবে, আর নয় দুর্গারই তরবারি জীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকবে, ওর তরবারি একেবারে মাঝখান থেকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। ওর বাঁ হাতটা কেটে গিয়ে গল-গল করে রক্ত বেরুতে লাগল। সেটা কোনোমতে সামলে নিলাম বটে, কিন্তু অন্যদিনের মতো তত আকর্ষণীয় হলো না।

স্টেজ থেকে ভিতরে এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম—কি হলো?

দুর্গা ক্ষতস্থানটা ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে হাসিমুখে রহস্য করেই বললে—ও কিছু নয়। যুদ্ধ করলাম ডান হাতে, কাটলো বাঁ হাত।

বইতে ছিল, 'যুদ্ধ করতে-করতে উভয়ের প্রস্থান'—কিন্তু আমরা ঠিক তা না করে যুদ্ধও দেখাতাম, রাবণের মৃত্যুও দেখাতাম। আমরা এইভাবে মহলা দিয়েছিলাম—যুদ্ধ করতে-করতে আমি স্টেজের ডানদিকে আসব—দর্শকদের দৃষ্টিতে বাঁ দিক অরণ্য। তারপর তরবারিটা শূল বেঁধাবার মতো করে সোজা আমার বুকে বিঁধিয়ে দেবার অভিনয় করবে দুর্গা। আমি তৎক্ষণাৎ ওটা আমার বা বগলের তলা দিয়ে চেপে নিয়েই একটু বেঁকে দর্শকের দিকে মাথা করে একেবারে দেহটা ধনুকের মতো বেঁকিয়ে আর্চ হয়ে যাবো। দর্শক দেখবে তরবারিটা আমার বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে আর গল-গল করে রক্ত পড়ছে। এই অবস্থায় আমার মাথাটা স্টেজ থেকে মাত্র হাতখানেক উঁচুতে থাকবে। কিছুক্ষণ এইভাবে থেকে পাছায় ভর রেখে দুম করে পড়বো—এভাবে পড়লে এফেক্টও হবে, আর আমার লাগবেও না।

আমাদের রিহার্সল মতোই দুর্গা করত। আগে জিমনাস্টিক করতাম, তাই

আর্চ হতে কোনো অসুবিধে হতো না। এই অভিনয়ে সেটা কাজে লেগে গেল। যুদ্ধের দৃশ্য, তাই বর্ম পরতাম। আর বাঁ বগলের তলায়, বুকের বাম পাঁজড়ায় আর বাহুতে স্পঞ্জের প্যাড পরতাম। স্পঞ্জে লাল রঙ থাকতো। হাত ফাঁক করে যুদ্ধ করতাম, তাই বগলে চাপ পড়তো না এবং স্পঞ্জ থেকে রঙও পড়তো না। তরোয়াল বগলে নেবার পরই প্রাণপণে চাপ দিতাম আর গল-গল করে রক্ত বেরুতো। দৃশ্যটা এত বাস্তব হতো যে দর্শকরা আঁতকে উঠতো—এমন কি থিয়েটারের অনেক ডিরেক্টারও ভয় পেতেন।

এই দৃশ্যটায় খুবই নাম হলো—এর পরই একটা 'সর্ট কার্টেন', তারপরই সীতার অগ্নি-পরীক্ষা।

অভিনয় দেখলেন স্টারের সব ডিরেক্টারবৃন্দ, নাট্যকার অপরেশবাবুও দেখলেন, প্রত্যেকেই খুব সুখ্যাতি করলেন। সকলেই বললেন—চমৎকার প্রোডাকশন। এ বই চলবে, লোকে নেবে। বলতে বাধা নেই— ওঁদের ভবিষ্যদ্বাণী সফলও হয়েছিল।

প্রথম অভিনয় হলো ১লা জুলাই—সেদিন ছিল শুক্রবার। শুক্র, শনি ও রবিবার পর-পর তিন দিন হলো। প্রত্যেক দিন 'হাউস ফুল'—ন স্থানং তিলধারণম্। এর পর হল ৯ ও ১০ জুলাই—দর্শকদের ভিড় সমানই রইল। ১৩ই জুলাই বুধবার আমাদের থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ দিয়ে বসলেন 'সাজাহান'। তারপর ১৬ ও ১৭ আবার 'শ্রীরামচন্দ্র'।

স্টার ও মনোমোহনের সম্মিলিত শিল্পীবৃন্দ মিলে অভিনয় কি রকম হলো—সেটা এবার একটু বলছি। আমি করলাম সাজাহান, দানীবাবু করলেন আওরঙজেব, পিয়ারা আশ্চর্যময়ী, দিলদার তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, জাহানারা রাণীসুন্দরী, দুর্গাদাস এদিন সাজাহানে কিছু ভূমিকা নেয় নি—ও গিয়েছিল স্টারে 'শোধবোধ'-এ সতীশ করতে।

স্টার থেকে দানীবাবু যেমনি এলেন মনোমোহনে 'ঔরঙ্গজেব' করতে, তেমনি তার পরদিন বৃহস্পতিবার আমরা আবার গেলুম স্টারে 'চন্দ্রগুপ্ত' করতে। ভূমিকা-লিপি ছিল এইরকম—চাণক্য—দানীবাবু, চন্দ্রগুপ্ত—দুর্গাদাস, নরেশ মিত্র—কাত্যায়ন, আমি—সেলুকাস, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়—অ্যান্টিগোনাস, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়—নন্দ, বড়ো সুশীলা—মুরা, আশ্চর্যময়ী—ছায়া, সরস্বতী—হেলেন।

যাই হোক, শনি, রবিবার মনোমোহনে 'শ্রীরামচন্দ্র' দুরন্তভাবে চলতে লাগল—আবার বুধ, বৃহস্পতিবার দুই থিয়েটারের শিল্পীবৃন্দই পর্যায়ক্রমে দুটো থিয়েটারের নানা ভূমিকায় অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগলাম। চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, রাজসিংহ—এই সব নাটকই হতো অধিকাংশ দিন। কোনো-কোনো দিন আমার কোনো ভূমিকা থাকত না, সেদিন ছুটি পেতাম। কিন্তু ছুটিতেও বাড়ীতে বসে থাকতে পারতুম না—চলে আসতুম

থিয়েটারে, অন্যের অভিনয় দেখি আর গল্প-গুজব করি। শিল্পীদের দিক দিয়ে স্টার তখন রীতিমত জমজমাট।

আমার এই দীর্ঘদিনের অজ্ঞাতবাসকালে স্টারে কি নাটক হচ্ছিল, তা জানার কথা নয়। কিন্তু সে-সময়ের প্রচারপুস্তিকার ফাইল ও খবরের কাগজ থেকে স্টার থিয়েটারের খবরটুকু সংগ্রহ করেছিলাম। সেই খবরটুকু এখানে জানানোর প্রয়োজন।

সেই যে ১৯২৭ সালের ৯ই মার্চ আমি স্টারে অভিনীত 'রাজসিংহে' ঔরঙ্গজীব করলাম, তার পরেই তো স্টারের জলপাইগুড়ি সফর। সেখানে একদিন রাত্রে অসুস্থতার ভান করে চলে এলাম কলকাতায়। এসেই নোটিশ দিয়ে কলকাতা থেকে হারিয়ে গেলাম।

জলপাইগুড়ি থেকে স্টারের দলবল ফিরে এসে আরম্ভ করলো 'চণ্ডীদাস', 'কর্ণার্জুন'। বলা বাহুল্য, আমার ভূমিকা অন্য লোকে করতো। যে রাধিকাবাবু কোনোদিন এক রাত্রে একাধিক নাটকে অভিনয় করতেন না, আমার অনুপস্থিতিতে তাঁকেও তা করতে হতো।

১৪ই এপ্রিল স্টারে বৃদ্ধ অমৃতলাল বসুকে নিয়ে 'তরুবালা' মঞ্চস্থ করলো। অমৃতলাল তাঁর অরিজিন্যাল রোল 'বেহারী খুড়ো'ই করতেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন তিনকড়ি-দা, রাধিকানন্দ, দুর্গাদাস, সুশীলা (বড়ো এবং ছোট), নীহারবালা প্রভৃতি।

রাজসিংহে আমার জায়গায় অভিনয় করতেন প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। অথচ বিজ্ঞাপনে আমারই নাম থাকতো। নোটিশ পাওয়ার পরেও আমার নাম কেন বিজ্ঞাপনে দেওয়া হয়, বুঝতে পারি নি। মনে হয়, কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন আমার এই নোটিশ সাময়িক মান-অভিমানের ব্যাপার। দু-চার দিন বাদেই আমি অভিনয়ে যোগ দেব, হয়তো এই আশাই ওঁদের ছিল।

বিজ্ঞাপনে আমার নাম, আর অভিনয়ের বেলায় প্রফুল্ল সেনগুপ্ত—দর্শকরা এতে খুশি হলো না। অনেক সময় টিকিটের মূল্য ফেরত দিতে হতো। কেননা, অহীন্দ্র চৌধুরীর নামে বিজ্ঞাপন দিয়ে অন্যকে দিয়ে অভিনয় করানো, এটা কোনোমতেই বরদাস্ত করা যায় না। তাই বলে একথা বলবো না, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত বাজে অভিনয় করতেন। আমার তো মনে হয় প্রফুল্ল সেনগুপ্ত রাজসিংহের ঔরঙ্গজীব চরিত্রে ভালোই অভিনয় করতেন।

আমার নামে বিজ্ঞাপন প্রচারের পিছনে কর্তৃপক্ষের অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে আমার ধারণা হলো। হয়তো আমার নামে মামলা দায়ের করার অনুকূল অবস্থা ওঁরা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

যাই হোক, এইরকম অবস্থার মধ্যে স্টারে 'রাজসিংহ', 'তরুবালা', 'অযোধ্যার বেগম' অভিনীত হলো। তারাসুন্দরী স্টারে এলে তাঁকে অযোধ্যার বেগমে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করানো হলো ৬ই মে। ৫ই মে'র 'কপালকুণ্ডলা' নাটকে ঐ তারাসুন্দরী অভিনয় করলেন মতিবিবির ভূমিকায়। ১০ই মে স্টারে অভিনীত হলো রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'। বড়ো সুশীলা নেমেছিলেন নামভূমিকায়, আর অর্জুন সেজেছিলেন রাধিকানন্দ। ইতিমধ্যে দানীবাবু ফিরে এলেন সুস্থ হয়ে, এসেই নামলেন 'প্রফুল্ল'য় যোগেশ হয়ে। রমেশ করলেন রাধিকানন্দ। 'চিরকুমার সভা'য় আমি করতাম চন্দ্রবাবুর ভূমিকা—রাধিকানন্দকে সে ভূমিকাটিও করতে হলো। ২৬শে মে 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চিরকুমার সভা' দুই-ই হলো একসঙ্গে। এই সব থেকে বোঝা যায় রাধিকাবাবুর খাটুনি যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। ২রা জুন 'চাঁদবিবি' করেছিলেন—বিজ্ঞাপনে নাম ছিল শুধু নাম-ভূমিকায় তারাসুন্দরীর—আর কারুরই নাম ছিল না।

১লা জুন থেকে ওঁরা মনোমোহনের লীজ নিয়েছিলেন, তার বিজ্ঞপ্তি বেরুলো ৩রা জুন। প্রসঙ্গত বলা দরকার, 'মিত্র থিয়েটার' উঠে গেল মে মাসের মাঝামাঝি, বাইরে থেকে আমি কিছুই জানতে পারিনি। দুঃখ লাগলো—এত করেও শেষপর্যন্ত 'মিত্র' দাঁড়াতে পারলো না। তার কারণ ইদানিং তাঁরা যে সমস্ত অভিনয় করেছিলেন, তার একটাও জমাতে পারেননি। ক্রমাগত লোকসানে ওঁদের মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। তার ওপর আমাকে যে বাইরে বাইরে ঘোরাতে হচ্ছে—তারও খরচ আছে। এসব ছাড়াও ওঁরা কতকগুলি মামলাতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন—একটি অবশ্য স্টারেরই উস্‌কে দেওয়া। এক সময় 'মিত্র' 'জনা' খুললেন, আর অমনি স্টার নোটিশ দিয়ে দাবী করলেন রয়্যালটি বাবদ আড়াইশো টাকা।

ব্যাপারটা হলো এই যে, নাট্যমন্দিরের সঙ্গে ঐ 'জনা' নিয়ে যখন একটু বাদানুবাদ হয়েছিল, তখন স্টার দানীবাবুর কাছ থেকে 'জনা'র নাট্যস্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন। দানীবাবু ছিলেন সাদাসিধে প্রকৃতির লোক, রয়্যালটির টাকাপয়সা নিয়ে বারবার তাগাদা দেওয়াটা উনি পছন্দ করতেন না। তাই 'স্টার' একসঙ্গে কতকগুলো থোক টাকা দেওয়ায় 'জনা'র মঞ্চস্বত্ব এঁদেরই দিয়ে দিয়েছিলেন। এ-খবরটা ছিল মিত্রদের অজ্ঞাত, তাই তাঁরা বিপদে পড়লেন। শুধু রয়্যালটির টাকাই নয়, 'জনা'র প্রোডাকসনের জন্য যেসব খরচপত্র হয়েছিল, তা জলে গেল এবং 'জনা'র অভিনয়ও বন্ধ করে দিতে হলো।

তারাসুন্দরীর ছেলে মানিকলাল ছিল ওখানে স্টেজ-ম্যানেজার। তার ক'মাসের মাইনে বাকি পড়েছিল বলে স্টারের দেখাদেখি সেও দিল এক মামলা ঠুকে। অমৃতলাল

বসু ওখানে অভিনয় করেছিলেন কিছুদিন, নাট্যাচার্যও ছিলেন। ওঁর 'সাগরিকা' নাটক হবার কথা ছিল—সে-নাটকও হলো না—তিনিও টাকার দাবী করে এক কেস জুড়ে দিলেন। শেষপর্যন্ত এমন হলো যে মানিকলাল মনোমোহনের পোশাক-আশাক ক্রোক করালে, আর স্টার ক্রোক করালেন ওঁদের হারমোনিয়ামটি। এটা সেই পুরনো যুগের মিনার্ভার হারমোনিয়াম—বেশ বড়ো এবং আওয়াজটি ছিল ভারী সুন্দর। 'মিত্র' যে এ-জিনিসটি মিনার্ভা থেকে কিভাবে পেয়েছিল, তা অবশ্য জানা নেই আমার। স্টার এটিকে নিয়ে মনোমোহনেই রাখলেন।

বড়ো বড়ো অভিনেতা, যেমন নির্মলেন্দু প্রভৃতি, এঁদের নিশ্চয়ই কিছু দিতে হয়েছিল, নইলে ওঁরা কাজ করবেন কেন? তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী—এঁদেরও মাহিনা বাবদ বেশ কিছু বাকি ছিল, কিন্তু এঁরা আদালতের দরজায় যাননি, এমনিই কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর পাওনা ছিল ক্ষেত্রমোহন মিত্রের। তাঁকে সবাই মিত্রসাহেব বলে ডাকতেন। একেবারে শেষ অবস্থায় ইনি যোগদান করেছিলেন এ-থিয়েটারে এবং বহু পুরনো বই—'রানী দুর্গাবতী' থেকে 'অহল্যাবাঈ' পর্যন্ত নাটকে অভিনয় করেছেন। তাড়াতাড়িতে এসব বই ভালো করে মহলা দেবার সময় পাওয়া যেত না, তারই মধ্যে যতটুকু পারতেন দেখাতেন ক্ষেত্র মিত্রমশাই। কিন্তু এত চেষ্টা করেও শেষরক্ষা করা গেল না। দর্শকের সংখ্যা যত কমতে লাগল, পাওনাদারদের সংখ্যা তত বাড়তে লাগল। ফলে একদিন সত্যই 'মিত্র' থিয়েটার উঠে গেল।

আমি তখন শ্যুটিং করছি চরথেরীতে, কিছুই জানতে পারিনি। সবথেকে চিত্তাকর্ষক ঘটনা যেটা এসে জানতে পারলাম কাগজপত্র ঘেঁটে, সেটা হাইকোর্টে আমাকে নিয়ে ওঁদের মামলার বিবরণ। স্টার থিয়েটারে ওঁদের একটা খবরের কাগজের 'কাটিং-বই' ছিল। এতে ওঁদের সম্বন্ধে যখন যা-কিছু বেরুতো সব কেটে আঠা দিয়ে সাঁটা থাকতো। এর পরে যখন স্টারে এসে যোগদান করলাম, তখন আমি খুব ভালো করে সেই 'কাটিং-বইটি' উল্টেপাল্টে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাই থেকেই আমি বিবরণগুলি নিয়ে আপনাদের কাছে পেশ করছি। ৮ই এপ্রিল ইনজাংশন জারী করলেন, আর ৯ই 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি কাগজ মহা-উৎসাহে খবরগুলো ছাপতে লাগলো—'Sensation of the Sensation'—'Injunction against Actor' প্রভৃতি শিরোনামা দিয়ে, অমৃতবাজার দিলে 'Suit against stage-artiste !' 'নায়ক' হেডিং দিলে 'চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ'। ভাগ্যিস আমি তখন কলকাতায় ছিলাম না, নইলে লোকজনকে খুঁটিনাটির বিষয় কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যেতো। মামলার বিবরণ দেবার আগে একটা খবর দিয়ে রাখি—সেটা আমার অনুপস্থিতির সময়

ঘটেছিল। সেটা হলো দুর্গাদাসের পিতৃবিয়োগ। দুর্গাদাসের পিতার নাম ছিল তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন দক্ষিণ গড়িয়ার জমিদার। সেজন্য স্টার থেকে দুর্গাও কিছুদিন অনুপস্থিত ছিল।

এইবার একটু মামলার কথায় আসি—পাঠকদের কাছে এটা খুব খারাপ লাগবে না বলেই মনে হয়। মামলা উঠেছিল হাইকোর্টে জাস্টিস গ্রেগরীর কোর্টে। আমাকে আটকে রাখবার জন্যে আর্ট থিয়েটার ইনজাংশন প্রার্থনা করে 'এগেনস্ট এনি আদার কোম্পানি'। বাদীর পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার বি. সি. ঘোষ। এই মামলা সম্পর্কে 'নায়ক' পত্রিকা ৯ই এপ্রিল ১৯২৭ তারিখে যে বিবরণ প্রকাশ করে, সেটা পড়লেই পাঠকবৃন্দ ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার'ও ঐ একই রকম ছেপেছিল : ১৯২৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের চুক্তিতে লিখিত শর্ত অনুযায়ী ১লা বৈশাখ *(১৪ই এপ্রিল, ১৯২৪) তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য* কার্য করিতে চুক্তি করেন। ঐ চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন অর্থাৎ ১৯২৫ সালের আগস্ট মাসে শিশিরকুমার বসু ও শিশিরকুমার মিত্রের প্ররোচনায় প্রতিবাদী উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত এক চুক্তি করেন যে ১৯২৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে তিনি উক্ত থিয়েটারে অভিনয় করিবেন। তখন বাদিগণ অহীন্দ্র চৌধুরী ও উপেন্দ্রনাথ মিত্রের বিরুদ্ধে ইনজাংশন প্রার্থনা করেন, যাহাতে উক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে না পারেন। অহীন্দ্রবাবু আদালতে স্বীকার করেন, তিনি চুক্তিভঙ্গ করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিবাদী স্টার থিয়েটারে যোগ দিতে স্বীকৃত হন এবং আরও তিন বৎসরের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হন। ১৯২৭ সালের ১৬ই মার্চ প্রতিবাদী পুনরায় নোটিশ দেন—তিনি আর স্টারে অভিনয় করিবেন না এবং অভিনয়-তারিখে অনুপস্থিতও হন। সেজন্য বাদিগণ পুনরায় ইনজাংশন প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। বিচারক ইস্টারের ছুটি পর্যন্ত ইনজাংশন মঞ্জুর করিয়াছেন। (নায়ক—৯।৪।২৭)

এই বিবৃতিতেই কাগজের কার্যকলাপ শেষ হলো না। বরং পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন কাগজ যেসব টিকা-টিপ্পনী কাটতে লাগল তা আমার পক্ষে মর্মান্তিক হলেও পাঠকদের নিশ্চয়ই খুব মুখরোচক লেগেছিল। ও-পক্ষের কাগজগুলো আমাকে 'অকৃতজ্ঞ' বলে গালাগাল পর্যন্ত দিতে ছাড়েনি। তাদের ভাবা হলো—'যারা তুললো, তাদেরই বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতা ?' এর প্রতিবাদে বিপক্ষ দল লিখলো—'তাহলে কোর্টে গিয়ে এত কান্না কেন ? একজন গেছে, আরেকজনকে তোলো !' আর যারা নিরপেক্ষ অর্থাৎ কোনো দলেরই নয়, তারা লিখলো, 'মামলার রায় না বেরুনো পর্যন্ত কোনো

মন্তব্য করা উচিত নয়।' কেউ লিখলে—'কী ব্যাপার তা অহীন্দ্রবাবুর কাছ থেকেই শুনতে চাই।' ও-পক্ষের কোনো পত্রিকায় বেরুলো—"অখ্যাত অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে তুলে ধরা হলো, আজ নাম হয়েছে, কিন্তু ভাবা উচিত কতো পাবলিসিটির খরচা করা হয়েছিল ওঁর পিছনে। এই কি নীতি? তা-ও কলালক্ষ্মীর পূজারী নাট্যমন্দিরে গেলে বুঝতুম। অভিজাত থিয়েটার দুটোই তো আছে—'আর্ট থিয়েটার' আর 'নাট্যমন্দির'। তা নয় 'মিত্র'—ছি-ছি।" কেউ লিখলে—'যাবার সময় বিবাদ-মামলা কেন? হাসিমুখে গেলেই তো হয়।' যেন আমিই বিবাদ-মামলা বাধিয়েছি। আর হাসিমুখে কি সবসময় যাওয়া যায়? মালিকপক্ষ কি সবসময় খোলা মনে সম্মতি দিতে চায়! মালিকপক্ষ মানেই তো ধনী—তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই মন অহঙ্কার আর আত্মম্ভরিতায় ভরা—তাঁরা যদি কাউকে ধরে রাখতে মনস্থ করেন, তাহলে কি সত্যি সত্যি হাসিমুখে প্রীতির সম্বন্ধ বজায় রেখে সম্পর্ক ত্যাগ করা যায়?

আমাদের অবস্থা হলো অনেকটা চা-বাগানের কুলির মতো। কনট্রাক্ট চলছে তো চলছেই। মাইনের আর হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। স্টারে তখন পাচ্ছিলাম তিনশো টাকা মাসে, আর এঁরা দিতে চাইলেন মাসে সাড়ে চারশো টাকা আর বছরে চার হাজার টাকা বোনাস। এতে কি লোভ হয় না? একটা জিনিস কেউ বুঝতে পারে না যে, একবার যখন মুক্তির কামনা জাগে, তখন তাকে চেপে রাখা খুব শক্ত; অর্থ, যশ কিছুরই সাধ্য নেই তাকে আটকে রাখা। এতে যে সবসময় ফল শুভ হয় তা নয়, অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তের ফলে শিল্পী মারাও পড়ে।

সেবারও যখন স্টার ছেড়ে যাই-যাই করেছিলাম, তখন লিখিত কোনো চুক্তি ছিল না। তাই যখন অধিক অর্থপ্রাপ্তির আশায় মিনার্ভায় যোগ দিলাম চুক্তিপত্র সই করে, তখনই ওঁরা ইনজাংশন জারী করলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত আদালতে যেতে হয়নি। আপোষ-নিষ্পত্তি হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তবু ওঁদের মিষ্টি কথায় ভুলে গেলাম, বাঁধন কাটতে গিয়েও কাটা হলো না। সেই সুযোগে ওঁরা লিখিত চুক্তি করে নিলেন। এটা যে ওঁরা এইবারে প্রয়োগ করবেন, সেটা তখন ভাবিনি। যদিও ভাবা উচিত ছিল। অল্প বয়েস, মানুষকে অবিশ্বাস করার কথা মনে আসত না—সকলকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতাম। তারপর সেখানে ঘা পড়লেই ক্রমশ মানুষ ধীরে ধীরে সংশয়বাদী আর সন্দিগ্ধতাপরায়ণ হয়ে ওঠে।

কাউকে কিছু বলি না—কাগজের 'কাটিং'গুলো পড়ি আর মনটা খারাপ হয়ে যায়। 'শিশির' পত্রিকায় (২৩শে এপ্রিল, ১৯২৭) একটি ব্যঙ্গ-কবিতা (ছড়া বলাই ভালো) বেরুলো—

"বাবুরা করেছে পণ করিব থ্যাটার
সামাল সামাল সবে রক্ষা নাহি আর।…
রবীন্দ্র-শরৎ আছে প্রয়োজন হলে
কালান্তক নাটকেতে মাথা যাবে টলে।
চাই কিন্তু একজন যুগ অবতার,
ওর ল্যাজ ধরে রই নদী হবে পার।
অবতার ছিল আগে শিশির ভাদুড়ী
বিবাগী হইয়া এবে হয়েছে আনাড়ী।
অহীন্দ্র অভদ্র বড়ো—কুছ কাম নাই—
যেহেতু করিছে শুধু 'পালাই পালাই'।"

যাই হোক, মামলার বিবরণে আবার ফিরে যাই। পরবর্তী শুনানীর দিনে হাকিম বদল হলো। গ্রেগরীর কোর্টে অন্য কেস ছিল বলে আমার মামলা জাস্টিস কস্টেলোর কোর্টে হয়েছিল। এখানে মিত্র থিয়েটারের পক্ষে ব্যরিস্টার দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ এস. এন. ব্যানার্জি। কস্টেলো সাহেব কেসের সবটা শুনে যা বলেছিলেন, সেটা 'ফরোয়ার্ড' আর 'বেঙ্গলী' কাগজে ২৭শে এপ্রিল বেরিয়েছিল—

"His Lordship observed that he could not see any good in taking a horse to the pond that was determined not to drink."

শুনানী অবশ্য মুলতুবী ছিল সেদিন। পরবর্তী দিন কেস উঠলো ঐ কস্টেলোরই কোর্টে ১০ই মে তারিখে। আর্ট থিয়েটারের পক্ষে ছিলেন সেদিন শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার (পরে 'স্যর' হয়েছিলেন, নিউ থিয়েটার্স চিত্র-প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীবীরেন সরকারের বাবা) ও মিঃ বি. সি. ঘোষ। এদিনও শুনানী মুলতুবী ছিল। পরের দিন কেস উঠলো জাস্টিস গ্রেগরীর কোর্টে। এদিন শ্রী এন. এন. সরকার অন্যত্র কেস থাকাতে এলেন না, তাঁর জায়গায় এলেন মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস। মিঃ বি. সি. ঘোষ তো ছিলেনই। ঐদিন কেসটার শুনানী হলো, যাকে বলে 'ইন ক্যামেরা', বিচারপতির চেম্বারে—রুদ্ধদ্বারকক্ষে। মিঃ বি. সি. ঘোষ প্রস্তাব করলেন—'গত মামলায় অহীন্দ্র চৌধুরীর এফিডেভিটটা পড়া হোক।'

এ-পক্ষের ব্যারিস্টার মিঃ এস. এন. ব্যানার্জি বলে উঠলেন: 'আপত্তি। তিন বছর আগেকার এফিডেভিট এ-মামলায় কেন?'

গ্রেগরী বললেন—'তবু পড়ো—শুনবো।'

বি. সি. ঘোষ পড়লেন—অহীন্দ্রের এগ্রিমেণ্টটা মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে

"Had been procured from him after he had been given to drink and was under the influence of liquor."

অতএব সেই এগ্রিমেণ্টটা 'ইনঅপারেটিভ অ্যাণ্ড ইনভ্যালিড'।

পড়তে পড়তে চমকে উঠলাম। বেশ মনে আছে, প্রবোধবাবুর উপদেশে স্টেটমেণ্টে সই দিয়েছিলাম অত্যন্ত ভালো মনে। কিন্তু সেটা যে এইভাবে মামলায় ওঁরা ব্যবহার করবেন, আর সেটা যে কাগজে কাগজে এইরকম কদর্যভাবে ছড়িয়ে পড়বে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। 'মদ খাইয়ে লিখিয়ে নিয়েছে'—এ-কথাটা অভিনেতাদের সম্পর্কে মন্তব্য করে লোককে বোঝানো খুবই সহজ ছিল। কারণ, তখন অভিনেতারা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর মদ্যপান করতেন, আর তখনকার দিনে অভিনেতাদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে লোকের ধারণা আদৌ ভালো ছিল না। আর তাছাড়া খ্যাতিমান ব্যক্তি সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃই কৌতূহল বেশী—তাঁদের সম্বন্ধে যদি একটা সামান্য টুকরো খবরও কাগজে বেরোয়, তবে তাঁকে কেন্দ্র করে অনেককিছু রঙ চড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে এই খ্যাতিমান ব্যক্তিটি যদি অভিনেতা হন, তাহলে তো আর কথাই নেই।

যাই হোক, আমাদের ব্যারিস্টার এস. এন. ব্যানার্জি বললেন—এ-যুক্তিতে ইনজাংশন দেওয়া উচিত হয়নি। এফিডেভিটটা ইনভ্যালিড হয় কী করে? এতে আমার মক্কেলদের ওপর অবিচার করা হয়।

এ-কথায় গ্রেগরী পড়লেন একটু বিপদে। তিনি বললেন—'তাহলে মামলার নিষ্পত্তিই হয়ে যাক। ইনজাংশন আবার কেন? অহীন্দ্র দু' দলেই প্লে করবে না—এইরকম কথা বলুক না কেন? আপত্তি কী?'

ল্যাংফোর্ড বললেন, 'অল্প কয়েকদিনের জন্যে হলে আপত্তি নেই। মামলার নিষ্পত্তির জন্যেই অপেক্ষা করবো। রায় না বেরুনো পর্যন্ত অভিনয় করবে না—এ আণ্ডারটেকিং দিতে পারে আমার মক্কেল।'

ব্যানার্জি মন্তব্য করলেন, যেমন করেই হোক, মক্কেলকে অভিনয় করতে দেবে না, অভিনয়-জগৎ থেকে সরিয়ে রাখবে, এটাই হচ্ছে আসল কথা।

ল্যাংফোর্ড বললেন, 'আমার কথার অমন কদর্থ করলে আমি উইথড্র করছি আমার কথা।'

ব্যানার্জি জবাব দিতে উঠলেন। কিন্তু সেদিন সেই সময় কোর্ট বন্ধ হয়ে গেল।

পরের দিন অর্থাৎ ১২ই মে, মিঃ ব্যানার্জি কোর্টে বললেন—মামলাটা এক্স-পিডাইট করা হোক, ততদিন অহীন্দ্র প্লে করবে না।

এর তিন সপ্তাহ পরে শুনানীর দিন স্থির করা হবে কথা হলো। কিন্তু সে তিন সপ্তাহ আর এলো না। মামলার অন্য কোনো শুনানী হলো না, কাগজে কাগজে আর কোনো বিবরণ নেই। মামলার যে কী হলো আমি আর জানতে পারলাম না, যেটুকু জানলাম সেটুকু হলো, স্টার মনোমোহন নিলে, আমিও এসে পড়লাম সেখানে, আর 'জনা'র রয়্যালটি প্রভৃতি মামলা নিয়ে শেষপর্যন্ত মিত্র থিয়েটার উঠেই গেল।

বিবরণ এইটুকুই দিলাম। সমস্ত বিবরণী খুঁটিয়ে পড়া শেষ করে আমারই ভয়ানক লজ্জা করতে লাগল। যেসব সহকর্মী রীতিমত আমাকে খোসামোদ করে চলতো, আমাকে সমীহ করতো, আমি যাদের বন্ধুভাবে মনে করতাম—তারা এফিডেভিট করে অম্লানবদনে বেমালুম আমার নামে যেসব জঘন্য মন্তব্য করেছে, তা পড়তে পড়তে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। এত বিশ্রী এবং ক্লেদাক্ত সেইসব কথা যে লিখতেও লজ্জা করে। এক জায়গায় দেখি আমার বাবাকে পর্যন্ত টানা হয়েছে। ভাবতে লাগলাম এসব খবর তো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার সম্বন্ধে সকলের কি ধারণা হয়েছে কে জানে। আর শুধু দেশের মধ্যেই বা বলি কেন—আমার এক জাহাজী বন্ধু ছিল—সে জাহাজে 'পার্সার'-এর কাজ করত। সে একবার কলকাতা এসে আমার সঙ্গে দেখা করে কথায় কথায় বললে আমার এই মামলার খবর সে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বসে পড়েছে। অসম্ভব কিছু নয়, ইংরিজী, বাংলা সব কাগজেই ফলাও করে ছাপা হয়েছিল ঐ বিবরণ। আইন-আদালতের কলমে লোকের কেচ্ছা-কাহিনী পড়বার আগ্রহ বেশী—এ জিনিসটা এখনও যেমন আছে, আগেও তেমনি ছিল। 'রয়টার'-এর কৃপায় খুব ফলাও করে না হলেও মোটামুটি খবরটা তাই আমার পার্সার বন্ধুটি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বসে কাগজে পড়েছিলেন।

আসল কথা, এসব পড়তে পড়তে আমার চোখের সামনে দিয়ে যেন একটা অন্ধকার পর্দা উঠে গিয়েছিল। আমি সবার থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে বা ভাবতে পারিনি কোনোদিনই। কিন্তু এই মামলায় আমার অতি-পরিচিত ব্যক্তিদের এইসব জঘন্য উক্তি, যার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই, আমার মন আপনা থেকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আগে যেমন সবাইকে অতি সহজে বিশ্বাস করতাম, এখন আর তা করতে পারি না। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম থিয়েটারের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সম্পর্কে।

এর পর দেখা দিল আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া। লোকের সঙ্গে মিশি কম, কথা

বলি কম। 'শ্রীরামচন্দ্র' করি মনোমোহনে, স্টারেও যখন যা প্রয়োজন হয় করি—কিন্তু সবার সঙ্গে আর তেমন প্রাণ খুলে মিশতে পারি না।

ব্যাপারটা চোখে পড়ল অনেকেরই। কেউ কেউ এসে জিজ্ঞাসা করলে—'কি হয়েছে? এরকম চুপচাপ কেন?'

সংক্ষেপে বলি—'এমনিই—ও কিছু নয়।'

কিন্তু ওরা কেউ জানলো না, কেউ বুঝলো না বা বুঝতে চাইলোও না যে হঠাৎ এমন প্রাণখোলা অহীন্দ্র এমন মনমরা হয়ে উঠলো কেন? ভেতরে ভেতরে আমার মনটা ছিল ভীষণ রোমান্টিক, আর সেন্টিমেণ্টাল—ঘা খেলাম সেইজন্যে সব থেকে বেশী। জাগতিক ব্যাপারে অনভ্যস্ত মন না হলে হয়তো আঘাতটা এত গুরুতরভাবে আমার বুকে বাজতো না।

কিন্তু একটা কথা—মামলার কথা নিয়ে ছোট কিংবা বড়ো কেউ কোনোদিন আমার সঙ্গে আলোচনা করেনি, এমনকি প্রবোধবাবুও না। আমিও ও-সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব রইলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মনটা আমার অস্থির হয়ে উঠতে লাগলো। মনে হতে লাগলো—হাত-পা যেন আমার শেকলে বাঁধা পড়েছে। মনের এই অশান্ত ভাবটাকে কাটিয়ে উঠবার জন্যে কাজেকর্মে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে আমি মেতে উঠলাম। কাজ ছাড়া আর কোনো কথা নেই, থিয়েটার বা অন্য কোনো চিন্তা নেই। তবু অবসর-মুহূর্তগুলিতে দুঃস্বপ্নের মতো আরোপিত কলঙ্ক-কাহিনীগুলো এক এক সময় কাঁটার মতো খচ্‌খচ্‌ করতো। অধ্যাপক-টধ্যাপক হলে সমাজে মুখ দেখাতে পারতাম না। আমি অভিনেতা, আমাদের সম্বন্ধে সমাজের অধিকাংশ লোকই এক খারাপ ধারণা পোষণ করেন, কিছু না করলেও দুর্নামের ভাগী হতে হবে। এঁদের ধারণা—অভিনেতা মাত্রেই মদ্যপায়ী এবং দুশ্চরিত্র। আমাদের শিল্পের আদর আছে কিন্তু চরিত্রের আদর নেই। গিরিশচন্দ্রকেও তদানীন্তন লোকে ভ্রূ কুঁচকে বলতো 'নোটো গিরিশ'। গিরিশচন্দ্র বলেছেন,

'লোকে কয় অভিনয়
কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু
অভিনেতাগণ
তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক
কণ্ঠের হার,
তথাপি এ-পথে পদ
করেছি অর্পণ।

এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের একটি মূল্যবান মন্তব্য মনে পড়ে—'ভদ্রসন্তান হলেও যখন এর মধ্যে ঢোকেন তখন মনুষ্যত্ব যেন চলে যায় এত নীচ হয়ে পড়েন। কিন্তু যারা বেশ্যা, তারা এসে এখানে উঁচু হয়েছে। পাল্লা দেবার চেষ্টায় তারা ক্রমশ বড়ো হয়ে ওঠে।'

'নীচ হয়ে পড়েন'—এ-কথার তাৎপর্য আগে বুঝতাম না কিন্তু সেদিন বুঝলাম এই সব তথাকথিত 'বন্ধুদের' কুৎসারটনা ও মিথ্যাভাষণের বহর দেখে। একদিকে আমার প্রতি গোপন ঈর্ষা, আর অন্যদিকে চাকরী বজায় রাখার জন্য মালিকদের খুশি করতে গিয়ে সহকর্মীর নামে অবাধ মিথ্যাভাষণ—এটা নীচতা-হীনতা ছাড়া আর কি?

কিন্তু দুঃখের কাহিনী আর কত বলব? থাক ওসব কথা, তার থেকে যা বলছিলাম সেই কথায় ফিরে আসি।

এরপরই প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—অত্যন্ত আকস্মিকভাবে রাধিকানন্দবাবুর স্টারের সংস্রব ছিন্ন করে ফেলা। রাধিকাবাবু আমার অবর্তমানে স্টারে প্রচুর খেটেছেন এবং এক দিনে দু'খানা পর্যন্ত নাটকে নেমেছেন—এ-কথা আগেই বলেছি। সম্ভবতঃ ওঁর মনে মনে একটা আশা ছিল যে স্টার ও মনোমোহন যখন এক কোম্পানীর পরিচালনাধীনে এসে গেল, তখন উনি নিশ্চয় এক বড়ো কোনো 'পদ' পাবেন। আর ওদিকে হলো কী—আমি মনোমোহনে এসে অধিষ্ঠিত হলাম একেবারে প্রধান অভিনেতারূপে। শুধু তাই নয়, অপরেশবাবু কাগজে-কলমে মনোমোহনের ম্যানেজার হলেও আসতেন খুবই কম। প্রবোধবাবু সকালে মনোমোহনে এসে টিকিটবিক্রির ব্যাপারটা ঠিকঠাক করে দিয়ে চলে যেতেন। বিকেলে স্টারে যেতে হতো তাঁকে। আর ডিরেক্টরদের মধ্যে হরিদাসবাবু আসতেন, তা-ও বেড়াতে। এবং রাত্রিবেলায়। অতএব 'সহকারী ম্যানেজার' হলেও কার্যত ম্যানেজার ছিলাম আমিই। রাধিকাবাবু সম্ভবতঃ এতে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। স্টার ছেড়ে পালানো লোক আমি, সেই আমাকে এতো খাতির করে নিয়ে এসে এতো বড়ো দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার অর্থ টা কী? ব্যাপারটা মোটেই উনি সুস্থভাবে নিতে পারেননি। তাই উনি 'দুম' করে ছেড়ে দিলেন। অন্য কোনো থিয়েটারেও গেলেন না। আপাতত ঘরে বসেই রইলেন বলা যায়, বসে বসে নতুন কোনো থিয়েটার খোলা যায় কিনা, বা অন্য কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা তারই চেষ্টাচরিত্র করতে লাগলেন।

ওঁর অভিমান বা অভিযোগ সরাসরি আমার ওপর না হলেও, পরোক্ষভাবে সেটা এসে আমাকেই স্পর্শ করে। আমি স্টার ছাড়তে ওখানে ওঁরই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে উঠলো। আমার পার্টগুলো উনিই করতে লাগলেন। সে-সব পার্টে ওঁর সুনামই হলো, পাবলিসিটিও হলো ভালো, লোকে বললে—'অনুকরণ নয়, নতুন ধরনের।"

কিন্তু আমি ফিরে আসাতে কর্তৃপক্ষ আবার সেইসব পার্টগুলো আমাকে দিয়েই করাতে লাগলেন—এতে ওঁর মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আমি যখন বাইরে বাইরে ঘুরছিলাম, তখন মিনার্ভা আঙুরবালাকে দিয়ে 'তুলসীদাস' করেছিল, কিন্তু তাও বেশীদিন চলেনি। ওদিকে অসুস্থতার পর শিশিরবাবু ফিরে এলেন নাট্যমন্দিরে। তার আগে দানীবাবুও স্বাস্থ্যোদ্ধার করে ফিরে এসে স্টারে 'প্রফুল্ল'-র পুনরাভিনয় শুরু করেছিলেন। দানীবাবু করতেন 'যোগেশ', তারা-সুন্দরী—উমাসুন্দরী। আর আমার পার্ট 'রমেশ' করতেন রাধিকাবাবু। নাট্যমন্দিরে ফিরে এসে শিশিরকুমারও ধরলেন 'প্রফুল্ল'—এতে যোগেশ সাজতেন শিশিরবাবু। এটিই তাঁর সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম সামাজিক নাটকাভিনয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আমি মনোমোহনে আসার পর স্টার কবিগুরুর আর একখানি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল—সেটি হচ্ছে 'পরিত্রাণ'। তাতে ধনঞ্জয় বৈরাগী ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, বসন্ত রায়—নরেশ মিত্র, প্রতাপাদিত্য—তুলসী বন্দ্যো, বিভা—নীহারবালা, সুরমা—সরস্বতী।

একদিন হরিদাসবাবু মনোমোহনে রোজ যেমন বেড়াতে আসতেন, তেমনি এসে আমার হাতে একটা কাগজের বাণ্ডিল তুলে দিয়ে বললেন—অবসর সময়ে এটা একটু পড়ে দেখবেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কী এটা?

হরিদাসবাবু মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন—নাটক।

—কার?

হরিদাসবাবু বললেন—স্টারে 'মুক্তির ডাক' বলে একখানা একাঙ্কিকা নাটিকা আপনি করেছিলেন, মনে আছে? সেই 'মুক্তির ডাক'-এর লেখক মন্মথ রায় এ-নাটকখানি লিখেছেন। পড়ে দেখুন আপনি, মনে হয় ভালো লাগবে, নতুন ধাঁচের লেখা।

সেই রাত্রেই পড়ে ফেললাম নাটকখানি। সেই চাঁদ বেনে বেহুলা লখিন্দরের পুরনো গল্প। কিন্তু লেখার স্টাইলটা নতুন ধরনের। সংলাপও আধুনিক। এসব কারণে পুরনো গল্প নতুন এক রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

পরদিন হরিদাসবাবু এসে জিজ্ঞেস করতেই বললাম, বই ভালো, চলবে।

উনি খুশি হয়ে বললেন, তবে আর কী? শুরু করে দিন।

আমি বললাম—লেখাটাও যেমন নতুন ধরনের, প্রোডাকশানটাও তেমনি নতুন ধরনের হওয়া উচিত।

হরিদাসবাবু বললেন—তাই হবে। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। লেগে যান আপনি কাজে।

ওঁর সঙ্গে কথা বলার পর উনি প্রবোধবাবুকে এই নাটক সম্বন্ধে বলে দিলেন। আমিও প্রবোধবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। প্রবোধবাবু ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী পুরুষ, কাজের ভারে ভয় পান না। উনি অবিলম্বে পাণ্ডুলিপি 'কপি' করতে দিলেন। তখনকার দিনে প্রত্যেক থিয়েটারেই একজন করে 'কপি-লিখিয়ে' থাকতো। পাণ্ডুলিপিও গোটা গোটা বড বড় অক্ষরে কপি করবে, আবার পার্টও লিখবে। গিরিশবাবুর ছিল এই ব্যবস্থা এবং সেই থেকেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এটা চালু হয়ে এসেছে। থিয়েটারে সব বিভাগেই একজন করে 'প্রধান' বা 'মাথা' ছিল। স্ব স্ব বিভাগের কাজের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হতো ম্যানেজারের কাছে। আমার কাছে নতুন কপি-লিখিয়ে নেই, আছে স্টারে, সেজন্য প্রবোধবাবুই কপি করাবার ভারটা নিলেন।

কপি করার কাজে অভিজ্ঞ লোক স্টার থিয়েটারে ২।১ জনের বেশী নেই, সেইজন্য মনোমোহনে টপ্ করে সেরকম লোক পাই কোথায়? তখনো কার্বন-পেপারের রেওয়াজ হয়নি, অথচ ছুটি কপি চাই। সমস্ত বইখানা বড বড পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে তু' কপি করতে হবে ধরে ধরে। থিয়েটারে চলতি ভাষায় এই কপিকে 'সাট' বলে—তার ওপর সব আলো ফেলার নির্দেশ লেখা থাকত—কোন্ দৃশ্যে লাল, কোথায় নীল, কোথায় হলদে—এমন কি আর্কল্যাম্পের সাহায্যে কখন কোথায় কার ওপর 'ফোকাস' ফেলতে হবে—তাতে সব লেখা থাকত। ততদিনে 'টর্চ' বাতির চলন এসে গেলেও, অনেকে টর্চের মুখটা লাল কাপড় দিয়ে বেঁধে নিত, যাতে আলোটা ছড়িয়ে না পড়ে। টর্চের আগে প্রম্পটাররা মোমবাতি দিয়ে কাজ চালাত।

যাই হোক, খুব শিগ্‌গীরই হাতে এসে গেল 'সাট' আর লেখা পার্টগুলো। একদিন সব ভূমিকা বণ্টনও হয়ে গেল। চাঁদ সদাগর—আমি, বেহুলা—সুশীলাসুন্দরী (ছোট), লখিন্দর—ইন্দু মুখার্জি, সনকা—রাণীসুন্দরী (মনোমোহনের), সাঁই সদাগর—কনকনারায়ণ ভূপ, নেতা—আশ্চর্যময়ী, কালু সর্দার—কুঞ্জলাল সেন, নেড়া—তুলসী চক্রবর্তী, ধন্বন্তরী—সন্তোষকুমার শীল, মনসা—নিভাননী। দর্গাদাসকে এ-বইতে পাওয়া যায়নি। স্টারে তখন অপরেশবাবুর লেখা 'মগের মুলুক' খোলা হবে—তাতে কাজ করছে সে।

মহলা চলতে লাগলো। আগের স্টেজ-ম্যানেজার কালীবাবু তখন নেই, প্রবোধবাবু নিজে এসে সেট নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। বইটাতে ইল্যুশান দৃশ্য ছিল কয়েকটি,

আমার ইচ্ছে ছিল ওগুলো বাদ দিয়ে দিই, কিন্তু প্রবোধবাবু নাছোড়বান্দা, উনি বললেন,—ঠিক আছে, দেখ না আমি সব করে দেবো। এছাড়া ছিল নৃত্য। বেহুলার সর্পনৃত্য ছিল, ময়ূরনৃত্য ছিল। নৃত্যশিক্ষক হয়ে এসেছিলেন ললিতমোহন গোস্বামী। বয়স্ক ব্যক্তি, আমায় এসে বললেন—আপনি ঠিক কেমন চান? আপনার আইডিয়াটা বলুন—আমি ঠিক তেমনি করে দেব।

আমি বললাম—নাচের আমি কি জানি?

ললিতবাবু বললেন—আপনার কাছে অনেক বই আছে। সেগুলি দিয়ে আমাকে যদি একটু সাহায্য করেন, তাহলে আমি নতুন ধরনের কিছু করে দিতে পারি।

উৎসাহিত হয়ে বললাম—দেখুন ললিতবাবু, আমার ইচ্ছে খুব বেশী অঙ্গভঙ্গী বা পায়ের কাজ না করিয়ে যতটা পারেন হাতের ভঙ্গী দিয়ে ভাবটা ফুটিয়ে তুলুন। যেমন ধরুন, সাপ দুধ খেতে আসছে বা বাঁশী শুনে আনন্দে দুলছে বা দংশন করতে চলেছে ইত্যাদি 'সর্পগতিকে' হাত বা দেহভঙ্গিমার মধ্যে নিয়ে আসুন। তাহলে এসব নৃত্য একটা নূতনত্ব পাবে।

ললিতবাবু স্টার থেকে এখানে এসেছেন, আর এখানকার নৃত্যশিক্ষক ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায় গেছেন স্টারে। ললিতবাবু একটু সেকেলে ধরনের লোক, কিন্তু আমার ওপর তাঁর আস্থা অপরিসীম। আমার কাছে নৃত্যসম্বন্ধীয় কিছু বই ছিল—বিলেত থেকে ড্যান্সিং টাইমস্ আনাতুম। ললিতবাবুর আগ্রহ দেখে বইগুলো তাঁকে দেখালুম। ছবি আর গ্রাফগুলো বুঝিয়ে দিলাম। ললিতবাবু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সেগুলি বুঝে নিলেন। ফলে ওঁর নৃত্যপরিকল্পনায় যে নূতনত্ব প্রকাশ পেলো, তার জন্য উনি যথেষ্ট প্রশংসা পেলেন। শিল্পী যদি বিনয়ী হন এবং মনে যদি তাঁর অহঙ্কার না থাকে এবং সত্যিই যদি লোককে নূতন কিছু দেবার ইচ্ছে তাঁর মনে থাকে, তবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নূতন নূতন শিল্প সৃষ্টি করে যান। আর যদি তিনি মনে করেন, 'যা জানি তাই তো যথেষ্ট—এই বা কে জানে?'—তাহলে ধরে নিতে হবে যে তাঁর সৃজনশীল ক্ষমতার অপমৃত্যু হয়েছে।

যাই হোক, প্রস্তুতি-পর্ব খুব জোর চলেছে। একদিকে মহলা চলছে, অন্যদিকে সেট্ নির্মাণ চলছে। সকাল-দুপুর-বিকেল—দিনে তিনবার করে প্রবোধবাবু এখানে আসছেন—প্রচুর খাটছেন তিনি। আবার সন্ধ্যার মুখে স্টারে চলে যান। একটা দৃশ্য আছে—যেখানে বেহুলা ভেলা করে নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে গান গাইছে। তাকে ভয় দেখাবার জন্যে ভূতপ্রেতের আবির্ভাব হতে লাগলো এবং যাতে সে

এগুতে না পারে, তার জন্যে নদীর বুকে বড়ো বড়ো পাথরের ঢিবি জেগে উঠতে লাগল।

আমি বললাম ভূত-প্রেতের আওয়াজ না হয় নেপথ্য থেকে হাঁড়ির ভেতর থেকে করা গেল, কিন্তু সব মিলিয়ে এই ইল্যুশান সৃষ্টি করার দরকার কী? নাটকের নিজস্ব গতিতেই এ চলে যাবে। কিন্তু প্রবোধবাবু ছাড়লেন না। তিনি সব করে-টরে রিহার্সাল দেখালেন একদিন। ছাতার মতো পাঁচ-ছ'টা অতিকায় বস্তু খুলে গিয়ে পাথরের ঢিবি হয়ে যেতে লাগলো—তার ভিতরে ছাতার শিকের মতোই শিক লাগানো, ছাতার মতো খুলে যায়, বুঁজে যায়।

ব্যাপারটা দেখতে মন্দ লাগলো না, কিন্তু তবু আমার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগলো—আসল কথা আমার এ-সিনটাই ভালো লাগছিল না। এদিকে সোজাসুজি না-বলতেও পারছি না, তাহলে যদি ওঁর জেদ চেপে যায়! তবু আমি ঘুরিয়ে বললাম—আসলে এ-'সিন'টারই কোনো দরকার নেই।

প্রবোধবাবু বললেন—না হে, ঠিক আছে। দেখো, ঠিক হয়ে যাবে।

আমি আর কিছু বললাম না।

নাটকের প্রথম অভিনয় হয়ে গেল। নীচের দর্শক কিছু বলেনি, কিন্তু ওপর থেকে যারা দেখছিল, তারা পছন্দ করলে না। প্রবোধবাবু নিজেও দেখলেন, দেখে সম্ভবতঃ ওঁর নিজেরও ভালো লাগলো না। অভিনয়-শেষে আমাকে এসে বললেন—না হে, তুমি ঠিকই বলেছিলে—ওটা কেটেই দাও।

আমি তো এ-ই চাইছিলাম—আমি তখ্খুনি বসে গেলাম 'এডিট' করতে। দ্বিতীয় রজনী থেকে ওসব দৃশ্য একেবারে বাদ হয়ে গেল, তাতে নাটকের কোনোই অঙ্গহানি হলো না।

'চাঁদ সদাগর'-এর প্রথম অভিনয়-রজনীর তারিখ ছিল ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, বুধবার, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

প্রথম রজনীতে নাট্যকার মন্মথবাবু আসেননি থিয়েটারে। কেন আসেননি তার কৈফিয়তটা তিনি নাটকের ভূমিকায় দিয়েছেন। ওঁর মাতামহ ৺রামপ্রাণ গুপ্ত ছিলেন তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার ও ঐতিহাসিক। তিনি সেদিন মহাপ্রয়াণ করেন। দৌহিত্রকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাই মাতামহকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে তিনি আসতে পারেননি।

দ্বিতীয় অভিনয়-রজনীতে নাট্যকার এলেন। সুদীর্ঘ সুঠাম সুন্দর গৌরবর্ণ চেহারা। মিষ্টভাষী ও সদালাপী। মাথার চুল একটু কোঁকড়ানো। হরিদাসবাবুই

ভিতরে নিয়ে এলেন সঙ্গে করে। তখন অভিনয় শেষ হয়ে গেছে—আমি মেক-আপ তুলছি। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিতভাবে মন্মথবাবু বলে উঠলেন—'আমার বই যে অভিনীত হবে এবং সেটা যে এত ভালো হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। দেশে বসে নাটক লিখি—ক্লাবে প্লে হয়, ব্যস্ ঐ পর্যন্ত। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম আমার পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনীত হলো। অভিনয় সকলেরই চমৎকার হয়েছে—বিশেষ চাঁদ সদাগর, বেহুলা আর সনকা।'

এই থেকেই মন্মথবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ। আর সে-আলাপ জমে-জমে শেষপর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে, আমরা পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেলাম। সে-আলাপ ওঁতে-আমাতেই শুধু সীমাবদ্ধ রইলো না। অচিরেই আমাদের দু' পরিবারের মধ্যেও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলো। শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়ালো যেন আমি বড়ো ভাই, আর উনি কনিষ্ঠ—আমরা যেন একই পরিবারের লোক। ওঁর মা আমার স্ত্রীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আজ পর্যন্ত আমাদের দুজনের সে প্রীতির বন্ধন অটুট আছে। ওঁর আরও নাটক আমি করেছি, এবং সেসব নিয়ে অনেক ঘটনাও আছে—যথাসময়ে সেসব কথা বলব।

'চাঁদ সদাগর'-এর নাম হলো খুব, কাগজে কাগজে সুখ্যাতিও বেরুল প্রচুর। স্থানাভাবে সেগুলি আর উদ্ধৃত করলাম না। আমাদের ডিরেক্টররা খুব খুশি। অপরেশবাবুও এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। মনে হলো এতদিন যাবৎ স্টারে কাজ করছি—সেই ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত। প্রশংসা, সহানুভূতি অনেক পেয়েছি, কিন্তু এ অভিনয় ও প্রযোজনায় যা পেলাম, তা হলো ঠিক প্রশংসা নয়—যাকে বলে শ্রদ্ধা। এরকমটি আর কখনও পাইনি। আর একটা কথা—নিজের ওপর এলো নির্ভরশীলতা। এই 'চাঁদ সদাগর' থেকেই আমার সত্তা এখানে সম্যক প্রতিষ্ঠিত হলো।

'চাঁদ সদাগর' সগৌরবে চলতে লাগলো মনোমোহনে। আর ওদিকে নাট্যজগতে ঘটলো এক অভাবনীয় ঘটনা। নাট্যমন্দিরে শিশির ভাদুড়ী খুললেন নতুন নাটক শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' (দেনা-পাওনার নাট্যরূপ)। এর প্রথম রজনী হলো ৩রা আগস্ট, ১৯২৭, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৪। প্রথম কয়েক রাত্রি তেমন লোক হয়নি এ-নাটকে। দর্শক আকর্ষণের জন্য 'শেষরক্ষা'কে জুড়ে দিতে হলো। তারপর অবশ্য দারুণ ভিড় হতে লাগলো। প্রশংসায় অভিনন্দনে আকাশ-বাতাস ভরে গেলো। প্রথম অভিনয়-রজনীতে ছিলেন জীবানন্দ—শিশির ভাদুড়ী, প্রফুল্ল—রবি রায়, এককড়ি—গোপাল ভট্টাচার্য, নির্মল—শৈলেন চৌধুরী, ষোড়শী—চারুশীল'

প্রথম কথাই হলো নাটক। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র। নাটকের জোরালো গল্প।' তার

সংলাপ এবং চরিত্রচিত্রণ। তারপর হলো প্রযোজনা। সবদিক থেকে এমন একটা সুসমঞ্জস রূপ পরিগ্রহ করেছে যা দেখে প্রতিটি লোক মুগ্ধ হয়েছে। অন্য সবার অভিনয় বা প্রযোজনায় আমাদের পক্ষে চমক লাগাবার মতো তেমন কিছু দেখতে পাইনি বটে কিন্তু যেটা আমাদের মনকে সবচেয়ে বেশী করে নাড়া দিলো সেটা হলো শিশিরকুমারের অদ্ভুত অভিনয় এবং সমগ্র নাটকখানির প্রযোজনা। 'জীবানন্দ' চরিত্রের সঙ্গে ওঁর অভিনয় যেন মিশে একাকার হয়ে গেছে। শিশিরবাবুর এতাবৎ যেসব অভিনয় আমি দেখেছি, তাতে নূতনত্ব যথেষ্ট থাকলেও নাটকের মধ্যে ওঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বই সবথেকে বেশী প্রকট হয়ে উঠত। মনে মনে ব্যক্তিগতভাবে ওঁর অভিনয়ের প্রতি এই ছিল আমার অভিযোগ। সেখানে শিশিরকুমার ছাড়া আর কাউকে তেমন নজরে পড়তো না। কিন্তু তাঁর 'জীবানন্দ' দেখবার পর আমার সব অভিযোগ খণ্ডন করতে বাধ্য হলাম। জীবানন্দের চরিত্রের মধ্যে শিশিরবাবু যেন মিশে গেলেন—এমন আত্মমগ্ন অভিনয় যে, সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে একটা অন্তর্নিহিত মুগ্ধকর ভাব আগাগোড়া বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে। নাট্যকার-সৃষ্ট চরিত্রে 'চরিত্র' ছাড়াও আরও যে কিছু করার থাকে অভিনেতার, সেই 'আরও কিছু'কে দর্শক হিসাবে সেদিন পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে এলাম।

আমার তো মনে হয় এই অভিনয়ের পরে যদি শিশিরবাবু আর কোনও অভিনয় নাও করতেন, তাহলেও তিনি অমর হয়ে থাকতেন। জীবানন্দ-ষোড়শীর ভাবগত নাট্যদ্বন্দ্বে সেদিন জীবানন্দ এক তৃতীয় বাণীর সঞ্চার করেছিলেন বললে অত্যুক্তি করা হবে না। সাহিত্য-পাঠে যেমন "to read between the lines" বলে একটা কথা আছে, নাট্য-সাহিত্যেও তেমনি নির্দিষ্ট ঘটনা ও নির্দিষ্ট সংলাপ ছাড়াও কিছু বস্তু অনুভব করার আছে। সেই অনুভূতিকে যিনি যতো উপলব্ধি করতে পারবেন ও প্রকাশ করে বিশ্লেষণ করতে পারবেন, তিনি ততো বড়ো শিল্পী। দর্শকের পক্ষে এ-পাওনাটা উপরি-পাওনা, আর এই 'উপরি-পাওনার' জন্য প্রতিটি রসজ্ঞ দর্শকের মন আকুলিবিকুলি করতে থাকে বলে তাঁরা বারবার প্রেক্ষাগৃহের দিকে ছুটে যান। এ 'উপরি-পাওনা'র ব্যাপারটা বলে বা লিখে বোঝাবার নয়, এটা উপলব্ধিসাপেক্ষ।

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটলো। পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে—সেই যে চরখেরীতে গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে 'রাজসিংহ'র শুটিং করতে। এই থিয়েটারের ফাঁকে ফাঁকে সেই 'রাজসিংহে'র শুটিং হয়ে যেতে লাগল। ছবিটা তুলতে খরচও হয়েছিল যেমন, সময়ও লেগেছিল তেমনি। কলকাতায় চোরবাগান 'মার্বেল প্যালেস'-এ (এ-বাড়িটি এখনও বর্তমান) আমাদের শুটিং হলো।

'রাজসিংহে' কাহিনীর যে স্থান-কাল, তার সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গতি রাখতে অবশ্য 'মার্বেল প্যালেস' পারেনি স্থাপত্য-রীতির দিক থেকে। কিন্তু ম্যাডান কোম্পানী ওসব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করল না। 'রাজসিংহ' রাজা-রাজড়াদের ছবি—তার সঙ্গে বেশ জাঁকজমকওলা কিছু দেখাতে পারলেই হলো। ঐতিহাসিক পারম্পর্য আবার কি? কেই বা ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? যাইহোক, এইভাবে ছবি তো একদিন শেষ হলো, কিন্তু মুস্কিল বাধলো ছবির 'রিলিজ' নিয়ে। মুসলমানরা আপত্তি তুললেন। আওরঙজেব-কন্যা জেবুন্নিসা অন্তঃপুরে বসে বাইজী নিয়ে নৃত্যগীত উপভোগ করছেন ও মোবারকের সঙ্গে মদ্যপান করছেন এসব দৃশ্য তাঁরা পছন্দ করলেন না। আওরংজেবের অন্তঃপুরে নৃত্যগীত আবার কি? এমন কি শ্যুটিং-এর সময় পর্যন্ত গোলমাল হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে 'মোবারক' যে করছিল সে ছিল মুসলমান। সে একটি দৃশ্যে অভিনয় করতে আপত্তি করে বসেছিল।

তবু ফ্রামজীর দৃঢ়তায় বইটি তোলা শেষ হলো এবং সাড়ম্বরে মুক্তিদিবসও ঘোষিত হলো। রিলিজ সংক্রান্ত সমস্ত বন্দোবস্তও হয়ে গেল। ঠাকুর সিং বলে ম্যাডানে একজন বেশ নামকরা পেইণ্টার ছিল। সে সিনেমা-গৃহের সামনে ডিস্‌প্লে করার জন্য 'রাজসিংহে'র একটি প্রকাণ্ড কাট-আউট তৈরী করলো। যথারীতি মেক-আপ নিয়ে পোশাক পরে তাকে কয়েকটা 'সিটিং' দিতে হয়েছিল এইজন্যে। ঘোড়ায় চড়ে রাজসিংহ চলেছেন, আর ঠাকুর সিংয়ের চাই 'রাজসিংহে'র বিগ ক্লোজ-আপ, মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত—অর্থাৎ ঘোড়া দেখা যাবে না, কিন্তু রাজসিংহ যে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন এটা যেন বেশ বোঝা যায়, আমাকেও সেইভাবে একটা চৌকির ওপর ঠায় বসে থেকে 'সিটিং' দিতে হলো। আসল ঘোড়ায় চড়ে 'সিটিং' দিলে ঘোড়া স্থির থাকবে কেন? সে তো নড়াচড়া করবেই, তাই ঠাকুর সিং বললে, 'আপনি শুধু ঘোড়ায় চড়ার পোজটা দিন। আমি আপনার ছবির সঙ্গে পরে ঘোড়া এঁকে নেব।

রিলিজ হবার দিন কয়েক যেতে-না-যেতেই আপত্তি উঠলো। এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় ম্যাডানদের বাধ্য হয়ে ছবি উঠিয়ে নিতে হলো। ফ্রামজী ম্যাডান ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি ব্যাপারটা আগে থেকেই আন্দাজ করে তেইশটা প্রিণ্ট করে সারা দেশ জুড়ে তেইশটা হাউসে 'রাজসিংহ' রিলিজ করেছিলেন। তখন ম্যাডানদের সারা ভারতে প্রায় একশোটা চিত্রগৃহ ছিল। ভেবে দেখুন সে যুগে তেইশটা প্রিণ্ট একসঙ্গে !! এটা ম্যাডান কোম্পানী বলেই সম্ভব হয়েছিল। সব হাউসে এক সপ্তাহ ধরে চললেই তো তেইশ সপ্তাহ চলে গেল—তার ওপরে সব নিজেদের হাউস! পয়সা উঠিয়ে নিতে এমন কি কষ্ট !!

ম্যাডানরা পরে দানীবাবুকে দিয়ে 'শাস্তি-কি-শাস্তি' করিয়েছিল। দানীবাবুর সেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবিতে চিত্রাবতরণ। উনি ছিলেন প্রধান ভূমিকায়, আর আমি 'প্রকাশ'। শ্যুটিং-এর সময় 'কাট' বললে যে অভিনয় বন্ধ করতে হয়, তারপর ক্যামেরা এগিয়ে বা পিছিয়ে নিয়ে ক্লোজ-আপ, মিড-শট, লং-শট নেয়—সেসব দানীবাবু বরদাস্ত করতে পারলেন না। মঞ্চাভিনয়ের সে স্বতঃস্ফূর্ত ধারাবাহিকতা ব্যাহত হতে লাগলো। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন—'না বাপু, এসব আমার দ্বারা হবে না।'

খবর শুনে ফ্রামজী নিজে এলেন। দেখেশুনে বললেন—ঠিক আছে, আপনি স্টেজে যেরকম করেন সেই রকমই করুন। আপনার বেলায় আমরা আর 'কাট' করবো না।

দানীবাবু খুশী হয়ে বললেন—বেশ, তাহলে হতে পারে।

ফ্রামজীর উপস্থিতবুদ্ধি ছিল অসাধারণ। উনি ওঁর মুভমেণ্টটা দেখে নিয়ে ৪।৫টা ক্যামেরা সাজিয়ে রাখলেন। চার পাঁচজন ক্যামেরাম্যান একযোগে কাজ করতে লাগলো—'শট' নিতে লাগলো সুবিধামতো। পরে 'শটগুলো' এডিট করে নেওয়া হয়েছিল।

যাক, এবার ছবির কথা ছেড়ে দিয়ে আবার মঞ্চের কথায় আসা যাক।

স্টারে মাঝে মাঝে অভিনয় করতে হয়। একদিন হরিদাসবাবু, তাঁর যেমন অভ্যাস কানে কানে কথা বলা, আমায় ডেকে বললেন—'আলমগীর' করুন না?

চমকে উঠে বললাম—আলমগীর? কোন্ আলমগীর?

হরিদাসবাবু মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন—কোন্ আলমগীর আবার? ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীর? আপনি নাম-ভূমিকায়।

একটু চুপ করে থেকে বললাম—ও তো শিশিরবাবু করেছেন, এখনও করছেন মাঝে মাঝে।

হরিদাসবাবু বললেন—তা করুন না তিনি, আপনার করতে বাধাটা কোথায়? আপনি নতুন একটা রূপ দেবেন—এটাই তো আমরা আশা করবো।

কথাটা ভাবতে লাগলাম। উনি কিন্তু নাছোড়বান্দা। এর পর যেদিন আবার দেখা হলো, উনি প্রথমই প্রশ্ন করলেন—আলমগীরের কী হলো?

এবারে আমি মনস্থির করে বললাম—ঠিক আছে, করবো আলমগীর।

ইতিমধ্যে বইটা নিয়ে আগাগোড়া পড়ে ফেলেছি এবং নিজের মনের মধ্যে কল্পনায় ছকেও নিয়েছি সব জিনিসটা। কথাটা শুনে হরিদাসবাবু উৎসাহিত হলেন, আর আমিও প্রস্তুত করতে লাগলাম নিজেকে। স্যর যদুনাথ সরকারের 'হিস্ট্রী অফ

আওরঙজেব' আমার কাছে ছিল, সেটা থেকে 'আওরঙজেব' বা আলমগীর সংক্রান্ত বিষয়গুলোর খুঁটিনাটি সব পড়ে ফেললাম ভালো করে। কেমব্রিজ-এর 'হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া', আর ভিনসেণ্ট স্মিথের 'হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া' বই দু'খানিও পড়ে নিলাম। এসব পড়লেও যদুনাথবাবুর বইই আমার কাজে এসেছিল বেশী। তাঁর মতো এমন বিশদ বর্ণনা এমন মনোরমভাবে কেউ করতে পারেন নি বলে আমার ধারণা। যাই হোক, এইসব বই থেকেই ঐতিহাসিক আওরঙজেব চরিত্রটা ঠিকমতো বুঝে নিতে চেষ্টা করলাম। স্যর যদুনাথের 'অ্যানেকডোট্স অফ আওরঙজেব'ও আমার খুব উপকারে লেগেছিল।

ঐতিহাসিক কাহিনীগুলোতে এমন খুঁটিনাটি বর্ণনা অনেক থাকে যা আপাত-দৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও আমাদের পক্ষে মূল্যবান। মুঘল দরবারের আদব-কায়দা, বাদশাহদের পাঞ্জা দেওয়ার পদ্ধতি,—এগুলো আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। আর একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছিল আলমগীরের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে। বহু খুঁটিনাটি ঘটনার বিবরণ পাঠ করে আমার ধারণা হলো যে এই চরিত্রটির মধ্যে আবেগের স্থান ছিল না। আবেগশূন্য, গম্ভীর এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন আলমগীর। অভিনয়ের মাধ্যমে আমি সেই রূপটিই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম। তার আগে সচেষ্ট হয়েছিলাম আলমগীরের চেহারা সম্পর্কে। ছবি দেখে তাঁর সেই বয়সের হুবহু সাদৃশ্য মেক-আপের সাহায্যে প্রকাশ করা এমন কিছু কঠিন ছিল না, কিন্তু আমি চাইছিলাম এমন একটি ছবি যাতে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। অনেক ছবি দেখতে দেখতে অবনীন্দ্রনাথের একখানি ছবি দেখলাম ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটিতে। অবনীন্দ্রনাথের 'আলমগীরের' এই ছবির মধ্যে আছে—এক হাতে তাঁর পবিত্র কোরান, অন্য হাতে তরবারি এবং দুটি হাতই পিছনে জড়ো করা। ছবিখানিকে এত জীবন্ত ও চরিত্রানুগ মনে হলো যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এই ছবিখানিই হলো আমার প্রেরণার উৎস—ছবিতে যেরকম পোশাক ছিল আমিও সেইরকম পোশাক তৈরী করালাম।

অভিনয় হলো। আমার চলন, বলন, অভিব্যক্তি, আদবকায়দা প্রভৃতির মধ্যে লোকে অনেক কিছু নতুনত্বের স্বাদ পেলো। কথাবার্তার মধ্যেও অনেক কিছু নতুনত্ব পেলো দর্শক। উদিপুরীর সঙ্গে যেসব বিদ্রূপাত্মক সংলাপ আছে সেখানে চরিত্রটিকে আমি লঘু না করে খুব সংযত করলাম। যেমন কথার পূর্বে সব সময় কথা না বলে, চোখের চাউনি এবং এক্সপ্রেশান দিয়ে উদিপুরীর কথাগুলো ধরে নিয়ে তারপরে ধীরে অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠে সংলাপ উচ্চারণ। অর্থাৎ 'ইমোশন' বা 'আবেগ' প্রকাশে যথেষ্ট সংযত ভাব রক্ষা ক'রে চলা। শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে যেখানে আলমগীর দিলীরকে

বলছেন—'আমি ঊর্ধ্বে উঠে যেতে লাগলুম' ইত্যাদি সেখানে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ খানিকটা আবেগ বা 'ইমোশন'-এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন—এখানে 'ইমোশন'টা নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং পরিহার করা চলে না। যদিও আমার মতে নাটকের এ অংশ অনাবশ্যকভাবে রোমান্টিক হয়ে উঠেছে।

আমার অভিনয় দেখে বহু পত্র-পত্রিকাই সেদিন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে থেকে গোঁড়া শিশিরভক্ত 'নাচঘর' (২৫শ সংখ্যা, ১৩৩৪)-এর উক্তিই উদ্ধৃত করছি। "অহীন্দ্রবাবু আলমগীরের ভূমিকার অঙ্গসজ্জা করেছিলেন চমৎকার। ঔরঙজেবের যে ঐতিহাসিক চিত্র 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' প্রভৃতি স্থানে দেখেছি তার সঙ্গে এঁর অঙ্গসজ্জা চমৎকার মিলে যায়। তার উপর অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ে ইসলাম ধর্মে একনিষ্ঠ, বিলাসিতার একান্ত বিরোধী, আত্মনির্ভরতায় অতুলনীয় সম্রাট আলমগীরের ঠিক ঐতিহাসিক মূর্তি যে ফুটে উঠেছে তাও অস্বীকার করবার যো নেই।... পরন্তু অহীনবাবুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুখ্যাতির কথা এই যে তিনি হাততালি পাবার লোভে ভ্রমক্রমেও কোথাও তাঁর পূর্ববর্তী বিখ্যাত প্রতিভার অনুকরণ করেন নি। ইনি নতুন কিছু দেখাতে চেয়েছেন এবং তাতে সফলও হয়েছেন।"

শিশিরবন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর "বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার" গ্রন্থে লিখেছিলেন, "তিনি হচ্ছেন চতুর নট, এ ভূমিকাটি নিজের পদ্ধতিতে নূতনভাবে দেখিয়ে নিজের মান রক্ষা করেছিলেন বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই।" আমি ঐ যে আবেগ একটু কম দেখিয়েছি সেই জন্যেই এই সমালোচনা। তবু যাহোক, "নিজের পদ্ধতিতে নূতনভাবে" কথাটি যে ব্যবহার করেছিলেন, এতেই তাঁর একটা স্বীকারোক্তি প্রকাশ পায়—আমি তাতেই খুশী।

'আলমগীর'-এর ভূমিকা সম্পর্কে আরও একটি তদানীন্তন বিখ্যাত পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছি আগ্রহী পাঠকের কৌতূহল নিরসনের জন্য। পত্রিকাটির নাম 'দীপালী'। বেশ কিছুদিন পরে ১৯৩৪ সালের মে মাসে (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪) এঁরা লিখেছিলেন—"অহীন্দ্রের ঔরঙ্গজেব স্থির, ধীর। তাঁহার মেক-আপ হইতে চলিবার ভঙ্গী, স্বরের বিকৃতি প্রথমেই দর্শকের মনে বৃদ্ধত্বের, কূট রাজনীতিজ্ঞের ছাপ রাখিয়া যায়। তাঁহার অভিনয়ে বাদশার গাম্ভীর্য বিদ্যমান। সে যে সমগ্র হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট, সে যে নীরব ফন্দিবাজ, চক্রান্তকারী অথচ স্থির, ধীর, অনুতপ্ত, তাহা তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে ও প্রতি ভাষণে সম্পূর্ণ প্রকটিত হয়। তাঁহার চলনে ও বলনে বাদশার গাম্ভীর্য আছে, কণ্ঠস্বরে আছে বৃদ্ধের (স্খলিত) স্বর।"

এইসব মন্তব্য থেকে পাঠক খানিকটা 'আলমগীর'-এর রূপারোপ সম্বন্ধে ধারণা

করতে পারবেন। আমার অভিনয় লোকে নিয়েছে, দেখে খুশী হয়েছে—এতে আমার আত্মপ্রসাদও কম হয়নি। আমি যে অন্যের অনুকরণ না করে, নতুন কিছু দিয়ে দর্শকদের খুশী করতে পেরেছি সেইটেই আমার চরম ও পরম সার্থকতা।

'আলমগীর' তারপর বহুদিন ধরে চলেছিল, যদিও নিয়মিতভাবে নয়, কারণ, স্টারে তখন সপ্তাহান্তিক নতুন নাটকের অভিনয় চলছে 'মগের মুলুক'। অতএব মধ্য সপ্তাহান্তিক আকর্ষণ হিসেবেই চলতে লাগলো 'আলমগীর'।

ম্যাডানের বেইলী থিয়েটারে শিশিরবাবু যখন 'আলমগীর' করেছিলেন তখন 'রাজসিংহ' সাজতেন প্রবোধ বসু। সেই প্রবোধ বসুই এসে আমাদের সঙ্গে 'রাজসিংহ' করেছিলেন। দুর্গাদাস সাজতো ভীমসিংহ, উদিপুরী তারাসুন্দরী। পরে অবশ্য চারুশীলাও নেমেছে, শান্তবালাও নেমেছে, তারও পরে কুসুমকুমারী নেমেছে।

স্টারে মাঝে মাঝে 'নরমেধ যজ্ঞ' এবং 'চন্দ্রশেখর'ও হতো। আমি 'চন্দ্রশেখর'-এ তখন করতাম 'নবাব'। 'চন্দ্রশেখর'-এ 'নবাব'ই আমার প্রথম ভূমিকা, পরে অবশ্য অন্য ভূমিকা করেছি।

দেখতে দেখতে এসে গেল বড়দিন। তখন বড়দিন হলো থিয়েটার-জগতের একটি বিশেষ মরশুম। সবাই নতুন বই খোলার চেষ্টা করত। স্টার ধরলো অপরেশবাবুর লেখা নতুন গীতিবহুল নাটক 'পুষ্পাদিত্য'। তিনকড়িবাবু, নরেশবাবু, আশ্চর্যময়ী, নীহারবালা—এঁরা ছিলেন 'পুষ্পাদিত্যে'। মিনার্ভা খুললো বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তের লেখা 'নর্তকী'। দানীবাবু তখন মিনার্ভায় গেছেন—ওঁকে তাই নামানো হলো নায়কের ভূমিকায়। তরুণ সেনাপতি, বা নগরকোতোয়াল নর্তকীর প্রেমে পড়েছেন—এই হলো 'নর্তকী'র গল্প। নায়কের ভূমিকায় এমন কিছু দেখাবার ছিল না যাতে দানীবাবুর মতো অভিনেতার প্রয়োজন। কোনো তরুণ অভিনেতা হলে ভূমিকাটিতে মানাতো, দানীবাবুর মতো বৃদ্ধকে তাতে মানাবে কেন?

মনোমোহনে বড়দিনে আমিও ধরলুম নতুন নাটক 'আরবী হুর'। এই নাটকের কথা একটু গোড়া থেকে বলি। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—রাণাঘাটে বাড়ী—'হরবোলা'র পাঠ করে একদা খুব নাম করেছিলো 'পরদেশী' নাটকে। নাটকটি হয়েছিল পুরাতন মনোমোহনে। সেই হরিদাস এখন আমাদের সঙ্গেই কাজ করছে মনোমোহনেই। ওর জন্যে 'মনোমোহনে' 'পরদেশী'ও করা হয়েছিল বারকতক। এরকম ভিন্ন ভিন্ন নাটক সুবিধা বুঝলেই ধরা হতো। মনোমোহনে 'আলিবাবা'ও হয়েছে। নাম-ভূমিকায় কনকনারায়ণ, মর্জিনা—সুশীলাবালা।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। 'পরদেশী' নাটকটি লিখেছিলেন পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

বলে এক ভদ্রলোক। এঁর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ-পরিচয় হয় এবং এঁর অপেরা রচনায় বেশ হাত আছে দেখে একদিন ইটালিয়ান অপেরা 'রিগোলিটো'র গল্প বললাম কথায় কথায়। ইটালিয়ান অপেরার বৈশিষ্ট্য হলো, প্রথম দিকে নাচ-গান হাস্যরস থাকলেও শেষটা হতো বিয়োগান্তক বা ট্রাজিক। পঞ্চাননবাবু ঐ 'রিগোলিটো'র গল্পকেই অনুসরণ করে নাটক লিখলেন 'আরবী হুর'। পাঁচটি দৃশ্যে পাঁচ অঙ্কের নাটক। অর্থাৎ এক একটি দৃশ্য এক একটি অঙ্ক। গোড়ার দিকটা বেশ অপেরার স্টাইলে লেখা, কিন্তু শেষটা নিদারুণ ট্র্যাজেডী। যদিও ভাষা দুর্বল এবং প্রহসনের ধারায় সংলাপ লেখা তবু বেশ একটা নূতনত্ব ছিল। কনকনারায়ণ এ নাটকের গানগুলিতে সুর দিলেন বা 'মিউজিক সেট' করলেন। চমৎকার হয়েছিল গানের সুরগুলি। 'আরবী হুর' প্রথম অভিনীত হলো ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ সাল। সত্যি কথা বলতে কি, দর্শকদের ভালোই লেগেছিল নাটকখানি, এবং আমরাও বেশ সুখ্যাতি পেয়েছিলাম। আমি করতাম প্রধান ভূমিকা—কুব্জ মুসা বেদুইন।

এখানে 'আরবী হুর' করলে কি হবে, স্টারে গিয়ে আবার 'আলমগীর' করতে হতো।

১৯২৭ সাল হলো আমার জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর। বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত। একদিকে যেমন পরিশ্রমের অন্ত ছিল না, তেমনি অন্যদিকে ছিল নিয়ত কাজে ডুবে থাকার আনন্দ। অভিনেতার জীবনে যা কাম্য সেইরূপ পরিপূর্ণতায় ভরা ছিল মন। কিন্তু আজ মনে হয় সমগ্রভাবে দেখতে গেলে শিল্পীজীবনের দুটি বিপরীতধর্মী প্রবাহ আছে—যা একসঙ্গে দুটি বিভিন্ন ধারায় বয়ে চলে—এক ধারায় অমৃত, অন্য ধারায় বিষ। যখন শিল্পকর্মে অমৃতের জোয়ার ওঠে, তখন ব্যবহারিক জীবনে আসে সমস্যা আর বেদনার ঢেউ। আবার ব্যবহারিক জীবনে যখন সুখসমৃদ্ধি নেমে আসে তখন শিল্পক্ষেত্রে দেখা দেয় সংঘাতের তরঙ্গমালা।

কর্মজীবনে সাফল্যলাভ করলেও ১৯২৭ সাল আমার পারিবারিক জীবনকে করে তুলেছিল অশান্তিময়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং সমস্যাজর্জরিত। সংসার সম্বন্ধে যতই নির্লিপ্ত থাকি না কেন, সাংসারিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে তো সম্পূর্ণ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায় না। মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা যখন থিয়েটারের যাবতীয় কাজ সেরে রাত্রি দুটো-তিনটেয় বাড়ী গেছি। তারপর খেয়েদেয়ে শুতে প্রায় ভোর হয়ে যেতো। সেই কারণে স্বভাবতই সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে দেরী হোতো। বাড়ীতে থাকা আর কতক্ষণ। উঠে স্নান, খাওয়া-দাওয়া—আর একটু বইয়ে চোখ বুলোনো। ব্যস—এতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। দুপুর কাটতে না কাটতেই আবার থিয়েটারে চলে

যাওয়া। এর ওপর যখন শুটিং থাকত, তখন তো আর কথাই নেই। সকাল দশটার সময় ঘুম-চোখেই স্নানাহার সেরে স্টুডিওয় চলে যেতাম। সেখানে মেক-আপ চড়াবামাত্র আবার অন্য মানুষ হয়ে যেতাম, তারপর সারাটা দিন শুটিং করে ওখান থেকেই সোজা থিয়েটারে। সেখানে গিয়ে আবার অন্য কাজের মধ্যে মেতে যেতাম। তারপর যখন অধিক রাত্রে থিয়েটারের কর্মশেষে বাড়ী ফিরতাম তখন শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তো যেন। সুতরাং এই কর্মপ্রবাহের মধ্যে "ব্যবহারিক আমি"র অস্তিত্ব কোথায়, কতটুকু?

হয়তো বাবা আমাকে বুঝতেন, তাই অতো রাতে আমি দরজায় ধাক্কা দিলে তিনি এসে দরজা খুলে দিতেন। সঙ্কুচিতভাবে আমি বলতাম, 'তুমি কেন—এত রাতে—?'

বাবা বলতেন—আমি বুড়ো মানুষ—রাতে আমার ঘুমই হয় না—বৌমা ছেলে-মানুষ, সারাদিন খেটেখুটে ঘুমিয়ে পড়েছে—ও কি আর এত রাত্রি পর্যন্ত জেগে বসে থাকতে পারে? আর চাকর-বাকরের ওপর সব সময় বিশ্বাস করে থাকা যায় না। তারাও তো ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

বাবা ইদানিং কাজে বেরুতেন না, অর্থাৎ বয়সের জন্যে বেরুতে পারতেন না।

বাবা বললেন বটে বৌমা ছেলেমানুষ—রোজ রোজ এত রাত্রি পর্যন্ত কি জেগে থাকতে পারে? কিন্তু আসলে সুধীরা একরকম জেগেই থাকতো। আমি এসে কোনোদিন খেতুম কিছু, কোনোদিন হয়তো কিছুই খেতুম না—ও কিন্তু খাবারটি ঢাকা দিয়ে টেবিলের ওপর রেখে বসে থাকতো। আমার সঙ্গে সুধীরার কথাবার্তা বিশেষ হতো না। বাবার শরীর যে ভাল না তাও আমাকে জানতে দেওয়া হতো না একরকম। আমি কোনো কোনো দিন জিজ্ঞেস করলে জবাব পেতুম—ভালো—ডাক্তার দেখছে।

ব্যস, এই পর্যন্তই।

এই সময় মাঝে মাঝে বাইরে আমরা থিয়েটার করতে যেতাম। সেবার গিয়েছিলাম স্টারের হয়ে আসানসোলে। সেখানে বসেই প্রবোধবাবুর মুখে খবর পেলাম—আমার ভাই পঞ্চু এসেছিল থিয়েটারে আমাকে খুঁজতে।

হঠাৎ আমাকে খুঁজতে কেন? মনটা চিন্তিত হয়ে রইল।

কলকাতায় এসে জানতে পারলুম পঞ্চু হঠাৎ বিলেত চলে গেছে—তাই যাবার আগে আমার কাছে এসেছিল।

'বিলেত যাবো' 'বিলেত যাবো' বলে প্রায়ই সে বাবার কাছে আবদার ধরতো। এবার সে মন স্থির করেই ফেলেছিল তাই আমাকে জানাতে এসেছিল।

পরে শুনলাম, মাদ্রাজ মেলে সোজা গেছে মাদ্রাজ হয়ে কলম্বো। কলম্বো থেকে

জাহাজ ধরে একেবারে লণ্ডন। বাবার ডায়েরীতে লেখা আছে ২৫শে মে, ১৯২৭—পঞ্চু অ্যারাইভড অ্যাট লণ্ডন।

এদিকে ভাই চলে গেছে বিলেত, ওদিকে বাবার শরীর খারাপ। সুতরাং পারিবারিক অবস্থা আর বিশেষ কিছু না বললেও চলবে আশা করি।

সংসার সম্বন্ধে যতই কেননা উদাসীন থাকি, মনের উপর বেশ খানিকটা চাপ পড়ে বৈকি।

একদিন স্ত্রী আমাকে বললেন: দেখ, অন্য কিছু নয়, বাজার খরচ বাবদ তুটো করে টাকা আমায় রোজ দিয়ে যেও।

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। বাবা তো কখনো মুখ ফুটে আমার কাছে কিছু চাইবেন না জানি, এমন কি সুধীরাকে উনি বলে রেখেছিলেন, দেখ বৌমা, তোমার যখন যা দরকার তা আমার কাছে চাইবে। আমি শুধু তোমার শ্বশুরই নয়, বাপ বলো, ছেলে বলো—সে আমি।

সেজন্যে সুধীরা কোনোদিন আমার কাছে কিছু চাইত না, সুতরাং সে যখন আমার কাছে বাজার খরচের টাকা চাইছে, তখন নিশ্চয় টানাটানি চলছে এবং অত্যন্ত নিরুপায় হয়েই আমার কাছে চেয়েছে।

অবশ্য টানাটানি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাবা ব্যবসার কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ীতে বসে আছেন। এতে তো আর্থিক ক্ষতি হবেই। তা ছাড়া আমার নাম-ডাক যাই হোক না কেন, অর্থপ্রাপ্তির ব্যাপারটা তখনো এমন কিছু বলার মতো হয়নি।

যাই হোক সুধীরার কথামতো মাসে ষাটটি করে টাকা তার হাতে দিতে লাগলাম।

বাড়ীতে তখন আমাদের অনেকগুলো গরু ছিল, যথেষ্ট তুধ হতো। সেই তুধ থেকে মা সন্দেশ তৈরী করতেন, সুধীরা মাকে এ বিষয়ে সাহায্য করত। আর চাল-ডালের ব্যবস্থা ছিল বাবার—বাকী রইল শুধু বাজার। এই বাজার খরচ হিসাবেই ষাট টাকা আমি বরাদ্দ করেছিলাম।

এই রকম যখন সংসারের অবস্থা তখন পঞ্চু চলে গেল বিলেত। পঞ্চু ম্যাট্রিক পাশ করেছিল লণ্ডন মিশনারী স্কুল থেকে। কলেজে ভর্তি হয়ে ৪।৫ মাস পড়লো, কিন্তু লেখাপড়ায় ওর মন বসলো না। ও বাবাকে বলল—আর্ট স্কুলে পড়ব—ছবি আঁকা শিখব।

কিন্তু ও তো সাধারণ ছবি আঁকতে চায় না—ও চায় কমার্শিয়াল আর্ট শিখতে।

এই দিকেই ওর ঝোঁক। ওর বিলেত যাওয়ার উদ্দেশ্যই হলো ওখান থেকে ভালো করে কমার্শিয়াল আর্ট শিখে আসবে।

জয়পুর আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন কুশল মুখোপাধ্যায়—আমাদের বিশেষ পরিচিত। আমার কাছে আসতেন, নানারকম স্টেজের মডেল দেখাতেন। কমার্শিয়াল আর্ট তিনি শিখে এসেছিলেন বিলেত থেকে। সম্ভবত পঞ্চুর কমার্শিয়াল আর্ট শিখবার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তিনিই।

পঞ্চু ছিল একটু জেদী প্রকৃতির, ও যখন জিদ ধরেছে একবার, তখন না গিয়ে ছাড়বে না। বাবা একটু বেশীরকম ভালোবাসতেন পঞ্চুকে, ওর ওপর একটু বিশেষ দুর্বলতা ছিল বলা চলে, সেই জন্যে ওর বিলেত যাওয়ায় বাধা দিতে পারলেন না। কিন্তু আমি তো বাবার অবস্থা জানি—'প্যাসেজ মানি'টা হয়তো কোনো রকমে যোগাড় করে দিয়েছেন, কিন্তু তারপর ?

এইবার আমি সত্যি সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি যে কোথা থেকে কিভাবে টাকা পাব তা আমি নিজেই ভেবে পেলাম না। তার ওপর এত কাজের ভীড়ে প্রতি মাসে সময়মতো টাকা পাঠানোও তো এক মহা সমস্যার ব্যাপার।

সুধীরাকে একদিন ডেকে বললাম—দেখ, আমার পকেটে ব্যাগের মধ্যে যখন যা থাকে তার থেকে আন্দাজ করে সামান্য কিছু রেখে বাকীটা নিয়ে নিও সংসার খরচের জন্যে। হিসেবের দরকার নেই।

'সংসার' বলতে আমরা ক'জন, রাঁধুনি, ঝি, চাকর সবই ছিল। আর ছিল গরু। বাবা নিজে ওদের যত্ন করতেন, সেবা করতেন। ওদের জন্যে 'ক্রাসড্ ফুড' কিনে আনতেন হগ্ সাহেবের বাজারের পিছন থেকে। বাবা নিজের হাতে ওদের গা বুরুশ করে দিতেন—ওরাও বাবাকে দেখে শান্ত হয়ে থাকত। উনি ওদের এত যত্ন করতেন বলেই ওরা ছিল স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী।

এইসব কাজে আমাদের ছোটবেলার তারাপদ থাকলে অনেক সাশ্রয় হতো। কিন্তু সে এখন বৃদ্ধ হয়েছে, তার ভাইপোরা এখন আর কাজ করতে দেবে কেন ?

সে এখন দেশেই থাকে—দেশে থেকেই শুনতে পায় আমার নাম। তার আদরের 'খোকাসাহেব' এখন বড়ো বড়ো পার্ট করে, কতো নাম-ডাক হয়েছে তার। আমাদের ওপর তার মায়া এখনো পুরোমাত্রায় আছে। চিঠি দেয় মাঝে মাঝে, উত্তর না পেলে আবার অভিমানও করে।

হঠাৎ কখনো কখনো চলে আসতো কলকাতায়—এসে একনাগাড়ে ৩।৪ মাস থাকতো, তারপর আবার চলে যেতো। যখন এখানে থাকতো, তখন সবসময় আমার

ছেলেমেয়েদের কোলে করে বেড়াতো। আমার মেয়ে মীরার পা ছিল খুব নরম, সেই পায়ে ও দাড়িওয়ালা মুখ নিয়ে চুমু খেতো, বলতো—লক্ষ্মীঠাকরুণের মতো পা।

বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য হলেও সুধীরা ওর সামনে ঘোমটা টেনে কথা কইতো, তাও আবার একটু আড়াল থেকে। তারাপদ খেতে বসলে থামের আড়াল থেকে তদারক করতো সুধীরা। তারাপদ বলতো—না মা, শুতে যাও—তোমাকে আর দাঁড়াতে হবে না।

ভাত ঢাকা থাকতো ওর, নিজেই খুলে খেতো, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়তো—কেউ তদারক করলে ওর একটু অস্বস্তি হতো।

শুধু সুধীরা ওর খাবার সময় দাঁড়িয়ে থাকতো—কারণ ওর কর্তব্যজ্ঞানটা ছিল অসাধারণ। অগত্যা তারাপদ আর মানা করবে কি করে? খেতে-খেতে গল্প করত —আমাদের দেশে জানো বৌমা, চৌদ্দ হাত বলরাম হয়। পূজো হয় বলরামের। গাজন হয় সে-সময়। আর কি ধুমধাম—সে কি বলব তোমায় বৌমা!

বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলতো—বৌমা, অনেক রাত হয়ে গেছে—আর গল্প নয়, তুমি শুতে যাও।

কোনো কোনো দিন বলতো—'হ্যাঁ বৌমা, খোকাসাহেব নাকি বড়ো অভিনেতা? একদিন বলো না আমি দেখতে যাবো। আমার খোকাসাহেবের বক্তিমে শুনবো না একদিন?'

আমি তো ফিরতাম গভীর রাত্রে। সুধীরা আমাকে বলবার অবকাশই পেতো না।

এর কয়েক দিন পরে তারাপদ আবার জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ বৌমা, বলেছিলে?

সুধীরা মাথা নাড়তো। হয়তো কোনো সময় সে আমাকে বলেও ছিল, কিন্তু আমার খেয়ালই থাকতো না।

শেষ পর্যন্ত তারাপদর আর যাওয়া হতো না। তার খোকাসাহেবের বক্তিমে আর শোনা হলো না। এদিকে দেশ থেকে চিঠি আসতো ঘন-ঘন। একদিন সে চলে যেতো।

আবার হয়তো বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন এসে হাজির হতো। আবার বলতো—এবার খোকাসাহেবের বক্তিমে শুনবো।

সেবারও নানা কাজে তার আর যাওয়া হয়ে উঠতো না।

এইভাবেই চলতে লাগল আমাদের সংসারের রথচক্র—আর অন্য দিকে চলতে লাগল আমার মঞ্চ এবং নাটক।

এদিকে ১৯২৭ সালে ম্যাডান কোম্পানী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' তুলতে শুরু করলেন—এই তোলা শেষ হলো ১৯২৮ সালে গিয়ে। এতে আমি করলাম নগেন্দ্রনাথ। অন্যান্য ভূমিকায় ছিল—শ্রীশ—ইন্দু মুখার্জি, সূর্যমুখী—নিভাননী, কুন্দ—সরস্বতী, দেবেন্দ্র —তুলসী বন্দ্যোঃ, হীরা ঝি'র ভূমিকায় নামল বোম্বাই থেকে আগত একটি নতুন শিল্পী, তার নামটা আজ মনে নেই। পরিচালনা করেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সব ছবিতে কাজ করতে-করতেই মনে একটা প্রবল বাসনা হলো নিজস্ব চিত্র-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার।

ইচ্ছে তো হলো, কিন্তু টাকা কোথায় ? এতে অনেক টাকা দরকার। সাধ তো হলো কিন্তু সাধ্য কোথায় ? কল্পনায় তো অনেক কিছু করবার ইচ্ছা করে, কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত করবো কি করে, সেদিকে খেয়াল নেই।

যাই হোক, এইভাবে শেষ হলো আমার সুখ-দুঃখের দোলায় দোলানো ১৯২৭ সাল।

আটাশ সালের প্রথম পর্বই হলো পাকাপাকিভাবে আমার স্টারে থাকা। মনোমোহন থেকে 'আরবী হুর' স্টারে চলে এলো। 'আরবী হুর' ছাড়া আরও কাজ বাড়লো। এই সময় তিনকড়িবাবু অসুস্থ হয়ে ছুটি নিলেন, ফলে 'মগের মুলুকে' তাঁর পার্ট 'শাহসুজা' আমাকেই করতে হলো। 'মহম্মদ' করতো দুর্গাদাস, 'সন্ধ্যা' আগের মতো কুসুমকুমারীই করতে লাগলো, শুধু সরস্বতীর বদলে নীহারবালা করতে লাগল 'গুলবানু'।

১৯২৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর-এর একটা পুরনো বিজ্ঞপ্তিতে দেখেছি স্টারে আমি করছি 'আলমগীর'—এই সঙ্গে ছিল 'পাণ্ডবগৌরব'—এতে কুসুমকুমারী করতো সুভদ্রা, আর ওদিকে মনোমোহনে চলছিল 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—তাতে গোবিন্দলাল ছিল তুলসী বন্দ্যোঃ, ভ্রমর—সুশীলাবালা, তার সঙ্গে ছিল 'দুর্গেশনন্দিনী'—ওসমান —তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইভাবে আমাদের দুই থিয়েটারই চলতে লাগলো। আটাশ সালের গোড়ার দিকে স্টারে 'আলমগীর'-এর প্রতাপটাই ছিল খুব বেশী, সঙ্গে চলছিল 'আরবী হুর' আর 'মগের মুলুক'।

এর একমাস পরে মনোমোহনে থিয়েটার বন্ধ হয়ে চলতে লাগল বায়স্কোপ। পাঠকরা যেন মনে না করেন যে, থিয়েটারের অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্যে কর্তৃপক্ষ এখানে বায়োস্কোপ চালু করলেন। তখন বাঙালীর তোলা ছবি অবাঙালী হাউসে দেখানো খুব মুস্কিল হয়েছিল, তাই বাঙালীকে বাঙালী না দেখিলে কে দেখিবে।

এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মনোমোহনে ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে বায়োস্কোপ দেখানো শুরু হয়। ইস্টার্ন ফিল্ম সিণ্ডিকেট নামে একটি নবগঠিত বাঙালী প্রতিষ্ঠান শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' তুলেছিলেন—আট রীলের ছবি। উত্তর কলিকাতায় তখন কর্নওয়ালিশ সিনেমা ছাড়া তো আর হাউস ছিল না। ম্যাডান কোম্পানী নিজেদের ব্যবসা নষ্টের ভয়ে বাঙালীর তোলা ছবি দেখাতে রাজী হলেন না—তাই মনোমোহনের এই ব্যবস্থা। প্রত্যহ দুটি করে শো হতো—৬টা ও ৯॥টা। নাম-ভূমিকায় ছিলেন ফণী বর্মা এবং অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন তিনকড়িবাবু, নরেশবাবু, কনকনারায়ণ, নীহারবালা, মণি ঘোষ, তারকবালা (লাইট) প্রভৃতি।

মনোমোহনে যখন এই বায়োস্কোপ চলা আরম্ভ হলো তখন আমাকে সদলবলে বেরিয়ে পড়তে হলো উত্তরবঙ্গ সফরে।

ফিল্ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠার বাসনা মনে জাগলেও তা মনেই পুষে রেখে মত্ত হয়ে পড়লাম স্টারে অভিনয় নিয়ে। উত্তরবঙ্গের পর আমরা চললাম ঢাকায়, অবশ্য সোজা ঢাকা নয়, ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকা। ময়মনসিংহে আমরা প্রোগ্রাম শেষ করে আমাদের দল যখন ঢাকা রওনা হবার উদ্যোগ করছে, তখন আমি এক কাণ্ড করে বসলাম। ময়মনসিংহে থাকতেই গৌরীপুরের কথা শুনেছিলাম। সেখান থেকে কিছু দূরে মধুবন বলে একটি সুবৃহৎ বন আছে, সেখানে আবার বিরাট বিরাট অনেক জলাশয় আছে, যেখানে অজস্র পাখীর ঝাঁক নামে। ক'দিন এই হ্রদের মতন জলাশয় আর পাখীর কথা শুনতে শুনতে মন বড় অধীর হয়ে উঠলো। তখন বন্দুক কিনেছি নতুন, পাখী শিকারের নামে মনটা একেবারে নেচে উঠল।

সবাই বললে—আজ রওনা হবো ঢাকা—আর তুমি যাচ্ছ কিনা পাখী শিকারে ?

বললাম—ট্রেন তো আপনার ছাড়ছে গিয়ে সেই সন্ধ্যেবেলায়—আমি ঠিক সময়ে ফিরে আসব।

গেলাম শিকারে। খুব ভোরবেলায় উঠেই বেরিয়ে পড়া গেল। বেশ বড়ো বড়ো জলা। এপারে দাঁড়িয়েছি, ওপারে ধোপারা কাপড় কাচছে। জলাটা এত চওড়া যে ক্ষুদে ক্ষুদে দেখাচ্ছে এই সব ধোপাদের।

একটা ছোট্ট নৌকা নিয়ে চললাম জলার ওপর দিয়ে। উদ্দেশ্য সুবিধামতো জায়গা থেকে নৌকোয় দাঁড়িয়ে পাখী-শিকার। যাঁরা শিকারের উদ্দেশ্যে আসেন তাঁরা এইভাবেই শিকার করেন। এতেই সুবিধে।

কিছুক্ষণ চলার পর একটা সুবিধেমত জায়গায় এসে নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়লাম। আমি আগ্রহসহকারে জিজ্ঞেস করলাম, দেখ তো, দেখ তো কী হলো ?

মাঝি বললো—পড়েছে, পডেছে—একটা পডেছে।

—কিন্তু পডলে কী হবে, কোথা থেকে একটা চিল এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল সেটা। অতএব মারো চিলকে।

উত্তেজনার মুখে চিলকে তাক করে মারতে গেলাম। বন্দুক ছুঁডতে গিয়ে হলো এক বিপদ—এদিকে নৌকোর দোলানির সঙ্গে নিজে টাল সামলাতে না পেরে পডে গেলাম নৌকোর ওপর। ফলে হলো কি, ছররাগুলো জলের ওপর দিয়ে হুডকে ওপারে একটা ধোপার রগ ঘেঁষে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। একটুর জন্যে বেঁচে গেল লোকটা তাই রক্ষে—নইলে কি যে দারুণ ফ্যাসাদ হতো এখন ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

কপালের ঘাম মুছে মাঝিকে বললাম—আর নয় এবার ফেরো, আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।

মধুবন কি এখানে? চলেছি তো চলেছিই—এদিকে ট্রেনের সময়ও এগিয়ে আসছে—শেষকালে ট্রেন না ফেল করি!

যখন ফিরে এলাম তখন ঘডির দিকে তাকিয়ে দেখি আর সময় নেই। তাই আর বাডী না গিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলাম একেবারে স্টেশনে।

আমার খাস চাকর হল নীলু—আমি ভাবলুম যে আমার দেরী দেখে নীলু নিশ্চয়ই বুদ্ধি করে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে দলের অন্য সকলের সঙ্গে গাডীতে উঠে বসেছে।

আমি যখন স্টেশনে পৌছলাম তখন দেখি গার্ড সাহেব বাঁশী বাজিয়েছে, নীল পতাকা নাডছে—আর গাডীও সবে চলতে শুরু করেছে। আমি আর অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না দেখে সামনেই যে সেকেণ্ড ক্লাশ কামরাটা পেলাম তাতেই উঠে পডলাম। কিন্তু কি অদ্ভুত যোগাযোগ। সেই কামরাটা আমাদেরই লোকজনে ভর্তি। দলের সব মাঁতব্বররা মনের আনন্দে জাঁকিয়ে বসে গুলজার করছেন। আমাকে ওভাবে উঠতে দেখে ওঁরা আনন্দে ও বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন। মনে হলো এতক্ষণে ওঁরা যে অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন তা কেটে গেল।

একজন বললে—তুমি তো এলে কিন্তু তোমার নীলু যে এলো না—সে তো তোমার অপেক্ষায় বাড়ীতে বসে আছে।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম—সে কি? নীলু আসে নি?

—না, আমরা কতো বললাম, আমাদের সঙ্গে আয়, বাবু ঠিক গিয়ে হাজির হবে। কিন্তু ও তোমার বিছানা-বাক্স বেঁধে ঠায় বসে আছে—বললে, বাবু না এলে কি করে যাব?

—কী অনুগত দেখেছ—একেবারে ক্যাসাবিয়াঙ্কার দ্বিতীয় সংস্করণ। বাপ বলেছে এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, নড়ো না। জাহাজ পুড়ে গেল তবু ছেলে নড়লো না—জ্যান্ত পুড়ে মারা গেল। এইরকম সব রঙ-তামাশা হতে লাগলো।

আমি গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি যে ট্রেন তখনও প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে যায় নি, স্থানীয় লোকেরা যাঁরা স্টেশনে এসেছিলেন আমাদের বিদায় জানাতে তাঁদের একজনকে মুখ বাড়িয়ে বলে দিলাম, নীলু রয়ে গেল—দয়া করে তাকে যেন পরের ট্রেনেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আমরা ঢাকায় নামিয়ে নেবো।

তাঁরা সে অনুরোধ রেখেছিলেন। নীলু তার পরদিন সকালে এসে ঢাকা পৌছুলো।

ঢাকায় প্লে করছি, হঠাৎ কলকাতা থেকে একখানা টেলিগ্রাম গিয়ে হাজির—আমার বোন প্রতিমার হঠাৎ বিয়ে স্থির হয়েছে। টাকার দরকার।

আমি জানালাম টাকা পাঠাচ্ছি—আয়োজন কর, বিয়ের দিন পৌছুব।

প্রবোধবাবু আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁকে টেলিগ্রাম দেখিয়ে টাকার কথা বললাম।

উনি বললেন—কিছু টাকা নিয়ে তুমি চলে যাও। এখানে অবশ্য অসুবিধে হবে। তা হোক, কি আর করা যাবে? তুমি যাও, তোমার যাওয়া দরকার।

তাই হলো। বিয়ের দিন সকালে আমি কলকাতা এসে পৌছলাম। বাবার শরীর ভালো নয়, আমাকেই কন্যা-সম্প্রদান করতে হলো। এই দিনটা ছিল ৮ই মার্চ ১৯২৮—২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

এদিকে মনোমোহনে আবার বায়োস্কোপ থেকে থিয়েটার হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ 'দেবদাস'-এর প্রদর্শন শেষ হতে আবার 'পুনর্মূষিকোভব'। মনোমোহনে চলছে 'চাঁদসদাগর', স্টারে 'মগের মুলুক'।

পরদিন রবিবার স্টারে ছিল 'চাঁদসদাগর'। সুতরাং ঐ যে শনিবার স্টারে এলাম 'শাহ সুজা' করতে, সেই আমার বরাবর থেকে যাওয়া। মনোমোহনে তখন 'জয়দেব', 'লুলিয়া' এই সব হতে শুরু করলো।

এদিকে আবার ডিরেক্টরদের সঙ্গে প্রবোধবাবুর মতবিরোধ হতে লাগল। ঢাকা-সফরে টিকিট বিক্রয় হয়েছে বেশ, খরচও হয়েছে তেমনি আন্দাজে। কিন্তু লাভের ঘর একেবারে শূন্য কেন?

আমাকে ডেকে একজন ডিরেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন কথাটা। আমি কোনো উত্তর দিলাম না। এ-সব হচ্ছে যাকে বলে হায়ার পলিটিক্স—এ-সবের মধ্যে থাকতে আছে কখনও?

এই হলো প্রবোধবাবুর স্টার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার সূত্রপাত।

এ তো গেল থিয়েটারের কথা। এদিকে আমার মনের মধ্যে সেই সুপ্ত বাসনাটা আবার মাঝে মাঝে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল—মানে সেই নিজস্ব চিত্র-প্রতিষ্ঠান গঠনের কল্পনাটা। কথাটা যখনই মনে হয়, তখন কল্পনায় মন ছুটতে থাকে তীব্র গতিবেগে। মনে মনে প্রতিষ্ঠানের নামকরণও করে ফেলি—অহীন্দ্র ফিল্ম কর্পোরেশন।

এই সময় একটা ছেলেমানুষীর মধ্যে দিয়ে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। বিমল পাল ব'লে এক ভদ্রলোক এই সময়ে প্রায়ই স্টারে আসতেন—তিনি একটা দল নিয়ে স্টারে কিছুদিন অভিনয়ও করেছিলেন। বিমলবাবু ছিলেন কন্ট্রাক্টর এবং ফিল্মের ব্যাপারে খুব আগ্রহী। একটা ফিল্ম পত্রিকাও বার করেন—নাম 'বায়োস্কোপ'। স্টারে ঘুরতেন সেই পত্রিকার বিজ্ঞাপনের জন্য। ক্রমে আমার সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। একদিন রহস্যচ্ছলে ওঁকে বলে বসলুম—দাম পাবেন না, এরকম একটা বিজ্ঞাপন ছাপবেন?

বিমলবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন—ঠিক আছে—কি ছাপতে হবে বলুন।

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে আমি বললাম—অহীন্দ্র ফিল্ম কর্পোরেশন।

বলেছি—এই পর্যন্তই। তারপর আমি ব্যাপারটা একদম ভুলে গেছি। তারপর কয়েকদিন পরে একদিন হঠাৎ বিমলবাবু পত্রিকা নিয়ে এসে হাজির। দেখি ছেপে দিয়েছেন একটা বেশ বড়ো রকমের বিজ্ঞাপন—গঠিত হইতেছে—অহীন্দ্র ফিল্ম কর্পোরেশন, স্বত্বাধিকারী অহীন্দ্র চৌধুরী ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপন দেখে তো আমি অবাক।

উনি বললেন—আপনার অনারে দাম দিতে হবে না।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম—দামের কথা না-হয় ছেড়ে ছিলাম, কিন্তু এর পর?

আর এরপর! উনি তো হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন সেদিন, কিন্তু আমার হলো সমূহ বিপদ। লোকে এসে আমাকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো।

—হ্যাঁ মশাই, কোথায় জমি নিলেন? কোথায় স্টুডিও? কি ছবি হবে? কারা তুলছে? ইত্যাদি হরেক রকম প্রশ্ন।

তখনকার দিনে ছবির সিনারিও লেখা হতো একটা ছাপানো ফর্মে। আমি অতিষ্ঠ হয়ে লোকের কৌতূহল মেটাবার জন্যে 'অহীন্দ্র ফিল্ম কর্পোরেশনে'র নামে কিছু ফর্ম ছাপিয়ে নিলাম। অর্থাৎ ভাবটা হলো এই যে, সব হচ্ছে মশাই—তবে ধীরে ধীরে।

কী করি—যদি বলি 'না', তাহলে তো প্রেস্টিজ (আজকালকার ভাষায়) পাংচার্ড।

ও হরি, লোকের জ্বালাতন এতে আরও বাড়লো। তখন এই ঝামেলা থেকে পরিত্রাণ পেতে মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেললো। সেই সময় অভিনেতা রবি রায় প্রায়ই ছেলেকে কোলে করে নিয়ে এসে স্টারের বুকিং অফিসে বসতেন সকালবেলায় গল্পগাছা করবার জন্যে। তাঁকেই বলে ফেললাম কথাটা—'ওহে রবি, আমার কোম্পানীর কাস্টিং ডিরেক্টর হবে তুমি? বলো তো তোমার নামটা ছাপিয়ে দিই।'

রবিও বিশেষ কিছু না ভেবে বলে দিল—তা দিতে পারো।

দিলাম ছাপিয়ে ওর নাম। আর যাবে কোথায়, রবি তখন নাট্যমন্দিরে অভিনয় করতো—লোকে ধাওয়া করতে লাগলো সেইখানে।

এদিকে অনেককেই বলেছিলাম, স্টুডিও করবো—একটা জমি খুঁজে দিতে পারো? একদিন হঠাৎ খবর নিয়ে এল স্টারেরই কয়েকজন ইলেকট্রিসিয়ান আর অ্যাপ্রেনটিস যে, একটা ভালো জমি বাড়ীসুদ্ধ পাওয়া যেতে পারে উল্টাডাঙ্গায়।

মহা-উৎসাহে জমিসহ বাড়ীটা একদিন দেখে এলাম। বেশ বড়ো জমি—১০১নং উল্টাডাঙ্গা মেন রোড—উল্টাডাঙ্গা স্টেশনের ঠিক পূবদিকে। পরে ওখানে বিরাট কাঁচের কারখানা গড়ে উঠেছিল, এখন অবশ্য বাড়ীটা আর নেই। যাই হোক, জায়গাটা পছন্দ হলো আমার এবং সঙ্গে সঙ্গে লীজ নিয়ে ফেললাম।

দু'পাশে বড় বড় ধানকল—বিস্তৃত তার প্রাঙ্গণ। তার মাঝখানে আমার জমি—বাড়ীসুদ্ধ। জমিতে একটা পুকুরও ছিল। গেট থেকে মেন বিল্ডিং-এ পৌছুতে তিন-চার মিনিট সময় লাগতো—এর থেকেই বোঝা যায় জমির পরিমাণটা কতোখানি। বাড়ীর সামনে পুকুরঘাটটা ছিল সানবাঁধানো, দু'পাশে বসবার বড়ো বেদী। দু'পাশে দু'টি বিপুলকায় বকুলগাছ ছিল। বকুল ফুটলে সেই বকুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠত।

বাসগৃহ নির্মাণ আপাততঃ রইলো—শুরু হলো স্টুডিও নির্মাণের এলাহি প্রস্তুতি। দৌড়ঝাঁপ, ছুটোছুটি আমাকে কিছুই করতে হয় না—ছেলেরাই মহা-উৎসাহে সব করে। কিছু বলতে গেলে বলে—আপনি চুপ করে বসে দেখুন না স্যর, আমরা সব করে দিচ্ছি।

প্ল্যানটা অবশ্য প্রায় সবটাই আমার কিন্তু সে তো কাগজে-কলমে। ওরা সেটাকে রূপ দিতে শুরু করলো। একেবারে সর্বাধুনিক বিলাতী স্টুডিওর অনুকরণে তৈরী হতে লাগল আমার স্টুডিও। ওভারহেড ট্যাঙ্ক বসলো, প্লাম্বিং মিস্ত্রীরা কাজে লেগে গেল। দেড় ইঞ্চি পাইপ বসানো হতে লাগল। ল্যাবরেটরীর ডার্করুমের জন্যে জল চাই, টিউবওয়েল বসানো হল, কারণ পুকুরের জলে তো আর ফিল্ম ডেভেলাপ হতে পারে না। টিউবওয়েল থেকে জল উঠিয়ে ট্যাঙ্কে ভর্তি হবে, সেখানে জল পরিস্রুত হবে,

তারপর সেই জল ল্যাবরেটরীতে যাবে—তারও ব্যবস্থা হলো। এলাহি কাণ্ড—আমি যেন শুধুমাত্র দর্শক—ওরাই সব করে।

স্টুডিও তো তৈরী হতে লাগল—এই ফাঁকে একটু থিয়েটারের কথা বলে নিই।

এই সময় মন্মথ রায়েরই আর একখানা নাটক খোলা হলো স্টারে—নাম 'দেবাসুর'। প্রথম অভিনয়-তারিখ—২৮শে এপ্রিল, ১৯২৮।১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৫।

'দেবাসুর'কে বৈদিক নাটক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া আমরা আরো একখানা বৈদিক নাটক করেছিলুম—'ঋষির প্রেম'। কিন্তু সেটি ছিল তপোবন-কেন্দ্রিক। ঋষিদের তপোবনের জীবন—তাদের সংসার এবং দৈনন্দিনতার পরিচয়—এই ছিল তার উপজীব্য বিষয়। কিন্তু তার সঙ্গে এ-নাটকের প্রভেদ প্রচুর। রসের দিক থেকেও বটে, আবার বিন্যাসের দিক থেকেও বটে। তাছাড়া পৌরাণিক নাটকের প্রধান উপকরণ হলো ভক্তি ও করুণ রস। এখানে তা অনুপস্থিত। এখানে ভক্তিও নেই, কারুণ্যও নেই—এ-নাটক শুধু বুদ্ধিজীব্য, এবং কিছুটা প্রতীকীও বটে। দধীচির আত্মদান ও অস্থিই সেই প্রতীক। নিপীড়িত জনগণের শক্তি—প্রেরণার উৎস।

এই কিছুদিন আগেও ভিয়েতনামে বৌদ্ধ নিপীড়নের প্রতিবাদে কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী পর পর স্বেচ্ছায় অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশকে।

কিন্তু কী সে শক্তি যার বলে মানুষ এভাবে আত্মোৎসর্গ করতে পারে? এই শক্তির স্বরূপের কথাই নাট্যকার বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন নাটকে।

কিন্তু তখনকার দিনে এইরকম বুদ্ধিজীব্য বিষয় দর্শকে তেমন নিলো না, কয়েক রাত্রি চলার পর 'দেবাসুর'কে স্থানত্যাগ করতে হয়েছিল। যদিও সকলের অভিনয় হয়েছিল খুব সুন্দর।

এই নাটকের কাহিনী-বিশ্লেষণে এবং চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকার কল্পনারই আশ্রয় নিয়েছিলেন বেশী।

বেদে পাওয়া যায় শচী দানবকন্যা। পৌলমী ওঁর অপর নাম। নাট্যকার এই ইঙ্গিতটিকে প্রধানতম নাট্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দানবকন্যা বিবাহ করেছেন দেবতাকে। বৃত্রাসুর শক্তিমান হয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকার ক'রে পেতে চান পৌলমীকে। এই চাওয়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বৃত্রাসুরের অত্যাচার, দধীচির আত্মত্যাগে যে-শক্তির দমন ও ইন্দ্রের পুনরুত্থান।

আমি করতাম বৃত্রাসুর। ইন্দ্র—মণি ঘোষ, দধীচি—নরেশ ঘোষ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ইন্দু মুখার্জি ও সুশীল ঘোষ, ত্বষ্টা—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, বলাসুর—সন্তোষ দাস, শচী—নিভাননী, উষা—নীহারবালা, সূর্যা—সুশীলাবালা।

বৃত্রাস্বররূপে আমাকে মানাতো ভালো। মেক-আপ করে কস্ট্যুম পরবার পর আমাকে বৃত্রাস্বর ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। দধীচির অস্থি দেখে আঁতকে উঠে বৃত্রাস্বরের একটা পলায়ন-দৃশ্য ছিল। অস্থির দিকে দুটি বিস্ফারিত চোখ রেখে ভীত-সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে পিছনে হটতে হটতে ঠিক সময়মতো এক সময় পিছু-হটা অবস্থাতেই স্টেজের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতাম। মনে আছে লোকের খুব ভালো লেগেছিল এটা।

অথচ আমাকে সময় ঠিক রেখে ভিতরে ভিতরে সতর্ক হয়ে প্রস্থান করতে হতো। আমার পিছন দিকে উঁচু ঢিবির মতো দেখানো থাকতো যেন পাহাড়ের অংশ। সেটা পাহাড়ের পাথরের চাঁই। মনে হতো যেন পাহাড়ের কোলেই দৃশ্যটি অভিনীত হচ্ছে। জায়গাটা উঁচু-নীচু, আর প্রস্থান-পথটা ছিল সরু কাঠের ওপর দিয়ে। পিছু হটবার সময় মনে রাখতে হতো যেন একপেশে হয়ে পড়ে না যাই। পিছনে তাকাতে পারব না—শুধু পায়ের স্পর্শ দিয়ে বুঝে নিতে নিতে যেতে হতো।

যাক, 'দেবাস্বরে'র প্রথম রজনী হয়ে গেল। তারপর ২রা জুন মনোমোহনে 'শ্রীরামচন্দ্র' ও 'মগের মুলুক' হলো। তিনকড়িবাবু ফিরে এসেছেন এতদিনে। তিনি মনোমোহনে 'শ্রীরামচন্দ্রে' আমারই পার্ট 'দশরথ' করতে লাগলেন। আর 'রাবণ' করতে লাগলেন দুর্গাপ্রসন্ন বসু। আর 'মগের মুলুকে' তিনকড়িবাবু নিজের 'শাহ-স্বজা'র পার্টটাই করতে লাগলেন। ২রা জুন ওখানে ঐ ব্যাপার, আর স্টারে হতে লাগল নির্বাচিত নৃত্যগীত, রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট নাটক 'বশীকরণ' ও 'চিরকুমার সভা'। শেষোক্ত নাটকে 'অক্ষয়' করতেন তিনকড়িবাবু, অর্থাৎ ওখানে দশরথ করার পরই এখানে এসে করতেন 'অক্ষয়'।

এইভাবে আমি স্টারে রয়েছি, 'দেবাস্বর' ছাড়া উল্টে-পাল্টে নানান বই হতে লাগল—অবশ্য সবই এখানকার অভিনীত বই।

মিনার্ভা এই সময় খুলেছিলেন অমৃতলাল বসুর 'যাজ্ঞসেনী'—৫ই মে, ১৯২৮। এই বইখানিও বেশী দিন চলেনি, তার কারণ প্রথমতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা, তারপর ভাষাও ছিল অত্যন্ত দুর্বোধ্য। অর্থাৎ মানে বুঝতে গেলে অভিধানের সাহায্য নিতে হয়।

এর পরে আমরা নতুন নাটক খুললাম, শরৎচন্দ্রের 'রমা' ('পল্লীসমাজে'র নাট্যরূপ)—৪ঠা আগস্ট। এই নাটক সম্বন্ধে হরিদাসবাবুর চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। তিনকড়িবাবু ছিলেন আমাদের মধ্যে প্রধান, কিন্তু তিনি বয়েস হয়েছে বলে রমেশ করতে চাননি। সেইজন্যে বইটা বেশ কিছু দিন পড়ে ছিল, এইবার হরিদাসবাবু আমাকে বললেন 'রমেশ' করবার জন্যে। যদিও চরিত্রটি আমার পছন্দ

হয়নি, তবুও চক্ষুলজ্জার খাতিরে 'না' বলতে পারলুম না। এক তো প্যাসিভ চরিত্র, তার উপর প্রেমানুভূতির প্রকাশ—এসব আমার ঠিক আসে না। জ্যেঠাইমা করেছিলেন—তারাসুন্দরী, বেণী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গোবিন্দ—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, আকবর —মণি ঘোষ, রমা—নীহারবালা, ভৈরব—ননীগোপাল মল্লিক, ধর্মদাস—নরেশ ঘোষ।

দৃশ্যপট সুন্দর, ছোটোখাটো পার্টগুলো সুন্দর হয়েছিল কিন্তু 'রমেশ' আমার মনের মতো হলো না। আমার ধারণায় জীবনে যত অভিনয় করেছি, তার মধ্যে 'রমেশ'-এর মতো খারাপ কখনো করিনি।

ঠিক এর পরেই মিনার্ভা খুলল তরুণ নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'সত্যের সন্ধান'—এ-নাটকখানি খুব জমে গিয়েছিল। বিশেষ করে কেষ্টবাবুর দু'খানি গান—'আমার কবিতা হারায়ে ফেলেছি' ও 'স্বপন যদি মধুর এমন', আজকের ভাষায় হলো সুপারহিট। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিল অরিন্দম—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, চন্দন —ভূমেন রায়, সারঙ্গদেব—কার্তিক দে, পুরোহিত—প্রভাত সিংহ, কবি—কৃষ্ণচন্দ্র দে, অধীরা—শশিমুখী, পিয়ারী—আঙুরবালা।

স্টারে ১৬ই আগস্ট আবার 'রাজসিংহ' খুললো। 'রাজসিংহে' আমি আগে করতুম ঔরংজেব, এখন কর্তৃপক্ষ আমাকে নামভূমিকায় নামতে বললেন। তখন একটা রেওয়াজ ছিল যে, ভূমিকা অদল-বদল করে অভিনয় করা। ওঁরা সেই রেওয়াজ ধরেই আমাকে বদলালেন। আমার মনটা খুঁতখুঁত করলেও ওঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না।

অগত্যা রাজী হতেই হলো। হেড ড্রেসার যে ছিল, সে খুঁজে খুঁজে বের করল অমৃত মিত্র যে-পোষাক পরতেন 'রাজসিংহে' সেই পোষাক। বাঘের ছালের পোষাক —জামা, প্যাণ্ট, সব। এই পোষাকটা আমার পছন্দ হলো। আমি বললাম—ঠিক আছে, এইটেই পরবো।

'রাজসিংহে' অন্যান্য ভূমিকায় নেমেছিল মোবারক—দুর্গাদাস, অনন্ত মিশ্র—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জেবউন্নিসা—নীহারবালা, চঞ্চলকুমারী—সুশীলাবালা।

কিছুদিন চললো এইভাবে।

এদিকে পুজো এসে গেল। পুজোর সময় নতুন বই খুলতে হবে। কে লিখবে নাটক? অপরেশবাবু কলম ধরলেন—কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী নিয়ে তিনি নতুন নাটক লিখলেন 'ফুল্লরা'। এ-নাটকের উদ্বোধন হলো মহাসপ্তমীর দিন—২১শে অক্টোবর, ১৯২৮।

ভূমিকালিপি ছিল এইরকম: কালকেতু—আমি, মহাদেব—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী,

ভাঁড়ু দত্ত—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, পার্বতী—শান্তবালা, পদ্মা—সুশীলাবালা, ফুল্লরা—নীহার-বালা, নারদ—তুলসী চক্রবর্তী, যুবরাজ—সন্তোষ দাস।

'ফুল্লরা'য় নাচ ছিল—এই নাচ নীহারকে শিখিয়েছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। নীহার নিজে একজন নামকরা নাচিয়ে ছিল। কিন্তু সে নিজে যে-স্টাইলে নাচতো, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা স্টাইলে নাচ শিখিয়েছিলেন মণিলালবাবু। নিজের জিনিসকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে একেবারে অন্য জিনিস গ্রহণ করার মধ্যে বিরাট শক্তি ও সাধনার প্রয়োজন। এইটাই ছিল নীহারের বিশেষত্ব। নতুন কিছু পেলে—কি নাচে, কি গানে, কি অভিনয়ে—সব সময়ই ও আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছে। কখনও কোনোরকম অহমিকা প্রকাশ করেনি।

মণিবাবু ওর পায়ে ঘুমুর দিলেন না। ঘুমুরের বদলে ও পায়ে পরলো 'আধলা'কে (তখনকার দিনে আধ-পয়সা চালু ছিল) ফুটো করে মালা গেঁথে। তার উপর পায়ের গয়না হিসেবে পরেছিল পলা। দেখলে মনে হতো যেন আধলার ওপরে পাড় বসানো হয়েছে। এই পয়সার নূপুরে ঝংকারটাও নতুন এবং আওয়াজটাও ভারী মিঠে। আর নাচের ভঙ্গী যে আলাদা—এ-কথা তো আগেই বলেছি।

'ফুল্লরা'র প্রথম প্রবেশের মুখে নাট্যকার বর্ণনা দিয়েছেন—'বুকে গাছের ছাল আঁটা, পরনে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম, মুক্ত কেশরাশিতে বনফুল জড়ানো। গায়ে পলা ও রক্তিম পাথরের গয়না। এই বর্ণনা থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন ফুল্লরার সাজ-পোষাকের ব্যাপারটা।

'ফুল্লরা'র সেট-সেটিংসের ব্যাপারেও খুব অভিনবত্ব ছিল। ম্যাজিসিয়ান রাজা বোসের নাম আমি আগেই করেছি। সেই রাজা বোসই এসে গেলেন এই সেট-সেটিংসের ব্যাপারে, যদিও প্রবোধবাবুর ইচ্ছে ছিল না রাজা বোসের আসায়। রাজা বোস আমাদের অন্যতম ডিরেক্টর কুমারবাবুর লোক, প্রবোধবাবুর ভয় ছিল লোকটা কুমারবাবুর কাছে গিয়ে যদি কিছু লাগানি-ভাঙানি করে তো মুস্কিল। লোকে বলত ওর নাকি এর কথা তাকে, আর তার কথা একে বলা স্বভাব। প্রবোধবাবুর সঙ্গে ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের একটু মন-কষাকষি শুরু হয়ে গিয়েছিল—আবার প্রবোধবাবুর বিরুদ্ধে সব স্যাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্যেই রাজা বোসকে পাঠান হয়েছে কিনা কে জানে?

রবিবার আমাদের 'ফুল্লরা' খোলা হবে, আর শুক্রবার দেখলাম চলতি নাটকের সঙ্গে রাজা বোসের ম্যাজিক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রবোধবাবুর দিক থেকে প্রবল বাধা উঠলেও রাজা বোস রয়ে গেলেন স্টারে।

এতে কিন্তু আমার একটা খুব সুবিধে হলো। ফুল্লরায় দুটো 'ট্রিক' সিন ছিল—সে দুটো অতি চমৎকার করেছিল রাজা বোস।

এ দুটো 'সিনে'র একটা এমন কিছু মারাত্মক নয়—কারাগার থেকে লোহার শিক বেঁকিয়ে কালকেতুর পলায়ন।

কিন্তু অন্যটি ছিল বেশ শক্ত—এই দৃশ্যটি লেখাও হয়েছিল চমৎকার, আর জমতোও অদ্ভুত। 'চোখ গেল, চোখ গেল—কেন রে পাখী কাঁদিস অমন কাতর করুণ স্বরে' বলে একখানি গান গাইত নীহার। এ গানটির সুর দিয়েছিলেন জানকী বসু। সুরও যেমন সুন্দর হয়েছিল, নীহার গেয়েছিলও তেমনি দরদ দিয়ে। গানের পরে কালকেতু ধনুকের গুণে বেঁধে নিয়ে এল একটি গো-সাপ। ফুল্লরা দেখে বললে—ভারী সুন্দর তো এটা। একেবারে কাঁচা সোনার রঙ। ওকে মারবো না, পুষবো।

বলে কুঁড়ে ঘরের ভেতরে সাপটাকে রেখে ঝাঁপ বন্ধ করে দিল।

কিছুক্ষণ পরে ঝাঁপ খুলতেই দেখা গেল কোথায় গো-সাপ! সেখানে বসে আছেন এক পরমাসুন্দরী কন্যা, তিনি বসে মৃদু মৃদু হাসছেন। যাঁরা মঙ্গলকাব্য পড়েছেন, তাঁরা বুঝবেন যে 'গোধিকা'র রূপ ধরে কালকেতুর ঘরে যিনি এসেছিলেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং পার্বতী। ছদ্মবেশিনী পার্বতীর সঙ্গে ফুল্লরার সরস কথোপকথন যা নাট্যকার লিখেছেন তা খুব উপভোগ্য। তার কিছু কিছু তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

পার্বতী স্বামীর পরিচয় দিতে দিতে বললেন—

> কভু দিগম্বর
> নাহি ঘৃণা লজ্জাডর
> কর্মহীন ফেরে স্বেচ্ছাধীন···
> ···চিতা-ভস্ম অঙ্গের ভূষণ,
> ওগো সব লয়ে শ্মশানে-মশানে ফেরে
> নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষ্ণা—অজর, অমর।

ফুল্লরা। আদেষ্ট। সে কি পাগল। আর তোমার বাপ-মাই বা কী? দেখে-শুনে তোমায় এমন পাগলের হাতে দিয়েছে। তার পরে পার্বতী বলছেন—'আমি এ-কুটীরে রব আজি হতে।'

শুনে ফুল্লরা স্বগত উক্তি করছে—ওমা! আমার মাথা খেতে এ কী কথা বলে গো?···আমি জেনে-শুনে এই সুন্দরী, ঘোর যুবতীকে আমার ঘরে ঠাঁই দেব?

ফুল্লরা অনেক বোঝালো, কিন্তু দেবী নাছোড়বান্দা, তিনি কিছুতেই যাবেন না ওদের ঘর ছেড়ে।

তার পর এলেন কালকেতু। এখানে ফুল্লরার মনোগত ঈর্ষার ভাব নিয়ে নাট্যকার মাধুর্যে, ব্যঞ্জনায় অপূর্ব রস পরিবেশন করেছেন। অভিজ্ঞ নাট্যকার, বেশী বাড়াবাড়ি করেননি। একটু পরে কালকেতু নিজেই এগিয়ে গিয়ে মহিলাটিকে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন। তিনি বললেন—'এভাবে পরের বাড়ীতে থাকলে লোকে মিথ্যাবাক্য রটনা করতে পারে, আপনি বাড়ী যান।'

উত্তরে পার্বতী নিরুত্তর, মৃদু-মৃদু হাসছেন শুধু।

এখানে নাট্যকার কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের আসল লাইন ক'টি কালকেতুর মুখে বসিয়ে দিয়েছেন—

'পুরনো বসন ভাতি অবলাজনার জাতি
রক্ষা পায় অনেক যতনে।'

কালকেতু বললেন—'কোথায় আপনার ঘর বলুন, আমি আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

তবু দেবী নিরুত্তর—মুখে মৃদু হাসি।

কালকেতু তখন রেগে গিয়ে ধনুকে তীর যোজনা করলেন, বললেন—এভাবে পর-পুরুষের ঘরে এসে থাকা অন্যায়, আমি বিনাশ করব।

তখনো জনসাধারণের মন থেকে ভক্তিভাব বিদূরিত হয়নি। তাঁরা দেখছেন কালকেতু জগজ্জননীর ওপরে তীর নিক্ষেপে উদ্যত। তাদের মন এইখানে এক অপূর্ব রসে ভরপূর হয়ে উঠত। তাদের মন যেন বলত—আরে, কাকে মারছিস? এঁর গায়ে আঘাত করবি তোর সাধ্য কি?

এর পরে কালকেতু যখন সত্যিই তীর মারতে গেলেন তখন কালকেতুর তীর আটকে গেল অলৌকিক ভাবে। তিনি অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলেন—কে তুমি?

—কে আমি!

বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন ছদ্মবেশিনী পার্বতী। আর তার পরমুহূর্তেই কি দেখলেন কালকেতু আর ফুল্লরা?

দশভুজা দাঁড়িয়ে আছেন দশ হাত মেলে—মাথায় স্বর্ণকিরীট ঝলমল করছে, ডাইনে-বামে লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ।

পরক্ষণেই 'ড্রপ'। আর সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে আর লোকের প্রশংসাধ্বনিতে ভেঙে পড়তো প্রেক্ষাগার।

মাত্র এই দৃশ্যটি দেখবার জন্য খুব ভীড় হতো দর্শকদের। দৃশ্যটি হতো সত্যিই অদ্ভুত—আর এর সমস্ত কৃতিত্ব রাজা বোসের। এ সিনটি ছিল এমনিই চমকপ্রদ।

লোকে ভেবে পেত না যে এরকম একটি ইলিউশান মুহূর্তের মধ্যে হতো কী করে !

স্টেজের আলো কিন্তু নিভতো না, পূর্ণ আলোকচ্ছটার মধ্যেই দৃশ্যটি পরিবর্তিত হতো। কোনো 'ডামি' নয়—যিনি পার্বতী করতেন, তিনিই থাকতেন মঞ্চে, মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে যেতেন।

অথচ জিনিসটা এমন কিছু কঠিন নয়, মঞ্চচাতুরী মাত্র। কুটীরের পশ্চাৎপটে থাকতো কালো ভেলভেটের পর্দা, স্টেজের আলো সেখানে তেমন যেতো না, তারই আড়ালে পটে জীবন্তভাবে কাট-আউট করা থাকতো লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ। এর প্রত্যেকটি খণ্ড কালো ভেলভেট দিয়ে ঢাকা।

অভিনয়ের সময় পার্বতী নির্দিষ্ট একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেন। ভেলভেটের পর্দা আর তার-এ বাঁধা কুটীর সরে যেত এক লহমায়, সঙ্গে সঙ্গে বাকী সবকিছু দৃশ্যমান হয়ে পড়তো। পার্বতীর মুকুট, আরও ৮টি হাত, সিংহ, অসুর মায় চালচিত্রটি পর্যন্ত। এসবগুলো আগে থাকতেই যথোপযুক্ত স্থানে পর্দার আড়ালে সাজানো থাকতো। ব্ল্যাক-আর্টের ব্যাপার আর কি।

এই গেল ফুল্লরার কথা। তারপর হলো বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'—নাট্যরূপ দিলেন অপরেশচন্দ্র। ৫ই ডিসেম্বর থেকে 'রজনী' সুরু হয়েছিল। আমি করতাম 'অমরনাথ', লবঙ্গলতা—নীহারবালা, হীরালাল—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রামসদয়—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, রজনী—ছোট সুশীলা, শচীন্দ্র—সন্তোষ সিংহ।

সন্তোষবাবু আগে স্টারে ছোটখাটো কি বড়জোর মাঝারি ধরনের ভূমিকা করতেন, 'হিরো'র ভূমিকায় এই প্রথম। সেজন্যে অনেকেরই সন্দেহ ছিল ঠিকমত ভূমিকাটি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন কিনা—কিন্তু অভিনয় দেখার পর সকলেই খুশী হলেন—চমৎকার উৎরে গেলেন সন্তোষ সিংহ।

ছোট সুশীলা নামভূমিকায় (অন্ধ ফুলওয়ালী) যা করেছিলেন তা এককথায় অপূর্ব। 'লবঙ্গলতা' রূপে নীহারের অভিনয়ের তো কথাই নেই। কুঞ্জবাবু ও মনোরঞ্জনবাবুও বেশ ভালোই করেছিলেন। আমার ভূমিকাটি নিজ-মুখে কী করেই বা বলি—তবে অভিনয় খুব সংযত হয়েছিল এইটুকু বলতে পারি। তদানীন্তন পত্র-পত্রিকা সমালোচনায় ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। বাহুল্যবোধে সেই সব সমালোচনা আর এখানে উদ্ধৃত করলাম না। আমার ব্যক্তিগত ধারণায়, 'অমরনাথ', 'লবঙ্গলতা'র সঙ্গে যে সিনগুলো ছিল সেগুলো, আরও একটু সংযত হলে ভাল হতো।

'কালকেতু' আর 'রজনী' দুখানা বই একসঙ্গে চলতে লাগল। দুটো সম্পূর্ণ

বিপরীতধর্মী চরিত্র। 'কালকেতু' হলো বুনো মোষ, আর 'অমরনাথ' হলো ধীর-স্থির শান্ত। রিয়ালিস্টিক নাটকের চরিত্রায়নে, অভিনয়ে সংযমটাই বড কথা। এটা দিনের পর দিন ধরে আমি বুঝতে শিখেছিলাম।

'রজনী' বেশ কিছুদিন চলার পরে বড়দিনের আসরে ধরা হলো ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শাঁখের করাত'। এই বইখানি খুব জমে গিয়েছিল। ঐ নাটকে আমি অবশ্য কোনো অংশ গ্রহণ করতাম না। প্রধান ভূমিকা অর্থাৎ জামাই 'নন্দন'-এর ভূমিকায় সন্তোষ দাস (তুলো) স্থন্দর অভিনয় করতেন। রাজা—কুমার কনকনারায়ণ, মন্ত্রী—তুলসী চক্রবর্তী, রাজপুরোহিত—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, কালিন্দী—সরস্বতী, জামাইয়ের বন্ধু স্থরদাস—সন্তোষ সিংহ, আরেক বন্ধু কেশব—জহর গাঙ্গুলী।

নাটকখানি যেমনি কৌতুকপ্রদ তেমনি শিক্ষণীয়ও ছিল। লোভ যে মানুষকে কতটা অমানুষ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে বহু মানুষের অশান্তির কারণ হতে পারে, 'শাঁখের করাতে' তাই দেখানো হয়েছিল।

এতক্ষণ স্টারের কথা বললাম—এবার বলি অন্য থিয়েটারের কথা।

মিনার্ভা নতুন নাট্যকার শরৎচন্দ্র ঘোষের 'জাতিচ্যুত' খুললো বড়দিনের সময় ২২শে ডিসেম্বর '২৮। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা। রাজা যদু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দীন হয়ে যান, সেই কাহিনী। এর মধ্যে যদুর মা'র একটি পার্ট ছিল—করতেন নগেন্দ্রবালা। কি অপূর্ব অভিনয়ই করতেন নগেন্দ্রবালা! আমি পরে যখন মিনার্ভায় যোগদান করি, তখনও মাঝে মাঝে 'জাতিচ্যুত' হয়েছে। তখন দেখেছি নগেন্দ্রবালা কি অদ্ভুত জীবন্ত অভিনয় করতেন। ওঁর সম্বন্ধে গল্প শুনেছি যে স্টারে যখন অমৃতলাল বসু নাট্যরূপায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' হয়েছিল তাতে নগেন্দ্রবালা 'শৈবলিনী'র জন্য নির্বাচিতা হয়েছিলেন। মহলা দেওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তিগত কারণে শেষ পর্যন্ত 'শৈবলিনী' আর করেননি, অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। 'জাতিচ্যুত' দেখে বুঝলাম কেন এতো মেয়ে থাকতে এঁকেই শৈবলিনী করতে ডাকা হয়েছিল। 'জাতিচ্যুত'র যদুর মা'র মধ্যে সেই শৈবলিনীর দুরূহ অংশের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছিলাম ওঁর বৃদ্ধ বয়সে। পরে অবশ্য উনি শৈবলিনী করেছিলেন এবং তা প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

ওঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হতে আমি ওঁকে এই কথাটাই বলেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে হাসিতে ভরে উঠেছিল, কিন্তু এত বিনয় যে সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার উপক্রম করতেই, আমি ওঁর হাত ধরে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিলাম—ছি-ছি—এ কী করছেন?

উনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন—আপনি এতো বড়ো অ্যাক্টর, আপনি প্রশংসা—

আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম—আমার থেকে আরও বড়ো বড়ো অ্যাক্টর প্রশংসা করে গেছেন আপনার যৌবনকালের অভিনয় দেখে—সেসব আমি নিজের কানে শুনেছি।

উনি মুখ নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এইরকম ছিলেন তখনকার দিনের অভিনেত্রীরা। যে সত্যিকারের বড়ো, তার মধ্যে অহমিকা বা আত্মম্ভরিতা থাকে না, তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ হল বিনয় এবং তা চরিত্রটিকে মহনীয় করে তোলে।

যাই হোক, নগেন্দ্রবালার কথা ছেড়ে আবার আগের কথায় ফিরে আসি। স্টারে মাঝে মাঝে 'সাজাহান' হয়, 'কর্ণার্জুন'ও হয়। 'সাজাহানে' নাম-ভূমিকায় আমি, আর ঔরঙ্গজেব করতো দুর্গাদাস। দুর্গাদাস ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় কখনো নেমেছিল একথা তেমন শোনা যায় না, কিন্তু সে যে ঔরঙ্গজেবের একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়েছিল এটা বলবার জন্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম।

'কর্ণার্জুনে' শকুনি করতেন মনোরঞ্জনবাবু, কর্ণ করতাম আমি, পরে দুর্গাদাসও করতো। তাছাড়া মাঝে মাঝে 'হরিশ্চন্দ্র' হয়েছে—নাম-ভূমিকায় নামতেন কুঞ্জলাল চক্রবর্তী।

হ্যাঁ ভাল কথা, একটা প্রয়োজনীয় খবর দিতে আপনাদের ভুলে গেছি। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি অভাবিত বজ্রপতন ঘটে গিয়েছিল—এই বছরেরই জুলাই মাসে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ পরলোকগমন করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৬৪ বছর হয়েছিল।

মনোমোহনে এখন অনাদি বসু মশায় সিনেমা চালিয়ে যাচ্ছেন, আমিও অবসরমত কখনো-সখনো যেতাম। বসে-বসে অনাদিবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতাম। স্টুডিও তো গড়ে তোলা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সিনেমা-হাউসও চাই যে! এখন যেটা লিবার্টি সিনেমা তখন সে জায়গাটা ফাঁকা পড়ে ছিল। অনাদিবাবু বললেন—ওটা পাওয়া যেতে পারে চেষ্টাচরিত্র করে। নেবেন?

উনি এমন ভাব দেখালেন যেন আমি একাই নেবার মালিক।

তবে এটা ঠিক, অনাদিবাবু সিনেমা-হাউস তৈরী করবার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে পড়লেন। তোড়জোড় করতে লাগলেন।

এইসব পরামর্শের ব্যাপারে মনমোহনে আমি মাঝে মাঝে যাই। একদিন গিয়ে

দেখি প্রবোধ গুহমশাই ওখানে ঘোরাঘুরি করছেন। সবিস্ময়ে বললাম—আপনি এখানে ?

একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন প্রবোধবাবু। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—না, এই সব দেখতে-টেখতে এলুম আর কি !

ব্যাপারটা ভাঙলেন না—কিন্তু মনে একটা খটকা রয়ে গেল—ব্যাপারটা কী ? উনি এখানে কেন ?

এখনকার লিবার্টি সিনেমার আগে নাম ছিল 'জুপিটার'। তারও আগে ওখানে ছিল একটা খেলার মাঠ। এই মাঠে আমি আর অনাদিবাবু গিয়ে মাপজোপ করেছিলুম। জায়গাটা সকলেরই পছন্দ হলো। নিজেদের সিনেমা-হাউস যদি থাকে তো সিনেমার ব্যবসা মারে কে ?

মনোমোহনে প্রায়ই যাই অনাদিবাবুর কাছে, আর তাগিদ দিই। অনাদিবাবু বলেন—লিমিটেড কোম্পানী করব, শেয়ার বিক্রি করতে হবে।

আমি বললাম—বেশ তো করুন।

দিন যায়—কিন্তু কোম্পানী আর গড়ে ওঠে না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলাম। ওঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল সিনেমা নয়, থিয়েটার করা। সেটা উনি আমার কাছে একেবারে চেপে রেখেছিলেন।

আমি একদিন ওঁকে খুব বোঝালুম—দেখুন অনাদিবাবু, আপনার দৌলতে আব দেবী ঘোষের কর্মপ্রেরণায় বহু লোক করে খাচ্ছে, আপনার নিজের টুরিং থিয়েটার কোম্পানী আছে, কিন্তু এর ওপর আবার আপনি কলকাতায় যদি থিয়েটার কোম্পানী করতে যান, তাহলে আমার তো মনে হয় আপনি ক্ষতিগ্রস্তই হবেন। কলকাতায় এই প্রতিযোগিতার বাজারে থিয়েটার চালানো কি কম কথা ? আপনি কত দিকে মন দেবেন ?

কথাটা উনি অবশ্য মন দিয়েই শুনলেন—এবং হ্যাঁ-হুঁ করেই কাটিয়ে দিলেন, স্পষ্টভাবে কোনো উত্তর দিলেন না।

এর কয়েকদিন পরে অবশ্য অনাদিবাবু আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। আমি গেলুম। কি ব্যাপার ? না, ওঁর অরোরা কোম্পানীতে 'কেলোর কীর্তি' নামে একটা ফিল্ম তোলা হবে। অনাদিবাবু বললেন—আপনিই করুন।

এসব কাজে আমার চিরকালই খুব উৎসাহ। সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলাম। কাগজপত্র নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলাম, এমন সময় শুনলাম, শেষ পর্যন্ত ঐ থিয়েটারই করছেন অনাদিবাবু। আসলে প্রবোধবাবুই রয়েছেন এর পিছনে। মনোমোহনবাবুর

কাছ থেকে থিয়েটার নেওয়া হয়ে গেছে অনাদিবাবুর নামে। দেখাশোনা করার ভার দিয়েছেন অনাদিবাবু প্রবোধবাবুর ওপর। আমার কথাটা উনি কানেই তুললেন না—সেই শেষ পর্যন্ত থিয়েটারই করলেন কলকাতায়—আমার প্রচণ্ড অভিমান হলো, রাগও হলো।

উনি আমাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন, বললেন—করছি কেন জানেন? আমাদের সিনেমা কোম্পানীর অনেক শেয়ার বিক্রি হবে এতে।

কী করে?

উনি আমাকে বোঝাচ্ছেন—বক্সে সব বাছা বাছা বড়ো লোক আসবে, বুঝলেন? তাদের কাছে গিয়ে শেয়ার গছাবার চেষ্টা করব—বুঝলেন না?

আমি বললাম—চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, থিয়েটারের কী হবে? যাক, আমি আর এসব ব্যাপারের মধ্যে নেই। বলে রেগে হন-হন করে বেরিয়ে এলাম মনোমোহন থিয়েটারের গেট দিয়ে। উনি পিছন-পিছন ডাকতে ডাকতে বেরুলেন—কী হলো মশাই—এই যে—ও অহীনবাবু!

কিন্তু কে শোনে সেই ডাক। আমি মুখ না ফিরিয়ে সেই যে চলে গেলাম আর ওমুখো হইনি বহুদিন। সত্যিকথা বলতে কী, এই মনোমালিন্য বহুদিন ছিল আমাদের মধ্যে। পরে একদিন হঠাৎই সেটা মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। দেখা হতেই হেসে বলেছিলেন অনাদিবাবু—কী মশাই, রাগ পড়েছে? হ্যাঁ, পুরুষের রাগ বটে!

আমি উল্টাডিঙ্গিতে জমি নিয়েছি শুনে একদিন দেখতেও এলেন। জিতেনের কথা বোধহয় ইতিপূর্বে বলা হয়নি। জিতেন ব্যানার্জী, সে নিজে ছিল ল্যাবরেটরী-ম্যান, সুতরাং আমি ল্যাবরেটরীর যে পরিকল্পনা তাকে দিয়েছিলাম সেটা সে দলবল নিয়ে দিব্যি গড়ে তুলেছিল। অনাদিবাবু ওসব দেখে অবাক হয়ে গেলেন। উল্টাডাঙ্গার এই এত বড়ো জমি, তাতে ল্যাবরেটরী করা হয়েছে, ডার্করুম করা হয়েছে। 'ওভার-হেড' ট্যাঙ্ক আছে, জল পরিস্রুত করার ব্যবস্থা আছে। প্রায় আট ইঞ্চি উঁচু করে চারদিকে ইট বসিয়ে তার ওপর কাঠের পাটাতন বসানো। ইচ্ছে করলে সেই পাটাতন যেখান থেকে খুশী তুলে ফাঁক করে নেওয়া যায়। এটা করা হয়েছিল জল যাতে নীচে দিয়ে গড়িয়ে যেতে পারে সেইজন্য। আমার একটা ছোট্ট মুভি-ক্যামেরা ছিল, সেটা নিয়ে জিতেনই ঘুরে বেড়াতো, ছবি তুলতো। আর স্টারের ইলেকট্রিসিয়ানদের নিয়ে এসে স্টুডিওর কাজ জাঁকিয়ে তুলতো। বড়ো বড়ো শালবল্লীর খুঁটি বসিয়ে ইলেকট্রিক লাইন পর্যন্ত টানা হয়েছে—গেট থেকে বাড়ী পর্যন্ত।

এই সময় জিতেনরা আমাকে দিয়ে একখানা গাড়ী পর্যন্ত কিনিয়েছিল—

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পুরনো 'ওভারল্যাণ্ড' গাড়ী। আমাকে নিয়মিত থিয়েটারে দিয়ে আসতো এবং থিয়েটার থেকে নিয়ে আসতো। আর দিনের বেলায় নানা কাজে এখানে-ওখানে যেতো। গাড়ী বসে থাকলে বাবাকে নিয়ে মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে আনতো। বাকী সময়টা ওদেরই হেপাজতে থাকতো। নিজেরাই একজন ড্রাইভার ঠিক করে রাখলো—আমি শুধু টাকা দিয়ে খালাস।

অনাদিবাবু দেখে-শুনে বললেন—করেছেন কী মশাই, অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছেন দেখছি!

বললাম—আমি তো দেউলে হয়ে গেলুম। এবার—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন অনাদিবাবু—আর কিছু ভাববেন না, আমি আপনার সঙ্গে আছি।

—ভালো, আমার পয়সা নেই, আপনার আছে। সুতরাং—

উনি বললেন—সুতরাং ছবি আরম্ভ করে দিন।

—করবো? আশা ও আনন্দে অধীর হয়ে বলি।

—নিশ্চয়ই। উনি আশ্বাস দিলেন।

ব্যস, এবার আরও দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে গেলাম। ইতিমধ্যে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত তাঁর প্রথম নাটক 'রক্তকমল' লিখেছেন এবং সেটির রিহার্সাল হতো মাঝে মাঝে—বেশীর ভাগই গান-বাজনার রিহার্সাল। প্রবোধবাবু তখনো স্টারে, তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—কী ব্যাপার? স্টারে হবে নাকি?

উনি বলেছিলেন—আরে না-না, অন্য জায়গায়—এখানে নয়।

শচীনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় আগে থাকতেই ছিল। ওঁকে গিয়েই বললাম—একটা গল্প ডেভেলাপ করুন তো মশাই। সিনেমা করব।

উনি একটি গল্প দাঁড় করালেন। সে গল্প অবশ্য সিনেমা করা আর হয়ে ওঠেনি, এবং প্রসঙ্গত বলে রাখি, পরে এই গল্পেরই একটু রদ-বদল করে উনি নাটক লিখেছিলেন 'সতীতীর্থ' নামে, পরে সেটি নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয়েছিল। সে সব কথা পরে বলব।

যাক, এদিকে অনাদিবাবু তখন নবগঠিত মনোমোহন নিয়ে ব্যস্ত। নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সরযূবালা—এঁরা তখন 'টুরিং' থিয়েটার করে বেড়ান। ওঁরা তখন রেঙ্গুন থেকে চট্টগ্রামে এসে অভিনয় করছেন। এই নবগঠিত মনোমোহনের জন্যে ওঁদের আনিয়ে নিলেন এখানে। ম্যানেজার ও নাট্যাচার্য হিসাবে যোগদান করলেন দানীবাবু। সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—যিনি ছিলেন তখনকার দিনের একজন নামকরা নাট্য-

সমালোচক—পরে 'দীপালি' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন এবং দীর্ঘদিন তা চলেছিল—তাঁর লেখা 'মীরাবাঈ' দিয়ে এই নতুন মনোমোহনের উদ্বোধন হয়েছিল, ১১ই আগস্ট, ১৯২৮। নাম-ভূমিকায় নেমেছিল গায়িকা সুবাসিনী। রাণা কুম্ভ করেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

একটি পুরাতন বিজ্ঞপ্তিতে দেখেছি ঃ

"In 1928 Monomohan Theatre was leased to Babus Anadi Bose of the Aurora Film and Probodh Ch. Guha who re-opened Monomohan Theatre with Mirabai on 11th Aug., 1928."

এই 'মীরাবাঈ' যখন হয় তখন অনাদিবাবুর সঙ্গে আমার সেই ঝগড়ার পালা চলছিল। এরপর ওঁরা খুললেন জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রাণের দাবী'। তখনও আমাদের ঝগড়ার পালা শেষ হয়নি। এ-বইও আমি দেখিনি, তবে শুনেছি বেশীদিন চলেনি ওটা। এর ভূমিকালিপিতে ছিল কেশব—নির্মলেন্দু, অচলা—সরযূবালা, শশাঙ্ক—রবি রায়।

জমল এর পরের বইটা। বাগেরহাটের উকীল নিশিকান্ত বসুরায়—যাঁর কথা আগে বলেছি—এঁর লেখা 'পথের শেষে' নাটক আসর জাঁকিয়ে তুলল। ঠিক বড়দিনের আগে ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৮, এর উদ্বোধন হলো। এতে 'দুর্গাশঙ্কর'-এর ভূমিকায় দানীবাবু অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। বয়সের সঙ্গে যেমন মানিয়েছিল তেমনি একাত্ম করে নিয়েছিলেন নিজেকে ভূমিকাটির সঙ্গে। অদ্ভুত সাবলীল অভিনয় করেছিলেন এই ভূমিকায়। বস্তুত এই অভিনয় থেকেই দানীবাবুর নাম আবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়, বৃদ্ধবয়সে উনি যেন আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। আর অভিনয় করেছিলেন 'শুভদা'র ভূমিকায় প্রকাশমণি—অপূর্ব। মণি ঘোষের 'যোগেশ' ও সত্যেন দে-র 'অনাদি' চমৎকার, নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও সরযূবালাও মোটামুটি ভালোই অভিনয় করেছিলেন।

এই 'পথের শেষে'র সময়েই অনাদিবাবুর সঙ্গে আমার মান-অভিমানের পালা শেষ হয়ে যায়। আবার আমাদের মধ্যে মিল-মিশ হয়ে যায়—এবং এই সময় বা এরই কাছাকাছি কোনসময়ে উনি আমার স্টুডিওতে বেড়াতে আসেন—সেটা আগেই বলেছি।

আমার সেই 'ওভারল্যাণ্ড' গাড়ী করে নারাণ-ড্রাইভার নিজে থেকে বাড়ী গিয়ে বাবাকে উঠিয়ে নিয়ে আসত। বাবা তাঁর নাতি-নাতনীকেও সঙ্গে নিতেন। গাড়ীতে করে যেতেন বালাখানা তামাক কিনতে।

একদিন এই গাড়ীর 'অ্যাকসেল' ভেঙে ফেলল ড্রাইভার। থিয়েটার থেকে আমাকে নিয়ে আসতে যেতো গাড়ী কিন্তু সেদিন না যাওয়াতে ট্রামেই বাড়ী ফিরলাম। বাড়ী ফিরে দেখি বাড়ীর সামনে একটা জোরালো আলো পড়েছে। গাড়ীর সব অংশ খোলা—ওরা নিজেরাই মেরামত করছে।

আমি বিরক্ত হয়ে নারাণকে ছাড়িয়ে দিলাম। পাড়ারই একটি ছেলে এবার গাড়ীটা চালাতে লাগল। এও বাবাকে এই রকম বেড়িয়ে আনত—যেটা আমার কাছে ছিল পরম সান্ত্বনার বিষয়।

এই রকম সময়ই আমি শচীন সেনগুপ্ত মশায়ের গল্প নিয়ে শ্যুটিং আরম্ভ করি। গল্পটা সেই 'সতীতীর্থে'র, নাটকটা নয় কিন্তু। ক্যামেরা চালাতেন দেবী ঘোষ, অনাদি-বাবু আসতেন দুই-একদিন অন্তর অন্তর। পরিচালনা করছি আমিই। ভূমিকায় ছিলাম —আমি, রবি রায়, তারকবালা (লাইট) এই সব আর কী! 'সেটিংস' বা দৃশ্যসজ্জার ভার নিয়েছিল স্টারের মানিকলাল দে।

১৯২৮ সাল তখন বিদায় নেবার মুখে; বড়দিনের সময় শিশিরবাবু নাট্যমন্দিরে খুললেন নতুন নাটক 'দিগ্বিজয়ী', যোগেশ চৌধুরীর লেখা নাদির শাহকে কেন্দ্র করে নাটক। গানগুলির সুর দিয়েছিলেন বিখ্যাত ক্ল্যারিওনেট-বাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার —যিনি পরে কলিকাতা রেডিও স্টেশনের কর্তাব্যক্তি হয়েছিলেন। পরিচালনা ও নাদির শাহের ভূমিকায় ছিলেন শিশিরবাবু স্বয়ং, অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন: সালেহ বেগ —বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, আলি আকবর—যোগেশ চৌধুরী, আহমদ খাঁ—জীবন গাঙ্গুলী, রহমৎ খাঁ—রবি রায়, সিতারা—কৃষ্ণভামিনী, সিরাজী বেগম—চারুশীলা। পরে ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভারতনারীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হতে লাগলেন কঙ্কাবতী শাহু বি.এ.।

এই কঙ্কাবতীকে নিয়ে একটা কাহিনী আছে—যেটা বলতে আমাকে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। ১৯২৮ সালের জুন-জুলাই মাসে শহরে মোড়ে-মোড়ে প্রাচীরপত্রে ছেয়ে গেলো—'স্টারে শ্রীমতী কঙ্কাবতী শাহু বি.এ.। গ্র্যাজুয়েট তো দূরের কথা, ম্যাট্রিক পাশ করা মেয়েই থিয়েটারে এর আগে কেউ আসেনি। সুতরাং শহরের সর্বত্রই বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। যাই হোক, এঁকে নিয়ে স্টার ও নাট্যমন্দিরের মধ্যে একটা মামলার সূত্রপাত ঘটে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কঙ্কাবতী নাট্যমন্দিরেই যোগদান করেন এবং মামলাটা আপোষে মিটে যায়।

১৯২৮ সালের শেষের দিকে শুধু 'দিগ্বিজয়ী' নয়, আর একখানি নতুন নাটক খুললেন নাট্যমন্দির। সেটি হলো রবীন্দ্রনাথের 'শেষ-রক্ষা'। কবি নিজেই তাঁর 'গোড়ায়

গলদ' নাটকখানিকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে 'শেষ-রক্ষা' নাম দিয়েছিলেন ; এই কৌতুক-নাট্যটি হতো 'ষোড়শী'র সঙ্গে। এই বছরেই বাংলার নাট্যজগতে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুতে।

৩রা অক্টোবর দানীবাবুকে নিয়ে এসে শিশিরকুমার 'প্রফুল্ল' করলেন। গিরীশ-বাবুর মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে গিরীশ পার্কে, তারই জন্যে চাঁদা তুলতে হবে, তারই জন্যে এই সম্মিলিত অভিনয়। ভূমিকালিপি ছিল এই রকম—যোগেশ—দানীবাবু, রমেশ—শিশিরবাবু, ভজহরি—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মোক্ষদা—তারাসুন্দরী, জ্ঞানদা—কুসুম-কুমারী, প্রফুল্ল—প্রভা। টিকিটের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। হেমেন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্ত লিখেছেন—'প্রায় চার হাজার টাকা ওঠে।'

হ্যাঁ, আগের কথায় আবার ফিরে আসি—মানে 'দিগ্বিজয়ী'র কথায়। নাট্যমন্দিরে অর্থাৎ কর্নওয়ালিশ স্টেজের পেছনে, প্রকাণ্ড একটা হলঘরের মতো ছিল, ওখানে তক্তপোষ পাতা থাকত। আর্টিস্টরা বসে বিশ্রাম করতেন। দেখলাম ঐ ফাঁকা জায়গা-টিকেও স্টেজের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে—তাতে স্টেজের ডেপ্থ বা গভীরতা অনেকখানি বেড়ে গেছে। বস্তুত এই প্রোডাকশনটি হয়েছিল যেমনি ব্যয়বহুল, তেমনি জাঁকজমকপূর্ণ। অনেকের মতে 'দিগ্বিজয়ী'তে যা খরচ হয়েছিল সেরকম খরচ বোধহয় আর কোনও নাটকে শিশিরবাবু করেননি।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে আমার ব্যক্তিগত মতে প্রত্যেকেই ভালো অভিনয় করেছিলেন। টিম-ওয়ার্ক সুন্দর। কোন কোন সমালোচক মন্তব্য করেন যে 'নাদির শাহে' কোন কোন জায়গায় 'আলমগীরে'র ছাপ পড়েছে। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে 'নাদির শাহ' এবং 'আলমগীর' এক ধরনের চরিত্র নয় অবশ্যই। 'আলমগীর' যাঁরা দেখেননি, তাঁদের হয়ত খুবই ভালো লেগেছিল, কিন্তু তাঁদের ততটা লাগেনি, যাঁরা 'আলমগীর' দেখেছিলেন।

অবশ্য তাঁদের সমালোচক মন খুঁত-খুঁত করলেও শান্ত হয়ে যদি তাঁরা ভেবে দেখতেন, তাহলে তাঁরা শিশিরবাবুকে বিশেষ দোষ দিতে পারতেন না। আর্টিস্টের বিখ্যাত ভূমিকার ছায়া অন্য ভূমিকার অভিনয়ে এসে পড়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে এটুকু তাঁদের সপক্ষে বলা যায় যে, শিল্পী যদি এ-বিষয়ে একটু বেশী সচেতন থাকেন তাহলে তাঁর ভাগ্যে দ্বিগুণ যশোলাভ হয়।

যাই হোক নাট্যমন্দিরে চলতে লাগল 'দিগ্বিজয়ী', সঙ্গে-সঙ্গে 'শেষ-রক্ষা'ও চলতে লাগল অন্য নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে—কখনও কখনও 'দিগ্বিজয়ী'র সঙ্গেও।

এইভাবে শেষ হলো নাট্যজগতের ১৯২৮ সাল। শুরু হলো ১৯২৯ সাল, ব্যক্তিগত-ভাবে আমার জীবনে এনে দিয়েছে যুগপৎ বিষ ও অমৃত, শোক ও সুখ, বিষাদ ও আনন্দ।

১৯২৯ সালে বাধ্য হয়ে আমাকে ম্যাডানের কাজ ছেড়ে দিতে হলো। অবশ্য আমরা যে ম্যাডানে কাজ করতাম, সেই ম্যাডানই আর রইল না। ব্যবসায়ে ওঁদের প্রচুর দেনা হয়ে গিয়েছিল, সেই দেনার দায়ে রিসিভার বসল। এ অবস্থাতেও ম্যাডান কোম্পানী চলেছিল কিছুদিন, কিন্তু তার পরে এদের স্টুডিও প্রভৃতির দখল নিলেন রায়বাহাদুর শুখলাল করনানী। ইনি নতুন নিয়ম করলেন যে প্রত্যেক শিল্পী এবং কলাকুশলীকে (যারা এই স্টুডিওর বেতনভুক) প্রত্যহ বেলা দশটায় স্টুডিওয় হাজিরা দিতে হবে, কাজ না থাকলেও। ম্যাডানের সময় নিয়ম ছিল, কর্মীদের শ্যুটিং-এর সময় উপস্থিত থাকতে হবে।

আমি দেখলাম—এ আমার দ্বারা হবে না। অতএব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলাম। তখন আমি ম্যাডান থেকে পেতাম মাসিক ৪০০৲ টাকা, আর স্টার থেকেও পেতাম ৪০০৲ টাকা। এই প্রসঙ্গে ফ্রামজী ম্যাডানের উক্তিটি মনে পড়ে—আপনাকে স্টার যা দেয়—আমিও তাই দেবো—ওই চারশো টাকা।

ম্যাডানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে আমার আয়ের অর্ধেক কমে গেল। তার ওপর গাড়ীখানার মেরামত তো প্রায় লেগেই আছে। তাতে একটা মোটা খরচের ধাক্কা। তারপর আমার সিনেমা কোম্পানীর কাজ বাধা পেল। অনাদিবাবু ছবি নির্মাণের দিকে আর উৎসাহ রাখলেন না, তিনি মন দিলেন পরিবেশন বা ডিস্ট্রিবিউ-শানের দিকে। ওঁর কোম্পানীর নতুন ম্যানেজার হয়ে এসেছেন জি. রামাশেষণ বলে এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক। তিনি হিসাবপত্রে খুব সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন, প্রথমেই অরোরার বাকী-বকেয়া নিয়ে পড়লেন। খাতাপত্র দেখতে দেখতে ওঁর চোখে পড়ল যে, আমার কাছে অরোরা সাতশো টাকা পাবে।

মিঃ রামাশেষণ আমাকে টাকার তাগাদা দিলেন, এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক।

অনাদিবাবুকে বললাম আমার অবস্থার কথা। একটু ভাবলেন তিনি। তারপর হেসে বললেন, আচ্ছা আমি দেখব'খন। ঠিক আছে আপনাকে দিতে হবে না।

তখন আমার বাস্তবিকই টাকার খুব টানাটানি যাচ্ছে। গাড়ীটাকে বিক্রি করে দিলাম। পুরনো গাড়ী কিনেছিলাম চারশো টাকায়, বিক্রিও করলাম সেই চারশো টাকায়। লোকসান হলো না।

প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল আমার পক্ষে পরম দুর্বৎসর। বাবার শরীর খারাপ, বেড়াতে যেতে পারেন না। তাঁর জন্যও যে গাড়ীটা রাখব তারও উপায় ছিল না। আমি থিয়েটারে যাই-আসি থিয়েটারেরই গাড়ীতে।

আগেই বলেছি যে বাবা শেষের দিকে করতেন ফাটকার ব্যবসা। সেই ব্যবসায়ে লোকশান-টোকসান যা যখনই হয়েছে, তা কাউকে জানতে দেননি। নিজের বেদনা নিজের মনেই চেপে রাখতেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা বেড়ে গিয়ে এমন পর্যায়ে এলো যে তিনি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না—তখন আর চেপে রাখতে পারলেন না ব্যবসার বিপর্যয়ের কথা। জানা গেল বহু টাকা শুধু ঋণই হয়নি, উপরন্তু কোন কোন মহাজন নালিশ পর্যন্ত করেছে।

জিজ্ঞাসা করলেই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসি হেসে বলতেন—কিছু ভেবো না। ঐ ট্রাঙ্কে সব কাগজপত্র আছে, ওসব নিয়ে একটু বসতে পারলেই হয়। দাঁড়াও, একটু সুস্থ হয়ে নেই।

এ গেল একদিক। অন্যদিকে বাড়ীতে চার-পাঁচটা গরু, কলকাতায় রেখে তাদের খরচ যোগানো কঠিন। তাই তাদের নিয়ে গিয়ে রাখলাম উল্টোডাঙ্গার বাড়ীতে। বর্ষার জল পেয়ে কচি-কচি ঘাস হয়েছে প্রচুর, ওরা খেয়ে বাঁচবে, খোলা হাওয়ায় চরে বেড়িয়ে বাঁচবে। মালী ছিল, সে ওদের ছেড়ে দিত, তারা চরে বেড়াতো মনের আনন্দে।

কিছুদিন পরে বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমি একদিন দেখি ট্রেন থেকে নেমে বাবা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্টুডিওর বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে আসছেন।

ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরী হলো না। আসলে গরুগুলোকে উনি ভীষণ ভালোবাসতেন। না দেখে থাকতে পারছিলেন না বলে, একটু সুস্থ হতেই কাউকে কিছু না বলে সোজা ছুটে এসেছেন এতদূর—এদের দেখতে।

মালীকে ডেকে বললাম—বাবা রাস্তায় বাড়ী খুঁজছেন—যাও, যাও, শিগগীর ওঁকে নিয়ে এসো। মালী তৎক্ষণাৎ ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

বাবার মধ্যে একটি প্রকৃতি-পাগল মানুষ বাস করত। সাধারণভাবে তিনি ছিলেন বিষয়ী মানুষ, ব্যবসা-ট্যাবসাই করেছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি তাঁর একটা দারুণ আকর্ষণ ছিল। সেদিনকার ছবিটি আমার মনে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত থাকবে।

ছেলের ভাড়াবাড়ী দেখতে এই প্রথম এসেছেন—কিন্তু সেসবের দিকে তাঁর

মনোযোগ প্রথম গেল না। ঘাটের পাশে যে ঝাঁকড়া-মাথা পল্লবিত বকুল গাছ দুটি ছিল, তার তলায় চাতালে এসে বসলেন আগে। বকুল গাছটির পিছন দিকে বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসে-ঢাকা জমিতে তাঁর গরুগুলি মনের আনন্দে চরছে দেখে তাঁর মুখে যে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল—এরকম একখানি প্রসন্ন মুখ আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না। সত্যিই অদ্ভুত সে তৃপ্তির হাসি।

তারপর সব ঘুরে-ফিরে দেখলেন, তাঁর প্রিয় গরুগুলিকে আদর করলেন। এদের জন্যে বাবা বুরুশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, মালীকে বলে দিলেন এদের গা ঝেড়ে দিতে। মালীরা বাবার সামনেই গরুগুলোর গা বুরুশ করে দিল। বাবা শেষবারের মতো গরুদের আদর করলেন। বাবা বেশ খুশী হয়েই বাড়ী ফিরে গেলেন। বাবার সঙ্গে মালীকেও পাঠিয়ে দিলাম। একলা মানুষ, অনেকদিন রাস্তাঘাটে একা চলেননি। যাতে তাঁর কোন অসুবিধে না হয়।

এদিকে আমি তখন খরচান্তের একশেষ। সবদিক সামলে উঠতে পারছিলাম না। কিছু খরচ কমানো খুব দরকার হয়ে পড়ল। উল্টোডাঙ্গার বাড়ীতে দুজন দারোয়ান ছিল—একজনকে ছাড়িয়ে দিলাম। রইল একজন দারোযান আর একজন মালী। আমি মাঝে-মাঝে যাই আর চলে আসি।

তা সত্বেও বাড়ীভাড়া, বিদ্যুৎ-খরচ ইত্যাদি খরচে আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। শান্তিও নষ্ট হতে লাগল। কাজের মধ্যে শুধু থিয়েটার। আর কোন দিক থেকে কোন আয় নেই। এইভাবেই চলতে লাগল।

এই সময় স্টার থিয়েটারে ঘটল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৬ই জানুয়ারী, ১৯২৯, প্রবোধ গুহ মশায় পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। প্রবোধবাবু ছিলেন কর্তৃপক্ষস্থানীয়—যা-কিছু ব্যবস্থা-পত্তর তিনিই করতেন। সুতরাং তাঁর পদত্যাগে যে চারিদিকে একটা সোরগোল পড়ে যাবে এ তো স্বাভাবিক। এই নিয়ে থিয়েটারে নানা জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল।

সেই সময় বর্ধমানের মহারাজকুমারের বিবাহ উপলক্ষে আমরা স্টার থিয়েটারের শিল্পীরা সব গেলাম বর্ধমানে অভিনয় করতে। মহারাজা বিজয়চাঁদ বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন 'চিরকুমার সভা' করার জন্য। আমি শুধু 'চিরকুমার সভা' করার জন্যেই বর্ধমান গিয়েছিলাম, তারপর অভিনয় শেষে চলে আসি—আমরা তিনজন—আমি, তিনকড়িবাবু ও অপরেশবাবু। আমাদের পার্টি অবশ্য আরও ২।৩ দিন ছিল, তারা অন্য নাটক অভিনয় করেছিল। 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব—রাজবাড়ীর ভেতরে সুসজ্জিত মঞ্চে বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের সামনে অভিনয়

হয়েছিল। আদর-আপ্যায়নও হয়েছিল রাজকীয় ধারায়। প্রত্যেকটি লোকের সুখ-সুবিধার দিকে এবং থাকা-খাওয়া-শোওয়ার ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল কর্তৃপক্ষের। সে কি এলাহী ব্যাপার বলে শেষ করা যায় না। এই রাজকুমারই পরবর্তী কালে রাজাবাহাদুর হয়েছিলেন এবং এই বধূরাণীই পরবর্তীকালে আমাদের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীতে একজন সদস্যা হয়েছিলেন। কিছুদিন হল তিনি পরলোকগমন করেছেন।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। তখনও প্রবোধবাবু স্টারের কাজে ইস্তফার নোটিশ দেননি। উল্টাডাঙ্গার বাড়ীতে যে স্টুডিও করেছিলাম—সেখানে যে শ্যুটিং করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে সে ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি—আমি তখন ল্যাবরেটরী নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ব্যাটারীর সেল কেনার জন্যে তখন তিন-চারশো টাকার খুব দরকার হয়ে পড়েছিল, অথচ হাতে কিছু নেই।

প্রবোধবাবুকে গিয়ে বললাম কথাটা। প্রবোধবাবু সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিলেন—নিয়ে যাও।

সেই টাকায় ব্যাটারীর সেলের ডেলিভারী নিলাম। কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল। এবার দরকার পরিস্রুত জল। পুকুরের জল পরিস্রুত করে নেওয়া যেত, কিন্তু তাতে অসুবিধা দেখা দিল অনেক। তাই 'টিউবওয়েল' বসিয়ে তা থেকে জল নেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বেশীদূর এগুনো গেল না অর্থাভাবে। এদিকে ম্যাডানের কাজটাও আর তখন নেই। অতএব তখন একমাত্র ভরসা থিয়েটার।

থিয়েটারে তখন ধরা হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'; আমি—পশুপতি, আর দুর্গাদাস—হেমচন্দ্র।

অন্যান্য পুরনো বইয়ের সঙ্গে 'মৃণালিনী' চলতে লাগল। কিন্তু নতুন বই না হলে তো আর চলে না।

এল মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক 'শ্রীবৎস'—অভিনয় হল ৮ই জুন। ভূমিকা-লিপি ছিল এইরূপ : শ্রীবৎস—আমি, বাসুদেব—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, শনিদেব—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বণিক—ননীগোপাল মল্লিক, নগরপাল—তুলসী চক্রবর্তী, মালিনী—তারকবালা (লাইট), চিন্তা—শান্তবালা, ভদ্রা—সুশীলাবালা (ছোট), লক্ষ্মী—ঊষারাণী, রাখাল—সরস্বতী, নন্দিনী—নীহারবালা।

শনি ও লক্ষ্মীর বিবাদকে কেন্দ্র করে 'শ্রীবৎস'র দুর্ভাগ্য ও জীবন-সংগ্রাম হল এর বিষয়বস্তু। সহজেই লোকের মনে ধরলো, বিশেষ মেয়েদের। আমার ভূমিকাটি ছিল সিম্প্যাথেটিক। আমার একটা উন্মাদ দৃশ্য করেছিলেন মন্মথবাবু। চিন্তাকে হারাবার

পর শ্রীবৎস চলেছেন রাস্তা দিয়ে—ছেলেরা পাগল দেখে পিছনে হাততালি দিচ্ছে। আর উনি রাস্তা থেকে ধুলো কুড়িয়ে ছিটোচ্ছেন আর বলছেন—নেই—নেই—

এই দৃশ্যটি এত করুণ হয়েছিল যে, দর্শকরা চোখের জল রাখতে পারত না।

প্রথম রাত্রি থেকেই বইটা খুব জমে উঠল। দর্শকদের ঘন-ঘন হাততালিতে প্রেক্ষাগার যেন ফেটে পড়তে লাগল। একটা ড্রপের সময় হরিদাসবাবু ভেতরে এসে পরিহাস করে বললেন, কতগুলো পাশ দিয়েছেন মশাই যে হাউস একেবারে ফেটে পড়ছে?

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন অপরেশবাবু—আমি ওঁর কথার উত্তরে বললাম—সে আপনারাই জানেন। মানে পাশ নিলে তো আপনাদের কাছেই নেব—সুতরাং হিসেবটা আপনারাই কষে দেখুন।

তখনকার দিনে একটা প্রচলিত পরিহাস ছিল। শোনা যায়, কোন কোন অভিনেতা পাশ দিয়ে কিছু নিজের লোক ঢুকিয়ে দিতেন—এবং যখনই নিজের 'সীন' আসত তখনই হাততালি দিয়ে হাউস গরম করে দিয়ে নিজের অভিনয়ের উৎকর্ষ জাহির করতেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে সহ-অভিনেতাকে ঘাবড়ে দিতেন। হাততালির ব্যাপারটাও হল সংক্রামক—একজন বা দুজন দিলে অনেকেই দিতে আরম্ভ করে।

এই নাটকখানি চলাকালীন অনেকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল থিয়েটারে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের পারিবারিক জীবনেও।

প্রথমেই একদিন শুনলাম যে নীহারবালা হঠাৎ স্টার ছেড়ে দিচ্ছে। কোথায় যোগ দেবে—কি বিশ্রাম নেবে—কি বাইরে যাবে—কিছু জানা গেল না। তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন ফল হল না।

প্রসঙ্গত 'শ্রীবৎস' নাটকের ভূমিকায় মন্মথ রায় যে মন্তব্য করেছেন তার থেকে একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি: "গত (১৯২৮) বড়দিনের উৎসবে স্টার থিয়েটার কর্তৃক অভিনয়ার্থ একটি নাটক লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া গত ৫ নভেম্বর হইতে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে 'শ্রীবৎস' রচনা করি, কিন্তু ইতিমধ্যে আমার পিতৃদেব জটিল রোগে পীড়িত হইয়া পড়ায় যথাসময়ে অভিনয়োপযোগী করিয়া দিতে না পারায় এতদিন অভিনীত হইতে পারে নাই।"

'শ্রীবৎস' লিখবার সময়ই প্রথম বাধা পড়ল, তারপর অভিনয়ের সময় ক্রমাগত একটার পর একটা বাধা পড়তে লাগল। প্রবোধবাবু ছেড়ে গেলেন ১৬ই আগস্ট—তারপরই নীহারবালা চলে গেল এক সপ্তাহ পর—২২শে আগস্ট। অবশ্য এর আগে ১৫ই জুলাই কৃষ্ণভামিনী ও সুবাসিনী এসে যোগদান করেছিল। কিন্তু নাটক জমবার

মুখেই এইসব বাধা এসে পড়ায় আমাদের সকলের মনই একটা অস্বস্তিতে ভরে গেল। কিন্তু সবথেকে বড় বাধা এসেছিল আমারই দিক থেকে—সেইটাই বলব এবার।

বাবার অসুখ আবার বেড়ে গেছে ইতিমধ্যে। এবার একেবারে শয্যাশায়ী বলা যায়। কোনক্রমে উঠতে পারেন, কিন্তু বসতে পারেন না—একটা কিছুতে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখতে হয়। ওঁর শরীরের এদিকে এই অবস্থা, তার ওপর মামলা চলছে, তার কতদূর কী হয়েছে কে জানে!

একদিন ওঁকে জিজ্ঞাসা করায় উনি বললেন—বাক্সে কাগজপত্র সবই আছে—ভাবনার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কয়েক দিন যায়। শরীর ওঁর সারে না। রীতিমত দুর্বল, অশক্ত। আবার ওঁর কাছে বসে কথাটা তুললাম। উনি এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন ধীরে ধীরে—অ্যাটর্নীকে গিয়ে বলো।

অ্যাটর্নীর বাড়ী ছিল কাছেই। আমি একদিন গিয়ে দেখা করলাম। আমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেই উনি বুঝলেন যে, মামলাটার ব্যাপারে আমি বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানি না।

উনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—আপনাকে উনি কিছুই বলেননি?

—না।

উনি গম্ভীর মুখে বললেন—ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস।

যাই হোক, মামলা চলতে লাগলো।

এতদিন সংসারের কথা একেবারেই ভাবিনি—থিয়েটার, সিনেমা আর অভিনয় নিয়েই মত্ত থাকতাম, আজ এসব দিকে নজর দিতে কেমন যেন দিশেহারা করে তুলল আমাকে।

এই জুলাই মাসে বাংলার নাট্যাকাশের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়ল—৩রা জুলাই আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে কাগজে দেখলাম, রসরাজ অমৃতলাল বসু আর ইহজগতে নেই। অর্থাৎ ১লা কিম্বা ২রা জুলাই তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন। আনন্দবাজারে স্টারের বিজ্ঞাপনে বেরুল—অদ্য বুধবার অভিনয় বন্ধ রহিল। শুধু স্টার নয়, সব থিয়েটারই বন্ধ ছিল সেদিন এই উপলক্ষে।

বাবার সঙ্গে অমৃতলালের নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। সমবয়সী অবশ্য ছিলেন না দুজনে, বাবার থেকে অমৃতলাল ২।৪ বছরের বড়ই ছিলেন বোধহয়—কিন্তু ওঁদের বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়। একে বাবার অসুস্থ শরীর, তারপর এই দুঃসংবাদ দিলে তিনি খুবই মুষড়ে পড়বেন—এই ভয়ে সংবাদটা আর তাঁকে জানালাম না।

এদিকে প্রবোধবাবু স্টার ছেড়ে যাবার পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি—তবে খবর পাওয়া গেল মনোমোহনের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। নীহার তখন পর্যন্ত অন্য কোন স্টেজে যোগদান করেনি।

একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন—সে-দিনটা হল ২রা শ্রাবণ, ১৩৩৬ (২৫শে জুলাই, ১৯২৯)। মৃত্যুর ঠিক সময়ে আমি বাবার কাছে ছিলাম না। কিন্তু খবরটা কিভাবে পেলাম তাই বলছি।

দুর্ঘটনা যখন আসে, তখন একা আসে না, অনেকগুলোকে পর পর টেনে নিয়ে আসে। বাবার মৃত্যুর দু'দিন আগে আর একটি দুঃসংবাদ পেলাম। সেটি হল মামলার ফল বেরিয়েছে এবং তাতে অপর পক্ষই ডিগ্রী পেয়েছে। অ্যাটর্নী জানালেন যে, আমাদের বাড়ী আর জমি অ্যাটাচ্ করবে, 'সেল'-এ উঠবে।

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। অ্যাটর্নী বললেন—বসুন।

বসতে ইচ্ছে হল না—দাঁড়িয়েই বললাম নিম্নকণ্ঠে—বাড়ীটা তার আগে বাঁধা দেব, আপনি একটা পার্টি দেখে দেবেন?

উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে বললেন—বেশ, দেখছি।

বাড়ী গিয়ে এ-খবরটা কাউকেই দিতে পারলুম না—নিজের মনের মধ্যেই দুশ্চিন্তাটা গুমরে গুমরে ফিরতে লাগল। রাত্রে ঘুমুতে পারি না। স্ত্রী কিছু জিজ্ঞেস করলে বাবার অসুখের দোহাই দিয়ে কথাটা এড়িয়ে যাই। শুধু তখন একমাত্র চিন্তা—বিরাট নৈরাশ্যের অন্ধকারে একমাত্র আশার আলো—যদি বাড়ীটা মর্টগেজ দিতে পারি। অন্ততঃ এবারকার মতো তো বাড়ীটা তাহলে বেঁচে যায়।

সেই স্মরণীয় ২রা শ্রাবণও গেছি অ্যাটর্নীর অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। আমার মা তখন এখানে ছিলেন না—তীর্থভ্রমণে গেছেন। বাবার অসুখ করেছে, চিকিৎসা হচ্ছে, সেরে যাবেন—এইটাই জানি, কিন্তু উনি যে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন এ তো এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি।

সেদিন বাবা সুধীরাকে বলেছিলেন—ও কি এখন বেরুবে? বেরুবার আগে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

আমি সেই কথাটা সুধীরার কাছ থেকে জেনে বেরুবার আগে বাবার ঘরে গেলাম। মেঝের ওপর বিছানা পাতা। সেই বিছানায় তাকিয়া উঁচু করে হেলান দিয়ে আধ-শোওয়া আধ-বসা অবস্থায় তিনি রয়েছেন। ইসারা করে আমাকে কাছে ডাকলেন।

আমি কাছে গিয়ে বসতেই কাঁধের ওপর হাত রাখলেন বন্ধুর মতো। মুখে কিছু

বললেন না, শুধু কাঁধটা ধরেই রইলেন নিবিড় আলিঙ্গনের মতো—আর তাঁর দু' চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারার মতো জল গড়িয়ে পড়ছে। কি যেন বলতে চান, অথচ বলতে পারছেন না। বলতে না পারার বেদনাটা যেন গলে গলে অশ্রু হয়ে ঝড়ে পড়ছে।

আমি বললাম—আমাকে কিছু বলবে? বল।

ঘাড় নেড়ে যেন অতিকষ্টে বললেন—না, তুমি যাও।

না গিয়েও আমার উপায় ছিল না—অ্যাটর্নীর সঙ্গে দেখা আমার করা খুব দরকার, অতএব আমি উঠে দাঁড়ালুম। ইতিমধ্যে সুধীরা এসে ওঁর গায়ে হাত বুলিযে দিতে লাগল।

দুর্ভাগ্য যে কোর্টে গিয়ে অ্যাটর্নীর সঙ্গে দেখা হল না—তিনি কি কাজে যেন বেরিয়ে গেছেন, ফিরতে অনেক দেরী হবে।

কী আর করি, চলে গেলাম স্টারে। ওখানেও মন বসলো না—কি যেন একটা অনাগত আশঙ্কায় ছটফট করছিল মনটা। চলে গেলাম সোজা রিক্শা করে উল্টাডাঙ্গার বাড়ীতে।

ইতিমধ্যে বাড়ীতে যা অবধারিত তাই ঘটে গেছে।

সুধীরা এক সময় দুধ গরম করার জন্য উঠে গেছে। দুধ গরম করে ফিরে এসে দেখে বাবার মাথাটা বাঁ-দিকে হেলে পড়ে আছে।

সুধীরা খুব কাছে এসে ডাকতে লাগল—বাবা, বাবা!

কিন্তু আর কাকে ডাকা? তিনি তখন সমস্ত ডাকাডাকির উর্ধ্বে চলে গেছেন—যেখানে এখানকার কোন ডাক পৌঁছয় না।

আমাদের প্রতিবেশী উমেশবাবু ছিলেন অতি সজ্জন ব্যক্তি। ওঁর বাড়ীতেই সুধীরা ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিল সর্বাগ্রে। একা এই বিপদের মধ্যে ভেঙে না প'ড়ে অসম্ভব দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে ধরে রাখল—আর এক এক করে সমস্ত প্রাথমিক কাজগুলি করে যেতে লাগল। আমার জন্য ফোন করালে স্টারে। ফোন থেকে উত্তর এল—উনি এখানে নেই—এখানে একবার এসেছিলেন, এখন উল্টাডাঙ্গায় গেছেন। এখুনি লোক পাঠাচ্ছি।

আমার সেই চাকর নীলু তখন স্টারে এসেছিল স্নান করার জন্যে। দুপুরে নীলু রোজই আসত স্নান করার জন্যে, তারপর স্নান সেরে বাসায় খেতে যেত। তাই যখন ফোন এল তখন বুকিং অফিস থেকেই ধরেছিল। তারা নীলুকে ডেকে পাঠাল। নীলু তখন স্নান শেষ করে খেতে যাবে আর কি!

বুকিং-এর লোকটি তাকে বলল—এই নীলু, শিগ্গির একটা ট্যাক্সি নিয়ে

উল্টোডাঙ্গায় চলে যা। বাবুর বাবা মারা গেছেন। নীলু আর দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এসেছিল উল্টোডাঙ্গার বাড়ীতে।

আমি সবেমাত্র পৌঁছেছি—রিক্শাটা তখনও গেট ছেড়ে যায়নি—এমন সময় দেখি একটা ট্যাক্সি গেটের মধ্যে ঢুকছে।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। এমন অসময়ে কে এল ট্যাক্সি করে? অনাদিবাবু মাঝে মাঝে আসতেন, কিন্তু ইদানিং বেশ কিছুদিন আসেননি—তবে অনাদিবাবুই এলেন নাকি?

ট্যাক্সিটা কাছে এসে দাঁড়াতেই দেখি নীলু নামছে গাড়ী থেকে, সঙ্গে আর কেউ নেই।

অবাক হয়ে বললাম—কিরে, তুই?

নীলু মুখ নীচু করে বললে—বাবু, থিয়েটারে টেলিফোন এসেছিল—কর্তাবাবু আর নেই।

সে-মুহূর্তটির কথা জীবনে ভুলব না। মনে হল পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন দপ্ করে নিভে গেল। পৃথিবীর যাবতীয় রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ যেন একেবারে একাকার হয়ে একটা বিরাট ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম, কয়েক মুহূর্তের জন্য মনটা অসাড় হয়ে গেল। চোখ দিয়ে একফোঁটা জল এল না—আমি শূন্যদৃষ্টিতে বাঁধানো চত্বরটার ওপর বসে পড়লাম। আমার মন যেন চলে গেছে বাস্তবের সীমানা ছাড়িয়ে কোন্ দূর রাজ্যে।

নীলু ডাকল—বাবু!

এই ডাক শুনে আমি আবার ফিরে এলাম যেন এই পৃথিবীতে। আমি আর কিছু না বলে জুতোটা খুলে ফেলে দিয়ে ঐ ট্যাক্সিতেই উঠে বসলাম।

ট্যাক্সি ছুটে চলল। আমাদের দু'জনের কারোরই মুখে কোন কথা নেই। গাড়ী সার্কুলার রোড-গ্রে স্ট্রীটের মুখে আসতেই নীলুকে বললাম—তুই নেমে যা।

নীলু বললে—না বাবু, আমি আপনার সঙ্গে যাই।

আমি বললাম—না না, তুই যা, খাওয়া-দাওয়া কর গিয়ে। বেলা অনেক হয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলু নেমে গেল—আমি সোজা চলে এলাম বাড়ী।

বাবার ঘরে ঢুকে দেখি—বাবা শুয়ে আছেন শান্ত সমাহিত ভাবে। সুধীরা তাঁর বিছানার পাশে মূর্তিমতী বিষাদ-প্রতিমার মতো বসে আছে। আত্মীয়-স্বজন কয়েকজন এসেছেন, শ্মশান-যাত্রার আয়োজন করছেন। আমি জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ালাম। আমি জীবনে কোনদিন কাঁদিনি—এতক্ষণ পর্যন্ত কোনরকমে নিজেকে সামলে

রেখেছিলাম—কিন্তু এবার মনে হল চীৎকার করে কেঁদে উঠি। প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু চোখের জল আর কোন বাধা মানল না—অন্তরের রুদ্ধ আবেগ যেন সহস্র ধারায় ফেটে পড়ল।

স্ত্রীর কাছে শুনলাম—মৃত্যুর আগে বাবা খেদ প্রকাশ করে গেছেন, কিছু রেখে যেতে পারলুম না, ও ঘোরাঘুরি করছে বটে কিন্তু আমি জানি আর কিছু হবার নয়। আমি সবই শেষ করে খেয়ে গেলুম। স্ত্রী ওঁকে সান্ত্বনা দিতে উনি বলেছিলেন—তোমার সেবা কখন ভুলতে পাবব না মা, আমি আশীর্বাদ করে যাচ্ছি—যা গেল তা দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে ফিরে আসবে।

এদিকে ঘটনার কী অদ্ভুত যোগাযোগ! মা গিয়েছিলেন তীর্থ করতে। তিনি সেইদিনই ফিরলেন। শিয়ালদহের কাছেই মামার বাড়ী, স্টেশন থেকে সোজা মামার বাড়ীতেই চলে গিয়েছিলেন। ওঁকে দেখামাত্রই দাদামশায় বললেন—তুমি এখনই ভবানীপুরে জামাইয়ের কাছে যাও—ওঁর খুব অসুখ।

মা চেয়েছিলেন সেদিনটা ওখানে থেকে পরদিন আসতে, কিন্তু দাদামশায় জোর করে মামাকে সঙ্গে দিয়ে মাকে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।

এতবড় বিপর্যয়ের কথা মা কিছুই জানতেন না, বাড়ীতে পা দিয়েই দেখেন শব-যাত্রার প্রস্তুতি। বাইরে খাট সাজানো হচ্ছে। বারান্দায় পৌঁছেই বাবার মৃতদেহ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন—আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললাম—না ধরলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত।

যাই হোক, বাবার শবদেহ নিয়ে আমরা শ্মশানে গেলুম দাহ করতে। সেখানে প্রবোধবাবু আর অনাদিবাবু এসেছিলেন। অনাদিবাবু কাছে এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন—টাকাকড়ি দরকার?

আমি বললাম—না।

'না' বললাম বটে, তবে মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। মনে পড়ে গেল সেই বিখ্যাত শ্লোকটা—'রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ'। বন্ধুত্বের এ স্নেহস্পর্শ কখন ভুলব না।

অবশ্য এঁদের আসার একটা কারণও ছিল। শহরে পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে 'প্রফুল্ল' অভিনয় হবে—মনোমোহনে 'কম্বিনেশন' নাইট। দানীবাবু যোগেশ, আর আমি রমেশ। ঠিক পরের দিনই অভিনয়।

স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের কথা। 'একবাড়ি' বিক্রি—ন স্থানং তিলধারণং—। আমি অশৌচ অবস্থাতেই থিয়েটারে গেছি, অভিনয় করতে নয়, অভিনয় থেকে ছুটি

নেবার জন্যে। বাড়ীতে কিছু ভালো লাগছিল না, তাজা দগ্‌দগে বেদনাটাকে খানিক ভুলে থাকার জন্যেই ওঁরা আমাকে জোর করে থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। আমি যে আজ নামতে পারব না এর একটা কৈফিয়ত তো দর্শকদের দিতে হবে—তাই ম্যানেজার হিসেবে অভিনয়ের আগে দানীবাবু আমাকে নিয়ে মঞ্চে গিয়ে হাজির হলেন। দর্শকদের জানালেন আমার পিতৃবিয়োগের জন্য আমি আজ মঞ্চাবতরণে অক্ষম।

আমি হাতজোড করে বললাম: এ অবস্থায় আপনারা দয়া করে আমায় ছুটি দিন, আজকে মঞ্চে নামতে না পারায় ক্ষমা করুন।

দর্শকরা নির্বাক হয়ে রইল। যবনিকা ধীরে ধীরে আমাদের দু'জনকে ঢেকে দিল।

তার কিছুক্ষণ পরে অনাদিবাবু তাঁর গাড়ী করে আমায় বাড়ী পৌছে দিলেন। বাড়ী পৌছে দিয়ে অনাদিবাবু বহুক্ষণ বসে বসে গল্প করলেন, তারপর অনেক রাতে বাড়ী গেলেন।

শুধু 'প্রফুল্ল' কেন, সে সপ্তাহে 'শ্রীবৎস' নাটকেও নামতে পারলুম না।

এদিকে মামলায় যা অবশ্যম্ভাবী তা-ই হল। বাড়ী 'সেল'-এ উঠেছিল এবং বিক্রীও হয়ে গিয়েছিল। আমার প্রথম এবং প্রধান চিন্তা হল বাড়ীর সকলকে নিয়ে গিয়ে রাখব কোথায়?

বন্ধুরা সব বললেন—যাঁর বাড়ী তাঁকে গিয়ে বলুন, তিনি নিশ্চয়ই কিছু বিবেচনা করবেন।

অগত্যা তাই করলাম। যিনি বাড়ী কিনেছিলেন তাঁর অ্যাটর্নীর বাড়ীটা চিনতাম। ভবানীপুরে যেখানে আমাদের যাত্রার ক্লাব-ঘরখানা ছিল, সেখান থেকে আরও খানিকটা এগিয়ে নর্দার্ন পার্কের শেষপ্রান্তে আমাদের হরিমোহনবাবুর প্রতিবেশী। হরিমোহনবাবুই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক আমাকে চিনলেন। তাঁকে অনুনয় করে বললাম—শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত থাকা যায় না?

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—সে তো একমাস, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি বললেন—ভাদ্রমাস পড়ে যাবে—'পজেসন' নিতে দেরী হবে। তারপর একটু থেমে বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, তাই হবে। তবে কথা দিন, পয়লা আশ্বিনই আপনারা উঠে চলে যাবেন বাড়ী ছেড়ে।

কথা দিলুম।

যাক্, কয়েকটা দিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

যথাসময়ে শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেল। এই উপলক্ষে যা খরচপত্র হয়েছিল সেটা থিয়েটার থেকে নিয়েছিলাম অবশ্য। বন্দোবস্ত হল যে মাইনে থেকে মাসে মাসে কেটে নেবে।

উল্টোডাঙ্গার বাড়ীতেই গিয়ে উঠব ঠিক করলাম—ওখানে দারোয়ান, মালী এরা সব রয়েছে। এ-বাড়ী থেকে জিনিসপত্র সব পাঠাতে লাগলাম একে একে।

দেখতে দেখতে পয়লা আশ্বিন এসে গেল। ভাদ্রমাসের শেষ দিন অনাদিবাবুর গাড়ীটা চেয়ে রাখলুম। গাড়ী নিয়ে তাঁর সেই পুরনো ড্রাইভার জহুরী আগের দিন রাত্রি থেকেই আমার ওখানে রইল। তারপর ১লা আশ্বিন সূর্যোদয়ের আগেই মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আর পঞ্চুর একটা পোষা কুকুর—সেটা দেখি আগেভাগেই গাড়ীতে উঠে বসে আছে—সব নিয়ে এ-বাড়ীর সমস্ত মায়া পরিত্যাগ করে ছেড়ে চললুম। যখন উল্টোডাঙ্গা গিয়ে পৌছলুম, তখন দেখি যে, পূর্বাকাশ লাল হয়ে উঠেছে, সূর্যদেব তাঁর দৈনন্দিন পথপরিক্রমায় বেরুচ্ছেন।

মা অবশ্য ওখানে থাকলেন না, কয়েকদিন পরেই উনি আবার তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

সুধীরা রইল ছেলেমেয়েদের নিয়ে একলাই ওখানে। নেপালী দারোয়ান ছিল—খুব বিশ্বাসী, আর ছিল মালী। আমরা পৌছেই দেখি সে উন্থন-টুন্থন সব তৈরী করে রান্নাঘরের ব্যবস্থা করে রেখেছে, ঘরদোর পরিষ্কার করে রেখেছে।

সেখানেই বাস করতে লাগলুম। চারদিক ফাঁকা—মাঝখানে জেগে আছে দ্বীপের মতো বাড়ীটা। ওখান থেকেই যাতায়াত করি থিয়েটারে একটা রিক্শা নিয়ে। ফিরতে রাত হয়, একটা-দেড়টার কম নয়।

মামারা দেখতে এলেন। সুধীরাকে বলেছিলেন, এখানে কি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকা যায়! আমাদের বাড়ীতে এসে থাকো।

সুধীরা সংক্ষেপে বলেছিল—না, এই তো বেশ।

আমার শ্বশুরমশাইও এসেছিলেন। তিনি তাঁর মেয়েকে বলেছিলেন,—আমার ওখানে চল। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় তুই একলা থাকবি কি করে? কোনদিন শুনব ডাকাতে মেরে রেখে গেছে।

সুধীরা তাতে বলেছিল—তোমার কোন ভয় নেই বাবা, আমি এখানেই বেশ থাকব।

হ্যাঁ, একটা ব্যাপার বলতে ভুলে গেছি।

আমার তখন অশৌচের কাল চলছে—এমন সময় দেখলাম প্রাচীরপত্র পড়েছে স্টারে 'চিরকুমার সভা'র। এ অবস্থায় আমার তো মঞ্চে নামা সম্ভব নয়। শুনলাম চন্দ্রবাবু করবেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

ব্যাপারটা কিরকম যেন ঠেকল। শিশিরবাবু নিজেব থিয়েটার ছেড়ে এখানে আসছেন অভিনয় করতে! কি উদ্দেশ্য কে জানে!!

কৌতূহলী হয়ে আমি অভিনযের দিন গেলাম থিযেটারে। উইংস-এর পাশে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ অভিনয়টা দেখলাম।

অভিনয়ের পর ডিবেক্টররা আমায় জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন?

বললাম—ভালোই, আপনারাও তো দেখলেন!

ওঁরা কিছু বললেন না, শুধু একটু হাসলেন।

অভিনয়ের পরে অবশ্য শিশিরবাবু আমাকে বলেছিলেন, তোমার একটা ফরম্যাল পারমিশান নেওয়া আমার উচিত ছিল। তোমায় খুঁজেছিলুম, পাইনি।

আমি বললাম—আমি তো উইংস-এর পাশেই ছিলাম দাঁড়িযে সর্বক্ষণ।

এই কথা শুনে উনি আর কিছু না বলে অন্যদিকে চলে গেলেন।

আমার বিস্ময় ওঁর চন্দ্রবাবু করার জন্য নয়—আমার বিস্ময় ওঁর নিজের থিয়েটার ছেড়ে স্টারে আসার জন্য। বুঝলাম যে ওঁর নাট্যমন্দিরের খেলা বোধ হয শেষ হয়ে আসছে।

যাক, শ্রাদ্ধশান্তি হযে গেল—অশৌচের শেষ হল।

স্টারে একদিন অপরেশবাবু হাবুলকে ডেকে বললেন—হাবুল, 'শ্রীবৎস'র সাটটা নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় দিয়ে এসো। প্রবোধ চলে গেল, অহীনের পিতৃবিয়োগ হল—আরও ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে? এ বই আমাদের ধাতে সইবে না। ও গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়াই ভালো।

এরপর নানা বই হতে লাগল, নতুন পুরনো। এবার ধরা হল গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'—প্রথম অভিনয়ের তারিখ হল জন্মাষ্টমী, ২৭শে আগস্ট, ১৯২৯। কৃষ্ণভামিনী—নিমাই, সুবাসিনী—নিতাই, মনোরঞ্জনবাবু—জগাই, আমি—মাধাই।

এর পর হল অপরেশবাবুর 'ছিন্নহার'। আমি করেছিলাম মিঃ রায়, কালাচাঁদ—তিনকড়িবাবু, চিরঞ্জীব—কুঞ্জবাবু।

এইভাবেই চলতে লাগল—এদিকে শীতকাল এসে গেল,—নতুন বই ধরতে হয়। শুনলাম, অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি'র নাট্যরূপ দিচ্ছেন অপরেশবাবু। নতুন

বই-এর নামে একটা উৎসাহের সঞ্চার হল থিয়েটারে। প্রবোধবাবু স্টারে নেই, গদাইবাবু বা গদাধর মল্লিক সব দেখাশোনা করছেন। গদাইবাবু ধনী ব্যক্তি। আমাকে ডেকে বললেন—খুব বেশী খরচ করবেন না মশাই—স্টারের অবস্থা তো দেখছেন।

অপরেশবাবু ম্যানেজার, কিন্তু নাটক প্রডাকশনের সমস্ত দায়িত্ব আমারই ওপর এসে পড়ল।

গদাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী কী সিন্ চাই?

আমি বললাম—অন্য সব পুরনো যা-কিছু আছে তাতে রং-চং ফিরিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু একটা সিন্ তৈরী করতেই হবে। রেলস্টেশনের দৃশ্য। শেয়ালদাতে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে, কামরায় বসে আছে 'বাণী'। পিতা রমাবল্লভ প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করেছেন। লোকজনের আনাগোনা, হকারের চীৎকার, কুলীদের মাল-পত্তর বওয়া—চারিদিকে একটা দারুণ ব্যস্ততা। ট্রেন ছাড়তে তখনো বেশ দেরী আছে। এমন সময় স্টেশন কাঁপিয়ে আসাম মেল এসে পড়ল। অসুস্থ অম্বরকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসতে আসতে বাহকেরা একটু থামল বিশ্রাম নিতে। আর থামল ঘটনাচক্রে সেই কামরারই সামনে।

অম্বরকে চেনা যায় না—শীর্ণ, রোগ-জীর্ণ দেহ, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। তবু তার দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র কেঁপে উঠল বাণীর অন্তর। সে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—ও কে? ও কে বাবা?

রমাবল্লভ বুড়োমানুষ, তিনিও চিনতে পারেননি, বললেন—অসুস্থ কোন প্যাসেঞ্জার-ট্যাসেঞ্জার হবে—ও কিছু না।

কিন্তু তার দিকে ভালো করে দেখতেই বাণীর সব সন্দেহ কেটে গেল—সে পাগলের মতো কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়ল স্বামীর বুকের ওপর।

এর পরেই পড়তো যবনিকা। নাট্যকার গল্পটা মেলাবার জন্য আরও একটা সিন্ করেছিলেন। কিন্তু 'এ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স' নাটক শেষ করতে মন চাইছিল না। তাই এখানেই সমাপ্তিসূচক যবনিকা পড়তো।

এই একটিই 'সেট' তৈরী হয়েছিল নতুন—সেট, সাউণ্ড এফেক্ট ও আলোক-নিয়ন্ত্রণ—সব মিলে দৃশ্যটি অদ্ভুত বাস্তবানুগ হয়েছিল এবং দর্শকদের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

'মন্ত্রশক্তি'র প্রস্তুতিতে পুরোদমে লেগে গেলাম। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে

যায় বুঝতে পারি না। ফিরতে রোজই বেশ রাত হয়। স্ত্রী প্রায়ই অনুযোগ করেন —এত রাত্রে রোজ রিক্শা করে এই রাস্তা দিয়ে ফের—কোনদিন কিছু বিপদ-আপদ না ঘটে। জায়গাটা তো ভালো নয়।

কথাটা আমার মনে লাগল, রাত্রে আসতে আমারও যে ভয় করত না, তা নয়। গুণ্ডার জায়গা—যদি সত্যিই কিছু ঘটে।

একদিন চলে গেলাম উল্টোডাঙ্গার থানায়। গিয়ে দেখি ওখানকার ও-সি হলেন আমার খুব পরিচিত ব্যক্তি—বিনযদা।

তিনি আমায় দেখে বললেন—কী ব্যাপার হে!

বললাম সব কথা খুলে—বাড়ী ফিরতে রাত হয়, স্ত্রী একা থাকে বাচ্চাদের নিয়ে। একটু দেখবেন।

বিনযদা অল্প একটু হেসে বললেন—না দেখলে চলছে কি করে?

বিস্মিত হয়ে বললাম—তার মানে?

উনি বললেন—পুলিশের লোক আমরা—সব খবরই রাখি। জায়গাটা যে ভালো নয় সে তো বুঝতেই পেরেছ। গুণ্ডাদের সব ডেকে বলে দিয়েছি—বাবু আমার লোক—ওর যেন কোন বিপদ-আপদ না হয়। এবার বুঝলে? তুমি যে রাত-বিরেতে যাতায়াত কর তাতে কোনদিন কোন অসুবিধে ঘটেছে?··ঘটেনি তো! ঘটবেও না কোন দিন। যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যাও, কোন ভয় নেই।

যাক, এদিকটা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

উল্টোডিঙ্গির বাড়ীর কথা আজও সব স্পষ্ট মনে পড়ে। বৃষ্টির দিনে একটু বেশী বৃষ্টি হলে উঠোনে জল জমে যেত, আর সেই জলের সঙ্গে পুকুরের জল মিশে একাকার হয়ে যেত। যখন ল্যাবরেটরী ছিল তখন ছোকরা ইলেকট্রিশিয়ানের দল এই পুকুরের জল থেকে ভেসে-আসা ছোট ছোট কাছিম ধরতো। আমার ওতে মোটে রুচি ছিল না, কিন্তু ওরা বলত যে ওর মাংস নাকি অত্যন্ত উপাদেয়।

এসব অবশ্য আমার ওখানে সস্ত্রীক ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসার আগের কথা।

এখন এরা এখানে আসার পর একটা সমস্যা দেখা দিল। মেয়ে এতসব খোলামেলা জায়গা পেয়ে চারিদিকে বেশ ঘুরে বেড়ায়। ভয় হয়, কোন সময় পুকুরধারে পা হড়কে জলে পড়ে না যায়। পুকুরে হাঁস ছিল—সেই হাঁস দেখতে যাওয়া শিশুমনে খুব স্বাভাবিক।

ছেলে অবশ্য অন্যদিকে মন দিতে পারে না। সে ছিল বাবার খুব 'ন্যাওটা'। বাবাকে 'বাবুজী' বলত—সে প্রায়ই 'বাবুজী'কে খুঁজত। তখনকার দিনে পাঞ্জাবীরা

নতুন ব্যবসা করতে আসছে কলকাতায়। হরনাম সিং বলে একজন পাঞ্জাবী আসত বাবার কাছে, আবশ্যকমতো টাকা-পয়সা নিত। সে এসে বাবাকে বলত 'বাবুজী'। সেই থেকে আমার ছেলেমেয়েও বাবাকে ডাকতে আরম্ভ করেছিল বাবুজী বলে। সেই 'বাবুজী'কে ওরা ভুলতে পারছিল না কিছুতেই।

বলত—ভবানীপুর যাব। এক-একদিন মনের ভুলে বাবার মতো কাউকে দেখলে 'ঐ বাবুজী' বলে ছুটে যেতে চাইত।

একদিনের কথা বলি। সকাল থেকেই সেদিন ছেলের শরীরটা ভালো ছিল না। ঐ অবস্থায় ওকে দেখে আমি বেরিয়ে যাই। সেদিন সুরু হয়েছিল বৃষ্টি—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। সমস্ত রাত ধরে এমন বৃষ্টি যে থিয়েটারেই আটকে গেলাম—কোনমতেই বেরুতে পারলাম না। বাড়ী ফিরলাম পরদিন সকালে।

ছেলের এদিকে ভয়ঙ্কর পেটখারাপ। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস আকার নিয়েছিল। ছেলে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে—সুধীরা কিন্তু নার্ভাস হয়ে পড়েনি। আমার ভাই-এর এক বন্ধু ছিল ডাক্তার। স্ত্রী তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন আর কোনো উপায় না দেখে। ডাক্তার বৃষ্টির জন্যে আসতে পারেননি—তবে অসুখ শুনে ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় অসুখটা আর বাড়েনি। ওই ওষুধেই কাজ দিয়েছিল।

এইসব কারণে ভেবে দেখলাম, এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও বাসা নেওয়াই ভালো কাছে-পিঠে। কিন্তু চট্ করে বাড়ী পাই-ই বা কোথায়?

কিন্তু আমার তখন সীমিত আয়, অর্থের অনটন প্রকট হয়েই দেখা দিতে লাগল। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে—লেখাপড়ার দিকটা ওদের মা-ই এখন দেখাশোনা করছে—কিন্তু আজ বাদে কাল তো ওদের স্কুলে দিতে হবে।

মা তো আমার তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সুতরাং সংসার এবার তার সব সমস্যা নিয়ে আমাকে পাকে পাকে জড়াতে লাগল। কিন্তু যার জীবন ও জীবিকা নাট্যলক্ষ্মীর পায়ে নিবেদিত তার কাছে সাধারণ যে-কোন সমস্যাই অসাধারণ হয়ে দেখা দেয়।

এদিকে 'মন্ত্রশক্তি'র উদ্বোধনের তারিখ যত এগিয়ে আসতে লাগল, তখন কোথায় রইল সংসার আর তার সমস্যা। পাগলের মতো খেটেই চলেছি দিনরাত।

পোশাক-পরিচ্ছদে খরচ করা হয়েছিল মোটামুটি। আমি পরেছিলাম খড়কে ডুরে আদ্দির পাঞ্জাবি, যাকে বলে 'ব্যায়লা-কাট'। এ ছাড়া অন্য 'সিন্'-এর জন্য সিল্কের ওপর লম্বা সুতিকাটা পাঞ্জাবিও ছিল, আর ছিল একটা গোলাপী রং-এর গেঞ্জী। আরও

একটি গেঞ্জী আমি পারতাম—সেটি আমার বাড়ী থেকে আনা—স্ত্রীর হাতে-বোনা —'পারফোরেটেড' করা।

কুমারবাবু একটি চমৎকার ছড়ি দিয়েছিলেন—বিলিতি। আমি অনেকদিন ব্যবহার করেছিলাম সেটা, তারপর একদিন আমারই অসাবধানতায় সেটা ভেঙে যায়।

'মন্ত্রশক্তি' জমে গেল। শুধু জমে গেল নয়, আজকের ভাষায় যাকে বলে 'সুপারহিট'। বহুদিন ও নাটক চলেছিল—প্রচুর পয়সা দিয়েছিল স্টারকে। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম—রমাবল্লভ—কুঞ্জবাবু, মথ্রো—তিনকড়িবাবু, মৃগাঙ্ক—আমি, অম্বর —ইন্দু মুখুজ্যে, পরাণ—তুলসী চক্রবর্তী, বাণী—কৃষ্ণভামিনী, তুলসী—সুবাসিনী, কৃষ্ণপ্রিয়া—কুসুমকুমারী, অজ্ঞা—সুশীলাবালা, জহরা—রাজলক্ষ্মী। অভিনয়ের তারিখ হল ২৩শে নভেম্বর, ১৯২৯ সাল।

মনে আছে এই প্রথম অভিনয়ের দিনই এক অঘটন ঘটে গেল। শান্তবালার করার কথা ছিল কৃষ্ণপ্রিয়ার পার্ট। এই পার্টেই সে শেষদিন পর্যন্ত রিহার্সাল দিয়েছিল অপরেশবাবুর কাছে। সে যথারীতি সাজতেও এল অভিনয়ের দিন। থিয়েটারে প্রচুর ভীড়, সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। 'ড্রপ' ওঠবার সময় দেখা গেল শান্তবালা জ্বরে বেহুঁস। মাঝে মাঝে বমি করছে, সাজতে সাজতে শুয়ে পড়ছে, উঠতে পারছে না একেবারেই।

তার যে শরীর এতখানি খারাপ হয়ে পড়েছে একথা আগে কাউকে জানায়নি— অভিনয়ের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠার জন্যেই সে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল অভিনয়টা চালিয়ে নিতে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারল না।

কিন্তু এদিকে উপায়? সকলেই খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছি আমরা। অপরেশবাবু চুপচাপ বসে তামাক টেনে যাচ্ছেন।

আমাদের সকলের এ অস্থিরভাব দেখে অপরেশবাবু আমাদের আশ্বস্ত করলেন, বললেন—কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর হাবুলকে ডেকে কানে কানে কি বললেন। হাবুল চলে গেল।

এদিকে যত সময় যায় ততই আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। একে অভিনয়ের প্রথম রজনী, তার উপর 'হাউস ফুল'।

অপরেশবাবু স্টেজের পাশের জায়গাটুকুতে পায়চারি করছেন, আর খালি বলছেন —হাবুল এল? হাবুল?

হাবুলের দেখা নেই। অপরেশবাবু একসময় বললেন—

—শান্ত আর এখানে থেকে কি করবে—ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

শান্ত এ-কথা শুনে কেঁদে-কেটে অস্থির। অপরেশবাবু গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—মনে কিছু করো না—এ অবস্থায় তো তুমি স্টেজে নামতে পারবে না। কি আর করবে বল—সব তোমার ভাগ্য।

সত্যিই শান্তর পক্ষে সম্ভব ছিল না অভিনয় করা। সে চলে গেল। কিন্তু এখন কথা হল ওর পার্টটা করবে কে?

দেখতে দেখতে আরো দশ-পনের মিনিট কেটে গেল। অভিনয় আরম্ভ হতে আর বেশি দেরী নেই—এমন সময় হাবুল এল, সঙ্গে একটি মহিলা—মাথায় ঘোমটা-টানা।

অপরেশবাবু ও'কে বললেন—শুনেছ তো সব—নাও, এখুনি সেজে নাও, এখুনি নামতে হবে।

মহিলাটি বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে বললেন—সে কী! পার্টের কিছুই জানা নেই—এমন কি বইখানাও পড়া নেই আমার!

অল্প হেসে অপরেশবাবু বললেন—কোন ভয় নেই। তুমি ঠিক পারবে। যাও, শিগ্‌গির মেক-আপ করে নাও, সিনের ফাঁকে ফাঁকে হাবুল তোমাকে পার্ট পড়িয়ে যাবে। প্রম্পটার তো আছেই।

আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম—মহিলাটি যথারীতি মেক-আপ করে সেজে মঞ্চে নামলেন, অভিনয় করলেন এবং এক সিনে দর্শকদের কাছ থেকে হাততালি পেলেন। দর্শকরা ঘুণাক্ষরে টের পেলেন না যে উনি একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় নেমেছিলেন। অভিনেত্রীটি হলেন পাকা অভিনেত্রী—নাম কুসুমকুমারী। এককালের নাট্যসম্রাজ্ঞী।

পুরনো ম্যানেজারের মাথা, আর পুরনো শিল্পীর দক্ষতার গুণে আমাদের সেদিন মুখরক্ষা হয়েছিল আশাতীত ভাবে।

প্রথম রাত্রি থেকেই মন্ত্রশক্তি লোকের মনে ধরে গিয়েছিল। এ বইতে কত লোক যে কত মেডেল দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, সিলেটের জমিদার গোপিকাবল্লভ রায় তিনকড়িবাবুকে, আমাকে আর কৃষ্ণভামিনীকে বহুমূল্য পাথর-বসানো পদক উপহার দিয়েছিলেন।

এ বইতে পার্ট সকলেরই ভালো হয়েছিল, বিশেষ করে উপরোক্ত তিনজনের পার্ট সম্বন্ধে লোকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল।

সংবাদপত্রের সমালোচকরাও 'মন্ত্রশক্তি'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন, বাহুল্য-বোধে সেগুলি আর এখানে উদ্ধৃত করলাম না।

এইভাবে 'মন্ত্রশক্তি' চলতে লাগল অপ্রতিহত গতিতে।

নাটকের সাফল্য, আমার সাফল্য—চারিদিকে অজস্র প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টিতে

মনমেজাজ খুব শরীফ হয়ে উঠল বটে, কিন্তু আসল ব্যাপারের কোন উন্নতি হল না, অর্থাৎ আর্থিক অনটনটা রয়েই গেল। মন ভরল কিন্তু পেট ভরল না। এই আর্থিক অনটনের জন্যেই মিনার্ভার আমন্ত্রণ যখন এল, তখন তা সাগ্রহে গ্রহণ করলাম। এই মিনার্ভায় যোগদান নিয়ে সমস্ত অবস্থাটা যেরকম ঘোরাল হয়ে উঠল, তা পাঠকদের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্টারে থাকাকালীন এক সময় বেড়াতে বেড়াতে মিনার্ভায় গিয়েছিলাম। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যাইনি, এমনই গিয়েছিলাম। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী উপেন মিত্র মশাই তখনই আমার সঙ্গে এখানে যোগদানের জন্য প্রস্তাব করলেন। আমার তখন অর্থের দারুণ টানাটানি চলেছে, চুক্তিপত্রে লোভনীয় শর্ত দেখে 'না' করতে পারলুম না। স্টারে যা পেতাম তার থেকে অনেক বেশী। প্রথমতঃ, তখনকার দিনে থিয়েটারে সর্বোচ্চপদ—ম্যানেজার; দ্বিতীয়তঃ, মাসিক মাহিনা পাঁচশো টাকা, বছরে সাড়ে তিন হাজার টাকা বোনাস এবং একটা 'বেনিফিট' নাইট; অর্থাৎ সেই রাত্রে যা বিক্রি হবে সব আমার। কণ্ট্রাক্ট হল তিন বছরের জন্যে, সই করে ফেললাম। বিগত মামলার স্মৃতি তখনও ভুলতে পারিনি, জ্বলজ্বল করছিল মনে, তাই আবার যদি কোন গোলমাল হয় এইজন্যে গেলাম অ্যাটর্নীর বাড়ী। অ্যাটর্নী সব কাগজপত্র দেখে বললেন—স্টারের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট তো শেষ হয়ে গেছে আপনার, অতএব আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না। কোন ভাবনা নেই আপনার।

যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এই মিনার্ভায় যোগদানের খবরটা আমি কাউকেই জানাইনি, কিন্তু ওঁরা কিরকম করে যেন আঁচ পেয়ে গিয়েছিলেন। ওঁরা নিজেরা আমায় কিছু না বলে গণদেবকে পাঠালেন আমার কাছে। গণদেব এসে সরাসরি আমায় জিজ্ঞাসা করল কোনরকম ভূমিকা না করেই বললে,—তুমি নাকি মিনার্ভায় যাচ্ছ?

—তোমাকে কে বললে?

—শুনলাম।

একটু চুপ করে থেকে বললাম—হ্যাঁ, যাব বলে ভাবছি।

গণদেব বললে—কিন্তু কেন?

আমি ঈষৎ হেসে বললাম—মানে আর কি? টাকা।

গণদেব বললে—কত টাকা বেশী দেবে ওরা?

আমি তখন চুক্তির শর্ত সব খুলে বললাম।

ও তখন বললে—শোন, কর্তৃপক্ষই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। এখন

তুমি পাচ্ছ চারশো পঁচিশ করে—ওটা এবার থেকে সাড়ে চারশো করেই পাবে আর তুমি হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। এর বেশী ওঁরা আর দিতে পারবেন না—স্টারের অবস্থা তো দেখছ।

আমি বললাম—সব বুঝলাম, কিন্তু আমার টাকার খুব প্রয়োজন—এ টাকায় আমার চলছে না।

গণদেব বললেন—ওঁরা সে কথাও বলছিলেন—সে রকম দরকার হ'লে ওঁরা তার ব্যবস্থা করে দেবেন মাঝে মাঝে।

আমি বললাম—কি ব্যবস্থা? অ্যাড্ভান্স দেবেন তো? সে তো ধারের সামিল—মাসে মাসে কেটে নেবেন তা মাইনে থেকে। না ভাই, ধার আমি নেব না।

গণদেব খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললে—তাহলে তুমি যাবেই?

—হ্যাঁ ভাই, না গেলে উপায় নেই।

গণদেব বললেন—তোমার সঙ্গে ছেলে-ছোকরারাও চলে যাবে তো?

না ভাই, আমি নিজেই যাচ্ছি, কাউকেই দলে টানছি না।

গণদেব আর কিছু না বলে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে উঠে চলে গেল।

এরপর একদিন অপরেশবাবু এলেন স্বয়ং। সেদিন মেক-আপ রুমে বসে মেক-আপ তুলছি, এমন সময় তিনি ধীরে ধীরে এসে ঢুকলেন ঘরের ভিতরে।

ওঁকে অভ্যর্থনা করে ঘরে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আজ এখনো বাড়ী যান নি যে!

উনি বললেন—যাবো কী করে? আপনি যে আমাদের খুব ভাবিয়ে তুলেছেন।

এইবার বুঝলাম উনি কি জন্য আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমি চুপ করে থেকে মেক-আপ তোলা শেষ করতে লাগলাম।

উনি বললেন—এটা আপনার মহাগুরু-নিপাতের বৎসর; এ বৎসর ঠাঁই-নাড়া না করাই ভালো।······না না—আমি উপদেশ দিচ্ছি না, শুধু শাস্ত্রবাক্যটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

ধীরকণ্ঠে বললাম—আমি তা জানি। হয় তো খুবই বিপদের মধ্যেই ঝাঁপ দিচ্ছি, কিন্তু আমার না গিয়েও কোনো উপায় নেই।

অপরেশবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—মিনার্ভায় তো যাচ্ছেন, ওখানে টিকতে পারবেন কি? ওখানকার যা আবহাওয়া সে সম্বন্ধে তো আমার খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে। এক এক সময় এমন দৃশ্য নজরে পড়বে যাতে চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে।

আমি বললাম—দেখুন, প্রকাণ্ড ঋণের বোঝা আমার মাথায়। টাকার আমার খুব প্রয়োজন—আমার না গিয়ে কোনো উপায় নেই।

অপরেশবাবু বুঝলেন যে আমায় সঙ্কল্প থেকে টলানো যাবে না, তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে ছাড়লেন না, বললেন—দেখুন, আমি ব্রাহ্মণ। আপনি স্টার ছেড়ে যাবেন না। আমি তো নাম-মাত্র ম্যানেজার—আসলে কাজ-কর্ম সব তো আপনাকেই করতে হবে।

আমি করযোড়ে বললাম—আপনি একটু ভুল করছেন। কর্তৃত্বের লোভ বা মোহ আমার নেই। আমার প্রয়োজন টাকার।

উনি আর কিছু না বলে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেলেন।

আমার কিন্তু সেটাই ছিল স্টারে শেষ রজনী। নরেশ ঘোষ, যাকে আমরা গৌর বলে ডাকতুম, সে বরাবর আমার সঙ্গে ছিল। ওখানে আমার যা কিছু জিনিসপত্র ছিল, আমার ড্রেসার মণি তা সব বেঁধে-ছেঁদে দিল। তারপর গৌর একটা ট্যাক্সি ডেকে এনে জিনিসগুলো সব তাতে তুলে দিল। আমি চলে গেলাম উল্টাডাঙ্গা।

আমার মিনার্ভার যোগদানের তারিখ হলো ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩০। আমার জায়গায় স্টারে 'মৃগাঙ্ক' করতে এলেন মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), পরে জুন মাসে এলেন স্বয়ং শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

এরপর মিনার্ভায় যেদিন প্রথম গেলাম, তখন দেখি নীচে বসে উপেন মিত্র মশায় তামাক খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা করে বসালেন, তারপর নিয়ে গেলেন দোতলায়। ঘরটার সঙ্গে লাগোয়া একটা সিঁড়ি ছিল স্টেজে নামবার। তেতলা থেকে যে মূল সিঁড়িটা নেমেছে, তার সঙ্গে এক জায়গায় সংযুক্ত হয়েছে।

যে ঘরটা আমাকে উনি দিলেন সাজবার জন্যে সেটি বেশ বড়। একার পক্ষে বেশ ভালোই বলা চলে। এই ঘরটি আগে ছিল শিল্পনির্দেশক পরেশ বসু মশায়ের। তিনি নীচে চলে গেলেন খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েই।

মিনার্ভায় তখন বিজনেস-ম্যানেজার ছিলেন রামচন্দ্র ঘোষ। বহুদিনের পুরনো লোক, সেই গিরিশবাবুর সময় থেকেই রয়েছেন এখানে। এঁর ছেলে দ্বিজেন ঘোষও তখন মিনার্ভার ব্যবসায়িক দিকটা দেখেন। আমার ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট নেই শুনে এই দ্বিজেন ঘোষই আমার একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে দিলেন 'নিউ ইয়র্ক' ব্যাঙ্কে। ওঁরা সকলেই প্রথম দিন থেকে এত ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন আমার সঙ্গে যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

এদিকে মিনার্ভায় আমার কাজ শুরু হতে না হতেই এক বিপদ এসে জুটলো। স্টার আমার নামে এক মামলা শুরু করে দিল খেসারতের দাবি করে। কারণ কি,—না স্টারে থাকাকালীন আমি নাকি কাজে গাফিলতি করেছিলাম—অনেকদিন নাকি ইচ্ছে করেই স্টেজে নামিনি।

এই ধরনের নালিশ শুনে তো আমি অবাক। মানুষ এত নীচে নামতে পারে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল—এধরনের অভিযোগের জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। বিশেষ করে কোর্টে যখন কেস উঠল তখন ওঁদের ব্যারিস্টার শরৎ বোসের কী সব বিশ্রী উক্তি—যা শুনলেই মন-মেজাজ সপ্তমে উঠে যায়। জেরার মুখে উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, আপনি কতটা মদ এক সঙ্গে খেতে পারেন, বেহুঁশ না-হওয়া পর্যন্ত?

এই প্রশ্ন শুনে তো আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত একটা যেন তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললাম—সেটা নির্ভর করে অনেকটা 'মুডের' উপর।

এই ধরনের বহু বক্রোক্তি আর কথা কাটাকাটি। এমন সব কথা যা শুনে দুঃখে ও বেদনায় মনটা একেবারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। থিয়েটার থিয়েটার করে তখন এমনই পাগলের মত ছিলাম যে, সংসারকে দেখিনি, স্ত্রী-পুত্র কন্যার দিকে তাকাইনি। কোনদিন শো-তে অনুপস্থিত হওয়া তো দূরের কথা, কোনদিন ডবল-শো, ট্রিপল-শো পর্যন্ত করেছি। থিয়েটারের কর্মীদের জন্য সেই সময়ই 'চ্যারিটি শো'-র পত্তন করা হয়। একবার মনে আছে, পর পর তিনখানা নাটক একরাত্রে অভিনয় করেছিলাম—'ইরাণের রাণী', 'চৈতন্যলীলা' আর 'ফুল্লরা'। তিনটি ভূমিকাই বেশ বড় এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ। —দারা, মাধাই আর কালকেতু। সে তারিখটাও আমার আজও মনে আছে—২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সাল।

কিন্তু কথা হচ্ছে—এই কি তার পুরস্কার?

মামলা চলতে লাগল; একদিন আমার অ্যাটর্নী আমায় ডেকে বললেন—শুনুন, মামলাটা মিটিয়ে ফেলুন। ওঁদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আপনি আটশো টাকা দিলেই ওরা মামলা তুলে নেবে। আর তা না হলে ওরা যদি ডিক্রি পায় তো কয়েক হাজার টাকা আপনার পকেট থেকে বেরিয়ে যাবে।

আমি বললাম—এখন আমি ঐ আটশো টাকাই বা পাব কোথায়?

অ্যাটর্নী বললেন—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে—ভাবছেন কেন? আপনার নতুন পার্টি মিনার্ভাই দেবে এই টাকা। তারপর ধীরে-সুস্থে আপনি শোধ করে দেবেন।

অগত্যা—শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাবেই রাজী হতে হল। টাকা পেয়ে স্টার মামলা মিটিয়ে ফেললেন। কিন্তু এই হীন মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে মনে যে আঘাত পেলাম সে ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকোল না। আজও মনে পড়লে ব্যথায় টনটন করে ওঠে জায়গাটা।

যাক, এইবার মিনার্ভার কথায় আসি।

ম্যানেজার হিসাবে প্রথমেই কিছু কিছু আইন-কানুনের প্রবর্তন করতে হোল। লক্ষ্য করে দেখলাম—স্টেজের ভেতরে বহু বাইরের লোক এসে ভিড় করে। এমনকি অনেকে এসে মেয়েদের সঙ্গে নানারকম ফষ্টিনষ্টি করে।

এগুলো যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি অশোভন। আমি প্রথমেই এক নোটিশ জারী করে দিলাম যে মঞ্চের ভেতরে কোনো অপ্রয়োজনীয় লোকের আসা চলবে না—আড্ডা দেবার জায়গা এটা নয়। এই বিজ্ঞপ্তির ফলে স্টেজের ভেতরে ফালতু লোকের ভিড় কমে গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটলো।

জনৈক ভদ্রলোক—নামটা তাঁর আর নাই বা উল্লেখ করলাম—তিনি ছিলেন মিনার্ভা থিয়েটারের নিয়মিত দর্শক। যেদিনই থিয়েটার থাকত সেদিনই আসতেন এবং পাঁচ টাকার টিকিট কিনে সামনের সারিতে বসতেন। প্রত্যেক দিন তিনি আসতেন—কোনোদিন তাঁকে অনুপস্থিত হতে দেখিনি। থিয়েটারের দিক থেকে তিনি ছিলেন 'খদ্দের লক্ষ্মী'। তাঁর এই নিয়মিত আসার ফলে থিয়েটারের কর্মীদের প্রায় সকলেই তাঁকে চিনত এবং কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হয়ে গিয়েছিল।

এই ভদ্রলোক করতেন কি—অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে ভেতরে চলে আসতেন। হাঁদুবাবুর ভাই যখন থিয়েটারের অর্কেস্ট্রায় হারমোনিয়াম বাজাতেন, তাঁর কাছে বসে গল্পগুজব করতেন, তামাক খেতেন, তারপর চলে যেতেন। আমার এই নোটিশ জারীর পর দেখা গেল সে ভদ্রলোক আর থিয়েটারেই আসছেন না।

এই না-আসা মানে হল থিয়েটারের এক নিয়মিত দর্শক কমে গেল, অর্থাৎ সপ্তাহে ৪ দিন মাসে ১৬ দিন পাঁচ টাকা করে মোট আশী টাকার মত আয় কমে গেল।

এই লোকসানের ফলে উপেনবাবু ও রামবাবু (মালিক ও মালিকপক্ষ) উভয়েই বেশ একটু অসন্তুষ্ট হলেন। মুখে আমাকে কিছু না বললেও বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

এই কথাটা ওঁরা দ্বিজেনবাবুকে (থিয়েটারের একজন প্রশাসনিক কর্মী) বললেন—নোটিশ তো উনি ভালোর জন্যেই দিয়েছেন, কিন্তু এতে যে থিয়েটারের প্রচুর লোকসান। জানেন তো 'যস্মিন দেশে যদাচারঃ'।

দ্বিজেনবাবু কথাটা একদিন আমায় জানালেন, আর না জানিয়েই বা করেন কী? আমি ম্যানেজার! আমি ব্যাপারটা বুঝলাম—দ্বিজেনবাবুকে বললাম, আচ্ছা ভদ্রলোক এইবার এলে একবার আমার কাছে নিয়ে আসবেন তো!

থিয়েটারকে ভদ্রলোক খুব ভালবাসতেন। এই থিয়েটারেরই টানে কয়েকদিন পরে ভদ্রলোক আবার এলেন এবং আমার নির্দেশমতো দ্বিজেনবাবু ওঁকে সঙ্গে করে আমার ঘরে নিয়ে এলেন। আমি তাঁকে খাতির করে বললাম—বসুন।

বসলেন উনি।

আমি বললাম—আপনি রোজ আসেন থিয়েটারে, আমরা সবাই দেখি আপনাকে। দেখতে দেখতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা যে, একদিন দেখতে না পেলেই মনটা খারাপ লাগে। মানে একটা মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বললেই হয়। আপনি যদি আসা ছেড়ে দেন, তাহলে খুবই দুঃখের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি বোধহয় একটু সঙ্কোচ অনুভব করে চুপ করে রইলেন।

আমি বললাম, দেখুন, আমি এই থিয়েটারে এসে দেখলাম থিয়েটারের ভেতরটা যেন অবারিত-দ্বার হয়ে গেছে কলকাতার কয়েকজন বড়লোকের কাছে। তাঁদের আসার আসল উদ্দেশ্য হল থিয়েটারের মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা। আপনিই বলুন, এগুলো দৃষ্টিকটু কিনা। ম্যানেজার হিসেবে খানিকটা ডিসিপ্লিন বজায় রাখা আমার কর্তব্য নয় কি? তাই আমি ঐ নোটিশ জারী করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে একথা খাটে না। আপনি কি আমাদের থিয়েটারের অজানা-অচেনা মানুষ? আপনার সঙ্গে আমাদের দৈনিক সম্বন্ধ। আপনি যথারীতি আসবেন, যাবেন—এ নিয়ম আপনার জন্যে নয়।

আমি বেশ ভালোভাবেই ওঁকে কথাগুলো বুঝিয়ে বললাম। তাতে ওঁর মুখে হাসি ফুটলো—অভিমানও দূর হল। তারপর আবার যথানিয়মে আসা-যাওয়া শুরু করলেন। শুনেছিলাম, পরে উনি উপেনবাবুকে গিয়ে বলেছিলেন আমার বিষয়ে।

যাই হোক, একটা সমস্যা তো মিটল, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে আর একটা সমস্যা দেখা দিল। মেয়েদের সাজঘরের সামনে বসে যারা একটু বয়স্থা স্ত্রীলোক, তারা সিগারেট খেতো। এই দৃশ্য আমার চোখে এত বিসদৃশ লাগলো যে সঙ্গে সঙ্গেই লোক মারফত জানিয়ে দিলাম প্রকাশ্য স্থানে বসে মেয়েদের সিগারেট খাওয়া চলবে না।

মেয়েমহলে এই নিয়ে একটা তুমুল আলোড়ন ঘটে গেল। এই বিষয়ের মোকাবিলা করতে এলেন ওঁদের দিক থেকে প্রবীণা নগেন্দ্রবালা। তিনি বললেন—দেখুন বাবা, অভ্যেস করে ফেলেছি—এখন কি করি বলুন!

বললাম—খেতে হয় ঘরে বসে খান। বাইরের লোকজনের সামনে কেন? জিনিসটা দেখতে বড্ড বিশ্রী লাগে।

নগেন্দ্রবালা মুখ কালো করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন—আমার বয়েস হয়েছে, আমাকে অন্ততঃ অনুমতি দিন।

সংক্ষেপে বললাম—না, তা হয় না। আপনি সকলের থেকে বয়সে বড়। এ হিসেবে আপনার দায়িত্বটাই বেশী। আপনাকে সিগারেট খেতে দেখলে ওরা আস্কারা পাবে আরও বেশী।····· দেখুন, আমি আপনার থেকে বয়সে ছোট, তবু আমাকে কঠোর হতে হচ্ছে। মনে কিছু করবেন না।

ওঁকে শান্তভাবে বুঝিয়ে বলতে উনি বুঝলেন ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—ঠিক আছে বাবা, আপনার কথামতই কাজ হবে। আর 'চুক' হবে না।

মিটল এ সমস্যাটাও।

তখনকার মিনার্ভার কথা স্মরণ করতে গেলে কত কথাই না ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। এই ধরনের কত ছোটখাটো অনিয়ম বা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সংশোধন করতে হয়েছে এবং তাঁরা নিয়ম ও শৃঙ্খলার খাতিরে তা সহজভাবেই মেনে নিয়েছেন। আজ হলে কি হতো বলা যায় না। আজ এসেছে থিয়েটারে দম্ভের যুগ। থিয়েটার এমন একটা শিল্প যা একার দ্বারা কখনও সার্থক করে তোলা যায় না—বহুলোকের সমবেত ঐকান্তিকতা ও সমবেত চেষ্টায় নাটকের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়। ব্যক্তিবিশেষের দম্ভ উত্তাল হয়ে উঠলে তা শেষ পর্যন্ত সমগ্র প্রতিষ্ঠান ভেঙে চুরমার করে দেয়। এ-সত্যটা সেকালের লোকেরা সহজেই বুঝতে পারতেন; তাই নগেন্দ্রবালার মত শিল্পী আমার এ নির্দেশটাকে খুব সহজ সরলভাবে মেনে নিতে পেরেছিলেন। আজকালকার-দিনে কোন প্রচলিত জিনিসের রদবদল করতে গেলেই তারা আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, এবং আড়ালে-আবডালে ষড়যন্ত্র করে আপনাকেই উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করবে।

যাক ওসব কথা—এবার মিনার্ভায় অভিনয়ের কথা বলি। শীগ্‌গিরই মিনার্ভায় অভিনয় হলো 'আত্মদর্শন' আর 'মিশরকুমারী'। 'মিশরকুমারী'তে আমি করলাম 'আবন', আর নীহারবালা তখন ছিল মিনার্ভায়—সে করল 'নাহরিন'।

প্রবোধ গুহ তখন মনোমোহনে—তিনিই তখন এর 'লেসী', অনাদিবাবু মনোমোহন ছেড়ে দিয়েছেন।

মিনার্ভায় মিশরকুমারীতে আমি কিছু অদল-বদল করে নিয়েছিলাম। সমস্ত প্রোডাক্‌সনটিতে একটা নতুন সংস্থাপনার রূপ পাওয়া গিয়েছিল।

প্রথম থেকেই আমার 'আবন' লোকে নিল। নবরূপে সাজানোর জন্যে মিশরকুমারী পেলো প্রচুর খ্যাতি—নতুন করে আবার নাম হলো মিশরকুমারীর।

'আত্মদর্শনে'ও আমি সামান্য একটু-আধটু পরিবর্তন করলাম। তাতেও ফল ভালই হয়েছিল।

এদিকে আমি মিনার্ভায় আসার মাসখানেক পরেই নীহারবালা মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেল মনোমোহনে। ওখানে তখন প্রবোধবাবু নতুন দল গড়েছেন—প্রভাত সিংহ, ভূমেন রায় প্রভৃতিদের নিয়ে।

আমি মিনার্ভায় নিয়ে এলাম রবি রায়কে। উপেনবাবুর বিশেষ মত ছিল না, আমি একরকম জোর করেই নিয়ে এলাম। উনি তখন বললেন—শরৎ চাটুজ্যে হিরো, শরতের বেশী মাইনে দিতে পারব না।

—বেশ, তাই হবে।

কিন্তু পুরনো পুরনো বই নিয়ে আর কতদিন কাটান যায়? উপেনবাবুকে বললাম—এবার নতুন বই ধরুন।

উপেনবাবু বললেন—কথাটা আমিও ভাবছি।

কয়েকদিন পরে উনি একখানা নতুন বই, মানে পাণ্ডুলিপি নিয়ে এলেন। নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রাঙারাখী'।

নাটকখানি পড়া হল একদিন। আমার কিন্তু খুব ভাল লাগল না, কিন্তু লক্ষ্য করলাম উপেনবাবুর ইচ্ছা আছে নাটকখানি করবার। আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কি কোনরকম কথা দিয়েছেন নাকি?

উপেনবাবু বললেন—না, মানে ঠিক তা নয়। বইখানা হাতে পেয়েছি, ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। আপনি দেখে-শুনে ছাটকাট করে লাগিয়ে দিন, আমার মনে হয় আপনি চেষ্টা করলে জমিয়ে দিতে পারবেন।

আমি চুপ করে আছি দেখে উনি আবার বললেন—আসল কথা কি জানেন, জলধরবাবুর লেখা যেমনই হোক, উনি আমাদের বড় পয়মন্ত লোক। ওঁর লেখা 'সত্যের সন্ধানে' আমাদের যথেষ্ট পয়সা দিয়েছে।

বললাম—বুঝলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন—এ গল্প কি বাঙালী দর্শক নিতে পারবে?

উপেনবাবু বললেন—দেখুন না একবার পরখ করে। ছেলে-ছোকরারা খুব দেখবে। আমার মনে হয় ও ঠিক চলে যাবে।

এর ওপর আর কথা নেই—শুরু করলাম মহলা।

বইটা এমন কিছু নয়, তবে দৃশ্যসজ্জা, টিম-ওয়ার্ক আর সকলের অভিনয়ের গুণে নাটকখানি বেশ জমেছিল। 'রাঙারাখী'র অভিনীত হয় ১৯৩০ সালের জুন মাসে। তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এবং বিদেশী-দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের ঢেউ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

'রাঙারাখী' চলতে লাগল। 'রাঙারাখী'তে আমি করতাম সদাশিব। আমার চরিত্রায়নের প্রশংসা তখনকার সব কাগজেই বেরিয়েছিল। আমার প্রয়োগ-পদ্ধতিও সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। আমি একটি কাগজ থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি।

'ছাই রঙের কোট গায়ে, গলায় পাকানো চাদর, সাদা মোজার ওপর প্যানেলা জুতো, তিনি পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার সদাশিব মুখুজ্যে। সুদক্ষ রূপসজ্জাকর হিসাবে অহীন্দ্রবাবুর প্রশংসা করা বাহুল্য। সদাশিবের ভূমিকায় যে গুণটি তাঁকে বৈশিষ্ট্যশালী করে তুলেছিল, সেটি তাঁর সংযম। অঙ্গভঙ্গির আতিশয্য বা কণ্ঠস্বরের অতিরিক্ত বিক্রম তাঁর অভিনয়ের মধ্যে একটিবারও আমাদের চোখ-কানকে পীড়া দেয়নি। শেষের দিকে ভ্রাতৃস্নেহাতুর শোকবিধ্বস্ত সদাশিবের ব্যাকুলতা একান্ত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল।'

['সংবাদ' থেকে উদ্ধৃত করেছেন শ্রীসুধীর বসু তাঁর অধুনা দুষ্প্রাপ্যপ্রায় গ্রন্থ 'বাঙলার নটনটী'তে]।

এর পর আমার সংসারক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন এল। পরিবর্তন মানে বাসা-বদল। আর বাসা-বদলটা হল দ্বিজেনবাবুর জন্যে।

মিনার্ভা থেকে ফিরতে রোজই বেশ রাত হয়। মিনার্ভার গাড়ী আমাকে রোজ পৌঁছে দিত উল্টাডাঙ্গার বাড়ীতে। যখন বাড়ী ফিরতাম তখন রাস্তাঘাট সব নির্জন হয়ে যেত, ক্বচিৎ দুই-একজন লোককে দেখা যেত রাস্তায়—গাড়ী-ঘোড়াও দেখা যেত না। দ্বিজেনবাবু একদিন বললেন—এত দূরে বাড়ী—এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কাছে-পিঠে চলে আসুন।

অল্প হেসে বললাম—শখ করে কি আর আছি ভাই।

দ্বিজেনবাবু বললেন—দাঁড়ান, আমি বাড়ী ঠিক করে দিচ্ছি।

দ্বিজেনবাবু সত্যিই করিৎকর্মা লোক। কয়েকদিনের মধ্যেই ডালিমতলা লেনে একটা বাড়ী ঠিক করে দিলেন।

বাড়ীটা অবশ্য ছোট—দোতলা। কিন্তু দেখে পছন্দ হয়ে গেল। ভাড়া ঠিক হল মাসিক পঞ্চান্ন টাকা।

এ বাড়ীটায় একটা সব থেকে বড় সুবিধে হল বাড়ীর ঠিক পাশেই ছিল অমৃতলাল

বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রমোহন বসুর বাড়ী। তাঁর আর আমার বাড়ীর মাঝখানে ছিল শুধু একটা দরজা—আর এ-দরজা প্রায় সব সময় খোলাই থাকত। দুই বাড়ীর লোকই অবাধে যাওয়া-আসা করত। আমার মা সব সময় বাড়ীতে থাকতেন না—প্রায় বেশীর ভাগ সময়ই তীর্থভ্রমণে নানা দেশ ঘুরে বেড়াতেন। সেজন্যে সুধীরা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একলাই থাকত। ক্ষেত্রবাবু ছিলেন ভাল হোমিওপ্যাথ। ওঁর স্ত্রীকে আমরা ডাকতুম 'অন্নমা' বলে। ওঁর নাম ছিল অন্নপূর্ণা। ক্ষেত্রবাবু ডাকতেন অন্ন বলে—সেই দেখে ছেলে-মেয়েরা সকলেই ডাকতো 'অন্নমা' বলে। আমরাও ঐ বলেই ডাকতুম। ওরা সেই সময় আমাদের যে কত উপকার করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই।

এই বাড়ীতে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। উল্টোডাঙার বাড়ী থেকে গরুগুলোকে পাঠিয়ে দিলুম দেশে—আমার জ্ঞাতিদের কাছে। দারোয়ান বা মালীদেরও এখন আর কোন প্রয়োজন নেই দেখে তাদের ছাড়িয়ে দেব বলে ঠিক করলাম।

এইবার যেন আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম। আরও বেশী করে কাজে মনঃ-সংযোগ করলাম।

এদিকে 'রাঙারাখী' চলতে লাগল মিনার্ভায়। মাঝে-মাঝে পুরনো বই—'আত্মদর্শন', কখনো 'মিশরকুমারী'।

১৯৩০ সাল আমার এইভাবে কাটতে লাগল।

নতুন বাড়ীতে এসে আমার সবদিক থেকেই সুবিধা হলো বলা চলে। বাড়ীটি ছোট হলেও আমার কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি পড়লো। তার ওপর ক্ষেত্রবাবুর মতো দরদী প্রতিবেশী পাওয়ায় আমি একরকম নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

তবু মাঝে-মাঝে উল্টাডিঙ্গির কথা মনে পড়তো। শুধু যে বাড়ীখানির চারিদিকে বিস্তর খোলামেলা—এসব আকর্ষণ তো ছিলই, সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে এই বাড়ীর স্মৃতি। বহু স্মৃতি এ বাড়ীর সঙ্গে আমার জড়ানো আছে। ওখানেই আমি স্টুডিও করেছিলাম, যদিও অঙ্কুরেই তার বিনাশ ঘটলো। আবার এইখানেই পারিবারিক জীবনে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় সাংঘাতিক কিছু ঘটেনি, সবাই বেঁচে গিয়েছিল। নইলে আজও সেকথা মনে হলে গা শিউরে ওঠে।

বেশ মনে আছে, একদিন রাতে অভিনয়ের শেষে বাড়ী ফিরছি রিক্‌শা করে। রাত্রি তখন একটা-দেড়টা হবে। বাড়ীর সামনে এসে পড়েছি, আর একটু এগুলেই ফটক। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, একটা ঘর থেকে অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্ছে, আগুন লাগলে যেরকম ধোঁয়া হয় সেইরকম ধোঁয়া।

দেখে তো চমকে উঠলাম। রিক্‌শাওয়ালাকে বললাম—তাড়াতাড়ি চল।

সে যথাসম্ভব দ্রুত চালিয়ে ফটকের কাছে আসল, আমি তাকিয়ে দেখলাম দোতলায় যে-ঘরে সুধীরা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে শোয়, ধোঁয়াটা সেই ঘর থেকেই বেরুচ্ছে।

সর্বনাশ! দারোয়ানকে ডাকলাম—সে বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছিল, এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেনি। সে নীচের ঘর খুলে দিতেই আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে উপরে ছুটলাম। দরজায় ধাক্কা দিতেই সুধীরা এসে দরজা খুলে দিল—তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

—কী ব্যাপার?

সুধীরা যা উত্তর দিল তা শুনে বুঝলাম এই—সুধীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কি রকম এক ধোঁয়া অনুভব করে জেগে উঠেছে। আগেকার দিনে মশা তাড়ানোর জন্যে যে গোলাকার ধূপ পাওযা যেত, তাই জ্বালা হয়েছিল মশা তাড়াবার জন্যে। তারপর কিভাবে সেই জ্বলন্ত ধূপের সঙ্গে মশারীব এক প্রান্ত জড়িয়ে গিয়ে আগুন ধরে যায়।

তাড়াতাড়ি আগুনটা নিভিয়ে ফেলেছিল অবশ্য, কিন্তু ধোঁয়াটা তখনও বেরুচ্ছিল, আর তাই রাস্তা থেকে দেখে অমন ভীত, চকিত হয়ে উঠেছিলাম।

সত্যি বলতে কি, একটা দুর্ঘটনাই ঘটতে যাচ্ছিল আর একটু হলে!

এই ঘটনার জন্যেই বোধ হয় উল্টাডিঙির বাড়ীর কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

উল্টাডিঙির বাড়ীতে বাস করার মধ্যে যে থ্রিল ছিল, ডালিমতলার এ বাড়ীতে অবশ্য এ-সব কিছু নেই। আছে নিশ্চিন্ততা ও স্বস্তি। থিয়েটারের কাছে বাড়ী, লোকালয়ের মধ্যে, সুতরাং সুধীরাকেও আর উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না।

কিছুদিন এই শান্ত নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার পর হঠাৎ আবার একটা অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হলো। আমার শিশুপুত্র ভানুর হলো 'টাইফয়েড'। এখনকার দিনে টাইফয়েডের নানা ওষুধ বেরিয়েছে, লোকে আর তেমন ভয় পায় না। কিন্তু তখনকার দিনে টাইফয়েড শব্দটাই লোকের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করতো।

ভানুর টাইফয়েডে প্রতিবেশী ক্ষেত্রবাবু যা করেছেন তার তুলনা হয় না। এত স্নেহ তিনি আমাদের করতেন যা বলে বোঝানো যায় না। এ বাড়ীতে এসে তিনি ভানুকে কোলে করে বসে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নাওয়া-খাওয়ার জ্ঞান থাকত না। নিজে ছিলেন একজন ভালো হোমিওপ্যাথ। ভানুর এই অসুখে আমরা সবাই খুব নার্ভাস হয়ে পড়লাম। আমার শুধু মনে পড়তে লাগল অপরেশবাবুর কথা—মহাগুরু-নিপাতের বৎসর—একটু সাবধানে থাকাই উচিত।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। একটি দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। সকালে কী একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু এসে দেখি ক্ষেত্রবাবু ভানুকে কোলে করে ঠায় বসে আছেন, আমাকে দেখেই উনি একটু আশ্বস্ত হয়ে বলে উঠলেন—এসেছো বাবা? এখুনি একজন ভালো ডাক্তার ডাকার দরকার।

—ডাক্তার? কেন?

উনি বললেন—ভানুর জ্বরটা বেড়েছে। আমি ভালো বোধ করছি না। আমি তো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম ডাক্তারের বাড়ী। ছুটতে ছুটতে একেবারে ডাক্তার বটকৃষ্ণ রায়ের বাড়ী—আমি সিঁড়ি দিয়ে একেবারে দোতলায় গিয়ে ডাকাডাকি আরম্ভ করলাম।

ডাক্তারবাবু তখন স্নান করতে যাচ্ছিলেন—আমাকে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার? আপনি?

বললাম—আমার বড বিপদ, ছেলের অসুখ, আপনাকে এখুনি একবার যেতে হবে।

ডাক্তারবাবু বললেন—আমি যে এইমাত্র ফিরছি, স্নান করতে যাচ্ছি যে!

আমার মনে হলো যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখলাম। আমি অনেক অনুনয় করে বললাম—দেখুন, কেসটা খুব সিরিয়াস। এখুনি না গেলে তো ভানুকে বাঁচান যাবে না। বলে আমি অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইলাম।

ডাক্তারবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় মনের অবস্থাটা বুঝলেন। বললেন—আচ্ছা দাঁড়ান একটু, আমি যাচ্ছি। বলে তিনি জামাটা গায়ে দিয়ে তক্ষুণি আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। আমি হাতে নিলাম ডাক্তারী ব্যাগটা। সূর্য তখন মাথার ওপর ছাড়িয়ে পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়েছে—ডাক্তারবাবুর স্নান-খাওয়া-বিশ্রাম কিছুই হলো না।

বাড়ী পৌছে ভানুকে ভালো করে দেখলাম, তখনও দেখি ক্ষেত্রবাবু ভানুকে কোলে করে বসে আছেন। ভানুর বয়স তখন বছর-পাঁচেক হবে।

ব্যাগ থেকে ইনজেকশানের সিরিঞ্জ বের করে ভানুকে একটা ইনজেকশান দিলেন এবং বসে রইলেন এই ইনজেকশানের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য। বটুবাবু বেলা প্রায় তিনটে পর্যন্ত বসে রইলেন, ক্ষেত্রবাবুও নাওয়া-খাওয়া ভুলে বসে রইলেন ইনজেকশানের এফেক্ট্ দেখবার জন্যে। বটুবাবু আর একটা ইনজেকশান দিলেন।

তারপর আরও কিছুক্ষণ কাটবার পর বটুবাবু আর একবার ভালো করে দেখলেন, দেখে বললেন—যাক, এইবার কাজ হয়েছে, আমাকে আর থাকতে হবে না।

বেলা তখন প্রায় চারটে। উনি একটা কাগজ নিয়ে প্রেসকৃপশান লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন—ওষুধটা এখুনি আনিয়ে নিন ডাক্তারখানা থেকে। ওষুধটা খাবার পর কেমন থাকে আমায় খবর দেবেন।

চলে গেলেন উনি।

ভানুর অসুখের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সুধীরা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল, আমিও তাই। যাই হোক ঈশ্বরের কৃপায় ভানু দিন দিন সেরে উঠতে লাগল ক্ষেত্রবাবুর আপ্রাণ শুশ্রূষা আর বটুবাবুর চিকিৎসাগুণে।

এই বটুবাবু ছিলেন একজন নাট্যকার, নাট্যরসিক ও সু-অভিনেতা। তাঁর 'পার্ল্ট-পাল্টি' নামে একখানি নাটিকা স্টারে অভিনীত হয়েছিল। বহু নাটকে অপেশাদার অভিনেতা হিসাবে তিনি অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

এই সবে ছেলে পড়েছে অসুখে, মেয়ে পড়েছে, স্ত্রীও অসুস্থ হয়েছে, এমনকি আমার মা-ও অসুস্থ হয়েছেন। তীর্থ সেরে যখন ফিরে এলেন তখন হলো তাঁর জ্বর। কিন্তু ভগবানের দয়ায় সব বিপদই কেটে গেছে।

এই সময় সিনেমা-জগতে এল এক বিরাট বিপ্লব। বায়োস্কোপে কথা-বলা বা 'টকী'-র যুগ। তখনকার দিনে কয়েকটি ইংরেজী চিত্রগৃহে 'কথা-বলা' ছবি দেখানো হতে লাগল। এই 'কথা-বলা' ছবির ঢেউ আমাদের দেশেও এল। ভারতে প্রথম টকি-ফিল্ম তৈরি করলেন বোম্বাই-এর ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানী। বাংলার প্রথম টকীর মেসিনপত্র আনালেন ম্যাডান কোম্পানী। এক্সপেরিমেণ্ট হিসেবে প্রথমে ছোট-ছোট 'টকী-শর্ট' তোলা হল নাটকের বিশেষ-বিশেষ দৃশ্য বা নাচ-গান নিয়ে। এই সব নির্বাচিত দৃশ্য তুলে জনসাধারণকে দেখানো হতে লাগল। দর্শক-সাধারণ যথেষ্ট কৌতূহল প্রকাশ করল।

আমাকে দিয়ে ম্যাডান কোম্পানী অনেকগুলি টুকরো-টুকরো দৃশ্য অভিনয় করালেন। ক্যামেরায় চার শ' ফুট ফিল্ম চড়ান থাকত, তাতে চার মিনিট অভিনয় করা চলত। আমাদের একনাগাড়ে এই চার মিনিট অভিনয় করতে হতো। 'আলমগীর', 'সাজাহান', 'ইরাণের রাণী', 'মৃণালিনী' প্রভৃতি নাটকে নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করলাম।

স্টুডিও-তে একটা নতুন জিনিস দেখলাম—'ক্যামেরা বুথ'। আজকাল পাবলিক টেলিফোনের জায়গায় টেলিফোন করার জন্যে যে কাঁচ-ঘেরা বুথ থাকে, এ-ও ছিল তেমনি। 'সাউণ্ড' ক্যামেরা থাকত এইরকম চলমান 'বুথ'-এর মধ্যে। সে এক দেখবার জিনিস। ক্যামেরাম্যান বসত বুথের ভিতরে। কখনো কখনো সহকারীও। ক্যামেরা ঠেলবার কুলিরা থাকত পিছনে। পরিচালক থাকতেন বাইরে, ক্যামেরার কাছাকাছি।

এখন যার নাম ইন্দ্রপুরী স্টুডিও, তখন এইটাই ছিল ম্যাডানের স্টুডিও। যাই হোক, এই স্টুডিওর মধ্যে তখন কোনো বাড়ী ছিল না। পাশেই প্রাচীরসংলগ্ন একটি বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। সে আমলের বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও কংগ্রেসকর্মী সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ছিলেন এই বাড়ীর মালিক। এই বাড়ীতেই রিহার্সাল থেকে শুরু করে সাজ-পোশাক পরার কাজও সারতে হতো।

টকী ফিল্ম তৈরি আরম্ভ হলো এদেশে। স্টুডিওর ফ্লোর তৈরি হল। ল্যাবরেটরী, এডিটিং রুমও তৈরি হল। কিন্তু 'মেক-আপ' করা হত একটা গাড়ির মধ্যে। সবচেয়ে ভাল লাগত গাছতলায় চেয়ার-টেবিল পেতে লাঞ্চ খেতে। বেশ আনন্দ ছিল তাতে।

স্যুটিং চলাকালীন স্টুডিওর মধ্যে তখন কথা বলার নিয়ম ছিল না। আ জ্বলে-ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই সবাই চুপ করে যেত। কিন্তু মুশকিল হত স্টুডিও-র বাসিন্দা কুকুরগুলোকে নিয়ে। তাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও দু'একটা কুকুর মাঝে মাঝে বিরক্ত করত। কিন্তু স্টুডিও-র গাছে থাকতো কাক। তাদের নিয়েই হত ফ্যাসাদ। দু-চার জনকে ব্যস্ত থাকতে হত কাক আর কুকুর নিয়ে।

টকীর প্রথম যুগের কথা ভাবলে এমনধারা কত কথাই না মনে পড়ে। আজো অবসর মুহূর্তে সে-সব কথা স্মরণ করি।

এখানে নিজের প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু বলি। আমি নির্বাকযুগে নিজের অভিনীত ছবিগুলো দেখতাম। সবাক যুগেও দেখিনি এমন নয়। তবে একটি ঘটনার পর থেকে নিজের ছবি দেখা বন্ধ করে দিলাম। ঘটনাটা হল 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুললেন ম্যাডান কোম্পানী। ছবিতে আমি অভিনয় করেছিলাম হিরণ্যকশিপু চরিত্রে। নীহারবালার একটি নাচ ছিল ছবিতে। নাচটি ছিল দীর্ঘ। 'কারাগার' নাটকে নীহার একটি নৃত্য পরিবেশন করে সে-সময়ে দারুণ বাহবা পেয়েছিল। পরিচালক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী নীহার-এর উক্ত নৃত্য-দৃশ্যটির লোভ সামলাতে পারেন নি। সেটি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন 'প্রসাদ চরিত্র' চিত্রে; অবশ্য একটু-আধটু পরিবর্তন করে। প্রায় পনেরো মিনিটের নাচ। দৃশ্যটি কিন্তু একটি মাত্র জায়গায় ছিল। আমি এসে সিঁড়ির একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ক্রুর দৃষ্টিতে দেখলাম। মুহূর্তের দৃষ্টি। সিঁড়ির ওপর একটি পা, মাটিতে একটি পা—তির্যক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আমি।

সে চিত্রের সম্পাদক ছিলেন জ্যোতিষ মুখুজ্যেমশাই। তিনি কাঁচি হাতে সম্পাদনা করতে বসে দেখলেন যে, নাচটি অত্যন্ত দীর্ঘ, দর্শকের কাছে একঘেঁয়ে

লাগতে পারে। অথচ আমার ইনসার্ট মাত্র ঐ একটিই তোলা হয়েছিল। জ্যোতিষবাবু নাচটির মাঝে মাঝে আমার ওই একই ইনসার্ট ব্যবহার করলেন।

এর ফলে দৃশ্যটির চেহারা যা ঘটলো, তাতে আমি তো হতবাক। প্রথমবার নাচের মাঝে আমাকে দেখে দর্শক কিছু বলেনি। তারপর যেই আমাকে দেখে, তখনি 'হাউস' হৈ-হৈ করে উঠে। 'ঐরে শালা আবার এসেছে।'

সেই যে ছবি দেখতে দেখতে আমি উঠে এসেছিলাম, তারপর থেকে ছবিতে আমার ছবি আর কখনো দেখিনি। একবার নিউ থিয়েটার্সের 'সীতা' দেখতে গিয়েছিলাম অনাদি বসুর সঙ্গে। যে ছবিতে শিশিরবাবু ছিলেন রাম, আমি ছিলাম শম্বুক। আর একবার গিয়েছিলাম বাবুলাল চোখানির অনুরোধে 'চাঁদসদাগর' দেখতে।

টকীর কথা বলতে বলতে অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়েছি। রেকর্ড ও রেডিও-র কথা এবারে বলে নিই। তখন হিজ মাস্টার্স ভয়েসের নাট্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন ভগবতী ভট্টাচার্য। যখনকার কথা বলছি, তখন তাঁর বেশ বয়স হয়েছে। সুন্দর দোহারা চেহারা, টাক মাথা, অবশিষ্ট চুলও পাকা—কথাও বলতেন ধীরে ধীরে, রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে তিনি আপ্রাণ যত্ন নিতেন। দিনের বেলা অফিস করতেন, আর রাত্রে যোগাযোগ করতেন শিল্পীদের সঙ্গে। অফিসে পুরোদস্তুর সাহেব আর বাইরে আমাদের সান্নিধ্যে খাঁটি বাঙালী। ওকে থিয়েটারে আসতে দেখলেই বুঝতাম, নিশ্চয়ই গ্রামোফোনে নাটকের ব্যাপার আছে।

তখন এইচ. এম. ভি-র রিহার্সাল রুম ছিল চিৎপুর রোডের উপর গরাণ-হাটার মোড়ে। নাটকের রিহার্সাল শুরু হত সকালে। চলতো সারাদিন। আমরা যে-কোন সময়ে এসে রিহার্সাল দিয়ে যেতাম। গানের রিহার্সাল অবশ্য রাত্রেও চলতো।

বাড়ীটি ছিল বড় এবং লম্বা ধরণের। তিনতলাটি নির্দিষ্ট ছিল বিদেশী শিল্পীদের জন্যে। দোতলাটা ছিল আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট। মনে আছে, একটা সরু গলির মধ্যে দিয়ে ঢুকতে হত রিহার্সাল রুমে।

অবশ্য প্রথম যখন রেকর্ড করি, তখন ওদের অফিস ছিল বেলেঘাটায়। বরফ কলের পাশে। আজকালকার অনেকেই হয়তো সে অফিস দেখেন নি। তখনকার রেকর্ডগুলোকে বলা হত মেকানিকাল রেকর্ড। রেকর্ডিং-এর সময় আমাদের অভিনয় করতে হত একটা চোঙা মুখের কাছে ধরে। গ্রামোফোনের চোঙা যারা দেখেছেন তাঁরা জিনিসটা সহজেই বুঝতে পারবেন। সেই চোঙার উল্টোদিক অর্থাৎ

বড দিকটা মুখের কাছে ধরে চিৎকার করে কথাগুলো বলতে হত। চিৎকারটা আবার বেশী যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হত। হাবুলের কথা তো আগেই বলেছি। সেই স্টার থিয়েটারের হাবুল, তার কাজ ছিল অভিনেতাকে ধরে থাকা। লক্ষ্য রাখা অভিনেতা যেন বেশী চিৎকার না করেন উত্তেজনা বশে। মনে আছে, এক-এক সময় ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয়কে জাপটে ধরে রাখতে হত। অভিনয় করতে করতে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়তেন তিনি। তখন বছরে দুখানা করে নাটক অভিনয় করা হত। আর হত সব টুকরো দৃশ্য। রেকর্ডিং করতেন একজন সাহেব। রেকর্ডিং-এর পর আমাদের শুনিয়ে দিতেন। খুব ভদ্র এবং অমায়িক ছিলেন তিনি। আমরা কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ড করার ব্যাপারে খুব মেতে থাকতাম। এত উৎসাহ ছিল যে, একখানা বই-এর রিহার্সাল শেষ হতে না হতে আর একখানা বই ধরা হত। আর একটা বিষয়ে আমাদের তখন খুব উৎসাহ ছিল। সেটা ছিল বেতারে অভিনয়। বেতারে অভিনয় হত তিনঘণ্টা। প্রতি শুক্রবার অভিনয় হত, জনপ্রিয় ছিল বেতার নাটক। ইদানীং যেমন রেডিও নাটকের রিহার্সেলে যেতামই না, সেকালে কিন্তু ছিল তার উল্টো। সে সময়ে বেতার নাটকের পরিচালক ছিলেন হিরেন বসু। পরে এলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র—যিনি পরবর্তী বেতার নাটকের প্রডিউসারে হয়ে দাঁড়ালেন। কতো যে নাটক আমরা রেডিও-তে অভিনয় করেছি, তার হিসেব নেই।

বেতার এবং গ্রামোফোনে অনেকের সঙ্গে আলাপ হতো। একদিন পরিচিত হলাম কে. মল্লিকের সঙ্গে। মানুষটি ছিলেন সদালাপী এবং বন্ধুবৎসল। মায়ের নাম গান ওর মুখে অদ্ভুত সুন্দর শোনাত। 'লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখত লিখে নিয়েছে হায়', 'আয় মা সাধন সমরে'—গানগুলি দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জাতিতে মুসলমান হলেও, মায়ের নামগানে কে. মল্লিকের কণ্ঠে যে দরদ ফুটে উঠতো, তা যেন মায়ের ভক্তের পক্ষেই সম্ভব। গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল ঘরে ফরাসের ওপর শুয়ে বিশ্রাম করতেন তিনি। একবার কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা মল্লিকমশাই, গানে এত দরদ আপনি পান কোথায় ?

উত্তরে মল্লিকমশাই বলেছিলেন, মায়ের নাম গানে দরদ যদি না থাকবে, তবে সে গান গাওয়া কেন ? সবই তাঁর ইচ্ছে।

সত্যিকারের, সঙ্গীত-সাধক ছিলেন মল্লিকমশাই। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা। তাঁর বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার এক মুসলমানপ্রধান গ্রামে। সেখানেই

তিনি সঙ্গীত-সাধনা করতেন। হিন্দুর দেব-দেবী নিয়ে নামগান করতেন, কিন্তু এ-নিয়ে কেউ-ই আপত্তি করেনি।

এই থিয়েটার, রেকর্ড, রেডিও নিয়ে দিনগুলো ভালোই কাটছিল। তারপর ছিল টকী পট। টাকাপয়সা মোটামুটি মন্দ আসছিল না। এটা-ওটা অনেক কথা বলেছি। আবার ফিরে আসছি মিনার্ভায়।

আমি যখন স্টারে ছিলাম, নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নতুন নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়েছিলেন। ভালো করে পড়িনি। একবার চোখ বুলিয়ে ছিলাম মাত্র। ভূপেনবাবু আমার অগ্রজপ্রতিম। ডাকতাম দাদা বলে। ওঁর 'অভিনয় শিক্ষা' বলে যে বই ছিল, তাতে মেক-আপ নামে একটি অধ্যায় আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। মনে আছে, একদিন ভূপেনবাবু আমাকে 'তোমায় আর কী দেব' বলে একটি একশ টাকার নোট আমার দিকে ধরেছিলেন।

অভিমান ভরে বলে উঠেছিলাম, লেখা ফিরিয়ে দাও দাদা, টাকার দরকার নেই আমার।

এরপরেই আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তোমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি ভাই।

সম্পর্ক যেখানে এমন, সেখানে নাটকের পাণ্ডুলিপি যত্ন করে পড়বো এইটাই ভূপেনবাবুর আশা। যাই হোক, আমি পাণ্ডুলিপি দাদার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, দাদা—আমি আর স্টারে থাকছি না। মিনার্ভায় যাচ্ছি। কথাটা কিন্তু কাউকে বলবেন না। সেইজন্যে নাটকটায় তেমন মন দিতে পারি নি।

মিনার্ভার সঙ্গে ভূপেনবাবুর যোগাযোগ আরো বেশী। ওঁর লেখা 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা' এক সময় মিনার্ভায় খুব নাম করেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সে অভিনয় দেখেছিলেন মিনার্ভা পুড়ে যাবার আগে। নাটক সম্পর্কে খুব উচ্চ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন দেশবন্ধু। এই আলোচ্য নাটক রচনায় দেশবন্ধুর প্রেরণা পরোক্ষে কাজ করেছে। আর সে-কথা ভূপেনবাবু ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

নাটকটির ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, তাঁর বিশেষ আদেশ, 'পুনরায় স্বদেশী নাটক রচনা-কালে যেন গুণধরের মত একটি চরিত্রের অবতারণা করি।'

দু-চার দিনের মধ্যেই নাটক লিখতে আরম্ভ করি। তখন ইহার নামকরণ হয়েছিল 'গুনদা-কি-গুণ্ডা'। এই নাটক রচনা করে প্রথমে উনি স্টারে অভিনয়ের চেষ্টা

করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভূপেন-দা লিখেছিলেন, 'পাণ্ডুলিপিটি রচনার পরেই বৎসরখানেক আমার হস্তান্তর হইয়াছিল। পুনরায় হস্তগত হইলে নাটকের নাম পরিবর্তন করিয়া নাটকের নামকরণ করিলাম, 'লক্ষীলাভ।' এই 'লক্ষীলাভ' শেষপর্যন্ত উপেন মিত্র মহাশয় নিয়ে রেখে দিয়েছিলেন সুযোগ মত কাজে লাগাবেন বলে। কিন্তু কাজে লাগাতে লাগাতে কেটে গেল কয়েকটি বৎসর।

আমার মিনার্ভায় যাওয়া নিয়ে আগ্রহ ছিল ভূপেন-দারই খুব বেশী।

একদিন প্রথম সারিতে বসে মিনার্ভায় 'সত্যের সন্ধান' দেখছি। রেণুবালা (সুখ) গাইছে—'আসল ব্রহ্মা সেইখানে, টাকাকড়ি যেইখানে'—এই গানটির প্রতিক্রিয়া দেখে চমকে উঠেছিলাম। পাশে বসেছিলেন ভূপেন-দা। আমার মত উনিও দেখলেন যে, জনৈক দর্শক উৎসাহের আতিশয্যে সব সীট টপকে সামনের সারিতে চলে এলো—একেবারে আমার পাশেই; এমনকি আসনেও সে বসলো না। বসলো, ব্যাক-রেস্টের উপর। ঘাবড়ে গিয়ে ভূপেন-দাকে বললাম, এ তবু ওখানে বসেছে, কেউ আবার না ঘাড়ের ওপর চেপে বসে।

ভূপেন-দা মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

বললাম, মিনার্ভার আসর যে কী রকম, সেটা দেখলেন তো? আমি যে এখানে এসে কতদূর কি করতে পারবো জানি না।

ভূপেন-দা বললেন, তা হোক, তবু তুমি এসো। আসছো তো এখানে ম্যানেজার হয়ে। সব ভেঙেচুরে নিজের মত গড়ে নেবে।

বস্তুতঃ মিনার্ভা ছিল তখন সখীদের আসর। এই ধরনের পরিবেশ দেখে আমার মনটা খুব খুঁত-খুঁত করতে লাগলো। আর সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। সে সময়ে যদি ভূপেন-দা আমাকে উৎসাহ না দিতেন, তাহলে আসতাম কি না সন্দেহ।

আরো একটা দিনের কথা মনে পড়ে। মিনার্ভায় যেদিন প্রথম এলাম। সেদিন উপেনবাবু যখন আমার জন্যে উপরের ঘরের দরজা খুলে তক্তপোষের উপর বসালেন খুব সমাদর করে, তখন সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ভূপেন-দাও একজন।

উপেনবাবু বললেন, এই হল আপনার ঘর।

তাতো হল, কিন্তু ওদিকে ঘটলো আর এক বিপদ। এই ঘরখানায় বসতেন তখনকার মিনার্ভার আর্ট ডেকরেটর পরেশ বসু মহাশয়। মিনার্ভায় তখন তাঁর প্রতিপত্তি প্রচুর। তিনি গিয়ে উপেনবাবুকে ধরলেন। উপেনবাবু বললেন, না—ও-ঘরে অহীনবাবুই বসবেন। আপনার জন্য নীচে একটা ঘর ঠিক করে দিয়েছি।

এতে পরেশবাবু বেশ মনক্ষুণ্ণ হলেন। সম্মানে ঘা লাগলো কি না জানি না, তিনি মিনার্ভা ছেড়ে দিলেন।

খবরটা শুনে আমি বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উপেনবাবুকে বললাম, ব্যাপারটা কি রকম হল, আমিও এলাম, আর উনিও ছেড়ে চলে গেলেন?

উনি একটুও না ঘাবড়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনি তো রইলেন। পুরনো সিন তো যথেষ্ট আছে, নতুন করাতে চান তাও করিয়ে নেবেন। তার জন্যে লোক আছে। আপনি এ্যাক্টিং-এর ভেতর দিয়ে নাটক জমিয়ে দিন। মঞ্চের অযথা জাঁকজমক নাই-বা হল। ভাববার কি আছে? এটা ঠিক যে, স্টেজ জমানোর জন্যে দুটো জিনিস আছে। হয় এ্যাক্টিং, আর না হয় সাজসজ্জার জাঁকজমক। তা আমার সাজসজ্জার দরকার নেই—এ্যাক্টিং তো রইলো।

মিনার্ভায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এই রকম একটা ঘটনা—যাক, কি আর করা যাবে।

এদিকে 'রাঙারাখী' ভালই চলছিল, কিন্তু এর পর তো নতুন বই দরকার। ভূপেন-দা তাঁর বইয়ের জন্যে তাগিদ দিচ্ছেন, কিন্তু উপেনবাবু তখনো সেটা বার করতে রাজী হচ্ছেন না। তিনি তখন অন্য ধরনের বই ধরার পক্ষপাতী। ওঁর কথাবার্তায় যা বোঝা গেল, তা হচ্ছে—উনি কোনো পৌরাণিক বই ধরার পক্ষপাতী। বিশেষ করে বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীর দিকে ওর খুব ঝোঁক। স্টারে 'চাঁদ-সদাগর' খুব সাফল্যের সঙ্গে চলার জন্যেই বোধহয় ওঁর মাথায় এই আইডিয়াটা এসে থাকবে। অথচ 'চাঁদ-সদাগর' করবার উপায় নেই, কারণ ওটা স্টারের কপিরাইট।

আমি তখন একটু ভেবে বললাম—দাঁড়ান, দেখছি।

আমার মনে পড়ে গেলো—অনেকদিন আগে হরনাথ বসুর লেখা 'বেহুলা' নাটক আমরা অভিনয় করেছিলাম অ্যামেচারে কয়েকবার। সে প্রায় ১৯১৮ সালের কথা।

সেই নাটকখানি হল মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগরের' সম্পূর্ণ বিরোধী জিনিস। ঐ স্টারেই অমর দত্ত মশাই এই নাটকখানি অভিনয় করেছিলেন—সেটা অবশ্য অনেক-দিন আগের কথা।

আমি করলাম কি—নাট্যকার হরনাথবাবুকেই ধরে তাঁকে দিয়েই অনেক কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে একটা নতুন রূপ দেওয়ালুম। তারপর উপেনবাবুকে সেই নতুন পাণ্ডুলিপি দিয়ে বললুম—পড়ুন এটা এইবারে। নতুন করে লিখিয়ে এখন যা দাঁড়িয়েছে, তাতে দর্শকদের কাছে নতুন নাটক বলেই মনে হবে।

উপেনবাবুকে পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনানো হল। তাঁর খুব পছন্দ হল। তিনি

উৎসাহের সঙ্গে বললেন—ঠিক আছে। এইরকম জিনিসই খুঁজছিলাম আমি। দিন, লাগিয়ে দিন।

মেতে গেলাম 'বেহুলা' নিয়ে। শুধু অভিনয়ই করব না—বইখানার প্রযোজনাও করতে হবে আমাকে ; সমস্ত দায়িত্ব আমার মাথার ওপর। বইখানা নিজেই নিয়েছি—দুশ্চিন্তা হলো যদি লোকে না নেয়!

আপ্রাণ খেটে তৈরি করতে লাগলুম বইখানাকে। প্রধান ভূমিকা ছিল আমাদের চারজনের। চন্দ্রধর—আমি, লখীন্দর—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, বেহুলা—আসমানতারা, মণিভদ্রা—চারুশীলা।

নাটকে 'বেহুলা' নাম-ভূমিকা হলেও প্রকৃত নায়িকা হল মণিভদ্রা। প্রথমে আমি যখন যাই, তখন নীহারবালা ছিল এখানে—কিন্তু মাসখানেক পরেই সে চলে গেল এ-মঞ্চ ছেড়ে। তার জায়গায় এলো চারুশীলা। সে-ই নামল মণিভদ্রার ভূমিকায়।

মণিভদ্রার কথা বিশেষ করে বলছি এই জন্যে যে, ভূমিকাটি নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। নাট্যকার মনসার প্রসঙ্গ সামান্যই এনেছেন এ-নাটকে, আসল নাট্যবস্তু গড়ে তুলেছেন মণিভদ্রাকে নিয়ে। মণিভদ্রা হচ্ছে এক পার্বত্য রমণী, নাগপর্বতে সে পালিয়ে যেতে চায় লখীন্দরকে নিয়ে। মণিভদ্রার নৃত্য ছিল একটি—সর্পনৃত্য। বলা বাহুল্য চারুশীলা ভূমিকাটি ভালোই করেছিল।

এ-নাটকে আরও দুটি চরিত্র ছিল—'নেড়া' আর 'বিন্দি'। করতো যথাক্রমে হীরালাল চট্টোপাধ্যায় ও রেণুবালা (স্থখ)। এ-চরিত্রও স্টারের 'চাঁদ সদাগর'-এ ছিল না। তারা নাচে-গানে আর কৌতুক-রসে খুব জমিয়ে রাখত। 'বেহুলা'-র ভূমিকায় আসমান-তারাও খুব নাম করেছিল। চরিত্রটি যদিও পুরনো প্রচলিত কাহিনী অনুসারেই গড়ে উঠেছিল, তবে নাট্যকারের একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যেতো।

'বেহুলা' নাটকখানির উপক্রমণিকায় নাট্যকার তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ব্যাখ্যা করেছেন। আমি অবশ্য তাঁর প্রকাশিত নাটকের কথাই বলছি। যদিও নাটকটি আমি প্রয়োজনমত অদল-বদল করে নিয়েছিলাম, অনেক জায়গা নাট্যকারকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছিলাম—আমাদের অভিনীত পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তাঁর প্রকাশিত নাটকের প্রভেদ অনেক, তবু নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গীর কোনরকম পরিবর্তন আমি করিনি। নাট্যকার এ কাহিনী গ্রন্থনে প্রচলিত মঙ্গলকাব্যগুলিকে অনুসরণ না করে 'তন্ত্র'কে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। 'মনসা'র লোকপালিনী দেবীভাবকে কল্পনা করেছেন নাট্যকার, তাঁর কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তিকেই মানসচক্ষে দেখেছেন এবং সেইভাবেই গড়ে তুলেছেন 'বেহুলা' চরিত্রটি। এর ফলে এই 'বেহুলা'-র পরিপ্রেক্ষিতে চন্দ্রধরের চরিত্রও

গড়ে উঠেছে ভিন্নতররূপে। নাট্যকার তাঁর নাটকের উপক্রমণিকায় বলেছেন, "বেহুলার অলৌকিক সাধনপ্রণালী দেখিয়াই চন্দ্রধর নিজের পন্থার ত্রুটি বুঝেন এবং সতীর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সতীশক্তির নিকট মস্তক অবনত করেন। সতীরূপে মনসা ও বেহুলা একই সামগ্রী বলিয়া, বেহুলার মহিমা স্বীকার করিয়া, চন্দ্রধর-মনসার মহিমাই স্বীকার করিয়াছেন। ইহাই আমার ধারণা।"

এর পরে প্রশ্ন থেকে গেল চন্দ্রধরের জটিল চরিত্রটি নিয়ে 'চাঁদ-সদাগরে'ও যে 'মেক-আপ' করতাম, এখানেও প্রায় তাই সামান্য একটু-আধটু এদিক-ওদিক করা হোল মাত্র। কিন্তু অভিনয় ঠিক একরকম করা যায়নি, কারণ দু'জন নাট্যকারের দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন এবং কাহিনীও ঠিক এক নয়; সুতরাং চরিত্রায়ণেও পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এ নাটকে 'সনকা'র প্রাধান্য তত ছিল না। 'চন্দ্রধর'-এর চরিত্রের যে অংশটুকু এখানকার নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে, তা হলো তার চরিত্রের শুষ্ক অর্থাৎ 'ড্রাই' দিক। এখানে চরিত্রানুযায়ী emotion বরং একটু কমই করতে হয়েছিল।

না, দুশ্চিন্তার কিছু রইলো না, লোভে নাটকখানি নিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তাহার নতুন চন্দ্রধরকেও। সব পত্রিকাতেই সমালোচকরা প্রচুর প্রশংসা করেছিল। এখানে 'স্টেটসম্যান' যা লিখেছিল সেইটি উদ্ধৃত করছি:

Mr. Ahindra Chowdhury, who played the role of Chandradhar or Chand Sadagar, kept the audience almost spell-bound......He is second to none in India in the technique of make-up and has established his fame as the 'Indian Lon Chaney'.

'দীপালী' বলেন,—সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, সর্বোপরি প্রযোজনা হয়েছিল তারিফ করবার মতো।

দর্শকদের মুখ চেয়ে এ বইতেও একটি ইল্যুশান সিন রাখতে হয়েছিল—সেটা ছিল একেবারে শেষ দৃশ্যে। দেবতাদের বর ও আশীর্বাদ লাভ করে বেহুলা ফিরে পেলেন মৃত স্বামী লখীন্দরকে—এই ছিল দৃশ্যটির বিষয়বস্তু। জলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া, অগ্নির মধ্যে দিয়ে যাওয়া—এসব তো ছিলই, কিন্তু সব থেকে তাক-লাগানো ব্যাপার ছিল যেখানে শেষ দৃশ্যে মেদ-মাংস গলে-পচে যাওয়া কঙ্কালটির বদলে উঠে বসলেন লখীন্দর পুনর্জীবিত হয়ে।

পরেশবাবু তখন মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেছেন, ওখানকার 'সিফটার'-রা মিলে এই ইল্যুশানটি তৈরী করেছিল। এই ট্রান্সফরমেশনের ব্যাপারটা আমি আগে ঠিক ধরতে পারতাম না। এসব ব্যাপারে তখনকার পার্শী থিয়েটার ছিল ওস্তাদ। পরেশবাবুও

ওদের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। পার্শী থিয়েটারে আমি 'সতী লীলা' দেখেছিলাম, কারণ ইন্দ্রজাল ছিল তাতে। প্রসঙ্গ যখন এসেই পড়ল, তখন ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে নিই। অত্রি মুনির স্ত্রী ছিলেন অনুসূয়া। তাঁর সতীত্বের পরীক্ষা করতেই একদিন দেবতারা এলেন ছদ্মবেশে ওঁর দুয়ারে অতিথি হয়ে। অত্রি মুনি তখন গৃহে ছিলেন না, বাধ্য হয়ে অনুসূয়াকেই অতিথি-সম্ভাষণ করতে হলো। পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে ওঁদের আহারে আমন্ত্রণ জানালেন সতী অনুসূয়া।

ছদ্মবেশী দেবতারা বললেন—আতিথ্য গ্রহণ করতে পারি এক শর্তে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে আমাদের সামনে এসে পরিবেশন করতে হবে আহার্য সামগ্রী।

কি সাংঘাতিক অনুরোধ! একদিকে অতিথি—তার উপর দেবতা! অতিথিকে বিমুখ করা মহাপাপ—তাই বাধ্য হয়ে শর্ত মেনে নিতে হল সতী অনুসূয়াকে। তিনি এলেন খোলা চুলের রাশি বুকের ওপর ফেলে দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে অতিথিরা সব দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়ে গেলেন। সতী ছিলেন ছায়ারূপে অর্থাৎ শ্যাডোতে সেটা না হয় বুঝি—কিন্তু বিরাট বিরাট মানুষগুলো সব মুহূর্তের মধ্যে শিশুতে পরিবর্তিত হয়ে গেল কী করে, সেটা কিছুতেই মাথায় এলো না।

পরে আত্মদর্শনেও এই রকম ট্রান্সফরমেশন দৃশ্যে অবাক হয়ে গেছি। আমি 'মন' রাজা—আমি শেষ দৃশ্যে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছি—আমিই ঠিক ধরতে পারতাম না—কী করে হচ্ছে। আমাকে শুধু বলা হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে চলে যেতে। আমি তাই করতাম। কিন্তু বুঝতাম না, 'মন' রাজা উধাও হয়ে যেত কি করে?

বেহুলার শেষ দৃশ্যে এসে অবশেষে ব্যাপারটা বুঝলাম। ওরা যখন 'সিনটা' সেট করতো, তখন আমি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করতাম।

আসল মায়াটা হতো দুটি জিনিস দিয়ে। বড়ো বড়ো তিন পিস কাঁচ আনা হয়েছিল, আর টিন দিয়ে গোলাকার একটা বস্তু তৈরি হয়েছিল। যেটা লম্বা পাঁচ-ছয় ফুট হবে। এর মাঝখানে লম্বা একফালি ফাঁক থাকতো। যাই হোক জিনিসটা অদ্ভুতভাবে ঘোরানো যেত। টিনের ফালিটার ভিতরে লাগানো থাকতো সারি সারি কয়েকটা বাল্ব, ওপর থেকে নীচে। পিছনে থাকতো কালো পর্দা। এই আলোটা আমার ওপর দিয়ে মিলিয়ে যেতো ধীরে ধীরে। সেই সঙ্গে আমিও মিলিয়ে যেতাম। আর একটি স্থান চিহ্নিত থাকতো, যেখান দিয়ে লখীন্দরের আবির্ভাব ঘটতো ধীরে ধীরে। অর্থাৎ তার ওপর ধীরে ধীরে আলোক-নিক্ষেপ করা হতো। আর দর্শকরা এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হতো।

যখন 'বেহুলা' অভিনয় চলছে সগৌরবে, সেই সময়েই একদিন শুনলাম, শিশিরকুমার

ভাদুড়ী সদলে আমেরিকা যাত্রা করছেন। এর আগে এ সম্পর্কে কানাঘুষা শুনেছি, তবে এবারে শুনলাম যাওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি। আসছে ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁদের শুভযাত্রার দিন।

একদিন মনোরঞ্জনবাবু মিনার্ভায় আমার ড্রেসিংরুমে এসে খুশির সুরে বললেন, আমারও হয়ে গেল অহীনবাবু!

—কি হয়ে গেল?

—আমেরিকা যাওয়া, শিশিরবাবু সব ঠিক করে দিয়েছেন।

আমি একটু রহস্যচ্ছলে বললাম, তাহলে পোশাক-আশাক? না কি এই খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরেই যাবেন?

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, সে সবের জন্যে আমার ভাবনা নেই। বড়বাবু বলেছেন।

আমি আবার বললাম, সে কী? আমেরিকা হল ফ্যাসানদুরস্ত জায়গা, তারপর আপনি হলেন অভিনেতা, ওখানে কি চাঁদনীর তৈরি কোটপ্যাণ্ট পরে যাওয়া চলে?

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, নতুন পোশাক করার পয়সা কোথায়? বন্ধুবান্ধবদের বলেছি, তাদের কাছ থেকে প্যাণ্ট আর গলাবন্ধ কোট যোগাড় করে নেবো। যাব, আর অভিনয় করে চলে আসবো।

বুঝলাম ব্যাপারটা। আমি আর এ নিয়ে বেশি কিছু বললাম না। এবারে যাত্রাপর্বের গোড়ার ইতিহাসটা বলি।

১৯২৯ সাল।

সতু সেন এই সময় আমেরিকায় ছিলেন। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে কিছু পড়াশুনা এবং হাতে-কলমে কিছু শেখার উদ্দেশ্যে। তাঁর সঙ্গে এলিজাবেথ মারবেরী নাম্নী এক ধনাঢ্য মঞ্চানুরাগী মহিলার আলাপ-পরিচয় হয়। এই মহিলার ওদেশে যথেষ্ট নামডাক। এঁরই প্রভাব ও অর্থানুকূল্যে এবং উদ্যোগে মস্কো আর্ট থিয়েটারের মত বিখ্যাত নাট্যসম্প্রদায়কে আমেরিকায় আনা সম্ভব হয়েছিল। তিনিই সতু সেনকে বলেছিলেন যে, ভারতের এক হিন্দুনাট্যগোষ্ঠীকে আমেরিকায় নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করতে।

এরপরেই সতু সেন আমেরিকা থেকে শিশিরবাবুর সঙ্গে পত্রালাপ করেন। শিশিরবাবুর সম্মতি পেয়ে শ্রীমতী মারবেরী এরিক এলিয়েটকে টাকাকড়ি এবং উপযুক্ত ক্ষমতা দিয়ে কলকাতায় পাঠান সব বন্দোবস্ত পাকা করতে। এরিক এলিয়েট নিজে ছিলেন একজন অভিনেতা। তিনি কলকাতায় এসে শিশিরবাবুকে বন্ধুত্বসূত্রে গেঁথে

সব বন্দোবস্ত পাকা করলেন, টাকাকড়ি দিলেন এবং বললেন যে ফাইনাল চুক্তিপত্র সই হবে আমেরিকায় গিয়ে।

এই কথাটা শুনে আমার মনে হল—এটা কি রকম হল? ওখানে গিয়ে যদি কোন কারণে ওঁদের পছন্দ না হয়, তাহলে এতগুলো লোক ফিরে আসবে কি করে? এতো দেখছি এতগুলো লোক যাচ্ছে শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। ওখানে কি হবে কেউ কিছুই জানে না।

শিশির সম্প্রদায় আমেরিকা যাবার আগে ওখানকার বিভিন্ন কাগজে কি রকম বিবরণ বেরিয়েছিল, তার একটু নমুনা তুলে দিচ্ছি :

The Hindus are coming :

"He has secured a company of beautiful nautch girls, maidens trained in the service of religion whose homes have been in the temples of India, and who, save for some special dispensation which Bhadury must have arranged, would inevitably suffer loss of caste for leaving their gods behind......Many of these wonderful nautch girls whom Bhadury is bringing to America come from Benaras, where it has been their task to perform twice daily before their idols, for the atonement of their own souls and then in their intercessions through the rhythm of religious dancing for the sins of others.

এই দলে ছিলেন সর্বসাকুল্যে ২৩ জন, যথা : শিশিরকুমার, প্রভা, কঙ্কাবতী, সরলা (বেঁকি), পরিমল, বেলারাণী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তারাকুমার ভাদুড়ী, অমলেন্দু লাহিড়ী, শৈলেন চৌধুরী, রাধাচরণ ভট্টাচার্য, রমেন চট্টোপাধ্যায় (দেবু), বেচা চন্দ্র, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দু বসু, পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিশিরবাবুর খাস চাকর ভিখা।

শিশিরবাবুরা দুটি দলে যাত্রা করলেন—শিশিরবাবু মেয়েদের নিয়ে সাতজন গেলেন ট্রেনে করাচী হয়ে; আর বাকী সকলে খিদিরপুর থেকেই জাহাজে উঠলেন ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে। যাবার আগে বহু সংস্থা থেকে শিশির সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানানো হল, স্টারে এক বিরাট সভায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে অশোক শাস্ত্রী মশায় সংস্কৃতে অভিনন্দন পাঠ করলেন। হাওড়া স্টেশনে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে সে কি বিরাট জনতা! প্রত্যেকেই পুষ্পমাল্যে ভূষিত করলেন শিশিরকুমার ও সম্প্রদায়কে। মনে আছে সেদিন গাড়ীতে এত ফুলের মালা জড়ো হয়েছিল যে

কম্পার্টমেণ্ট বোঝাই হয়ে গেল। শিশিরবাবু তখন কামরার ছাদের ওপর সেগুলো তুলে দিলেন।

তাঁরা নিউইয়র্ক পৌছালেন ২৫শে অক্টোবর, অর্থাৎ পুরা ৪৫ দিন লাগলো জাহাজে যেতে।

নিউইয়র্কে পৌছে প্রচারের গুণে শিশির সম্প্রদায়কে এমন একটা স্তরে ওঠানো হয়েছিল যে সেখানে সিটি হলে ডেপুটি মেয়রের পৌরোহিত্যে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হল। এত বিরাটভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল যে, সে সম্মান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও পাননি সেখানে। রবীন্দ্রনাথ সে-সময় নিউইয়র্কেই ছিলেন। অসুস্থতাবশতঃ সে সম্বর্ধনা সভায় তিনি যোগ দিতে পারেননি। স্থানীয় বিল্টমোর থিয়েটারে ২৮শে অক্টোবর উদ্বোধনের দিন ধার্য হল। প্রত্যেকটি আসন আগে থেকেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আসনগুলির সর্বনিম্ন মূল্য ছিল ১২ ডলার অর্থাৎ তখনকার দিনে প্রায় ৩৬৲ টাকার মতো।

এদিক দিয়ে তো সব ঠিকই হলো। কিন্তু বিপদ বাধলো ড্রেস রিহার্সালের সময়।

শ্রীমতী মারবেরী তো অভিনয় দেখে, অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখে চটে লাল। অভিনেতাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন যাঁরা কোনদিন স্টেজে নামেননি—তাঁরা স্টেজে দাঁড়িয়ে রীতিমত কাঁপছিলেন, একমাত্র শিশিরকুমার ও প্রভা দেবী ছাড়া আর কারুর অভিনয়ই মিস মারবেরীর পছন্দ হল না। তিনি চুক্তিপত্রে সই-ই করলেন না এবং কোনোরকম টাকাকড়ি দিতেও অস্বীকার করলেন।

এঁরা তো অকূল পাথারে পড়লেন। তখন সতু সেন বহু চেষ্টার পর সাতদিনের শো করবার একটা বন্দোবস্ত করলেন এবং সে-সমস্ত খরচা বহন করলেন ইরা ক্যাম্পবেল নাম্নী আর একজন মার্কিন মহিলা। কিন্তু তার আগে নিউইয়র্ক থেকেই সংগ্রহ করতে হোল ব্যালে গার্লদের। এদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলেন রাধাচরণ ভট্টাচার্য। দৃশ্যপটাদি সব জাহাজে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; তার ওপর মাপেও ছোট হল। সুতরাং সেগুলো ওখানে আবার নতুন করে আঁকতে হল।

এই সব বন্দোবস্ত করতে এবং নর্তকীদের শেখাতে প্রায় মাস তিনেক সময় চলে গেল—তারপর জানুয়ারী মাসে একটি থিয়েটারে সাতদিনের জন্য 'সীতা' অভিনীত হল। তাতে সংবাদপত্রে শিশিরকুমার ও প্রভার কিছু কিছু সুখ্যাতি বেরিয়েছিল।

তারপর চুপি চুপি তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে এলেন প্রায় ছ'মাস পরে। জাহাজে কাটল তিনমাস, আমেরিকায় বসে বসে কাটল তিনমাস—অভিনয় হল মাত্র সাতদিন।

সেই সময় আর একজন ভারতীয় শিল্পী তখন সারা ইয়োরোপ ও আমেরিকায় নিজের নৃত্যকলা প্রদর্শন করে প্রতীচ্যবাসীদিগকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি

হচ্ছেন উদয়শঙ্কর। সুতরাং এক ভারতীয় শিল্পীর গৌরবে যেমন আমাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তেমনি আবার শিশিরবাবুর বেহিসাবী ও অব্যবসায়ী বুদ্ধির ফলে লজ্জা ও অপমানের কলঙ্ক যেন আমাদেরও মুখে এসে লাগল।

যদিও আমার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এই আমেরিকা সফরের কোনো যোগাযোগ নেই, তবু একই পেশার শিল্পী আমরা—একের কলঙ্কের কালি অন্যের গালে এসে লাগে। কোনো বিশেষ শিল্পীর অপমান নয়, সমগ্র দেশের, সমগ্র জাতির অপমান। আমাদের এতবড় আশার মূলে কুঠারাঘাত করা হল—এইখানেই যা ক্ষোভ বা অভিযান।

আমি আবার আমার নিজের কথায় ফিরে আসি। 'বেহুলা' পূজার কিছু আগে খোলা হল এবং তা অত্যন্ত সাফল্যের সহিত চলতে লাগল। অবশ্য এই সঙ্গে 'মিশরকুমারী', 'আলমগীর', 'আত্মদর্শন' প্রভৃতির সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রতাপাদিত্যও হতো। এতে আমি করতাম ভবানন্দ।

তারপর আবার বড়দিন এসে পড়ল—চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী নতুন নাটক খোলা দরকার। এইবার ভূপেনদার 'লক্ষ্মীলাভ'-এর পাণ্ডুলিপি যা অনেকদিন থেকে উপেনবাবুর কাছে পড়ে ছিল, সেখানি বার করে দিলেন। যদিও নাটকখানি দেশাত্ম-বোধক, তবু প্রথমে এর নাম ছিল 'গুনদা-কি-গুণ্ডা'। তারপর হল 'লক্ষ্মীলাভ'। আমি ভূপেনদাকে প্রথমেই বললাম—দাদা, বইখানির নামটা বদলানো দরকার।

ভূপেনদা বললেন—কি নাম দেওয়া যায় বলো দেখি?

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম: 'দেশের ডাক' কেমন লাগে?

ভূপেনদা সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন, বললেন—খুব ভাল, এটাই থাক।

'দেশের ডাক' মঞ্চস্থ হল মিনার্ভায়, ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে। বইখানি সত্যিই খুব জমেছিল, প্রত্যেকের অভিনয়ও হয়েছিল চমৎকার। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম: গুণধর—আমি, কানাইলাল—শরৎ চট্টো, গোপীনাথ—রঞ্জিৎ রায়, পরেশ—গণেশ, অদ্ভুতকুমার—ব্রজেন সরকার, নিরঞ্জন—সুরেন রায়, লছমী—আঙ্গুরবালা, সুনীতি—আসমান, ভণ্ডুল—রেণুবালা।

এরপর প্রায় মাসছয়েক আর কোন নতুন বই ধরা হল না। পরবর্তী নাটক মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ যা ধরলেন, সেটি হল শরৎচন্দ্র ঘোষের 'অভিজাত'। শরৎবাবু নতুন নাট্যকার, এর আগে তাঁর 'জাতিচ্যুত' নামে একটি নাটক মিনর্ভাতেই অভিনীত হয়েছিল। সে নাটক সব দিক থেকেই সফল নাটক, যার জন্যে উপেনবাবু একটু বেশি খাতিরও করতেন।

যাই হোক, 'অভিজাত' নাটকটি বেশ উঁচুদরের হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ দর্শকের কাছে এ নাটক সমাদর পেল না। তবে নাটকরসিক এবং বিদগ্ধ সমাজ এই নাটকটি সম্পর্কে উচ্চ অভিমত ব্যক্ত করলেন।

'অভিজাত' অভিনীত হয় ১৩৩১ সালের জুন মাসে। এর বিশেষত্ব ছিল একটি সেটে সমগ্র নাটক অভিনীত হত। চার অঙ্কে এই সেটের কিছু রকমফের হত। প্রথমে আভিজাত্যের চরম দিকটা দেখানো হত, এমনি করে পর্যায়ক্রমে শেষ অঙ্কে দেখানো হত দারিদ্র্যের চরম অবস্থা।

একদিন সিন-সিফটার প্রথম দৃশ্যের ঝাড়লণ্ঠনটি শেষ দৃশ্যে সরিয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিল। প্রতিদিনই সেটি সামান্য সরানো হত, কিন্তু যে কারণেই হোক সেদিন ভুল হয়েছিল। এই ভুলটা চোখে পড়লো স্বর্গত নাট্যসমালোচক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের। তিনি এই ঘটনা নিয়ে ফলাও করে লিখলেন 'নাচঘরে'। টিপ্পনী কাটলেন প্রযোজকের বিরুদ্ধে। এই টিপ্পনীটা আমাকেই লক্ষ্য করে করা হয়েছে, তা বুঝতে বাকি রইলো না। যদিও প্রযোজক হিসেবে নিজেকে কোথাও আমি জাহির করিনি। যদিও প্রযোজকের দায়িত্বটা যে আমারই ছিল, তা অস্বীকার করি না।

'অভিজাত'-এর ভূমিকালিপি ছিল এই রকম: রুদ্রপ্রতাপ—অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রশান্ত—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, উদয়—গণেশ গোস্বামী, চুণীলাল—ব্রজেন সরকার, অনুরাধা—চারুশীলা, চন্দ্রা—আঙ্গুরবালা, সর্বাণী—আসমান-তারা।

এই 'অভিজাত' সম্পর্কে তখনকার 'শিশির' লিখেছিলেন, 'প্রযোজনার দিক দিয়া নাটক একেবারে নিখুঁত হইয়াছে বলা যায়। যে ধরনের নাটক অদ্যাবধি রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া আসিতেছে, অভিজাত ঠিক সে ধরনের নাটক নয়।'

ভগ্নদূত লেখেন, 'আভিজাত্যাভিমানী রুদ্রপ্রতাপের সবখানি মহিমাই তিনি বজায় রেখেছেন সর্বতোভাবে। তাঁর অভিব্যক্তিগুলি সর্বত্রই অতি সুন্দর। স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে আসমানতারার সর্বাণী সকলের আগে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী চারুশীলার অনুরাধা ও আঙ্গুরবালার চন্দ্রাও ভালই হয়েছে।'

এরপর একদিন 'অভিজাত' অভিনয় শেষ হবার পরই আমি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কদিন আগে থেকেই জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছিল। ভেবেছিলাম, যাহোক কাজ চালিয়ে যাব। কিন্তু 'অভিজাত' শেষ হতে মনে হল, এরপর 'প্রতাপাদিত্যে' ভবানন্দ করতে পারব না। শরীর এতোই দুর্বল। কর্তৃপক্ষকে জানালাম সেকথা।

কর্তৃপক্ষ বললেন, কিন্তু করবে কে? আর দর্শকরা কি শুনবে?

বললাম, ভাবনার কিছু নেই, আমি হীরালাল দত্তকে অনুরোধ করেছি।

যা হোক কর্তৃপক্ষ রাজী হলেন। কিন্তু সকলের চিন্তা—আমি ভবানন্দ করবো বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, দর্শকরা অন্যের ভবানন্দ দেখবে কিনা। ভাবলাম, দেখা যাক, কী হয়।

কিন্তু হীরালালবাবু তো এখানে নেই। তিনি থাকেন বৌবাজারে। আমি তাঁকে চিঠি লিখে অনুরোধ করে পাঠালাম, যেন পত্রপাঠ চলে আসেন।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, হীরালালবাবুই অরিজিন্যাল ভবানন্দ। আমার আগে তিনিই এই চরিত্রে অভিনয় করতেন।

হীরালালবাবু আসতে তাঁকে অনেক বলে কয়ে রাজী করলাম। তারপর হীরালালবাবুকে মেক-আপে বসিয়ে মঞ্চের মাইক থেকে ঘোষণা করা হল যে, আজ আমার অসুস্থতার জন্যে হীরালাল দত্ত অবতীর্ণ হবেন ভবানন্দের ভূমিকায়।

কিন্তু বিপদ হলো বেরোবার মুখে। সিঁড়ির নীচেই দেখলাম বেশকিছু মানুষের ভিড়। ছোটখাটো জনতা বললেও ভুল হবে না। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা এখানে ভিড় করছেন কেন ?

নানাকণ্ঠে একটি কথা—আমার ভবানন্দ ছাড়া তারা অন্যের অভিনয় দেখবে না। আমি ভবানন্দ না করলে টিকিটের দাম ফেরত দিতে হবে।

কতো করে বোঝালাম যে আমি অসুস্থ—এমনকি ওষুধের শিশি পর্যন্ত দেখালাম, কিন্তু তাঁরা কোন কথা কানে নিলেন না। কথা তাঁদের একটাই, আমার ভবানন্দ ছাড়া দেখবে না।

অগত্যা আমাকেই অসুস্থ অবস্থায় স্টেজে নামতে হলো। হীরালালবাবু সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছেন, তিনি কিছু মনে করলেন না।

অসুস্থ অবস্থায় সেদিন আমাকে স্টেজে নামতে হলো। একেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা।

এর পড়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্যরসাত্মক নাটক 'কলির সমুদ্র-মন্থন' মঞ্চস্থ হলো ১৯৩১ এর আগস্ট মাসে। সেদিন বাংলায় তারিখটি ছিল ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩৮ সাল। ভূমিকালিপি ছিল : তরুণ—আমি, মহাদেব—প্রভাত সিংহ, নন্দী—রঞ্জিৎ রায়, ভৃঙ্গী—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ফরাসী—সুরেন্দ্রনাথ রায়, ইংরেজ—সুশীল ঘোষ, পার্বতী—আঙুরবালা, ভদ্রকালী—বেদানাবালা, পদ্মর পিসি—রাণীসুন্দরী।

নাটকের বিষয়বস্তুটি বেশ চিত্তাকর্ষক। বাঙলা দেশে তথা কলকাতায় এসে সব জাতি সব কিছু করে নিলে, কিছুই করতে পারল না বাঙালী—সংক্ষেপে নাটকের বক্তব্য

ছিল এই। নাট্যকার এই নাটকের উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন,—'কলির নীলকণ্ঠ যাঁরা, জগতের সমস্ত হলাহল গণ্ডুষে যাঁরা পান করেছেন, আমার সেই কেরাণী ভায়েদের হাতে আমার এই নাটক উৎসর্গ করলাম।'

এই সময়ে চলতি নাটকের মধ্যে মনোমোহনে অভিনীত শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' এবং মন্মথ রায়ের 'কারাগার' বিরাট সাফল্য লাভ করেছিল। দুটি নাটকেরই প্রধান ভূমিকায় ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। কিন্তু দুঃখের কথা, 'কারাগার' যখন পূর্ণোদ্যমে চলছে, তখনই মনোমোহন থিয়েটারে ভাঙনের পালা শুরু হল।

একটা থিয়েটার গড়তে দেখলে যে আনন্দ হয়, ভাঙলে দুঃখটা তার চেয়ে বেশি বাজে।

এর পর ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠা হল নাট্যনিকেতনের। বর্তমানের বিশ্বরূপা থিয়েটারই হল সেদিনের নাট্যনিকেতন।

১৯৩১-এর ১৪ই মার্চ নাট্যনিকেতনের উদ্বোধন হল। কিন্তু প্রথমে ঐ মঞ্চে নাটক নয়, নৃত্যগীত পরিবেশন করা হয়েছিল কিছুদিনের জন্যে। নাট্যনিকেতনের প্রথম নাটক হেমেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক নাট্যরূপায়িত নিরূপমা দেবীর 'ধ্রুবতারা'। তার পর ঐ বছরের মে মাসে নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হল মন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী'। সাবিত্রীর পর নিরূপমা দেবীর 'দিদি'।

এদিকে স্টার থিয়েটারে সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের 'স্বয়ম্বরা' উদ্বোধন হল ঐ বছরেই ২৭শে জুন তারিখে। ঐ মঞ্চের পরবর্তী নাটকটি ছিল অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীগৌরাঙ্গ'। সেপ্টেম্বর মাসে এটির উদ্বোধন হয়েছিল। নাটকটির সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল চাপাল গোপালের ভূমিকায় দানীবাবুর অভিনয়।

এই ১৯৩১ সালেই আর একটি নাটকের আসর বসল কলকাতায়। নট রবি রায় এবং অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে দুজনে মিলে একটি দল গড়লেন। নাম দীপালি সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘে এসে যোগ দিলেন নরেশ মিত্র, মিস লাইট, নিভাননী প্রমুখেরা। এই দলের আস্তানা ছিল শ্যামবাজারে বাজারের ওপর, যে ঘরটিতে এক সময় শিশিরবাবুও রিহার্সালের আসর বসাতেন। এই দল বিভিন্ন জায়গায় পুরোনো নাটক অভিনয় করে বেড়াতেন।

ইতিমধ্যে শিশিরবাবু ফিরে এসেছেন আমেরিকা থেকে। ফিরে এসেই একটি স্টেজের সন্ধান করছিলেন। রঙমহল কর্তৃপক্ষ দশ হাজার টাকা অগ্রিম সম্মান-দক্ষিণা দিয়ে শিশিরবাবুকে টেনে নিলেন। শিশিরবাবু রঙমহলে প্রথমেই মঞ্চস্থ করলেন যোগেশ চৌধুরীর 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীও এই নাটকে অংশ নিতেন।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া বেশীদিন চলল না। তাই শিশিরবাবুকে আবার পুরোনো নাটক অভিনয় করতে হল। তাতেও কিছু হল না। শেষটা তাঁকে বেশ কিছু খেসারৎ দিয়ে চলে যেতে হল রঙমহল ছেড়ে।

এদিকে মিনার্ভায় 'অভিজাত'-এর পরে আমরা আরম্ভ করলাম শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ'। চন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ৯ই অক্টোবর, ১৯৩৯। ভূমিকালিপি ছিল এই রকম: কৈলাশখুড়ো—অহীন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রনাথ—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, সুলোচনা—চারুশীলা, সরযূ—আসমানতারা। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, চন্দ্রনাথের নাট্যরূপ দিয়েছিলাম আমি। নাটকটি সুখ্যাতিই পেয়েছিল।

এর মধ্যে মিনার্ভায় অন্য নাটকও মাঝে মাঝে চলছিল। ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রহসন 'ধরপাকড', ডাঃ সুরেন রায়চৌধুরীর 'মানভঞ্জন' এবং সতীশ ঘটকের 'পদধূলি', 'হাটে হাঁড়ি', 'অগ্নিশিখা'ও অভিনীত হয়েছিল। এর কোনটাই তেমন চলে নি।

এই সময়ে আমার 'বেনিফিট নাইট' হিসেবে আলমগীরের সম্মিলিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন মিনার্ভা। আমার ইচ্ছে ছিল নাটকে রাজসিংহ নয়, আমি অভিনয় করি আলমগীরের ভূমিকায়। এই চিন্তা নিয়ে রাধিকানন্দবাবুর কাছে গেলাম, যদি তিনি রাজসিংহ করেন।

আমার কথা শুনে রাধিকানন্দবাবু মৃদু হেসে বললেন, আমি তো কোনো বেনিফিট নাইটে অভিনয় করি না।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, আমি জানতাম না। কিছু মনে করবেন না।

কী করবো? কার কাছে যাবো রাজসিংহের জন্যে! প্রবোধবাবু বললেন নির্মলবাবুর কথা। কিন্তু নির্মলেন্দুবাবুকে বলতে তিনি বললেন, আমি নামতে পারি, তবে রাজসিংহ নয়, আলমগীরের ভূমিকায়।

তাই হলো।

সেই থেকে আমি বরাবর 'রাজসিংহ'ই করে এসেছি। আলমগীর সেজে আর স্টেজে নামি নি।

এর পর মিনার্ভায় একটি নাটক খুব নাম করল। সেটি হল ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর লেখা 'বাসুকী'। উদ্বোধন হয়েছিল ১৯৩১-এর ১৯শে ডিসেম্বর। ঐ নাটকে মঞ্চমায়া ছিল ভালই। ইন্দ্রের সিংহাসন ধরে তক্ষকের স্বর্গে চলে যাওয়া, সর্পযজ্ঞের সময় সর্পকুলের আগুনে-পড়া, শূন্যে সিংহাসন ইন্দ্র ও তক্ষক—এসব দৃশ্যে দর্শকরা মুগ্ধ হতেন। নামভূমিকায় অভিনয় করতাম আমি। এছাড়া শরৎ, হীরালাল চ্যাটার্জি, প্রভাত সিংহ, রেণুবালা, চারুশীলা, সুবাসিনী,—এরাও নাটকের গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকায় অংশ নিতেন। পরবর্তী কালের যশস্বিনী অভিনেত্রী উমাশশীও এই সময় কড়িবাবু অর্থাৎ নৃত্যশিক্ষক সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের থিয়েটারে যোগ দিলেন।

যে সময়ের কথা বলছি, এই সময় চিত্রজগতে একটা পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে। নির্বাক ছবির জায়গায় সবাক ছবির যুগের সূচনা হল। ম্যাডান কোম্পানী সবাক ছবির তোড়জোড় আগে থেকেই শুরু করেছিলেন, এবারে তাঁদের সবাক চিত্র বেরোল। নাম 'জামাইষষ্ঠী'। প্রথম সবাক চিত্রের নির্মাণের গৌরব পেলেন অমর চৌধুরী। ম্যাডানের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি হল 'ঋষির প্রেম'। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋষির প্রেমেই আমার প্রথম সবাক চিত্রে অভিনয়। কবি কৃষ্ণধন দে'-র লেখা এই কাহিনীচিত্রে নায়িকা ছিলেন কানন দেবী, নায়ক ছিলেন হীরেন বসু। এই বছরেই ম্যাডান কোম্পানী 'প্রহ্লাদ' নামে আর একটি ছবি উপহার দিয়েছিলেন। পরিচালক ছিলেন প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। এই চিত্রে আমি ছাড়া জয়নারায়ণ, মৃণালকান্তি, শান্তি গুপ্তা, নীহারবালা, জ্যোতি, ধীরেন দাস প্রমুখ শিল্পীরা অংশ নিয়েছিলাম। ক্রাউন সিনেমায় ছবিটি ২৯-১২-৩১ তারিখে মুক্তিলাভ করে। আরও একটি প্রতিষ্ঠান, এই বছর সবাক চিত্র তৈরী করেছিলেন। সে প্রতিষ্ঠানটি হল নিউ থিয়েটার্স। তাঁদের প্রথম ছবি শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা'। পরিচালক ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ভূমিকায় ছিলেন : দুর্গাদাস, নিভাননী, অমর মল্লিক প্রভৃতি। ৩০শে ডিসেম্বর ছবিটি চিত্রায় মুক্তিলাভ করে।

বছরের কথা শেষ করার আগে আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। এবারে সেই না-বলা ঘটনার কথা বলছি।

একটা কথা তো আগেই জানিয়েছি যে, আমার মধ্যে একটা ঘূর্ণি আছে, এক জায়গায় বেশীদিন স্থির থাকা আমার অভ্যাসের বাইরে। নিজের মধ্যে একটা যাযাবর মন আছে, সে মনটা সময়ে-সময়ে দারুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এবারে পুজোর আগে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। এ চাঞ্চল্য কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাবার জন্যে। কিন্তু যাব বললেই তো যাওয়া যায় না। মিনার্ভার চুক্তিবদ্ধ শিল্পী শুধু নই, ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বও আমার, সুতরাং আমার পক্ষে এক কথায় কোথাও যাওয়া কি সম্ভব ?

তবু শেষ পর্যন্ত উপেনবাবুকে বললাম আমার বাইরে যাওয়ার ইচ্ছের কথা।

শুনে উপেনবাবু বললেন, কী করে এমন সময় ছুটি দিই, বলুন ! এখন পুজোর মরশুম, যেতে হয় পরে যাবেন। তাছাড়া আপনি বাইরে গেলে নাটকের অঙ্গহানি হবে।

আবার বললাম, আমি তো বেশী দিনের ছুটি চাইছি না, মাত্র আট-দশ দিন।

এবারে উপেনবাবু লাফিয়ে উঠলেন, আরে বাপরে—এ একেবারে অসম্ভব।

তবুও অনুরোধ জানালাম ছুটির জন্যে। কিন্তু উপেনবাবু কোনমতে রাজী হলেন না। জানালেন, পূজো কেটে যাক, তারপর আমিই আপনার বাইরে যাবার বন্দোবস্ত করে দেব।

এর পর আর কথা চলে না। হলো না এবারে বাইরে যাওয়া। কিন্তু মনটা তখনো ছটফট করছে বাইরে যাবার জন্যে।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পর বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে রইল আমার প্রিয় ভৃত্য নীলু, আর থিয়েটারের আরো দুজন অভিনেতা।

প্রথমে গেলাম অযোধ্যা। তখন সবে ভোর হচ্ছে, অযোধ্যায় পৌছেচি। এক ধর্মশালায় উঠলাম। চা-পানের পর একটা টাঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ফৈজাবাদের দিকে। ফৈজাবাদের নবাব বাড়ী, বিশেষ করে ফুলের বাগিচা দেখবার মত। এখানকার শেষ নবাব সুজাউদ্দৌলা, তাঁরই পুত্র আসকউদ্দৌলা, পরে লক্ষ্ণৌ শহর নির্মাণ করেন। আগে ফৈজাবাদই অযোধ্যার রাজধানী ছিল।

ফৈজাবাদের রাজপথ ধরে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করলাম, দলে-দলে ছেলে-মেয়েরা সেজেগুজে কোথায় যেন চলেছে। জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম, সরযূ নদীর ধারে মেলা হচ্ছে, সেখানেই চলেছে ওরা।

ভালই হল। আমরাও চললাম মেলা দেখার বাসনা নিয়ে।

মেলা দেখলাম। বিরাট এলাকা জুড়ে মেলা বসেছে। মেলা দেখে হনুমানজীর মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের চারদিকে অজস্র হনুমান দেখলাম, যাদের উৎপাতে যাত্রীরা দস্তুরমত বিব্রত।

আবার ফিরে এসেছি ধর্মশালায়। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম শেষে টাঙ্গা নিয়ে এলাম স্টেশনে। এবারে আমরা যাব লক্ষ্ণৌ।

লক্ষ্ণৌ-এ উঠেছি হোটেলে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন হোটেল। হোটেলে জিনিস-পত্তর গুছিয়ে রেখে শহর দেখতে বেরোলাম। খানদানী শহর। সর্বত্র একটা আভিজাত্যের ছাপ জড়ান। শহর পরিক্রমা শেষে একটা দোকানে এসেছি কিছু কেনাকাটা করব বলে। এখানেই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হল পাহাড়ী সান্যালের দাদা দ্বিজেন সান্যালের সঙ্গে।

আমাকে দেখেই দ্বিজেন সান্যাল বলে উঠলেন, আরে দাদা, আপনি এখানে?

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, আমি কিন্তু তখনো দ্বিজেন সান্যালকে চিনি না। একজন অপরিচিত মানুষকে পরিচিতের মত কথা বলতে দেখে অবাক হলাম।

দ্বিজেনবাবু এতক্ষণে আপন পরিচয় দিলেন। বললেন, দাদা—আমার বাড়ী থাকতে আপনারা হোটেলে থাকবেন কেন? চলুন, আমার বাড়ী।

বললাম, হোটেলেই ভাল। বেশ নিজের মত থাকা যায়।

দ্বিজেনবাবু হেসে বললেন, আমার বাড়ীতেও নিজের মত থাকবেন।

বললাম, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। এবারে যখন হোটেলে উঠেছি, তখন সেখানেই থাকি। আবার যখন আসব, তখন আপনার বাড়ীতেই উঠব।

এর পর আরও দুদিন লক্ষ্ণৌ ছিলাম।

তারপর এলাম কানপুরে।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন কানপুর শহরে ট্রাম চলত। তার কয়েক বছর পরেই শহর থেকে ট্রাম উঠে যায়।

গোটা দিনে কানপুর শহর দেখা শেষ করলাম। সারাটা দিন ঘুরেছি। তারপর আর কোথাও নয়, একেবারে সরাসরি স্টেশনে এলাম।

এবারে আবার কলকাতায় ফেরার পালা। ঝড়ের মত কদিন এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে, আবার সেই পরিচিত শহর কলকাতায় ফিরে এলাম।

আবার শুরু হল পরিচিত নিয়মের আবর্তে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া।

আবার সেই সিনেমা, থিয়েটার—আবার সেই অভিনেতার চল্‌তি জীবন।

এইভাবে ১৯৩১ সাল শেষ হল—অনন্তকালের সমুদ্রে আর একটি বছর লীন হয়ে গেল।

১৯৩২ সাল শুরু হল। আমরা 'বাসুকী'কে সঙ্গে নিয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানালাম। 'বাসুকী' বেশ কিছুদিন চলার পর আমরা মিনার্ভায় খুললাম সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার, সম্প্রতি স্বর্গত ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদের পঞ্চাঙ্ক নাটক 'পুরোহিত' ২৫শে আষাঢ় (১০ই জুলাই, ১৯৩২)। ফণীবাবু ছিলেন প্রধানতঃ যাত্রার পালা লেখক—কিন্তু 'পুরোহিত' নাটক হিসাবে সত্যিই ভাল হয়েছিল, তবু লোকে তেমন নেয় নি। কয়েক সপ্তাহ মাত্র চলেছিল, বোধহয় গানের সংখ্যা কম ছিল বলে, কিংবা অন্য কোন কারণে ঠিক বলা মুশকিল। অথচ অভিনয়ের দিকটা খারাপ হয় নি। দর্শক এবং সমালোচক সকলেই

আমার ('রাজপুরোহিত' মতই মুনি) এবং রাণী সন্ধ্যারূপে চারুবালার খুব সুখ্যাতি করেছিল। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শরৎ চট্টোপাধ্যায়, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন সরকার, বঙ্কিম দত্ত, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, গণেশ গোস্বামী, আসমানতারা, নিরুপমা প্রভৃতি।

এর কিছুদিন পরেই মিনার্ভায় টিকেটের হার কমান হল এই রকম: ।৷০ আনা, ১৲, ২৲, ৩৲ টাকা, স্পেশাল—৫৲ ও বক্স ১২৲ টাকা (৩ জনের), ৫ জনের ২৫৲ এবং ৬ জনের ৩০৲ টাকা। মহিলাদের জন্য—।৷০ আনা, ১৲ ও ২৲ টাকা। বুধবার ১৩ই শ্রাবণ থেকে এই নতুন হার চালু হল। এতে দর্শকসংখ্যা অবশ্য বাড়ল, কিন্তু থিয়েটারের আভিজাত্য গেল কমে। এর আগে কোন নাটক ভাল না লাগলে দর্শকরা তেমন চেঁচামেচি করতেন না; কিন্তু এখন হল কি, কোন কিছু দর্শকদের মনঃপূত না হলে শেষ সারি থেকে নানারকম অপ্রিয় (কোন কোন সময় অশ্লীলও) মন্তব্য হত—মাঝে-মাঝে হৈ-চৈ যে না হত তা নয়। অন্য কোন থিয়েটার অবশ্য টিকিটের দাম কমায় নি।

এর পর মিনার্ভার কর্মসচিব রমেন্দ্রনাথ ঘোষের (রামবাবু) সম্মান-রজনী উপলক্ষে ২রা আগস্ট দুখানি বড় নাটকের অভিনয় হয় বিশিষ্ট সব অভিনেতৃ সম্মেলনে। নাটক দুখানি হল 'প্রতাপাদিত্য' ও 'বাঙালী'। 'প্রতাপাদিত্য'র ভূমিকালিপি ছিল: প্রতাপ—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কমল—দুর্গাদাস, ভবানন্দ—আমি, বসন্ত রায়—কার্তিক দে, গোবিন্দ দাস—কৃষ্ণচন্দ্র, সুন্দর—রবি রায়, বিজয়া—সরযূ, রডা—ভূমেন রায়, শঙ্কর—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ রায়—জয়নারায়ণ, কল্যাণী—চারুশীলা, কাত্যায়ণী—বেদানাবালা, বিন্দুমতী—রেণুবালা। 'বাঙালী' নাটকে আমি—সুখদাস, নীহারবালা—ভিখারিণী, ছোট গিন্নী—প্রকাশমণি, ফ্লোরা—নিরুপমা।

পরবর্তী নতুন নাটক মিনার্ভায় খোলা হল, সেই বড়দিনের সময়—১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩২। নাটকটি হল 'মিশরকুমারী'-র লেখক বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'দেবযানী'। বরদাবাবু নামকরা নাট্যকার, তিনি দর্শকদের নাড়ী টিপে বুঝতে পারতেন তারা কি চায়। সুতরাং 'দেবযানী'তে তিনি সেইসব উপাদান দেওয়ায় দর্শকরা তা সাদরে গ্রহণ করল। 'দেবযানী'র ভূমিকালিপি ছিল: আমি—শুক্রাচার্য, যযাতি—শরৎ চট্টো, ঘণ্টাকর্ণ—কুঞ্জবাবু, বৃষপর্ব—হীরালাল, চারুশীলা—দেবযানী, আসমানতারা—শর্মিষ্ঠা।

এই বছরটা অন্যান্য থিয়েটারে কি কি বই হল, তার একটু পরিচয় দিই। রংমহলে হল—সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের 'রুমেলা' (১৭-১-৩২), শিবরাত্রির সময় হল 'দেবদাসী'। দোলের সময় হল 'রংয়ের খেলা'। তারপর হল নট ও নাট্যকার উৎপল সেনের 'সিন্ধুগৌরব' (২৫-৬-৩২)। সতু সেন ছিলেন মঞ্চাধ্যক্ষ। তারপর

জুলাই মাসে হল জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'অসবর্ণা' এবং অক্টোবর মাসে 'রাজ্যশ্রী'। বড়দিনের আগেই রংমহল বন্ধ হয়ে যায়। এর পর রংমহলের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন শ্রীশিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র, তখনও সতু সেন ছিলেন মঞ্চাধ্যক্ষ হয়ে।

'বনের পাখী' নাটকখানির রিহার্সাল আগেই শুরু হয়েছিল, সেখানি মঞ্চস্থ করে ওঁরা অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' মঞ্চস্থ করলেন ১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৩—নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যোগেশ চৌধুরী।

নাট্যনিকেতনে এ সময় কাজী নজরুলের 'আলেয়া' ও শিবরাম চক্রবর্তী কর্তৃক নাটকীকৃত নিরুপমা দেবীর 'দিদি' চলছিল। তারপর শচীন সেনগুপ্তের 'সতীতীর্থ' ২০শে জুন, ১৯৩২ মঞ্চস্থ হয়। এই গল্পটিই আমি আমার প্রথম ছবির জন্য নির্বাচন করেছিলাম। তারপর জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'আধারে আলো' (৮-৭-৩২), তার এক মাস পরে হল সুধীন রাহার 'বিপ্লব'। নভেম্বর মাস থেকে আবার ভাদুড়ীমশায় পাকাপাকিভাবে এখানে এসে আসর জমালেন। তাঁর প্রথম প্রযোজিত নাটক হল 'মহাপ্রস্থান', সত্যেন গুপ্তের লেখা। ২৫শে নভেম্বর এই নাটক খোলা হয়। দুঃখের বিষয় নাটকখানি তেমন জমেনি, এবং ভাদুড়ীমশায়কে আবার এখান থেকে চলে যেতে হয়।

স্টার থিয়েটারের পক্ষে এই বছরটি খুবই অশুভ। অনুরূপা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'পোষ্যপুত্রে'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অপরেশ মুখোপাধ্যায়। স্টারে পোষ্যপুত্র নাটকে শ্যামাকান্ত চরিত্রে অভিনয় করতেন দানীবাবু। শ্যামাকান্ত চরিত্রে দানীবাবুর অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব। কিন্তু দানীবাবু এই সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অসুস্থতাই তাঁর মৃত্যুর কারণ। কিছুদিন রোগভোগের পর নভেম্বর মাসে দানীবাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্রের উত্তরসাধক দানীবাবুর মৃত্যুতে বাংলা মঞ্চের যে ক্ষতি হলো, তা পূরণ হবার নয়।

দানীবাবুর মরদেহ নিয়ে যে শোকযাত্রা হয়েছিল, তা অভূতপূর্ব। এই শোকযাত্রায় বাংলার অভিনেতা, অভিনেত্রী, নাট্যকার থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষেরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু আমি শোকযাত্রায় অংশ নিতে পারিনি। যখনই খবর পেলাম, তখনই দানীবাবুকে শেষ দর্শনের আশায় একেবারে শ্মশানঘাটে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম,

দানীবাবুর মরদেহ তখন চিতাশয্যায় শায়িত। চোখের সামনেই তদানীন্তন স্টার রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল।

গিরিশ যুগের শেষ দীপশিখাটি নিবে গেল। অবসান ঘটলো একটি যুগের।

ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের 'বড়বৌ' নাটক অভিনীত হয়েছিল ২৪শে ডিসেম্বর, আর রবীন মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল ৩০শে ডিসেম্বর। এই আমার সে বছরের শেষ অভিনয়।

এবারে চিত্রজগতের কথা বলি। এই ক'বছরই ম্যাডান কোম্পানীর 'বিষ্ণুমায়া' চিত্রে আমি অভিনয় করি। বিষ্ণুমায়াতে আমি কংস চরিত্রে রূপদান করেছিলাম। এই ছবিই হলো কানন দেবীর দ্বিতীয় সবাক ছবি।

ম্যাডানের আর একটি ছবি 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই বছরেই মুক্তিলাভ করে। কৃষ্ণকান্তের উইলে আমি কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম।

কতো সহজে নিঃশব্দে ফুরিয়ে গেল ১৯৩২ সাল। তবু ডায়েরীর পৃষ্ঠায় সে বছরটিকে ধরে রেখেছি।

১৯৩৩ সাল এসে গেল। মার্চ মাস পর্যন্ত 'দেবযানী', 'পুরোহিত' এবং অন্যান্য পুরনো বই চলতে লাগল বটে মিনার্ভায়, কিন্তু এখানকার পরিবেশ আর ভালো লাগছিল না—অন্য কোন একটা জায়গায় যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। এই সময় সুযোগও জুটে গেল একটা। একদিন থিয়েটারে এলেন অনাথ কবিরাজমশায়। অনাথবাবুর কবিরাজ হিসাবে নাম ছিল—কিন্তু নাট্যরসিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল আরও বেশী। সমস্ত থিয়েটারেই ছিল তাঁর অবারিত দ্বার। তিনি এসেছিলেন স্টার থিয়েটারের অন্যতম ডিরেকটার কুমারকৃষ্ণ মিত্রের দূত হয়ে। তিনি এসে একথা সে-কথার পর প্রস্তাবটা করেই ফেললেন—'দেখুন, দানীবাবু মারা গেছেন—মনোরঞ্জনবাবু ঠিক হাউস টানতে পারছেন না। স্টারে 'পোষ্যপুত্র'টা একেবারে মার খাচ্ছে। আপনি চলে আসুন না এখানে। আপনি শ্যামাকান্তটা করুন। তাহলে বইটাও আবার দাঁড়ায়, আর থিয়েটারও বাঁচে।'

আমি এতক্ষণে অনাথবাবুর আমার কাছে আসার হেতুটা বুঝলাম। আমি বললাম—যেতে আমার আপত্তি নেই—তবে কনট্রাক্টা আমি আর আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে করব না।

ব্যগ্রভাবে অনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তবে কার সঙ্গে করবেন?

—কুমারবাবুর সঙ্গে। আর্ট থিয়েটার আজ আছে, কাল নেই—আমিও লিমিটেড কোম্পানীর সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট করব না। ওসব রিস্কের মধ্যে আমি নেই মশায়।

—আচ্ছা বেশ তো—সে-সব ব্যাপারের জন্যে আটকাবে না—

আমি বাধা দিয়ে বললাম—আর একটা কথা—

—বলুন, বলুন—

আমি তখন বললুম—ওঁদের সঙ্গে 'কেসে' আমার যে টাকাটা খরচ হয়েছিল, সেটাও ফেরত দিতে হবে।

অনাথবাবু তখন বললেন: সে-সব ঠিক হয়ে যাবে—আপনি ওখানে একদিন গিয়ে সব কথাবার্তা বলে নিন।

—বেশ, যাবো।—বলে একটা দিন স্থির করলাম।

এদিকে রঙমহল থেকেও আহ্বান এসেছিল। শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিকমশায় আমার সঙ্গে দেখা করে ওখানে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। আমি এটা-ওটা বলে এড়িয়ে গেলাম। কোন কথা দিলাম না।

এদিকে বিখ্যাত অ্যাটর্নী শ্রীপতি চৌধুরী ছিলেন উপেনবাবুর বিশেষ বন্ধু। প্রায়ই আসতেন তিনি থিয়েটারে। এসে আমার ঘরে আসতেন, গল্পগুজব করতেন।

একদিন তিনি এসেছেন। এসে দেখেন যে, আমার সেদিন থিয়েটার নেই, অন্য প্লে আছে—আমি আমার ঘরে বসে কি একটা সাময়িক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলাম। শ্রীপতিবাবু ঘরে ঢুকে বললেন—আরে ঘরে একা-একা বসে কি করছেন—চলুন, গিয়ে থিয়েটার দেখা যাক।

আমাকে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে গেলেন ওপরের একটা বক্সে। ওখানে বসে থিয়েটার দেখতে দেখতেই কথাটা পাড়লেন তিনি।

—শুনলাম, আপনি নাকি মিনার্ভা ছেড়ে দিচ্ছেন?

—আমি বললাম—কন্‌ট্রাক্টের মেয়াদ তো আমার ফুরিয়ে এল, আর মাসখানেক মাত্র আছে। এর মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করতে হবে তো।

শ্রীপতিবাবু বললেন—অত ঝামেলায় কি দরকার? আপনি এখানেই থেকে যান না।

—এখানে?

—হ্যাঁ, এখানে। দেখুন থিয়েটারের অবস্থা তো দেখছেন—একদম চলছে না। এ-অবস্থায় আপনি যদি চলে যান, তাহলে উপেনবাবুর খুবই ক্ষতি হবে।

আসলে আমার মিনার্ভার পরিবেশটা ভাল লাগছিল না—অন্য কোথাও যাবার জন্য মনটা খুব উতলা হয়েছিল—কিন্তু সেটা না বলে আমি এ-প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে বললাম : দেখি ভেবেচিন্তে কি করা যায়!

উপেনবাবুও একদিন আমাকে ডেকে বললেন—থিয়েটারের যা অবস্থা তাতে মাইনেটা যদি কিছু কম নেন, তাহলে ভাল হয়।

আমি বললাম—বলেন কি? লোকের চাকরি করলে মাইনে বাড়ে, আর আমার এখানে মাইনে কমে যাবে? এটা কি করে সম্ভব?

উপেনবাবু একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন—দেখুন, যা ভাল বোঝেন, করুন।

একদিন অনাথবাবু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন স্টারের অন্যতম ডিরেক্টার কুমারকৃষ্ণ মিত্রের কাছে। তিনি আমার সমস্ত দাবি মেনে নিলেন। টাকা-পয়সার জন্যে আর কারো কাছে যেতে হবে না—চুক্তিতে এ-কথাও লেখা হল। এছাড়া মিনার্ভায় যে-টাকা পেতাম, এখানেও তাই পাব। তাছাড়া কেসের দরুণ ৮০০৲ টাকা আমি ফেরত পাব।

স্টারের চুক্তিপত্রে সই করে আমি শেষবারের মতো মিনার্ভার হয়ে দু' সপ্তাহের জন্যে আসানসোল ও ধানবাদ সফরে গেলাম। কিন্তু ফিরে এলাম দল-বলের আসার আগেই। কেননা, নীহারবালার সম্মান-রজনী উপলক্ষে 'গৈরিক পতাকা'-য় আমার ঔরংজীবের ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল।

আর আমি মিনার্ভার শিল্পী নই। কলকাতায় ফিরেই স্টারে 'পোষ্যপুত্র' নাটকে শ্যামাকান্তর ভূমিকায় অভিনয় শুরু করলাম। এই ভূমিকাটি করতেন দানীবাবু। তাঁর অভিনয় ছিল অপূর্ব। তারপর মনোরঞ্জনবাবু নামতেন এই ভূমিকায়। কিন্তু তাঁর অভিনয় তেমন উচ্চাঙ্গের হয়নি। এবারে আমি—শ্যামাকান্ত চরিত্রটিকে নতুনভাবে রূপ দিলাম বটে, তবু মনে হতো দানীবাবুর সেই অভিনয়ের কাছে আমার অভিনয় পৌঁছতে পারেনি। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। দর্শকদের খুশি করেছিল আমার অভিনয়।

এরপর স্টারে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'মন্দির প্রবেশ' অভিনীত হতে লাগলো। হরিজন সমস্যা নিয়ে লেখা নাটক। নাটকের রসিক চরিত্রটি ছিল আমার, আর লোকনাথের ভূমিকাটি ছিল মনোরঞ্জনবাবুর।

এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অভিনয়—স্টার ও নাট্যমন্দিরের শিল্পীদের একত্রে 'ষোড়শী' অভিনয়। এই অভিনয়ে জীবানন্দ ছিলেন শিশির ভাদুড়ী, আর আমি ছিলাম এককড়ি।

রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'ও এই সময় স্টারে অভিনীত হয়েছিল। নাটকে বৈকুণ্ঠের চরিত্রে রূপদান করেছিলাম আমি।

এর পরের নাটকের নাম ছিল 'অভিমানিনী'। শিশিরবাবু ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। কিন্তু এ-নাটকে আমি অভিনয় করিনি।

এই সময়ে 'আর্ট থিয়েটার'-এ একটা অঘটন ঘটলো। রায়বাহাদুর সুখলাল কারনানীর কাছে ঋণ করেছিল আর্ট থিয়েটার লিঃ, তারই দায়ে ডিক্রি পেলেন রায়বাহাদুর কারনানী। সলিসিটর কান্তি মুখোপাধ্যায় অফিসিয়াল রিসিভার নিযুক্ত হলেন। রিসিভার ছিলেন শিশিরবাবুর ব্যক্তিগত বন্ধু।

যাই হোক, স্টারের দখল নিলেন শ্রীকারনানী। অভিনয় বন্ধ হলো সাময়িক-ভাবে। আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের পোশাক, সিন ও অন্যান্য আসবাব যা স্টারে ছিল, স্টার কর্তৃপক্ষ কিনে নিলেন সিনগুলো, আর পোশাকগুলো কিনে নিলেন এক নাম-করা পোশাক-বিক্রেতা।

এই সময়ের দুটি দুঃসংবাদের কথা বলি। প্রথমটি হল, বিখ্যাত অভিনেত্রী কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যু, আর একটি হল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়া। থিয়েটার বন্ধ হতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো। আমি তো প্রথমেই গেলাম অপরেশবাবুর কাছে। অসুস্থ অপরেশবাবু বললেন, আমি কি বলবো বলুন, আপনি কুমারবাবুকে গিয়ে বলুন।

কুমারবাবুর কাছে যেতে তিনি বললেন, লিমিটেড কোম্পানীর ব্যাপার, আমি কি করতে পারি বলুন ?

আমরা চুপ করে থাকলেও ঝাড়ুদার, জমাদার, দারোয়ান—এরা তো চুপ করে থাকবে না। তারা শেষপর্যন্ত কুমারবাবুর গাড়ী আটকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলো। তাদের কথা, আমাদের মাইনের ব্যবস্থা করুন।

কুমারবাবু বললেন, ঠিক আছে—তোমরা কয়েকজন আমার বাড়ীতে এসো। আমি দেখছি কি করতে পারি।

কুমারবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন। এই সব অধস্তন কর্মীদের বেতনের ব্যবস্থা করেছিলেনও। কিন্তু শিল্পী ও অন্যান্য কলাকুশলীদের কোন ব্যবস্থাই হলো না।

এই সময়ে শিশিরবাবু আমন্ত্রণ পেলেন চুঁচুড়ায়। কয়েকটি অভিনয় সেখানে হবে। আমিও গেলাম শিশিরবাবুদের সঙ্গে। সেখানে অভিনয় হয়েছিল চারদিন। দুদিন অভিনয় করে আমাকে ফিরতে হল কলকাতায়। কেননা, 'চাঁদ-সওদাগর' ছবির শুটিং ছিল।

এদিকেও একটা ব্যবস্থা হল। শিশিরবাবু রিসিভারের কাছ থেকে স্টার

থিয়েটার লীজ নিলেন নাট্যমন্দিরের নামে। জুলাই মাসেই মঞ্চস্থ করলেন 'বিরাজ-বৌ'। তারপর ২৭শে সেপ্টেম্বর আরম্ভ হলো 'সরমা'। এর পর ২৪শে নভেম্বর শচীন সেনগুপ্তের 'দেশের দাবী'। তারপরের নাটক ছিল 'বিজয়া'। মাঝখানে সত্যেন গুপ্তের 'শ্যামা' নামে একটি নাটক অভিনীত হলেও, সেটা তেমনি চলেনি।

একটা না-বলা ঘটনার কথা বলি। মিনার্ভা ছাড়ার কিছুদিন আগে ঘটনাটা ঘটেছিল।

তখনকার দিনে থিয়েটার জগতে চণ্ডীবাবুর নামটা অপরিচিত ছিল না। চণ্ডীবাবুর একটি ছাপাখানা ছিল, নাম 'ফাইন আর্ট প্রিন্টিং'। কিন্তু থিয়েটার মহলে ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত।

চণ্ডীবাবুর কী ইচ্ছে হল, তিনি একবার থিয়েটারের 'নাইট' কিনলেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নিয়ে সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করলেন মিনার্ভায়। নাটক হল 'প্রফুল্ল'। চণ্ডীবাবু যোগেশের জন্যে শিশিরবাবুকে ধরলেন, আর আমার কাছে গেলেন রমেশের জন্যে।

বললাম—আপত্তি নেই—তবে আমাকে পাঁচশ' টাকা দিতে হবে।

চণ্ডীবাবু আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, সে কি মশায়—আপনাকে এতো টাকা দিতে হবে!

আমি বললাম—হাঁ। এর কমে আমি কোনমতেই স্টেজে নামতে পারবো না।

চণ্ডীবাবু মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বললেন: ঠিক আছে, আমি উপেনবাবুকে গিয়ে বলি তাহলে।

উপেনবাবু বললেন: টাকাটা কিন্তু আমায় দিয়ে যাবেন—কারণ, অহীনবাবু তো আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।

এই কথা শুনে আমি বললুম: এটা তো উপেনবাবুর মিনার্ভার কোন 'শো' নয় যে, টাকাটা আমি ছেড়ে দেব। অপরের ব্যবস্থাপনায় যখন শো—তখন টাকা ছাড়া অভিনয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শেষপর্যন্ত অনেক বাক-বিতণ্ডার পর চণ্ডীবাবুকে টাকা দিতে হল; এবং আমাকে এ-অভিনয়ে অনুমতি দেবার ব্যাপারে উপেনবাবু চণ্ডীবাবুকে বেশ একটু চাপ দিলেন। অর্থাৎ মিনার্ভা থিয়েটারের পোস্টার, হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি চণ্ডীবাবুর প্রেসেই ছাপা হত। তার দরুণ কিছু বিলের টাকা চণ্ডীবাবুর প্রাপ্য ছিল। উপেনবাবুর সম্মতি আদায় করতে চণ্ডীবাবুকে কিছু টাকা ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

'প্রফুল্ল'র সম্মিলিত অভিনয়ে সমস্ত হাউসে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। তার ওপব টিকিটের হার বর্ধিত হয়েছিল। ঠিক যে কত টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল, তা জিজ্ঞেস কবেও জানতে পারিনি বা ইচ্ছে করেই উদ্যোক্তারা আমায় জানতে দেননি। যদি ভবিষ্যতে এর থেকে বেশী টাকাব দাবি করি।

বিবাট বিবাট পোস্টার পডেছিল বাস্তায়—বেশ মনে আছে পোস্টারে লেখা ছিল : নাট্যাচার্য ও নটস্থর্যেব সম্মিলিত অভিনয়। শিশিববাবুব সঙ্গে এই আমাব প্রথম অভিনয়।

এব কিছুদিন পরে জন্মাষ্টমীব সময শিশিববাবু কর্ণওয়ালিশ থিযেটারেব স্টেজ (বর্তমান শ্রী সিনেমা) ভাডা নিযে এক বাত্রি অভিনযেব বন্দোবস্ত কবলেন। স্থির হলো 'মন্ত্রশক্তি' অভিনীত হবে। শিশিববাবু আমাকে বললেন : আমি ভাবছি 'মৃগাঙ্ক'টা কবব, তুমি ববং 'বমাবল্লভ'-টা কব।

আমি বললাম : আচ্ছা, তাই হবে।

এই নাটকের এইরকম সমাবেশ আরও একবাব হযেছিল—অনেক দিন পবে শ্রীবঙ্গমে।

যাক, এবাব আমবা আবাব একটু আগের কথায় ফিবে আসি।

স্টার থিয়েটারেব তো এই অবস্থা—শিশিরবাবুবা ওখানে আসর জাঁকিয়ে বসলেন। আমি এখন কি কবি! আমাব সঙ্গে তো কুমারবাবুর কন্‌ট্রাক্ট এখনও চালু আছে। ঠিক সেই সময় নাট্যনিকেতন কর্তৃপক্ষ অনুরূপা দেবীর 'মা' মঞ্চস্থ করার আয়োজন করছেন। কুমাববাবু একদিন আমাকে বললেন : 'মা'-তে অরবিন্দর চরিত্রটি করার জন্য প্রবোধবাবুরা আপনাকে চায়—আপনি করবেন, নাকি কোন আপত্তি আছে?

আমি বললাম : আপত্তি কেন থাকবে? তবে টাকাকডির ব্যাপারটা আপনার সঙ্গে যেমন ছিল তেমনই থাকবে।

—মানে?

—মানে হল এই যে, আমার প্রাপ্য টাকা আমি আপনার কাছ থেকেই নেব—আপনি ওদের কাছ থেকে আদায় করে নেবেন। প্রবোধবাবুর কাছে আমি টাকাকড়ি কিছু চাইব না।

এতে উনি একটু ভেবে বললেন : ঠিক আছে, তাই হবে। আমি হপ্তা-হপ্তা ব্যবস্থা করে নেব টাকা নেবার। যে হপ্তায় টাকা পাব না, সে হপ্তায় আপনাকে আমি একটা চিঠি দেব মঞ্চে নামতে নিষেধ করে। আপনি নামবেন না। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

এদিকে প্রবোধবাবুর ইচ্ছে ছিল ওঁর সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করার—কিন্তু আমি তা করিনি। কুমারবাবুর কাছে থেকেই আমি হপ্তায়-হপ্তায় টাকা নিতাম।

'মা'-র নাট্যরূপ দেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম: অরবিন্দ—আমি, ব্রজরানী—নীহারবালা, নিতাই—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অজিত—সরযূবালা, শরৎশশী—চারুশীলা, মৃত্যুঞ্জয়—মনোরঞ্জন, দুর্গাসুন্দরী—কুসুমকুমারী প্রভৃতি। 'মা'-র প্রথম অভিনয়-রজনী হল ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩।

এই সময় হিন্দি শেখার ঝোঁক হল খুব। আমি একজন হিন্দি-শিক্ষক নিযুক্ত করলাম—তাঁর নাম ছিল পণ্ডিত শুক্ল। তিনি রোজ সকালবেলায় আসতেন এবং এসে কিছুক্ষণ বসে থেকে ফিরে যেতেন। কারণ, ব্যাপারটা হল অধিক রাত্রি পর্যন্ত থিয়েটার করে খুব সকালে ওঠা হয়ে উঠত না। সেইজন্যে পণ্ডিতজী প্রায়ই বিরক্ত হয়ে বলতেন: তোমার দ্বারা কিছু হবে না। যাই হোক, কোনদিন পড়া হয়, কোনদিন হয় না—এইভাবেই আমার হিন্দি শিক্ষা চলতে লাগল।

সেই সময় শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিও খোলবার তোড়জোড় হচ্ছে। একদিন পরিচালক শ্রীপ্রফুল্ল রায় আমার ডালিমতলার বাড়ীতে এলেন—এসে বললেন: আমি ভারতলক্ষ্মীর হয়ে 'চাঁদ-সদাগর' ছবি করছি—তোমাকে 'চাঁদ' করতে হবে।

স্টুডিও কি রকম হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন: আমি কাল আসব—এসে নিয়ে যাব তোমাকে স্টুডিও দেখাতে।

প্রফুল্ল রায় ঠিক সময়েই এলেন—আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ভারতলক্ষ্মীতে। ভারতলক্ষ্মীর স্বত্বাধিকারী বাবুলাল চোখানীর সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। আমি যখন ম্যাডানে ছবি করতুম, তখন থেকে আলাপ। শেষের দিকে কয়েকটি ছবিতে উনি টাকা দিয়েছিলেন। অনেক সময় ম্যাডানের ডিরেক্টার জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় শ্যুটিং-এর আগে আমাকে সঙ্গে করে চোরবাগান (বাবুলালজীর বাড়ী) হয়ে সেখানে টাকাকড়ি নিয়ে তবে স্টুডিও যেতেন শ্যুটিং করতে।

বাবুলালজীর দক্ষিণ হস্ত এবং ভারতলক্ষ্মীর ম্যানেজার বৈজুবাবুর সঙ্গে নতুন করে আলাপ হল। অবশ্য এর আগেও আলাপ হয়েছিল ঘনশ্যামদাস চোখানীর মারফতে। এই ঘনশ্যামবাবু ছিলেন খুব শৌখিন ব্যক্তি, যাকে চলতি ভাষায় বলা হয় 'কাপ্তেন'। প্রায়ই মিনার্ভা থিয়েটারে আসতেন। মিনার্ভার উপেনবাবুকে কিছু টাকাও দিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে বৈজুবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, বাবুলালজী বৈজুবাবুকে স্টুডিওর চারিদিক আমাকে বেশ ভাল করে দেখিয়ে দিতে বললেন। সমস্ত বিভাগগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলুম। পোশাক-আসাক

অফুরন্ত তৈরি করে চলেছে দর্জিরা মাস্টারজীর তত্ত্বাবধানে। অন্যান্য বন্দোবস্ত সব চমৎকার; তবে যদিও কর্তৃপক্ষ বলছেন স্টুডিও সাউণ্ড-প্রুফ, কিন্তু সাউণ্ড-প্রুফ মোটেই নয়—ট্রেনের হুইস্‌ল, কিংবা কুকুরের ডাক সবই শোনা যায় ফ্লোরের ভেতর থেকে। সেদিক থেকে কলকাতার কোনো স্টুডিওই সাউণ্ড-প্রুফ নয়—যদিও এ-জিনিসটি অপরিহার্য টকী ফিল্মের ক্ষেত্রে। ল্যাবরেটরী দেখলুম—একতলা বাড়ীতে বাবুলালজীর অফিস, বৈজুবাবুর অফিস, ওপরে রিহার্সাল ঘর, নীচে ল্যাবরেটরী। পুকুরের ধারে খাওয়া-দাওযার ঘর, অর্থাৎ ক্যানটিন। মাছ-মাংস যাতে স্টুডিওর মধ্যে না যায়, তাই বাইরের দিকে খাবার ঘর। কিন্তু বড় বড় শিল্পী বা টেকনিসিয়ান সবাই ভেতরে বসেই খেতো—শুধু ছোটখাট শিল্পীরা এবং কর্মীরা এই ক্যানটিনে এসে বসতো।

মোটামুটি ব্যবস্থা বেশ ভাল লাগল।

আমি সব দেখছি—এমন সময় মন্মথবাবুও এসে হাজির হলেন। মন্মথবাবুরই লেখা 'চাঁদ-সদাগর'—যা স্টারে অভিনীত হয়েছিল, এখন তার চিত্ররূপ দেওয়া হবে।

বাবুলালজীর সঙ্গে আমার চুক্তি হয়ে গেল।

এরপর রীতিমত রিহার্সাল শুরু হোল। 'লখীন্দর' চরিত্রের জন্য প্রথমে একটি নতুন ছেলেকে পরীক্ষা করা হল। ছেলেটির নাম পুষ্কর বাগ্‌চী—বেনারসের ছেলে, ভাল সাঁতারু। সুন্দর চেহারা। বেশ কয়েকদিন ধরে রিহার্সাল দেওয়া সত্ত্বেও পুষ্কর আমাদের মনে কোনো রেখাপাত করতে পারল না। ফলে ঐ চরিত্রটি তখন ধীরাজ ভট্টাচার্যকে দেওয়া হল।

এর ১৫।২০ দিন বাদে আমরা সব রিহার্সাল ঘরে রিহার্সাল দিচ্ছি, এমন সময় খবর এল সাউণ্ড-ট্রাক এসে গেছে—খিদিরপুর ডকে রয়েছে। বাবুলালজী গেছেন মাল ছাড়িয়ে আনতে। সন্ধ্যার দিকে দেখি তিনি নিজেই সেই ট্রাকটি চালিয়ে নিয়ে আসছেন।

এইবার একদিন শুভদিন দেখে 'চাঁদ-সদাগর'-এর শ্যুটিং শুরু হল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল 'রামায়ণ' নামক একখানি হিন্দি ছবি। এ-ছবিখানি করছিলেন পণ্ডিত সুদর্শন এবং তাঁকে কলা-কৌশলের দিকে সাহায্য করছিলেন প্রফুল্ল রায়। যদিও বিজ্ঞাপনে নাম উভয়েরই যুগ্ম-পরিচালকরূপে।

এর কিছুদিন পরেই ভারতলক্ষ্মীতে আর একখানি হিন্দি ছবির কাজ শুরু হল—নাম 'ভক্ত-কি-ভগবান'। এ ছবিখানির পরিচালক ছিলেন দাদা গুণজাল।

এই ছবিতে পরিচালক মশাই আমাকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নির্বাচিত করলেন। এই আমার প্রথম হিন্দি ছবি।

এই সময় নিউ থিয়েটার্স থেকে ডাক এল। প্রোডাকশান বিভাগের চানী দত্ত (ইনি একজন নামকরা অভিনেতা ছিলেন) এলেন প্রোডাকশান ম্যানেজার অমর মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে। তাঁরা আমায় 'রূপলেখা' ছবিতে 'অশোকের' ভূমিকা অভিনয়ের জন্য অনুরোধ করেন। পরিচালনা করবেন প্রমথেশ বড়ুয়া। তখন বড়ুয়া সাহেব গৌরীপুরের সুদর্শন রাজকুমার। তরুণ অভিনেতা হিসেবে খ্যাতি —পরিচালক হিসেবে নয়। যাই হোক, আমার সঙ্গে চুক্তি হল তিন মাসের—যদি তিন মাসে আমার কাজ শেষ না হয়, তাহলে Provata দিতে হবে। নিউ থিয়েটার্সের হয়ে এর আগে একখানি ছবি করেছিলাম—শিশিরবাবু তাঁর সম্প্রদায়কে নিয়ে যে 'সীতা' ছবিখানি প্রযোজনা করেছিলেন, তাতে আমিই একমাত্র দলছুট লোক। আমি 'শম্বুক' করেছিলাম।

এর মধ্যে কয়েকখানি তামিল ছবি পরিচালনা করেছিলাম এখানে। তখন মাদ্রাজে চিত্রনির্মাণের ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। ভাষা তো বুঝি না—টেকনিক্যাল দিক এবং অভিনয়ের দিকটা দেখতাম আমি। 'সাক্কুবাই' এবং আরও কয়েকখানি ছবি আমি পরিচালনা করি।

এদিকে থিয়েটারে তখন 'মা' চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। তখন থিয়েটার আরম্ভ হত সাড়ে সাতটায়, আর ভাঙতো বারটারও পরে। যেদিন দুটো করে শো থাকত, অর্থাৎ রবিবার বা ছুটির দিন, সেদিন আরম্ভ হত বেলা দুটায় প্রথম শো এবং দ্বিতীয় শো রাত্রি আটটায়। দ্বিতীয় শো ভাঙত সেই রাত্রি একটায়। তখনকার দিনে দর্শকদের মনোবৃত্তি ছিল যে থিয়েটার দেখতে গেলে ঘণ্টা পাঁচেক না দেখলে আর কি হল। এর কমে হলে তাদের মনস্তুষ্টি হত না।

নাট্যনিকেতনের হয়ে একবার গেলাম আসানসোল সফরে। সেখানে হল 'মন্ত্রশক্তি'—আমি করলুম 'মৃগাঙ্ক'। কিন্তু তার পরদিনই ছিল আমার শুটিং নিউ থিয়েটার্সে। আমি অভিনয়ের পর সেইরাত্রেই পাঞ্জাব মেল ধরে কলকাতা রওনা হলুম। হাওড়ায় পৌছলাম সাড়ে সাতটায়। বাড়ী পৌছে সঙ্গে সঙ্গেই স্নানাহার করে একেবারে দশটার মধ্যে স্টুডিও। গিয়ে যথারীতি শুটিং করলাম।

এই সময় আর একটি বিরাট প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা যা সমগ্র দেশকে কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—সেটি হল বিহার ভূমিকম্প। আমরা কলকাতায় তার ভয়াবহতা কিছুই বুঝতে পারি নি, কিন্তু মুঙ্গের, পাটনা, মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থানে যে বীভৎসতা ও সহস্র

সহস্র লোকক্ষয় ও সম্পত্তিক্ষয় হয়েছিল, তা আজও বহুলোকের স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে আছে। কলকাতায় শুধু আমরা দেখেছিলাম সেন্ট পল গির্জার একটি চূড়ায় ফাটল ধরেছিল এবং বিপজ্জনক মনে করে সেটাকে নামিয়ে ফেলা হয়েছিল।

এই সময় 'চাঁদ-সদাগর' মুক্তি পেল ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমান উত্তরা) মার্চ মাসে। এই ছবিখানি জনগণের মনকে এমনভাবে জয় করেছিল যে, সুদীর্ঘকাল ধরে চলেছিল একই সিনেমায়, সম্ভবতঃ ৫২ সপ্তাহ ধরে চলেছিল। এরপর বাবুলালজী একদিন আমায় বললেন, মন্মথ রায়ের 'কারাগার' ফিল্ম করলে কেমন হত। আমি বললাম—খুবই ভাল হয়, তবে এ প্রোডাকশান খুব খরচসাপেক্ষ। এতে বাবুলালজী বললেন : তা হোক। আমি করব—আপনি ডাইরেকশান দেবেন।

আমার তো আনন্দ হবারই কথা। মণি বর্মা এলেন আমার সহকারী হয়ে। চিত্রনাট্য রচনায় তিনি আমায় সাহায্য করতে লাগলেন। শিল্পী অখিল নিয়োগী সেটিংয়ের সব স্কেচ করতে লাগলেন।

স্কেচগুলি আমরা অনুমোদন করার পর সেট-নির্মাতা দিনশ' ইরাণীকে (বিখ্যাত শব্দযন্ত্রী জে. ডি. ইরাণীর পিতা) দেওয়া হল সেট নির্মাণের জন্য। কিন্তু এত তোড়জোড় করেও বইখানি আর চিত্ররূপ পেল না।

কিন্তু কেন যে হল না, তার প্রধান কারণ হল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলে। অত্যন্ত পরিশ্রম করে এর চিত্রনাট্য রচনা করেছিলুম আমি—প্রত্যেকটি চরিত্রের পোশাক-পরিচ্ছদের স্কেচ, সেটিংসের স্কেচ দিয়ে সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য যাঁরা যাঁরা দেখেছিলেন, প্রত্যেকেই একবাক্যে প্রশংসা করে বলেছিলেন—এতো সিনারিও নয়, এ যে একেবারে ব্লু প্রিণ্ট। একজন আনাড়ীও যদি এই চিত্রনাট্য হুবহু অনুসরণ করে, তাহলে তার হাত থেকে একখানি প্রথম শ্রেণীর ছবি বেরিয়ে আসবে।

সে যাই হোক, আমারই অদৃষ্ট খারাপ, ছবিটা হল না—যদিও বেশ কিছুদিন রিহার্সাল দেওয়া হয়েছিল তদানীন্তন মঞ্চ ও চিত্রজগতের সব শিল্পীদের নিয়ে। শান্তি গুপ্তাকে নেওয়া হয়েছিল ধরিত্রীর ভূমিকায়। কাননকে নেবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু ও ছিল তখন রাধা ফিল্মের চুক্তিবদ্ধ শিল্পী—পরিচালক প্রফুল্ল ঘোষ তাকে ছাড়ল না। কিন্তু সবটাই পণ্ডশ্রম হল। আমার এই পরিশ্রমের মূল্যবাবদ কিছু টাকায় রফা করে বাবুলালজী আমায় চুক্তির আওতা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে রাধা ফিল্মের 'দক্ষযজ্ঞ' মুক্তিলাভ করল কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে—এতে আমি করেছিলুম মহারাজ দক্ষের ভূমিকা। সে-সময় বিরাট সাফল্য লাভ করেছিল এই ছবিখানি।

এই সময় মে মাসের তিন তারিখে আমার একটা সম্মান-রজনী হয়। তাতে অভিনীত হয়—'পোষ্যপুত্র' ও 'মন্ত্রশক্তি'। এছাড়াও নির্বাচিত নৃত্য-গীত। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে ভোর সাড়ে ছটা পর্যন্ত অভিনয় হয়েছিল।

এই বছরে মে মাসে নাট্যজগতে একটি বিরাট উল্কাপাত ঘটল—অপরেশচন্দ্রের মৃত্যু।

আজকালকার দর্শক ওঁকে জানে একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকাররূপে, কিন্তু উনি যে কত বড় অভিনেতা ছিলেন, সে যাঁরা তাঁর অভিনয় না দেখেছেন তাঁরা ধারণা করতে পারবেন না। 'সিংহল বিজয়'-এ সিংহবাহু, চিরকুমার সভায় তাঁর 'রসিক', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আহেরিয়ায়' 'মূলরাজ' যারা দেখেছেন, তাঁরা কোনদিনই ভুলতে পারবেন না সে অভিনয়। তাঁর 'রসিক'কে অতিক্রম করতে শিশিরবাবুও পারেন নি এবং দানীবাবু অপেক্ষা তিনি 'মূলরাজ' ভাল করতেন। 'বঙ্গনারী'তে তারাসুন্দরীর সঙ্গেও অভিনয় করেছিলেন। 'অযোধ্যার বেগম'-এ তিনি করেছিলেন 'ইমাম'—ঐ সময় তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে মঞ্চে নামার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অপূর্ব ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর এবং তেমনি ভাবব্যঞ্জনার শক্তি।

গিরিশবাবুর সঙ্গে তাঁর একটা ঘটনার কথা এখানে বলছি—তাতে বোঝা যায় গিরিশবাবুকে তিনি কতখানি শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তখন মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার। গিরিশবাবুর 'সিরাজদ্দৌলা' মঞ্চস্থ হবে। তাঁকে প্রথমে নির্বাচন করেছিলেন 'সিরাজ'রূপে—কয়েকদিন রিহার্সাল দিলেন। কিন্তু পরে দানীবাবু গিয়ে তাঁকে ধরলেন এই ভূমিকাটির জন্য। পুত্রের অনুরোধ এড়াতে না পেরে একদিন গিরিশবাবু তাঁকে একান্তে ডেকে এনে বললেন,—'দেখ অপরেশ, সিরাজের ভূমিকাটা আমি ভেবে দেখলাম দানীকে দেব—তুমি অন্য কোন ভূমিকা নাও। তোমার পার্টটা আমাকে ফেরত দাও।'

'যে আজ্ঞে' বলে অপরেশবাবু তাঁকে সমস্ত পার্টটা ফেরত দিয়ে দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পদত্যাগপত্রটাও দাখিল করলেন।

গিরিশবাবু বললেন: এটা কি রকম হল?

অপরেশবাবু বললেন: আমার ইজ্জৎ বাঁচাতে এ ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। আমি থিয়েটারের ম্যানেজার, আমি কয়েকদিন এই ভূমিকায় রিহার্সাল দিয়েছি; এখন যদি অন্য কেউ করে, তাহলে নানালোকে নানা কথা বলতে পারে। তার চেয়ে আমি যদি সাময়িকভাবে এখান থেকে চলে যাই, তাহলে এসব কথা উঠবে না।

সত্যিই উনি সাময়িকভাবে মিনার্ভা ছেড়ে দিয়েছিলেন; পরে অবশ্য আবার এসেছিলেন।

শেষের দিকে তিনি আর অভিনয় করতেন না—শারীরিক অক্ষমতার জন্যে। ঘাডটা তিনি সোজা করতে পারতেন না। এরও একটা কারণ আছে। মাছ ধরায় তাঁর দারুণ নেশা ছিল। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ছিপ হাতে করে পুকুরের ধারে বসে থাকতে কখনও ক্লান্তিবোধ করতেন না। এইভাবে থাকতে থাকতে তাঁর ঘাডে মাছ ধরার ভূত এমনভাবে চাপল যে তিনি কিছুতেই আর তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেন না।

এর পরে নাটক রচনার দিকে অধিকতর মনসংযোগ করলেন এবং নাট্যরূপ দেওয়া এবং মৌলিক নাটক রচনার ব্যাপারে তিনি যে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তা আশাকরি আমাকে নতুন করে বলাব প্রয়োজন হবে না। তাঁর প্রায় ৬০।৬৫ খানি নাট্যরচনা আছে—নাট্যকৃতিগুলিই এর সাক্ষ্য দেবে।

যাই হোক, অপরেশবাবুর তিরোধানে রঙ্গমঞ্চের যে ক্ষতি হয়েছিল, তার পূরণ আজও হয়নি একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই।

আমি তখনও কুমার মিত্রমহাশয়ের সঙ্গে আগেকার চুক্তি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছিলাম।

আমার বন্ধু হরিমোহন বসু প্রায়ই আমাকে বলত, 'তোমার সঙ্গে কুমারবাবুর এত অন্তরঙ্গতা, ওঁর কাছে কিছু সুবিধে করে কিছু জায়গা করে নাও না। ওঁর প্রচুর জায়গা আছে গোপালনগরে। সেগুলো উনি বিক্রি করছেন এখন।'

প্রস্তাবটা আমার ভাল লাগলেও পরের ব্যাপারটা, মানে বাড়ী করবার নানা ঝামেলার কথা ভেবে পিছিয়ে এলাম। আর বাড়ী করার মত টাকা তো আমার হয় নি।

আমি বললাম : অত টাকা আমার কোথায় ?

হরিমোহন বলল : এখন তো তুমি সিনেমা করছ, থিয়েটার করছ—তাছাড়া রেডিও গ্রামোফোনও আছে। বেশ তো দু-পয়সা আসছে। ভাডাবাড়ীতে আর কতদিন থাকবে ?

একদিন আমাকে জোর করেই সঙ্গে করে নিয়ে গেল কুমার মিত্রমশায়ের বাড়ী। যাবার সময় বললে—সঙ্গে একশো এক টাকা অন্ততঃ নাও। নাহলে হবে না। যাই হোক, গেলাম কুমারবাবুর কাছে। খানিকটা জায়গা গোপালনগর রোডের ওপর (আমার বাড়ী) কিনলাম—কুমারবাবু আমাকে বিশেষ খাতির করে তাঁর নির্ধারিত মূল্যের থেকেও কাঠাপিছু একশো টাকা করে কম নিলেন। একশো এক টাকা বায়না দিয়ে এলাম এবং ঠিক হল আমার কনট্রাক্টের টাকা থেকে উনি মাসে মাসে কেটে নেবেন।

এইভাবে জমি কেনা হল এবং তা রেজেস্ট্রি হল ১৯৩৪ সালের জুন মাসে।

জমি রেজিস্ট্রি করার পরই আমার পেছনে লাগলেন ভেলুবাবু। ইনি হলেন প্রবোধ গুহমহাশয়ের এক দূরসম্পর্কীয় ভাই—কণ্ট্রাক্টর বাসুদেব কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার—অর্থাৎ বাসুদেব কোম্পানীর ইনি হলেন বাসু, ইনি আমাকে খালি তাগাদা দিতে লাগলেন বাড়ী করবার। একদিন উনি প্ল্যান পর্যন্ত করে নিয়ে হাজির। প্রথমে দোতলা বাড়ী হবে, তাতে চারখানা ফ্ল্যাট থাকবে। প্রথমে বললেন : আপনাকে আস্তে আস্তে অল্প-স্বল্প করে খরচা দিলেই চলবে। আমি সেইজন্যেই রাজী হলাম, কিন্তু কাজ শুরু হবার পরই তিনি টাকার তাগাদা আরম্ভ করলেন; ক্রমশঃ তাঁর সেই তাগাদার মাত্রা বাড়তে লাগল এবং তার সেই তাগাদার ঠেলায় আমাকে পরিশ্রমের মাত্রা বেশ বাড়াতে হল।

'মা' বেশ সাড়ম্বরে চলছিল তখন। ৫০শ অভিনয় রজনী অতিক্রম করলেও দর্শকসংখ্যা একটুও কমেনি।

এর মধ্যে ৭ই মার্চ তারিখে নাট্যনিকেতনে খোলা হল যোগেশ চৌধুরীমশায়ের সামাজিক নাটক 'পূর্ণিমা মিলন'। নাটকখানি খুবই কৌতুককর। এক বৃদ্ধের যুবতী নারীর প্রতি আসক্তির ফলে যে সমস্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করে এর গল্পাংশ গড়ে উঠেছিল। আমি ঐ নারী সঙ্গাভিলাষী বৃদ্ধের ভূমিকাটি করেছিলাম। সকলের অভিনয়গুণে নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

অনেকদিন থেকেই শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না—আমি কিছুদিনের ছুটি চাইলাম প্রবোধবাবুর কাছে যে একবার একটু হাওয়া বদলে আসি। কিন্তু প্রবোধবাবু বললেন : বেশ চল, তোমাকে ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম : কোথায়?

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন : ডায়মণ্ডহারবার।

অবাক হয়ে বললাম—ডায়মণ্ডহারবার?

—তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমার কথায় আস্থা রেখে একবার চলই না। দেখবে তার এফেক্ট।

এর ওপর আর কথা চলে না। গেলাম তাঁর সঙ্গে। রইলাম সেখানে সাতদিন ডাক-বাংলোয়। সঙ্গে রইলো নীহারবালা এবং সুবল। প্রবোধবাবুর ছেলে সুধীর রোজ যেত, খবরাখবর সব ওর মুখ থেকেই শুনতাম।

তখন জানুয়ারী মাস, শীতকাল। রোজ খুব সকালে উঠে বেড়াতে যেতাম। একদিন নৌকো করে বেড়াতে গেলুম কুমড়োহাটি। প্রথমটা ডায়মণ্ডহারবার শুনে যেমন নাক সিঁটকেছিলাম—এখন দেখা গেল শরীর বেশ ভালোই হল।

*   *   *   *

ডায়মণ্ডহারবার থেকে ফিরে এসেই আবার নতুন উদ্যমে কাজে লেগে গেলুম।

ডায়মণ্ডহারবারে থাকাকালীনই প্রবোধবাবু বলছিলেন যে সামনে 'ঈদ' আসছে —একটা বিশেষ আকর্ষণ—কি করা যায়? কেউ বলল 'সাজাহান', কেউ বলল 'ইরাণের রাণী', কেউ বলল 'অযোধ্যার বেগম'। শেষে প্রবোধবাবুই বললেন: আচ্ছা 'রিজিয়া' করলে কেমন হয়—মনোমোহন রায়ের 'রিজিয়া'?

মুসমলানদের পর্ব, সুতরাং মুসলমানী বিষয়বস্তু হলে এ-সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করা যাবে।

কথাটা মনে লাগল সবাইয়ের। আমিও মত দিলুম। ঠিক হল যে আমি 'বক্তিয়ার', তারাসুন্দরী 'রিজিয়া' এবং চারুশীলা 'ইন্দিরা'-র ভূমিকায় অভিনয় করবে।

পাঁচ তারিখে ফিরলুম ডায়মণ্ডহারবার থেকে—আবার সাত তারিখে মঞ্চাবতরণ। ঐদিনই 'রিজিয়া' অভিনয়। বক্তিয়ারের ভূমিকায় আমি এই প্রথম। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় সেদিন খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

'রিজিয়া' অবশ্য একদিনই হয়েছিল। নিয়মিতভাবে তখন নাট্যনিকেতনে চলছে 'চক্রব্যূহ'। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের লেখা এই নাটকটি ১৯৩৪ সালের ২৩শে মে উদ্বোধন হয়। আমি 'শকুনির' ভূমিকায় অবতীর্ণ হতাম। আর নির্মলেন্দু লাহিড়ী সাজতো ভীম।

জানুয়ারী মাসে দুটি ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলাম। একটি হল ধীরেন গাঙ্গুলী পরিচালিত 'বিদ্রোহী', অপরটি হল 'প্রফুল্ল'। ছবি দুটির কাজও শুরু হল। নাট্যনিকেতনে আমার সম্মান-রজনী উপলক্ষে দুটি নাটকের অভিনয় হল। 'সাজাহান' আর 'পথের শেষে'। সেদিনের অভিনয়ে বহু বিশিষ্ট অভিনেতা অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এই সময়ে কলকাতা রেডিও-র স্টেশন ডিরেকটর মিঃ স্টেপলটন একটি ঘরোয়া বৈঠকে কয়েকজন জনপ্রিয় শিল্পীকে সম্মানিত করেন। সেই অনুষ্ঠানে আমিও আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। একটি রৌপ্যাধার আমি পেয়েছিলাম স্মারক হিসাবে।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে বোধহয় ২৭ তারিখে নাট্যমন্দির অর্থাৎ স্টারে শ্রেষ্ঠ শিল্পীসমন্বয়ে 'আলমগীর' অভিনীত হয়। সঙ্গে আরো একটি নাটক ছিল, সেটি হল 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। শিশির ভাদুড়ী এবং নাট্যমন্দিরের শিল্পীদের সঙ্গে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

এপ্রিল মাসে নাট্যনিকেতনে নতুন নাটক খোলা হল। প্রভাবতী দেবী-

সরস্বতীর 'ব্রতচারিণী' উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। 'ব্রতচারিণী' মোটামুটি ভালই চলেছিল।

'ব্রতচারিণী' নাটকে একটি নতুন ছেলেকে নির্বাচন করা হয়েছিল কোন একটি চরিত্র অভিনয়ের জন্যে। একদিন আমি বসে রিহার্সাল পরিচালনা করছি। মনোরঞ্জনবাবু ছাড়া অন্যান্য শিল্পীরাও উপস্থিত আছেন। নতুন ছেলেটি রিহার্সাল দিচ্ছে। কিন্তু তার যেন সবজান্তা ভাব। হঠাৎ একসময় সে প্রম্পটারকে বলে বসলো, —এই জায়গাটা দরকার নেই, বাদ দিয়ে দিন। একথাগুলো নাটকে না রাখলেও চলে।

এছাড়া আরো কিছু বললো ছেলেটি।

ব্যাপারটা আমার কাছে খুব বিসদৃশ লাগলো। মেজাজ গেল বিগড়ে। চটে উঠে বললাম, ওহে শোনো—এটা তোমার কি ধরনের ভদ্রতা, যেখানে আমি রিহার্সাল পরিচালনা করছি, নাট্যকার বসে আছেন—আর তুমি প্রম্পটারকে বলছো—ও জায়গাটা বাদ দিয়ে দিন। এটা ভদ্রতার বাইরে। এ ধরনের ব্যবহার এ্যামেচার ক্লাবে চলে, এখানে নয়। পেশাদারী মঞ্চের কতকগুলো নিয়ম আছে, যেগুলো সকলকেই মেনে চলতে হয়। আর এসব যদি মানতে না পারবে, তাহলে এখানে অভিনয় করা চলবে না।

ছেলেটি সেদিনের পর আর আসেনি। তার নাম ছিল জ্যোতি।

এপ্রিল মাসে জয়পুর গিয়েছিলাম 'বিদ্রোহী' ছবির শ্যুটিং করতে। জয়পুরের কাছেই গলতা বলে একটা জায়গায় শ্যুটিং করতে যেতে হত। কিন্তু আমরা থাকতাম জয়পুরেই।

প্রতিদিন সকাল আটটায় আমরা সদলবলে যেতাম 'লোকেশনে'। এখানকার মাছির উপদ্রবের কথা কোনদিন ভুলবো না। খাওয়া-দাওয়ার সময় সে যে কী অবস্থা হত, তা কি বলবো। এছাড়া আরো একটি ঘটনার কথা মনে আছে। একদিন শ্যুটিংএ দারুণ দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হয়েছিল আমাকে। একটা 'শট' ছিল—প্রাসাদের ফটক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আমাকে অনুসরণ করছে আরও কয়েকজন অশ্বারোহী।

ক্যামেরা বসানো হয়েছে সামনে, একটু কোণ ঘেঁষে। কতদূর ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে হবে, অর্থাৎ ক্যামেরা ফিল্ড কতখানি, তাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দলের সুবল ঘোষ কলকাতার নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। সে-ই আমাদের অশ্বারোহণের তালিম দিত। শ্যুটিং-এর সময় সুবল দাঁড়িয়ে ছিল ক্যামেরা ফিল্ডের বাইরে।

পরিচালক ডি. জি. শটটা রেডি করে বললেন,—স্টার্ট ক্যামেরা।

ক্যামেরা চলতে লাগলো। আমাদের ঘোড়াও ছুটে চললো। আমি ওপর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে ক্যামেরার পাশ দিয়ে বেশ দ্রুগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলাম।

ক্যামেরা ফিল্ড অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে সুবল আমার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো। আমার ঘোড়াটা থামলো বটে, কিন্তু পিছনের ঘোড়াগুলো হুড়মুড়িয়ে ছুটে গেল সুবলকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে। কয়েকটা ঘোড়া তাকে মাড়িয়ে গেল।

সাংঘাতিকভাবে জখম হল সুবল। তাকে হাসপাতালে পাঠানো হল সঙ্গে সঙ্গে।

আমি সেদিন সুবলকে বলেছিলাম, তুমি একটি নির্বোধ—তোমার বোকামির জন্যে এমন কাণ্ড হল।

সুবলকে বেশ কয়েকদিন ভুগতে হয়েছিল এই দুর্ঘটনার দরুন।

জয়পুরে শ্যুটিংয়ের কথা মনে পড়লে সুবলের এই দুর্ঘটনার কথা মনে আসে।

তদানীন্তন ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের রাজত্বের রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল মে মাসে। ঐ উপলক্ষে চৌরঙ্গীপাড়ার আলোকসজ্জার কথা এখনো আমার স্মৃতিতে আছে।

ঐ মাসেই একদিনের সম্মিলিত অভিনয়ের কথা বলা দরকার। 'প্রতাপাদিত্য' নাটক অভিনীত হয়েছিল, যাতে শিশিরকুমার 'রডার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জীবনের ঐ একবারই তিনি রডার ভূমিকায় অভিনয় করেন। অভিনয়ে তিনি কিছু পর্তুগীজ শব্দ ব্যবহার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

এই সময়ে আমার পারিবারিক জীবনের কিছু কথা না বলে পারছি না। গোপালপুর রোডে বাড়ী তৈরি করেছিলাম, বেশ কিছুদিন আগে। এতদিনে সে বাড়ীর দরজা 'গৃহপ্রবেশ'-এর জন্যে উন্মুক্ত হল। কিন্তু এ বাড়ী করেছিলাম ভাড়া দেব বলে। কিন্তু ভাড়া দেওয়া হল না। কলকাতার ডালিমতলার বাড়ী ছেড়ে শেষ পর্যন্ত আমরা এই বাড়ীতেই বাস করতে আরম্ভ করলাম।

গৃহপ্রবেশের দিনটি ছিল ১৮ই আষাঢ়, বুধবার, ইংরাজী ৩রা জুলাই, অর্থাৎ রথযাত্রার পরের দিন। গৃহপ্রবেশের দিন থেকে তিনরাত্রি নতুন বাড়ীতে বাস করতে হয়, এই নাকি বিধি। তাই হল। এ কদিন থিয়েটারের পর চলে আসতাম গোপালনগরের বাড়ীতে। ভেবেছিলাম, তিনরাত্রি বাসের পর আবার ডালিমতলার বাড়ীতে যাব। কিন্তু তা আর হল না। মা কিছুতেই এই নতুন বাড়ী ছেড়ে যেতে চাইলেন না। এমন সুন্দর বাড়ী, তাছাড়া বাড়ী থেকে কালীঘাটের

মন্দিরের চূড়ো দেখা যায়—মা কোনমতেই বাড়ী ছাড়লেন না। সেই থেকেই আমরা গোপালনগরের বাড়ীতেই আছি।

রাধা ফিল্মস সে সময়ে পর পর ছবি করছিল। এই কোম্পানীর ভক্তিমূলক ছবি 'কৃষ্ণ-সুদামা'তে আমি সুদামের ভূমিকায় অভিনয় করলাম। কৃষ্ণের ভূমিকায় ছিলেন ধীরাজ আর রাধার চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন কানন দেবী। ছবিটির পরিচালক ছিলেন ফণী বর্মা।

রাধা ফিল্মসের আর একখানি ছবি 'কণ্ঠহার' রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করলো ২১শে ডিসেম্বর। এই ছবিতে আমার ছিল রণলালের ভূমিকা। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন ধীরাজ, কানন, নির্মলেন্দু ও আরো অনেকে। পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই বছরে আর একটি ছবিতে কাজ করেছিলাম। ছবিটি হল সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'তরুবালা'।

এই বছরেই নাট্যনিকেতনের হয়ে আমরা গিয়েছিলাম চট্টগ্রামে অভিনয় করতে। কথা ছিল 'গৈরিক পতাকা' অভিনয় হবে, কিন্তু স্থানীয় মুসলমানদের ঘোরতর আপত্তিতে শেষটা 'সাজাহান' করতে হল।

সাজাহান অভিনয়ের পর কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান ভদ্রলোক আলাপ করতে এলেন। অভিনয়ের সুখ্যাতিতে তারা পঞ্চমুখ, কিন্তু কয়েকটি ব্যাপারে আপত্তি জানালেন। যেমন—ঔরঙ্গজীব যে মাঝে মাঝে বলেন, 'আমি তো মক্কার দিকে পা বাড়িয়ে আছি' বা যেখানে ঔরঙ্গজীব খোদার নাম উচ্চারণ করেন, সে-সব জায়গা বিদ্রূপাত্মক মনে হয়। সেদিন ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। আমি বললাম, দেখুন—এক-একজন অভিনেতা এক-একভাবে অভিনয় করেন ; ঠিক আছে, আপনাদের আপত্তির কথা আমি রাধিকাবাবুকে জানাবো।

এবারে তাঁরা আমার ভূমিকা প্রসঙ্গে বললেন, আপনি বাঁ-হাতে কোরাণ স্পর্শ করেন এটা বড় দৃষ্টিকটু, ডান হাতে স্পর্শ করতে পারেন তো ?

বললাম, ডান দিকটা পক্ষাঘাতদুষ্ট, আমি তো এইভাবেই অভিনয় করি, সুতরাং ডান হাতে কোরাণ স্পর্শ করার কোন উপায় নেই।

আমি কিন্তু এর পরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে না ডান, না বাম, কোন হাতে না ছুঁয়ে কোরাণ স্পর্শ করার জায়গায় মাথা দিয়ে স্পর্শ করতাম।

এ ছাড়া ওখানে 'খনা' হল একরাত্রি নয়, বিশেষ অনুরোধে দ্বিতীয়বার। খুবই জনাদর লাভ করেছিল 'খনা'।

প্রবোধবাবুর বহু বন্ধুবান্ধব নানাস্থানে ছড়িয়ে আছেন—চট্টগ্রামেও ওঁর বহু বন্ধুবান্ধব ছিল। তারা একদিন আমাদের সকলের জন্য - স্টীমার পার্টির আয়োজন করলেন। আমরা একেবারে কর্ণফুলী নদীর মোহনা পর্যন্ত, যেখানে সাগরে গিয়ে মিশেছে নদী, সেখান পর্যন্ত মহানন্দে ঘুরে এলাম। খুবই উপভোগ্য হয়েছিল সে স্টীমার-ভ্রমণটি।

তারপর আমার অন্য কাজ থাকায় আমি দলের সকলের আগেই কলকাতা চলে এলাম—আমার সঙ্গে এল সরযূবালা ও মনোরঞ্জনবাবু।

এই বছরের ১৪ই ডিসেম্বর নাট্যনিকেতনে শচীন সেনগুপ্তর লেখা দেশাত্মবোধক নাটক 'নরদেবতা' খোলা হল। এই নাটকখানি বিখ্যাত বিলাতী লেখিকা মেরী করেলীর 'টেম্পোর্যাল পাওযার' উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই নাটকখানির বিষয়বস্তু দর্শকমহলে দারুণ আলোডনের সৃষ্টি করেছিল। এক সিংহলী রাজার ছেলের প্রণয় হল এক বিদ্রোহী দলের নেত্রীর সঙ্গে এবং একে কেন্দ্র করেই রাজার সঙ্গে বাধে বিরোধ। কয়েক রাত্রি অভিনয় হবার পর 'নরদেবতা' আমাদের তদানীন্তন শাসকসম্প্রদায়ের কোপদৃষ্টিতে পড়ে এবং ১৯৩৬ সালের গোডার দিকেই তা বন্ধ করে দিতে হয়। বিংশ অভিনয় ছিল 'নরদেবতা'-র শেষ অভিনয় ৪-১-৩৬ তারিখে। ভূমিকায ছিলাম আমি, নীহারবালা ও অন্যান্য অনেকে।

এই সময় নাট্যনিকেতনে মন্মথ রায়ের আর একখানি নাটক অভিনীত হল —তার নাম 'খনা'। 'খনা' নাটক থেকে লেখকের কথায় বলি—" 'খনা' লিখিয়াছিলাম নিজের প্রেরণায় ১৯৩২ সালে পূজার ছুটিতে। খনার মতই এ নাটকখানির ভাগ্য বিচিত্র। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত স্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম পঠিত ও গৃহীত হয়। দিনাজপুর নাট্য-সমিতি কর্তৃক ইহা প্রথম অভিনীত হয়। অধুনালুপ্ত 'নাট্যকুঞ্জ' (কলিকাতা) কর্তৃক ইহা প্রথম বিজ্ঞাপিত হয়। 'বাঙলার বাণী' সাপ্তাহিক পত্রে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশেষে বর্তমানরূপে রূপান্তরিত হইয়া রাজধানীর নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় নাট্যনিকেতনে—২৮শে আষাঢ়, ১৩৪২ (১১ই জুলাই, ১৯৩৫)····· খনার কোন ইতিহাস পাই নাই। এই নাটকের বার আনা আমার কল্পনা এবং চারি আনা কিম্বদন্তী।

এতে সঙ্গীত রচনা করেন শ্রীঅখিল নিয়োগী, সুর সংযোজনা করেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, নৃত্যপরিকল্পনা করেন নীহারবালা।

ভূমিকালিপি ছিল এইরূপ : বরাহ—আমি, মিহির—জীবন গাঙ্গুলী, খনা—সরযূবালা, ধরণী—চারুশীলা, কামন্দক—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মদনিকা—নিরুপমা, তরলিকা—তারকবালা (লাইট), বিক্রমাদিত্য—শিবকালী চট্টোপাধ্যায়।

হ্যাঁ, এই বছরেই আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল সেটা বলতে ভুলে গেছি। সেটা হল নাট্যনিকেতনের মঞ্চে ক্যালকাটা থিয়েটার্সের আবির্ভাব। থিয়েটারের ব্যবস্থাপনার ভার প্রবোধবাবুর হাত থেকে চলে গেল। ভার নিলেন যশোদাবাবু। নীহারবালাও প্রবোধবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে ক্যালকাটা থিয়েটার্সে এসে যোগদান করলেন। এঁরা প্রথম মঞ্চস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'। আমি করলুম 'চন্দ্রবাবু' আর নীহারবালা করল 'নীরবালা'।

এই বছরের শেষ দিকে একটা মারাত্মক ব্যাধির কবলে সারা কলকাতা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রোগটা তখন 'ঝিনঝিনিয়া' বলে সকলের মুখে মুখে ফিরত। এটা আসলে ছিল একটা স্নায়বিক ব্যাপার। হঠাৎ দেখা যেত কারু সারা শরীরে প্রচণ্ড কাঁপুনি, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহ অবশ হয়ে যেত। এই রকম অবস্থায় কাউকে দেখলে মাথায় ঘটি-ঘটি জল ঢালত। কিছুক্ষণ পরে অনেকে সুস্থ হত, আবার কারু কারু এর জের চলত ২।৪ দিন। ডাক্তাররা বললেন,—এ আর কিছুই নয়—ভিটামিনের অভাব এবং অবসাদই এর কারণ।

যাই হোক, সারা কলকাতায় বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল এই 'ঝিনঝিনিয়া' রোগের প্রাদুর্ভাবে।

এল ১৯৩৬ সাল। ২০শে জানুয়ারী ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের মহাপ্রয়াণ ঘটল এবং অষ্টম এডওয়ার্ডকে ভারতের সম্রাটরূপে ঘোষণা করা হল ২২শে জানুয়ারী।

এর পর আমি পর পর দুটি বড় ছবির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করি। একটি হল ডি. এল. রায়ের 'পরপারে'। চন্দ্র ফিল্মস্ ছিলেন এর নির্মাতা এবং বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান যতীন দাস ছিলেন পরিচালক। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু, জ্যোৎস্না গুপ্তা, ভূমেন, শৈলেন চৌধুরী প্রভৃতি। ২৩শে জানুয়ারী কণ্ট্রাক্ট সই করলাম, আর ছবি মুক্তিলাভ করল ৪ঠা জুলাই—চিত্রায়।

৩রা ফেব্রুয়ারী ইস্ট ইণ্ডিয়ার 'সোনার সংসার' ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হলুম। দেবকী বসুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি এই 'সোনার সংসার' এবং আমারও। স্যর শঙ্করনাথের চরিত্রটি আমার খুবই ভাল লেগেছিল; সেজন্যে যখন সেটে অভিনয় করতাম, তখন আমি ও তুলসী লাহিড়ী (পণ্ডিত) দুজনে অনেক কথা বানিয়ে বলতুম, অবশ্য সিচুয়েশান বুঝে। ক্যামেরা চলছে, আমরা অভিনয় করে যাচ্ছি—Script-এ নেই এমন অনেক কথা আমিও বলছি, তুলসীও জবাব দিচ্ছে; কিন্তু দেবকীবাবু দেখছেন আর মুচকি মুচকি হাসছেন। ওঁর সহকারীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, কিন্তু দেবকীবাবু 'কাট'

বলছেন না! শেষে 'শট' শেষ হল। প্রায়ই দেবকীবাবু হাসতে হাসতে বলতেন—'ভেরি গুড'।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিল—ধীরাজ, ছায়াদেবী, মেনকা, জীবন গাঙ্গুলী, আজুরী, রণজিৎ রায়, সত্য মুখোপাধ্যায়, বিনয় গোস্বামী, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতি। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এতে সুর দেন।

যাই হোক, এই ছবিতে অভিনয় করে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম।

ফেব্রুয়ারী মাসেই নাট্যনিকেতনের সঙ্গে গেলাম পাটনায়। ওখানে নাট্যনিকেতন বেশ কয়েক রাত্রি অভিনয় করলেও, আমি দু'রাতের বেশি অভিনয় করতে পারি নি। কারণ সে সময়ে কলকাতায় আমার অনেকগুলো ছবির শ্যুটিং চলছিল, সুতরাং আমাকে কলকাতায় ফিরতে হল।

কলকাতায় ফেরার পরে সিনেমার কাজ নিয়ে মেতে উঠলাম। এর পর থিয়েটার তো আছেই। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে রঙমহলে 'চরিত্রহীন' অভিনীত হল। আমি করলাম 'শিবপ্রসাদ'। তারপর 'মহানিশা'তে মুরলীধরের ভূমিকাতেও অভিনয় করলাম। মার্চ মাসেই স্টারে অভিনীত 'রীতিমতো নাটক'-এ আমি সুহৃদ ডাক্তারের চরিত্রে রূপদান করি।

এপ্রিল মাসের চার তারিখে নাট্যনিকেতনে 'কেদার রায়' নাটকটির উদ্বোধন হল। রমেশ গোস্বামীর এই দেশাত্মবোধক নাটকটি মঞ্চস্থ করতে ক্যালকাটা থিয়েটার্সের স্বত্বাধিকারী যশোদানারায়ণ ঘোষ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। নাটকটির প্রয়োগনৈপুণ্যে এবং অভিনেতাদের অভিনয়ের গুণে সে-সময়ে নাট্যরসিক মহলে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নাটকটির ভূমিকালিপি ছিল এইরকম : কেদার রায়—আমি, চাঁদ রায়—রবি রায়, শ্রীমন্ত—নরেশ মিত্র, কার্ভালো—ভূমেন রায়, ঈশা খাঁ—জহর গাঙ্গুলী, কাল্লু সর্দার—মণি ঘোষ, সোনা—নিরুপমা, রত্না—চারুবালা, মায়া—রেণুকা রায়।

কেদার রায়ের রিহার্সালে একটা ঘটনা ঘটলো। সেটা না উল্লেখ করে পারছিনা। প্রথমে কেদার রায়ের চরিত্রটি দেওয়া হয়েছিল নির্মলেন্দুকে, আমার ছিল চাঁদরায়ের ভূমিকা। এইভাবে রিহার্সাল শুরু হয়েছিল। একদিন রিহার্সাল চলছে, অথচ নির্মলেন্দু রিহার্সালে ঠিকমতো যোগ না দিয়ে টিপ্পনী কেটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। নরেশবাবু ব্যাপারটা যশোদাবাবুর কাছে বলতে, যশোদাবাবু নির্মলেন্দুকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আপনি বিশিষ্ট অভিনেতা, অথচ এ-ধরনের আচরণ করছেন কেন? আপনার আচরণ থেকে কি শিখবে ছোট ছোট শিল্পীরা!

নির্মলেন্দু বরাবর ছিলেন একটু দাম্ভিক প্রকৃতির। সে একটু চড়া সুরেই বললে, —আমি আর কি করবো, ওরাই তো সব করছে। এ ভাবে রোজ রোজ আমি রিহার্সাল দিতে পারবো না।

শান্তপ্রকৃতির মানুষ যশোদাবাবু। ব্যক্তিগত জীবনে চিরকুমার এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির। বললেন, আমি থিয়েটারের শৃঙ্খলা কারো জন্যে ভাঙতে রাজী নই, নির্মলেন্দুবাবু।

নির্মলেন্দু সেই কথাতেই থিয়েটার ছেড়ে দিলে। যাবার আগে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে গেলো, অহীন—চললাম আমি।

মনে আছে আমি শুধু বলেছিলাম, আচ্ছা, এস।

এরপরেই কেদার রায়ের ভূমিকালিপি বদলে গেল। আমি হলাম নামভূমিকার শিল্পী।

ঠিক এই সময় খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী চারুশীলার মৃত্যু ঘটলো রহস্যজনকভাবে। আর সেইজন্য তাঁর শেষকৃত্য চুপিসারে সারতে হয়েছিল। কিন্তু সেই মৃত্যুরহস্য আজো রহস্যই রয়ে গেছে।

এই সময়ে মিনার্ভায় 'দস্যু' নামে নতুন নাটক খোলা হল। এই নাটক তেমন না চললেও শরৎ খুব ভালো অভিনয় করেছিল। সতু সেনের সম্মান-রজনীতে 'বাংলার মেয়ে' অভিনীত হল এই সময়েই। আমি বাংলার মেয়েতে জিতেন ব্যানার্জির ভূমিকা করেছিলাম।

নাট্যনিকেতনে নতুন করে 'সরলা' অভিনীত হল। আমি ছিলাম 'গদাধরচন্দ্র'-এর ভূমিকায়।

জুন মাসে দেবদত্ত ফিল্মের হয়ে 'অহল্যা' ছবির জন্য স্বাক্ষর করি। শ্যুটিংও বেশ কিছুদিন করেছিলাম, পরিচালনা করেছিলেন হরি ভঞ্জ। কিন্তু কেন জানি না, ছবিখানি শেষ পর্যন্ত সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করেনি। এতে আমি 'গৌতম ঋষি'-র ভূমিকায় অভিনয় করি।

এই সময় ভাদুড়ীমশায়ের সম্প্রদায়ে অর্থাৎ স্টারে নবনাট্য মন্দিরের সঙ্গে কয়েকটি সম্মিলিত অভিনয়ে আমি যোগদান করি। প্রথমে হল—৫ই জুন গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান', এতে ভাদুড়ীমশায় করেছিলেন 'করুণাময়', আমি করি 'রূপচাঁদ', আর রাধিকানন্দবাবু করেছিলেন 'দুলালচাঁদ'। তারপর ১১ই জুন হল 'বিজয়া'। 'বিজয়া'-য় শিশিরবাবু বরাবর করতেন 'রাসবিহারী', এবার আমি করলাম 'রাসবিহারী', শিশিরবাবু করলেন 'নরেন' আর ভূমেন করল 'বিলাস'।

এই মাসেই 'পরপারে'-র শ্যুটিং শেষ করলাম।

ছোটবেলা থেকেই আমার খেলাধূলার দিকে ঝোঁক ছিল প্রচণ্ড। নিজেও এক সময় খেলেছি। এই সময় কলকাতায় এল চীন থেকে একটি ফুটবল টীম। এই বোধহয় ভারতে বৈদেশিক টীমের প্রথম আগমন হল। ভারতীয় একাদশের সঙ্গে খেলায় (১—১) ড্র হল। বিদেশী টীমের সঙ্গে ভারতীয় দল কিরকম খেলে তা দেখার লোভ সামলাতে পারলুম না।

শিশিরবাবু তখন তাঁর মঞ্চসফল নাটক 'রীতিমত নাটক' উঠাবার তোড়জোড় করেছিলেন কালী ফিল্মস্-এর হয়ে। সুহৃদ ডাক্তারের ভূমিকাটি তাঁর সঙ্গে স্টেজেও করেছি, ফিল্মেও আমাকেই আহ্বান জানালেন ঐ ভূমিকাটির জন্যে। আমি ২১শে জুলাই চুক্তিপত্রে সই করি।

৮ই আগস্ট রূপবাণীতে দেবদত্ত-র 'রজনী'-র উদ্বোধন হল। ছবিখানি তখনকার দিনে দর্শকদের চিত্ত জয় করতে পেরেছিল।

এই সময় একদিন শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর স্বত্বাধিকারী বাবুলাল চোখানী আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর স্টুডিওতে। আমি যেতে বাবুলালজী আমার সঙ্গে এক সুদর্শন সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোকের আলাপ করে দিলেন। বললেন : ইনি হলেন মিঃ মধু বোস—এঁর 'আলিবাবা' দেখছেন তো! ইনি এবার আমার এখানে একটা ছবি করছেন—সেটার বিষয় কথা বলবেন।

আমি বললাম : ওঁর নাম আমরা খুব শুনেছি, তবে চাক্ষুষ আলাপ হয়নি। যাক, কি ছবি করছেন আপনি ?

মিঃ বোস বললেন : ছবিটার নাম হল 'অভিনয়'—মন্মথ-র গল্প।

আমি বললাম : আমার চরিত্রটা কি ধরনের ?

মিঃ বোস গল্পটা মোটামুটি বলে আমার চরিত্রটা বুঝিয়ে দিলেন। ভালই লাগল আমার চরিত্রটি।

১৮ই আগস্ট সই করলাম 'অভিনয়'-এর কণ্ট্রাক্টে।

এই সময় আদর্শ ফিল্মের 'দলিত কুসুম' দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হল। আদর্শ ফিল্মের দুই পার্টনার ছিলেন জব্বলপুরের এম. পি. শেঠ গোবিন্দদাস, আর মিঃ মিশ্র। এঁদের দুজনের মধ্যে কি একটা গণ্ডগোলের জন্যে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল ছবির কাজ। গোলমাল মিটতে আবার ছবির কাজ আরম্ভ হল। এই ছবির পরিচালক ছিলেন মিঃ ট্যাণ্ডন, আর উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন একজন রাশিয়ান ভদ্রলোক। ছবি তৈরির সময় একদিন মজার ব্যাপার হল।

ছবিতে একটা দৃশ্য ছিল, অনাথ আশ্রমের সম্পাদক মদ্যপান করে একটি মেয়ের ওপর অত্যাচার করতে উদ্যত। রাশিয়ান ভদ্রলোক বললেন, দৃশ্যটিকে বাস্তবসম্মত করতে গেলে অভিনেতাকেও একটু মদ্যপান করতে হবে।

আমি তখন বললাম, এটা মন্দ কথা নয়, তবে যদি শটটা পাঁচবার এন. জি. হয় এবং পাঁচবার নিতে হয়, তখন? পাঁচবারই তাকে মদ্যপান করতে হবে তো?

রাশিয়ান ভদ্রলোক বললেন, দেখাই যাক না, কি রকম দাঁড়ায়।

মনে মনে বললাম, এতো বেশ ভালো ডিরেক্টার। এরকম কথা তো কেউ বলে না।

সেই মতই শ্যুটিং আরম্ভ হল। এবারে আসল কথাটা বলি, অনাথ আশ্রমের সম্পাদকের ভূমিকাটা ছিল আমার, আর 'শট'টি নিতে হয়েছিল বার তিনেক।

অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে একটা বেনিফিট নাইটে আমাকে অভিনয় করতে হল 'গৈরিক পতাকা'য়; আমার ভূমিকা ছিল 'ঘোড়পুরে'। এ-ভূমিকায় এই প্রথম নামলাম।

এর পরের সপ্তাহে অভিনেতা মণি ঘোষ 'প্রফুল্ল' নাটকের সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করলেন নাট্যনিকেতনে। আমি 'কাঙালীচরণ'-এর ভূমিকায় নামলাম, আর ভূমেন রায় করলো রমেশ। অভিনয়ের মাঝে মাঝে চরিত্র বদল মন্দ লাগে না।

এই সময় প্রতিদিন রাত্রে 'সরলা'-র শ্যুটিং হতো ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওয়। ছবিটির প্রযোজক অবশ্য ভারতলক্ষ্মী নয়—প্রযোজক ছিলেন যামিনী মিত্র। পূজোর সময় ছবিটি রিলিজ করতেই হবে, তাই প্রতিদিন শ্যুটিং হতো, দিনে এবং রাতে। রাতের শ্যুটিং-এ শ্যামাপোকার উৎপাতে কতো যে ফিল্ম নষ্ট হয়েছে তার হিসেব নেই। সন্ধ্যে হতেই কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এই পোকা এসে ভিড় করতো কে জানে। ক্যামেরা চলাকালীন ক্যামেরার সামনেও এই পোকারা আসর জমাতো। এই পোকা মারার জন্যে যামিনীবাবু একটি অভিনব পন্থা নিয়েছিলেন। বড়ো বড়ো কাগজের সীটে আঠা মাখিয়ে আলোর পাশে রাখা হতো—যাতে পোকারা এই আঠাতে জড়িয়ে যায়। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। আর ছবিটি যখন মুক্তি পেল, তখন পর্দার ওপর পোকার চিহ্নও ফুটে উঠলো।

'সরলা'-র শ্যুটিং-এ আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। পুরো এক রোল ফিল্ম ক্যামেরায় উল্টোভাবে লাগানো হয়েছিল। সেইভাবেই ছবি উঠেছে। ঘটনাটা ধরা পড়লো ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটনের সময়। অগত্যা আবার শ্যুটিং করতে হল। এই সময় আর এক বিপদ হল।

পরিচালক চারু রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হঠাৎ মারা গেল। তাঁর স্ত্রী মায়া রায় বাড়ীতে থাকতে পারতেন না—তিনি চলে আসতেন স্টুডিওতে। ঐখানে ফ্লোরের একধারে শিল্পীদের বিশ্রামের জন্য একটি ফরাসের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত রাত ধরে শ্যুটিং হত। যে-সব শিল্পীরা শটের ফাঁকে ফাঁকে অবসর পেতেন, তাঁরা একটু গড়িয়ে নিতেন এখানে। শ্রীমতী রায়ও এখানে শুয়ে থাকতেন। এই শোকসন্তপ্ত দম্পতীকে দেখে সত্যিই আমার কষ্ট হত। চারুবাবুর মনের যেরকম অবস্থা, তাতে কোন শিল্পসৃষ্টি করা সম্ভব নয়—তবু ছবির রিলিজের দিন ঠিক হয়ে গেছে, অতএব ছবি যেমন করে হোক শেষ করতেই হবে।

যাই হোক, এইভাবেই ছবি শেষ হল এবং মুক্তিলাভও করল নির্দিষ্ট দিনে শ্রী সিনেমায় ২১শে অক্টোবর।

সেই একই দিনে আরও দুখানি ছবি মুক্তি লাভ করল—একটি হল 'সোনার সংসার' উত্তরায়, অপরটি হল 'বিজয়া' রূপবাণীতে। এই দুখানি ছবির তুলনায় 'সরলা' খুবই নিরেস হয়েছিল।

আমার নট-জীবনের সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক ভূমিকায় নামতে হয়েছিল আমাকে একবার। নতুন নতুন ভূমিকায় অভিনয় করতে সব অভিনেতাই চায়। আমারও কি খেয়াল হল একবার যে 'প্রতাপাদিত্য' রডা-র ভূমিকায় নামলে কেমন হয়! এই সময় এক সম্মিলিত অভিনয়ে আমি নামলুম 'রডা'-র ভূমিকায়, আর আমার 'ভবানন্দ' ভূমিকাটি করলেন নরেশ মিত্র। কিন্তু দুঃখের কথা বলব কি, এরকম ফাঁকা হাউস আর তার ওপরে দর্শকদের বিরুদ্ধ সমালোচনা আমার জীবনে বিশেষ জোটেনি।

এখানে 'কেদার রায়' তখন সগৌরবে ৬০শ রজনীর গৌরব লাভ করেছে নাট্য-নিকেতনে। শিশিরবাবু স্টারে খুললেন 'অচলা' (শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'-এর নাট্যরূপ) ২২শে অক্টোবর, ঠিক পূজোর মুখে একেবারে। এ-নাটকখানি কিন্তু তেমন বেশীদিন চলেনি।

১লা নভেম্বর রঙমহলে শেষ প্রদর্শনীর পর থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। ডিরেক্টারদের মধ্যে মতদ্বৈধতাই সম্ভবত এর কারণ।

আপনাদের আগে জানিয়েছি যে, এক জায়গায় বেশীদিন চুপচাপ বসে থাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কয়েক মাস বাইরে কোথাও না-যাওয়ায় মনটা কিরকম হাঁফিয়ে উঠেছিল। তাই ভাবছিলাম যে, কোন দূরদেশ না হোক, কাছাকাছি কোথাও অন্ততঃ একটা 'শর্ট ট্রিপ' দিয়ে আসতে পারলে মন্দ হয় না।

একদিন সে-সুযোগ জুটে গেল।

আমার এক তরুণ ভক্ত, নামটা তার আজ ঠিক মনে পড়ছে না, তাকে আমরা 'রায়' বলে ডাকতুম। বেশ বড়লোকের ছেলে, থিয়েটার দেখার দারুণ নেশা। সে থিয়েটার ভাঙার পর প্রায়ই রাত্রে আমায় বাড়ী পৌঁছে দিত। বিরাট গাড়ী হাঁকিয়ে সে আসত, নিজেই চালাত, আর বেশ ভালই চালাত।

একদিন আমি রঙ্গচ্ছলে বলেছিলাম : হ্যাহে রায়, তুমি তো বড ভাল চালাও হে। চল না একদিন কাছাকাছি কোথাও একটু 'এক্সকারসান'-এ যাওয়া যাক।

রায় খুশী মনে বললে : বেশ তো চলুন না—কোথায় যাবেন বলুন।

আমি বললুম : বেশী দূর যাওয়া তো যাবে না—কাছেপিঠে,—ধর হাজারিবাগ। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে গিয়ে হাজারিবাগ ঘুরে চলে আসা যাক।

রায় শুনেই রাজী হয়ে গেল।

তারপরদিনই আমরা খাওয়া-দাওয়ার পর যাত্রা করলাম বেলা একটা নাগাদ। রায় নিজেই ড্রাইভ করছিল, আমি আর তুজন সঙ্গী ছিলেন আমার সঙ্গে। তাঁরা থিয়েটার-বায়স্কোপের বাইরের লোক—আমার বন্ধু।

ধানবাদ পৌঁছলাম রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়। রাত্রিটা ডাকবাংলোয় কাটিয়ে পরের দিন স্নানটান সেরে চা-জলখাবার খেয়ে আবার বেরিয়ে পডা গেল বেলা সাডে দশটা নাগাদ। ওখান থেকে বেরিয়ে বাগাডো পৌঁছলাম বেলা সাড়ে বারটার সময়। ওখানে গিযে উঠলুম পি. ডবলু. ডি. বাংলোয়। মধ্যাহ্নভোজন সারলুম ওখানেই—তারপরই বেরিয়ে পডলুম হাজারিবাগের উদ্দেশে।

ওখান থেকে হাজারিবাগ রোড হল ৩২ মাইল—ওখানে পৌঁছুতে বেজে গেল সাডে চারটা।

ওখানে থাকবার কোনো জায়গা না পেয়ে আমরা চলে এলাম তাঁচিঝোরায়—হাজারিবাগ থেকে ১৭ মাইল দূরে। এইখানে শিওয়ান নদীর সেতু বেশ দেখবার মতো। আমরা তাঁচিঝোরায় ডাকবাংলোতে এসে বিশ্রাম করলাম। সেই সন্ধ্যার সময় আমরা হাজারিবাগ টাউনের দিকে যাত্রা করলাম। কিন্তু হাজারিবাগ টাউনে না থেমে চলে গেলাম সোজা রাঁচির পথে—একটানা ৫৭ মাইল পথ। কিন্তু রাঁচিতেও কোন হোটেলে স্থান পাওয়া গেল না। শেষকালে স্টেশনের রেস্তোঁরায় নৈশাহার শেষ করলাম।

জায়গাই যখন পাওয়া গেল না, তখন আর থেকে কি হবে। আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম—এবার ফেরার পথে। এলাম পুরুলিয়ায়—দূরত্ব ৭২ মাইল।

পুরুলিয়া পৌঁছুতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি যে, রাত্রি

তখন এগারটা বেজে গেছে। রাস্তাঘাটেও লোক চলাচল নেই বললেই হয়। রাস্তাও তেমন ভাল নয়। দীর্ঘ পথ মোটর চালিয়ে রায়ও ক্লান্ত হযে পডেছিল। হঠাৎ রাস্তায় একজন লোকের দেখা পাওয়া গেল—তাকে জিজ্ঞেস করলুম ঃ ডাকবাংলোটা কোথায় বলতে পারেন?

লোকটি মোটরের তীব্র হেড-লাইটে একটু হকচকিযে গেল, তারপর বিডবিড করে সামনের দিকে একটা রাস্তা দেখিযে দিল। আমরা সেইদিকেই এগিযে গেলাম। কিছুদূরে যেতেই বজ্রগম্ভীর স্বরে একটি আওয়াজ ভেসে এল ঃ হল্ট্—হুকুমদার।

গাডীর হেড-লাইটে দেখা গেল দুজন সশস্ত্র প্রহরী বন্দুক উঁচিয়ে সামনে এসে দাঁডিয়েছে। রায় তো সঙ্গে সঙ্গেই গাডী থামাল। সেণ্ট্রি দুজন এগিযে এসে বলল ঃ ইধার কাঁহা যাতা?

আমি বললাম ঃ কি ব্যাপার কি? আমরা যাব ডাকবাংলোয।

'ডাকবাংলা ইধার নেহি—উধারসে যাইযে।' বলে দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

গাডী ঘুরিযে নিযে আমরা সেইদিকেই চললাম আবাব।

ডাকবাংলোয় পৌছলুম বটে, কিন্তু সেখানে অনেক ডাকাডাকির পর চৌকিদার-সাহেব উঠে দরজা খুলে দিল। আমরা ভিতবে তো ঢুকলুম, কিন্তু প্রচণ্ড খিদে পাওয়া সত্ত্বেও একদানা খাবারও জুটল না আমাদের অদৃষ্টে। যাই হোক, খাওয়া না হোক, শোওয়া তো হল।

দীর্ঘ মোটর-ভ্রমণের ক্লান্তিতে শোওয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পডলাম।

ঘুম ভাঙল যখন তখন সকাল আটটা।

তারপর স্নানটান সেরে বেশ ভালভাবে প্রাতরাশ সেরে দশটা নাগাদ আবার বেরিয়ে পডলুম ধানবাদের পথে। ধানবাদ পৌছলুম বেলা সাডে বারোটা নাগাদ। ওখানে বাজারে এক হোটেলে গিয়ে মাংস-ভাত খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা হল।

একটু বিশ্রাম করেই আবার রওনা হলাম। এবার কলকাতার দিকে। ইচ্ছে ছিল যাবার পথে বরাকর ডাকবাংলোয় কিছু সময় থাকবো, কিন্তু হল না। বাংলো বন্ধ। চৌকিদার গেছে পাশে গ্রামের বাডীতে। লোকজন না থাকলে সে এমনি করে।

রায় বললে, চলুন, কার্মাটারে আমার বাডী আছে, সেখানেই রাতটা কাটাবো।

বললাম, বেশ, তাই চলো।

সন্ধ্যে হল কার্মাটারে পৌছতে। কিন্তু রায়ের বাড়ী খালি নেই। মালী

জানালো, আগে থেকে একজন ভাড়াটে এসেছে। সুতরাং সেখানে আর স্থান হল না। শেষটা মালীই আর একটা বাড়ী ঠিক করে দিলে।

বাড়ীটা ছিল পোড়ো-বাড়ী। তবুও সেই বাড়ীতেই উঠলাম।

রাঁচী থেকে কয়েকটা মুর্গী এনেছিলাম। তারই দুটো কেটে রান্না করলো মালী। আর বাজার থেকে পাঁউরুটি কিনে আনানো হল।

সে-রাত্রে মুর্গী ভালোই রান্না করেছিল মালী।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি সেই রাতের ট্রেনেই কলকাতায় রওনা হলাম। আমার থাকার উপায় ছিল না, কারণ পরদিনই থিয়েটার আছে 'কেদার রায়'।

কেদার রায় তখনো অপ্রতিহত গতিতে চলছে।

এই সময় নাট্যনিকেতনে মন্মথ রায়ের 'কারাগার' অভিনীত হল। আমি কংসের ভূমিকায় অভিনয় করলাম।

কী জানি কেন, ছুটে বেড়াবার নেশা আমার। এই তো সেদিন খানিক বেড়িয়ে এলাম। আবার নভেম্বরের ১৫ই তারিখে বেরিয়ে পড়লাম। মোটর ভ্রমণে। এবারে গেলাম বরাকরে 'কল্যাণেশ্বরী' মন্দির দর্শন করতে।

রাত্রে 'কারাগার' অভিনয় শেষে বেরিয়ে শেষরাত্রে বরাকরের ডাকবাংলোতে আশ্রয় নিলাম। এই বরাকরের নদীই হল বাংলা-বিহারের সীমারেখা। সকালে বরাকর নদীতে স্নান সেরে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে গেলাম দেবী দর্শন করতে।

এই কল্যাণেশ্বরীর ওপর আমার দারুণ বিশ্বাস এবং আকর্ষণ। এইখানেই আমার চিত্রজীবন শুরু। আমার প্রথম ছবি 'সোল অফ এ স্লেভ'-এর শুটিং এইখানেই হয়েছিল। তারপর ম্যাডানের নির্বাক ছবি 'প্রেমাঞ্জলী' (ময়মনসিংহ-গীতিকার 'মহুয়া' থেকে নেওয়া) ছবির শুটিং-ও হয় এখানে। আরো দু-তিনবার এখানে এসেছি। একবার আমার সঙ্গে ভূমেনও এসেছিল। কল্যাণেশ্বরী মূর্তির স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে আছে। এ-পথে কোথাও গেলে দেবীদর্শন না করে যাইনি।

যাই হোক, কল্যাণেশ্বরী মন্দির-অঙ্গনে এসে দেবী-মূর্তির সামনে দাঁড়ালাম, তখন মনটা ভরে গেল এক অনির্বচনীয় প্রশান্তিতে।

এরপর আমরা চলে এলাম নদী পেরিয়ে বিহারের একটি গ্রামে—চিরকুণ্ডায়। মনোরম গ্রাম। এখানকার ডাকবাংলোয় রাত্রিবাস করে, পরদিন সকালে খাওয়া-দাওয়া করে সাড়ে বারোটার সময় কলকাতা রওনা হলাম। কলকাতা পৌছলাম সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। বাড়ীতে একটু বিশ্রাম করেই ছুটলুম রেডিও স্টেশনে। সেদিন আমার রেডিওতে 'মিশরকুমারী' অভিনয়।

তখন বয়স কম ছিল—পরিশ্রম করতে পারতাম। কাজ করতে কখনও আমি ক্লান্তি বোধ করিনি।

এদিকে মিনার্ভা থিয়েটার তখন খুললেন 'পরশুরাম'।

ডিসেম্বর মাসের ৩রা তারিখে সম্মিলিত শিল্পীদের নিয়ে 'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হয়। এতে আমি নামলাম 'প্রতাপে'র ভূমিকায়। অন্যান্য ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দবাবু, মনোরঞ্জনবাবু, সরযূবালা, আঙুরবালা প্রভৃতি।

এইদিনই খবরের কাগজে যে-সংবাদটি সারা পৃথিবীর লোককে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল সেটি হল, রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের এক চাঞ্চল্যকর ঘোষণা। ঘোষণাটি হল তিনি আমেরিকাবাসিনী মিসেস সিম্পসনকে বিবাহ করবেন। ডিভোর্স-করা কোন মহিলাকে বিবাহ করা ব্রিটিশ রাজপরিবারে নিষিদ্ধ, সুতরাং একে বিবাহ করলেই তাঁকে রাজ্যত্যাগ করতে হবে। কিন্তু অষ্টম এডওয়ার্ড (যিনি ছিলেন ভূতপূর্ব প্রিন্স অব ওয়েলস্) প্রেমের দাবিকেই বৃহত্তর সম্মান দিয়ে এই ঘোষণার পর রাজ্যত্যাগ করলেন এবং 'Half hound' নামক রণতরীতে চেপে ইংলণ্ড ত্যাগ করলেন। হৃদয়ের দাবির কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দাবি ম্লান হয়ে গেল।

১৪ই ডিসেম্বর ষষ্ঠ জর্জকে ঘোষণা করা হল ইংলণ্ডের রাজা বলে। ডিউক অফ উইণ্ডসর ভিয়েনার কাছে ব্যারণ রথচাইল্ডের অতিথিরূপে বাস করতে লাগলেন।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, সপ্তাহখানেক আগে কালী ফিল্মস্ 'হারানিধি' নামক একটি ছবির জন্যে আমার সঙ্গে চুক্তি করে গেলেন। তিনকড়িদা ছিলেন এর পরিচালক।

১৫ই ডিসেম্বর ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমান উত্তরা) রাধা ফিল্মের 'বিষবৃক্ষ' ছবির মুক্তিলাভ ঘটে। এতে নগেন্দ্রনাথের ভূমিকাটি আমি করি। নির্বাক যুগেও আমিই ম্যাডানের হয়ে এই ভূমিকাটি অভিনয় করেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র নাট্যরূপ দিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র। ১৯শে ডিসেম্বর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাট্যনিকেতনে গোরার উদ্বোধন করলেন। প্রথম দিন অভিনয়ে নাটক শেষ হতে লেগেছিল ৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহিত করলেন। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় ধরে নাটক চলতে পারে না, সুতরাং নাটককে সংক্ষিপ্ত করার কাজ আরম্ভ হল পরের দিন থেকে।

গোরায় পরেশবাবুর ভূমিকায় ছিলাম আমি; নরেশ মিত্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন পানুবাবুর চরিত্রে, সুচরিতার ভূমিকাটি ছিল শান্তি গুপ্তার, আর নামভূমিকায় ছিলেন ভূমেন রায়।

এই স্টারেও রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' আরম্ভ হল। সেটিরও উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ। নাটকে মধুসূদনের চরিত্রে ছিলেন শিশিরকুমার, আর কুমুদিনীর ভূমিকায় ছিলেন কঙ্কাবতী।

কলকাতার দুটি বিখ্যাত মঞ্চে তখন রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩৬-এর শেষ পর্যায়ে আর এমন কিছু ঘটনা নেই। ১৯৩৭-এর শুরুতেই এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল না। তবে একটি ছবির কথা না বলে পারি না। ছবিটি হল শিশিরকুমার পরিচালিত 'টকী অফ টকীজ'। শ্রীতে মুক্তিলাভ করেছিল। ছবিটিতে আমি করেছিলাম সুহৃদ ডাক্তার। ছবিটি ভালই চলেছিল।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমাকে প্রায়ই এখানে-ওখানে নাটক অভিনয় করতে যেতে হত। নাট্যনিকেতনের হয়ে আমি ৩১শে জানুয়ারী ফরিদপুর রওনা হলাম। রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ওখানে অভিনয়-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। ফরিদপুরের প্রসঙ্গে ওখানকার স্থানীয় নেতা মোয়াজ্জেম চৌধুরী, যিনি 'লাল মিঞা' বলে পরিচিত,—মানুষটির কথা মনে পড়ে। মনে আছে, ফরিদপুরে পাঁচদিন আমাদের অভিনয় করতে হয়েছিল। প্রতিদিন নাটক দেখতে অজস্র দর্শকসমাগম হত।

ফরিদপুর থেকে আবার কলকাতায়। আবার সেই 'গোরা' অভিনয়। কিন্তু সেই রাতে অভিনয় শেষে আবার অভিনেতা কালী গুহের দলের সঙ্গে ভূমেনের গাড়ীতে পুরুলিয়ায় যাওয়া। পথে ধানবাদ ডাকবাংলোয় কিছুক্ষণ বিশ্রাম। এই বিশ্রামের অবসরে দেখা হল ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে। ক্ষিতীশবাবু শুধু নাট্যরসিক নন, ভাল অভিনেতাও।

ধানবাদ থেকে রওনা হয়ে প্রায় ৫২ মাইল পথ অতিক্রম করে এলাম পুরুলিয়ায়। এইখানেই আজ রাত আটটায় 'সাজাহান' অভিনয়।

রাতে অভিনয় শেষে আবার কলকাতার পথে রওনা হলাম ভূমেনের গাড়ীতে।

কলকাতায় পৌছোবার ২ দিন পরেই শুরু হল কালী ফিল্মসে 'হারানিধি'-র শ্যুটিং।

১৪ তারিখে হল 'গোরা'-র ২৩শ অভিনয়—এইদিন রবীন্দ্রনাথ আবার দেখলেন ম্যাটিনী শো-তে। সন্ধ্যার শো-তে দেখলে ভাঙতে দেরি হয় বলে তিনটের শো-তেই এসেছিলেন।

সেইদিন রাতেই আবার ভূমেনের গাড়ীতেই আমরা রওনা হলুম ধানবাদ। এবারে ধানবাদে যে একজিবিশান হচ্ছিল, তাতেই অভিনয়ের পালা। এবার খেয়াল হল ধানবাদ এবং বরাকরের কাছে প্রচুর জলা আছে—সেখানে কিছু শিকার করলে

মন্দ হয় না। এ বিষয়ে ভূমেনের উৎসাহ ছিল খুব বেশী। সেজন্যে সঙ্গে নিলাম আমার বন্দুকটা। আর তা ছাড়া রাত্রিবেলায় যাতায়াত করা—সেজন্যে সঙ্গে আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র থাকাটাও মন্দ নয়। বলা তো যায় না—কখন কি হয়।

যাই হোক, ১৫ তারিখে ধানবাদের অভিনয় সেরে ১৬ তারিখেই সকালে বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার দিকে। ভূমেন বলল: দাদা, বন্দুকটা এনেছ—চল না দেখা যাক, কিছু শিকার-টিকার মেলে কিনা! আমি বললাম: আগে থেকে শিকারের ধান্দায় ঘুরলে আর কল্যাণেশ্বরী যাওয়া যাবে না। এই ঝামেলাতেই দিন শেষ হয়ে যাবে। তার চেয়ে আগে কল্যাণেশ্বরী চল, দেবীদর্শনের পর যদি সময় থাকে তো তারপরে এদিকে নজর দেওয়া যাবে।

আগে বলেছি যে কল্যাণেশ্বরীর প্রতি আমার একটা দারুণ আকর্ষণ আছে। সুতরাং শিকার না হয় না হোক, কিন্তু দেবীদর্শন হবে না—এটা অসহ্য। কাজেই কল্যাণেশ্বরী পৌঁছে স্নানাদি সেরে পূজা দেওয়ার পর আহারাদি সারতে বেলা প্রায় গড়িয়ে এল। আর শিকারে বেরুনো হল না। সোজা কলকাতা চলে এলাম।

এর কয়েকদিন পরেই আবার ছুটলাম সিউড়ীতে। এবারে নাট্যনিকেতনের হয়ে। সিউড়ীতে এক বিরাট মেলা হচ্ছিল—সেই উপলক্ষে এই অভিনয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারী পৌঁছলাম সিউড়ীতে সকাল ৮-১৫ মিনিটে। ট্রেন থেকে নেমে দেখি সুলেখক, নাট্যকার এবং নাট্যরসিক রায়বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষা করছেন প্ল্যাটফর্মে। নির্মলশিব অত্যন্ত বন্ধুবৎসল অমায়িক ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। তিনি আমার জন্যে আলাদা বাড়ীতে বিশেষ বন্দোবস্ত করলেন। রাতে গিয়ে পৌঁছলেন নরেশবাবু বনবিহারী ও সন্তোষ দাসকে সঙ্গে নিয়ে।

বিকেলবেলা নির্মলশিববাবু তাঁর ভাইপো তারাপদকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মেলা দেখবার জন্যে। ঘুরে ঘুরে মেলা দেখলাম, কিছু কিছু কেনাকাটাও করলাম। মেলাটি বেশ বড়, আর জিনিসের সমাবেশও হয়েছে প্রচুর।

রাত্রি ৯টায় প্লে। প্রথম দিন হল 'কেদার রায়'।

দ্বিতীয় দিন—দুটো অভিনয়। প্রথম অভিনয় বেলা ৪টায়—'খনা'; দ্বিতীয় অভিনয় হল 'সাজাহান' রাত্রি ৯টায়।

তৃতীয় দিন রাত্রি ৭টায় হল 'গোরা'। অভিনয়ের পরে তাড়াতাড়ি নির্মলবাবু তাঁর গাড়ীতে করে সাঁইথিয়া পৌঁছে দিলেন। পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম গাড়ী এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি করে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে লাইনে পা লেগে পড়ে গেলাম। ভাগ্যি ভাল যে আঘাতটা তেমন গুরুতর হয়নি।

কলকাতা পৌঁছলাম পরদিন সকাল ৮-৩০টায়। সেইদিনই আবার কালী ফিল্মে 'হারানিধি'র শুটিং বেলা একটা থেকে। বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেলাম স্টুডিও, তারপর সমস্ত দিন শুটিং করে ওখান থেকে সোজা চলে গেলাম নাট্যনিকেতনে —সাড়ে সাতটায় 'গোরা' অভিনয়।

এইরকম দৌড়ঝাঁপ করে অবিশ্রান্ত অভিনয় করে গেছি। এ একটা দারুণ নেশা —মাঝে মাঝে ক্লান্তি বোধ করেছি, কিন্তু ভালো লেগেছে।

একবার সিউড়ী যাবার প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল।

বর্ধমান স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়ায় প্রায় দশ মিনিট, কিন্তু স্টেশনে নেমে একটু পায়চারি করছি এমন সময় দেখি অদূরে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় শ্বেতশুভ্র দাড়ির প্রান্তভাগ দেখা যাচ্ছে। কৌতূহল হল, কাছে এগিয়ে গেলাম—দেখলাম আমার অনুমান ঠিক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ চলেছেন বোলপুরে। আমি গিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই নমস্কার করতেই কবি স্মিতহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন: অহীন যে—কোথায় চলেছ?

আমি বললাম: সিউড়ী—ওখানে যে একজিবিশান হচ্ছে সেইখানে একটা অভিনয়ের ব্যাপারে যাচ্ছি।

—ও, বড়বাগানের মেলা! বেশ, বেশ।

এইরকম টুকরো টুকরো দু একটা কথা বলার পর ট্রেন ছেড়ে দিল। উনি বললেন: উঠে এস।

আমি কবির কামরাতেই উঠে পড়লাম তাড়াতাড়ি। কবির সঙ্গে গল্প করতে করতে বোলপুর পর্যন্ত গেলাম। বোলপুরে কবি নেমে গেলেন, আমি আবার আমার কামরায় ফিরে এলাম।

পরদিন দেখি দীনেন্দ্রনাথ নিজেই এসেছেন গাড়ী নিয়ে আমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবার জন্যে। আমি জানতাম যে, একবার দীনুবাবুর সঙ্গে গিয়ে পড়লে তার ওপরে তিনি যেমন গল্পপ্রিয় মজলিশি লোক, তাতে আর সময়ে ফিরতে পারব না। আমি অনেক করে তাঁকে বুঝিয়ে বললাম এবং অনুরোধ রাখতে পারলাম না বলে ক্ষমাও চাইলাম।

১লা মার্চ রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে পার্লামেন্ট অফ রিলিজন-এর উদ্বোধন হল। সভাপতিত্ব করলেন ডঃ ব্রজেন শীল। এই উপলক্ষে একটি বিরাট প্রদর্শনীরও আয়োজন হয়।

৩রা মার্চ সকালবেলায় প্রবোধবাবুর ছেলে সুধীর আমাকে টেলিফোনে জানাল যে, আজকেই দুপুরের ট্রেনে বহরমপুর যেতে হবে। সেখানে 'খনা' ও 'আলাদীন' অভিনয়

হবে, আমাকে যেতে হবে। আমার যেতে তেমন মন ছিল না, কারণ টাকা-পয়সা ঠিকমত পাওয়া যায় না ওদের কাছ থেকে। তাই আমি বললাম, অনাদিবাবুর স্টুডিওতে আমি তেলেগু ছবির পরিচালনার ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। যাই কি করে!

কিন্তু সুধীর নাছোড়বান্দা।

তখন আমি বললাম, অনাদিবাবু যদি অনুমতি দেন তাহলে যেতে পারি।

সুধীর তখন অনাদিবাবুকে ফোন করে। অনাদিবাবুকে অনেক কষ্টে রাজী করাল, কিন্তু এক শর্তে—পরদিনই অর্থাৎ চার তারিখে ছেড়ে দিতে হবে।

অগত্যা যেতেই হল। সেইদিন রাতেই অভিনয় শেষে রাত ১-৭ মিনিটের ট্রেনে কলকাতা রওনা হলাম।

ভোরবেলায় কলকাতা পৌঁছতেই জয়নারায়ণের টেলিফোন—সেইদিনই বেলা এগারোটা থেকে বেলগাছিয়া ভিলাতে 'হারানিধি'-র শ্যুটিং। একটু বিশ্রাম করে স্নানাহার সারতেই স্টুডিওর গাড়ী এসে নিয়ে গেল। পৌনে চারটে পর্যন্ত শ্যুটিং হল। তারপর অরোরা স্টুডিওতে গিয়ে অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা করে তেলেগু ছবি 'বিপ্রনারায়ণ'-এর চিত্রনাট্যটি নিয়ে এলাম একটু ভাল করে পড়ে দেখব বলে।

তারপরদিন আবার বহরমপুর যেতে হল। আসাম মেলে উঠে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করে বহরমপুরের ট্রেন ধরলাম। এদিন আবার 'কেদার রায়' অভিনয়। অসম্ভব জনসমাগম হয়েছিল সেদিন। বহুলোক টিকিট না পেয়ে ফিরে গিয়েছিল—এর ফলে খানিকটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু পরে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকায় ব্যাপারটা বেশীদূর গড়ায়নি।

অভিনয় খুব ভাল হয়েছিল। অভিনয়ের পরে রাঘববাবু আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে প্রচুর খাওয়ালেন। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার রাত্রি ১-৭ মিনিটের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে এলাম।

১০ই মার্চ শুরু হল তেলেগু ছবি 'বিপ্রনারায়ণে'-এর শ্যুটিং অরোরা স্টুডিওতে। আমি তেলেগু ভাষা জানি না—আমি টেকনিক্যাল দিক এবং অভিনয়ের দিক দেখতাম —সংলাপের জন্য ওদের তরফের লোক ছিল।

পরদিন অর্থাৎ ১১শে মার্চ ছিল শিবরাত্রি। সকাল দশটা থেকে চিত্রমন্দিরের 'শশিনাথ' শ্যুটিং। শ্যুটিং-এর পরই থিয়েটার। সেদিন আবার সারারাত্রি অভিনয়—গোরা, কেদার রায়, জয়দেব। সেদিন আবার নরেশবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় 'কেদার রায়ে' শ্রীমন্তর ভূমিকায় নাম বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও নামতে পারলেন না। এই নিয়ে

একশ্রেণীর দর্শক তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করলেন। শেষে অনেক করে বুঝিয়ে তাঁদের ঠাণ্ডা করা হয়।

এর ২।১ দিন পরে নাট্যনিকেতন আবার আমাকে অনুরোধ করলেন মহিষাদলে প্লে করতে যাবার জন্য, কিন্তু এবারে আর রাজী হলাম না। আমার হাতে এখন এত কাজ যে দিনে রাত্রে কোন সময়ই বিশ্রাম ছিল না। কোন কোন দিন দিনের বেলায় 'হারানিধি', রাত্রে 'শশিনাথ' বা 'বিপ্রনারায়ণ'। এ ছাড়া তো থিয়েটারের দিন থিয়েটার ছিলই।

এই যে মহিষাদল যেতে রাজী হলাম না, এতে যশোদাবাবু (ক্যালকাটা থিয়েটার্সের কর্ণধার) আমার ওপর বেশ রেগে গেলেন। এর কয়েকদিন পরেই তাঁর কাছ থেকে পেলাম একখানা রেজেস্ট্রি চিঠি। তাতে আমায় জানানো হয়েছে যে নাট্য-নিকেতনে আমার চাকরি খতম।

চিঠি পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি বললাম: আমাকে আপনার রেজিস্ট্রি চিঠি দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না—কারণ আপনার সঙ্গে তো আমার কোনো কন্‌ট্রাক্ট নেই। মুখে বললেই হোতো, বা পোস্টারে নাম না দেখলে আমি নিজে থেকেই আর আসতুম না।

এরপর শিশিরবাবুর আহ্বানে নবনাট্য মন্দিরের হয়ে একদিন নামলাম 'সীতা'-য় বাল্মীকির ভূমিকায়, আর একদিন নামলাম 'আলমগীর'-এ রাজসিংহের ভূমিকায়। দুদিনই কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ ছিল পূর্ণ।

এই সময় রাধা ফিল্মের সঙ্গে দুখানি ছবির চুক্তিপত্রে সই করলাম—'প্রভাস-মিলন' ও 'ছিন্নহার'।

১লা এপ্রিল হল হরতাল। উপলক্ষ—তদানীন্তন ভারত সরকারের নতুন শাসন-নীতি চালু হল—প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। মুখ্যমন্ত্রী হলেন জনাব এ. কে. ফজলুল হক, তার সঙ্গে রইলেন পাঁচজন হিন্দু ও পাঁচজন মুসলমান মন্ত্রী।

দেবদত্ত স্টুডিওতে 'ইন্দিরা'-র শ্যুটিং আরম্ভ হল।

এই সময় (৮।৪।৩৭) নবনাট্যমন্দিরে 'চিরকুমার সভা'-র একটি সম্মিলিত অভিনয় হল: আমি—চন্দ্রবাবু, দুর্গাদাস—পূর্ণ, মনোরঞ্জনবাবু—রসিক ও নীহারবালা—নীরবালা। খুব জমেছিল সে অভিনয়।

তখনকার দিনে চিত্রজগতের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা নিশ্চয় তদানীন্তন হিন্দী ছবির নায়ক গুল হামিদকে ভুলে যান নি। সত্যিকারের সুদর্শন চেহারার অধিকারী ছিলেন তিনি। 'বাঘী সিপাহী', 'খাইবার পাশ', 'সোনেরা সংসার', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি

বহু হিন্দী ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। তিনি হঠাৎ মারা যান তাঁর দেশে পেশোয়ারের এক গ্রামে, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৭।

প্রায়ই বাইরে যেতে হত এর-ওর দলের হয়ে। কখনও কালী গুহের ব্যবস্থাপনায়, কখনও মিনার্ভার দিলওয়ার হোসেন ও চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায়, কখনও বিমল পালের ব্যবস্থাপনায়। মানে আমি তখন বাঁধন-ছেঁড়া ঘোড়ার মত—যে কেউ ডাকলেই এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলেই অভিনয় করে আসতাম। যাকে বলে 'খেপ' মারা—এ ঠিক তাই। বর্ধমান, আসানসোল, ধানবাদ, চুঁচুড়া, জামসেদপুর, শ্রীরামপুর যে কতবার গেছি তার ঠিক নেই।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকে (২৮।৪।৩৭) নাট্যনিকেতনে ক্যালকাটা থিয়েটার্স খুললেন মন্মথ রায়ের 'সতী'। সেই সঙ্গে তাঁরা চার আনার টিকিট চালু করলেন। এটা পরীক্ষামূলকভাবে চালু হল বটে কিন্তু সার্থক হল না।

ইতিমধ্যে কালী-ফিল্মের 'হারানিধি'-র শ্যুটিং শেষ হয়ে মুক্তিলাভ করল উত্তরা সিনেমায় ১লা মে, ১৯৩৭।

এ বছরের মে মাস একটা দিক দিয়ে বিশেষ স্মরণীয়—সেটা হল ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের অভিষেক উৎসব। এই উপলক্ষে কলকাতায় যথেষ্ট আলোকসজ্জা ও বাজী পোড়ানো হয়েছিল।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর কর্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে 'রঙমহল' আবার খুলল ১৫ই মে 'অভিষেক' নাটক নিয়ে। দুর্গাদাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি ছিলেন এই নাটকে।

এই মাসেরই ২২ তারিখে রূপবাণীতে মতিমহল থিয়েটার্সের ছবি 'রাঙা বৌ' মুক্তিলাভ করল। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর পরিচালক।

১৮ই জুন দশহরার দিন মিনার্ভায় নতুন নাটক 'গয়াতীর্থ'-র উদ্বোধন হল।

আদর্শ চিত্রের 'দলিত কুসুম'-এর কথা আপনাদের আগেই বলেছি। এতদিনে ছবিখানি মুক্তিলাভ করল নিউ সিনেমায়, ১৭ জুলাই।

এই দিনই বাংলা চিত্রজগতে আর একটি ব্যাপার ঘটল। ঐ দিনই প্রমথেশ বড়ুয়া যে স্টুডিও করেছিলেন, সেটি বিক্রি হয়ে যায়—আর তা কিনে নেন শ্রীঅনাদি বসু। বড়ুয়াসাহেব থাকতেন মূলেন স্ট্রীটে, তারই পাশে ছিল এই স্টুডিও। ওখানকার যন্ত্রাদি ও জিনিসপত্র কিনে নিয়ে অরোরা স্টুডিওয় নিয়ে গেলেন।

ম্যাডানের নামকরা ইটালিয়ান ক্যামেরাম্যান মিঃ মারকনি পরলোকগমন করেন। ভদ্রলোক বিদেশী হলে কি হবে—বেশ অমায়িক ছিলেন।

চিত্রমন্দিরের 'শশিনাথ'-এর উদ্বোধন হল রূপবাণীতে ১৪ই আগস্ট। আমি সোমনাথের ভূমিকায় অভিনয় করি। পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটিই প্রথম ছবি। ছবিখানি মোটামুটি ভালই হয়েছিল।

শ্রীভারতলক্ষ্মীর 'অভিনয়' ছবিতে কণ্ট্রাক্ট স্বাক্ষরিত হয় ১৮ই আগস্ট—একথা আগেই জানিয়েছি।

১৮ই আগস্ট রঙমহলে 'বন্ধু' নামক একখানি নাটক খোলা হয়।

এদিকে নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীমশায় ম্যাডান থিয়েটারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ধর্মতলার কোরিন্থিয়ান থিয়েটার (বর্তমান অপেরা সিনেমা) লীজ নিলেন। কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের যারা দর্শক ছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশই হল অবাঙালী। কারণ হিন্দী থিয়েটারে বাঙালী দর্শকের সমাগম তো এমনিতেই খুব কম। যোগেশবাবুর বন্ধুবান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীরা বোঝালেন যে, আপনার নাটক যেখানেই চলবে, সেখানেই দারুণ ভিড় হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি 'গৌরাঙ্গসুন্দর' নামক ধর্মমূলক নাটক খুললেন ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭। শিল্পীদের সংগ্রহ করলেন সব থিয়েটার থেকে। আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম যে ঐ মহল্লায় বাংলা নাটক চলা শক্ত, তার উপরে ধর্মমূলক। কারণ চাঁদনী ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলিতে তো বেশীর ভাগই অ-হিন্দুর বাস। যাই হোক, আমাদের আশঙ্কাটাই ফলল। মাত্র কয়েক রাত্রি পরেই যোগেশবাবুকে ওখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে হল। এরপর যোগেশবাবু আবার স্টারে গিয়ে আসর জমাবার চেষ্টা করলেন।

এর কয়েকদিন পর অর্থাৎ ১৭ই সেপ্টেম্বর রঙমহলে খোলা হল হিন্দী নাটক —'অভিষেক' ও 'রাজতিলক'। বাঙালী ও অবাঙালী শিল্পীদের নিয়ে এই নাটক দুখানি খোলা হল। ঠিক যে কারণে যোগেশবাবুর 'গৌরাঙ্গসুন্দর' কোরিন্থিয়ানে চলল না, রঙমহলেও এ পরীক্ষা সফল হল না। কারণ রঙমহল হল পুরোপুরি বাঙালীপাড়ার মধ্যে।

তখনকার দিনে বাঙালীপাড়ায় হিন্দী বই চলত না। হিন্দীভাষী এলাকাতে আবার এর বিপরীত। সেখানে বাংলা বই আসর জমাতে পারত না।

রাধা ফিল্মসের 'ছিন্নহার' সে সময়ে খুবই নাম করেছিল। হরি ভঞ্জ পরিচালিত এই ছবিটি উত্তরায় মুক্তিলাভ করেছিল ২৫শে সেপ্টেম্বর। এতে আমার ভূমিকা ছিল পুলিশ ইন্সপেক্টরের।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে দুজনের নামের সঙ্গে আমার কেন, গোটা বাংলাদেশের মানুষের পরিচয়। এরা হলেন মধু বসু আর সাধনা বসু। বসু দম্পতির পরিচালনায় সি. এ. পি. তখন খুব নাম করেছে। কিন্তু এঁদের দলে কোন পেশাদার

অভিনতা বা অভিনেত্রী ছিলেন না। দলে ছিলেন অভিজাত বংশের ছেলে-মেয়ে। এঁরা ইতিপূর্বে 'আলিবাবা' করেছেন, সৌরীন মুখুজ্যের 'মন্দির' এবং মন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী' করেছেন। লোকমুখে শুনেছি সি. এ. পি.-র প্রশংসা, কিন্তু নিজে তখনও দেখিনি।

একদিন নাট্যকার মন্মথ রায় আমাকে বললেন, সি. এ. পি.-র জন্যে নাটক লিখছি —'বিদ্যুৎপর্ণা'। আপনি যদি রাজী থাকেন অভিনয় করতে, তাহলে আপনার মত একটা চরিত্র সৃষ্টি করব নাটকে।

বললাম, অভিনয় না-করার কোন কারণ নেই। স্টেজ ছেড়েছি সাময়িকভাবে। কারণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর। তবে আপনি সি. এ. পি.-র কথা বলছেন, ওঁদের দলে তো পেশাদার শিল্পী কেউ নেই। ওঁরা কি আমাকে—

মন্মথবাবু বাধা দিয়ে বললেন, সে ভাবনাটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।

মন্মথবাবুর সঙ্গে কথা হওয়ার কয়েকদিন বাদেই মধু বসু আমাকে নাটকের 'মোহন্ত' চরিত্রটি অভিনয়ের জন্যে বললেন। আমি রাজী হয়ে গেলাম।

সি. এ. পি. সম্প্রদায় সাধারণ রঙ্গালয় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধাঁচের না হলেও, এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। দলের ওপর মধু বসুর ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দলের পরিবেশটিও আমার ভাল লাগত।

'বিদ্যুৎপর্ণা', তৈরী হল অভিনয়ের জন্যে। ফার্স্ট এম্পায়ার-এ (বর্তমানে রক্সি সিনেমা) নাটকটি উদ্বোধন হল ৯ই অক্টোবর, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। নাটকটি ছিল ছোট, অভিনয়ে সময় লাগল দু ঘণ্টার মত। তাই এই সঙ্গে 'ওমর খৈয়াম' নামে একটি ছোট নাটকও অভিনীত হয়েছিল। এই নাটক দুটি সংবাদপত্রের প্রশংসা পেয়েছিল। প্রতিটি কাগজেই শ্রীমতী বসু এবং আমার অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসূচক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'স্বদেশ' পত্রিকা লিখেছিল, 'অহীন্দ্র-সাধনা সম্মিলন যে কিরূপ আকর্ষণীয় হয়েছিল, তার প্রমাণ ওই হাউসে উপর্যুপরি কয়েকদিন অভিনয় হওয়াতেই পাওয়া গেছে।'

দীপালী লিখেছিল, 'শ্রীমতী সাধনা বসু ও অহীন্দ্র চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয়-নৈপুণ্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।'

এই সময়ের একটি ঘটনার কথা বলি। লণ্ডন থেকে ইসলিংটন কোরিন্থিয়ান ফুটবল দল ভারতে এল। ভারতের ছোটবড় বিভিন্ন শহরে তারা প্রদর্শনী ফুটবল খেলল। দু-এক জায়গায় ড্র করে, নয়ত সর্বত্রই তারা জয়লাভ করেছিল। কলকাতায় থাকাকালীন একদিন এই দলের সদস্য-খেলোয়াড়রা 'বিদ্যুৎপর্ণা' নাটক দেখতে এল।

অভিনয়-শেষে তারা স্টেজের মধ্যে এল শিল্পীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করতে। প্রতিটি সদস্য এমনভাবে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করল, যার মধ্যে সত্যকার আন্তরিকতা ছিল। মুহূর্তের জন্যেও মনে হয়নি, ওরা সাগরপারের মানুষ, ওরা সেই দেশ থেকে এসেছে যারা আমাদের শাসক।

কোরিন্থিয়ান দলের ছেলেরা আমাদের সকলের অটোগ্রাফ নিলে।

যে সময়ের কথা বলছি, এই সময় স্টারে আরম্ভ হয়েছিল 'বিদ্যাপতি' নাটক।

নানা ঘটনার মধ্যে এই সময়ের একটি দুঃসংবাদ শুধু আমাকে নয়, গোটা বাংলা দেশের মানুষকে মর্মাহত করল। সে-সংবাদটি বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যু। ২৩শে নভেম্বর তিনি গিরিডিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। গিরিডি থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হল কলকাতায়। আচার্য বসুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্নটি হারিয়ে গেল।

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে আমি গিরিডি রওনা হলাম, 'দেবী ফুল্লরা' ছবির শ্যুটিং করতে। হাজরা পিকচার্সের এই ছবিটির পরিচালক আমাদের তিনকড়িদা। কলকাতা থেকে আমি যাচ্ছি মোটরে। সঙ্গে তিনকড়িদা আর শিশুবালা। গিরিডি যাবার পথে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। অন্য সময় দূরের পথে রাতবিরেতে যেতে হলে আমি সঙ্গে বন্দুক নিতাম। তবে এবারে তিনকড়িদা রাইফেল নিয়েছেন বলে আমি শূন্য হাতেই বেরিয়েছি।

যাই হোক, এবারে ঘটনার কথা বলি। মাঝরাতে আমরা গিরিডির পথে পরেশনাথ পাহাড়ের ধার দিয়ে চলেছি। সবাই আধো তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। হঠাৎ তিনকড়িদার তন্দ্রা টুটে গেল। সেই তন্দ্রা-ভাঙা মুহূর্তে চিৎকার করে উঠলেন, ভালুক—ভালুক— বলেই গুলী ছোঁড়েন আর কি। সেই মুহূর্তে ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে বললে, ভাল্লুক নয় বাবু, ওগুলো পিচের ড্রাম।

রাস্তার ধারে কালো-সাদা রঙ-করা পিচের ড্রামগুলোয় মোটরের হেডলাইটের আলো পড়ায় এই রকম দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছিল। তারপর তন্দ্রাভাঙা মুহূর্ত।

আমাদের উচ্চকণ্ঠ হাসির মধ্যে গাড়ীটা আবার চলতে আরম্ভ করল।

'দেবী ফুল্লরা'-র শ্যুটিং করলাম ২০ তারিখ পর্যন্ত। এর পর আমি একদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছিলাম, 'বিদ্যুৎপর্ণার' রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে। তারপর কাজ শেষ করে ২১ তারিখ রাত্রেই আবার গিরিডি ফিরে এলাম। গিরিডিতে ২২।২৩ তারিখে ছবির শ্যুটিং একেবারে শেষ করে মোটরে কলকাতায় ফিরে এলাম। এবারে পার্টির সকলেই চলে এলেন।

এর কয়েকদিন পরে তখনকার দিনের নামকরা পরিচালক ও চিত্রসম্পাদক জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় হঠাৎ পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মানুষ হিসেবে বড় অমায়িক ছিলেন জ্যোতিষবাবু। কালী ফিল্মের সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন।

সি. এ. পি. ৩০শে ডিসেম্বর ফার্স্ট এম্পায়ারে আবার একখানি নাটক খুললো। এবারও মন্মথ রায়ের লেখা—নাম "রাজনটী"। ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত একটানা ৭ দিন অভিনয়-এর মধ্যে অবশ্য ছদিন আবার 'বিদ্যুৎপর্ণা'ও হল। 'রাজনটী'-র অভিনয় সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল। 'স্টেটসম্যান' লিখেছিল:

'Again the combination of Sadhana Bose (as the Court Dancer) and Ahindra Chowdhury (as the holy preceptor) carted the play, especially in the scene of renunciation, in which both of their dramatic abilities rose to a high pitch.'

জানুয়ারী মাসের প্রথমেই আমার পুত্র ভানুকে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিট্যুশানে ভর্তি করা হল থার্ড ক্লাশে। যখন ডালিমতলা লেনে ছিলাম, তখন ও টাউন স্কুলে পড়ত—তারপর গোপালনগরে চলে আসার পর স্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বাড়ীতেই পড়াশোনা করত। একদিন ভানুর ছোট মামা অর্থাৎ আমার ছোট শ্যালক ভানুকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দিল।

আমি তখন অভিনয় নিয়ে এত ব্যস্ত যে বাড়ীতে কি হচ্ছে—ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে কিনা—এসব দিকে নজর দেওয়ারই সময় পেতাম না। এ-সমস্ত বিষয়ের ভার ছিল আমার স্ত্রী সুধীরার ওপর।

ভানু এমনিতেই খুব শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল। পাড়ার কারুর সঙ্গে মিশত না। খেলার সময় পাড়ার ২।১ জন নাকি অশ্লীল কথা বলেছিল বলে সে খেলাধুলাই ছেড়ে দিয়েছিল। বারান্দায় চুপটি করে বসে থাকত, আর ছাদে বেড়াত। বেশীর ভাগ সময় পড়াশোনা নিয়েই থাকত। স্কুলে ভর্তি হবার পর আমার দারোয়ান পাঁড়ের সঙ্গে যেত, আবার পাঁড়ের সঙ্গেই স্কুল থেকে ফিরত।

এই জানুয়ারী মাসের ১৪ তারিখে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল—সেটি হল বেলুড় মঠে মন্দিরের উদ্বোধন। এক মার্কিন মহিলার দাক্ষিণ্যে এই মন্দির নির্মিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আমেরিকার অধিবাসীদের যে কী দারুণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তারই প্রমাণ এই মন্দির নির্মাণ।

এরই একদিন পরে অর্থাৎ ১৬ই জানুয়ারী বাংলার সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বল

জ্যোতিষ্কের পতন হল! দীর্ঘদিন রোগ-ভোগের পর বাংলার অপরাজেয় কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেহরক্ষা করলেন এক নার্সিংহোমে। আমরা তাঁর কত নাটক অভিনয় করেছি, যেমন—পল্লীসমাজ, বিজয়া, ষোড়শী, চরিত্রহীন প্রভৃতি। কতদিন তিনি থিয়েটারে এসে আমাদের সঙ্গে কত গল্প করেছেন—আজ তাঁর এই লোকান্তর গমনে ব্যক্তিগতভাবে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল।

এই সময় রাধাফিল্ম স্টুডিওতে নির্বাক যুগের চিত্র-পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ একদিন তাঁর লেখা একখানি ছবির চিত্রনাট্য শোনাতে এলেন। ছবিখানির নাম হল 'পুরুষোত্তম',—অর্থাৎ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবনী। আমি যা শুনলুম তা আমার ভাল লাগল না। কালীবাবুকে একথা জানাতে তিনি আমার ওপর খুব চটে গেলেন। তিনি নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে চাইলেন তাঁর চিত্রনাট্যের উৎকর্ষতা। এমন কি তিনি একথাও বললেন যে, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' থেকে তাঁর পুরুষোত্তম কোনো অংশে কম নয়। তাঁর এই দম্ভটা আমার খুব খারাপ লাগলো। যাই হোক, সে-চিত্রনাট্যকে আমরা কোনদিন পর্দায়িত হতে দেখিনি, কারণ আমার মতে সেটা চিত্রনাট্যই হয়নি।

এ সময় কোনো মঞ্চের সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে যুক্ত ছিলাম না বলে এখানে-সেখানে প্রায়ই 'খেপ' মারতে যেতুম। কখনও বিমল পালের দলের সঙ্গে সিউড়ি, কখনও প্রভাত সিংহের দলের সঙ্গে ধানবাদ, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করতে যেতুম, কখনও কলকাতাতেই পূজা-পার্বণ উপলক্ষে বিশেষ অভিনয়ে আমাকে নিয়ে যেত।

'অভিনয়'-এর শ্যুটিং রীতিমত চলছিল ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে। এই সময় যামিনী মিত্রের আর একখানি ছবির কন্‌ট্রাক্ট সই করলাম—'ত্রিস্রোতা'। কিন্তু সে সই করাই সার হল, ছবি আর হল না। এই রকম অনেক ছবিই অসমাপ্ত, অর্ধ-সমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে তার ঠিক নেই।

১১ই মার্চ ফার্স্ট এম্পায়ারে 'বিদ্যুৎপর্ণা'-র একটি বিশেষ প্রদর্শনী হল চ্যারিটি শো হিসাবে। এই অভিনয়ে লর্ড ও লেডী ব্র্যাবোর্ন উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ের শেষে ব্র্যাবোর্ন দম্পতি স্টেজের ভিতর এসে মধুবাবু, সাধনা বসু ও আমাকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে অভিনন্দন জানালেন, আর সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন যে শ্রীমতী বসু ও আমার অভিনয় তাঁদের খুব ভাল লেগেছে ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও।

স্টারে (নবনাট্য মন্দির) এই সময় নতুন নাটক খুলল—শচীন সেনগুপ্তের 'কালের দাবী'।

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর কর্ণধার শ্রী বি. এল. খেমকার নবজাত চিত্রপ্রতিষ্ঠান

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের হয়ে একখানি ছবির কণ্ট্রাক্ট সই করলুম—ছবির নাম 'খনা'। মন্মথ রায়ের নাটক। পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'খনা' যখন নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয়, তখন এর চিত্রস্বত্ব কিনে রেখেছিলেন অরোরার অনাদি বসু। এখন শ্রীখেমকা এই চিত্রস্বত্ব কিনতে চাওয়ায় অনাদিবাবুকে তাঁর প্রদত্ত ৭০০৲ টাকা ফিরিয়ে দিতে হয়।

এই সময় আন্তর্জাতিক গগনে কালো মেঘের সঞ্চার হচ্ছিল। শীগ্‌গির যে বিরাট অশান্তি ও বিপর্যয় ঘটবে, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল খবরের কাগজ মারফত এবং আন্তর্জাতিক ঘটনা-প্রবাহের মাধ্যমে। এই মেঘসঞ্চার পরে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক গগনের কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের থিয়েটার জগতেও প্রচণ্ড আলোড়নের ধাক্কা এসে লাগল।

৩০শে মার্চ নাট্যনিকেতন মঞ্চে ক্যালকাটা থিয়েটার্স শেষ অভিনয় করলেন 'বভ্রুবাহন' ও 'কর্ণার্জুন'।

মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী উপেন মিত্র মশায় পুরাতন মিনার্ভা ছেড়ে দিয়ে স্টার থিয়েটারে এসে আসর জমালেন। অর্থাৎ ১লা এপ্রিল থেকে ক্যালকাটা থিয়েটার, স্টার থিয়েটার ও মিনার্ভা একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য মিনার্ভার শিল্পী এবং কলাকুশলীরা সবাই স্টারে এসে জমলেন—এখানে তাঁদের প্রথম নাটক হল 'ধর্মদ্বন্দ্ব' (কিংবা 'ধর্মদণ্ড'—আমার ঠিক মনে নেই)।

একমাত্র চলছিল ভাল তখন রঙমহল। তাঁরা 'স্বামী-স্ত্রী'-র পঞ্চাশৎ রজনীর উৎসব করলেন। দুর্গাদাস আর রাণীবালা এই নাটকে খুব সুনাম অর্জন করেছিল।

১৭ই এপ্রিল ললিত মিত্রের মৃত্যুসংবাদ পেলাম। মঞ্চে ও পর্দায় দক্ষ চরিত্রাভিনেতা বলে তার সুনাম ছিল।

সেই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়ার হয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা ছেলেদের এ্যাডভেঞ্চার-মূলক বই 'যখের ধন'-এ অভিনয় করছিলাম। পরিচালক ছিলেন হরি ভঞ্জ।

এই সময় একদিন ইস্ট ইণ্ডিয়ার কর্ণধার খেমকাজীকে বললাম যে,—'দ্রৌপদী'র একটা মোটামুটি চিত্রনাট্য করা আছে—একদিন শুনুন না ?

খেমকাজী রাজী হলে একদিন তাঁকে শোনালাম। তাঁর ভাল লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পরিচালনার দায়িত্ব দিতে রাজী হয়ে গেলেন।

১৯শে মে ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে 'দ্রৌপদী' ছবি করবার জন্যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করলাম। এটা কিন্তু অভিনয়ের জন্য নয়, পরিচালনার জন্যে।

ফুটবলের দিকে আমার ঝোঁক আশৈশব। বিদেশী কোন টীম এলেই তাঁদের খেলা দেখবার জন্যে আমি ছট্‌ফট করতাম। এই সময় এলো বর্মা ফুটবল টীম। খেলা হয় ২ দিন আই-এফ-এ'র সঙ্গে। একদিন আই-এফ-এ জিতল, একদিন ড্র হল। দুদিনই চ্যারিটি। একদিন একখানা চ্যারিটির টিকেট যোগাড় করে দেখতে গেলাম।

আমাদের জীবনের একটা বিরাট ট্র্যাজিডি হল জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে পারি না নানা কারণে। স্টেজে যখন অভিনয় করি, তখনও বেশ একটা দূরত্ব থাকে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় জনতার মাঝে গিয়ে দাঁড়াই। তাদের সঙ্গে মিশে যাই, তাদের সঙ্গে কথা বলি। আবার যখন ভাবি খ্যাতির খেসারত দিতে অনেক শিল্পীকেই নাজেহাল হতে হয়েছে, জনতার ভালবাসার চাপে পড়ে শিল্পীকে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়তে হয়েছে—তখনই পিছিয়ে পড়েছি।

যাই হোক, একদিন খোলা মাঠে সাধারণের একজন হয়ে খেলা দেখে খুব তৃপ্তি পেলাম।

৩রা জুন স্টার মঞ্চে পুরাতন মিনার্ভার শিল্পীরাই মঞ্চস্থ করলেন 'চক্রধারী'।

এদিকে 'দ্রৌপদী' ছবির প্রস্তুতিপর্ব চলছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে আমাকে একখানা আলাদা ঘর দেওয়া হল। 'দ্রৌপদী'-র চিত্রনাট্যের সংলাপ রচনা করতে লাগলেন মণি বর্মা। ক্যামেরাম্যান ঠিক হলেন পল ব্রিকেট; স্ক্রিপট্ এবং শ্যুটিং-এর বিষয় আলোচনা করতে তিনি প্রায়ই আসতেন। বটু সেন আমার সেটের ডিজাইন করতে লাগলেন।

'দ্রৌপদী'তে বহু চরিত্র, খুব সন্তর্পণে দেখে-শুনে সব ঠিক করছি। ১৯শে জুন 'দ্রৌপদী'-র প্রথম শ্যুটিং হল। তখন 'দ্রৌপদী' ভূমিকাটির জন্য উপযুক্ত শিল্পী পাই নি।

ইতিমধ্যে 'ফুল্লরা'-র কাজ শেষ হয়ে ২৫শে জুন উত্তরায় মুক্তিলাভ করল। দর্শকেরা 'দেবী ফুল্লরা'কে বেশ ভালভাবেই অভিনন্দিত করল।

থিয়েটারগুলির মধ্যে একমাত্র রঙমহলই তখন একেবারে রম্ রম্ করে চলেছে। ১৩ই জুলাই বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা 'মেঘমুক্তি'-র উদ্বোধন হল রঙমহলে। তারপর ৩১ তারিখে হল 'স্বামী-স্ত্রী'র শততম অভিনয় উৎসব।

এই সময় চিৎপুরে নতুন বাজারের কাছে 'রঙমহল' নামে একটি থিয়েটারের আবির্ভাব ঘটে। নাট্যনিকেতনের হাউসই বন্ধ, কর্মীরা শিল্পীরা সব বেকার। তাদেরই মধ্যে থেকে কয়েকজন এই থিয়েটারের সংগঠক। তারা প্রথমে মহেন্দ্র গুপ্তর 'উত্তরা' নাটক নিয়ে রঙমহলের দ্বার-উদ্ঘাটন করল। তারপর এরা নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তকে দিয়ে একখানি নাটক লেখাল—'আবুল হাসান'। তারা দুর্গাদাসকে গিয়ে

ধরল এই নাটকের নাম-ভূমিকায় নামবার জন্যে। দুর্গা এই নাটকে অভিনয় করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিল। আমিও মাঝে একবার গিয়ে 'ইরাণের রাণী' অভিনয় করি।

এই সময় বাংলা নাট্যজগতের এক বিরাট ক্ষতি হল। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার, আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ভূপেনদা (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) বেরি-বেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তিনি মারা গেলেন ৫ই আগস্ট, কিন্তু ৮ই আগস্টের খবরের কাগজে তা প্রকাশিত হল। তাঁর নাটক 'বাঙ্গালী' এবং 'দেশের ডাক'-এ আমি অভিনয় করেছিলাম—একথা আগেই জানিয়েছি।

এই সময় আবার সি. এ. পি.-এর 'রাজনটী'-র পুনরভিনয় হল ফার্স্ট এম্পায়ারে তিন দিনের জন্যে—৭ থেকে ৯ই আগস্ট।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে মুক্তিলাভ করল 'অভিনয়' রূপবাণীতে। ছবিখানি দেখে দর্শক ও সাংবাদিক সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তদানীন্তন বিখ্যাত সিনেমা-সপ্তাহিক 'ফিল্মল্যাণ্ড' পত্রিকায় 'অভিনয়'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বেরিয়েছিল :

"Ahin Chowdhury surpasses all his previous records in the screen. He is unique in his creation of 'Pitambar' ".

কলকাতা রেডিওতে এই সময় একটি বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। প্রতি শুক্রবার বেতার নাটুকে দল যে নিয়মিত নাটক অভিনয় করতেন, তাতে সময় লাগত প্রায় ৩ ঘণ্টা করে। এই বছরের ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে সেই সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়ালো এক ঘণ্টায়। অর্থাৎ নাটকগুলিকে নির্মমভাবে কাটছাঁট করে রেডিওতে অভিনয়ের উপযোগী করে নেওয়া হোত।

কোনো দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধভাবে না থেকে মঞ্চে অভিনয় আমার চলতে লাগল পুরোদমেই। কখনও 'মা', কখনও 'কর্ণার্জুন', কখনও 'সাজাহান', কখনও 'পোষ্যপুত্র' একটা-না-একটা থিয়েটারে লেগেই থাকত—আর এই নাটকগুলিতে আমার 'পার্টও' বাঁধা থাকত।

অক্টোবরের প্রথম দিকে আবার সি. এ. পি. মঞ্চস্থ করলেন 'বিদ্যুৎপর্ণা'—ফার্স্ট এম্পায়ারে—দুদিনের জন্যে।

১১ই অক্টোবর বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক ও সজ্জন ব্যক্তির মহাপ্রয়াণ ঘটল। তাঁর নাম হল নগেন্দ্রনাথ বসু—'বিশ্বকোষ'-এর সম্পাদক। এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল বেশ ভালই, এঁর মৃত্যুতে খুবই বেদনাবোধ করেছিলাম।

চৌরঙ্গীপাড়ায় একটি অতি-আধুনিক চিত্রগৃহ 'লাইট হাউস'-এর উদ্বোধন হল

নিউ এম্পায়ারের পাশেই। এই দুটি চিত্রগৃহেরই কর্তৃপক্ষ এক—হুমায়ুন থিয়েটার্স লিঃ। দর্শকদের মনোরঞ্জন করার জন্য যতকিছু সুখ-সুবিধা প্রয়োজন, তার কোনটিরই অভাব ছিল না, ফলে অচিরেই চিত্রগৃহটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

নভেম্বর মাসের ৩ তারিখে সি. এ. পি. সম্প্রদায়ের হয়ে আমরা গেলাম ঢাকায় অভিনয় করতে। গিয়ে আমরা উঠলুম ডাকবাংলোয়। আমি আর তিমির একটা ঘরে, মিঃ ও মিসেস বোস একটা ঘরে, দলের অন্যান্য মেয়েরা আর একটা ঘরে। অভিনয় হবে পিকচার হাউসে—নাটক 'বিদ্যুৎপর্ণা' ও 'ওমরের স্বপ্নকথা'। অভিনয়ের দিন সে কি ঝামেলা! ওখানকার রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের একটি দল (সুনীতি-সঙ্ঘ) বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করলেন হাউসের সামনে। বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ও ব্রাহ্মধর্মের একনিষ্ঠ সেবক কেশবচন্দ্র সেনের নাতনী সাধনা বসু পুরুষদের সঙ্গে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবেন—এইটাই তাঁদের আপত্তি।

পরদিন অভিনয়। অভিনয়ের কিছু আগে আমি, মিসেস বোস ও তিমির —এই তিনজনে হাউসের সামনে নামতেই বিক্ষোভকারীরা আমাকে ঘিরে ধরলো। আমি তখন বললাম : আমাদের আপনারা আটকাচ্ছেন কেন? আমরা শিল্পী মাত্র—আমরা তো হাউস বুক করিনি। আপনাদের যা কিছু বলবার আছে তা আমাদের প্রযোজক ও পরিচালক মধু বসুকে গিয়ে বলুন। তিনি আমাদের কণ্ট্রাক্ট করে নিয়ে এসেছেন, এইমাত্র—আমরা এসেছি, এতে আমাদের দোষ কি বলুন?

এই কথা বলায় তাঁরা একটু হকচকিয়ে গেলেন। আমরা ইত্যবসরে ভিতরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই থামল না—গড়াল অনেকখানি। আগে ছিল "ওমরের স্বপ্নকথা"—সেটি যখন অভিনীত হয়, তখনই হাউসের টিনের ছাদে ইট-পাটকেল পড়তে থাকে।

মহামুশকিল! এরকম ইষ্টকবৃষ্টি হতে থাকলে অভিনয় চলবে কি করে? আমরা বেশ ভাবিত হয়ে পড়লাম। বিরতির সময় মধুবাবু স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে বেশ একটা ছোট-খাটো লেকচার দিয়ে ফেললেন। তিনি বললেন যে, আমরা সব তাঁদের অতিথি—অতিথির উপর আপনারা এইরকম ব্যবহার করবেন জানলে কখনই আসতাম না।

এই কথা বলায় সত্যিই ফল হল। স্থানীয় অন্যান্য গণ্যমান্য লোকজনের চেষ্টায় এবং স্থানীয় তরুণ দলের আগ্রহে গণ্ডগোল থেমে গেলো। এরপর তিনদিন অভিনয় হল—আর কোনোদিন কোনোরকম গণ্ডগোল হয়নি। শুধু তাই নয়, দর্শকসমাগম এতো বেশি হতে লাগলো যে একদিন অতিরিক্ত অভিনয় করতে হল।

এখানে প্রায় প্রতিদিনই কোনও-না-কোনও বিশিষ্ট নাগরিকের বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ লেগেই থাকত।

ফেরবার পথে মেঘনা নদীর ওপর অদ্ভুত দৃশ্যাবলীর কথা আজও ভুলতে পারিনি।

অবশ্য ঢাকায় আমি এর আগেও দু'বার গেছি—১৯২৭ সালে এবং ১৯৩৩ সালে, কিন্তু এইবারের ঢাকা-সফর যতটা স্মরণীয়, অন্যবারেরটা তত নয়।

ইতিমধ্যে মেট্রোপলিটান পিকচার্সের 'খনা'-র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল—মুক্তিলাভ করলো ১২ই নভেম্বর। এতে আমি করেছিলাম 'বরাহ'—সে খবর আমি আপনাদের আগেই জানিয়েছি। এর সঙ্গে ছিল ডি. জি. পরিচালিত একখানি দু-রীলের হাসির ছবি—'অভিসারিকা'।

এরপর সি. এ. পি. ধরলেন মন্মথ রায়ের 'রূপকথা'। মধুবাবু আমার কাছে একদিন প্রস্তাব করলেন—এই নাটকে যক্ষরাজের ভূমিকাটির জন্য। ভূমিকাটি গুরুগম্ভীর নয়—হালকা হাস্যরসপ্রধান, কিন্তু নতুনত্ব ছিল। আমি রাজী হয়ে গেলাম। 'রূপকথা'র রিহার্সাল শুরু হল, আর ৪ঠা ডিসেম্বর ফার্স্ট এম্পায়ার মঞ্চে এর উদ্বোধন হল। 'রূপকথা'য় অভিনয় করে আমিও আনন্দ পেয়েছিলাম, আর দর্শকরাও খুশি হয়েছিলেন। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'আনন্দবাজার' লিখেছিলেনঃ "অভিশাপগ্রস্ত প্রেমের কাঙাল রুদ্ররূপী যক্ষের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।"

এক সপ্তাহ এখানে অভিনয় হয়, পরে আবার 'শ্রী' চিত্রগৃহের মঞ্চে এর পুনরভিনয় হয়।

১২ তারিখে নিউ এম্পায়ারে এক চ্যারিটি শো হয় এই 'রূপকথা'-এর। ঐদিনের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন লেডী ব্র্যাবোর্ন। এইদিন অল ইণ্ডিয়া রেডিও আবার অভিনয়টিকে বেতারে প্রচার করেন।

ঠিক এর একদিন পরে রঙমহল থেকে আমার আহ্বান এল। আমি গিয়ে শুনলাম যে ওঁরা শীগ্‌গির নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের 'তটিনীর বিচার' নাটকটি খুলবেন। সেই উদ্দেশ্যে ডাঃ ভোসের ভূমিকাটির জন্য আমাকে তাঁদের প্রয়োজন। আমি রাজী হয়ে গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয়ে গেল।

এদিকে সি. এ. পি. সম্প্রদায় আবার জামশেদপুরে তিনদিন অভিনয়ের জন্য একটি বায়না নিয়ে বসেছেন—মিলনী সিনেমার সঙ্গে। যেতেই হল ওখানে ১৮ তারিখে, ওখানে তিনদিন 'বিদ্যুৎপর্ণা' অভিনয়ের পর ২২ তারিখে কলকাতায় ফিরে এলাম।

ঐ সময় অর্থাৎ ১৯ তারিখে নাট্যনিকেতন খুললেন মন্মথ রায়ের 'মীরকাশিম' এবং স্টার (অর্থাৎ পুরাতন মিনার্ভা) খুললেন 'বাসুদেব'।

কলকাতা ফিরেই 'তটিনীর বিচার'-এর রিহার্সাল নিয়ে উঠে-পড়ে লাগলাম। বড়দিনের আগের দিন উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়ে গেছে। যাই হোক, ২৪শে ডিসেম্বর রঙমহলে রাত্রি ৮টার সময় এর উদ্বোধন হল। ২৫ ও ২৬ তারিখে দুটো করে শো হল। নাটকখানি কিন্তু প্রথমদিন থেকেই দারুণ জমে গিয়েছিল। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন রাণীবালা, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ছায়া সিনেমায় আবার কয়েকদিন সি. এ. পি.-র 'শো' হল। ২৯।৩০ তারিখে হল 'রূপকথা'। দুদিনই আমাকে নামতে হল। তারপর ওঁরা করলেন 'আলিবাবা' —এতে আমার কোন ভূমিকা ছিল না—আর তাছাড়া 'তটিনীর বিচার' চলছে তখন অপ্রতিহত গতিতে।

এরই মধ্যে ২।৩ দিনের জন্য একবার 'যখের ধন'-এর আউটডোর শ্যুটিং-এ যেতে হল। স্থান নির্বাচিত হয়েছিল রাঁচীর কাছাকাছি একটি পাহাড়ী জায়গায়। ১৯৩৯ সালের বর্ষারম্ভে এই প্রথম বাইরে যাওয়া। ১৩ তারিখ পর্যন্ত শ্যুটিং করে ১৪ তারিখ সকালে কলকাতা পৌঁছই, সেই দিনই সন্ধ্যায় আবার 'তটিনীর বিচার'।

১২ তারিখে ঐ রাঁচীরই আর এক জায়গায় গেলাম লোকেশান ঠিক করতে। সঙ্গে ছিলেন পরিচালক হরি ভঞ্জ, সুলাল (জহর গাঙ্গুলী) ও সুশীল রায়। কিন্তু লোকেশানটি আমার ঠিক মনোমত হল না। গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে দরজার ওপর হাত রেখে হরিবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় সুশীল বললে : তাহলে চল চল—এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট না করে অন্য জায়গা দেখা যাক। বলে গাড়ীতে উঠে বসে দরজাটা বন্ধ করতে গেল, আর সেই ফাঁকে আমার হাতের আঙুলটা দরজার ফাঁকে গেল চেপটে। ভাগ্যিস আমার হাতে গার্নেটের আংটিটা ছিল—তাই সমস্ত চাপটা আংটির ওপর পড়তেই আংটির পাথরটা ছিটকে পড়ে গেল, আর আংটিটাও তেবড়ে গেল। আঙুলটায় সামান্য আঘাত লাগল মাত্র, কিন্তু বেঁচে গেল। ওখানেই সামান্য বরফ দিতে যন্ত্রণাটা কমে গেল।

এর মধ্যে আবার অনুরোধ এল কালী গুহের কাছ থেকে যে, ধানবাদে একদিনের জন্যে যেতে হবে—সেখানে অভিনয় হবে 'ইরাণের রাণী'। আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম না। ১৬ তারিখে ধানবাদ পৌঁছে সেই রাত্রে অভিনয় করে, আবার রাত্রিশেষের ট্রেন ধরে ১৭ তারিখে সকালে কলকাতা পৌঁছলাম। সেইদিন রাত্রেই আবার যাত্রা করলাম 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র উদ্দেশ্যে।

অর্থাৎ বিশ্রাম বলে যে একটা জিনিস আছে এবং সেটা একান্ত প্রয়োজন, শুধু জীবনধারণের জন্যে এটা ভুলেই গিয়েছিলাম একরকম। এক যান্ত্রিক নিয়মে কাজ করে যাচ্ছিলাম। অথচ এর জন্যে কোনরকম ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করিনি কখনো। একটা দুর্দমনীয় স্রোতের টানে যেন ভেসে চলেছিলাম।

যাই হোক ১৮।১৯ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 'সাজাহান' ও 'খনা' অভিনয় করে আমি ১৯ তারিখে রাত্রেই কলকাতা রওনা হই; ২০ তারিখে কলকাতায় পৌঁছে আবার সন্ধ্যায় 'তটিনীর বিচার' করলাম।

এর পর কয়েকদিন বেশ বিশ্রাম করলাম কলকাতায় বসে। ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ তারিখে আবার গেলাম বিমল পালের ব্যবস্থাপনায় তার নাট্যসংস্থার সঙ্গে সিউড়ী। এখানে ২ দিন অভিনয় হল—একদিন 'প্রতাপাদিত্য', আর একদিন 'পোষ্যপুত্র'।

এই ফেব্রুয়ারী মাসের ২৩ তারিখে তদানীন্তন বাংলার গভর্ণর লর্ড ব্র্যাবোর্ন সামান্য রোগভোগের পর লোকান্তর গমন করলেন।

মার্চ মাসে দোলযাত্রার দিন সি. এ. পি. একদিনের জন্য 'শ্রী' নাটমন্দিরটি ভাড়া নিলেন। সেখানে হল 'বিদ্যুৎপর্ণা' ও 'ওমর খৈয়াম'। আমি যথারীতি নামলাম 'বিদ্যুৎপর্ণায়'।

এর পর ২০ তারিখে রঙমহল আবার বন্ধ হয়ে গেল। এইদিন 'তটিনীর বিচার'-এর ৩৭তম অভিনয় ছিল।

এর পর আবার সেই ভেসে বেড়ানোর পালা শুরু হল। চুপচাপ বসে থাকা তখনকার দিনে আমার কোষ্ঠীতে লেখেনি—অবশ্য ভগবানের দয়ায় সুযোগও এসে গেছে একটার পর একটা। এই দেখুন না, ভবানীপুরে রূপচাঁদ মুখার্জি লেনে ময়মনসিংহের আঠারবাড়ীর জমিদারগৃহে এক বিবাহ উপলক্ষে তাঁরা 'মন্ত্রশক্তি' অভিনয়ের আয়োজন করলেন তাঁদের বাড়ীতে স্টেজ তৈরী করে। পুরাতন স্টারের বেশীর ভাগ অভিনেতা-অভিনেত্রীই এতে অভিনয় করেন—আমিও 'মৃগাঙ্ক'র ভূমিকায় নামি।

নানাস্থানে অভিনয় করে বেড়াতে লাগলাম। চুঁচুড়া রূপালী সিনেমায় একদিন হল 'মেঘমুক্তি', আমি নামলাম প্রোঃ ঘোষের ভূমিকায়। বসিরহাটে এই সময় একটি বিরাট মেলা হচ্ছিল—নাট্যনিকেতনের হয়ে সেখানে ২ দিন অভিনয় করলাম। একদিন হল 'কর্ণার্জুন', আর একদিন হল 'সাজাহান'। তারপর রঙমহলের শিল্পীরা বর্ধমানের 'বিচিত্রা' সিনেমাহাউস বুক করল। ওখানে ২ দিন অভিনয়

হল—একদিন 'কর্ণার্জুন', আর একদিন 'পোষ্যপুত্র'। আমি আমার অভিনীত চরিত্রগুলিই করে যেতে লাগলাম।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার হয়ে সুশীল মজুমদার তখন 'রিক্তা' ছবিখানি শুরু করেছিলেন—তিনি একদিন আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন ফিল্ম কর্পোরেশনের অফিসে। ওখানে আমার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সই হল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যুটিং আরম্ভ হল।

এই সময় নাট্যনিকেতনের হয়ে গেলাম বাঁকুড়া—প্রথম দিন হল 'কর্ণার্জুন', পরদিন হল 'সাজাহান'। কথা ছিল এই অভিনয়ের পরেই ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরব। কারণ তার পরদিন ছিল দেবদত্তের 'রুক্মিণী' ছবির শ্যুটিং। আমাকে যেতেই হবে। যদি কোনো কারণে না যেতে পারি তাহলে কর্তৃপক্ষের খুব ক্ষতি হবে।

কিন্তু অভিনয় যে-কোনো কারণেই হোক ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গেল—ইতি-মধ্যে কলকাতা যাবার ট্রেন তখন চলে গেছে। আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম একেবারে। কারণ আমি আজ পর্যন্ত কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি নি।

কেউ-কেউ বললেন, একটা টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি 'সিরিয়াসলি ইল' বলে। অসুস্থ হয়েছে, অতএব যাবার উপায় নেই। একজন বললেন: কাল খুব ভোরে উঠে মোটরে করে আপনাকে পৌঁছে দেব—একটু দেরি হবে, কিন্তু উপায় কি।

আমি কিন্তু ওসব কথায় কান না দিয়ে বসলাম টাইম-টেবলখানা নিয়ে। দেখলাম যে একটা ট্রেন আছে আগ্রা হয়ে আসানসোল পর্যন্ত। আমি ভেবে দেখলাম এই ট্রেনে করেই আসানসোল পর্যন্ত যাওয়া যাক, তারপর আসানসোল থেকে অনেক ট্রেন পাওয়া যাবে। সেই রাত্রেই ট্রেন ধরলাম, এবং আসানসোল থেকে হাওড়াগামী একটা ট্রেন ধরে বেলা ১০টা নাগাদ হাওড়ায় পৌঁছলাম। এবং বাড়ী পৌঁছে তাড়াতাড়ি স্নানাহার করে স্টুডিওয় গিয়ে উপস্থিত।

একদিন ফিল্ম কর্পোরেশান স্টুডিওতে 'রিক্তা'র শ্যুটিং করছি, এমন সময় দেখি সুধীর গুহ, সতু সেন ও দীপচাঁদ কাংকারিয়া গিয়ে হাজির। কি ব্যাপার? শুনলুম ওঁরা শরৎবাবুর 'পথের দাবী' খুলবেন, তাই আমাকে ওঁদের প্রয়োজন 'সব্যসাচী'রূপে। আমি রাজী হতেই দীপচাঁদজী আমার হাতে ৯০০৲ টাকা গুঁজে দিতে এলেন।

আমি বললাম: টাকা আমি এখন নেব না—এখন শ্যুটিং করছি, রাখব কোথায়? তোমাদের কেউ একজন টাকা নিয়ে বসে থাক। আমি শ্যুটিং শেষ করে মেক-আপ খুলে জামা-কাপড় বদলাই—তারপর নেব।

সুধীর আর সতু রয়ে গেল, দীপচাঁদবাবু চলে গেলেন। তারপর শ্যুটিং শেষে যখন আমি টাকাটা নিতে গেলাম, তখন সুধীর আমার হাতে সব টাকাটাই দিয়ে বললেঃ কাকাবাবু ঐ টাকা থেকে আমাকে ৩০০৲ টাকা না দিলেই চলবে না। পুতুলকে (শেফালিকা) দিতে হবে—ও-ই তো 'পথের দাবী'তে ভারতী করছে। সে অসুস্থ—আমি তাকে আজ টাকা দেব বলে কথা দিয়ে এসেছি।

আমি বললামঃ দীপচাঁদ যে আমাকে ৯০০৲ টাকা দিয়ে গেল—তাহলে আমি ৯০০৲ টাকার রসিদ দেব না—রসিদ দেব ৬০০৲ টাকার।

সুধীর বলল ঃ ঠিক আছে, আপনার নামে ৬০০৲ টাকাই লেখা হবে।

আমি তখন ৩০০৲ টাকা সুধীরের হাতে দিয়ে দিলাম।

এদিকে নাট্যনিকেতনে তখন 'কর্ণার্জুন', 'প্রতাপাদিত্য', 'সাজাহান', 'আলমগীর' —এই সব পুরনো বইয়ের অভিনয় চলছিল এবং আমি প্রতি নাটকেই আমার ভূমিকাগুলি করে যাচ্ছি। একবার হল কি—রঙমহলের শিল্পীরা চুঁচুড়ায় রূপালী সিনেমায় বায়না নিয়েছে—আমাকে ধরে বসল দুদিন ওখানে অভিনয় করতে হবে।

আমি বললামঃ তা কি করে হয়, আমি যে নাট্যনিকেতনে অভিনয় করছি—একই দিনে দু' জায়গায় কি করে অভিনয় হবে ?

রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠী বললেন ঃ দাদা, আপনি একটু কষ্ট করলে দু'কূলই রক্ষা হয়।

আমি বললামঃ কি রকম ?

আপনি এখানে অভিনয় করামাত্র চুঁচুড়া চলে যাবেন—গাড়ী মজুত থাকবে। ওখানে আরম্ভ হতে তো একটু রাত্তির হবেই। ওখানে আমরা আরম্ভ করব সাড়ে দশটা নাগাদ। তাহলে সব দিক 'ম্যানেজ' হবে।

আমি দেখলাম যে, এটা সম্ভব হতে পারে, তবে শরীরের ওপর ধকলটা পড়বে খুব বেশী। তা পড়ুক, স্বাস্থ্য আমার বরাবরই ভাল ছিল, তাই এ সমস্ত কষ্ট আমি গ্রাহ্য করতাম না। আমি রাজী হয়ে গেলাম।

সেই রকমই ব্যবস্থা হল। কলকাতা ও চুঁচুড়া দু' জায়গাতেই অভিনয় ম্যানেজ হয়ে গেল।

১৭ই এপ্রিল একদিনের জন্য খুলনা করোনেশন হলে 'খনা' অভিনীত হল।

১৮ তারিখ থেকে শুরু হল কালী ফিল্মসে 'শর্মিষ্ঠা'-র শ্যুটিং। নরেশ মিত্র পরিচালক। আমি নামলুম শুক্রাচার্যের ভূমিকায়।

এর পর শুরু হল 'পথের দাবী'-র রিহার্সাল ২২শে এপ্রিল থেকে। খুব কঠিন ভূমিকা এই 'সব্যসাচী'—তার ওপর মেক-আপ পরিবর্তন আছে পাঁচবার। 'পথের

দাবী'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শচীন সেনগুপ্ত। যে 'পথের দাবী' বইকে বৃটিশ সরকার রাজদ্রোহিতার অপরাধে বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, সেই 'পথের দাবী'-র নাট্যরূপ মঞ্চে অভিনয় হবে—এজন্য দর্শকের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়েছে ১৩ই মে, সুতরাং হাতে সময় বেশী নেই। আমরা সবাই উঠে-পড়ে লাগলাম।

অবশ্য এই সঙ্গে রঙমহল শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয়ও চলতে লাগল এখানে-ওখানে। কখনো 'পোষ্যপুত্র', কখনো 'মন্ত্রশক্তি', আবার কখনো 'প্রফুল্ল', কখনো 'চিরকুমার সভা', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি।

'পথের দাবী'র রিহার্সাল পরিচালনা আমাকেই করতে হোত। সতু সেন যদিও নামে পরিচালক, তবু বেচারী সময় করে উঠতে পারত না। কারণ প্রবোধবাবু ইদানীং আর বিশেষ কিছু দেখতেন শুনতেন না, সেইজন্যে সতু আর সুধীর তুজনকেই সমস্ত জিনিসপত্র কেনাকাটা অর্থাৎ যাবতীয় ব্যবস্থাপনার কাজ করতে হোত।

রিহার্সাল সুষ্ঠুভাবেই চলছিল, কিন্তু উদ্বোধনের আগের দিন অর্থাৎ ১২ তারিখে আমার হল প্রচণ্ড উদরাময়। কাল 'পথের দাবী'-র উদ্বোধন, আর আজ শরীরের এই অবস্থা। ওষুধ-পত্তর খাওয়া হল।

আর শরীরেই বা দোষ কি! প্রায় রোজ অভিনয়—কোন কোন দিন তু' জায়গায়। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম, রাত্রিজাগরণ সব মিলে দেহযন্ত্রের এই অবনতি ঘটল।

যাই হোক, শনিবার দিন কিন্তু খানিকটা সুস্থ বোধ করলুম—তবে তুর্বলতা রইল। তবু এমার্জেন্সীবোধে একজন ডাক্তারকে মোতায়েন রাখা হল স্টেজের ভিতরে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সেরকম প্রয়োজন আর হয় নি।

এদিকে হাউস একেবারে দর্শকের ভিড়ে উপচ পড়ছে। ন স্থানং তিল-ধারণম্।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সুমিত্রা—প্রভা, অপূর্ব—ভূপেন চক্রবর্তী, ভারতী—শেফালিকা (পুতুল) প্রভৃতি। কয়েক রাত্রি পর থেকে প্রভার জায়গায় অপর্ণা করত 'সুমিত্রা'।

দর্শকরা তো প্রথম রাত্রি থেকেই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সবই ঠিক হল, কিন্তু আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত যেদিন 'পথের দাবী'র ডবল শো থাকত। পাঁচবার পাঁচবার দশবার মেক-আপ পরিবর্তন করা কি সহজ ব্যাপার! এইভাবেই 'পথের দাবী' চলতে লাগল।

এদিকে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে আর একটি নক্ষত্রপতন ঘটল। বাংলাদেশের একমাত্র গ্রাজুয়েট মঞ্চাভিনেত্রী কঙ্কাবতী সাহু পরলোকগমন করলেন। যদিও কঙ্কাবতী

শিশিরবাবুর দল ছাড়া অন্য কোথাও অভিনয় করেন নি, তবু তিনি যে একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন তার প্রমাণ তিনি অনেকবার দিয়েছেন।

এর পর জুন মাসের ২৯ তারিখে আমার বর্তমান গোপালনগর বসতবাটীর গৃহপ্রবেশ। যদিও তখন বাড়ীটি সম্পূর্ণ হয় নি, ঘরের মেঝেগুলি তখনও বাকী ছিল—তবু অসমাপ্ত অবস্থাতেই গৃহপ্রবেশ হল।

'পথের দাবী'-র ২৬ রাত্রি অভিনয়ের পর প্রভা নাট্যনিকেতন ছেড়ে দিল হঠাৎ। তখন একটা সমস্যা দেখা দিল—এখন হঠাৎ 'সুমিত্রা' পাওয়া যায় কোথায়? নবাগতা অপর্ণাকে এই ভূমিকায় 'ট্রায়াল' দেওয়া হল। দেখলুম মেয়েটির মধ্যে ক্ষমতা আছে—শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে চলবে। অতএব সেই দিন থেকে সে-ই করতে লাগল এবং ভালই করতে লাগল।

এর পর 'রুক্মিণী'-র শ্যুটিং সমাপ্ত হয়ে শুরু হল 'তটিনীর বিচার' সুশীল মজুমদারের পরিচালনায়। আমি ডঃ ভোসের ভূমিকাতেই নামলাম। তটিনীর ভূমিকায় রাণীবালা এবং নায়ক বসন্তের ভূমিকায় ছিল সুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় বলে একটি নতুন ছেলে। তখনকার দিনের লাস্যময়ী অবাঙালী চিত্রাভিনেত্রী রমলা (মিস র‍্যাচেল) একটি বিশেষ ভূমিকায় নেমেছিল।

এতদিন রঙমহলের শিল্পীরা নানা দিকে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছিলেন—এবার তাঁরা আবার থিতু হলেন। বিধায়কের লেখা 'মাটির ঘর' দিয়ে রঙমহল আবার নতুন করে দ্বারউদ্ঘাটন করল। দলপতি হয়ে এলেন দুর্গাদাস; নাটকখানি দীর্ঘদিন ধরে জনগণের মনোরঞ্জন করেছিল।

তারপর 'রিক্তা'-র উদ্বোধন হল রূপবাণীতে ১৯শে সেপ্টেম্বর। তখনকার দিনে 'রিক্তা' একটি স্মরণীয় চিত্র হিসেবে অভিনন্দিত হয়েছিল।

হ্যাঁ, একটা সব থেকে বড় খবর বলতে ভুলে গেছি—যাতে সমগ্র পৃথিবী নড়ে উঠল। জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধঘোষণা। এইটিই পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধরূপে পরিগণিত হয়। পৃথিবীর কোন দেশই এর বীভৎসতা থেকে রেহাই পায় নি।

যতদূর মনে আছে, এই সময় রঙমহল থেকে কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে গদাই মল্লিক বেরিয়ে গিয়ে অ্যালফ্রেড মঞ্চটি দখল করলেন 'নাট্যভারতী' নাম দিয়ে। শচীন সেনগুপ্তের 'আবুল হাসান' দিয়ে নাট্যভারতীর দ্বারোদ্ঘাটন হল।

১৬ই সেপ্টেম্বর আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও চিত্র-জীবনের প্রথম দিককার সহকর্মী পরিচালক প্রফুল্ল ঘোষ হঠাৎ লোকান্তরগমন করলেন। প্রথম জীবনে আমি ও প্রফুল্ল

কী দারুণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে 'সোল অফ এ স্লেভ' করেছিলাম, সে-সব কথা এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে বলেছি। হঠাৎ প্রফুল্লর মৃত্যুতে আমি খুবই আঘাত পেয়েছিলাম।

কিছুদিন যাবৎ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। কাছাকাছি কোথাও একটু ঘুরে আসবার জন্যে মনটা খুব উসখুস করছিল। একদিন সুযোগও এসে গেল।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের এক ভগ্নিপতি থাকেন কালিংপঙে। নাম ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত। মন্মথ এক চিঠি লিখে দিল তাঁকে—আমি আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সেখানে পাঠিয়ে দিলাম—আমি সঙ্গে যেতে পারলাম না, তার কারণ শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের একটি সম্মান-রজনী উপলক্ষে 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় হবে ৩রা অক্টোবর।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের এমনি দুর্ভাগ্য যে, স্টার মঞ্চে এই সম্মিলিত অভিনয় হবার শেষ মুহূর্তে সে অভিনয় হল না এবং একবাড়ী দর্শকদের টিকিটের মূল্য ফেরৎ দিতে হল।

৫ তারিখে আমি দার্জিলিং মেলে চলে গেলাম কালিংপঙ।

ওখানে আমি ৫।৬ দিন ছিলাম, প্রত্যেকটি দিনই বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে কাটল। ওখানে বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস তখন ছিলেন—আমাদের বাসার কাছেই তিনি থাকতেন—তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল কলকাতা থেকেই। খুব স্নেহ করতেন আমাকে। আমাকে ওখানে দেখতে পেয়ে তাঁর বাড়ীতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন।

একদিন রিক্‌শা করে যাচ্ছি। সামনে দেখি এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সামনে ভদ্রমহিলাকে দেখে আমি স্বভাবতঃই মুখটা নীচু করে আছি। এদিকে সেই ভদ্রলোকটি একেবারে রিক্‌শার সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন: আরে, কে অহীন নাকি?

আমি তাকিয়ে দেখি: ভদ্রলোক আর কেউ নন, ভারতের প্রাক্তন প্রধান-বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাস। সুধীরঞ্জন আমার বিশেষ বন্ধু। আমি সবিস্ময়ে বললাম: আরে, তুমি?

বলে রিক্‌শা থেকে নামলাম। সুধীরঞ্জন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন: তুমি যেরকম নতনেত্র হয়ে চলেছিলে, তাতে মনে হচ্ছিল যে তুমি কালিংপঙ-এর পাহাড়ে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য খুঁজে বেড়াচ্ছ।

আমি বললাম: একজন ভদ্রমহিলার দিকে সামনা-সামনি চেয়ে থাকলে তিনিও অস্বস্তি বোধ করবেন, আর সেই সঙ্গে আমিও, সেইজন্যেই······

এই রকম আরও কিছু-কিছু জানাশোনা লোক বেরিয়ে পড়ল। আর দাশগুপ্ত

তো আমাদের আদর আপ্যায়নের কোনরকম ত্রুটি করেন নি। অত্যন্ত ভাল লোক ছিলেন ডাঃ দাশগুপ্ত।

একদিন স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলাম গ্যাংটকে বেড়াতে, রওনা হলাম সকাল আটটায়। ওখান থেকে অইবালি হল নয় মাইল। এখান থেকে রংপো অর্থাৎ সিকিম সীমান্ত হল ১৪½ মাইল। এখানেই ছিল ব্রিটিশ রাজ্যের শেষ সীমান্ত। এখানে একটা চেকপোস্ট ছিল, সেখানে পরিচয়পত্র দেখাতে হবে সিকিম যেতে হলে। কালিংপঙ থেকে সমস্ত রাস্তাটাই বেশ সুন্দর, পীচ ঢালা, মাঝে মাঝে বহুদূরবিস্তৃত চেরী ফুলের গাছ, বড় এলাচের গাছ, রাস্তার দুধারে ফুটে রয়েছে। অপূর্ব দৃশ্য।

রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম যে, দু' এক জায়গায় 'ধস' নেমেছিল। সেগুলি আবার সারানো হচ্ছে। রংপো থেকে গ্যাংটক ২৫ মাইল। গ্যাংটক পৌঁছে আলাপ হল ওখানকার ফরেস্ট অফিসার শ্রীভীমবাহাদুর প্রধানের সঙ্গে। চমৎকার অমায়িক ভদ্রলোক।

তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন বৌদ্ধবিহারে। ভারতবর্ষে এর থেকে ভাল বৌদ্ধবিহার আর নেই। অজস্র ধর্মগ্রন্থে ঠাসা লাইব্রেরী—সত্যিই দেখবার জিনিস। ঘরের মেঝেগুলি কাঠের এবং এমন সুন্দর পালিস করা যে, 'ডান্স-ফ্লোর' বলে মনে হয়। সিকিমের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে আমাদের নিয়ে গেলেন শ্রীপ্রধান। প্রাসাদ দেখবার অনুমতি মিলল। এখন যিনি মহারাজ হয়েছেন তখন তাঁর বয়স ছিল খুব কম এবং তখন তিনি ছিলেন যুবরাজ। প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাদের নিমন্ত্রণ করেন ডিসেম্বর মাসে। সেই সময় ওখানে বিরাট এক মেলা হবে, আর সে-সময় সারা ভারত থেকে বৌদ্ধরা এসে সমবেত হবে। ওখানে আর একটা জিনিস দেখে খুব অবাক লাগল। প্রাসাদ ও বৌদ্ধবিহারের সামনে সুন্দর সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ময়দান।

একটু দূরেই ডাকবাংলো। মিলিটারী অফিসারদের কোয়ার্টার। মোটের উপর অপূর্ব সুন্দর জায়গাটি। ডাকবাংলোতেই আমরা খাওয়া-দাওয়া করলাম—তারপর সন্ধ্যার সময় আবার কালিংপঙ-এর দিকে যাত্রা করলাম। বাড়ী ফিরতে বেশ একটু রাত হয়েছিল—ছেলেমেয়েরা রাস্তায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমার কিন্তু মনটা একটা অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতিকে যারা ভালবাসে তাদের কাছে এইসব স্থানের সৌন্দর্য এক অক্ষয় ছাপ রেখে যায়।

এর পরদিন কালিংপঙ ত্যাগ করে শিয়ালদহের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

আরও কয়েকদিন থাকবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কলকাতা থেকে নাট্যভারতী কর্তৃপক্ষ,

টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগলেন, শেষে টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডারে টাকা পর্যন্ত পাঠালেন। বাধ্য হয়েই আমাকে চলে আসতে হল।

আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্টেজে নামতে হল। ইতিমধ্যে শিশিরবাবুর দল আমার নাম জুড়ে দিয়ে 'রঘুবীর, ষোড়শী, সধবার একাদশী ও চিরকুমার সভা ঘোষণা করে বসে আছেন। ১১ অক্টোবর কলকাতা পৌঁছলাম—সেইদিনই 'রঘুবীর'। তাতে ছিলেন শিশিরবাবু, তিনকড়িদা, নরেশবাবু, বিশ্বনাথ, শৈলেন, নীহারবালা ও আমি।

তারপর 'ষোড়শী' এবং তার পরদিন 'সধবার একাদশী' ও 'চিরকুমার সভা'।

আবার তার পরদিন নাট্যভারতীতে 'তটিনীর বিচার'—এইদিন অভিনয় শেষে দেখি আমার 'গারনেট' পাথরের আংটিটা আঙুল থেকে কখন খুলে পড়ে গেছে। একদম বুঝতে পারিনি। এই আংটিটার জন্যে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল—দাম অবশ্য খুব বিরাট কিছু একটা নয়—কিন্তু এটা আমার খুব প্রিয় আংটি ছিল।

এই সময় অভিনয় যে প্রত্যেক দিন হত তা নয়—এই সময় প্রায় প্রত্যহই দুটো করে অভিনয় হত এবং তা দু-জায়গায়। যেমন ধরুন 'তটিনীর বিচার' চলছিল নাট্য-ভারতীতে—ওদিকে নাট্যনিকেতনে চলছে 'পথের দাবী', 'কর্ণার্জুন' প্রভৃতি।

পূজার সময় চারদিনই নাট্যভারতী ও নাট্যনিকেতনে, দু'টো জায়গাতেই অভিনয় করেছি। কোনদিন আগে নাট্যভারতী, পরে নাট্যনিকেতন, আবার কোনদিন তার উল্টো। অর্থাৎ দুই থিয়েটারেই আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলেছিল।

অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে ছবির শ্যুটিংও চলছে। এই সময় শুরু হল প্রফুল্ল পিকচার্সের 'কমলে কামিনী'।

এইভাবে সপ্তাহের সব ক'টা দিনই প্রায় নাট্যভারতীতে 'তটিনীর বিচার' ছাড়াও কখনও 'মন্ত্রশক্তি', কখনও 'চিরকুমার সভা', কখনও 'প্রফুল্ল', কখনও 'পোষ্যপুত্র' হতে থাকল, আর ওদিকে নাট্যনিকেতনে 'পথের দাবী' ছাড়াও পুরাতন নাটক 'সাজাহান', 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতিতে নামতে হয়েছে। কারণ নাট্যভারতী ও নাট্যনিকেতন দু'দলেরই এই নাটক দুটিতে অর্থাৎ 'তটিনীর বিচার'-এ ডঃ ভোস এবং 'পথের দাবী'তে সব্যসাচীর ভূমিকায় আমাকে যেমন দর্শকরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে কর্তৃপক্ষের ভয় ছিল অন্য কোন শিল্পীকে যদি এই ভূমিকায় নামানো যায়, তবে চূড়ান্ত অনর্থের সৃষ্টি হবে, আর হয়ত থিয়েটারও মার খেয়ে যাবে। তাই আমাকে নিয়ে এত টানাটানি।

অবশ্য এমনও অনেক দিন গেছে যেদিন ঠিক ৫-টায় নাট্যভারতীতে করলাম

'তটিনীর বিচার', তারপর নাট্যনিকেতনে গিয়ে 'পথের দাবী' করলাম, ওটা শেষ করে আবার নাট্যভারতীতে ফিরে এসে 'মন্ত্রশক্তি' করলাম।

আর একবার মনে আছে শিশিরবাবুর সঙ্গে 'রঘুবীর' অভিনয় শেষ করে চলে গেলাম মিডলটন স্ট্রীটে, এ. পি. গুপ্তর বাড়ীতে। এখানে সেদিন কি একটা বিবাহ উপলক্ষে 'কর্ণার্জুন' অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। সে অভিনয় শেষ করে আবার ফিরে গেলাম নাট্যনিকেতনে 'বঙ্গেবর্গী'তে নামবার জন্যে।

অবশ্য এরকমভাবে অভিনয় করে অর্থাগম ভালই হতে লাগল। কিন্তু মানুষ তো যন্ত্র নয়—রক্তমাংসে গড়া। তার শরীরে ক্লান্তি আছে, অবসাদ আছে, আর সবথেকে বড কথা হল মন এবং মেজাজ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে আমি এইটুকুই বলতে পারি যে, শরীরে হাজার ক্লান্তি আসুক, মন-মেজাজ যতই খারাপ হোক, মঞ্চে পা দিলেই মনের অবস্থা সম্পূর্ণ পালটে যেতো। এই যে পরিবেশ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাজপোশাক, মঞ্চকর্মীদের ব্যস্তভাবে আনাগোনা, দর্শকের হৈ-হুল্লোড, যন্ত্রীদের সুর-বাঁধা টুং-টাং আওয়াজ—এ-সব একটা আলাদা মেজাজ এনে দেয়। এর ওপর মেক-আপ চড়ালে তো আর কথাই নেই—মানুষটাকেই বদলে যেতে হয়। তখন আর আমার মধ্যে আমি থাকি না—তখন আমি নাটকের চরিত্রের একজন—তখন আমি অহীন্দ্র চৌধুরী নই—তখন আমি কখনও ডাঃ ভোস, কখনও বৃদ্ধ 'সাজাহান', কখনও বহুরূপী 'সব্যসাচী', আবার কখনও আপনভোলা 'চন্দ্রবাবু'।

এই হল নটের জীবন। মঞ্চের ভিতর ঢুকলেই সে মানুষটা পালটে যায়—। আমারও ঠিক তাই হত। সুতরাং ক্রমাগত এত অভিনয় সত্ত্বেও কখনও ক্লান্তি আসত না।

নাট্যভারতীতে ১৯শে অক্টোবর তারিখে খোলা হল কাজী নজরুল ইসলামের নৃত্য-গীতবহুল নাটক 'মধুমতী'। এ নাটকে অবশ্য আমি কোন অংশ নিইনি—তবে প্রায়ই রিহার্সাল দেখতে হত। মাঝে-মধ্যে অনেক উপদেশ-নির্দেশও দিতে হত। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে রিহার্সাল কিন্তু চলতেই থাকল। অবশ্য এত চেষ্টা সত্ত্বেও নাটকখানি বেশী-দিন চলেনি।

এরপর নভেম্বরের শেষাশেষি আর একবার কালিংপঙ গেলাম। আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা—মীরা ও ভানু তখন ওখানেই ছিল। ভারি সুন্দর আবহাওয়া তখন ওখানে। শীত সামান্য পড়েছে, তবে অসহ্য নয়; বরং গরম জামা-কাপড় পরা থাকলে বেশ আরামদায়ক মনে হয়।

এখানে কয়েকদিন থাকার পর ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে কালিংপঙ থেকে

৯ মাইল দূরে আলগোড়া নামক একটি জায়গায় গেলাম। এ পাহাড়টি সমুদ্রগর্ভ থেকে ৫৮০০ ফুট উঁচু—এখানে যে ডাক-বাংলোটি ছিল সেটি ভারি সুন্দর, মনে রাখার মতো। ডাকবাংলোটি যেন একটি রেলের কামরা। এখান থেকে তিব্বত সীমান্ত পেডং খুব কাছে, মাত্র তিন মাইল। ডাকবাংলোয় বসে দেখা যেত তিব্বতী নারী-পুরুষরা অশ্বতরে চড়ে বিরাট বোঁচকায় ভর্তি উল এবং উলের তৈরী সোয়েটার নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আসত দলে দলে। অনেকে পায়ে হেঁটেও আসত। এখানে আছে রোপওয়ে স্টেশন। শূন্যে দড়ির লাইন পাতা আছে, তারই সঙ্গে লাগানো আছে ছোট বাক্সের মতো বসবার জায়গা। এ দিয়ে নীচ থেকে ওপরে ওঠা বা ওপর থেকে নীচে নামা যায়।

অপূর্ব দৃশ্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে দেখলেও যেন মন ভরে না।

এর পরদিন আমরা সকাল ৮-৩০ টায় মোটরে করে গেলাম দার্জিলিং। সঙ্গে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলাম। আসল উদ্দেশ্য হল টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখা।

যাবার সময় পড়ল তিস্তা নদীর ওপরে অ্যাণ্ডারসন ব্রিজ। এই সেতু নির্মাণে অদ্ভুত ইঞ্জিনীয়ারিং দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ রকম উঁচু জায়গায় একটা span-এ তৈরী সেতু সত্যিই বিস্ময়কর। সেইজন্যে আরও অবাক হলাম যে, ঐ রকম শক্ত সেতু কি করে সম্প্রতি বন্যার তাণ্ডবে ভেঙ্গে পড়ল।

আমরা গিয়ে পৌঁছলাম দুপুর বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন ভোজের সময় অর্থাৎ ১১-৩০ মিনিটে। গিয়ে উঠলাম কালীবাবুর সেণ্ট্রাল বোর্ডিং হাউসে। তখন শীতের সময় বোর্ডিং-এ লোকজন খুবই কম—সবাই প্রায় চলে গেছে—দু'চারজন ছাড়া বোর্ডিং প্রায় খালি। সুতরাং সেদিক দিয়ে কোন অসুবিধা হল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে সকলে মিলে বেরুলাম শহরটা একটু দেখবার জন্যে।

সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। কারণ রাত ৩-৩০ মিনিটের সময় তো উঠতে হবে টাইগার হিলে যাবার জন্যে। একজন লোককে বলে রাখলাম ঠিক সময়ে তুলে দেবার জন্যে। সে ঠিক সময় তুলে দিল—আমরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই লোকটিই আমাদের নিয়ে চলল পথ দেখিয়ে।

টাইগার হিলে যে জায়গা থেকে সূর্যোদয় দেখব, দেখি সেখানে ইতিমধ্যে বেশ ভিড় হয়ে গেছে। সামনের সিটগুলি ভর্তি হয়ে গেছে। স্থানীয় পাহাড়ী লোকদের ভিড়ই বেশী। ওদের পোশাকের দুর্গন্ধে গা-টা কিরকম যেন গুলিয়ে উঠল। তখনও সূর্যোদয়ের দেরি ছিল—আমি বললাম: এখানে তো বসা যাবে না দেখছি, চল ছাদের ওপর যাওয়া যাক।

গাইড বলল : ছাদের ওপর সাংঘাতিক ঠাণ্ডা বাবু, ভেতরে বসুন।

কিন্তু আমি জোর করেই ছাদের ওপর গেলাম। গিয়ে দেখলাম গাইডের কথা শুনলেই ভাল ছিল। শীতের চোটে ভানু ও মীরা তো রীতিমত ঠকঠক করে কাঁপছে—দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তো বেশীক্ষণ থাকা যায় না—বাধ্য হয়ে আবার নীচের সেই ঘরেই ফিরে এলাম।

তবে আমাদের ভাগ্য ভাল—সামনে যে সব লোক বসে ছিল, তারা একটু সরে নড়ে বসে সামনের সীটেই আমাদের স্থান করে দিল। আমরা বেশ ভাল ভাবেই বসলাম। আমাদের ভাগ্যটা আরও ভাল ছিল, কারণ সেদিন আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও ছিল না—এরকম পরিষ্কার নির্মল আকাশ এখানে খুব কমই দেখা যায়।

যাই হোক, এদিকে সাড়ে চারটে নাগাদ আকাশ একটু একটু করে ফিকে হতে শুরু করল। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র শীর্ষে শুরু হল বিচিত্র বর্ণ-সমারোহ। সূর্যদেব যেমন পাহাড়ের তলা থেকে একটু একটু করে উদয় হচ্ছেন, আর বিভিন্ন রং-এর রশ্মিগুলি যেন হাওয়ার ওপর ভর করে কাঁপতে কাঁপতে কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে এসে ঠিকরে পড়তে লাগল। লাল, নীল, বেগুনী, সোনালি প্রভৃতি সপ্তবর্ণের সংমিশ্রণে কাঞ্চনজঙ্ঘার যে রূপ চোখের সামনে প্রতিভাত হল, তার তুলনা নেই। দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইলাম সেই অপরূপ রূপসৌন্দর্যের দিকে।

কিন্তু ক্যামেরায় এই সৌন্দর্য-মুহূর্তটি ধরে রাখবো ভেবেছিলাম। হল না ছবি-তোলা। ক্যামেরা ফেলে এসেছি কালিংপঙ-এ। সুতরাং আবার সেই দুচোখ দিয়ে দেখা।

এরপর আবার ফিরে এসেছি কালিংপঙ-এ। এর মধ্যে একদিন স্থানীয় ফরেস্ট অফিসার নলিনী দাশগুপ্ত আমাকে ও আমার স্ত্রীকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন।

দাশগুপ্তের বাড়ীতে চায়ের আসরে সেদিন আরো অনেকে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সকলের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হল।

আমি তো বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলাম। কিন্তু নাট্যভারতীর একটির পর একটি টেলিগ্রাম আমাকে আর নিশ্চিন্তে থাকতে দিলে না। নাট্যভারতীর নতুন নাটক 'সংগ্রাম ও শান্তি'-র উদ্বোধন তারিখ আসন্ন। সুতরাং আর নয়, এবারে কলকাতায় ফিরবো ঠিক করলাম।

ফিরেও এলাম। আরম্ভ হল 'সংগ্রাম ও শান্তি'-র রিহার্সাল।

নাটকটির উদ্বোধন হল পূর্বঘোষিত দিনে, ২৩শে ডিসেম্বর। প্রথম দিন থেকেই নাটক জমলো। বড়দিনের সপ্তাহে মহাসমারোহে চললো নাটক। আমি ছাড়া এ নাটকে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম বলছি : জহর গাঙ্গুলী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়,

রাণীবালা, সুহাসিনী, বড় রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী (পঙ্কি), সন্তোষ সিংহ ছাড়া আরো অনেকে ছিলেন এই নাটকে।

চলতি অভিনয়ের কথা বলতে গেলে, শিশিরবাবুর সঙ্গে যে সম্মিলিত অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলাম, সে কথা না বললে বক্তব্য অসমাপ্ত থাকে। একদিন হল চন্দ্রগুপ্ত, আর একদিন রঘুবীর। চন্দ্রগুপ্তে শিশিরবাবু ছিলেন চাণক্যের ভূমিকায়, আর আমি অভিনয় করেছিলাম সেলুকাসের চরিত্রে।

অভিনয়ের মধ্যেই ১৯৩৯ সাল শেষ হয়ে গেল। এই বছরটা আমার জীবনের কর্মমুখর অধ্যায়। শুধু অভিনয় আর অভিনয়—এছাড়া যেন আর কিছু ছিল না। আর শুধু কি মঞ্চ? ফিল্ম, রেডিও, গ্রামোফোন—কিছুই বাদ যায়নি।

১৯৩৯-এর ধারাটাই অব্যাহত রইলো ১৯৪০-এর শুরুতে। নাট্যভারতীতে যথারীতি চলছে 'সংগ্রাম ও শান্তি'। মাঝে মাঝে অভিনীত হচ্ছে 'তটিনীর বিচার'।

এদিকে ফিল্ম কর্পোরেশনের নতুন ছবি, হীরেন বসু পরিচালিত 'অমরগীতি'তে অভিনয়ের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হলাম।

এই সময় আর্ট থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধাংশু চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকের যাত্রী হলেন। সুধাংশুবাবুর সঙ্গে থিয়েটারের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না—কিন্তু থিয়েটারে প্রায় আসতেন এবং তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত। সুধাংশুবাবুর মৃত্যুকালে মাত্র ৪৪ বছর বয়েস হয়েছিল। এরকম একজন ভাল লোকের মৃত্যুতে মনটা বেশ কাতর হয়ে পড়ল।

নাট্যভারতীতে 'সংগ্রাম ও শান্তি' বেশ ভালভাবেই চলতে লাগল। মাঝে মাঝে 'তটিনীর বিচার' হয়, আর নাট্যনিকেতনেও মাঝে মাঝে নামতে হয়; কখনও 'পথের দাবী', কখনও 'মা', কখনও 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতিতে।

একদিন নাট্যভারতীর হয়ে ময়মনসিংহ গেলাম সেখানকার এক মেলায় অভিনয় করতে। এখানে ২ দিন অভিনয় হয়েছিল। প্রথম দিন 'কর্ণার্জুন' (তিনকড়িদা কর্ণ, আমি শকুনি), পরদিন 'মন্ত্রশক্তি' (তিনকড়িদা মথরো, আমি মৃগাঙ্ক)। এখানে অভিনয় ভালই হল, স্থানীয় জনগণের প্রশংসাও পেলাম প্রচুর—কিন্তু যে জিনিসটা আজও ভুলতে পারিনি, সেটা হল বিপুল ভিড়। স্টেশনে ট্রেন থামতে দেখি, সে কি সাংঘাতিক ভিড় স্টেশনে! কাতারে কাতারে লোক—কয়েক সহস্র হবে। বেশির-ভাগই স্কুল-কলেজের ছেলে এবং গ্রামের তরুণ সম্প্রদায়। ভিড়ের চাপে আমরা ট্রেন থেকেই নামতে পারি না—শেষে পুলিশ এসে আমাদের নামতে সাহায্য করে।

ডাকবাংলোয় এসে তবে খানিকটা শান্তি। কিন্তু পুরোপুরি স্বস্তি পেলাম না। যদিও কয়েকজন পুলিশ ছিল ডাকবাংলোয় আমাদের পাহারা দেবার জন্যে, তবুও আনাচে-কানাচে সমস্ত দিন কৌতূহলী ছেলের দল আমাদের খুবই বিব্রত করেছিল।

৩১শে জানুয়ারী অভিনয় শেষ করে পরদিনই কলকাতা রওনা হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

১লা ফেব্রুয়ারী শেয়ালদহ পৌঁছেই দেখি, প্রবোধ গুহ মশায়ের তৃতীয় পুত্র নিরু স্টেশনে আমারই অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখেই বলল : কাকাবাবু, আপনার জিনিসপত্রগুলো দিন। আমরা গাড়ীতে তুলে দিই। আপনাকে এখুনি হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে।

—কেন ? আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি।

—আজ রাত্রে দুমকায় প্লে আছে, আর সবাই চলে গেছেন—আপনার টিকিট কেটে রেখেছি। বললে নিরু।

—আজই প্লে ? বাড়ী গিয়ে স্নান-খাওয়া করে যাওয়া যাবে না ?

নিরু বললে : তাহলে আর এই ট্রেনটা ধরা যাবে না। এ ট্রেনটা ফেল করলে আর তো ট্রেন নেই। এই টাকাটা বাবা আপনার জন্যে আমার কাছে রেখে দিয়েছেন।

বলে আমার প্রাপ্য টাকাটা আমার হাতে দিল। টাকাটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : কি প্লে হবে ?

—বোধহয় 'সাজাহান'।

আমি চলে গেলাম হাওড়ার দিকে, নিরু আমাকে পৌঁছে দিল হাওড়া স্টেশনে। স্টেশনেই রিফ্রেসমেণ্ট রুমে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। নিরু অবশ্য আমাকে বলে গেল যে, সে বাড়ীতে বুঝিয়ে বলে দেবে।

রামপুরহাট স্টেশনে গাড়ী থাকবে, ওখান থেকে দুমকা যাওয়া হবে—এই রকম কথা আমাকে বলে গিয়েছিল নিরু। কিন্তু রামপুরহাট স্টেশনে নেমে দেখি কাকস্য-পরিবেদনা। না গাড়ী, না লোকজন। মহামুশকিল, এখন পৌঁছাব কি করে ?

আসল ব্যাপারটি হল প্রবোধবাবু ভেবেছিলেন যে, আমি হয়ত শিয়ালদহ হতে ট্রেন থেকে নেমে সঙ্গে সঙ্গেই হাওড়ায় এসে আবার ট্রেনে উঠতে চাইব না, সেইজন্যে তাঁরা একরকম ধরেই নিয়েছিলেন যে আমি আসছি না। সেইজন্যেই কোন লোক বা গাড়ী পাঠান নি।

আমি যখন রামপুরহাট স্টেশনে নামলাম, তখন অপরাহ্ণ। আমি এদিক-ওদিক

ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম—দেখলাম যে কোনো গাড়ী নেই। বাস অবশ্য ছিল, কিন্তু অসম্ভব ভিড় দেখে, আর সমস্ত রাস্তা দাঁড়িয়ে যেতে হবে মনে করে আর উঠলাম না।

কুলির মাথায় আমার ছোট স্যুটকেশ আর বিছানাটি চাপিয়ে দিয়ে প্লাটফর্মের বাইরে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন তো অবস্থা দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম।

আমি কুলিকে জিজ্ঞেস করলাম: হিঁয়া কোই গাড়ী-উড়ি নেহি মিলেগা—তুমকা যানেকো লিয়ে?

কুলি বলল: বস্ মে যাইয়ে না! আউর তো কোই গাড়ী হ্যায় নেহি।

—নেহি বাবা—বাসমে নেহি যায় গা।·· আচ্ছা, তুম এক কাম করো। ওয়েটিং রুমমে সামান সব রাখ দো।·· কলকাত্তা যানে কো ট্রেন কয় বাজে আতি হ্যায়?

আমার তখন ভারী বিরক্তি লাগছিল। একটা লোক রাখেনি, কিসে যাব তার বন্দোবস্ত নেই—এমন কি একখানা গাড়ী পর্যন্ত নেই। এ অবস্থায় ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

প্লাটফর্মের দিকে ফিরতে যাব—এমন সময় দেখি দূরে বটগাছটার নীচে একখানা খালি বাস দাঁড়িয়ে আছে। আমি বাসটার কাছে গিয়ে দেখি একজন মাত্র লোক বাসের ভিতর বসে কি সব হিসেব করছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম: হাঁ ভাই, এ গাড়ী কি তুমকা যাবে?

সে হিসেবের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বলল: না।

আমি বললাম: যা ভাড়া চাও, তাই দেব।

এতক্ষণে সে চোখ তুলল আমার দিকে। কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল: স্যর আপনি?

—হ্যাঁ—কেন, আমাকে চেন নাকি? আমি কৌতুক করলাম।

সে সলজ্জ হেসে বললে: আপনাকে কে না চেনে, স্যর?···তা স্যর, আপনি আজ নামবেন তো 'সাজাহান'-এ! 'সাজাহান' বলতে তো আপনাকে বাদ দিয়ে কাউকে ভাবাই যায় না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: তুমি আমার 'সাজাহান' দেখেছ?

—হ্যাঁ স্যর—শুধু আপনার কেন, ভাদুড়ী মশায়েরও দেখেছি, তবে আমার আপনারটাই ভাল লেগেছে।

এখন ভাই, আমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারবে? এর জন্যে তোমার যা ভাড়া হবে তাই পাবে। তবে এ বাসে কিন্তু আর কোনো লোক নিতে পারবে না।

—ছেলেটি সোৎসাহে বলল: ঠিক আছে, স্যর।

বলে কুলির মাথা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে বাসের ভিতরে রাখল, আর আমাকে বলল: আপনি ড্রাইভারের পাশের সীটে বস্থন স্যর, আরামে যাবেন।

আপনি দু মিনিট বস্থন স্যর—আমি ত্রৈলোক্যকে ডেকে আনি।

—ত্রৈলোক্য কে?

—কণ্ডাক্টার, স্যর। ওর থিয়েটার দেখার খুব শখ, স্যর। ওকে একটা পাশ দেবেন স্যর।

আমি হাসতে হাসতে বললাম: বেশ তো তোমরা দুজনেই দেখবে।...তা প্লে'র আগে পৌছুতে পারব তো?

—সেজন্যে ভাববেন না, স্যর। আমার একটা দায়িত্ব নেই? এই ৪০ মাইল যেতে বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক লাগবে।

যেতে যেতে ছেলেটি অনেক কথাই বলল। ছেলেটির নাম শ্যামকান্ত। নিজেই ড্রাইভার। ভীষণ থিয়েটার-পাগল। ফাঁক পেলেই কলকাতা যায়—গিয়ে থিয়েটার দেখে। আমার বহু নাটক ও দেখেছে। গাড়ী চালাতে চালাতে সেই সব কথাই বলছিল।

সন্ধ্যার একটু পরেই আমি পৌছে গেলুম দুমকা। গিয়ে দেখি, যে ক্যাম্পে আমাদের আস্তানা হয়েছিল সে-স্থান শূন্য—সবাই চলে গেছে প্যাণ্ডেলে অর্থাৎ যেখানে অভিনয় হবে সেখানে। প্যাণ্ডেলে আমি গিয়ে পৌছতেই সকলেই যুগপৎ আশ্চর্য এবং আনন্দিত হল। প্রবোধবাবু বললেন: যাক্, তুমি যে আসবে এটা আমি ভাবতেই পারিনি—নীরুকে বলে এসেছিলাম এই পর্যন্ত। যাক্, বিশ্রাম করে মুখ-হাত ধুয়ে আগে কিছু খেয়ে নাও—তারপর মেক-আপে বস।

তাই করলুম—শ্যামকান্তর গাড়ী কিন্তু রেখে দিলাম—ঠিক হল যে, অভিনয় শেষ হলেই সে আমাকে আবার রামপুরহাট স্টেশনে পৌছে দেবে। কারণ পার্টি আরও দু'দিন থকেবে—অন্য অভিনয় আছে।

এদিন ঔরঙ্গজেব হয়ে নামল রবি রায় আর অর্পণা হল জাহানারা।

আমি অভিনয় শেষ করেই সেই বাসে করে রওনা হলাম রামপুরহাটের দিকে এবং ভোরবেলার ট্রেন ধরে কলকাতায় চলে এলাম।

৩।৪ তারিখে নাট্যভারতীতে 'সংগ্রাম ও শান্তি' করলাম। 'অমর গীতি'-র স্যুটিং একদিন স্থগিত রাখতে হল 'তটিনীর বিচার'-এর ব্যাক প্রোজেক্শনের জন্য।

৫ তারিখে আবার বরিশাল এক্সপ্রেসে খুলনা হয়ে গেলাম মাদারিপুর। মাদারিপুর যাওয়া বড় কষ্টকর। ট্রেন, স্টীমার, নৌকা ও বাস—এতগুলি যানবাহন পরিবর্তন করে যখন মাদারিপুর পৌছলাম, তখন সন্ধ্যা ৬টা। মাদারিপুরে উঠলাম ডাক-

বাংলোতে। রাত ৯-টায় 'সাজাহান', তার পরদিন 'চাঁদ-সদাগর'—রাত্রি ৯-টায়। আর সমস্ত দিন দুনিয়ার লোক ভিড় করে এল আমাকে দেখতে এবং কেউ কেউ আবার আলাপও করল।

ঐদিনই এক টি. এম. ও.-তে পেলাম প্রবোধবাবুর কাছ থেকে টাকা এবং নির্দেশ যে এখানকার অভিনয় করেই সদলবলে রওনা হতে হবে ফরিদপুর।

অভিনয় শেষ করে আর কোনো সময় পাওয়া গেল না—মেক-আপ তুলে ওখানেই কিছু খেয়ে নিয়ে সোজা একজন সিন-সিফ্টারকে দিয়ে ডাকবাংলো থেকে আমার জিনিসপত্র আনিয়ে নিয়ে চলে গেলাম স্টীমারঘাট। গিয়ে দেখি লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে—আমি লঞ্চের সামনের দিকটা আরাম করে বসলাম। লঞ্চ ছাড়লো ভোর সওয়া ৫-টায়। ভোরের হাওয়ায় এবং আগের দিনের পরিশ্রমে ওইখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। বেলা ৯-টার সময় ঘুম ভেঙ্গে দেখি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি। ওখান থেকে নৌকা করে বেশ কিছুদূর যেতে হবে।

সমস্ত দিন আর আমার কিছু খাওয়া হল না। আমার জন্য ওরা যা খাবার এনেছিল, তার ঢাকা খুলে দেখি খাবারের ওপরে লাল হয়ে একপুরু ধুলো জমে আছে। আমি আর তা খেলাম না—এমন কি জল পর্যন্ত না। তারপর বেলা তিনটের সময় বালিয়াটি পৌঁছলাম। তারপর আবার ওখান থেকে ২৫ মাইল বাসে ভ্রমণ। ফরিদপুর পৌঁছলাম ৫টার সময়। গিয়ে দেখি প্রবোধবাবু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। উনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচি ও বেগুন ভাজা করালেন। আমি স্নান করে এসে খেলাম। তারপর রাত্রি ৯টা থেকে অভিনয়—'কর্ণার্জুন'। শেষ হল রাত্রি আড়াইটায়।

তার পরদিন হল 'পথের দাবী'। এবং 'পথের দাবী' শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার রওনা হলাম কলকাতার উদ্দেশে।

কলকাতায় পৌঁছেই নাট্যভারতীতে 'সংগ্রাম ও শান্তি'। এদিকে নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার'-এর শ্যুটিং শুরু হল ফণী মজুমদারের পরিচালনায়। গায়ক ও সুরকার পঙ্কজ মল্লিক এই ছবিতে অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেলেন, সেই সঙ্গে সুদর্শন নায়ক জ্যোতিপ্রকাশ ও নায়িকা ভারতীরও অভিনয়জগতে প্রবেশ; পরবর্তীকালে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখলেন।

আমাদের থিয়েটারের হাবুলের কথা আগে বলেছি আপনাদের। ১১ তারিখে তার একমাত্র পুত্র এক মোটরদুর্ঘটনায় মারা গেল। হাবুল আমাদের সকলেরই খুব প্রিয়পাত্র ছিল, সুতরাং তার এ রকম একটা দুর্ঘটনায় আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল।

১২ই ফেব্রুয়ারী নিরঞ্জন পালের পরিচালনায় তাঁরই লেখা গল্প 'শুকতারা'-র শুভ-মুহূর্ত উৎসব সম্পন্ন হল বারাকপুরের ফিল্ম প্রোডিউসার্স স্টুডিওতে। আমার বিপরীতে ছিল চন্দ্রাবতী।

নাট্যভারতীতে 'তটিনীর বিচার' এবং 'সংগ্রাম ও শান্তি' যথারীতি চলছিল। এদিকে নাট্যনিকেতন তখন কলকাতায় থেকে বাইরের 'শো' করার দিকেই নজর দিয়েছিল বেশী।

১৪ই ফেব্রুয়ারী আসানসোলে গেলাম—সেখানে হল 'কর্ণার্জুন'—নিউ এম্পায়ার সিনেমায়। ১৬ তারিখে হল 'পথের দাবী'। 'পথের দাবী' আমরা কলকাতায় করতাম ঘূর্ণ্যমান (Revolving) মঞ্চে, কিন্তু মফঃস্বলে, যেখানে স্টেজই নেই—সিনেমাকে স্টেজে রূপান্তরিত করে অভিনয় করতে হয়,—সেখানে অসুবিধা হয়ই। তবু তারই মধ্যে সমস্ত মানিয়ে নিতে হল।

অভিনয় শেষ করেই শেষ রাত্রে ট্রেন ধরে হাওড়া চলে এলাম। আমাকে আসতেই হবে—কারণ পরদিন আমার নাট্যভারতীতে প্লে আছে—'সংগ্রাম ও শান্তি'।

সকাল বেলায় হাওড়া স্টেশনে এসে দেখি—সে এক বিপদ। হাওড়া ব্রিজ খুলে দেওয়া হয়েছে। তরুণ পাঠক-পাঠিকারা হয়ত অবাক হচ্ছেন শুনে যে, ব্রিজ খুলে দেওয়াটা কি ব্যাপার! তাহলে ব্যাপারটা বুঝিয়েই বলছি, শুনুন।

আজকাল যে ব্রিজটি দেখছেন সেটি তৈরী হয়েছে ১৯৪১ সালে। তার আগে কাঠের সেতু ছিল, জাহাজ যাবার সময় প্রতিদিনই একবার করে খোলা হত। অর্থাৎ ব্রিজটি এমনভাবে তৈরি ছিল যে মাঝের অংশটি সরিয়ে নেওয়া যেত। তারপর প্রয়োজন মিটে গেলে আবার যুক্ত করা হোত। ব্রিজ খোলার সময় প্রতিদিন কাগজে বিজ্ঞাপিত হত। প্রায় ঘণ্টা ২।৩ কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। এই সময় ফেরী স্টীমার ছিল, যাদের প্রয়োজন খুব বেশী এবং দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা যাদের পক্ষে সম্ভব হত না, তারা এই ফেরী স্টীমার কিংবা নৌকায় পারাপার হত।

আমিও তাই করলাম, অতক্ষণ অপেক্ষা করার চেয়ে স্টীমারে কোন মতে দাঁড়িয়ে গঙ্গা পার হয়ে কলকাতার মাটিতে এসে নামলাম।

কয়েকদিন পরে আবার নাট্যনিকেতনের হয়ে গেলাম বহরমপুর। সেখানেও একটি সিনেমা-হাউসের স্টেজ নিয়েই আমাদের কাজ করতে হল। উমা ভাদুড়ী আমাদের আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন নি। ডাকবাংলোয় আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হল। দলের অন্যান্য লোকজন আগেই চলে গিয়েছিল, আমি ২৭ তারিখে বেলা বারোটার ট্রেনে রওনা হলাম—কিন্তু পথে হল দেরি। মাঝপথে ট্রেন লেট করায়

যখন বহরমপুর পৌঁছলাম, তখন ৮টা বেজে গেছে, সুতরাং ধুলো পায়েই একেবারে স্টেজের ভিতরে মেক-আপ রুমে। প্রথম দিনই 'পথের দাবী'। রাত্রি প্রায় ২টার সময় অভিনয় ভাঙ্গল, তারপর ডাকবাংলোয় গিয়ে বিশ্রাম আর হল না—সামান্য কিছু মুখে দিয়ে একেবারে ঘুম।

পরদিন হবে 'সাজাহান' অভিনয়।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভাবলাম অভিনয় তো সেই রাত্রে, দিনের বেলাটা কাটাই কি করে? ২।১ জন শিল্পী এসে আমায় ধরল: দাদা, 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয় করি, আর সিরাজের দেশে এসে তার প্রাসাদ, কবর—এই সব স্মৃতিগুলো দেখে আসি, চলুন।

কথাটা আমারও খুব মনে ধরল, আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম: ঠিক আছে, চল, ঘুরে আসি—তোমরা প্রবোধবাবুকে বলে একখানা গাড়ী যোগাড় কর দেখি।

গাড়ী যোগাড় হয়ে গেল। আমি এবং আরও দলের তিনজন এই চারজনে বেরিয়ে পড়লাম বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখে আসতে। দেখলাম মতিঝিল, মুর্শিদকুলি খাঁর কবর, ইমামবাড়া, খোশবাগ যেখানে সিরাজ, লুৎফা ও আলিবর্দীর কবর সযত্নে রক্ষিত আছে। এই সব জায়গায় এলে, আর কিছু হোক বা না-হোক, মনটা খুবই উদাস হয়ে যায়। সিরাজের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্বন্ধ নেই, কিন্তু আছে আত্মিক সম্বন্ধ। সিরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হল, বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিল, যাদের তাড়াতে আমাদের ২০০ বছর সময় লাগল।

যাক, সব দ্রষ্টব্য দেখে সন্ধ্যার মধ্যেই ডাকবাংলোয় ফিরে এসে যথাসময়ে আসরে নামলাম এবং 'সাজাহান' অভিনীত হল।

অভিনয় শেষে সেই রাত্রেই আবার কলকাতা রওনা হলাম।

২রা ও ৩রা মার্চ নাট্যভারতীতে 'সংগ্রাম ও শান্তি' করে আবার ৪ তারিখে খড়্গপুরে নাট্যনিকেতনের হয়ে 'পথের দাবী' করলাম। অভিনয়ান্তে সেই রাত্রেই আবার কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

একদিন শ্রীভারতলক্ষ্মীর মালিক বাবুলালজী সন্ধ্যার সময় আমায় ডেকে পাঠালেন। গেলাম। যেতেই বাবুলালজী বললেন, আসুন দাদা, আসুন! আপনার একটা পার্ট আছে—

আমি বললাম: কি পার্ট—কি ছবি—কে ডাইরেক্টার?

বাবুলালজী বললেন: বুড়োদার ছবি—'অবতার'।

বুড়োদা মানে, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, আমায় পার্টটা বুঝিয়ে দিলেন।

যাক, আমার 'অবতার'-এর কনট্রাক্ট হয়ে গেল।

এরপর পড়ল শিবরাত্রি। আর শিবরাত্রি মানেই তো জানেন থিয়েটারওয়ালাদের পোয়াবারো। অর্থাৎ ৪।৫ খানা নাটক একসঙ্গে প্রোগ্রামে ফেলে টিকিটের দাম বাড়িয়ে সারারাত্রি অভিনয়ের আয়োজন করে দর্শক টানা। এই বছর আমি একটা রেকর্ড করলাম। নাট্যভারতী, নাট্যনিকেতন ও মিনার্ভা—তিন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষই এমন সব নাটক নির্বাচন করলেন যে সে-সব নাটকে আমার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আমি তিন জায়গাতেই রাজী হয়ে গেলাম। সেই মত নাটক সাজানো হল।

প্রথমে নামলাম নাট্যভারতীতে সন্ধ্যা ৬-৩০টায়—এখানে হলো 'তটিনীর বিচার'; তারপর নাট্যনিকেতনে হল 'কর্ণার্জুন' রাত্রি ১২-৩০টা থেকে এবং শেষ কিস্তিতে হল 'চাঁদ-সদাগর' মিনার্ভাতে।

এখানে একটু বলবার আছে। 'তটিনীর বিচার' শেষ করে যখন নাট্যভারতী থেকে বেরুতে যাব, এমন সময় এল প্রবল বৃষ্টি। আর আপনারা তো জানেন, ঠনঠনিয়া কালীতলার অবস্থা। কিন্তু আমাকে যেতে তো হবেই। কথা দিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হইনি, এমন ঘটনা আমার অভিনয় জীবনে বিরল। অথচ এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে না পাই ট্যাক্সি, না পাই কোন কিছু। এদিকে নাট্যনিকেতন থেকে ক্রমাগত ফোন আসছে। তাদের প্রথম নাটক শেষ হয়ে গেছে, এখন কর্ণার্জুনের জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই।

শেষ পর্যন্ত একটা রিকৃশা পেলাম। রিকৃশা চেপে সুকিয়া স্ট্রীট দিয়ে চলেছি, এমন সময় একটা ট্যাক্সি পেলাম। ট্যাক্সিতে উঠতে যাবো, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবোধবাবুকে দেখলাম গাড়ী নিয়ে আসছেন। আমাকেই আনতে যাচ্ছিলেন প্রবোধবাবু।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে প্রবোধবাবুর গাড়ীতেই চলে এলাম নাট্যনিকেতনে।

নাট্যনিকেতনে 'কর্ণার্জুন' শেষ হল রাত চারটেয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এখনো বাকী আছে, মিনার্ভায় 'চাঁদ-সদাগর'। সেখানে আমি নামভূমিকার অভিনেতা।

মিনার্ভায় 'চাঁদ-সদাগর' শেষ হল বেলা দশটায়।

এতোতেও ক্লান্তি নেই। ঐ দিনই বেলা ৫টায় নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার' ছবির শ্যুটিং ছিল। যথারীতি আমাকেও যেতে হল।

ক্লান্তি কি, জানতাম না সে সময়। রেসের ঘোড়াও বিশ্রাম পায়, কিন্তু বিশ্রামসুখ আমার জন্যে নয়।

দিন কয়েক পরে নাট্যনিকেতনের হয়ে বাঁকুড়ায় গেলাম অভিনয় করতে। সেখানে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অভিনীত হল 'সাজাহান', 'কর্ণার্জুন' আর 'পথের দাবী'।

অভিনয় উপলক্ষে গিয়েছি, তবু বিষ্ণুপুরটা বেড়িয়ে এলাম। বাঙলা সংস্কৃতির পীঠভূমি বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। দেখলাম, এখানকার বিখ্যাত মন্দিরগুলি। মন্দিরগুলি টেরাকাটা স্টাইলের। বীর হাম্বীরের দল-মাদল কামান দেখে বাঙালীর শৌর্যের কথা মনে পড়লো।

বিষ্ণুপুর ভালোই লাগলো সব মিলিয়ে। এখানেই আলাপ হয়েছিল স্থানীয় মহকুমা-হাকিম সাহিত্য-রসিক এবং সাহিত্যিক সুধাংশুকুমার হালদারের সঙ্গে। শ্রীযুক্ত হালদার একজন আই. সি. এস.।

বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় ফিরে কয়েকটি দিনের জন্যে 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকে অভিনয়। তারপর আবার কলকাতার বাইরে যাবার পালা।

এবারে দিলওয়ার হোসেনের সঙ্গে গেলাম পূর্ব-বাংলার বগুড়ায়। স্থানীয় এডওয়ার্ড হল সিনেমার মঞ্চে 'সাজাহান' অভিনীত হল।

বগুড়ায় প্রথমে ডাকবাংলোয় থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু বাংলোয় থাকা আর হল না। সেখানে আগে থেকে ভিড় জমে গেছে শিল্পীদের জন্যে। ভিড় বলতে রীতিমতো জনতা। শেষটা থিয়েটারের উদ্যোক্তারা আমাদেরকে নিয়ে এলেন রেল স্টেশনের কাছেই একটা নতুন বাড়ীতে। আপাতত জনতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

অভিনয় করতে যেখানেই যাই না কেন, কাছাকাছি দর্শনীয় কিছু থাকলে না দেখে ফিরি না। এখানে দেখলাম মহাস্থানগড। পূর্বে এখানে পরশুরাম নামে এক রাজার রাজধানী ছিল। তার ধ্বংসাবশেষও বর্তমান। অনেকের কাছে শুনলাম, এই পরশুরাম নাকি মহাভারতে বর্ণিত পরশুরাম। সত্যিমিথ্যে জানি না। এসব যাচাই করার স্পৃহাও আমার নেই।

বগুড়ায় আর একটি দর্শনীয় স্থান নীলাদেবীর ঘাট। অতীত দিনের কোন এক সতী নারীর আত্মত্যাগের মহিমা এই ঘাটের সঙ্গে জড়িত। অনেকটা 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটকে বর্ণিত ঘাটের মত আর কি!

যদিও কলকাতায় ফিরলাম, কিন্তু ফিরেই খবর পেলাম, সেইদিনই আমাদের যেতে হবে বসিরহাট হয়ে ধলতিথার কাছে ইছামতী পেরিয়ে ইটিণ্ডায়। সেখানে 'মিশরকুমারী' অভিনয় হবে। তখন জানলাম না, পরে শুনেছি ধলতিয়াই নাকি রসরাজ অমৃতলালের পৈতৃক বাসভূমি।

ইটিণ্ডার পথে যখন রওনা হলাম, তখন আকাশে প্রচণ্ড মেঘ জমেছে। ঝড়-বৃষ্টি হবে বলেই মনে হল।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগলো মোটরে ইটিণ্ডার খেয়াঘাটে পৌছতে। ইছামতী পেরিয়ে যখন ইটিণ্ডায় পৌছলাম, তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। গিয়ে দেখলাম, একটা স্কুল-বাড়ীর প্রাঙ্গণে মঞ্চ তৈরী হয়েছে। স্কুলবাড়ীর মধ্যে টিকিট বিক্রি হচ্ছে। আর সাজঘর করা হয়েছে একটা বাড়ীর দাওয়া ঘিরে নিয়ে।

মেক-আপ সেরে যখন মঞ্চে পৌছলাম, তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে। তবু অভিনয় শুরু হল রাত নটার সময়। কোনমতে একটা অঙ্ক হল। কিন্তু তারপর আরম্ভ হল মুষলধারায় বৃষ্টি। স্টেজ, প্যাণ্ডেল সব ভেসে গেল বৃষ্টিতে। সেই যে নাটক বন্ধ হল, আর আরম্ভ করা গেল না।

সেদিন সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছিল। ভোরে ইটিণ্ডা থেকে বেরিয়ে কলকাতায় এসে পৌছেছিলাম বেলা দশটায়।

'সংগ্রাম ও শান্তি'র সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হল ২২ তারিখে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন ব্যারিস্টার এস. এন. ব্যানার্জী। সুবর্ণজয়ন্তীর স্মারক অভিনয়ে সেদিন নাটকের শিল্পীদের পুরস্কৃত করা হয়েছিল।

এইদিন এত আনন্দের মধ্যেও একটি দুঃসংবাদ আমার মনের মধ্যে কাঁটার মত খচ-খচ করছিল। তা হ'ল রসরাজ অমৃতলাল বসুর পুত্র ক্ষেত্রমোহন বসুর পরলোকগমন। আমি যখন ডালিমতলা লেনে ছিলাম, তখন এঁরাই ছিলেন আমার পাশের বাড়ীতে। ক্ষেত্রবাবু ও তাঁর পরিবারের বন্ধুবাৎসল্য ও সহৃদয়তা কোনদিন ভুলবার নয়। ক্ষেত্রবাবুর আকস্মিক পরলোকগমন আমাকে খুবই আঘাত দিয়েছিল।

২৬ তারিখে গেলাম গাইবান্ধা প্রবোধবাবুর দলের হয়ে। এখানে হল 'সাজাহান'। এদিন এডমণ্ড টকীজ হলে অভিনয় হল। প্রচণ্ড ভিড়—বহু লোক টিকিট না পেয়ে ফিরে গেল বলে পরদিন 'পথের দাবী' অভিনয় হল ঐ হলের সংলগ্ন প্যাণ্ডেল বেঁধে। অভিনয় খুব ভালো হলো বটে কিন্তু সেই রাত্রেই আমাকে কলকাতা চলে আসতে হল, কারণ নাট্যভারতীতে 'তটিনীর বিচার' তখন সমানে চলছে। এইদিন ছিল ৯৮তম রজনী।

অভিনয় শেষ করেই আবার সেই রাত্রেই গাইবান্ধা রওনা—পরদিন ২৯ তারিখে পৌছলাম এবং 'কর্ণার্জুন' অভিনীত হল। অভিনয় শেষ করে আবার সেই রাত্রেই কলকাতা রওনা হলাম। পরদিন কলকাতায় পৌছেই আবার 'সংগ্রাম ও শান্তি' অভিনয় নাট্যভারতীতে।

অর্থাৎ আমি এইটাই বলতে চাচ্ছি যে, কলকাতার অভিনয় আসরগুলিকে ঠিক

চালু রেখে এবং একদিনও অনুপস্থিত না হয়ে বাইরের 'খেপ'গুলিতে যতদূর সম্ভব চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। আজ বলতে বাধা নেই, এত যে দৌড়ঝাঁপ করতাম তার জন্য কখনও ক্লান্তি বোধ করিনি। অবসাদ এসে কোনদিনও মনকে গ্রাস করেনি।

১লা এপ্রিল তারিখে ভারতলক্ষ্মীতে 'অবতার'-এর শ্যুটিং সেরে রাত্রের ট্রেনে রওনা হলাম লালমণিরহাট। এটাও প্রবোধ গুহমশায়ের দলবর্তী হয়ে যেতে হয়েছিল। ওখানে দুদিন (২রা ও ৩রা) তিনটি নাটক অভিনীত হল—প্রথম দিন হল 'সাজাহান'। পরের দিন 'সাজাহান' ও 'কর্ণার্জুন'। এখানে স্টেশনের পাশেই ডাকবাংলো, রেলওয়ে ইনস্টিট্যুটও একেবারে গায়ে গায়ে বললেই হয়। সব থেকে আমার ভাল লেগেছিল লালমণিরহাট স্টেশনের বিরাট ইয়ার্ডটি। কত ট্রেন আসছে, যাচ্ছে,—মালগাড়ী, প্যাসেঞ্জার, মেল ট্রেন—কত যাত্রী উঠছে নামছে—ট্রেনের হুইসিল, ইঞ্জিনের হুইসিল, লোকজনের চিৎকার, কুলীদের চিৎকার—সব মিলেমিশে একটা অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। পূর্ব-বাংলায় বোধ হয় এইটাই সবচেয়ে বড় রেলওয়ে ইয়ার্ড। রাত্রে অভিনয় শেষে স্টেজের একটা উইংসের দিকে দরজা-জানালা খুলে দিয়ে চুপচাপ একা বসে থেকেছি—কি রকম একটা অদ্ভুত স্বপ্নময় মনে হত সমস্ত পরিবেশটাকে। ডাক-বাংলোয় ফিরে এসেও—পেছনের জানালার ধারে বসে এ দৃশ্য দীর্ঘ সময় ধরে দেখেছি এবং উপভোগ করেছি।

৪ তারিখে ফিরে নাট্যভারতীতে যথারীতি 'তটিনীর বিচার' এবং 'সংগ্রাম ও শান্তি' চলতে লাগল। ১০ তারিখে রঙমহলে রঙমহলের শিল্পীবৃন্দ আমাকে নিয়ে 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয় করলেন। এতে কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভূমেন রায়, রবি রায়, মনোরঞ্জন, প্রভাত সিংহ, শান্তি গুপ্তা প্রভৃতি ছিলেন।

১১ তারিখে 'তটিনীর বিচার'-এর শততম অভিনয়-উৎসব উদ্‌যাপিত হল। প্রচুর ফুল উপহার দিয়ে কর্তৃপক্ষ এবং গুণগ্রাহী দর্শকরা শিল্পীদের অভিনন্দন জানালেন।

১৩ তারিখে নাট্যভারতীতে প্রথম হল 'চিরকুমার সভা' বেলা ৪টায়। আমি —চন্দ্রবাবু, দুর্গাদাস—পূর্ণ, তিনকড়িদা—অক্ষয়, যোগেশবাবু—রসিক। খুব জমেছিল অভিনয়। তারপর হল রাত্রি ৮-৩০টার সময় 'সংগ্রাম ও শান্তি'।

যদিও 'সংগ্রাম ও শান্তি' ভালই চলছিল, তবু কর্তৃপক্ষ নতুন নাটক তৈরী করতে লাগলেন। শচীনবাবু ইতিমধ্যে আর একখানি নাটক লিখেছেন এবং কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদনও করেছেন—এই নাটকখানির নাম হল 'নার্সিংহোম'। বাজারে পোস্টার ছাড়া হল আমার ও দুর্গাদাসের নাম দিয়ে।

১৭ তারিখে রংমহলে হল 'চন্দ্রগুপ্ত'। নরেশবাবু—চাণক্য, আমি—সেলুকাস। রবি, ভূমেন এরাও ছিল।

এর পর কয়েক রাত্রি শিল্পীদের সম্মান-রজনী উপলক্ষে কতগুলি পুরোনো বই-এর সম্মিলিতভাবে পুনরভিনয় হল। প্রথমে হল ১৯শে এপ্রিল ভূমেনের সম্মান-রজনী রঙমহলে'—'কেদার রায়' ও 'চরিত্রহীন'। ছুটি নাটকেই আমি ছিলাম।

তারপর হল ২৩শে এপ্রিল স্টারে সরযূবালার সম্মান-রজনী। এখানে হল 'চন্দ্রশেখর' ও 'সাজাহান'। আমি 'চন্দ্রশেখর' এবং 'সাজাহান'-এর নামভূমিকায়।

তারপর ৬ই মে হল রঙমহলে যোগেশ চৌধুরী মশায়ের সম্মান-রজনী—এদিনে হল 'প্রতাপাদিত্য' ও 'মহানিশা'। তারপর দিন অর্থাৎ ৭ তারিখে মিনার্ভায় সনৎ মুখোপাধ্যায়ের সম্মান-রজনী। এখানে হল 'সাজাহান' ও 'কিন্নরী'। এক 'কিন্নরী' ছাড়া সব নাটকেই আমি ছিলাম।

২৫ তারিখে প্রবোধবাবুর দলের হয়ে গেলাম রংপুরের টেপা নামক একটা জায়গায়। এখানকার জমিদারবাড়ীর বিরাট নাটমণ্ডপে স্টেজ বেঁধে অভিনয় হল 'সাজাহান'।

২৯ তারিখে গেলাম কলকাতার কাছাকাছি একটি গ্রামে—নাম সীতাপুর, মার্টিনের ট্রেনে যেতে হয়। সেখানে হল 'মন্ত্রশক্তি'। অভিনয় শেষে ফিরে আসবার কোন উপায় ছিল না—তাই বাধ্য হয়ে সেখানে রাত্রিবাস করতে হল।

জীবনে এত জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু এমন মশার উৎপাত কোথাও দেখিনি।

'তটিনীর বিচার' একটি মঞ্চসফল নাটক। এর চিত্ররূপও সমান সুখ্যাতি অর্জন করলো। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ৪ঠা মে রূপবাণী চিত্রগৃহে।

আরো একটি 'কমলে কামিনী'—যে ছবিটির পরিচালক প্রফুল্ল ঘোষ মারা গিয়েছিলেন ছবির কাজ অসমাপ্ত রেখে, সেই ছবিটি এতোদিনে সম্পূর্ণ হয়ে মুক্তি পেল ১১ই মে তারিখে। এই প্রসঙ্গে প্রফুল্লর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা না জানিয়ে পারছি না। প্রফুল্ল ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের 'চিত্র'-জীবন শুরু একই সঙ্গে। প্রথম জীবনে দু'জনে কতো কষ্ট স্বীকার করেছিলাম 'সোল অফ এ স্লেভ' ছবির জন্যে।

আজো যখন পুরনো কথার মধ্যে প্রফুল্লকে মনে পড়ে, তখনই মনটা শূন্য হয়ে যায়। ভাবি, প্রফুল্ল থাকলে সে আজ কতো বড়ো হতো। তার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল।

শুধু কি এক প্রফুল্ল, কতোজন এমনি করে অকালে হারিয়ে গেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু সেদিনের সাক্ষী হয়ে আজো আমি আছি।

যাইহোক, ভালোমন্দ মিশিয়ে দিন একরকম চলছিল। এর মধ্যে খবর পেলাম শ্রীমধু বসুর কাছ থেকে। মন্মথ রায়ের রাজনটী নিয়ে ছবি করছেন মধুবাবু। আমার কাছে অনুরোধ এলো রাজগুরুর ভূমিকাটি করার জন্যে। 'রাজনটী' নাটকে আমি মধুবাবুর পরিচালনায় সি. এ. পি.-র হয়ে অভিনয় করেছি। এবারের অনুরোধও অভিনয় করার—'রাজনটী'-র হিন্দী এবং বাংলা দুটি সংস্করণেই। শুধু হিন্দী, বাংলা নয়, ইংরেজীতেও মধুবাবু ছবিটি করেছিলেন। নাম 'কোর্ট ডান্সার'। বাংলা ও হিন্দী ছবির নামকরণ হয়েছিল 'রাজনর্তকী'।

মধু বসু এবং সাধনা বসু তখন বোম্বাইতে আছেন ছবির কাজে। সেই সঙ্গে মন্মথবাবুও। এই ছবির ব্যাপারে মন্মথবাবুর কাছ থেকেও চিঠি পেলাম। সে দীর্ঘ চিঠির কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

'You know how anxious we are to get you as a pillar of strength for our pictures. We missed you so greatly in 'Kumkum'. Let us not miss you in 'Rajnatee', which is going to be quite an ambitious venture.

Here are some of the strong points why you should not turn down Mr. Bose's proposal.

Firstly, the period of your stay in Bombay should not exceed three months. Mr. Bose will see to that. And it is not impossible for you to manage all absence from Calcutta for three months provided it means no loss for you, rather a gain.

Secondly, it may be arranged to pay you more than your ordinary and usual minimum monthly income of Rs. 2000/-..................'

এ ছাড়া চিঠিতে আরো অনেক কথা লিখেছিলেন মন্মথবাবু। বোম্বাই গেলে কাজের মধ্যে কিছুটা বিশ্রাম যেমন পাবো, তেমনি বোম্বাই বেড়ানো হবে। তাছাড়া সেখান থেকে দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের কাজটাও চুকিয়ে নিতে পারবো।

শুধু আমাকে নয়, মন্মথবাবু আমার স্ত্রীকেও একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। চিঠি লেখার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, মন্মথবাবু বেশ ভালো করেই জানেন, আমার স্ত্রীর দেশভ্রমণের নেশা প্রবল। বিশেষ করে তীর্থের পথ হলে তো কথাই নেই।

লাভ-ক্ষতির কথা হিসেব করলে, বোম্বে গেলে আমার আর্থিক দিক থেকে লোকসানই হয়। তবু শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম। তার প্রধান কারণ, বোম্বে গেলে

কিছুটা বিশ্রাম পাবো, যেটি আমার একান্ত দরকার। আর খানিকটা দেশভ্রমণ তো হবেই।

তবে মধুবাবুকে একটা কথা জানিয়ে দিলাম। কলকাতায় অনেক কাজ বাকি আছে, বিশেষ করে কয়েকটা ছবির কাজ হাতে রয়েছে, সেগুলো শেষ না করে যেতে পারবো না।

আমার কথায় রাজী হলেন মধুবাবু।

গ্রাণ্ড হোটেলে মধুবাবুর ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। সেখানে ছিলেন ওয়াদিয়া মুভিটোনের লালজী হেমরাজ হরিদাসের একজন প্রতিনিধি।

মধুবাবু বললেন, আপনার 'সেট' পড়তে এখনো দেরি আছে। সুতরাং আপনার হাতের কাজ শেষ করে নিন এর মধ্যে। আর সেট পডার আগে আপনাকে আমি জানিয়ে দেব।

যাক, সেদিন এইরকমই একটা ব্যবস্থা হয়েছিল।

মধুবাবুর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হল ৯ই আগস্ট। তার পরদিনই পেলাম মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক হিমাংশু রায়ের মৃত্যুতে ভারতের চিত্রজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। হিমাংশু রায় চিত্রজগতের ধ্রুবতারা। তাঁর 'লাইট অফ এশিয়া', 'সিরাজ', 'থ্রো অফ এ ডাইস', 'কর্ম' প্রভৃতি ছবি সারা পৃথিবীতে যে সমাদর লাভ করেছিল, তা তখনকার দিনে অভূতপূর্ব। সে সময় বোম্বাই-এ বম্বে টকীজের প্রতিষ্ঠা করে হিন্দী ছবিকে অ-হিন্দীভাষীদের কাছে জনপ্রিয় করার কৃতিত্ব বহুলপরিমাণে তাঁরই প্রাপ্য।

পরদিন রংমহলে হল 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'মাটির ঘর' অভিনয়। এই দুটি নাটকেই অভিনয় করে চলে গেলাম শিয়ালদহ স্টেশন—রাত্রি ১২-টার পর সেখানে হল 'ডাক্তার'-এর শুটিং। রাত্রি ১২-টার পর আর কোন যাত্রীবাহী ট্রেন স্টেশনে আসে না —লোকজনের ভিড়ও বিশেষ থাকে না—সেই সময়ে রেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে প্লাটফর্মের ভেতর ট্রেন থেকে নামা-ওঠা এবং কতকগুলি দৃশ্য তোলা হল। শুটিং শেষ করে বাড়ী পৌঁছলাম যখন, তখন ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টা বাজছে।

এর আগে ১৫ই মে তারিখে রংমহল কর্তৃপক্ষ নাট্যকার আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'আগামীকাল' নামক একখানি নাটক খুললেন। 'উমাপ্রসন্ন'-র চরিত্রটির জন্য প্রভাত সিংহ আমায় খুব ধরলো। আমি রাজী হলাম এক শর্তে—নাট্যভারতীতে 'তটিনীর বিচার' ও 'সংগ্রাম ও শান্তি'তে আমি যে রকম অভিনয় করছিলাম—তা করে যাব। ঠিক হল যে শনি ও রবিবার-এর নাট্যভারতীর প্রোগ্রাম ঠিক রেখে শুধু বুধবার দিন রংমহলে অভিনয় করব। সেই রকমই করতে লাগলাম।

এরপর ২৬ তারিখে নাট্যভারতীতে হল 'প্রফুল্ল'-র সম্মিলিত অভিনয়—তারপর 'সংগ্রাম ও শান্তি'।

এর দুদিন পরে ২৮ তারিখে গেলাম পাবনায়। স্থানীয় টাউন হলে অভিনয় হল 'সাজাহান'। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আবার কলকাতা ফেরার পালা। আসবার সময় সুলাল (জহর গাঙ্গুলী) এক কাণ্ড করে বসল। স্টীমারে দারুণ ভিড়। একটি অল্পবয়সী মুসলমান মেয়ে—সম্ভবতঃ কলেজের ছাত্রী—একা-একাই কলকাতায় আসছিল। হঠাৎ সুলাল একটু বেশী মাত্রায় মনোযোগী হয়ে উঠল। শিল্পীসম্প্রদায়ের ওপর সাধারণ ছেলে-মেয়েদের আকর্ষণ একটু বেশী হয়ে থাকে। সুতরাং তাকে আমাদের কামরায় এসে বসতে বলায় সে ভিড়ের হাত থেকে তো রক্ষা পেলই—তাছাড়া বাংলাদেশের নামকরা শিল্পীদের সঙ্গে ভ্রমণ করা কি কম সৌভাগ্যের কথা! কলকাতার কাছাকাছি ট্রেন এসে পৌছবার সময় সুলালকে একটু কাছে ডেকে চুপি-চুপি বললাম: আর কেন? বেচারীকে এবার রেহাই দাও।...ও কোন্ সম্প্রদায়ের লোক জান তো? বোরখা ছেড়ে তোমার সঙ্গে যে কথা বলছে, এই না কত! এর ওপর একটু বেচাল দেখলে মজাটা টের পাইয়ে দেবে।

সুলাল তাচ্ছিল্যভরে কথাটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল: কি যে বলেন দাদা। শেয়ালদা পৌছুলে হয় একবার। তারপর কে কার, কে তোমার।

যেদিন ফিরলাম সেই দিনই অর্থাৎ ২৯ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় 'আগামী-কাল' অভিনয়।

এর আবার কয়েকদিন পরে নাট্যনিকেতনের তরফ থেকে গেলাম পাকশী রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে, হল 'সাজাহান' অভিনয়। এসব নাটক তো রংয়ের তুরুপ—অভিনয় হলেই জমতে বাধ্য।

পাকশী থেকে ফিরেই সেইদিন (৪ঠা জুন) রঙমহলে দুখানি বড় বড় নাটকেই আমি নামলাম—'মন্ত্রশক্তি' ও 'চরিত্রহীন'। আমার সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রে নেমেছিল নির্মলেন্দু, সরযু, নরেশদা, যোগেশবাবু, ভূমেন, রবি, নিভাননী প্রভৃতি। অভিনয় শেষ করে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন রাত্রি দুটো।

এর পর 'নাট্যভারতী'তে ১৩ই জুন খুলল শচীন সেনগুপ্ত মশায়ের 'নার্সিং-হোম'। আমি 'নার্সিংহোম'-এ কোন ভূমিকা নিতে প্রথম অস্বীকার করি, কারণ আমার বম্বে যাওয়ার কথা—শুধু কয়েক রাত্রি নেমে, তারপর ছেড়ে দেওয়ার ফলে হয়ত নাটকখানি 'মার' খেয়ে যাবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নাছোড়বান্দা—আমাকে

'বিক্রমাদিত্য'-এর ভূমিকা নিতেই হল। নায়িকা কুন্তলার ভূমিকা করেছিল রাণীবালা।

নাটকখানি জমেছিল খুবই। দর্শক ও সমালোচক সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। দীর্ঘদিন পরে আবার শিশিরবাবুর সঙ্গে একসঙ্গে অভিনয় করলাম 'আলমগীর'-এ; এটা একটা বিশেষ অভিনয়-রজনী ছিল। এতে শিশিরবাবু, আমি এবং দুর্গাদাসও ছিল।

৬ই জুলাই রূপবাণীতে নিরঞ্জন পালের ছবি 'শুকতারা' মুক্তিলাভ করল। গল্প-লেখক হিসাবে মিঃ পালের খ্যাতি শুধু এদেশেই নয়, সাগরপারেও বিস্তৃত। দীর্ঘদিন ধরে তিনি চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত; এর আগেও কয়েকখানি ছবির পরিচালনা করেছিলেন, তবে 'শুকতারা'ই আমার মনে হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি।

এরপর কয়েক রাত্রি শিশিরবাবুর দলের সঙ্গে সম্মিলিত অভিনয় হল। এক দিন হল 'ষোড়শী' (৯-৭-৪০), আর এক দিন হল 'সীতা' (১২-৭-৪০)। এই দুটি অভিনয় রজনীতেই শিল্পীরা ছিলেন শিশিরবাবু, আমি, যোগেশ চৌধুরী, বিশ্বনাথ, ছবি বিশ্বাস, প্রভা, রবি, পুতুল, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি।

এই সময় আমার একটি বিশিষ্ট বন্ধু গণদেব গাঙ্গুলীর দাদা স্বরদেব গাঙ্গুলী ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন তাঁর সাধনোচিত ধামে। ইনি ছিলেন তদানীন্তন কালের এমারেল্ড প্রেসের মালিক। গণদেব ছিলেন নাট্যরসিক ও নাট্য-উৎসাহী। এঁরা দুজনেই প্রেস চালাতেন। ডি. এল. রায় স্ট্রীটে ছিল এই এমারেল্ড প্রেস এবং তাঁরা থাকতেনও ঐ বাড়ীতে। স্বরদেবের মৃত্যুতে আমি খুবই আঘাত পেয়েছিলাম।

১৬ জুলাই তারিখে আবার একবার সম্মিলিত অভিনয় হল মিনার্ভায়—নাটক ছিল 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'সাজাহান'।

তখনও 'নাট্যভারতী'তে 'সংগ্রাম ও শান্তি' যথারীতি চলছে; একদিন হঠাৎ রাণীবালা অসুস্থ হয়ে পড়ল; কিন্তু শেষমুহূর্তে 'প্রতিমার' চরিত্র কে করবে? কেউ সাহস করে না—খুবই মুশকিলে পড়ে গেলাম। দুপুরবেলায় ডেকে পাঠান হল সুহাসিনীকে (বর্তমানে নামকরা শিল্পী নীলিমা দাসের মা)। মাত্র কয়েক ঘণ্টার রিহার্সাল দিয়ে সুহাসিনী সাহস করে নেমে গেল। আর বলতে বাধা নেই, বেশ ভালই অভিনয় করল। নতুন বলে কোনরকম জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই। দর্শক-বৃন্দকে একেবারে বুঝতে দিলে না যে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে তাকে এই পার্ট তৈরী করতে হয়েছে।

এর পরদিন ছিল 'নার্সিংহোম'। সেদিনও রাণী নামতে পারল না। সেদিনও তার

ভূমিকাটি (মহামায়া) অন্য একজনকে দিতে হল। রাজলক্ষ্মী (বড) তখন অবশ্য ইদানীং কালের মত বিরাটদেহী ছিল না—সে-ই কোনরকমে কাজ চালিয়ে নিল। কিন্তু তার পরদিন রাণীবালার ভক্ত অনেক দর্শক রাজলক্ষ্মী মঞ্চাবতরণ করবে শুনে টিকিটের দাম ফেরত নিয়ে চলে গেল। প্রায় একশো টাকার টিকিটের দাম ফেরত দিতে হয়েছিল।

এদিকে বম্বে থেকে মন্মথ রায় ও মধুবাবুর ঘন-ঘন চিঠি আসতে লাগল বম্বে যাবার জন্যে। এতদিন তাঁরা আমাকে বাদ দিয়ে সে-সব দৃশ্য ছিল সেগুলির শুটিং করছিলেন—এবার আমাকে না হলে আর চলবে না। সুতরাং আমিও এখানকার কাজকর্ম সব শেষ করে যাবার জন্য তৈরী হতে লাগলাম।

২৩শে জুলাই মিনার্ভায় আমাকে এক বিদায়-সম্ভাষণ জানান হল। নবাব স্যর কে. জি. এম. ফারুকী সভাপতিত্ব করলেন। একটি সুন্দর রৌপ্যাধারে করে আমাকে একটি মানপত্র দিলেন মিনার্ভার শিল্পীরা ও কর্তৃপক্ষ। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য এই বিদায়-অভিনন্দনের পরে 'মিশরকুমারী' ও 'আত্মদর্শন' অভিনীত হল। আমি যথারীতি 'আবন' এবং নির্মলেন্দু লাহিড়ী 'সামন্দেশ' করল। 'আত্মদর্শন'-এ আমি 'মন' রাজা।

২৬ তারিখে আবার একবার শিশিরবাবুর সঙ্গে 'সীতা' অভিনয় করলাম। আমি করলাম 'শম্বুক'। এ অভিনয়ের আগে সকাল থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত 'ভারতলক্ষ্মী'তে 'অবতার'-এর শুটিং করেছি। তারপর স্টুডিও থেকে সোজা একেবারে নাট্যনিকেতনে।

অবশেষে বম্বে যাবার দিনস্থির হয়ে গেল। ৯ই আগস্ট। কিন্তু যাত্রার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যহ অভিনয় চলতে থাকল কোন-না-কোন থিয়েটারে। আমি যে কলকাতায় তিন মাসের মত থাকব না—তার জন্যে সব থিয়েটারই যেন আমাকে দিয়ে যতদূর সম্ভব কাজ করিয়ে নিতে চায়। আমিও কাউকে নিরাশ করিনি—সাধ্যমত সকলের অনুরোধই রাখতে চেষ্টা করেছি।

মঞ্চ ও চিত্র-জগতের বাইরের ব্যাপার হলেও একটি দিনের করুণ স্মৃতি বহুদিন আমার মনে কাঁটার মত খচ-খচ করেছিল। সেটি হল আই. এফ. এ. শীল্ড ফাইনাল খেলা এরিয়ান্স বনাম মোহনবাগানের। সেই স্মরণীয় খেলায় মোহনবাগান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল ৪—১ গোলে। যদিও এরিয়ান্স পুরোপুরি বাঙালী টিম, বাংলা দেশে ফুটবলের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে এরিয়ান্স তথা দুঃখীরামবাবুর অবদান অবিস্মরণীয়, তবু মোহনবাগানের এ দুর্ভাগ্যে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। হাজার হলেও আমাদের জাতীয় টিম বলতে মোহনবাগানকেই বুঝি।

সেদিন আর এক দুঃসংবাদের খবর পাওয়া গেল। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে আগুন লেগে বহু টাকার ক্ষতি হয়। অনেক নামকরা ছবির 'নেগেটিভ' পুড়ে যায়। এটাও একটা জাতীয় ক্ষতি—কারণ তখন সারা ভারতে বাংলার মুখোজ্জ্বলকারী চিত্র-প্রতিষ্ঠান ছিল নিউ থিয়েটার্স।

কিন্তু মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে আমাকে যেতে হল নাট্যভারতীতে এবং 'সংগ্রাম ও শান্তি'র ৮৩তম অভিনয় আসরে নামতেও হল রাত্রি সাড়ে ৭-টায়।

এর পরদিন ছিল ৮ই আগস্ট এবং সেই দিনই আমার কলকাতায় শেষ-রজনী। ভারতলক্ষ্মীর 'অবতারে'র কিছু শ্যুটিং বাকি ছিল, সেদিন তা শেষ করলাম। তারপর 'নাট্যভারতী'তে এসে দেখি সেখানেও বিদায়-সম্ভাষণের বিরাট আয়োজন। বম্বে যাত্রার প্রাক্কালে এ আমার 'শেষ অভিনয় রজনী'—এই মর্মে প্রচুর প্রাচীরপত্র পড়েছিল। সেদিনকার সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়।

পরদিন ৯ই আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় ই. আই. আর. বম্বে মেলযোগে বম্বে যাত্রা করলাম। এই উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শিল্পীদের ভিড়ে প্ল্যাটফর্ম ভর্তি। এদের মধ্যে যাদের কথা বেশি করে মনে পড়ছে তারা হল—অমর মল্লিক, ফণী মজুমদার, রতীন, সত্যেন ঘোষাল, বিমল ঘোষ, সুলাল, বিধু মল্লিক, দিলওয়ার হোসেন, বিজয় রায় ও আরো অনেকে। ফুলের মালায় ও অভিনন্দনে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। বিদায়বেলার এই ক্ষণগুলি মনের মধ্যে এমন দাগ কেটে যায় যে সহজে ভোলা যায় না। এ-দিনটিও আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

ট্রেন ছাড়বার আর অল্পক্ষণ বাকি। এমন সময় দেখি হন্তদন্ত হয়ে আসছে প্রবোধ গুহ মহাশয়ের ছেলে সুধীর। তার হাতে একটি ক্ষুদ্র হাঁড়ি। সুধীর আমাকে একখানি চিঠি দিল। প্রবোধবাবু লিখেছেন—

'তোমাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাতে আজ অনেকেই স্টেশনে গেছে—আমারও যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মন খুব কাতর হয়ে পড়ায় যেতে পারলুম না। তুমি যেটি খেতে খুব ভালবাস—তাই পাঠালুম। গ্রহণ করলে খুশী হব। তোমার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।'...ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাঁড়ি দেখে অনেকেই মনে করল যে, বুঝি রসগোল্লা আছে। দুই-একজন বলেও উঠল: দাদা, আপনি তো মিষ্টি খেতেন না—আবার ধরলেন কবে?

আমি বললাম: এখনও খাই না—ওতে মিষ্টি নেই—আছে বোধ হয় ফাউল রোস্ট—তাই না সুধীর?

সুধীর হেসে বলল : ঠিক ধরেছেন।

প্রবোধবাবু জানতেন ফাউল রোস্ট আমার খুব প্রিয়—এই ফাউল রোস্ট খাইয়ে উনি আমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছেন। আমি সুধীরকে বললাম : এইটে আমার সত্যিকারের লাভ হল। অন্যান্য বার ফাউল রোস্টের বিনিময়ে আমাকে কিছু-না-কিছু কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু এইবার কিন্তু কোন কাজ না করেই এটা পাওয়া গেল।

সকলেই খুব হেসে উঠল। তারপর আমি বললাম : দেখ, তোমার বাবার সঙ্গে আমার টাকা-পয়সা নিয়ে কোন কথাবার্তা কখনও হয় না—মানে দেনা-পাওনার কোন প্রশ্নই নেই তাঁর সঙ্গে—সেটা হয় তোমাদের সঙ্গে।

যাই হোক, এই রকম হাসি-খুশী ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে এক সময় ট্রেন ছেড়ে দিল।

ট্রেনের সেই কামরায় মাত্র আমি আর একজন অবাঙালী ভদ্রলোক। তিনিও নেমে গেলেন মোগলসরাই-এ, তারপর সমস্ত রাস্তাটাই কামরাটার মধ্যে আমি একা।

আর এই একা থাকার মানেই হল তুনিয়ার চিন্তা এসে মনের মধ্যে ভিড় করা। মনে পড়তে লাগল বাড়ীর কথা—স্ত্রীর কথা, ছেলে-মেয়ের কথা, বৃদ্ধা জননীর কথা—আরও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কথা। অভিনয়-জগতের বাইরেও যে একটা জগৎ আছে এবং আমরা যে আসলে সেই জগতেরই মানুষ, এ-কথাটা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

সংসার-তরণীতে ভেসে চলেছি, কিন্তু হাল ধরিনি কোনদিন—সেদিক দিয়ে আমার স্ত্রী সুধীরা সুদক্ষ নাবিকের মত সংসার-তরণী চালিয়ে নিয়ে যেতেন—কোনদিন আমাকে জানতে দেননি কিছু।

এদিকে মন্মথ রায় বম্বে থেকে আমাকে প্রায়ই চিঠি দিতেন। সত্যি কথা বলতে কি, অনেকটা তাঁর আগ্রহের জন্যেই কলকাতার সবকিছু ছেড়ে এই কণ্ট্রাক্ট সই করতে রাজী হয়েছিলাম। তিনি আমার জন্যে যে হোটেলটি ঠিক করেছিলেন, সেটির নাম হল 'হোটেল মেরিনা'—একেবারে সমুদ্রের ধারে মেরিন ড্রাইভের ওপর। ভারী সুন্দর জায়গা। একটি সম্পূর্ণ 'সুইট' মাত্র ২৫০৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঠিক হয়েছিল। যদিও আমি হোটেলে থাকার চেয়ে একটা ফ্ল্যাট নেবারই পক্ষপাতী ছিলাম, কিন্তু মনোমত ফ্ল্যাট না পাওয়ায় মন্মথ রায় আমার জন্যে হোটেলই বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। থাকা ও খাওয়ার খরচ বাবদ মাসিক ২৫০৲ টাকা এখন অবিশ্বাস্য শোনালেও তখন সেইটাকেই একটা মোটা অঙ্ক বলে ধরা হত।

মধুবাবুরাও থাকতেন আমার হোটেলের কাছাকাছি মাত্র কয়েকখানি বাড়ী পরে 'শ্যাটো মেরিন'-এ। এই জায়গাটি বোম্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজাত পল্লী—অনেক নামকরা এবং অভিজাত পরিবার থাকতেন এই মেরিন ড্রাইভের ওপর।

যাক, আমি তো ১১ই আগস্ট তারিখে বেলা ১০টার সময় বোম্বাই পৌছলাম। স্টেশনে মন্মথ রায় উপস্থিত ছিলেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে। তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন 'হোটেল মেরিনা'য় এবং ম্যানেজারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে, আমাকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে, তাঁর বাড়ী চলে গেলেন। মন্মথবাবু ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন 'প্যারেল'-এ।

পরদিন গেলাম মধুবাবুর সঙ্গে ওয়াদিয়া মুভিটোন স্টুডিও দেখতে। স্টুডিওর মালিক এবং 'রাজনর্তকী'-র প্রযোজক মিঃ জে. বি. এইচ. ওয়াদিয়ার সঙ্গে আলাপ হল। চমৎকার মানুষ মিঃ ওয়াদিয়া। পুরোপুরি ব্যবসাদার, অসাধারণ সৌজন্য-জ্ঞান তাঁর—এককথায় বলতে গেলে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। এ স্টুডিওতে তখনকার দিনে তোলা হত হাণ্টারওয়ালী, রোলস-রয়েস কী বেটি·· প্রভৃতি ছবি। এই প্রথম বিরাটভাবে সামাজিক ছবি তোলার আয়োজন—একেবারে তিনটি ভার্সান।

ওখানে অনেক পরিচিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের দেখতে পেলাম। দেখা হল সাগর মুভিটোনের মতিলাল, বুলবুল দেশাই, প্রতিমা দাশগুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে। প্রতিমা তো বাংলাদেশেই ছিল, ওর সঙ্গে কয়েকটা ছবিও করেছি একসঙ্গে। এখন পুরোপুরি বম্বের বাসিন্দা। এ ছাড়া তো মধুবাবু বাংলাদেশ থেকে শিল্পীদের ছাড়াও সমস্ত কলাকুশলীদেরও নিয়ে গিয়েছিলেন। যেমন ক্যামেরায় ছিল যতীন দাস, প্রবোধ দাস; সম্পাদনায় শ্যাম দাস, শিল্পনির্দেশে সুধাংশু চৌধুরী, সঙ্গীতে তিমিরবরণ প্রভৃতি। এই সব শিল্পীরা ছিলেন রাজনর্তকীতে—আমি, সাধনা বসু, জ্যোতিপ্রকাশ, বেচু সিংহ, প্রভাত সিংহ, প্রীতি মজুমদার (টুকলু), মৃণালকান্তি ঘোষ প্রভৃতি। মন্মথবাবুও একটা ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছিলেন।

এদের অনেকের সঙ্গে দেখা হল। ফেরার সময় মতিলালের গাড়ীতেই ফিরলাম। মতিলাল অবশ্য নেমে গেল তার বাড়ীতে মালাবার হিলে। তারপর তার গাড়ী এসে আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেল।

পরদিন সমস্ত দিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। আগের রাত্তির থেকে শুরু হয়েছে, সমস্ত দিনের মধ্যে বিরাম নেই। চুপচাপ বসে থাকতে বিরক্ত লাগছিল। বেরিয়ে পড়লাম এক সময় বর্ষাতিটা নিয়ে। কিন্তু কোথায় যাব? রাস্তাঘাট ভালো চেনা নেই। তারপর চারদিকে জল—জল, আর জল। আমি দমবার ছেলে নই, বর্ষাতির সঙ্গে

ছাতা নিয়ে গেলাম হর্নবী রোডের দিকে—হর্নবী রোড ধরে গেলাম মিউজিয়াম-এ। মিউজিয়াম ঘুরে আবার চলে এলাম মেরিন-ড্রাইভ। মেরিন-ড্রাইভের ওপরে বাঁধানো রেলিংটার ধারে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ওপর বৃষ্টি-পড়া দেখতে লাগলুম। ভারি ভালো লাগে আমার বৃষ্টি-পড়া দেখতে।

পরদিন আমার ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম মন্মথ রায়ের বাড়ীতে প্যারেলে, একা একা মুখবুজে হোটেলে থাকতে কি ভাল লাগে? ভাবলুম মন্মথর কাছে গিয়ে খানিকটা সময় কাটানো যাক। কিন্তু হরি হরি! গিয়ে দেখি মন্মথ বাড়ীতে নেই। এত খুঁজে খুঁজে এসে কিনা দেখি বাড়ী নেই! ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। শুনলুম, জ্যোতিপ্রকাশের বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এসেছে যে তার শিশুপুত্র অসুস্থ, তাই সে কলকাতা যাচ্ছে, আর মন্মথ তাকে ট্রেনে তুলে দিতে গেছে। বিফলমনোরথ হয়ে আবার হোটেলে ফিরে এলাম।

রাজনর্তকীর হিন্দী ও বাংলা দু' সংস্করণেই আমি রাজগুরুর ভূমিকাটি করি। হিন্দী সংস্করণের পার্ট বাংলায় লিখে আমাকে দেওয়া হল—আর এই হিন্দী সংলাপ শেখাবার ভার পড়ল মিঃ বোসের অন্যতম সহকারী ডবলু. জেড্. আহমেদের ওপর। স্টুডিও থেকে গাড়ী এসে আমাকে তুলে নিয়ে যেত—তারপর ওখানে হিন্দী ডায়লগ রিহার্সাল দিয়ে আবার গাড়ী আমায় হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যেত। কোন কোন দিন সঙ্গে থাকত মন্মথ। তখনকার দিনের খ্যাতনাম্নী কণ্ঠশিল্পী সুপ্রভা সরকার গিয়েছিল বম্বেতে 'রাজনর্তকী'-র প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসেবে। মাঝে মাঝে আমার গাড়ীতেই ফিরত।

আহমেদ ছেলেটিকে আমার বেশ ভালোই লাগতো। বম্বের দিনগুলো মনে এলেই মনে পড়ে আহমেদের কথা।

চুপ করে বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না। কাজের মধ্যে যেটুকু অবসর, সেটুকু ভরিয়ে নিতে চাই এখানে-ওখানে বেড়িয়ে।

একদিন গেলাম চৌপট্টিতে 'কোকোনাট ডে' উৎসব দেখতে। ধীবরদের এই উৎসবটির নাম কেন যে 'কোকোনাট ডে' হয়েছে বলতে পারবো না। এই দিনটিতে ধীবররা সমুদ্র-জলে নারিকেল ভাসায়—প্রার্থনা করে সমুদ্রদেবতার কাছ থেকে যেন কোন অমঙ্গল না আসে। সমুদ্র যে তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যারা সমুদ্রে আছে, তাদের প্রত্যাবর্তনের পথ যেন স্বচ্ছন্দ হয় এ-জন্যেও তারা প্রার্থনা করে।

'কোকোনাট ডে' এখানকার আকর্ষণীয় লোক-উৎসব। সত্যি বলতে কি, উৎসবটি সেদিন আমার ভালোই লেগেছিল।

বোম্বাইতে আছি, কিন্তু কলকাতার খবর না জানতে পারলে মনটা অস্বস্তিতে ভরে থাকে।

খবর পেলাম, নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার' ছবিটি ৩:শে আগস্ট কলকাতায় মুক্তিলাভ করেছে। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক-চিত্ত জয় করেছে ছবিটি। শুনে আনন্দ পেলাম। ছবিটিতে আমার ভূমিকা ছিল।

শুধু কি ছবির খবর কলকাতার অন্যান্য খবরের জন্যেও উন্মুখ হয়ে থাকি।

যাই হোক, এই সময়ের কথা বলতে, একটি ঘটনা-প্রসঙ্গ না বলে পারছি না। বাংলা দেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেব সদলে বোম্বাই এসেছেন জিন্নাসাহেবের কনফারেন্সে যোগ দিতে। কিন্তু হক সাহেব খুব মুশকিলে পড়লেন। হোটেলে তাঁর জায়গা মিললো না। শেষটা মন্মথ রায় সমস্যার সুরাহা করলেন। মন্মথবাবুর অনুরোধেই আমি আমার বসবার ঘরটি ছেড়ে দিলাম হক সাহেবের জন্যে। মনে আছে, দিন তিনেক তাঁরা ছিলেন। বলা-বাহুল্য হক সাহেবের সঙ্গে আমার আগে থেকেই সামান্য পরিচয় ছিল, এবারে সে পরিচয় পরস্পরকে আরো কাছে টানলো।

হক সাহেব যেদিন বিদায় নেবেন বোম্বে থেকে, সেদিন মন্মথবাবু ও আমি দুজনেই তাঁকে বিদায় জানাতে স্টেশনে এসেছিলাম। হক সাহেবকে নিয়ে হোটেল ছাড়ার মুহূর্তে সেদিন আরো দুজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এঁরা হলেন কলকাতার বিখ্যাত মোহনবাগান ক্লাবের করুণা ভট্টাচার্য ও প্রেমলাল। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁদের সঙ্গে বেশী কথা বলা হয়ে ওঠেনি।

হক সাহেবকে ট্রেনে তুলতে এক ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। আগে থেকে রিজার্ভেশন করা ছিল না। এদিকে ট্রেনের কোন কামরায় জায়গা নেই। শেষ পর্যন্ত কি হবে—হক সাহেব তো বললেন, জানালা দিয়ে গলে যাবো। যদিও তা আর করতে হল না। তাপনিয়ন্ত্রিত কামরায় জায়গা মিললো।

বোম্বাই শহরের বিলাসবহুল হোটেলের কক্ষে বেশ নিশ্চিন্তেই আছি। নিত্য-নতুন মানুষের আসা-যাওয়া লেগেই আছে। কত নতুন মুখ, কত পুরনো পরিচিতের মুখ।

বাকুলিয়া হাউসের বিনোদ মুখুজ্যে আমার পরিচিত। তাঁকে আচমকা আমার হোটেলের কক্ষে ঢুকতে দেখে অবাক হলাম।

শুনলাম, বিনোদবাবু জানতেন আমি এখানে আছি। তাই এসেছেন দেখা করতে। কথাপ্রসঙ্গে জানলাম, কোন হোটেলে ওঠেননি উনি। উঠেছেন স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে। ওখানেই একটা দিন কাটিয়ে চলে যাবেন শোলাপুর।

বিনোদবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরুলাম। বেড়াবার পথে এলাম স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে। খানিক কথা, গল্পগুজব হল। তারপর বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম আমার সেই নির্দিষ্ট হোটেলের চার দেয়ালের ঘরটিতে।

হোটেলের চার-দেয়ালের ঘরটির সঙ্গে আমার কতটুকু সম্পর্ক! দিনে রাত্রে যেটুকু সময় ঘুমোই—নয়তো আমার অবসর কাটে সমুদ্র-কিনারে। হোটেলের সামনেই সমুদ্রের বিস্তৃত পটভূমি।

কত সময় রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তখনই উঠে এসেছি হোটেলের বারান্দায়। দাঁড়িয়ে দেখেছি রাতের সমুদ্র। শুনেছি তরঙ্গের কলকণ্ঠ।

ঢু-এক সময় নিজের মনেই প্রশ্ন আসে—আমি কি স্বপ্নবিলাসী? পরমুহূর্তেই আত্ম-জিজ্ঞাসার বিশ্লেষণ করি। ভাবি, আমি শিল্পী। শিল্পীর জীবন তো স্বপ্ন দিয়ে গড়া। আমার স্বপ্ন শুধু শিল্পের স্বপ্ন।

কদিন আগে 'কোকোনাট ডে'র উৎসব দেখেছি। এবারে দেখলাম গণেশ চতুর্থীর পূজা-অনুষ্ঠান। শহরের সর্বত্র আড়ম্বর সহকারে গণেশ পূজো হয়। এই উপলক্ষে রীতিমতো উৎসবের ধূম পড়ে যায় শহরে। বোম্বাই শহরে ব্যবসায়ী মহলের প্রভাব যথেষ্ট, এবং স্বভাবত তারা গণেশ পূজায় উৎসাহী।

পরিচালক মধু বসুর অন্যতম সহকারী হেমন্ত গুপ্ত। দাদারে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছে। একদিন নিমন্ত্রণ পেলাম তার কাছ থেকে।

হেমন্তর ফ্ল্যাটে-যাবার পথে মন্মথবাবু আর জ্যোতিকে তুলে নিলাম। তারাও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। এই নিমন্ত্রণ কোন কিছু উপলক্ষে নয়—এমনিতে সবাই মিলে একটু খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব করা।

এখানেই শুনলাম, হেমন্ত গুপ্তের সঙ্গে মধুবাবুর সাম্প্রতিক মনোমালিন্যের ব্যাপারটা। যার জন্য হেমন্ত ছেড়ে দিয়েছে মধুবাবুর সহকারীর কাজ।

কদিন পর ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে আবার আমার ছবির কাজ আরম্ভ হল। প্রথম দিনে আমার শুটিং দেখবার জন্যে 'রাজনর্তকী'-র অধিকাংশ শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। এখানেই আলাপ হল বিখ্যাত অভিনেতা নায়ামপল্লীর সঙ্গে। প্রথম আলাপেই ঘনিষ্ঠতা হল। এই নায়ামপল্লীই 'রাজনর্তকী'-র হিন্দী সংস্করণে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

এর মধ্যে মাথায় চিন্তা এল, বোম্বেতে যখন বেশ কিছুদিন থাকতে হবে, তখন আর এই হোটেলে কেন। একটা ফ্ল্যাট নিলেই ভালো হয়।

যেমন চিন্তা, তেমন কাজ। 'ইব্রাহিম ম্যানরে' একটি ফ্ল্যাট নিলাম। ভাড়া

করা ফ্ল্যাট, তবু নিজের। মনের মতো ফার্নিচার নিয়ে এলাম। তা-ও ভাড়া করে, ভাবলাম, যে কদিন থাকি, নিজের মতোই থাকি। কলকাতা থেকে আমার খাস চাকর বংশীও এসেছে—যা কিছু সবই সে-ই করে। আমার সুখ-সুবিধে সে বোঝে। কখন কি দরকার সে জানে। এখন থেকে আমার ভাবনা বংশীর হাতেই ছেড়ে দিলাম।

ফ্ল্যাটে থাকলেও বংশী আমার খাবার নিয়ে আসত বাইরের রেস্তোঁরা থেকে। তৃপ্তি না হলেও, এছাড়া আর উপায় কি? কিন্তু ডিনারের পাট চুকিয়ে আসতাম মিঃ বোসের ওখানে। মিস্টার এবং মিসেস বোস কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়তেন না। শুধু পরিচালক হিসাবে নন, মানুষ হিসাবেও মধু বোস একজন বিরল ব্যক্তি।

কাজের মাঝেও অবসর আছে। অবসর পেলেই এখানে ওখানে যাওয়ার প্রোগ্রাম। একদিন আমরা সবাই মিলে গেলাম ভার্সোভা সমুদ্র-সৈকতে পিকনিক করতে। মিস্টার এবং মিসেস বোস ছাড়া সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তিমিরবরণ, বুলবুল দেশাই, সুনীত সেন, তিমিরবরণের ভাই শিশিরশোভন, টুকলু এবং আরো কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব।

ভার্সোভা সমুদ্র-সৈকত জায়গাটি বড় মনোরম। বিলাসী-মনের খোরাক ছড়িয়ে আছে সৈকত-এলাকায়। দেখলাম, আমাদের মত আরও নরনারী এসেছে নানা দলে বিভক্ত হয়ে। কত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখলাম, যারা সাগর-বেলায় খেলায় মেতেছে।

সারাটা দিন আমরাও সাগরবেলায় স্বচ্ছন্দ আনন্দ উপভোগ করলাম। দিন গেল। সূর্য ডুবলো সাগর পারে। সন্ধ্যে হল। সন্ধ্যে হতে সমুদ্র-সৈকতের চেহারাটাই যেন বদলে গেল।

জ্যোৎস্না-ধোয়া সন্ধ্যায় ভার্সোভার সমুদ্র-তীরে দাঁড়িয়ে সেদিন সত্যি আমি নিসর্গ শোভা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এখানে ওই যে ছোট ছোট কুটিরগুলো আছে, ওরই একটিকে আশ্রয় করে দিন কাটাই।

কিন্তু তার অবসর কই। অবসর থাকলেও বাস্তবে তা কোন দিনই সম্ভব নয়। তবু মন মাঝে মাঝে অসম্ভবের পিছু ছুটতে চায়।

বাংলা দেশে কালবৈশাখী দেখেছি, বর্ষা দেখেছি। তার রূপ আলাদা।

কিন্তু বোম্বাই-এর সাগরতীরে সেদিন যে বর্ষার রূপ দেখেছিলাম, তা কোন দিনই ভুলবো না। মনে আছে, সেদিন বেড়াতে বেরিয়ে ফিরতি পথে আকাশ

কালো মেঘে ছেয়ে গেল। সমুদ্র আর আকাশ যেন এক সঙ্গে মিশে গেল। তারপর শুরু হল প্রবল বর্ষণ। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামলো। সারাদিন চললো ধারা-বর্ষণ। সমুদ্রের জল স্ফীত হ'ল। রাজপথ প্লাবিত হল। সারাদিন আমার ঘরে বন্দী রইলাম। কিন্তু খোলা জানালার ধারে বসে উপভোগ করলাম এই বর্ষার রূপ।

কী জানি কেন, প্রকৃতির এই উদ্দামতার মধ্যে আমি এক বিচিত্র স্বাদ উপলব্ধি করি, যে কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না।

আমি যে হোটেল ছেড়ে ফ্ল্যাটে এসেছি, সে খবর আমার স্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। লিখেও ছিলাম, তুমি চলে এস।

সুধীরাও যেন এই রকম একটা চিঠির প্রত্যাশায় কলকাতায় ছিল। খবর পেয়ে আমার ছোট শ্যালক অনন্তলাল মিত্র, ডাক নাম ভাদু, তাকে নিয়ে চলে এল বোম্বে। পাচক তারিণীকেও সঙ্গে এনেছে।

সুধীরা কাছে থাকলে আমি অন্য মানুষ। কোথাও কোন অপূর্ণতা থাকে না। তাছাড়া সত্যি বলতে কি, আমার কথাটা আমি যত না ভাবি, তার চেয়ে সে-ই বেশী ভাবে। সুতরাং সুধীরা আসার পর আমি একেবারে নিশ্চিন্ত।

কলকাতার বাইরে আছি, তাই বলে কলকাতার খবর রাখি না এমন নয়। 'নাট্যভারতী'তে নতুন নাটক জলধর চাটুজ্যের 'পি. ডবলিউ. ডি'-র উদ্বোধন হয়েছে, সে খবরও রাখি। দুর্গাদাস, রাণীবালা, রতীন, সন্তোষ, জহর, নির্মলেন্দু—এরা এই নাটকের শিল্পী, তাও আমার অজানা নয়।

হীরেন বসুর ছবি 'অমর গীতি' ২রা অক্টোবর কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে, সে তারিখটিও ডায়েরীতে লিখে রেখেছি।

আগেই বলেছি, কাজ না থাকলে ঘরে বসে থাকতে পারি না। অবসর পেলেই কোথাও-না-কোথাও যাই।

এবারে অবসর মিলতেই ঠিক করলাম এলিফ্যানটা গুহা দেখতে যাবো। গেলামও। একা নই, আমার সঙ্গে আছে সুধীরা, ভাদু, তারিণী আর বংশী।

প্রথমে ট্যাক্সী চেপে অ্যাপোলো বন্দর। তারপর স্টীমার লঞ্চে সমুদ্রপথে সাত মাইল এসে এলিফ্যানটা গুহা।

গুহার মুখে উঠতে প্রায় ৫০০ ফুট সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয়। কষ্ট হলেও, এ-কষ্ট গায়ে লাগে না।

এলিফ্যানটা গুহার কথা অনেক শুনেছি। আজ দেখলাম। প্রথম দর্শনেই বিস্ময়। মনে হ'ল—ভারতের প্রাচীন শিল্পতীর্থে এসে পৌছেছি।

গুহার ভিতরে প্রস্তর-খোদিত শিব ও পার্বতীর মূর্তি। মহাকাল শিব, ত্রিলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক-পুরুষ, আর পর্বত-দুহিতা পার্বতী। অবাক হয়ে চেয়ে থাকি—দৃষ্টির নেশা মেটে তো মন ভরে না।

গুহার ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকি অবিচল, দৃষ্টি আমার হর-পার্বতীর মূর্তির দিকে। কিন্তু মন উধাও হয়ে গেছে ইতিহাসের কোন্ অলিখিত অধ্যায়ে, যেদিন ভারতের সাধক শিল্পীরা প্রাণের সমস্ত সত্তা নিঙড়ে রূপ দিয়েছিলেন শিব ও পার্বতীকে।

কিন্তু আরও দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখার সময় কই। ফিরে যেতে হবে আবার।

এখানেই পরিচয় হল এলিফ্যানটা গুহার কিউরেটরের সঙ্গে। ভদ্রলোক বাঙালী, নাম মিস্টার সেন—আমাদের সঙ্গে থেকে তিনি যা-কিছু দর্শনীয়, সবই দেখিয়েছিলেন।

এলিফ্যানটা গুহা থেকে অ্যাপোলো বন্দরে ফিরছি যখন, তখন বেলা চারটে। ফ্ল্যাটে না ফিরে চলে এলাম ফিরোজ শা মেহতা রোডে, গভর্ণমেণ্ট ইনফরমেশন সার্ভিসে। তখন এখানে কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যের একটা প্রদর্শনী ছিল।

প্রদর্শনীটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নানা রকমের কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যের সাজানো-গোছানো স্টলে, মনের মত নানা জিনিস। কিছু কিছু কেনা-কাটাও হল।

যেখানে যাই না কেন, কিছু না কিনে ফিরি না। সুধীরা সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই।

যাই হোক, প্রদর্শনী থেকে ফ্ল্যাটে ফিরেছি যখন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। ফিরে এসেই 'নাট্যভারতী'-র বিধু মল্লিকের চিঠি পেলাম। 'নাট্যভারতী'-র সাম্প্রতিক নাটক পি. ডবলিউ. ডি. সম্পর্কে লিখেছে। নাটক তেমন সুবিধের হয়নি। এছাড়া আরও জানিয়েছে, জহর গাঙ্গুলী 'নাট্যভারতী' ছেড়ে 'নাট্যনিকেতন'-এ যোগ দিয়েছে। তাছাড়া কলকাতার নাট্যজগতের আরো খবর ছিল তার চিঠিতে। কিন্তু তার চিঠির আসল কথাটা—আমি যেন কলকাতায় ফিরে এবারে 'নাট্যভারতী'তে যোগ দিই।

কথাটা মনের মধ্যে রাখলাম এই পর্যন্ত।

পুজো এলেই মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়। দুর্গাপুজোর সঙ্গে বাঙালীর যে নাড়ির টান। কিন্তু আমার পুজো এবারে প্রবাসেই কাটবে। তবু সুধীরা আর ডাঁদু এসেছে—নয়ত পুজোর দিনগুলো আরো নিঃসঙ্গ মনে হত।

'রাজনর্তকী'-র জন্যে আমরা খুব কম লোক আসিনি কলকাতা থেকে। কথা

উঠলো, পূজোর মধ্যে আমরা দাদারে মিলিত হয়ে একটা কিছু করবো। নাটক আর বিচিত্রানুষ্ঠান। প্রথমে 'সাজাহান' নাটকের কথা হল। আমি আপত্তি করলাম। বললাম, আমি না হয় সাজাহান করলাম—কিন্তু আর আর চরিত্রে? শেষটা 'রাতকাণা' প্রহসনটির কথা বললাম। অগত্যা তাই ঠিক হল।

অনুষ্ঠান হল। প্রবাসী বাঙালীদের এই অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলতেও হয়েছিল।

দাদারে বাঙালীদের উদ্যোগে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজো হয়। সুধীরা আর ভাঁদু এক দিন পূজো দেখতে গিয়েও ছিল।

পূজোর কটা দিন কাটলো। বিজয়াদশমীর দিনে ভাঁদু কলকাতা রওনা হল।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজো যেমন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়, এ-দেশে তেমনি দশেরা উৎসব। বিজয়াদশমীর দিনটিতে এই দশেরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দশেরা উপলক্ষে এখানে কোন প্রতিমা পূজা হয় না। এই দিনটিতে কোন উন্মুক্ত স্থানে বাঁশের বাখারি এবং কাগজ ইত্যাদি দিয়ে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও রাবণের প্রতীক তৈরি হয়। এই প্রতীক রাবণের বুকে তীর মারবেন রাম—তারপর শুরু হবে বহ্ন্যুৎসব। রাবণ সমূলে নাশ হবে। এমনি করেই উদযাপিত হয় দশেরা উৎসব।

আমার কাজ এখনো বাকি আছে। 'রাজনর্তকী'র জন্যে এখনো বোম্বে থাকতে হবে। কিন্তু মন্মথ রায়ের কাজ শেষ। এবারে ওঁর ফেরার পালা।

মন্মথবাবু কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। ওঁর সঙ্গে আমি কতকগুলি 'কিউরিও' পাঠিয়ে দিলাম।

বাকি কাজও প্রায় শেষ হয়ে এল। আর কয়েকদিন 'রাজনর্তকী'র শ্যুটিং করলে ছবির কাজ শেষ। এই কাজের মধ্যে মাঝে কিছুদিনের ছুটি পাওয়া গেল।

ছুটি পেলে বসে থাকতে রাজী নই। কোথাও যাওয়ার নেশা চেপে বসে।

এবারে কোথায় যাব? ঠিক হল নাসিক। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। ২৮শে অক্টোবর রাতে ভি-টি স্টেশন থেকে নাসিকগামী ট্রেন ধরলাম।

নাসিকে পৌছেছি বেলা সাড়ে ন'টায়। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই একজন মারাঠী ব্রাহ্মণ এসে আমাকে গ্রেপ্তার করলো। গ্রেপ্তার করা বলতে ভারতের অন্যান্য তীর্থে যেমন, এখানেও তেমন পাণ্ডারা যাত্রীদের জন্যে বসে আছে।

হোটেলে ওঠা আর হল না। শেষপর্যন্ত নাছোড়বান্দা পাণ্ডার বাড়ীতেই উঠলাম।

নাসিকে দ্রষ্টব্য স্থান বলতে পঞ্চবটি বন। রাম রাজ্য ত্যাগ করে সহধর্মিণী সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণকে নিয়ে এই বনে বাস করেছিলেন। এই পঞ্চবটিতেই রয়েছে প্রাচীন অক্ষয়-বট। এত ঝুরি নেমেছে যে, বৃক্ষের মূল কাণ্ডটি খুঁজে পাওয়া দায়। কিংবদন্তী এই যে, এই বটবৃক্ষতলে রামচন্দ্র ও সীতা বিশ্রম্ভালাপ করতেন।

পঞ্চবটি বনে আরো কিছু দর্শনীয় স্থান দেখা হল। সীতা যেখানে রাবণকে ভিক্ষা দেন, এবং লক্ষ্মণ যেখানে সূর্পনখার নাসিকা ছেদন করেন, সেই সব স্থান দেখলাম।

গোদাবরীর ওপরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের নামে তিনটি কুণ্ড আছে। সেখানে মৃতের উদ্দেশে তর্পণ করা বিধি।

গোদাবরীর তুলনা নেই। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল—গভীর না হলেও স্রোতের টান খুব বেশি। সতর্ক হয়ে স্নান করতে হয়। আমি এবং সুধীরা—স্নান করেছি গোদাবরীর পুণ্য-সলিলে। স্নানে অপূর্ব প্রশান্তি। তারপর পিতৃ-তর্পণের পালা। তর্পণ শেষ করেছি অনেক বেলায়। এরপর পাণ্ডাঠাকুরের বাড়ীতে আহারাদি সারলাম। রান্না করেছিল সুধীরা।

নাসিকে আরো কিছু দর্শনীয় মন্দির ইত্যাদি আছে। সে-সব দেখলাম। তারপর দিনান্তে এসে পৌঁছলাম স্টেশনে।

পাঞ্জাব মেল আসবে, তারই জন্যে ওয়েটিং রুমে প্রতীক্ষা।

এইখানে ঘটলো এক মহা ঝামেলা। দেখলাম, একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্টেশনে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষমান সাধারণ মানুষদের ওপর প্রচণ্ড আস্ফালন করছে। যার কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না।

শুনলাম, লোকটি নাকি শূয়োরের ব্যবসা করে। লোকটির এই অহেতুক অভব্য আচরণ আমাকে বিস্মিত করলো। তার এই আচরণের প্রতিবাদ না করে পারলাম না।

শেষপর্যন্ত চুপ করলো লোকটি।

ট্রেনের অপেক্ষায় আছি। একটানা ওয়েটিং রুমে বসে থাকতে ভালো লাগলো না। প্ল্যাটফর্মে খানিক পায়চারি করলাম।

ট্রেন এল। পাঞ্জাব মেল। নির্দিষ্ট কামরায় আসন গ্রহণ করলাম।

রাত তখন আড়াইটে। মানমদ স্টেশনে নামতে হল গাড়ী বদলের উদ্দেশ্যে। এখান থেকেই ঔরঙ্গাবাদের মিটার গেজ লাইন আরম্ভ হয়েছে, যে রেলপথ নিজাম স্টেটের।

ট্রেন বদল করেছি। এবারে আর বসে থাকা নয়, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাওয়া।

ভোর হতে সুধীরার ডাকে আমার ঘুম ভাঙলো।

—ওঠো, ঔরঙ্গাবাদ এসে গেছে।

উঠে বসলাম। বন্ধ কামরার দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা খুলতেই দেখতে পেলাম, এক দক্ষিণ দেশীয় ভদ্রলোককে। মুখোমুখি হতে তিনি বিনয় প্রকাশ করে বললেন, আমি নিজাম স্টেট রেলওয়ে হোটেল থেকে আসছি।

এই হোটেলেই আগে থেকে বন্দোবস্ত করা ছিল। সুতরাং ভদ্রলোকের সঙ্গে হোটেলেই চললাম।

হোটেলের গাড়ী অপেক্ষা করছিল স্টেশনের বাইরে।

হোটেলে পৌঁছে প্রথম কাজ হল, অজন্তা ইলোরা দেখার বন্দোবস্ত করা। সেই মত হোটেল ম্যানেজারকে বললাম।

ম্যানেজার বললেন, ঠিক আছে, আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। আপনারা ব্রেকফাস্ট সেরে তৈরি হয়ে নিন।

কথামত কাজ। ব্রেকফাস্ট সেরেই আমরা রওনা হলাম অজন্তার পথে।

অজন্তা দেখার বাসনা আমার অনেক দিনের। এলামও। ঔরঙ্গাবাদ থেকে কিছু কম-বেশি ষাট মাইল দূরে অজন্তা গুহা।

অজন্তা গুহার চিত্রাবলী দেখলাম। তু'চোখে দেখার আগ্রহ।

কিন্তু কি দেখবো! উহা এমনই অন্ধকার যে ভালো করে দেখা যায় না। শেষটা পাঁচ টাকায় আলো ভাড়া করে ছবিগুলি দেখলাম। কিছু কিছু শিল্পকর্ম কালের ভারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবুও সেইসব অনুপম শিল্পকর্ম দেখে অভিভূত হতে হয়।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। এইসব চিত্রকলার পরিচয় আছে নানা পুস্তিকায়। তা থেকে অনেক কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

গুহায় দাঁড়িয়ে রইলাম। মনের মধ্যে তখন বিচিত্র এক অনুভূতি। ভাবছি, ভারতের প্রাচীন শিল্প-যুগের কথা। ভাবছি, সেই সব শিল্পীদের কথা, যাঁদের কল্পনার তুলি আর রঙে জীবন্ত হয়ে ফুটেছে এই শিল্পমহিমা।

ভারতের শিল্প-তীর্থ এই অজন্তা।

গুহার বাইরে এলাম। বাইরে একটি সুন্দর ঝর্ণাধারা। জল-প্রপাতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

এখানেই খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে নিলাম খোলা আকাশের নীচে। তারপর অজন্তার যা কিছু দর্শনীয়, দেখা শেষ করে এলাম হোটেলে।

হোটেল থেকেই দেখা যায় 'বিবি-কা-মকবারা'—তবে সে দেখা দূর থেকে দেখা। এবারে কাছে থেকে দেখলাম। ভারত-সম্রাট ঔরঙ্গজীবের বেগম রাবিয়াস দুরাণীর সমাধিমন্দির এই 'বিবি-কা-মকবারা' তাজমহলের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেকটা তাজমহলের অনুকরণে নির্মিত এই সমাধি-মন্দির। মার্বেল-পাথরে তৈরি এই সমাধি-মন্দিরের অনেকাংশে শ্বেত পদ্মের কাজ করা, যার শিল্পচাতুর্য দেখবার মত।

পরদিন এলাম বিবি-কা-মকবারা দেখতে।

এরপর এলাম 'পবন চাক্কি' দেখতে। পবন চাক্কি বলতে হাওয়াই যাঁতা। একটা বিরাট কাঠের পাখা জলের বেগের মুখে পড়ে ঘুরতে থাকে, সেই সঙ্গে যাঁতাটাও। এখানেই এক সময়ে দুর্ভিক্ষের সময়ে ঔরঙ্গজীব প্রজাগণকে গম বিতরণ করেছিলেন। সে কথাও শুনলাম গাইডের কাছে।

সেদিনের মত ভ্রমণের পাট এখানেই চুকলো। পরদিন, ভোরে বেরিয়ে পড়লাম ঔরঙ্গাবাদ ফোর্ট দেখতে। ব্রেকফাস্ট হোটেল থেকে সেরে এসেছি, দুপুরের খাবার নিয়েছি টিফিন কেরিয়ারে।

যাই হোক, ফোর্টের কাছে পৌছতেই দেখলাম, গেট বন্ধ। শুধু আমরা নই, আরও দর্শনার্থী বাইরে অপেক্ষা করছে। শুনলাম, কিছু ইংরেজ পর্যটক ভিতরে গেছে, তাদের বাইরে না-আসা পর্যন্ত ভারতীয়দের জন্যে দরজা খুলবে না। শুনে, আমার ভারতীয় মন ক্ষুব্ধ হল। ভাবলাম, এ অবস্থার অবসান কবে হবে। আরো ভাবলাম, এত জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু কোথাও তো এমন স্পষ্ট ব্যবধান চোখে পড়েনি। মনটা বিদ্রোহ করে উঠলো। ফোর্ট দেখার বাসনা ত্যাগ করলাম। চলে এলাম সোজা 'রাওজা'য়। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমাধিক্ষেত্র এই 'রাওজা'। সমাধিক্ষেত্রটি এতই সাধারণ যে, সমাধি-প্রস্তরফলক পর্যন্ত নেই। চারদিকে ঘাস এবং ছোট ছোট আগাছা গজিয়ে উঠেছে। সাধারণ, তবু আমার চোখে সেদিন অসাধারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল এই 'রাওজা'।

এরপর এলাম আসাফজার সমাধিক্ষেত্রে। তারপর সেখান থেকে ইলোরায়। এই পথেই দেখলাম, অহল্যাবাঈ-এর গুহা, বৌদ্ধ গুহা এবং কৈলাস গুহা। কৈলাস গুহায় কেবল শিব এবং পার্বতীর নানা মূর্তি—নয়তো আর কিছু নেই।

ইলোরায় এসেছি। প্রবেশ পথেই একটি পাথরের হাতী দেখলাম, যার কারুকার্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। অনুরূপ আরো একটি হাতী ছিল, যেটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে কোন কারণে।

মনের মধ্যে বিস্ময়। ইতিহাসের স্মৃতি-বিজড়িত কোথাও এলে মন আমার এমনই বিস্ময়ে ভরে যায়।

'চাঁদ মিনা'-র হাতি-বস-হাওজা দেখে ভিতরে যাব বলে এগিয়ে চললাম। কিন্তু কিছুদূর সিঁড়িপথ উঠে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আর যেতে পারলাম না। বসে পড়লাম ফটকের ধারে সিঁড়ির ওপরে।

হঠাৎ দেখি, একজন লোক কাছেই সিঁড়ির ওপর আছড়ে পড়ে ছট্‌ফট করতে লাগলো। কী হল লোকটার ?

শুনলাম, মৌমাছির আক্রমণে মানুষটির এই অবস্থা।

সেই মুহূর্তেই দেখলাম, একঝাঁক মৌমাছি ছুটে আসছে। সুতরাং আর বসে থাকা নয়, উঠে পড়লাম।

এখান থেকে বেরিয়ে সোজা রেল-স্টেশন। এবারে চলেছি সেকেন্দ্রাবাদের দিকে।

পরদিন ভোরে সেকেন্দ্রাবাদ পৌছলাম। ট্রেন থেকে নামতেই নিজাম স্টেট কাস্টম্‌সের লোকজন আমাদের ঘেরাও করলো চেকিং-এর জন্যে।

চেকিং হল। তারপর স্টেশন থেকে সোজা এলাম মণ্টগোমারী হোটেলে।

কোথাও আসতে যেটুকু দেরি, এলে আর স্থির থাকতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার উদ্দেশ্যে।

হোটেলে ব্রেকফাস্টের পাট চুকিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে এলাম 'হুসেনী সাগর'। নামেই সাগর, আসলে একটা বড় দীঘি। তারপর সেখান থেকে বাঁশরীবাগ, চিড়িয়াখানা, চারমিনার, টাউন হল এবং মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের ভিতরে যাওয়া হল না, কারণ ঈদের জন্যে সেদিন মিউজিয়ম বন্ধ।

ট্যাক্সি ড্রাইভারই আমাদের গাইডের কাজ করছে। সে আমাদের নিয়ে এল মাসী নদী দেখাতে। নদীর ওপর সুন্দর সেতু। তারপর 'রিভার গার্ডেন' দেখবার মত ; নদীর কিনারায় এই সুন্দর উদ্যানটি শহরের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। এখানেই টিলার ওপর ছোট্ট অথচ সুরম্য প্রাসাদটিই 'খপলুকনামা প্যালেস' নামে প্রসিদ্ধ।

এবারে ট্যাক্সিচালক আমাদের শহর ঘুরিয়ে দেখাল। হাইকোর্ট, লাড বাজার, সিটি কলেজ, জুবিলি হিল। তারপর এলাম 'নিজাম প্রাসাদ' দেখতে। বাইরে থেকে দেখা, নয়ত ভিতরে দৃষ্টিপাত করার কোন উপায় নেই। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে এই প্রাসাদ, চারদিকে সুউচ্চ প্রাচীর, ফটকেও পর্দার আড়াল। সুতরাং ভিতরের কিচ্ছু দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

একটা কথা বলা হয়নি, চারমিনারের পাশেই রয়েছে মক্কা মসজিদ। সেখানে নিজাম বাহাদুর যখন যান, তখন রাস্তার সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

আরও কিছু দেখা বাকি ছিল। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিজামশাহী প্যালেস, বেগম পেট, খৈরতাবাদ—তাও দেখা হ'ল। তারপর ট্যাক্সি ছুটল গোলকুণ্ডার দিকে।

প্রথমে দেখলাম কুতুবশাহী বাজার, মক্কা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, আবুল হাসানের অসমাপ্ত কবর। তারপর দেখলাম, পাহাড়ের ওপর দুই নর্তকীর স্মারক-গৃহ—এই দুই নর্তকীর নাম হ'ল প্রেমাবতী আর তারাবতী। জানি না, এই দুই নর্তকীর পিছনে কোন্ কাহিনী জড়িয়ে আছে।

বাইরে এলে আমার মধ্যে একটা যাযাবর মন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হোটেলে ফিরে নৈশ ভোজ সমাধা করার পরেও বেড়ানোর নেশা। সেই রাতে আবার বেরোলাম। দূরে নয়, হোটেলের কাছাকাছি পায়ে হেঁটে বেড়াতে আরম্ভ করলাম। সেকেন্দ্রবাদের স্মারক হিসেবে কিছু সচিত্র পোস্টকার্ড কিনলাম। তারপর টুকিটাকি আরো জিনিস।

হোটেলে ফিরেছি। রাতটুকু ভোর হবার অপেক্ষা। শেষরাতেই ঘুম থেকে উঠেছি, তৈরি হয়েছি 'বিদার' যাওয়ার জন্যে।

স্টেশনে এসে টিকিট কাটতে এমন মুশকিলে পড়ব, এতো ভাবিনি। টিকিটের জন্যে কাউণ্টারে টাকা দিতেই কানে এল—'আরে মিস্টার, এতো ব্রিটিশ মানি!'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, হ্যাঁ, আমি তো ব্রিটিশ সাবজেক্ট্, থাকি ইণ্ডিয়ায়—আমি তো এই টাকাই দেব।

সে মাথা নেড়ে বললে, সরি স্যর, এটা নিজাম স্টেট। এখানে নিজাম্স্ কারেন্সি ছাড়া কিছু চলবে না।

তবুও টিকিটবাবুটি আমাকে নিরাশ করলেন। অগত্যা অপেক্ষমান ট্রেনের গার্ডসাহেবকে বললাম। মানুষটি ভালো। আমার অসুবিধের কথা বুঝলেন। যখন বললাম, এখন তো ট্রেনে উঠি, পরে কোন স্টেশনে ব্রিটিশ মানি বদলে নিয়ে টিকিট কেটে নেব। গার্ডসাহেব তাতেই রাজি হলেন।

পথে ভিকারাবাদ স্টেশনে আমি ব্রিটিশ টাকা বদলে নিয়েছিলাম;

আজ সকাল থেকেই কেমন যেন বাধা। বিদার স্টেশনে নেমে যদিও একটা ট্যাক্সি দেখলাম, কিন্তু তা-ও পেলাম না। শুনলাম, আগে থেকে রিজার্ভ করে রেখেছে অন্য একজন।

শেষটা একটা টাঙ্গা ভাড়া করলাম।

প্রথমেই গেলাম ফোর্ট দেখতে। দেখলাম, বিরাট 'গম্বুজ দরওয়াজা'। গম্বুজের উপর একটি বিরাটকায় কামান বসানো। কামানের গায়ে সোনা দিয়ে অনেক কিছু লেখা ছিল। যার অনেকখানি সোনা খোয়া গেছে।

তোরণদ্বার দিয়ে এলাম চিনি-মহলে। চিনি-মহলের মেঝেতে এখনো পারস্য দেশীয় টালিগুলো অতীতের ঐশ্বর্যমুখর দিনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারপর এলাম রঙীন-মহলে,—যেখানে আবুল হাসানকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। বন্দী কবি আবুল হাসান—মহলের দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে উর্দুতে তাঁর কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। উর্দু আমি জানি না, তবুও শুনলাম এই সব কবিতার মধ্যে দার্শনিক মননশীলতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

রঙ্গীন মহলের দেয়ালের চারধারে ঝিনুকের কারু কাজ সত্যিই দেখবার মত।

রঙীন-মহল থেকে এলাম 'শোলা-কা-মসজিদ' দেখতে।

কোথাও দু'দণ্ড দাঁড়াবার অবসর নেই। এক জায়গা দেখা শেষ হতেই টাঙ্গায় চেপে আর জায়গায় ছুটে চলা। বিরতি নেই। ছুটে চলাতেই যেন আনন্দ। এই জীবনের যাযাবর ছন্দকে আবিষ্কার করা—যে ছন্দে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি।

এবারে আমাদের টাঙ্গা এসে দাঁড়াল মহম্মদ ঘউস মাদ্রাসাতে।

মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষই শুধু চোখের সামনে বর্তমান। এই ধ্বংসাবশেষ দেখে চমকে উঠতে হয়। প্রশ্ন জাগে, এমন করে কে ধ্বংস করেছিল এই বিরাট ভবন! শুনলাম, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এক কাহিনী। মাদ্রাসা যেদিন সাধারণ্যে উদ্বোধন হবে, স্বয়ং রাজা আসছেন সে-গৃহ উদ্বোধন করতে, এমন সময় কোথাও কিছু নেই—না মেঘ, না ঝড়বৃষ্টি—এক বজ্রপাতের ফলে এই বিরাট গৃহটির আধখানা ধ্বংস হয়ে গেল—বাকী আধখানা আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই অভিশপ্ত শিল্পীর সাক্ষ্য বহন করে। দেখলে মনে হয় কে যেন ক্ষুর দিয়ে আধখানা অবিকৃত রেখে আধখানা নষ্ট করে দিয়েছে।

তাড়াহুড়ো করে বিদার বাজারে গেলাম কিছু কেনা-কাটার জন্যে—কিন্তু ঈদের ছুটির জন্য বেশির ভাগই বন্ধ, মাত্র ২।৩টি দোকান খোলা ছিল। তাতে বিশেষ এমন কিছুই ছিল না, যা কেনা যায়। এরপর টাঙ্গাওলা নিয়ে গেল বারিদশাহী রাজাদের কবর দেখাতে; তারও কিছু দূরে বাহমনি রাজাদের কবর।

এইসব দেখেশুনে স্টেশনে ফিরলাম। সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন। ট্রেনে জায়গার অসুবিধে হয়নি। এলুম ভিকারাবাদে। ওখানে স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমেই চা-জলখাবার খাওয়া গেল। কিন্তু স্টেশনে এত ভিড় যে সমস্ত প্ল্যাটফর্মের মধ্যে কোথাও

একটু বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। আমরা স্টেশনের মধ্যে পায়চারি করে সময় কাটাতে লাগলুম।

একজন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় মুসলমান ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকেই আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। তিনি সপ্রতিভভাবে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন: আপনি কি মিঃ অহীন্দ্র চৌধুরী?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম: হ্যাঁ।—আপনি কেমন করে জানলেন?

তিনি মৃদু হেসে বললেন: কাগজে আপনার অনেক ছবি দেখেছি।

তারপর, মাদ্রাসাটা দেখলেন?—বলে একটু থামলেন ভদ্রলোক—দেখে কি মনে হ'ল? কিরকম অদ্ভুতভাবে বাড়ীটা ভেঙ্গে পড়েছে না? মনে হচ্ছে না যে কেউ যেন ছুরি দিয়ে বাড়ীটাকে দু-আধখানা করে দিয়েছে?

—হ্যাঁ, আমারও ঠিক এই কথাই মনে হয়েছে।

—এর একটা করুণ ইতিহাস আছে।

আমি সাগ্রহে বললাম: বলেন কি? আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে তা হলে বললে খুব খুশী হব।

—না না, আপত্তি কেন থাকবে। তা হলে আসুন বসা যাক—এইখানেই বসা যাক।—বলে খবরের কাগজখানিকে বেশ করে বিছিয়ে, নিজেও বসলেন এবং আমাদেরও বসতে অনুরোধ করলেন।

বসলাম। ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন।

পারস্য দেশ থেকে এক শিল্পী সেসময় এদেশে এসেছিলেন। খুব নামকরা শিল্পী। তদানীন্তন রাজা ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁর প্রজাদের জন্যে একটি স্কুল (মাদ্রাসা) তৈরী করবেন। স্থপতিদের ডাকা হ'ল। সেই সময় এই শিল্পী এগিয়ে এসে বলল যে, তাকে যদি এগৃহ নির্মাণের ভার দেওয়া হয়, তাহ'লে সে এমন বাড়ী করে দিতে পারে যা হবে কালজয়ী। অর্থাৎ কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগই একে ধ্বংস করতে পারবে না। যুগ-যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই গৃহ দাঁড়িয়ে থাকবে অক্ষত অবস্থায়।

এই কথা শুনে রাজাসাহেব বললেন: বল কি? বেশ, তা হলে তুমি বাড়ীর নক্শা তৈরি কর।

দিন যায়, মাস যায়—প্ল্যান আর হয় না। রাজা শিল্পীকে তাগাদা দেন। আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি করে ৮।১০ মাস কেটে গেল। রাজা অস্থির হয়ে উঠেছেন। শেষে একদিন শিল্পী রাজসমীপে নক্শাটি দাখিল করল। নক্শা দেখে রাজা খুব খুশী। রাজা সেই নক্শা অনুমোদন করলেন।

এখন কাজ আরম্ভ করলেই হয়। বেশ কিছুদিন সময় গেল। রাজা আবার জোর তাগিদ দেন। শিল্পী জানালেন যে একটা পুকুর কাটাতে হবে। তাতে তিনি যে মশলা দরকার তা তৈরি করবেন। রাজার হুকুমে পুকুর কাটা হল, সেখানে শিল্পীর নির্দেশমত সমস্ত মাল-মশলা এনে জড় করা হল। বেশ কিছুদিন ধরে সেই মশলা তৈরি হল তারপর একদিন শিল্পী বললেন যে, একটা খুব শক্তিশালী হাতিকে সেই পুকুরে নামাতে হবে। হাতি যদি তাঁর সেই তৈরি মশলার ওপর দিয়ে হেঁটে চলে আসতে পারে, তাহলে মশলা ঠিকমত তৈরি হয়নি বোঝা যাবে,—আর যদি সে আটকে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে মশলা তৈরি হয়ে গেছে এবং এবার বাড়ী তৈরির কাজ শুরু করা যেতে পারে।

রাজ্যের মধ্যে যেটি সবচেয়ে তেজী হাতি তাকেই রাজার নির্দেশে নামানো হল পুকুরে। রাজা সামনে দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলেন। আশ্চর্য! অমন তেজী হাতি, কিন্তু সেই মশলাভরা পুকুরে নেমে আর পা তুলতে পারে না—আটকে গেল। শিল্পী আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন—তাঁর এক্সপেরিমেণ্ট সফল হয়েছে। বললেন এই মশলায় যে বাড়ী হবে, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে তাকে ধ্বংস করতে পারে।

রাজা বললেন : সে তো না হয় বুঝলুম, কিন্তু হাতিটাকে এখন বাঁচান।

শিল্পী বললেন, ওকে আর বাঁচানো যাবে না।

—সে কী? ও যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হাতি।

শিল্পী হেসে বললেন, অনেক সময় অনেক বড় কিছুর জন্যে প্রিয় জিনিসের মায়া ত্যাগ করতে হয়।

অগত্যা রাজা চুপ করে গেলেন।

যাক, কিছুদিন পরে এই বিরাট ভবন তৈরী হল। নির্দিষ্ট হল উদ্বোধনের দিন-ক্ষণ। রাজা আসবেন এই বিরাট ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করতে। উদ্যোগ-আয়োজনও হয়েছে আড়ম্বরপূর্ণ।

কিন্তু এ কী হ'ল। হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত। জল নেই, ঝড় নেই, আকাশের কোথাও টুকরো মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই—অথচ বজ্রপাত হল। জনতা ভয়ে বিস্ময়ে দেখল, বজ্রপাতে এই নবনির্মিত ভবনটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। অর্ধাংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল; আর বাকি অর্ধাংশ দাঁড়িয়ে রইলো। যেটি আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শিল্পীর হুঁশ হ'ল। তিনি বুঝলেন, ঈশ্বরের কাছে মানুষের কোন দম্ভই মূল্য পায় না। মুহূর্তের চিন্তা উন্মাদ করে দিল শিল্পীকে।

এইখানে গল্পে পূর্ণচ্ছেদ টানলেন ভদ্রলোক।

ইতিমধ্যে সেকেন্দ্রাবাদ থেকে পুণা যাবার গাড়ী এসে গেল। কিন্তু ট্রেনে দারুণ ভিড়। সিট রিজার্ভ করা ছিল। কিন্তু তাও পেলাম না। অগত্যা স্ত্রীকে তুলে দিলাম 'জেনানা কামরায়' আর আমি কোনমতে আর একটা কামরায় জায়গা করে নিলাম। বুঝলাম, ঈদের ছুটির জন্যে এতো ভিড।

ট্রেন ছাড়লো। কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে 'ওযাডী' স্টেশনে পৌছতে গার্ড সাহেব আমাদের জন্যে দুটি বার্থের ব্যবস্থা করে দিলেন। এখানে অনেক যাত্রী নেমেও গেল। বলাবাহুল্য আমি আগে থেকেই গার্ডসাহেবকে জানিয়ে রেখেছিলাম।

রাতটুকু চলতি ট্রেনেই কাটলো। গভীর ঘুমের মধ্যে আর কোন খবরই রাখি নি। শুধু ভোর হতে দেখলাম আমরা পুণা এসে পৌছেচি।

স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এক ট্যাক্সি চালককে বললাম, কাছাকাছি কোন হোটেলে নিয়ে যেতে। নিয়েও গেল তাই, ন্যাশনাল হোটেলে। স্টেশনের উল্টোদিকেই হোটেল, অথচ আশ্চর্য-হলাম ট্যাক্সিচালকের ব্যবহারে। এই হোটেলে তুললো, অথচ মিথ্যে খানিক ঘুরিয়ে আনলো। বুঝলাম, ও আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কিছু রোজগার করে নিল।

কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালাকে কিছু বললাম না। সোজা হোটেলে এসে ঢুকলাম।

স্নান-টান সেরে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বেলা সাড়ে নটা নাগাদ। একটা ট্যাক্সি ঠিক করে দেখতে গেলাম বন্দর বাঁধ, মালা নদী, বন্দর উদ্যান, প্রিন্স অফ ওয়েলস্ সড়ক, রেস কোর্স, হর্টিকালচার বাগান, গোয়ালিয়র মহারাজার ছত্রী (অর্থাৎ স্মৃতিসৌধ), ক্যাণ্টনমেণ্ট, দুটি স্টুডিও (সরস্বতী সিনেটোন ও অরুণ পিকচার স্টুডিও), পাহাড়ের ওপরে ভবানী মন্দির। এই মা ভবানী হলেন শিবাজীর আরাধ্যা দেবী।

এই ভবানী মূর্তি হল অষ্টভুজা—মন্দিরটি মাঝখানে, আর চারপাশে আরও চারটি মন্দির আছে—যেমন সূর্যনারায়ণ, গণপতি, অম্বিকা ও বিষ্ণু। গেলাম রেইসী মার্কেট, তার ওপরেই হল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়াম—এখানে দেখলাম ত্রিবাঙ্কুর জঙ্গল থেকে আনা একটি বিচিত্র ও বিরাট বল্কল। খাইওয়ারা গাছের ছাল। মার্কেটে গিয়ে কিছু কেনা-কাটা করলুম। তারপর যখন হোটেলে ফিরে এলাম, তখন বেলা চারটে বেজে গেছে।

সমস্ত দিন ঘোরাঘুরিতে শরীরটা বেশ ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল, সেজন্য আর বেরুলাম না কোথাও।

পরদিন গেলুম শানওয়ারীবাদীতে। এটা মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদের প্রাসাদ। এখন শুধু দেওয়ালগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে, বাকি সব গেছে নষ্ট হয়ে। দেখলাম শিবাজী গার্ডেন ও মিলিটারী স্কুল, শিবাজীনগর নামে একটি নতুন

কলোনী। চমৎকার উদ্যানসহ আবহাওয়া অফিস (সেদিন আবার সেটি বন্ধ ছিল), ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, কৃষি কলেজ, ফার্গুসন কলেজ, ক্যাণ্টনমেণ্ট বাজার—এই সব দেখে ফিরে এলাম হোটেলে, তখন প্রায় সন্ধ্যা। হোটেলে চা না খেয়ে গেলাম স্টেশনে—সেখানকার রিফ্রেসমেণ্ট রুমের চা-টি বড ভাল। ওখানেই চা-টা খেয়ে স্টেশনে বেড়াতে লাগলাম। রাত্রি সাড়ে আটটায় হোটেলে ফিরে নৈশভোজন সেরে শুয়ে পডলাম।

পরদিন অর্থাৎ ৫ই নভেম্বর ভোরবেলায়, মানে অন্ধকার থাকতে-থাকতেই আমরা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম স্টেশনের উদ্দেশে। স্টেশনে এসে স্থির করলাম যে এত-দূর যখন এসেছি, তখন কার্লা গুহাগুলোও দেখে যাওয়া যাক। কার্লা গুহা যেতে গেলে আবার লোনাভালা হয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ ওখানেই নামতে হবে।

লোনাভালায় নেমে দেখি কোন ট্যাক্সি নেই—শুনলাম তখন নাকি ওখানে কোন ট্যাক্সি পাওয়াই যেত না। যাই হোক, একটা ফিটন ভাড়া করলাম। এই ফিটনেই চললাম কার্লা। পুণার দিকে আরও পাঁচ মাইল রাস্তা যেতে হবে। রাস্তায় পড়লো বিরাট রেলওয়ে কলোনী।

রাস্তাটা ভালই—তবে প্রধান সড়ক থেকে সোয়া মাইলটাক পথ বড় বিশ্রী। গুহাগুলি বেশ উঁচুতে অবস্থিত, সমুদ্রগর্ভ থেকে ৪০০ ফুট। উঠতে অবশ্য কোন কষ্ট হয় না—ক্রমাগত লোক চলাচলের ফলে পাহাড়ের গায়ে আপনিই সিঁড়ি হয়ে গেছে। তার ওপর উঠে দেখলাম, একটি ঝর্ণার জল জমে সুন্দর জলাশয় তৈরি হয়েছে। জলটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং সুস্বাদু। ঐখানটায় বাতাসও বেশ ঠাণ্ডা। এ জায়গাটিতে এলে শরীর ও মন দুই-ই জুড়িয়ে যায়। ওখানে আমরা জলপান করলাম—সঙ্গের ওয়াটার-বটলটি এই জলে পূর্ণ করে নিলাম।

ওখানে রয়েছে কয়েকটি বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার—এই চৈত্যগুলি সব কাঠের তৈরি। স্তূপের ওপরে যে ছত্র আছে সেটা কাঠের তৈরী। সামনের দিকের ঘোড়ার খুরের মত আকৃতিবিশিষ্ট জানালাগুলির সামনে যে বারান্দাটি আছে, সেটাও কাষ্ঠ-নির্মিত। এই কাঠগুলি এত মজবুত যে, কত শতাব্দী অতিক্রম করে গেছে, আজও সেগুলি সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত অবস্থায়।

এখানে যে-সব মূর্তি ও শিল্পকীর্তি আছে সেগুলি সবই কাঠের তৈরি—ভরুত টাইপের। স্তম্ভগুলিও সব ঐ একই ধরনের।

এই চৈত্যের প্রবেশ মুখেই রয়েছে অম্বামাতার মন্দির, আর একদিকে রয়েছে ধ্বজদণ্ড মন্দির। ওখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য সব দেখে-শুনে ফিরে এলাম লোনাভালায়।

স্টেশনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল—পাঁচটার সময় বম্বে যাবার ট্রেন এল। বম্বের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে ফিরে এলাম যখন তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

সোজাসুজি স্টেশন থেকে বাড়ী না ফিরে বাজারে গিয়ে কিছু তরিতরকারী কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম—কারণ জানি তো যে তারিণীকে যা টাকাকড়ি দিয়ে এসেছিলাম—তাতে সে আর বংশী নিজেরা খেয়েছে, আর বাকি কি আর কিছু রেখেছে!

বাড়ী ফিরে দেখি মহাবিপদ। সকাল থেকে মুড়িসুড়ি দিয়ে বংশী শুয়ে রয়েছে। তাকে এই অবস্থায় দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম: কিরে তোর কি হয়েছে—শুয়ে কেন?

শরীর খারাপ বাবু।

আসলে কি যে তার হয়েছে কিছুতেই বলতে চায় না—শুধু বলে শরীর খারাপ।

আমি তখনই মধুবাবুর দলের প্রোডাকশন সহকারী বাদলকে ডেকে পাঠালাম। তাকে বললাম বংশীকে কোনো একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। সে তাকে ডাঃ সালধানার কাছে নিয়ে গেল। ডাঃ সালধানা তাকে পরীক্ষা করে বললেন: এর কোনো অসুখই হয়নি।

বুঝলুম ব্যাপারটা। কিছুদিন থেকেই সে বাড়ী ফিরে যাবার কথা বলেছিল—এইবারে সে ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছে। যাই হোক, আমি সঙ্গে সঙ্গে তার পরদিনই বি. এন. আর. বম্বে মেলের টিকিট কেটে দিয়ে তাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলাম।

এদিকে একগাদা চিঠি এসে পড়ে আছে কলকাতা থেকে, বেশির ভাগই সব থিয়েটার-মালিকদের এবং বন্ধু-বান্ধবদের। সকলেই তাঁদের থিয়েটারে যোগদানের জন্য আবেদন-নিবেদন করেছেন। গণদেবকে চিঠি লিখেছিলাম ওখানকার সব থিয়েটারের অবস্থা কি জানাবার জন্যে। আমি ভেবে দেখলাম ওখানকার যা অবস্থা, বর্তমানে তাতে যার দিকেই তাকাব, সে-ই আনন্দে আমাকে লুফে নেবে এবং আমি যা দাবি করব তাতেই রাজী হবে। শুধু একমাত্র প্রবোধ গুহমশায় একেবারে চুপচাপ রইলেন—তিনি একটি কথাও আমাকে লেখেন নি। শুনলাম, তিনি কোনো কোনো লোককে বলেছিলেন যে ও-তো এখন নীলামে উঠছে—নীলামে ডাকার মত ক্ষমতা আমার নেই। তারচেয়ে ও ফিরে আসুক, দেখি কোথায় যোগদান করে, দর কোথায় ওঠে, তারপর 'নাইট' হিসেবে আমি ওকে 'বুক' করব।

এদিকে আমি ফিরে এসেই মধুবাবুকে গিয়ে বললাম—এবার যেটুকু কাজ বাকি আছে তা শেষ করে ফেলতে, কারণ অবিলম্বে কলকাতায় ফেরা আমার খুব দরকার। মধুবাবুও আমার অবস্থা বুঝে আমার সেটগুলি সঙ্গে সঙ্গে করে ফেললেন। আমি

মোটামুটি একরকম জানতে পারলাম যে, দিন দশেকের মধ্যেই আমি বোম্বাই-এর পাট ওঠাতে পারব।

বম্বেতে এই ৩।৪ মাসে প্রচুর ফার্নিচার এবং টুকিটাকি অনেক কিছু কিনেছিলাম। সেই সমস্ত জিনিস ঠিকমতো প্যাক করে পাঠানো তো এক মহা সমস্যা হয়ে দেখা দিল। কিন্তু ওখানকার লোকেরা আমায় বললে যে প্যাকিং করার জন্যে এখানে আলাদা লোক পাওয়া যায়। তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলে তারা সুন্দরভাবে প্যাক করে দিয়ে যাবে। সুতরাং আমি বম্বে থেকে রেলওয়ে পার্শেল করলাম শালিমার স্টেশনে—এখান থেকে আমার দারোয়ান বাসদেব এসে বাড়ীতে নিয়ে গেল।

৯ই নভেম্বর শরীরটা ভাল ছিল না—একটু পেটের গোলমাল হয়েছিল। এই অবস্থাতেই সকালে মিঃ বোসের ফ্ল্যাটে গেলাম—কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না সেখানে। তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলাম।

সেদিন শ্যুটিং ছিল, বাধ্য হয়েই স্টুডিও যেতে হল। অবশ্য ডাক্তারের কাছে গিয়ে কিছু ঔষধ খেয়ে খানিকটা আরাম পেলাম। রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাজ করতে হল। এখন তো আমার তাড়া, স্টুডিওতে আমার অনুপস্থিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

শ্যুটিং রোজই চলতে লাগল আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত।

একদিন তখনকার দিনের হিন্দি চিত্র-জগতের নামকরা অভিনেতা মজহর খাঁ এলেন সেটে শ্যুটিং দেখতে। এই মজহর খাঁ মানুষটি ছিল ভারী সুন্দর। অনেকদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ করেছেন। 'সোনার সংসার'-এ আমি যে ভূমিকাটি করেছিলাম—স্যর শঙ্করনাথের—সে ভূমিকাটি তিনি করেছিলেন হিন্দিতে। সম্প্রতি প্রভাত ফিল্মের ভি. শান্তারাম পরিচালিত 'পড়শী' ছবিতে কাজ শেষ করেছিলেন। আসলে তিনি এসেছিলেন শিল্পী নয়ামপাল্লীর কাছে কি একটা কাজে—ওই ফাঁকে আমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। এই দিলখোলা লোকটির সঙ্গে আলাপে বেশ খানিকটা সময় কাটানো গেল।

এই দিনই নয়ামপাল্লী বললেন, বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা তারাপোর-ওয়ালার একটি বুক-ক্লাব আছে। এই ক্লাবের মেম্বার হলে আমার বাড়ীর ঠিকানায় সব বই পাঠিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য, আমি বুক-ক্লাবের সভ্য হয়েছিলাম এবং অনেকদিন পর্যন্ত সভ্য ছিলাম।

একটানা আট দিন শ্যুটিং করার পর বিশ্রাম পেলাম ১৭ তারিখে। সেদিন কোন কাজ নেই।

এ ক'দিন ধরে কলকাতার থিয়েটার কর্তৃপক্ষগুলির চিঠি এবং টেলিগ্রাম এসে জমা ছিল, সকালবেলায় সেইগুলির সব উত্তর দিলাম।

প্রভাত সিংহ রংমহলের তরফ থেকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে আমাকে লিখেছিল—শেষপর্যন্ত তার অনুরোধেই রাজী হয়ে গেলাম। কোনোরকম চুক্তিপত্র নয়—শুধু একটা স্বীকৃতিপত্র—যে, প্রতিদিন অভিনয় পিছু আমি 'এত' করে নেব। তাতেই তারা রাজী হয়েছিল।

তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি আর আমার স্ত্রী বেরিয়ে পড়লাম ইলেকট্রিক ট্রেনে করে জুহু বীচে-র দিকে। এই সাগর-সৈকতটি বেড়াবার পক্ষে ভারী মনোরম। ওখান থেকে চলে গেলাম সাণ্টাক্রুজ বিমানবন্দরে। সেখান থেকে বেশ খানিকটা ঘুরে একটা ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরে এলাম।

১৯ তারিখে 'রাজনর্তকী'-র শ্যুটিং শেষ হল। চিত্রনাট্য অনুযায়ী আমার যা কাজ ছিল, কাগজে-কলমে তা শেষ হল। কিন্তু মধুবাবুর দায়িত্বের কথা ভেবে আমার একটু ভাবনাও হল। ভাবনা কেন হল—সে কারণটা একটু খুলেই বলি।

আমি তো কাজ শেষ হয়েছে বলে ও'রা জানালেই আমি কলকাতা চলে আসব—কিন্তু যদি কোন কারণে আমাকে আর একদিনের জন্যও প্রয়োজন হয়, তখন তো আর আমায় পাওয়া যাবে না। কারণ, আমি একবার কলকাতা চলে এসে কোন থিয়েটারে যোগদান করলে আর তো সেখান থেকে ছেড়ে যেতে পারব না। অনেক সময় তো এমনও হয় যে, সম্পাদনার পর দেখা গেল কোন কোন শিল্পীর ২।১টা 'শট' (যাকে বলে এডিটিং-শট) হলে ভাল হয়, নয়ত যেন একটা ধাক্কা আসছে। তখন শিল্পীকে ডেকে নিয়ে এসে সেই শট নেওয়া হয়। এ তো আমরা এখানে হামেশাই দেখেছি।

আবার এমনও হয় যে, শেষ মুহূর্তে হয়তো চিত্রনাট্যের কিছু অদল-বদল হল, ফলে কিছুদিন শ্যুটিং-এর দরকার হয়ে পড়ল—তখন ?

অর্থাৎ সব দিক বিচার-বিবেচনা করে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে ছাড়তে হচ্ছে—এ একটা সাংঘাতিক দায়িত্বের ব্যাপার। এখানে দু'-একটা রিটেক শটের ব্যাপার হলে আমি এমনই সময় বুঝে একদিন গিয়ে করে দিয়ে আসতাম কিন্তু এখন তো তা হবার উপায় নেই। আমাকে আবার নিয়ে যাওয়া মানে কর্তৃপক্ষের বিরাট খরচের ধাক্কা এবং আমারও কলকাতার সমস্ত প্রোগ্রাম তছনছ করে ফেলা।

যাই হোক, পরদিন মধুবাবু, সম্পাদক শ্যাম দাস এবং প্রযোজক মিঃ ওয়াদিয়া —সবাই 'রাফ প্রিন্ট' দেখে সন্তুষ্ট হলেন এবং আমাকে আর প্রয়োজন নেই বলে রায় দিলেন। আমি অবশ্য প্রোজেকশন দেখিনি; এবং আমি নিজের ছবি দেখি

না—একথা আগেই আপনাদের বলেছি। এইবার সরকারীভাবে আমার চাকরি শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর অ্যাকাউণ্টস বিভাগ এসে আমার সমস্ত পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিলেন এবং আমার ট্রেনভাড়া পর্যন্ত দিয়ে দিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি লোকের কথা আজও আমার মনে হলে শ্রদ্ধায় মনটা ভরে ওঠে। তিনি ওয়াদিয়া মুভিটোনের মালিক মিঃ জে. বি. এইচ. ওয়াদিয়া। এরকম বিবেচনাশীল সপ্রতিভ ভদ্রলোক খুব কম দেখেছি আমার জীবনে—বিশেষ করে ফিল্ম লাইনে।

যাক, এইবার বোম্বাইয়ের বাসা তুলতে হোল।

এই চার মাস বোম্বাইয়ে থেকে শহরটার ওপর কি রকম একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। বহু নতুন বন্ধু সেখানে পেয়েছিলাম, কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেখানে। বাড়ীর বারান্দায় বসে সমুদ্রদর্শন, অর্ধবৃত্তাকার মেরিন ড্রাইভের সুন্দর রাস্তাটির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকলেও ক্লান্তি আসে না—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট—চারদিকেই বেশ একটা ছিমছাম ভাব—এসব ছেড়ে প্রথমটায় আসতেই মন চাইছিল না। সেদিন রাতে মধুবাবু আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করলেন। খুব খানা-পিনা হল। বাড়ী ফিরতে রাত বারোটা বেজে গেল।

রাতে ভাল ঘুম হল না। কারণ ভোরবেলায় ট্রেন ধরতে হবে, এই চিন্তাটা ছিল মনে।

ভোরে আমরা রওনা হলাম বোম্বাই-এর ভি-টি স্টেশনের উদ্দেশে। রাতেই সব কিছু গুছিয়ে রেখেছিলাম। স্টেশনে যাবার পথে ভাসুর নামে একটা চিঠিও রেজেস্ট্রী করলাম জি-পি-ও থেকে। আগের দিন যে-সব জিনিসপত্তর রেলযোগে 'শালিমারে' বুক করেছি, তার রসিদও পাঠিয়ে দিলাম। স্টেশনে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছিল টুকলু (প্রীতি মজুমদার), বাদল (ভাল নাম সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সম্পর্কে মধুবাবুর ভাই এবং রাজনর্তকীর প্রোডাকশন বিভাগে কাজ করতো) এবং নরেন ঘোষ। নরেন ঘোষ হল এরিয়ান্সের প্রাক্তন খেলোয়াড় সুবল ঘোষের ভাই। সে বম্বের জিমখানাতে সাঁতার শেখাতো। তার আর এক পরিচয়, সে ছিল বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের খুড়তুতো ভাই।

এরা এসেছিল আমাকে বিদায় জানাতে।

ট্রেন ছাড়লো সওয়া আটটায়। কিছুদূর এসেই ট্রেন দাঁড়ালো দাদরে। দেখলাম, দাদরে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছেন মিঃ ওয়াদিয়া। সঙ্গে এসেছে শিল্প-নির্দেশক সুধাংশু চৌধুরী, আর মধুবাবুর অন্যতম সহকারী অবনী মিত্র।

মিঃ ওয়াদিয়ার হাতে প্রচুর ফুল। এনেছেন আমার আর আমার স্ত্রীর জন্যে।

ফুলগুলো দু'হাত পেতে গ্রহণ করলাম। সত্যি বলতে কি, মিঃ ওয়াদিয়া যে নিজে আসবেন, এ আমি ভাবতেই পারি নি। ফুলগুলো হাত পেতে নিতে উনি বললেন, মিস্টার চৌধুরী—আপনি শিল্পী—আপনাদের জন্যেই তো আমরা।—না, না, এ আপনি কি বলছেন ? আপনার কথা আমার চিরদিনই মনে থাকবে মিঃ ওয়াদিয়া।

এরপর আরো কিছু কথা। তারপর ট্রেন ছেড়ে দিল। যতক্ষণ দেখতে পেলাম, দেখলাম মিঃ ওয়াদিয়া রুমাল নাড়ছেন।

বিদায়ের মুহূর্তে আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

জীবনে অনেক মানুষ দেখেছি, কিন্তু মিঃ ওয়াদিয়ার মধ্যে যে সুন্দর একটি চরিত্র খুঁজে পেয়েছি, তা সত্যিই বিরল।

মিঃ ওয়াদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক এখানেই শেষ নয়। যখনই তিনি কলকাতায় এসেছেন, হাজার কাজের মধ্যেও আমার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা করে গেছেন।

পুণা পৌঁছলাম সাড়ে দশটায়। আমাদের পরের ট্রেন সাড়ে বারোটায়। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে ওয়েটিং রুম থেকে স্নান সেরে নিতে হবে। স্নানান্তে প্রাতঃরাশও গ্রহণ করলাম স্টেশনের রেস্তোরাঁতেই।

টিকিট কিনেছি এম-এস-এম রেলপথের হাসান স্টেশনের। উদ্দেশ্য ওখান থেকে গোমতেশ্বর দর্শনে যাবো। মহীশূর রাজ্যের মধ্যেই এই স্থানগুলো।

ট্রেনে উঠেছি। একেবারে শূন্য কামরা। শুধু আমরাই আছি। ট্রেনের কামরায় এই শূন্যতা যেন ভালো লাগছিল না।

সেদিন সন্ধ্যার পর 'মিরাজ' পৌঁছে রাতের আহার গ্রহণ করলাম। এখানে বেশ কিছু সময় ট্রেন দাঁড়ায়।

তারপর আবার যাত্রা শুরু। কামরায় ভিড় নেই। ভালোই হলো। নির্বিঘ্নে রাতটা কাটবে। জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

ঘুমের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল রাত। সকালে হাভেরী স্টেশনে চা-পানের পাট চুকিয়ে নিলাম।

বসে আছি জানালার ধারে। দেখছি, সুউচ্চ মালভূমির ওপর দিয়ে আমরা চলেছি। এ অঞ্চলের মানুষ যে নিদারুণ রুক্ষতার মধ্যে বাস করে, চোখের দেখাতেই তা বুঝতে পেরেছি।

বেলা তখন সওয়া আটটা। পৌঁছেচি হরিহর স্টেশনে। এখান থেকে আরম্ভ হল মহীশূর রেলপথ। এদিকে মারাঠা সীমান্ত শেষ, শুরু হল মাদ্রাজ। সমস্ত পরিবেশ, পটভূমিকা বদলে গেল। মায় লোকজনের আকৃতি-প্রকৃতি পর্যন্ত। এবার

অসুবিধেয় পড়লাম লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে। ইংরেজী-জানা লোকজনদের সঙ্গে তবু কথা বলা যায় ;—নয়তো হিন্দী এখানে কেউ-ই বোঝে না বলতে গেলে।

ট্রেন থেকে দেখা, তবুও দেখলাম এখানকার মাটির রঙ কালো। এমন আর কোথাও দেখিনি। আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম, এখানে সিনেমা হলের ছড়াছড়ি। খুব কম জায়গা আছে, যেখানে সিনেমা হল নেই। ট্রেনে যেতে নজরে পড়লো, দেবাঙ্গিরী বলে একটি ছোট্ট গ্রাম, সেখানেও রয়েছে সিনেমা।

এবারে আমাদের পথ আরো ওপর দিয়ে। মাঝে 'কাডুর' নামে একটি স্টেশনে গাড়ী দাঁড়ালো। সেখানেই দুপুরের আহার্য গ্রহণ করলাম। তারপর আরো কিছুদূর এসে 'আরসেকিরি' স্টেশনে গাড়ী বদলের পালা। তবে গাড়ী থেকে নামতে হল না। আমাদের কামরাটা জুড়ে দেওয়া হল হাসানগামী ট্রেনের সঙ্গে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আরসেকিরির উচ্চতা ২৬৪৫ ফুট।

এখান থেকে হাসান আরও উঁচু—৩০৯৪ ফুট। বেলা চারটের সময় আমরা হাসান গিয়ে পৌছলুম।

কিন্তু সেখানে নেমেই তো আমাদের চক্ষু চড়কগাছ! একটাও মোটরগাড়ী নেই। জায়গাটা যদিও খুব ছোট, কিন্তু একটাও মোটরগাড়ী পাওয়া যাবে না—এটা তো ভাবিনি একবারও। গাড়ীর মধ্যে পাওয়া যায় 'জাটকা'। 'জাটকা' খানিকটা 'এক্কা'-র মত হলেও বসাটা তার মত স্বচ্ছন্দ নয়। ঘোড়ায় টানে বটে, তবে বসবার জায়গাটা হোল সমতল, অর্থাৎ 'বাবু' হয়ে বসতে হবে। একদিকে জিনিসপত্র রেখে আর একদিকে বাবু হয়েই বসলাম—কি আর করা যাবে, যস্মিন দেশে যদাচারঃ।

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে ওখানে থাকার হোটেল বলে তেমন কিছু নেই—তবে যাত্রীদের জন্য বাংলো আছে—আমাদের এদিকে যাকে ধর্মশালা বলি, খানিকটা তাই, তবে বেশ উন্নত ধরনের। ওখানে বাংলোয় পৌছে যে লোকটি তার তদারক করে, তাকে সব বললাম: একটা গাড়ী কোনরকম যোগাড় করে দিতে। আমরা এসেছি এখানে গোমতেশ্বর দর্শন করতে, যাব কি করে। এই 'জাটকা' করে এতখানি পথ তো বাপু যেতে পারব না।

লোকটি তো মাথা চুলকে ঘাড় নেড়ে বললে: গাড়ী তো এখানে পাওয়া যায় না সব সময়। একজন একটু দয়াপরবশ হয়ে বললে: আচ্ছা, আমেদ আলির একটা ছোট 'বাস' আছে। বলেন তো তাকে ডেকে আনতে পারি।

সুধীরা বললে: যাবো তো দুটো প্রাণী, এর জন্যে একটা 'বাস' ভাড়া করার কি দরকার।

আমি তবু বললাম : কত বড় 'বাস'?

সে বলল : ছোট 'বাস' বাবু—৭।৮ জন লোক যেতে পারে।

আমি বললাম : ঠিক আছে, নিয়ে এস সে লোককে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে এনে হাজির করলো একটি লোককে এবং তার গাড়ী সমেত। লোকটির নাম আমেদ আলি। এরা যাকে বাস বলছিল—আসলে সেটি 'স্টেশন ওয়াগন' আর কি! যাই হোক, আমেদ আলির সঙ্গে দরদস্তুর করে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পৌনে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম শ্রাবণ বেলেগোলার উদ্দেশে।

হাসান থেকে তার দূরত্ব হল ৩১ মাইল—ওখানেই আছেন জৈনদের দেবাদিদেব গোমতেশ্বরের মূর্তি।

গাড়ী ছেড়ে দিল। ফাঁকা রাস্তা—সুন্দর পীচের রাস্তা। আমেদ আলির সঙ্গে একজন লোক ছিল। ফাঁকা রাস্তায় হু-হু করে গাড়ী ছুটে চলেছে—এত স্পীডে চলেছে যে স্পীড-মিটারের দিকে তাকিয়ে দেখি গাড়ীর গতি কোনো সময়ই ৫০ মাইলের কম নামছে না, কখনও কখনও ৬০ মাইলও উঠছে। আমি একটু অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। মনের অস্বস্তি মনে চেপে রেখে তাকে শুধু একবার বললাম : ড্রাইভার সাহেব, এত স্পীডে যাবার কি দরকার—একটু আস্তে গেলে হয় না?

আমেদ আলি হেসে বলল : কিছু ভয় পাবেন না বাবুজি—এই স্পীডে তো আমরা হামেশাই যাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একটু তাড়াতাড়ি না গেলে অন্ধকার হয়ে যাবে—মন্দির দর্শন করবেন কি করে?

আমি আর কিছু বললাম না। তবে সমস্ত রাস্তাটাই আমি আর সুধীরা দু'জনেই ভয়ে সিঁটিয়ে বসে থাকলাম।

বেলেগোলা পৌঁছাতে তখন ৭ মাইল বাকি ; আমেদ আলি আমাদের দেখিয়ে বললে : ঐ দেখুন বাবুজী, গোমতেশ্বরের মূর্তি। ওখান থেকেই পাহাড়ের চূড়ার ওপর গোমতেশ্বরের মূর্তি দেখা গেল। বিরাট মূর্তি—৬০ ফুট উঁচু।

আমরা পাহাড়ের পাদদেশে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। ওখান থেকে পাহাড়ে ওঠার সিঁড়ি আছে। ৫০০ সিঁড়ি—আমি দেখলাম যে এত সিঁড়ি ভেঙে ওঠা দুঃসাধ্য ব্যাপার। দেখলাম ওখানে চেয়ার ভাড়া পাওয়া যায়—চেয়ারের দু'দিকে বাঁশ বাঁধা—দু'জন লোক দু'দিকে কাঁধে নিয়ে ওঠে। আমি দু'খানা চেয়ার ভাড়া করলাম। সুধীরা প্রথমে আপত্তি করেছিল এই বলে যে, মানুষের কাঁধে চড়ে তীর্থে দেবদর্শন করলে কোনো ফল হয় না। সে পায়ে হেঁটেই উঠবে।

আমি তখন তাকে বোঝালুম যে, ওটা মনের ভুল। নইলে যারা কেদারবদরী

ও অন্য কোন দুর্গম তীর্থস্থানে যায়, তারা 'ডাণ্ডি'তে করে যেত না। আর তাছাড়া ৫০০ সিঁড়ি ভাঙ্গার পর শরীরের কি অবস্থাটা হবে সেটা ভেবে দেখ।

অনেক করে বোঝাতে স্বধীরা রাজী হল। আমরা চেয়ারে করেই পর্বতশীর্ষে গোমতেশ্বরের মূর্তির পাদদেশে গিয়ে যখন পৌছলাম, তখন গোধূলির ম্লান আলোয় জায়গাটা অদ্ভুত স্বপ্নময় দেখাচ্ছিল। আমি তখনই ওখানে হাত মুখ ধুয়ে পূজো দিলাম।

তারপর অন্ধকার হয়ে আসাতে পুরোহিত ফ্লাড লাইট জ্বেলে সব দেখালে। ফ্লাড লাইটের আলোয় মূর্তির খুব কাছে গিয়ে দেখলাম—সব থেকে অবাক লাগল পাথর খোদাই করা—অসম্ভব মস্থণ। মনে হয় যেন একটি মাছি বসলেও পিছলে যাবে। আমি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এত চকচকে পালিশ করা কি করে হোল?

উত্তরে পুরোহিত ভাঙা হিন্দি ও ইংরাজীতে মিশিয়ে যা বললেন তার মর্মার্থ এই যে: বছরে একটা বিশেষ দিনে এঁকে দুধে স্নান করানো হয় ২৪ ঘণ্টা ধরে। সেদিন ভক্তরা এসে সমস্ত দিন ধরে এবং রাত ধরে ঘড়া ঘড়া দুধ ঢালে দেবতার গায়ে। সেদিনটি ছাড়াও মাঝে মাঝে যাদের মানত থাকে, তারা এসে মূর্তিকে খাঁটি দুধে স্নান করায়, তাই এঁর গা এত মস্থণ ও চক্‌চকে।

গোমতেশ্বর দর্শন শেষ হতেই শুরু হয়ে গেল টিপ-টিপ বৃষ্টি। আমরা আর দেরি না করে চেয়ার গিয়ে বসলাম নামবার জন্যে। বৃষ্টি থামল না—সিঁড়িগুলি বেশ পিচ্ছিল হয়ে পড়ল। বাহকগুলি খুব অভ্যস্ত এবং দক্ষ, তারা বেশ সন্তর্পণে অথচ দ্রুত নেমে এল আমাদের নিয়ে। কিন্তু আমরা যখন নীচে এসে পৌছলাম, তখন ভিজে একেবারে কাক-ভেজা হয়ে গেছি।

অতিরিক্ত জামা-কাপড় সঙ্গে ছিল না—অতএব ঐ ভিজা কাপড়েই বাহকদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে 'বাসে' উঠে বসলাম।

আসবার সময় আমেদ আলি সাহেব গাড়ীর গতি আর পঞ্চাশ মাইলে না তুলে আস্তে আস্তেই চালাতে লাগল। কিন্তু চালাতে চালাতে নানারকম ডাকাতি এবং ডাকাতের গল্প ফেঁদে বসল। একে নির্জন রাস্তা, তার ওপর অন্ধকার—এ অবস্থায় যদি আপনি শোনেন কিভাবে এসব জায়গায় ডাকাতি হয়, কাউকে প্রাণে মেরে দেয়, কাউকে হয়ত মারধর করে লুটপাট করে নিয়ে হাত-পা বেঁধে পথের ধারেই ফেলে দিয়ে চলে গেল—তাহলে আপনি যতই সাহসী পুরুষ হোন, আপনার গাটা ছমছম করবেই। স্বধীরা তো আমার খুব গা-ঘেঁষে এসে বসল। আমারও যথেষ্ট ভয় করছিল এবং মুখে সাহস দেখিয়ে বললাম: ভয় কিসের? আমি আছি তো।

বললাম তো 'আমি আছি তো'—কিন্তু সত্যিই যদি কিছু হোত, তাহলে আমি আর কিই বা করতে পারতাম সেই বিদেশ-বিভূঁই জায়গায়। একবার মনে হল যে এরা ডাকাত নয়তো! কিংবা হতেও পারে, কিছুই বলা যায় না। আর তখন করবারও তো কিছু ছিল না। সম্পূর্ণ এদের মর্জির ওপর নির্ভর করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মেরে-কেটে ফেললেও কেউ জানতেও পারবে না—সাহায্য করা তো দূরের কথা।

কিছুক্ষণ পরে তারা এসে থামল একটা জায়গায়। সেটাও এমন কিছু শহর নয়—লোক-চলাচল খুব কম। বেশ নির্জন চারিধার। বললে: আমার এখানে এক আত্মীয় থাকে—আমরা কয়েক মিনিটের জন্য গিয়ে দেখা করে আসব।

আমি কি আর বলি। এমন ভাব দেখলাম যেন মোটেই ভয় পাইনি। শুষ্ক মুখে বললাম: যাও, কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাব আর আসব।

তারা চলে গেল।

সেই অন্ধকার নির্জন পথপ্রান্তে আমি আর সুধীরা বসে যেন মহাকালের পদধ্বনি শুনতে লাগলাম। সময় আর কাটে না—এক একটা মিনিট যেন এক-একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। মনের নার্ভাস ভাবটাকে কাটাবার জন্যে আমি একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলাম।

সুধীরা বলতে লাগল: এরকম তাড়াহুড়ো করে না বেরিয়ে কাল সকালে এলেই হোত। এদের মনে যে কি আছে কে জানে বাবা। এখন ভালোয় ভালোয় বাংলোয় ফিরতে পারলে বাঁচি।

আমি ওকে সাহস দেবার জন্যে বললাম: তুমি না হয় একটু বস, আমি একটু ঘুরেফিরে দেখি ওরা কোথায় গেল।

—না না, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। তুমি এইখানেই বস, আমি একা থাকতে পারব না।

অগত্যা চুপচাপ বসে রইলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে মূর্তিমান দুজন খুব হেসে গল্প করতে এসে হাজির হল। এসেই বলল: বাবুজী, মাপ করবেন। একটু দেরি হয়ে গেল। এখানে আমার শ্বশুরবাড়ী কিনা—অনেকদিন আসিনি, তাই একটু মুলাকাত করে এলাম। ছাড়তে চায় না—বলে বসো—চা খেয়ে যাও। তাই একটু দেরি হয়ে গেল।

মনের বিরক্তি প্রাণপণে চেপে রেখে বললাম: আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন বাংলোতে ফিরে চলো দেখি—রাত অনেক হয়েছে।

কিছু 'ফিকর' করবেন না—এখুনি পৌঁছে যাব। বলে গাড়ী ছেড়ে দিল। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে, শেষ পর্যন্ত কোনোরকম অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি।

হাসানে পৌঁছলাম যখন, তখন রাত্রি ৯-৩০ বেজে গেছে। আমেদ আলিকে জিজ্ঞাসা করলাম: খাবার-দাবার কোথায় পাওয়া যায় বল দেখি?

সে তখন মাথা চুলকে বলল: তাই তো একথাটা তো আমার মনে হয়নি। আপনাদের তো সত্যিই খাওয়া হয়নি। এখানে এত রাত্রে কি খাবার পাওয়া যাবে! আচ্ছা দেখি।

আমি তাকে টাকা দিলাম। সে বেরিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল: নাঃ, দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে—কোথাও কিছু পাওয়া গেল না।

আমি তো একেবারে বসে পড়লাম। হতাশভাবে বললাম: তাহলে আমরা কি খাব রাত্রে?

কি ভেবে আমেদ আলি সাহেব তখুনি আবার বেরিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে এক মুসলমান হোটেল থেকে কিছু ভাজাভুজি, আর কিছু ওদেশীয় খাবার নিয়ে এল।

মুসলমান দোকান থেকে এনেছে শুনে সুধীরা প্রথমে খেতে চাইল না, আমি তাকে বোঝালুম যে 'বিদেশে নিয়ম নাস্তি'। বিদেশে অত মানতে গেলে চলে না। তাছাড়া এখন আর পাচ্ছ কি যে খাবে। ট্রেন-জার্নি, মোটর-জার্নি—তার ওপর ভেজা হয়েছে—সুতরাং শরীরের ওপর বেশ ধকল যাচ্ছে—এর ওপর রাতে না খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। নাও, খেয়ে নাও।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুধীরা সামান্য কিছু খেল।

তারপর আমেদ আলিকে কাল সকালেই গাড়ী আনতে বলে দিয়ে ঘরের দরজা বেশ ভাল করে বন্ধ করে শুয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠবার আগেই দেখি আমেদ আলি গাড়ী নিয়ে এসে হাজির।

আমরা তাড়াতাড়ি স্নানটান সেরে প্রথমেই গাড়ী নিয়ে গেলাম স্টেশনে। সেখানে চা, টোস্ট, ডিমের পোচ প্রভৃতি বেশ এক পেট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বেলা সাতটা নাগাদ বেলুড়ের উদ্দেশ্যে। পাঠক যেন কলকাতার কাছে বেলুড়ের কথা ভেবে বসবেন না—এ বেলুড় হল হাসান থেকে ২৪ মাইল দূরে।

এখানে আছে 'চেন্নাকেশব'-এর মন্দির। 'চেন্না' মানে হল সুন্দর অর্থাৎ সুন্দর কেশব বা কৃষ্ণের মূর্তি। এই মূর্তি নির্মাণ করান রাজা বিষ্ণুবর্ধন হয়শালা, ১২শ শতাব্দীতে।

এই মন্দিরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মন্দিরের শিখরগুলি কালের প্রভাবে সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু দেওয়ালগুলি এবং 'গোপুরম'গুলি এখনও অক্ষত অবস্থায় দণ্ডায়মান। শিখরগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও পরবর্তীকালে ছাদ করে দেওয়া হয়েছে।

চেন্নাকেশব'-এর মন্দিরে দুটি বিশিষ্ট শিল্পকর্মের ধারা দেখা যায়। আসল মন্দিরটি হয়শালা শিল্পপদ্ধতিতে তৈরী এবং 'গোপুরম'গুলি হল দ্রাবিড় পদ্ধতিতে— মনে হয় এগুলি অনেক পরে পরবর্তী কোন রাজার দ্বারা নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটি কালো পাথরের তৈরী এবং 'গোপুরম'গুলিতে অপূর্ব কারুকার্যের নিদর্শন দেখা যায়। মন্দিরের গাত্রের নিম্নভাগে খোদিত রয়েছে অপূর্ব সব হাতির মূর্তি এবং নর্তকীদের অপরূপ নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিমা। আর রয়েছে রুদ্রবীণা এবং বুলবুল তরঙ্গ।

একদম ভিতরে যাকে বলা হয় গর্ভগুহা, সেখানে রয়েছে 'চেন্নাকেশব' বা সুন্দর কেশবের অপূর্ব মূর্তি। এ মূর্তিটি হল শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্তি—বহুমূল্য অলঙ্কারে সারা দেহ সজ্জিত। মন্দিরে ঢুকবার মুখে সিঁড়ির ওপর রয়েছে একটি চমৎকার গুরুড়ের মূর্তি।

এখানে আর একটি দ্রষ্টব্য জিনিস হল কালোপাথরের ৪৮টি স্তম্ভ। প্রত্যেকটি স্তম্ভই হল বিভিন্ন আকৃতির এবং বিভিন্ন ধরনের এবং এর প্রত্যেকটিতেই অদ্ভুত সুন্দর কারুকার্য করা। একটি স্তম্ভের সঙ্গে অপরটির কোনো মিল নেই—কি আকৃতি-প্রকৃতিতে, কি শিল্পকর্মে। বেশীর ভাগ শিল্পকর্মই রূপায়িত করেছে আনন্দ রস এবং শৃঙ্গার রসকে। কিন্তু প্রত্যেকটি শিল্পকর্মই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এমনকি কয়েকটি নর্তকীর হাতের অলঙ্কারগুলি এমনভাবে খোদাই করা যে, সেগুলি আলগাভাবে হাতে পরানো হয়েছে বলে মনে হয়। সেগুলি আবার হাত দিলে টুং-টাং করে আওয়াজ তোলে।

ছাদের ভিতরের দিকে ছিদ্র-করা বিচিত্র ধরনের নক্‌শা করা রয়েছে দেখলাম, তার ভিতর থেকে 'ফ্লাড লাইট' দেওয়ায় চমৎকার শোভা ধারণ করেছে। এই পরিকল্পনাটি করেছিলেন জনকচারি।

এখান থেকে চলে গেলাম হলেবিদ। হয়শালা রাজাদের রাজধানী দেবসমুদ্রম্। সমুদ্র বলে কিছু নেই অবশ্য। জায়গার নামটাই ঐ। এখানে দু'টি মন্দির আছে— হয়শালেশ্বর এবং কেদারেশ্বর। মন্দিরের কারুকার্য বেলুড়ের মতই। দুটি মন্দিরেই একলিঙ্গ শিবের মূর্তি বিরাজমান। মন্দিরের সামনে দুটি সুন্দর মণ্ডপ এবং মণ্ডপের ধারে পাথরের খোদাই-করা বিরাট নন্দী-ষণ্ডের মূর্তি।

হয়শালেশ্বর এবং কেদারেশ্বরে জৈনঋষিদের মূর্তিও আছে।

এইসব দেখাশোনার পর আমরা হাসানে ফিরে এলাম সওয়া একটা নাগাদ। এরপর ঘটলো একটি বিশেষ ঘটনা।

ড্রাইভার আমেদ আলি এসে বলল : বাবুজী, আমাদের গরীবখানায় একটু পায়ের ধুলো দিতে হবে।

আমি বললাম : কেন ?

আমেদ বলল : কাল রাত্রে আপনাদের খাওয়া হয়নি। এই শুনে আমার পিতাজী আপনাকে আর মেমসাহেবকে নিমন্ত্রণ করেছেন ওখানে গিয়ে খেতে।

আমরা সকালে বেশ ভাল করে পেটঠেসে খেয়ে নিয়েছিলাম, সেইজন্যে মোটেই খিদে ছিল না—তাই বললাম : আলি সাহেব, তোমার বাবাকে আমার নমস্কার জানিয়ে বোলো—তিনি যে নিমন্ত্রণ করেছেন, এর জন্যে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু এখন আমাদের খিদে মোটেই নেই।

আমেদ খুব ক্ষুণ্ণ হল। সে বললে : আব্বা না খেয়ে আপনার জন্যে বসে আছেন! আপনারা না গেলে তাঁর মনে খুব দুঃখ হবে।

কি আশ্চর্য! তাঁর সঙ্গে আলাপ নেই, পরিচয় নেই। এক প্রদেশের লোকও নই আমরা, তার ওপর ভিন্ন জাতি—হঠাৎ আমার ওপর এত দরদ উথলে উঠল কেন? কাল রাতে ভাল করে খাওয়া হয়নি বলে? অদ্ভুত তো! ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমার একটা ভীষণ কৌতূহল হল। আমি বললাম : আচ্ছা চল, আমি তোমার আব্বার সঙ্গে দেখা করে বলে আসছি, তাহলে হবে তো!

আমি আমেদের সঙ্গে গেলাম তার বাড়ী। আমাকে দেখেই আমেদের পিতা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। পক্ক কেশ, শুভ্র দাড়ি, লম্বা ঋজু দেহ—সমস্ত চেহারার মধ্যে বেশ একটা অভিজাত্য আছে।

উনি বললেন : কাল থেকে আপনি না খেয়ে আছেন—এটা শুনেই আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন—আপনার ধারনাই খারাপ হয়ে যাবে আমাদের দেশ সম্বন্ধে যে, এমন জায়গায় গেলুম যেখানে খাওয়া মেলে না! এটা আমাদের বদনাম। আমাদের এ-গরীবের বাড়ীতে আপনাকে না খাইয়ে ছাড়ছি না।

আমি দেখলাম, এই বৃদ্ধের কথার মধ্যে এতটুকু কৃত্রিমতা নেই। মুগ্ধ হলাম তাঁর কথায়। মানুষের কাছে হৃদয়ের আবেদনটাই বড়ো। জাতি, ধর্ম, সংস্কার যেখানে উহ্য হয়ে যায়। বললাম, সত্যি বলছি আলি সাহেব, আমরা একদম খেতে পারবো না।

দেখলাম, বৃদ্ধের মুখখানি বিষণ্ণতায় ভরে গেল। তার চোখদুটিও সজল হয়ে উঠলো। বললে, বুঝেছি—আপনারা আমির আদমী, এই গরীবের বাড়ীতে—

—না না, আলি সাহেব, একি বলছেন! বললাম, আচ্ছা এক কাজ করুন, আমাদের দিন, এখানেই খাচ্ছি, তারপর বাকিটা আমাদের টিফিন-কেরিয়ারে ভরে দিন, রাতে ট্রেনে বসে খাবো।

বৃদ্ধের মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠলো—বৃহৎ আচ্ছা বাবুজী, তাই করুন।

আমেদ আলি আমার গাড়ী থেকে টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে এলো। বাড়ীর মেয়েরা তাতে পোলাও, মাংস ও আরো নানারকম খাবার ভরে দিলো। হাত পেতে নিলাম বৃদ্ধের দেওয়া ভালোবাসার উপহার।

এবারে বিদায় নেবার পালা। বিদায়ের মুহূর্তে মনটা ব্যথায় ভরে উঠলো। তবু বিদায় নেয়া হল।

কতোদিন হয়ে গেছে, আজো আমেদ আলির বৃদ্ধ পিতার স্মৃতিটা আমার মনের পর্দায় অম্লান।

এবারে ট্রেন ধরলাম কৃষ্ণরাজ সাগরের।

কৃষ্ণরাজ সাগরে পৌছলাম সন্ধ্যা সাতটায়, কিন্তু স্টেশনে না পেলাম কোন গাড়ী, না পেলাম একটা কুলি। শেষটা একটা ছোট বাস মিললো। সেই বাসযোগে আমরা স্টেট হোটেলে এলাম।

হোটেলের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে নানা রঙের আলোর সমারোহে অজস্র ফোয়ারা—এক সুন্দর মোহময় পরিবেশ রচনা করেছে।

হোটেলটির সবকিছুই সুন্দর। সর্বত্র মার্জিত শিল্প-রুচির ছাপ। নানা জাতের বৃক্ষবিন্যাসের মধ্যে আলো, ফোয়ারা—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

সবচেয়ে সুন্দর লাগে হোটেলের পিছনে পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে-আসা উচ্ছল ঝর্ণাধারা। যেখানে বৃক্ষের মধ্যে নানা রঙের আলোর ইশারা।

সমস্ত পরিবেশ মনে করিয়ে দেয় অদেখা স্বপ্নপুরীর কথা।

হোটেলের কাছেই একটি মনোরম হ্রদ। বৃহৎ না হলেও সুন্দর। হ্রদের মাঝখানে একটি সুউচ্চ ফোয়ারা—ওপারেও অজস্র ছোট ছোট ফোয়ারা, যেগুলি দেখবার মত।

তারপর সেদিন ছিল শনিবার। শনিবার আর রবিবারেই এই আলোকসাজের বাহার।

আরো একটি কথা, এখানকার ফোয়ারার জল আলোর স্পর্শে রঙিন। নয়তো

এদিকে সাধারণভাবে কোন আলো নেই। যেন সৌন্দর্যের জন্যে এই পরিবেশটিকে এমন অন্ধকার করে রাখা। আলোর বিন্যাসের মধ্যে এই যে কিছুটা অন্ধকার পরিবেশ রচনা—এও অনুপম শিল্পকল্পনা। আমরা সেই অন্ধকার স্থানটির মধ্যে দিয়ে হেঁটে এলাম। অন্ধকার পেরিয়ে মনে হল, সত্যি 'অন্ধকারের রূপ' আছে।

সারাদিন পথ-চলার ধকল গেছে। ক্লান্তি বোধ করছিলাম। এবারে ফিরে এলাম হোটেলে।

হোটেলে আরামের কোন ত্রুটি নেই। যেমনটি চাই তারও বেশি রয়েছে আমাদের জন্যে। সুতরাং একটি রাত আরামেই কাটলো।

রাত ভোর হয়েছে। স্নানাদিও সেরে নিয়েছি। তারপর বেড়াতে বেরিয়েছি। বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছি বাঁধের কাছে। আসার পথেই দেখেছি পূর্বতন মহারাজার মর্মরমূর্তি।

বেড়াতে বেড়াতে উঁচু বাঁধের ওপর এলাম। এখান থেকে দেখলাম সামগ্রিক পরিবেশ—যা-কিছু দেখছি, সুন্দর লাগছে।

সুন্দর লাগলো বৃন্দাবন গার্ডেনস্, যার একদিকে বয়ে চলেছে স্বচ্ছসলিলা কাবেরী—যে-নদীর নামের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে রোমান্টিকতা, যে-নদীর নাম সুদূর অতীত কাল থেকে ভারতের মানুষের কাছে 'প্রিয়' হয়ে আছে।

বৃন্দাবন গার্ডেনস্-এ যেসব ফোয়ারাগুলো রয়েছে, তার জল কিন্তু এই কাবেরী নদীরই। পাইপগুলো এমনভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যা বাইরে থেকে দেখা যায় না।

বাঁধের শেষ প্রান্তে যেতেই পড়লাম গিয়ে একটি ছোট্ট গ্রামে। এখানে একটি মন্দির আছে—মন্দিরটি দর্শন করে এবং যথারীতি পূজো দিয়ে হোটেলের বাগানে সেই লেকের ধারে ফিরে এলাম।

ওখানে লেকটি ঘুরে বেড়াবার জন্য মোটর-বোট আছে। বারতিনেক পুরো ঘুরিয়ে আনলে এক টাকা ভাড়া লাগে মাথাপিছু। আমরা কয়েকবারই ঘুরলাম ঐ ভাড়া দিয়ে। ভারি মনোরম লাগছিল। তারপর বেলা বেড়ে যেতে হোটেলে ফিরে এলাম। এখান থেকে মহীশূরের যে-হোটেলে থাকব, সেই মেট্রোপোল হোটেলে ফোন করে থাকার বন্দোবস্ত পাকা করে নিয়ে, তাদের হোটেলেরই গাড়ী পাঠাতে বললাম আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী এসে হাজির। লাঞ্চ খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম বেলা দেড়টা নাগাদ।

প্রথমে এলাম শ্রীরঙ্গপত্তম। টিপু সুলতানের সময়ের দুর্গ যদিও অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে এখনও, তবুও অযত্নে ও অনাদরে সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়ে আছে। ফোর্টের ভিতরে গিয়ে আমরা সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ভিতরে আছে শ্রীরঙ্গের মন্দির, এইটিই রঙ্গনাথমের আদি পীঠস্থান। এর কাছেই আছে বড মসজিদ। মন্দির ও মসজিদ প্রায় পাশাপাশি। আগের দিনে শান্তিপূর্ণভাবে দুই সম্প্রদায়ই নিজের নিজের ধর্ম নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকত। অন্যান্য দ্রষ্টব্য জিনিসগুলির মধ্যে আছে কাবেরী নদী ও দুর্গের প্রাকারের মধ্যবর্তী স্থানটিতে যেখানে একটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত ছিল এবং তা ভেঙে দিয়ে শত্রুরা দুর্গ মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। বিস্তারিত বিবরণ সাইনবোর্ডে লেখা আছে। দরিয়া-দৌলত এবং টিপুর কবর। দুর্গের মধ্যে আরও কতকগুলি জায়গা বিশেষভাবে চিহ্নিত আছে—যেখানে টিপু বিভিন্ন কাজ করেছিলেন বলে কথিত। যে তেঁতুল গাছটির কাছে টিপু আহত হয়ে পড়েছিলেন, সে-গাছটি এখনও আছে। এইসব ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ জায়গাগুলি বেশ ভালভাবেই সংরক্ষিত আছে।

শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গ দেখে বেরুলাম সওয়া তিনটার সময়। ওখান থেকে চললাম সোমনাথপুর মন্দিরের দিকে। এর দূরত্ব হল ২০ মাইল। এই মন্দিরের দেবতা হলেন কেশব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। একসঙ্গে পাঁচটি শিগর ছিল, এখন মাত্র তিনটি মন্দিরের শিখর সম্পূর্ণভাবে মহাকালের ঝডঝাপ্টাকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে—বাকিগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অপূর্ব কারুকার্য-করা মন্দিরগুলি। সমগ্র মন্দিরের দেওয়ালে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই যেখানে শিল্পী তাঁর শিল্পকলার স্বাক্ষর রাখেননি। এসবই হল জনকচারি পরিকল্পিত হয়শালা শিল্প-পদ্ধতিতে তৈরি।

এখানে আরও কয়েকটি পুরোনো মন্দির রয়েছে অনাদৃত অবস্থায়, যেমন—দেখলাম পঞ্চলিঙ্গের মন্দিরের ছাদের ওপর বড বড় ঘাস গজিয়েছে এবং মনের আনন্দে গবাদি পশু সেই ঘাস খাচ্ছে। এসব মন্দিরের বিগ্রহ স্থানান্তরিত হয়েছে—সুতরাং পূজার্চনাও আর হয় না।

তারপর মহীশূরের পথে যেতে পড়ল চামুণ্ডি পাহাড়। এই মন্দিরে আছে মহিষ-মর্দিনীর মূর্তি। দেবীর মাথাটি আবার রজতনির্মিত। পাহাড় থেকে একটু নেমে গেলেই পথের মাঝে পডবে বিরাট নন্দী-বৃষকে। এখানে যে কেন, কি উদ্দেশ্যে এই বৃষের আবির্ভাব ঘটলো, তা বলা দুঃসাধ্য। এই পাহাড় থেকে সমগ্র মহীশূর শহরটিকে দেখা যায়—রাত্রি বেলায় দেখতে অপূর্ব লাগে। হাজার হাজার ইলেকট্রিক বাতির সমারোহে সারা শহরটিকে যেন একটি মায়ানগরী বলে মনে হয়।

পাহাড় থেকে নেমে এলাম শহরে। আসবার সময় 'ললিত ভবনে'র পাশ দিয়ে

আসতে হল। 'ললিত ভবন' হল চমৎকার একটি বিরাট অট্টালিকা—বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তিদের থাকবার জন্য মহারাজা বিশেষভাবে তৈরী করেছেন। এখানে ভাইসরয়, রাজা-মহারাজা বা ঐ শ্রেণীর বিশিষ্ট মাননীয় অতিথিদের ছাড়া অন্য কারুর থাকবার অধিকার নেই। এসব দেখে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ এলাম হোটেল মেট্রোপোলে। কৃষ্ণরাজ সাগর থেকে এখান পর্যন্ত মোটরে ঘোরা হয়েছে ১০২ মাইলের মত।

হোটেলে নিজের ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়লুম।

পরদিন (২৫।১১।৪০) সকাল সাতটার সময় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলুম। এ কদিন ঝড়ের বেগে দিনরাত খালি ঘোরা হয়েছে—অনেকগুলো চিঠিপত্র লেখার ছিল, একটাও লিখতে পারিনি—এমন কি বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত নয়। আজ কয়েকখানা জরুরী চিঠি লেখা শেষ করে তারপর শহর পর্যটনে বেরুলাম।

প্রথমে গেলাম টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুটে। ওখানে নানারকম হাতের কাজের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন দেখা গেল। কিছু কেনাকাটাও করলাম। মহারাজার প্রাসাদের পাশ দিয়ে এলাম। বিরাট গেট ধরে এদিক-ওদিক থেকে যেটুকু পারা যায় বাইরে থেকেই দেখলুম—ভেতরে যাওয়া গেল না। আর ভেতরে যেতে দেবেই বা কেন—মহারাজার পরিবারের লোকেরা তো রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অফিসে গেলাম। দেখলাম ওখানে যে লাইব্রেরী আছে, সেখানে পুস্তক-সংরক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এখানে-ওখানে সব বই ছড়ানো রয়েছে—কিছু বই আবার মাটিতেই পড়ে রয়েছে। আমার দেখতে খুব খারাপ লাগলো। এছাড়া যোগেন্দ্র প্রাসাদে যে শিল্প-সংগ্রহ রয়েছে, তার মধ্যেও নতুনত্ব খুঁজে পেলাম না।

বাজার যাওয়াটা আমার চাই-ই। এখানেও বাজারে গেলাম। কিছু কেনাকাটা হলো না এমন নয়।

এর পর রোমান ক্যাথলিক গির্জায় এসেছি। গির্জার ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে মাতা মেরীর মূর্তি রয়েছে শায়িত অবস্থায়। রঙিন এই মূর্তিটি ইতালীর ভাস্কর্যের নিদর্শন।

নামও ঠাণ্ডি সড়ক, বাস্তবেও তাই। মহারাজার অশ্বশালার সামনে দিয়ে এই ঠাণ্ডি সড়ক চলে গেছে। পথটি এতো মনোরম, আর এমন ছায়াশীতল যে সড়কের নামটির যাথার্থ্য প্রমাণ করে। বৃক্ষবিন্যাস এমন, সূর্যের আলো পৌঁছয় না বললেই হয়। পথ চলতে এক বিচিত্র অনুভূতি জাগে মনের মধ্যে।

সড়ক দিয়ে যেতে লক্ষ্য করলাম, এখনো পথের ধারে দশেরা উৎসবের বর্ণাঢ্য মিছিলের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। শুনলাম, এখানকার দশেরা উৎসবের মিছিল দেখবার মত।

ঠাণ্ডি সড়ক পরিক্রমা শেষে ফিরে এসেছি হোটেলে। বেড়াতে আজ

অনেক দেরি হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকোতে বেলা তিনটে বাজলো।

তবু বিশ্রামের জন্যে সময় দিতে চাই না। পথে এসে আবার বিশ্রাম কী? বেরিয়ে পড়লাম চামুণ্ডী পাহাড় দেখতে। কিছুটা উঠলামও পাহাড়ের ওপর। তারপর পাহাড় থেকে নেমে দেখলাম নন্দীবৃষকে। একটি বিরাটকায় বৃষমূর্তি। ১৬ ফুট উঁচু আর ২৫ ফুট লম্বা এবং একখণ্ড কষ্টিপাথর থেকে এটি তৈরি হয়েছে। পুণ্যার্থীরা বৃষকে পূজো করে। আমার স্ত্রী সুধীরাও সেই দলে। সেও পূজো দিলে।

চামুণ্ডী পাহাড় থেকে এসেছি শিব-সমুদ্রম্ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দেখতে। এই যে আসাব পথটুকু, গাড়ীতে আসা অত্যন্ত কষ্টকর। অসমতল পথ। গাড়ী যেন লাফিয়ে চলে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভিতরে যাওয়ার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে দেরি হলেও, পেলাম। টারবাইন রুমে গেলাম বিদ্যুৎচালিত পথে। শুধু একটি কাঠের পাটাতনের ওপর বেঞ্চিতে বসে পড়া, তারপর যথাস্থানে পৌঁছে নেমে যাওয়া, অনেকটা 'স্লিপের' মত। তবে একসঙ্গে তিন-চার জন বসা যায়।

টারবাইন রুমে দাঁড়িয়ে থাকাই দায। এতো ভয়ংকর শব্দ, মনে হয় কানেব পর্দা ছিঁড়ে যাবে। ঘুরন্ত টারবাইনের ওপর প্রচণ্ডবেগে জলধারা টানেলের মুখ দিয়ে আছড়ে এসে পড়ছে—সেই সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে বিদ্যুৎ। পর পর তিনটি টারবাইন রয়েছে। যেগুলি পর্যায়ক্রমে কাজ করছে একটির পর একটি। তারপর জলধারা তে টানেলের মুখ দিয়ে বাইরে যাচ্ছে, সে জায়গাটিও দেখলাম। দেখলাম নিয়ন্ত্রণ কক্ষটি। আমাদের মতো মানুষের চোখে সব কিছু বিস্ময়কর।

ইচ্ছে ছিল আজ কাবেরী জলপ্রপাত দেখতে যাবো। কিন্তু হল না। এখানেই অনেক সময় গেল।

বাইরে এলাম। আকাশে তখন আসন্ন ঘনঘটার চিহ্ন। সুতরাং আর অপেক্ষা নয়, এবারে বাঙ্গালোরের পথে রওনা হওয়াই ভাল। রওনা হবার আগে স্থানীয় বাঙালীরা অনেক করে বললেন, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। কিন্তু আকাশে যে রকম দুর্যোগের লক্ষণ দেখলাম, তাতে তাঁদের কথা রাখা হল না। এঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম বাঙ্গালোরের উদ্দেশে।

আকাশের মেঘ তখন আরও জমাট বেঁধেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড়ের সংকেতও শুনতে পাচ্ছি।

যে আশঙ্কা করছিলাম, তাই হল। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি নামলো। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। তারপর অহরহ বিদ্যুতের চমকানি।

এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পিছল পথ ধরে আমাদের গাড়ী মন্থরগতিতে এগোচ্ছিল। যে চিন্তা আমাদের মনে, সেই চিন্তা ড্রাইভারেরও। শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালোরের হোটেল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো তো।

সত্যি বলতে কি, এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে যেতে আমরা রীতিমতো ভীত হয়ে পড়েছিলাম। শেষপর্যন্ত ড্রাইভারও আর চলতে চাইলো না। গাড়ী দাঁড় করালো একটা বড় গাছের নীচে।

কিন্তু আমি বললাম, এ কি করছো ড্রাইভার সায়েব? গাছের নীচে কি থাকা ঠিক হবে? বড়ো গাছেই যে বাজ পড়ে। তাছাড়া গাছও ভাঙতে পারে।

ড্রাইভার জানালে, এখানে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। ঝড়-বৃষ্টি না কমলে তার পক্ষে গাড়ী চালানো অসম্ভব।

গাড়ীর মধ্যে বন্দী হয়ে রইলাম। চোখের সামনে ভয়ংকর দুর্যোগ। প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি, তারপর মেঘের ভয়ংকর গর্জন—মনে হল যে-কোন মুহূর্তে আমরা এই দুর্যোগের বলি হব। তবুও মনের মধ্যে এই দুর্যোগকে উপভোগ করার স্পৃহা।

দুর্যোগ কমলো।

আমাদের গাড়ী আবার চলতে আরম্ভ করলো বৃষ্টিভেজা পথের ওপর দিয়ে। এখনো গাড়ীর গতি মন্থর।

পথে যেতে যেতে গ্রাম দেখলাম। প্রতিটি গ্রামেই বিজলী জলছে। সবচেয়ে সুন্দর লাগলো গ্রামের প্রবেশপথের কাছে বাঁধানো চত্বরগুলিকে। চত্বরগুলির চারদিক আলোকিত করা শুনলাম, এখানেই গ্রামের মানুষ মিলিত হয়, গল্পগুজব করে, আসর বসায়। এছাড়া রেডিও শোনার ব্যবস্থাও আছে। একটি সুন্দর ব্যবস্থা। ভাবলাম, এমনটি সারা ভারতের গ্রামেও তো হতে পারে, মুক্ত মজলিস কিংবা অনুরূপ কিছু।

আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সিনেমা হল। দক্ষিণ ভারতের ছবিগুলি প্রদর্শিত হয় এখানে। বুঝলাম, এখানে মানুষের জীবন থেকে আনন্দবোধ উহ্য হয়ে যায় নি।

আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি এই দেশে। মেয়েরা সিল্কের শাড়ী পরে ক্ষেত-খামারে কাজ করছে। জিজ্ঞাসা করেছি এ প্রসঙ্গে। উত্তরও পেয়েছি। এখানে সিল্কের সঙ্গে সুতী কাপড়ের বিশেষ তফাত নেই। তাছাড়া সুতীর চেয়ে সিল্ক অনেক বেশি টেঁকসই।

একটা কথা বলতে পারি, এদেশের সমাজজীবনে আমি একটা সার্বজনীন সৌন্দর্যবোধ প্রত্যক্ষ করেছি, যেটি আর কোথাও দেখিনি। মানুষ ছবি ভালবাসে, গান ভালবাসে, ফুল ভালবাসে—এটা নতুন কথা নয়। কিন্তু এদেশের মানুষের মত এমন করে ভালবাসতে পেরেছে আর কোথায়? মেয়েদের তো দেখেছি অন্য প্রসাদন থাক না থাক, খোঁপায় একটি ফুল ঠিকই আছে।

আরো দেখেছি চাষীদের জীবনে একটা সমন্বয়-বোধ আছে। জমি নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ কম। কারণ, এখানে সব চাষীর জমিই সুন্দরভাবে চিহ্নিত করা।

আর চাষের ব্যবস্থাও সুন্দর। জমির পাশ দিয়ে জল সরবরাহের খাল চলে গেছে, যেখান থেকে প্রত্যেক চাষীই জমিতে সেচ দিতে পারে। তারপর জল নিষ্কাশনের জন্যে পাকা নর্দমার ব্যবস্থা রয়েছে।

এই রকম সুবন্দোবস্ত দেখে মনে হয়, এসব বন্দোবস্ত রাজ্যসরকারেরই সুবিবেচনার ফল। শাসকশ্রেণী প্রজাদের জন্য কিছু চিন্তা করেছিলেন এবং দেশের লোকেও কৃষি-বিষয়ে স্বয়ম্ভর হবার জন্য বিশেষ উদগ্রীব ছিল।

দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে যখন ওয়েস্ট এণ্ড হোটেলে পৌঁছলাম, তখন ৯-৩০ বেজে গেছে। একে দুর্যোগের রাত—তার ওপর এত রাত্রি। রিসেপসন কাউণ্টারে গিয়ে বললাম যে আমাদের ঘর রিজার্ভ করা আছে—সেই সঙ্গে এত দেরি হওয়ার কারণটাও বললাম। রিসেপসনের ভদ্রলোক আর কিছু না বলে বেয়ারাকে ডেকে আমাদের ঘরের চাবি দিয়ে দিলেন।

বেয়ারাটি আমাদের হোটেলের যে অংশটিতে নিয়ে এল—সেখানকার ঘরগুলি খুবই স্বল্পালোকিত। মনে হল যেন হোটেলের মধ্যে নিকৃষ্ট অংশ এদিকটা। মুখে কিছু বললাম না বটে কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। জিনিসপত্র নামিয়ে সামান্য মুখ হাত ধুয়ে চলে গেলাম ডিনার খেতে। কারণ সাহেবী হোটেল, তার ওপর বেশ রাত্রি হয়ে গেছে, এরপর গেলে কিছুই পাওয়া যাবে না। যাইহোক, এখন যে ডিনার আমাদের দিল—দেখে মনে হল বাড়তি-পড়তি সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে। দেখেই তো মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, ভাবলাম একবার গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করি, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, কি হবে অভিযোগ করে। বললে হয়ত ওরা বলবে যে ওদের ডিনার-টাইম ৮টা, আর রাত্রি দশটার সময় কি খাবার থাকে! যাইহোক, যা দিল তাই কোনরকমে খেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই ঘরখানিকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেলাম। রাত্রে বিশেষ ভাল করে দেখবার অবকাশই পাইনি। ঘরটা সত্যিই অত্যন্ত

বাজে—বাথরুমটি তো জঘন্য। বাথরুমে একখানা আয়না পর্যন্ত নেই। কি আর করা যাবে—এই নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করে কোনও ফল হবে না, আর তাছাড়া এখান থেকে আজই আবার চলে যাব। সুতরাং ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাড়ে ন'টা নাগাদ আবার বেরিয়ে পড়লাম। সকালের ব্রেকফাস্টটা অবশ্য বেশ ভাল ছিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, এই হোটেলের কর্তৃপক্ষ শ্বেতাঙ্গ, এদেশীয়দের ভাল চোখে দেখেন না।

বেরিয়ে প্রথমে গেলাম স্টেশনে—সেখানে মাদ্রাজের টিকিট কেটে রেখে দিলাম, কারণ আজই তো বাঙ্গালোর ছেড়ে চলে যাব। তারপর বেরুলাম শহর-পরিক্রমায়।

রাস্তাঘাটগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার ওপর রাস্তার দুধারে বৃক্ষশ্রেণী থাকায় সমস্ত রাস্তাটাই বেশ ছায়া সুশীতল। তার ওপর জনসংখ্যাও খুব বেশী নয়—সুতরাং শহরটি বেশ ছিমছাম।

আমরা প্রথমে গেলাম সায়েন্স ইনস্টিট্যুট দেখতে। এখানকার প্রবেশপত্র যোগাড় করে ভিতরে ঢুকতেই হঠাৎ এই ইনস্টিট্যুটের অধ্যক্ষ ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে দেখে হয়তো চিনতে পেরেছিলেন। একজন ছাত্রকে ডেকে বলে দিলেন আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখাতে এবং বুঝিয়ে দিতে। দেখলুম এখানে শিক্ষক এবং ছাত্র মিলিয়ে বেশ কিছুসংখ্যক বাঙালী রয়েছেন। আগে যাঁরা এই ইনস্টিট্যুট পরিচালনা করতেন, তাঁদের কাছে বাঙালীরা ঠিক সুবিচার পেতো না—কিন্তু এখন দিনকাল বদলেছে। প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে যোগ্যতার ওপরেই বেশী নজর দেওয়া হয়েছে, তাই এখানকার অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। দেখে মনটা খুশীতে ভরে উঠল।

ডঃ ঘোষকে ধন্যবাদ দিয়ে ছাত্রটির সঙ্গে চলে গেলাম আমরা। ছাত্রটি আমাদের নিয়ে গেল সায়েন্স ইনস্টিট্যুট লাইব্রেরীতে। বিরাট লাইব্রেরী—এত বড় লাইব্রেরী ভারত সরকারের ন্যাশনাল লাইব্রেরী ছাড়া আর আছে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর যাবতীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বই এখানে সংগৃহীত এবং সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

ছাত্র বললে: ডঃ গুহর সঙ্গে আলাপ করবেন না স্যর?

আমি বললাম: ডঃ গুহকে তো আমি চিনি না, তিনিও বোধ হয় আমাকে চেনেন না—

ছাত্রটি বললে: ডঃ গুহ হলেন আমাদের প্রফেসর। ভারি ভাল লোক। আপনার নাম উনি নিশ্চয় শুনেছেন, আর তাছাড়া বাঙালী তো—

আমি বললাম: বেশ চলুন—আলাপ করতে আর আপত্তি কি আছে?

ছাত্রটি ডঃ গুহর কাছে নিয়ে গেল। তিনি তখন কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আমাদের দেখেই একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, যেন দীর্ঘদিন পরে কোনো পুরনো বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

ভারি সুন্দর দিলখোলা লোক ডঃ গুহ। এক মিনিটেই পরকে আপন করে নিতে পারেন। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন রাত্রে তাঁর বাংলোতে। কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে তাঁর সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হল। আমি সবিনয়ে জানালাম—আমরা আজ রাত্রেই মাদ্রাজ যাচ্ছি। সুতরাং আপনার নিমন্ত্রণ রাখতে পারলাম না বলে বিশেষ দুঃখিত।

তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন যেন, কিন্তু একেবারে হাল ছাড়লেন না—বললেন : বেশ, তাহলে বিকেলে আসুন একটু চা খেয়ে যাবেন। একবার গরীবের কুটীরে আপনাকে পদধূলি দিতেই হবে।

এখন আর না বলতে পারলাম না। বিকেলে চা খেতে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তিনি আর দুজন ছাত্রকে ডেকে ব'লে দিলেন আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখাতে। ছাত্ররা আমাদের নিয়ে গেল বটে এবং সব ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং সেগুলি কি উপলক্ষে ব্যবহৃত হয় তার বিবরণ দিতে লাগল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমরা বিশেষ কিছুই বুঝলাম না। শুধু বোকার মত ঘাড় নেড়ে চলে গেলাম।

ঐ ইনস্টিট্যুটেই বিরাজ করছে এর প্রতিষ্ঠাতা স্যর জামসেদজী টাটার বিরাট ব্রোঞ্জ মূর্তি।

তারপর আমরা এ ইনস্টিট্যুট থেকে বেরিয়ে গেলাম কুইনস পার্ক, শেখাদ্রি মেমোরিযাল (লালবাগ), মিউজিয়াম, টাউন হল, বাজার—সব সেরে গেলাম একলিঙ্গেশ্বরের মন্দিরে। কি যেন একটা বিশেষ পর্ব ছিল সেদিন—দেখলাম বেশ একটা জমকালো মেলা বসেছে।

এসব দেখতে বেশ বেলা হয়ে গেল। দেখে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। লাঞ্চ সেরে একটু বিশ্রাম করে আবার বেরুলাম ৪-৩০ নাগাদ। মহীশূর শিল্পের কিছু জিনিসপত্র কিনে, এলাম ডঃ গুহর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে।

আমার যেতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি ওঁরা সকলেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ডঃ গুহ ও তাঁর পরিবারের লোকজন ছাড়া কয়েকজন বাঙালী ছাত্রও দেখি জমায়েত হয়ে রয়েছে।

একটা কৌতুহল অনেকক্ষণ থেকেই আমার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছিল,

আমি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুমঃ আচ্ছা, আপনারা আমার নাম জানলেন কি করে? এদেশে তো আমার কোনো ফিল্মও আসে না—থিয়েটারের দলের সঙ্গেও কখনো আসি নি, এদেশের কাগজে আমার ছবি-টবিও বেরোয় না—সুতরাং আমার নাম তো আপনাদের জানার কথা নয়।

ডঃ গুহ তৎক্ষণাৎ বললেনঃ কেন, আপনার অভিনয় দেখতে না পেলেও নিয়মিত শুনি তো—মানে রেডিও মারফত।

—ও, বেতার নাটুকে দলের অভিনয়!

এইবার বুঝলাম ব্যাপারটা।

খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করে প্রচুর জলযোগের পর ডঃ গুহদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম হোটেলে। ওখানকার বিল মিটিয়ে সোজা চলে এলাম স্টেশনে। রেলওয়ে রেস্তোর্াঁয় নৈশভোজন সমাধা করে ৮-৫৫ মিঃ-র ট্রেনে বাঙ্গালোর ত্যাগ করে মাদ্রাজ রওনা হলাম।

মাদ্রাজ পৌছলাম সকাল ৬-১০ মিনিটে। মাদ্রাজ স্টেশনে ট্রেন থামতেই দেখি অরোরার মাদ্রাজ অফিসের ম্যানেজার মিঃ জি. রামশেষণ, ক্যামেরাম্যান দেবী ঘোষ মশায়ের ক্যামেরা-শিষ্য জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়—যাকে নিয়ে আমি অনেকবার 'আউটডোরে' ছবি তুলতে গেছি; আর কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমাদের স্টারের বিজয় মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই। স্টারের মালিক কুমার মিত্র মশায়ের বিরাট 'মাইকা'-র ব্যবসা ছিল; কৃষ্ণবাবু ছিলেন সেই 'মাইকা' ব্যবসায়ের দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধি। তাঁরা আমাদের জিতেনের গাড়ী করে নিয়ে গেল অরোরা ফিল্মের অফিসে। এঁদের অবশ্য আমার আসার ব্যাপারটা আগে থেকেই জানান হয়েছিল। মানে অনাদিবাবু আমার সফরসূচী মাদ্রাজ এবং মাদুরা অফিসে আগে থাকতেই জানিয়ে রেখেছিলেন। যাই হোক, অরোরা অফিসে গিয়ে দেখি আমার নামে একগাদা চিঠিপত্র এসে পড়ে আছে। চিঠিগুলি সবই থিয়েটারওয়ালাদের চিঠি—প্রত্যেক চিঠিতেই সেই এক অনুরোধ—কোথায় যোগ দিচ্ছি···ইত্যাদি।

তারপর আমরা চলে গেলাম শ্রীকৃষ্ণ ভবন হোটেলে। জিতেনই হোটেলটি ঠিক করেছিল। আমরা এ হোটেলে রইলাম কিন্তু প্রধান দুটি খাবার, মানে মধ্যাহ্ন-ভোজন এবং নৈশভোজন, দুই-ই আসত জিতেনের বাড়ী থেকে। ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ —পুরো বাঙালী খানা। অনেক দিন পর আজ পুরোদস্তুর বাংলা দেশের বাঙালীর মেয়ের হাতের রান্না খেয়ে ভারী তৃপ্তি পেলাম।

এখান থেকে গেলাম মিউজিয়াম—সেখান থেকে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল। এখানকার

অধ্যক্ষ ছিলেন আমার পুরাতন বন্ধু বিখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দেবীপ্রসাদ থাকত ভবানীপুরে আমাদের বাড়ীর কাছে—সেই থেকে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। সে আমাকে দেখে তো জড়িয়ে ধরল—কিছুতেই ছাড়লে না—নিয়ে গেল তার স্টুডিওতে—সেখানে সে আমাদের একটি দীপলক্ষ্মী (ভারী সুন্দর কারুকার্য-করা একটি দীপ-দান) উপহার দিল। এই দীপলক্ষ্মীটি তাঁকে তার এক ভক্ত উপহার দিয়েছিল।

তারপর আমাদের নিয়ে গিয়ে দেখাল টবের ওপর জন্মানো এক বটগাছ ও তেঁতুল গাছ। গাছটির বয়স ১২ বছর, কিন্তু তার উচ্চতা মাত্র দেড় ফুট। জাপানীরা যে অদ্ভুত এক প্রক্রিয়ার ফলে গাছের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করে—এ গাছ দুটি সেই প্রক্রিয়ার নিদর্শন।

এই সব দেখা-শোনার পর আমরা হোটেলে ফিরে এলাম বেলা ৫টা নাগাদ। সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে গেলাম আমার অরোরা ফিল্মের অফিসে—ওখানে জিতেন (ব্যানার্জি) এসে আমাদের নিয়ে গেল তার নিউ টোন স্টুডিওতে। এখানে জিতেন এসেছিল একজন ক্যামেরাম্যান হয়ে, কিন্তু তার কর্মকুশলতার গুণে সে এখন এই স্টুডিওর এক-তৃতীয়াংশের মালিক। চারিদিকে নাম-ডাক যথেষ্ট, অর্থাৎ সে এখন এখানে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। সে স্টুডিওটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাল—অন্যান্য অংশীদারদের ডেকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সকলেই টেকনিশান—একজন গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার আর একজন শিল্প-নির্দেশক।

ওখান থেকে গেলাম মেরিনা—দেখলাম সেখানকার জলজ প্রাণী ও পদার্থ সংরক্ষনাগারে (acquarium); ২০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯২০ সালে যখন এসেছিলাম, তখনও যেমনটি দেখেছিলাম, এখনও প্রায় সেইরকম,—শুধু কিছু কিছু নতুন সংগ্রহ স্থান পেয়েছে মাত্র।

ওখানে দেখা হল হরিবাবুর সঙ্গে—হরিপদ চন্দ, মাদ্রাজের নাম-করা রূপ-সজ্জাকর (make-up man)। হরিপদ আগে কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর কাজ করত। ক্যামেরাম্যান শৈলেন বসু এবং জ্যোতিষচন্দ্র (শব্দযন্ত্রী) আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। শৈলেন ক্যামেরাম্যানই রয়ে গেছে, কিন্তু জ্যোতিষ এখন চিত্র-পরিচালক। আমরা সবাই তারপর সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরে গেলাম এবং বেশ খানিকক্ষণ জমিয়ে বসে গল্প করা গেল। এখান থেকে কোথায় কোথায় যাব—সে সফরসূচী সম্বন্ধেও আলোচনা হল। তারপর তারা চলে গেল।

ইতিমধ্যে জিতেন একটি বিরাট টিফিন-কেরিয়ার করে প্রচুর মাছ-মাংস এবং নানা রকমের খাবার-দাবার নিয়ে এল। এসব যে এনেছিল আমাদের দুজনের জন্যে—কিন্তু

পরিমাণ এত বেশি যে আমরা সবাই মিলে খেয়েও তা শেষ করতে পারলাম না। খাওয়া-দাওয়ার পরে একে-একে সবাই শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

পরদিন (২৮-১১-৪০) ভোর ৫টার সময় কৃষ্ণবাবু এসে আমাদের ঘুম ভাঙালেন। কারণ সাড়ে ৬টার সময় আমাদের এগমোর স্টেশন ছেড়ে দক্ষিণাঞ্চল যাবার ট্রেন। এগমোর স্টেশন হল মাদ্রাজের দক্ষিণাঞ্চল যাবার স্টেশন। জিতেনও এল স্টেশনে দেখা করতে। সত্যিই মাদ্রাজে জিতেন আমাদের যে রকম খাতির-যত্ন করেছিল, তা আমার আজও মনে আছে।

এখান থেকে আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল হল কাঞ্জিভরম। বেশী দূর নয় ওখান থেকে। বেলা ৯-২০টার সময় কাঞ্জিভরম পৌঁছে গেলাম। এখানে আর কোন হোটেলে না উঠে, উঠলাম গিয়ে মিউনিসিপ্যাল রেস্ট-হাউসে। রেস্ট-হাউসটি ছোট হলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমার বেশ পছন্দ হল। বাজারে গিয়ে কিছু তরিতরকারী ও চাল কিনে আনলাম; স্নানাদি সেরে সুধীরা ঐখানেই রান্না চড়িয়ে দিল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা দুটোর সময় বেরুলাম মন্দিরাদি দর্শন করতে। প্রথম বিষ্ণু-কাঞ্জি মন্দিরে। গর্ভগৃহের দরজা তখন বন্ধ, সাড়ে তিনটের আগে খুলবে না, সুতরাং বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। ইতিমধ্যে দেখলাম মণ্ডপম। এইখানে আছে একশোটি স্তম্ভ, কিন্তু কতকগুলি স্তম্ভের গাত্রে যে-সব চিত্র খোদিত রয়েছে, সেগুলি উগ্র যৌন-বিষয়ক এবং অশ্লীল। পাইনের ধারে কিছুক্ষণ বসলাম। হঠাৎ সুন্দর টুং-টাং আওয়াজে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি একটি বিরাট স্বর্ণস্তম্ভের ওপর এক-গুচ্ছ সোনার পাতা। অনেকটা বৃন্দাবনের সোনার তালগাছের মত, বাতাসে সেগুলি থর-থর করে কাঁপছে, আর ঐ টুং-টাং আওয়াজ হচ্ছে।

তারপর সাড়ে তিনটের সময় মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটিত হল। আমরা দোতলার ওপর উঠে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করলাম। বিগ্রহ হল বিষ্ণু—অচলা মূর্তি এবং যোগমূর্তি।

তারপর গেলাম বড় কাঞ্চীভরমে অর্থাৎ শিব-কাঞ্চীতে। এখানে দেখলাম শিব-পার্বতী মূর্তি—একমেবাশ্বর এবং কামাক্ষীরূপে। এই এলাকার মধ্যেই কামাক্ষী দেবীর একটি আলাদা মূর্তিও আছে। এই স্থানটি কিন্তু বিষ্ণু-কাঞ্চীর থেকে অনেক বড়। এসব মন্দিরাদি দর্শন এবং পূজাদি দিয়ে ফিরে এলাম রেস্ট-হাউসে। ফিরে দেখি এক শিল্পী আমার জন্যে অপেক্ষা করছে—নাম এম. তারকেশ্বরাচারী। সে আমাকে একটি নটরাজের মূর্তি তৈরি করে দেবে বললে। আমি বললাম যে, আমি তো আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তাতে সে বললে যে, যাবার আগে স্টেশনে গিয়ে ডিজাইনটি আমাকে দেখাবে, অনুমোদনের জন্যে। আমি মনে-মনে ভাবলাম, এত

তাড়াতাড়ি কি সে স্কেচ করে আনতে পারবে! তবু মুখে বললাম: আচ্ছা তুমি নিয়ে এস স্টেশনে। দেখব, তারপর কথা হবে।

সে কিন্তু ঠিক ডিজাইনটি নিয়ে এল স্টেশনে। ডিজাইন ভালই হয়েছিল, আমার পছন্দও হল। তার সঙ্গে দর ঠিক হল—দেড় শ' টাকা। মূর্তিটি হবে ব্রোঞ্জের ওপরে। আমি তাকে তৈরি করবার অর্ডারও দিলাম—কিন্তু সে কিছু অগ্রিমের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি তাকে জানালাম যে, তাকে আমি এখন তো কিছু দিতে পারছি না—মাদ্রাজে ফিরে গিয়ে তাকে 'এ্যাডভান্স' কিছু পাঠাতে পারি। সে আর কিছু বলল না। বোধহয় কথাটা তার মনঃপূত হল না।

যাই হোক, ওখানে ট্রেনে আমরা চিংলিপুট গিয়ে সেখানকার রেলওয়ে রেস্তোরাঁতে নৈশভোজ শেষ করে ১১-১০ মিনিটে ত্রিচি এক্সপ্রেসে ত্রিচিনাপল্লী অভিমুখে রওনা হলাম। কামরাটি ভালই পেয়েছিলাম এবং বেশ আরামেই ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ ভেল্লিপুরম স্টেশনে স্টেশন-মাস্টারমশাইয়ের জানালা ধাক্কাধাক্কির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করতেই তিনি টিকিট দেখতে চাইলেন। আমি টিকিট দেখাতেই মুখ কাঁচু-মাচু করে স্বভাবসিদ্ধ মাদ্রাজী রীতিতে বললেন: 'Very sorry to trouble you, Sir, thank you Sir—বলতে বলতে চলে গেলেন।

ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতেই বোঝা গেল। এসব জায়গায় সেই সময় প্রথম শ্রেণীতে বিশেষ লোকই হত না। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন আমাদের টিকিট নেই, যদি থাকে তো তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট। 'ফালতু লোক' মনে করেই মাঝ রাত্তিরে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন; কিন্তু যখন টিকিট দেখলেন—তখন তিনি নিজেই লজ্জিত হয়ে চলে গেলেন।

২৯ তারিখে ভোরবেলায় আমরা ত্রিচিনাপল্লী পৌঁছলাম।

ট্রেনে যেতে-যেতেই পথে পড়ল শৈলমন্দির। পাহাড়ের উপরে মন্দির তৈরি হয়নি, পাহাড়েরই পাথর কুঁদে এই মন্দির নির্মিত হয়েছে। ভারি সুন্দর দেখতে—আমরা অবশ্য দূর থেকেই দেখলাম, কাছে গিয়ে দেখার আর সুবিধে হয়নি।

ওখানে রেলওয়ে রিটায়ারিং রুমেই আস্তানা গাড়লাম। দোতলার ওপরে সুন্দর ঘর, বেশ প্রশস্ত। পাশে রেলওয়ে রেস্তরাঁ—ওখানে সায়েবী খানা পাওয়া যায় বেশ ভালই—নীচেই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। সমস্ত দিনের জন্য ট্যাক্সিভাড়া করলাম। ভাড়া খুব সস্তা—সমস্ত দিনের জন্যে ৪৲ টাকা—অবশ্য পেট্রোল ছাড়া।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ প্রাতরাশ সেরে নিয়ে ট্যাক্সি করে বেরিয়ে পড়লাম তাঞ্জোরের অভিমুখে। ত্রিচিনাপল্লী থেকে তাঞ্জোরের দূরত্ব হল ৩৪ মাইল। ওখানে

দেখলাম বৃহদেশ্বর শিব মন্দির। মন্দিরটির ভৌগোলিক অবস্থান দেখে অবাক হয়ে গেলাম। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর, র‍্যামপার্ট, জলপূর্ণ গভীর পরিখা করা রয়েছে চারদিকে। ঠিক যেন একটা দুর্গের মধ্যে এসে পড়েছি। হয়ত আগের দিনে বিধর্মী দ্বারা আক্রমণের হাত থেকে মন্দিরকে রক্ষা করার জন্যই এই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল।

এখান থেকে গেলাম সুব্রহ্মণ্য মন্দির। সেখান থেকে বাজার। পথে দেখি কয়েক স্থানে বিরাট বিরাট আশ্রয়ের নীচে রথ রক্ষিত আছে—অর্জুনের রথ, শ্রীকৃষ্ণের রথ এবং অন্যান্য দেবতার রথ। রথের সময় এ জায়গায় খুব ধুমধাম হয় এবং সে সময় ঝাড়পোঁছ হয়ে, সুসংস্কৃত হয়ে, শোভাযাত্রায় বার হয়। রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত, সুতরাং রথের যাওয়া-আসায় কোন অসুবিধা হয় না। তাঞ্জোরের বাজার থেকে রুপো ও পেতলের ওপর খোদাই-করা কিছু জিনিসপত্র কিনে যখন আবার ত্রিচিনাপল্লী ফিরে এলাম, তখন আড়াইটা বেজে গেছে। মোটরে করে ৩৪ মাইল আসায় বেশ পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম আমরা।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ভ্রমণসূচী এমনই ছক-বাঁধা যে, বিশ্রাম করা আর ভাগ্যে ঘটল না। বেরিয়ে পড়লাম শ্রীরঙ্গমের দিকে। অরোরার মিঃ রামশেষণ ও সুন্দরেশন রঙ্গরাজ টকীজের মালিক মিঃ সদগোপের নামে একখানি চিঠি দিয়েছিলেন আমার পরিচয় দিয়ে। আমার তীর্থ-দর্শনে তিনি যেন সাহায্য করেন। রঙ্গরাজ টকীজ থেকে মিঃ সদগোপের সঙ্গে আলাপ করলাম এবং তাঁকে সেখান থেকে তুলে নিলাম। তিনি এবং তাঁর এক সহকারী আমাদের নিয়ে গেলেন শ্রীরঙ্গনাথম মন্দিরে। ঐ মন্দিরেরই একজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরঙ্গনাথম মন্দিরের প্রতিটি অংশ খুব যত্নের সঙ্গে ভাল করে তিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন।

মন্দিরটি বিরাট, অনেকগুলি গোপুরম আছে। এখানকার দেবতা হলেন নারায়ণ। অনন্ত শয্যায় শায়িত। ঠিক এইরকমই মূর্তি শ্রীরঙ্গপত্তমে আছে।

মন্দিরের নিজস্ব খামার আছে। যেখানে প্রয়োজনীয় সব কিছুই তৈরি হয়। ঠাকুরের ভোগের জন্যে রয়েছে বিরাট পাকশালা। মন্দিরের কর্মী এবং অতিথি কেউ-ই ভোগ্য প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হন না। এছাড়া দুধেরও অভাব নেই। গোশালা দেখেই তা বুঝলাম। শ্রীরঙ্গপত্তমের পাশ দিয়ে যেমন কাবেরী বয়ে গেছে, এখানেও সেই কাবেরী। মীনাক্ষী মন্দিরের মত জমকালো না হলেও শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটিও কম আকর্ষণীয় নয়।

শ্রীরঙ্গনাথম্ মন্দির দর্শন করে আমরা এলাম ত্রিচিনাপল্লীতে। এখানে দেখলাম

শৈল মন্দির। পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে মন্দিরটি। বাইরের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সিঁড়ি-পথে ওপরে উঠে এলাম। বৈদ্যুতিক বাতি থাকায় চলতে অসুবিধে হয় না, তবে সুড়ঙ্গ-পথে উঠতে দম বন্ধ হবার যোগাড়।

এই সুড়ঙ্গ-পথে উঠতে প্রথমে পড়ে বিনায়ক মূর্তি, অর্থাৎ সিদ্ধিদাতা গণেশ। গণেশ যেন এই মন্দিরের দ্বাররক্ষী।

মন্দিরের সামনেই উন্মুক্ত বারান্দা। চারদিক রেলিং দিয়ে ঘেরা। বারান্দায় পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলাম।

এখানেই শেষ নয় সুড়ঙ্গ-পথের। দ্বিতীয় পর্যায়ে সুড়ঙ্গ-পথ ধরে এলাম পাহাড়ের ওপরে। যেখানে শিব-পার্বতী বিরাজ করছেন। দেখলাম শিব-পার্বতীর মূর্তি। লক্ষ্য করলাম চারিদিকের প্রশান্ত পরিবেশ। ভারি মনোরম লাগল। শুনলাম জায়গাটির আর এক নাম, দক্ষিণ কৈলাশ।

সবচেয়ে ভাল লাগল, যখন মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সুন্দরী কাবেরীকে। বিপুল উচ্ছ্বাসে কাবেরী ছুটে চলেছে।

আবার ফিরে এসেছি স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে। এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন মিঃ সদগোপ। একসময় কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ত্রিচিতে এলেন, কিন্তু এখানকার একটা প্রসিদ্ধ জিনিস দেখলেন না।

প্রসিদ্ধ জিনিস বলতে হীরে। এখানকার হীরে নাকি খুব বিখ্যাত। কিন্তু আমি মিঃ সদগোপকে বললাম, না বাপু, হীরে কিনতে আমি চাই না। একে হীরে চিনি না, তারপর ও কেনার সামর্থ্যও আমার নেই।

পরদিন অর্থাৎ ৩০শে নভেম্বর সকাল সওয়া সাতটায় ত্রিচিনাপল্লী ছেড়ে মাদুরা রওনা হলাম।

বেশী দূরের পথ নয়—বেলা ১১টার সময় এসে পৌঁছলাম মাদুরায়। স্টেশনে নেমে দেখি মিঃ সুন্দরেশন আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন স্টেশনে। একটি গাড়ীও ঠিক করে রেখেছেন। আমরা যখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছি, কয়েকজন হকার ছুটে এল আমাদের কাছে তাদের পণ্যদ্রব্যের পসরা নিয়ে। নতুন লোক দেখলেই তারা বুঝতে পারে, তার ওপর বাঙালী বলেও বুঝতে পেরেছে। তারা জানে যে তাদের এইসব টুকি-টাকী জিনিস নতুন লোকেরাই কেনে। স্থানীয় লোকের কাছে এদের তেমন কদর নেই।

যাই হোক তাদের কাছে যে সব জিনিস দেখলাম তা এমন কিছু ভাল নয়—সব সস্তা, খেলো জিনিস।

আমি তখন তাদের বললুম: এমন কিছু জিনিস দেখাতে পার যা চট করে মনে ধরে যায় এবং যা সচরাচর সব জায়গায় পাওয়া যায় না।

তাদের মধ্যে একজন বলল ভাঙা ইংরাজী এবং আকারে-ইঙ্গিতে: আপনি দু' একটা জিনিসের নাম করুন, দেখি যোগাড় করে দিতে পারি কিনা।

আমি তখন তাকে বললাম একটি নটরাজের মূর্তির কথা। সে দুই এক মিনিট কি যেন ভাবলো—তারপর বললো—আচ্ছা স্যার, আমি এনে দেব আপনি যা চাচ্ছেন।

আমি বললাম: ঠিক আছে, তুমি ডাক-বাংলোতে নিয়ে এস। আমি ওইখানেই থাকব।

লোকটি 'নমস্কার' বলে চলে গেল।

আমরা ডাকবাংলোয় চলে গেলাম। ওখানে গিয়ে লাঞ্চের বিষয় বলে দিলাম ডাকবাংলোর তদারককারীকে। ডাকবাংলোর ছাদ থেকেই মীনাক্ষী মন্দিরের বাইরেটা পরিষ্কার দেখা যায়। প্রথম দর্শনেই মন্দিরের বিরাটত্ব সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা হল। এত বিরাট যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হল কে যেন ডাকছে—

—মিঃ নমস্কারম্।

পিছন ফিরে দেখি সেই হকার—যাকে আমি নটরাজ মূর্তির কথা বলেছিলাম। আর তার সঙ্গে একটি লোক। সে সত্যিই একটি চমৎকার ব্রোঞ্জের তৈরী নটরাজ মূর্তি নিয়ে এসে হাজির। দূর থেকে মূর্তিটি দেখেই মনে ধরে গেল। কাছে এসে পরীক্ষা করে দেখলাম যে মূর্তিটি যেমন সুনির্মিত, তেমনি ভারী। সবই নিখুঁত, শুধু একটি জিনিস নেই—সেটি অগ্নি-গোলকের বৃত্তটি—যা নটরাজের মূর্তির চারপাশে থাকে।

তার সঙ্গে দর কষাকষি করে ২৫০৲ টাকা থেকে ১৫০৲ টাকায় রফা হল। মিঃ সুন্দরেশন বললেন যে এ মূর্তির পক্ষে ১৫০৲ টাকা অন্যায্য নয়। আমি তখন তাকে বললাম: আমি তোমাকে এখন ১০০৲ টাকা দিয়ে যাচ্ছি—তুমি মূর্তিটি মিঃ সুন্দরেশনের কাছে জমা রাখ। তারপর মাদ্রাজ থেকে আমি বাকী ৫০৲ টাকা পাঠিয়ে দেব। তাতেই সে রাজী হল।

আমি টাকা দিয়ে দিলাম—মিঃ সুন্দরেশন মূর্তিটি নিয়ে গিয়ে তাঁর অফিসে রেখে দিলেন।

আমরা এদিকে লাঞ্চ খেয়ে তৈরি হয়ে বসে রইলুম। সুন্দরেশন এল সাড়ে তিনটার সময়। আসবার সময় তার এক বন্ধুর গাড়ী নিয়ে এল। তারপর তার

সঙ্গে আমরা গেলাম টেপ্পাকুলাম সরোবরে। সরোবরের মাঝখানে একটি জলটুঙ্গী গোছের জায়গায় নৌকো যোগে যেতে হয়। স্থানটা অনেকটা দ্বীপের মত। স্থানীয় লোকদের উৎসব উপলক্ষে এই স্থানটি ব্যবহৃত হয়। ওপরে উঠবার সিঁড়িগুলি বেশ সন্তর্পণে উঠতে হয়।

টেপ্পাকুলামের পর আমরা গেলুম তিরুমল নায়েকের প্রাসাদে। এই প্রাসাদটি এখন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট কর্তৃপক্ষ দখল করেছেন। ট্যুরিস্ট বা পর্যটক সম্প্রদায় প্রাসাদটি ঘুরে দেখতে পারে। সঙ্গে গাইড অবশ্য এর কাহিনী চুপি-চুপি বলতে থাকে—এই তিরুমল নায়েক একসময় নায়েক বংশের রাজা ছিলেন—তিনি মাতুরায় একসময় রাজত্ব করেছিলেন· ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এই প্রাসাদটি এখনও খুব যত্নসহকারে রক্ষিত হয়েছে।

সন্ধ্যার সময় আমরা গেলুম মীনাক্ষী মন্দিরে। মন্দিরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই এল প্রবল বেগে বৃষ্টি। আমরা তখন মন্দিরের চত্বরের ভেতরে ঢুকে পড়েছি। চারদিক ঢাকা, সুতরাং ভিজতে হল না। ড্রেন পাইপ দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ার আওয়াজ শুনে মনে হল যেন কোন জলপ্রপাতের কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

ওখানে নটরাজ, মীনাক্ষী, সুন্দরেশ্বর শিব, পার্বতী প্রভৃতি আরও বহুমূর্তি রয়েছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য মূর্তি হল শিব ও পার্বতীর নৃত্য-প্রতিযোগিতার মূর্তি। এই শিব-পার্বতীর নৃত্য সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। সেটি হল, একদিন শিব আর পার্বতীর নৃত্যের প্রতিযোগিতা হচ্ছে—কে ভাল নাচতে পারে। শিব যখন কিছুতেই পার্বতীর সঙ্গে পেরে উঠছেন না, তখন শিব করলেন কি, নৃত্যের মধ্যে হাত দিয়ে নিজের কর্ণ-ভূষণ ফেলে দিয়ে পা দিয়ে সেটি আবার যথাস্থানে পরলেন। পার্বতী তখন সবিনয়ে জানালেন যে এই উদ্ভট ভঙ্গী তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়—তিনি পরাজয় স্বীকার করেছেন।

এর মণ্ডপের মধ্যে হাজারটি স্তম্ভ আছে। এগুলি দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—আরতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি শুনে এগিয়ে গেলাম। দর্শন করলাম আরতি। পূজা দিলাম মীনাক্ষী মাতাকে। তারপর ফিরে এসেছি নির্দিষ্ট ডাকবাংলোয়। সুন্দরেশন ও তাঁর বন্ধুটি কিছুক্ষণ বসে কথাবার্তা বললেন, তারপর তাঁরা চলে গেলেন নমস্কার জানিয়ে। আমিও তাঁদের অকৃত্রিম ধন্যবাদ না জানিয়ে পারিনি।

আগে থেকে ঠিক ছিল, সকালেই আমরা মাদুরা ত্যাগ করবো। সেই মত বলেও রেখেছিলাম কুলিদের। তারা ভোর পাঁচটায় আমাদের ঘুম ভাঙাল।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়েছি। ছ'টা বাজতে আমরা পৌছেছি স্টেশনে।

সুন্দরেশন এসেছেন আমাদের বিদায় জানাতে। সত্যি মানুষটি ক'দিনে আমাদের একান্ত অনুরাগী হয়ে উঠেছেন।

৬-৩৮ মিনিটে আমাদের ট্রেন স্টেশন থেকে ছাড়ল। কিন্তু কয়েক মাইল এসে আচমকা ধু-ধু-করা মাঠের মাঝখানে ট্রেন থেমে গেল। শুনলাম, লাইন খারাপ হয়েছে, মেরামতের কাজ চলছে। ঠিক না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

ধু-ধু-করা মাঠ। অবারিত, রুক্ষ। শুধু মাঝে মাঝে বাবলা গাছ রয়েছে। গাছগুলোও যেন কেমন। শ্রী নেই, ছাঁদ নেই।

এখানে হাওয়ার গতি কোন সময়ে পূব থেকে পশ্চিমে, কখনো পশ্চিম থেকে পূবে। ঝাঁকড়া বাবলা গাছের ডালপালাও হাওয়ার গতির সঙ্গে কেমন যেন পাকিয়ে গেছে। কী করবো, বসে-দাঁড়িয়ে তাই দেখছি। দেখছি বাতাসে বাবলা গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো দুলছে।

নেমে এসেছি ট্রেনের কামরা থেকে। কাছে-পিঠে ইতস্ততঃ ঘুরে ঘুরে দেখছি। বাবলা গাছ থেকে প্রচুর আঠা বার করে নেওয়া হয়, যা আমাদের অনেক কাজে লাগে। এ-ছাড়া একসময় অর্থাৎ যুদ্ধের সময় দেখেছি যে, এই কাঁটা কুলীন হয়ে স্থান পেয়েছে অফিসে আদালতে—সর্বত্র পিনের তখন একান্ত অভাব। এই বাবলা কাঁটায় তখন কত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র গ্রথিত হয়েছে, তার ঠিক নেই।

পুরো দু'টি ঘণ্টা আমাদের সেই মাঠের মধ্যে অপেক্ষা করতে হল। তারপর ট্রেন ছাড়ল।

চলতি-পথে তেমন কিছু নতুনত্ব নেই, বৈচিত্র্য নেই। তবু জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি, যদি নতুন কিছু দেখতে পাই।

দুপুরের পর মণ্ডপম্ স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়ালো। এখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করলাম।

মণ্ডপম্ থেকে পামবান্। পামবান স্টেশন প্ল্যাটফরমে অজস্র অপেক্ষমান যাত্রী। শুনলাম এরাও সব রামেশ্বরমের যাত্রী।

রামেশ্বরে এলাম।

ইতিপূর্বে আমার মা ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থই ভ্রমণ করেছিলেন—রামেশ্বরেও এসেছিলেন। এখানে তাঁকে যে পাণ্ডা সাহায্য করেছিল, সেই পাণ্ডার ঠিকানায় আমি বম্বে থেকেই একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। স্টেশনে নেমে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক

দেখার পর দেখি, সেই পাণ্ডামশাই ঠিক এসে হাজির। আমাকে তো সে চেনে না—কিন্তু বাঙালী পোশাক দেখে সে আমাকে ঠিক খুঁজে বার করল। মজার ব্যাপার হল, সেদিনের তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বহু বাঙালী ছিল, আর ছিল গুজরাতী।

এই ভিড় দেখে আমি তো ঘাবড়ে গেলাম। পাণ্ডা বললে যে, কোন ভয় নেই—ধর্মশালায় আমাদের জন্যে সে আগেই জায়গা বন্দোবস্ত করে রেখে দিয়েছে। পাণ্ডামশাই আমাদের নিয়ে গেল ধর্মশালায়—কিন্তু জায়গাটি আমাদের মোটেই পছন্দ হল না। জায়গাটি কিরকম যেন ঘিঞ্জি এবং অত্যন্ত পুরনো তার ওপর স্নান ও শৌচাগারে নিজস্ব স্বাধীনতা নেই—বারোয়ারী ব্যাপার। পাণ্ডামশাই তখন আমাদের নিয়ে গেল মন্দিরের রেস্ট-হাউসে।

এটাও অপরিষ্কার এবং জরাজীর্ণ। অবহেলা এবং অমনোযোগের ফলে রেস্ট-হাউসটি এখন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে—অথচ এইখানে আগে বহু নামজাদা লোক থেকে গেছেন একদিন, দু'দিন করে। ভিজিটার্স বুকে আমি বিচারপতি স্যর মন্মথ মুখোপাধ্যায়ের নাম দেখলাম। লোকজন এখন বেশী আসে না—সেজন্য ঘরগুলি সব বন্ধই থাকে। ঘর খুলতেই কয়েকটা চামচিকে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। এই দেখে আর ঘরের মধ্যে ঢুকতে ইচ্ছে হল না। জিনিসপত্র সব দালানেই নামিয়ে রাখলাম। জায়গাটা আর কিছু না হোক, ধর্মশালা থেকে তো ভাল।

রেস্ট-হাউসের তদারককারীকে ডেকে পাণ্ডাঠাকুর বলে দিল—এই দালানটিই বেশ ভাল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিতে। অনেকদিন পরে সে একজন ভাল মক্কেল পেয়েছে। আর জিনিসপত্রগুলির ওপর যেন ভাল রকম নজর রাখে।

পাণ্ডাঠাকুরই আমাদের গাইড হল—প্রথমে আমরা গেলুম রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা-কুণ্ডদর্শনে। ওখান থেকে গেলাম তিন মাইল দূরস্থ রামঝরকা—গো-যান ছাড়া কোনো যানবাহনাদি পাওয়া গেল না। এখানে একটি ঘরে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন আছে—তারই পূজা হয়।

একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল এখানে—এই ঘরের বাইরে সমুদ্রের সে কি বিরাট গর্জন,—কান পাতা যায় না, কিন্তু এই ঘরের ভিতর সব শান্ত—কোন আওয়াজ নেই। এটা দেবতার মহিমা—কি শিল্পীর নৈপুণ্য, এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। তীর্থস্থানে দেবতার মহিমাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে এই ঘরের ছাদের উপর গেলাম—সেখান থেকে সমস্ত রামেশ্বর শহরটিকে সুন্দর দেখা যায়—দূরে ধনুষ্কোটিও দেখা যায়। রামেশ্বর থেকে ধনুষ্কোটি পর্যন্ত যেভাবে সমুদ্র বেঁকে গেছে তা দেখতে অনেকটা ধনুকের মত। ওপারে ধনুষ্কোটির

জাহাজঘাটায় দেখলাম একটি সিংহলে যাবার স্টীমার দাঁড়িয়ে আছে। এইখানেই সেতুবন্ধ হয়েছিল—শ্রীরামচন্দ্রের বানর সেনাবাহিনী এই সেতু দিয়ে সাগর অতিক্রম করে লঙ্কা আক্রমণ করেছিল। মণ্ডপম থেকে পামবান ব্রিজ ধনুষ্কোটি পর্যন্ত প্রসারিত যে সেতুটি আছে, সেইটিই রামায়ণে বর্ণিত বানর সেনাদের দ্বারা তৈরি কি না—সে গবেষণায় প্রবৃত্ত না-হওয়াই ভাল।

ওখানে বেশ মোটামুটি একটা বাজার আছে। আমি ও আমার স্ত্রী দুজনে মিলে কিছু বাজার করে রেস্ট-হাউসে ফিরে এলুম। ফিরে এসে দেখি দালানটি বেশ পরিষ্কার করা হয়েছে, বৈদ্যুতিক আলো নেই বলে কয়েকটি বড় বড় মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। রেস্ট-হাউসের তদারককারী, একটা তোলা উনুন এনে দিল—সুধীরা তাইতে রাত্রের রান্না চাপিয়ে দিল। আমি আর কি করি—কাছে একটা তক্তাপোশ ছিল—সেইটাতে বসে ডায়েরী লিখতে শুরু করলাম। এ ক'দিন বিরামবিহীন ঘোরাঘুরিতে কয়েক দিনের ডায়েরী লেখা হয়নি।

কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডাঠাকুর বা ছড়িদার যাই বলুন, একজন চৌকিদারকে সঙ্গে করে এসে হাজির। সে তাকে বিশেষ করে বলে দিল যে, আমি কলকাতা থেকে এসেছি—খুব নামী লোক; রাত্রে যেন এখানে পাহারা থাকে সব সময়।

রাত্রি প্রায় নটার সময় নিয়ে গেল আমাদের রামেশ্বর মন্দিরে—সেখানে গিয়ে আরতি দেখলাম। রামেশ্বর মন্দিরের বাইরে বহুদূর প্রসারিত দালানে, যে কারু-কার্য-মণ্ডিত স্তম্ভগুলি আছে এতদিন তা শুধু ছবিতেই দেখেছি, এখন সেগুলি চোখের সামনে দেখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। এ যে কি বিরাট এবং অপূর্ব, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

এখানে প্রতিদিন একটি করে পরিক্রমা উৎসব হয়। ব্যাপারটি হল প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পরে কারুকার্য-খচিত জমকালো একটি ডুলিতে করে শোভাযাত্রা করে প্রচুর শঙ্খ ঘণ্টা ও বাদ্য-সহকারে শিব আসেন পার্বতীর গৃহে, আবার সকালবেলায় সেই রকম বাদ্য-সহকারে সেই ডুলীতে করে শিব তাঁর নিজের ভবনে ফিরে যান। এই শোভাযাত্রা মন্দির-সংলগ্ন দালানের চারিপাশ পরিক্রমা করে। প্রতিদিনই এই ব্যাপার হয়—এইসময় বহু লোক জমায়েত হয়। তা হলেই মনে করুন, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যগুলিতে জনসমাগম কি বিরাট হয়।

মন্দিরের কাছে নানা-জাতীয় সুন্দর সুন্দর শাঁখ বিক্রি হয়। ভারি সুন্দর দেখতে সেগুলি। আমি ঘুরতে ঘুরতে যত রকম শাঁখ ছিল সবগুলিই কিনে ফেললাম—প্রায় ৬৬ রকমের শাঁখ, ঝিনুক ও শামুক ছিল।

তারপর চলে এলাম রেস্ট হাউসে—এসে খেয়ে-দেয়ে তক্তাপোশে বিছানা করে মশারী টাঙিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ভোর সাড়ে চারটের সময় পাণ্ডাঠাকুরই এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গেই মুখ-হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে চলে এলাম স্টেশনে। পাণ্ডার ছড়িদার আমাদের সঙ্গে ধনুষ্কোটি পর্যন্ত এল। পামবান্ সেতুর ওপর দিয়ে আসতে হল। অতি দীর্ঘ সেতু—একদিকে পাহাড়, সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে চলে গেছে বরাবর। ধনুষ্কোটি স্টেশনের পূর্বদিক থেকে রামেশ্বরমের সুউচ্চ গোপুরমগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। বন্দরে সিংহলে যাবার জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একটি ছেড়ে গেল দেখলাম।

এখান থেকে তিন মাইল দূরে হল আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের সঙ্গম স্থল। বেশীরভাগ যাত্রী সেখানে হেঁটেই চলেছে দল বেঁধে, ছড়িদার কিন্তু আমাদের জন্যে একটা গরুর-গাড়ী ভাড়া করে ফেলল। তখনও অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। ওখানে গিয়ে দেখি একটি ছোট্ট মন্দির—অনেকটা আমাদের কলকাতায় রাস্তায় যেমন ছোট ছোট মন্দির দেখা যায় সেই রকম।

যাই হোক, আমরা গাড়ী থেকে তো নামলাম। সঙ্গমে স্নান করবার জন্যে সুধীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ছড়িদার পূজার যোগাড়-যন্তর করে ফেলল—তবে আমি স্নান করলাম না, সঙ্গমস্থলে গিয়ে জল স্পর্শ করে মাথায় ছিটিয়ে নিলাম। সুধীরাকেও এখানে স্নান করতে নিষেধ করলাম। বালির ওপর দিয়ে বেশ কিছুদূর গিয়ে হাঁটু জল পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালাম। ছড়িদার মন্ত্র উচ্চারণ করে দুই সাগরের (আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর) জল নিয়ে আমাদের মাথায় ছিটিয়ে দিল। এই দুটি সাগরের দুটি বিভিন্ন প্রকৃতি—বঙ্গোপসাগরের দিকটা হল উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল আর আরব সাগরের দিকটা শান্ত।

এই সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ সেরে স্টেশনে ফিরে এলাম যখন, তখন ইণ্ডো-সিলোন এক্সপ্রেস জাহাজটি বন্দর ছেড়ে গেল। আমাদের ট্রেনটিও স্টেশনে অপেক্ষা করছিল—গাড়ীতে উঠে মণ্ডপম্ পৌছে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিলাম।

এইখানেই ছড়িদারের কাজ শেষ। তার খাতায় আমাদের নাম ঠিকানা সব লিখে দিলাম। বিদায় পর্বটি কিন্তু খুব মধুর হল না। ছড়িদার আমার কাছে এই দু'দিন ঘোরাঘুরির জন্যে একশ' টাকা চেয়ে বসল। যদিও শেষ পর্যন্ত তাকে এত দিতে হয়নি।

ফিরতি পথে আবার আমরা নামলাম ত্রিচিনাপল্লীতে। আবার আশ্রয় নিলাম সেই রিটায়ারিং রুমে।

কথা ছিল আমাদের গাইড হিসেবে মিঃ যজ্ঞস্বামী আসবেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে তিনি আসতে পারেননি। একজন লোককে পাঠিয়েছেন।

এখান থেকে কুম্ভকোনামে গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করবো, সে ব্যবস্থাও মিঃ যজ্ঞস্বামী করে রেখেছেন একথাও শুনলাম , ভালই হ'ল।

ত্রিচিনাপল্লী থেকে কুম্ভকোনাম। সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা হয়ে বেলা একটায় পৌঁছনো।

এখানে এসে যে মানুষটিকে পেলাম, আমার চোখে সে একটি বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। যজ্ঞস্বামীর সহকারীর ভাই, বয়স তার এমন কিছু নয়, উনিশ-কুড়ির মত। তাকে দেখেই অবাক হলাম। খালি গা, খালি পা, মাদ্রাজীদের মত কাপড় পরা, মাথায় একটি বিরাট শিখা, আর গায়ে একটি সাদা উত্তরীয়। আরো মানুষের ভিড় থেকে সে আমাকে ঠিকই চিনে নিয়েছে। কারণ, এখানে আমি একমাত্র ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা বাঙালী।

একটা কথা বলা দরকার। এখানে আমার পরিচয় চিত্র-পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরীরূপে, যদিও আমি বাংলাদেশের অভিনেতা, একথাটাও জানে না এমন নয়। আমি বেশ কয়েকটি তেলেগু ছবি পরিচালনা করেছি, যেগুলি এদেশে ভালই চলেছে।

যাই হোক, এই বিচিত্র যুবকটি আমাদের বিনয়ের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল। তার নামটিও জানলাম। গোপাল।

স্টেশনের বাইরে এসে আমিই একটি গরুর গাড়ী ঠিক করলাম। কিন্তু গোপাল গাড়োয়ানটিকে কী যেন বললে তার ভাষায়। গাড়োয়ান চলে গেল তার কথা শুনে। আমি ভাবলাম গোপাল বোধহয় কোন পাণ্ডার লোক। চটেই উঠলাম তার ব্যবহারে। বললাম, এ-সব কী হচ্ছে। তুমি বাপু এখান থেকে সরে পড়।

গোপাল আমাকে বোঝাতে চাইল ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে যে, সে আমারই জন্যে স্টেশনে এসেছে।

—বল কি?

এবারে সে জানালে, মিঃ যজ্ঞস্বামীর সহকারীর কাছ থেকে আগেই সে আমার খবর পেয়েছে। খবর পেয়েই আসছে।

নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জা পেলাম।

এবারে গোপালের সঙ্গে তার ঠিক করা গরুর গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

আমাদের বাংলাদেশের মতই এ-দেশের গরুর গাড়ী। গোপাল বসলো গাড়োয়ানের পাশে। আমি আর সুধীরা ভিতরে।

প্রথমেই আমরা এলাম একটা প্রেসে। আমরা এসেছি শুনে প্রেসের মালিক হন্তদন্ত হয়ে এলেন অভ্যর্থনা জানাতে। গাড়ী থেকে নামতে বললেন। গোপাল

দু'জন কুলিকে ডেকে আমাদের মাল-পত্তর নামিয়ে নিলে। তারপর আমাদেরকে নিয়ে দোতলার একটি ঘরে চলল।

ঘরটা দেখে আমি আর সুধীরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। এ-ঘরে বসা চলে, থাকা চলে না।

প্রেসের মালিকের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, তিনি এক-রাত্রির জন্যে আর কোথাও জায়গা না পেয়ে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করেছেন। আরো শুনলাম, প্রেসের পাশেই একটি সিনেমা হল রয়েছে, তারও মালিক তিনি।

সবই শুনলাম এবং বুঝলাম। কিন্তু এ ঘরে থাকা কি সম্ভব। বললামও তাকে।—এখানে দু'দণ্ড বসা যায়, কিন্তু থাকা কি সম্ভব?

আমার কথায় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন, সবই বুঝলাম স্যর, কিন্তু কি করবো বলুন। এখানে ভাল হোটেল নেই, তাছাড়া ধর্মশালাগুলিতেও জায়গার অভাব। যাই হোক, আপনারা একটু বিশ্রাম করুন, আমি আর একবার চেষ্টা করে দেখি কোথাও কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। গোপাল অবশ্য আমাদের কাছেই রইল।

কোথাও এসে কিছুতেই বসে থাকতে পারি না। এখানেও বসে থাকতে পারলাম না। একটা গরুর গাড়ী ঠিক করে বেড়াতে বেরুলাম।

যেখানেই যাই, সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরতে হবে। কারণ আলোর নিতান্ত অভাব। বিজলী আলোর ব্যবস্থা যা আছে, তা না থাকার সামিল।

কুম্ভকোনাম হল তামিল সংস্কৃতির পীঠভূমি। বাংলাদেশের নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী যেমন সংস্কৃতচর্চার স্থান, এ-ও তেমনি।

জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিতদের বাসস্থান এই কুম্ভকোনামে। তাছাড়া জ্যোতিষ-শাস্ত্র চর্চার জন্যে সারা ভারতে এদেশের খ্যাতি। এখনো কুম্ভকোনামে তেমন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি।

গরুর গাড়ীতে আমরা চলেছি। এদিক-ওদিক যা দেখার দেখছি! এরই মধ্যে একসময় বৃষ্টি নামল। সেই বৃষ্টির মধ্যে আমরা বাজারে এলাম, কিছু কেনাকাটার জন্যে।

এত সময় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। এবারে বৃষ্টি নামল মুষলধারায়।

আকাশের অবস্থা দেখে মনে হল, এ-বৃষ্টি সহজে থামবে না।

বাজার থেকে কিছু কেনাকাটা করেছি। তারপর ফিরে এলাম নির্দিষ্ট ছাপাখানায়।

কিন্তু মালিকের দেখা পেলাম না। শুনলাম, সিনেমা হলে গেছেন।

সিনেমা হলে দেখা হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। শুনলাম, আমাদের জন্যে একটা হোটেলের ব্যবস্থা করেছেন। খবরটা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। যা হোক একটা আশ্রয় তো মিলল।

সিনেমায় তখন 'সন্ত জ্ঞানেশ্বর' ছবিটি চলছিল। খানিক বসে ছবিটি দেখলাম। একটি মহান্ জীবনের ছবি বলেই দেখলাম, নয়তো সাধারণতঃ ছবি আমি দেখি না।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত মনেই এলাম চক্রপাণি মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখতে। সঙ্গে গোপালও আছে।

মন্দিরে এসেছি। চক্রপাণির মন্দির। সন্ধ্যারতি তখনো আরম্ভ হয়নি।

দক্ষিণ ভারতের আরো মন্দির থেকে এ মন্দিরটি একটু স্বতন্ত্র ধাঁচের। এ মন্দিরের যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তা মন্দিরটির সাধারণত্বে। আকারে ছোট হলেও সুন্দর। তবে মন্দিরের আচ্ছাদনগাত্রে দক্ষিণ-ভারতীয় রীতিতে রাশিচক্র অঙ্কিত রয়েছে, সত্যই তা দেখবার মত।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। মন্দিরের অভ্যন্তরের অপূর্ব কারুকায দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই।

মন্দিরের আরতি শেষ হতে ফিরে এসেছি। এবারে আর সেই ছাপাখানায় নয়, হোটেলে।

এখনো সম্পূর্ণ হয়নি হোটেল-বাড়ীটি। কাজ চলছে। এতদিন এটা কেবল রেস্তোরাঁই ছিল, এখন আয়োজন চলছে এটিকে আবাসিক হোটেলে রূপান্তরিত করার।

হোটেলের হল-ঘরটিতে, যেটি তখনো সম্পূর্ণ নয়, কাজ চলছে—সেইখানেই আমাদের থাকার জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে।

সময়ের সঙ্গে সবই মেনে নিতে হয়। যেমনই হোক, হোটেলের হল-ঘরের মধ্যে একটি তক্তাপোশকেও আজ মনের মত মনে হল।

আমার তবুও বিশ্রামের অবসর আছে। কিন্তু সুধীরার অবসর কই! তাকে যে এখন রান্নার আয়োজন করতে হবে। ঘরের কোণেই স্টোভ জ্বালাতে বসলো সুধীরা। কিন্তু বাধা দিলে গোপাল। জানালে, নিচে ভাল চুল্লি আছে, মিছে কেন এসব ঝামেলা করা।

একটু বাদেই সে ওপরে চলে এল। রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করতে মাথা নাড়ল। ওর ওই এক স্বভাব। সব কথাতেই মাথা নাড়বে।

সুধীরা একটু বিব্রত মনেই ওপরে ওঠে এল। জানালে, নীচে সে রান্না করবে না। ভয় করছে তার।

—কেন কী হল ?

—কি জানি, পাঁচ ছ'জন যণ্ডাগোছের কালো কালো লোক নিচে জটলা করছে। কী যে বলছে তারা, কিছুই বুঝতে পারছি না। তাছাড়া অত বড় বড় উনুন—গনগন করে জ্বলছে আগুন। আর ওই সব ভয়ানক লোকজন, ওর মধ্যে আমি একজন মেয়েমানুষ—কি করে থাকব! আমি পারব না নীচে রান্না করতে।

—ভয় কি ? বললাম, গোপাল না হয় সঙ্গে থাকছে। এবারে সুধীরা কিছুটা আশ্বস্ত হল। গোপালের সঙ্গে নীচে চলে গেল।

ওরা চলে যেতে আমি চুপচাপ বসে রইলাম একা।

রান্নার পালা চুকতে সুধীরা ওপরে এল গোপালকে নিয়ে। সুধীরা খাবার পরিবেশন করতে আরম্ভ করলো। গোপাল দাঁড়িয়েছিল একান্তে। জিজ্ঞাসা করলাম তুমি খাবে তো ?

—না, আমি খেয়ে এসেছি।

—সে কী !

গোপাল কথা না বলে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকলো। এবারে নিশ্চিন্তে বিশ্রামের পালা। শুধু আজকের রাতটুকু। কাল ভোরেই তো চলে যেতে হবে। কদিন থেকে এই তো চলছে। আজ এখানে, কাল সেখানে। কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই, শুধু যাযাবর মানুষের মত পথ চলা।

গোপাল তখনো দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোথায় থাকবে গোপাল ?

গোপাল এদিক-ওদিক ফিরে তাকাল। বলল, বারান্দায় আপনাদের দরজার বাইরে।

—অসুবিধে হবে না তো ?

—না। অনুচ্চ-কণ্ঠে গোপাল বললে, তারপর সে নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে গেল।

রাত। ঘুম আসেনি তখনো। ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় জীবনের হিসেব করছি। হিসেব এমন কিছু নয়—কদিনের এই ছুটে চলার হিসেবটা মিলিয়ে নিচ্ছি মনে মনে। এরই মধ্যে একসময় কখন যেন ঘুমের মধ্যে আজকের সব চিন্তা শেষ হয়ে গেল।

ঘুম ভাঙাল রাত ভোরে। গোপালের ডাকে। সকাল সাতটায় ট্রেন ধরতে হবে, সে খেয়াল তার ঠিকই আছে। পাঁচটা-বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের ডাক দিয়েছে।

সকাল সাতটায় ট্রেন। হাতে আর সময় নেই। এখনই সম্পূর্ণ করতে হবে যাবার আয়োজন।

সবকিছু গোছগাছ হয়ে যেতে গোপাল গাড়ী ডাকতে গেল।

ঘোড়ায় টানা গাড়ী। ধ্রুপদী ছন্দে চলে।

হোটেল থেকে স্টেশন। এমন কিছু দূরের পথ নয়। হোটেল থেকে বেরুবার মুহূর্তে একবার ফিরে চাই হোটেল-বাড়ীটার দিকে। ভাবি, জীবনের চলার পথে আমরা একটা রাত কাটিয়েছিলাম ওখানে।

স্টেশনে পৌঁছেছি। ট্রেনের কামরায় স্থানও করে নিয়েছি। কিন্তু কী জানি কেন, গোপাল তখনো দাঁড়িয়ে আছে, মুখ-চোখ দেখে মনে হয়, কিছু বলতে চায় সে। একসময় কাগজ-কলম এগিয়ে দিলে। একটু কুণ্ঠা জড়ানো স্বরে বললে, একটা সার্টিফিকেট স্যর।

—সার্টিফিকেট! কী হবে।

—আপনার একটা সার্টিফিকেট পেলে আমার অনেক কাজে লাগবে।

গোপালের মুখের দিকে ফিরে চাই। ভাবি, আমি দু'কথা লিখে দিলে ওর যদি কোন কাজ হয় ভালই তো!

সার্টিফিকেট লিখে গোপালের হাতে দিলাম। গোপাল একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। দেখলাম, ওর দুটি চোখ কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

স্টেশনের ঘণ্টা বাজলো। এঞ্জিনের বাঁশী উঠলো বেজে। বাঁশীর সংকেত দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করলো।

গোপাল তখনো দাঁড়িয়েছিল প্ল্যাটফর্মে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিলাম। হয়তো গোপালকে দেখার জন্যে।

একসময় গোপাল আমার দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল অপস্রিয়মান ছায়ার মত।

জীবনে চলার পথে এমনি কত মানুষ আসে যায়। হয়তো অজ্ঞাতসারে তারা মনের মধ্যে দাগ কেটে যায়। জীবনের চলতি পথের ছন্দ তো এরই মধ্যে।

শীতার্ত আবহাওয়ায় যাত্রা শুরু করেছিলাম। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেজটুকু হারিয়ে গেল। নির্মেঘ আকাশ; কুয়াশার জালটুকু সরে গেছে। সূর্যের আলো ঝরে পড়েছে প্রকৃতির পটভূমিকায়।

চলতি ট্রেনের জানালার ধারে বসেছিলাম। দৃষ্টি ছিল বাইরে। যেখানে উদার আকাশ দিগন্তের পারে মাটি স্পর্শ করেছে।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। দেখি দু-চোখের তারায় চলমান ছবি।

মুহূর্তের জন্যে কত ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে হারিয়ে যায়। জীবনের হারানো মুহূর্তের সঙ্গে তারাও যেন হারিয়ে যায়।

শুধু আমি নই—সুধীরার দৃষ্টিও তখন বাইরে চলমান দৃশ্যের মধ্যে সমানে ছুটে চলেছে। সে-ও দেখছে চল্‌তি পায়ের ছবি।

পথ চলতে এই আনন্দ। ক্ষণিকের দেখা, ক্ষণিকের উপলব্ধি—তারই মধ্যে জীবনকে মিশিয়ে দেওয়া।

বেলা এগারটা।

চিদাম্বরমে ট্রেন এসে দাঁড়াল। ট্রেন থেকে নেমেছি। এসেছি প্ল্যাটফর্মের বাইরে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে কোথায় যাব প্রথমে—এই কথাটা ভেবে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী করেছি। ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা। আমাদের সওয়ারী করে ছুটে চললো নটরাজের মন্দিরের উদ্দেশে। গাড়ীর ভাড়া ঠিক করতে হল না। মিউনিসিপ্যালিটির রেটে বাঁধা আছে।

চিদাম্বরমে শহরের রাজপথ ধরে চলেছে আমাদের টাঙ্গা। এখানেও দেখার বিরাম নেই। চল্‌তি-পথে যেটুকু দেখার ত্ু'চোখ ভরে দেখে নিই।

নটরাজের মন্দির। যার কথা এতদিন ভেবেছি, যে মন্দির দেখার বাসনা এতদিন মনের মধ্যে রেখেছি, সেই মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। গাড়ী থেকে নেমে চেয়ে থাকি মন্দিরের দিকে। তারপর গাড়ীতে জিনিসপত্তর রেখে, গাড়ীর লাইসেন্স নম্বরটি সঙ্গে রেখে, নগ্নপদে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি।

দক্ষিণ-ভারতের আরো মন্দিরের মত এ-মন্দিরের স্থাপত্যকলা একই ধরনের। যেটুকু পার্থক্য তার গঠনশৈলীতে এবং বৈচিত্র্যে।

মন্দিরের চারদিকে যা-কিছু দর্শনীয়, দেখা শেষ করে নটরাজের মূল মন্দিরে প্রবেশের পালা। লক্ষ্য করলাম—আরো দর্শনার্থী যারা, তারা সবাই নটরাজ দর্শনে চলেছে খালি গায়ে এবং খালি পায়ে। গায়ে শুধু একটি করে চাদর।

অগত্যা আমিও গায়ের জামা খুলে স্ত্রীর হাতে দিলাম। বললাম, তুমি অপেক্ষা কর। আমার দেখা হয়ে গেলে, তুমি যাবে।

সুধীরা আমার হাতে কিছু পয়সা দিয়ে বললে, পূজো দেবে, কেমন ?

সুধীরা দাঁড়িয়ে রইল। আমি আরো দর্শনার্থীর সঙ্গে মন্দিরের ভিতরে চললাম, নটরাজের মূর্তি দর্শন করতে।

বাইরে বারান্দা থেকে দেখলাম উচ্চ বেদীর ওপর নটরাজের মূর্তি। ছোট হলেও

সুন্দর। দুষ্প্রাপ্য এ্যাম্বার পাথরে তৈরি। যার পিছনে একটি দীপ-শলাকা জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটি যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ভাবি, কী বিচিত্র এই রূপকল্পনা। নৃত্যরত মহাকাল। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের ঈশ্বর।

দাঁড়িয়ে থাকি অচঞ্চল। প্রণাম করি। তারপর যাই দেব-গৃহ দেখার বাসনা নিয়ে।

এবারে বিস্মিত না হয়ে পারি না। কোন মূর্তি নেই—শুধু পটে-আঁকা আকাশ। মনে হয়,—সেই অরূপ, অব্যয়, সেই অনন্ত সত্তার প্রকাশ ওই আকাশে।

জানি না আমার ব্যাখ্যা ঠিক কিনা—জানতে চাইনে কারো কাছে—ভাবলাম, ঈশ্বরতত্ত্বের মূল কথাই এই। তিনি অরূপ—তিনি অব্যয়, তিনি অসীম অনন্তে বিরাজিত।

চিত্রিত আকাশপটের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ মনে এল সুধীরার কথা। সে আমার অপেক্ষায় আছে।

ফিরে এলাম মন্দির অঙ্গনে। যেখানে সুধীরা দাঁড়িয়ে ছিল আমার অপেক্ষায়।

এবারে সুধীরা গেল মন্দিরে। আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তার অপেক্ষায়।

শুনেছি, চিদাম্বরমে আরো একটি দর্শনীয় স্থান আছে, যেখানে ভরতনাট্যমের ১০৮টি মুদ্রা পাথরে ক্ষোদিত রয়েছে। আমি নাটক ভালবাসি, নাটকের মধ্যেই নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছি, তাই তো ভরতনাট্যমের মুদ্রা দেখতে এত আগ্রহ।

কিন্তু কী আশ্চর্য! আমি দূরদেশী পথিক, যা দেখতে আমার অদম্য আগ্রহ, সেই দর্শনীয় স্থানটির নিশানা জানাতে পারল না কেউ। শেষটা মুশকিল-আসান করলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম পথের হদিশ।

মনের মধ্যে যে কৌতূহল জমা ছিল, অবশেষে সে কৌতূহলের অবসান হল। ভরতনাট্যমের স্মারক আমার চোখের সামনে।

পর পর ১০৮টি ফলকে ভরতনাট্যমের মুদ্রা। পুরুষ আর প্রকৃতি—লীলায়িত দেহতনু। কত বিচিত্র তার প্রকাশ! কত বিচিত্র তার ছন্দ!

দু'চোখ ভরে দেখি, ভাবি যদি শিল্পী হতাম রঙ-তুলি দিয়ে এঁকে রাখতাম ভরত-নাট্যমের এই ধ্রুপদী ছন্দকে। যদি ক্যামেরায় ছবি তুলতে দিত, তাহলেও হয়তো ছবি তুলতাম। কিন্তু এখানে ছবি তোলা নিষেধ।

কিন্তু অমন শিল্পী আমি নই। অথচ মনের ক্যানভাসে চিরদিনের জন্যে আঁকা হয়ে গেল সবকিছু।

এবারে চললাম আন্নামানাই বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে। বাইরে থেকে যতটুকু দেখা—নয়তো আর কিছু নয়। দেখে মনে হল, আজ যে সম্ভাবনা দেখলাম, একদিন হয়তো তা পূর্ণ হবে নানা নতুন সম্ভাবনায়। বিশ্ববিদ্যালযের ভাইস-চ্যান্সেলারের বাস-গৃহটিও দেখা হল। সুন্দর!

বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে অনেক সময় গেল। খুঁটিযে দেখতে গেলে আরো সময় যেত। কিন্তু এই বেলায আর তা সম্ভব নয়। সেই সকাল থেকে একটানা ঘুরছি, দেখছি—এবারে একটু বিশ্রাম চাইছে দেহ। সুধীরাকে ক্লান্ত মনে হল। তারও মনে একটু বিশ্রাম-চিন্তা।

বিশ্ববিদ্যালয থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে সোজা স্টেশনে চলে এলাম। ক্ষিধেও পেয়েছিল খুব। ভালমন্দ বিচারেব অবসর নেই। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে খাবার পাওয়া যায। প্ল্যাটফর্মের একান্তে বসে মাদ্রাজী-খানা গ্রহণ করলাম।

আজই প্রথম মাদ্রাজীখানার স্বাদ গ্রহণ করলাম। ভাত আর ইডলিধোঁসা। অপূর্ব সুস্বাদু মনে হল। হযতো সেই প্রচণ্ড ক্ষুধার মুখে বলেই।

প্ল্যাটফর্মে আরো মানুষের ভিড। সবাই অপেক্ষা করছে ট্রেনের জন্যে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হল। বেলা চারটের ট্রেন এসে দাঁড়াল। ভিল্লু-পুরমগামী ট্রেন। ভিল্লপুবম থেকে আবার মাদ্রাজগামী ট্রেন ধরতে হবে।

বেলা তখন চারটে। শীতের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

খোলা জানালাব ধারে বসেছিলাম। দৃষ্টি ছিল বাইরে।

গ্রাম-জনপদ-প্রান্তর পেরিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে—। এরই মধ্যে চোখের পর্দায় প্রতিফলিত হয় চলমান জীবনের ছবি।

দেখতে পাই, প্রতিটি গ্রামেই রযেছে নানা প্রতীক মূর্তি। ভাবি দেবতা যেন এদেশের মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। মানুষ আর দেবতা যেন এখানে এক হয়ে গেছে।

আরো দেখি, ক্ষেতে-খামারে কাজ করছে নর-নারী। দেখি নারী এখানে পুরুষের কর্মসঙ্গিনী। জীবনের কর্মকাণ্ডকে তারা সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছে। আরো দেখতে পাই, নারী এখানে অবগুণ্ঠনের আড়ালে হারিয়ে যায়নি। তারাও আলো-বাতাসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারে।

দেখতে দেখতে দিনের আলো হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল বাইরের ছবি। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম ট্রেনের কামরার ভিতরে। দেখলাম, সুধীরা তখনো বসে আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। হয়তো দৃষ্টি তার আকাশের কোণে কোন উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে।

ভিল্লুপুরম জংশনে পৌছলাম সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়। রাত দেড়টার আগে মাদ্রাজগামী ট্রেন নেই। সুতরাং এই সময়ের জন্যে যাত্রা-বিরতি এখানেই।

কিন্তু রিটায়ারিং রুমে জায়গা নেই। নাই-বা থাক। এইটুকু তো সময়। কেটে যাবে ওয়েটিং-রুমে। তা ছাড়া এমন প্ল্যাটফর্ম তো রয়েছে।

সারাদিনের ক্লান্তি। দেহ-মন যেন একটু বিশ্রাম চাইছে। তাছাড়া শুধু তো একদিনের ক্লান্তি নয়, কদিন তো এই চলছে।

রিফ্রেসমেণ্ট রুমে খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে নিই আমরা। তারপর একটু বিশ্রামের আশায় এসে বসি ওয়েটিং রুমে।

ওয়েটিং রুমের চেয়ারে বসে থাকাতে একটু তন্দ্রাও এসেছিল। তন্দ্রা টুটে গেল স্টেশনের ঘণ্টা বাজতে। ট্রেন আসছে।

ট্রেন আসার পূর্বলগ্নে যাত্রীরা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ-চাঞ্চল্য আমাদের মনেও।

ট্রেনের কামরায় উঠেছি। বসেছি অলস ভঙ্গিতে। বাকি রাতটুকু কেটে যাবে চলতি ট্রেনে।

বাঁশীর সংকেত দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করলো। চলতি ট্রেনের একটা নিজস্ব ছন্দ আছে। রাতে যেন এই ছন্দটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দেখলাম, ট্রেনের দুলুনিতে সুধীরা ঘুম-ঘুম তন্দ্রাচ্ছন্ন। আমারও দু'চোখে তন্দ্রার আবেশ।

তখনো ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি। ট্রেন এসে দাঁড়াল এগমোর স্টেশনে। ঘড়িতে সময় দেখলাম। পাঁচটা।

স্টেশনে নেমেই মুখে-চোখে জল দিয়ে চায়ের তৃষ্ণা মেটাই। তারপর দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ফুটতে সকাল সাতটা নাগাদ ফোন করলাম জীতেনকে। জানালাম আমি এসেছি।

জীতেন জানালো, সে এখুনি আসছে আমার কাছে।

সাড়ে আটটায় জীতেন এল। এসেই জিজ্ঞাসা করলে, আপনারা এখানে উঠেছেন কেন? না—না, এখানে থাকা চলবে না। আসুন, আমি ভাল হোটেল ঠিক করে দিচ্ছি।

বললাম, না, হোটেল নয়, জীতেন। আমরা এখানেই থাকব। এই তো বেশ আছি।

জীতেন তবুও বলে, না—সে হয় না।

বললাম, কেন হয় না। এখানে অসুবিধে কিছু নেই, বরং অনেক দিক থেকে সুবিধে। পা বাড়ালেই রাস্তা, কাছেই ট্যাক্সি। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়ারও সুবিধে। হোটেলের মত আমিষ ভোজনের বাধা নেই। হোটেলে থাকলে তো টিফিন কেরিয়ারে তোমার বাড়ী থেকে খাবার আনতে হবে। কী দরকার ওসব ঝঞ্ঝাটে। তার চেয়ে এই তো ভাল।

সুধীরাও সেই একই কথা বললে।

জীতেন জিজ্ঞাসা করলে, এখন আর কি করবেন বলুন।

—করা-করির আর কি আছে। আজ তো ভাবছি, শহরটা একবার ঘুরে দেখব। বাজার-টাজার করবো। জানো তো আমাদের কিছু কেনাকাটার বাতিক আছে। তাছাড়া মায়লাপুরের মন্দিরটা আজই ঘুরে আসতে চাই। আজ পাঁচ তারিখ। হাতে তো দু'দিন সময়। এর মধ্যে পক্ষীতীর্থম আর মহাবলীপুরম দেখার ব্যবস্থাটা করে দিও। মাদ্রাজে এসে ওই দুটো জায়গা না দেখে তো যেতে পারি না। আট তারিখে কলকাতা যাওয়ার জন্যে ট্রেনে বার্থ রিজার্ভ করে রেখো।

জীতেন বললে, নিশ্চয়ই। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

জীতেন তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে ফোন করলে। কী বললে, জানি না। তবে যা বুঝলাম, তাতে মনে হল—আমার প্রসঙ্গেই ওর কথা।

এরপর চা-পানের পর জীতেন গাড়ী নিয়ে এল। উদ্দেশ্য বাজারে যাওয়া—কিছু কেনাকাটা করা। সেই সঙ্গে শহরটাও একটু খুঁটিয়ে দেখা হবে।

ঘুরে ঘুরে নানারকমের জিনিস কিনলাম। সুধীরার ঝোঁক ঠাকুরপূজার তৈজস কিনবার। পূজোর নানারকমের জিনিস-পত্তর কিনলাম। দেখবার মত। ধুতি চাদর থেকে আরম্ভ করে আরো কিছু কেনাকাটা করি। তারপর আছে আমার মেয়ের জন্যে পছন্দসই কিছু কেনা। তার জন্যে কিছু না নিলে নয়। ভারতবর্ষের এত জায়গায় এত জিনিস কিনেছি, কিন্তু এমন জিনিস চোখে পড়েনি।

কিন্তু বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়ে হল আর এক মুশকিল। দাম দিতে যাই দোকানীকে, কিন্তু জীতেন বাধা দেয়। জিনিসগুলো হাতে নিয়ে বলে, ওসব পরে দিলে হবে। বুঝলাম না ওর মতলবটা কি।

বাজারের পথেই রামসেশানের অফিসে এলাম। এসেই শুনলাম, আসছে কাল থেকে আমাকে এবং এনাক্ষী রামা রাও-কে সম্বর্ধনা জানানো হবে। সম্বর্ধনার কথা শুনে খুশি হইনি এমন নয়, তবু মনে হল—এসেছি বেড়াতে, এখানে আবার এসব ঝামেলা কেন? তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না। ভাবলাম, ওরা আমাকে

ভালবাসে বলেই তো সম্বর্ধনা দিতে চায়। ভালবাসার দান মাথায় তুলে নিতে হবে।

বললাম, সম্বর্ধনা তো হবে—আমাকে কিছু বলতে হবে না তো?

—বলতে হবে বৈকি। রামসেশান বললে, নিশ্চয়ই। এখানকার সবাই আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়।

রামসেশানের অফিস থেকে এসেছি মায়লাপুরম মন্দিরে। শহরের মধ্যেই মন্দির। অজস্র মানুষের ভিড়। এত ভিড় ভাল লাগে না। নিভৃতেই যেন দেবতার স্থান। তবু মন্দির দেখলাম। মনে তেমন দাগ কাটল না। মন্দির থেকে বেরিয়ে আর কোথাও নয়, সোজা চলে এলাম স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে। আজকের মত এখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়লো।

পরদিন। তারিখটা ৬ই ডিসেম্বর। সকাল থেকেই চিন্তা আজকের সম্বর্ধনার ব্যাপারে। চিন্তা বলতে, একটা কিছু ভাষণ দিতে হবে তো? কী বলবো। বসে বসে ইংরেজীতে তার খসড়াও করে ফেললাম। মোটামুটি একটা কিছু দাঁড়ালো।

যাইহোক যথারীতি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। আলাপ হল এনাক্ষী রামা রাও-এর সঙ্গে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন মাদ্রাজের বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা সত্যমূর্তি। সত্যমূর্তির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল।

অনুষ্ঠান আমাদের দেশের মত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন শহরের বিশিষ্ট নাগরিকগণ। দেশ থেকে এত দূরে এসেও আজ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে এসে মনে হল আমি এদের কত কাছের মানুষ।

সম্বর্ধনার উত্তরে আমাকে কিছু ভাষণ দিতে হল। ইংরেজীতেই আমার ভাষণ পাঠ করলাম।

তারপর যথারীতি জলযোগের পালা। এখানে অতিথিদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ আলাপের সুযোগ পেলাম।

অনুষ্ঠানশেষে আমাকে ফিরতে হবে। জীতেন আর কেষ্টবাবু আমাদের সঙ্গেই এল। কেষ্টবাবু বললেন, আসছে কাল ভোরেই আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন। পক্ষীতীর্থম যাব।

বললাম, ঠিক আছে তুমি যত সকালেই আস না কেন, দেখবে আমরা তৈরি হয়ে আছি তোমার অপেক্ষায়।

এর পর খানিক গল্পগুজব করে কেষ্টবাবু আর জীতেন বিদায় নিলে।

যাবার আগে কেষ্টবাবু আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিলে আসছে কাল সকালের কথা।

সে রাতটা কাটলো নিশ্চিন্ত আরামে। রাতভোরে সূর্য-ওঠার আগে সুধীরাই আমাকে ডাকল। বললে, ওঠ—এখনো ঘুমোচ্ছ, পক্ষীতীর্থ যেতে হবে না?

শয্যাত্যাগ করেছি। তৈরি হয়েছি অল্প সময়ের মধ্যে। জীতেন, কেষ্টবাবু এখনো এসে পৌঁছয়নি। তবে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হল না। জীতেন আর কেষ্টবাবু এসে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

মুসাফির, চলো। যাওয়ার নামে সুধীরা তো পা বাড়িয়েই আছে।

সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। শহর—শহরতলী পেরিয়ে পল্লীর পথ। পথের দুধারে মনোরম দৃশ্যপট। এই মুহূর্তে যা স্পষ্ট হয়ে ফোটে, পরমুহূর্তে তা হারিয়ে যায়। মাঝপথে চিংলিপুট জংশনে যাত্রাবিরতি। এখানে প্রাতরাশ সারতে হবে।

চিংলিপুট রেলস্টেশনটি বেশ বড। এখান থেকেই চলে গেছে কাঞ্চিভরম এবং ত্রিচিনাপল্লীর রেলপথ। স্টেশনের রিফ্রেসমেণ্ট রুমটিও সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন।

প্রাতরাশের পালা চুকিয়ে নিয়েছি। অর্ডার দিয়েছি দুপুরের আহারের জন্য। পক্ষীতীর্থম আর মহাবলীপুরম থেকে ফেরার পথে এখানেই মধ্যাহ্নভোজন করবো। ফিরতে হয়তো দুটো আডাইটে হবে। তা হোক।

চিংলিপুট থেকে রওনা হয়ে একেবারে পক্ষীতীর্থম। পক্ষীতীর্থমে পৌঁছেই একনজরে চারিদিকের পরিবেশে দৃষ্টিপাত করি। প্রথম দর্শনেই ভাল লাগলো জায়গাটিকে। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড—সবুজ অরণ্যে ঢাকা।

প্রথমেই দেখলাম একটি সুন্দর জলাধার। শুনলাম, যুগান্তে অর্থাৎ বারো বৎসর ধরে এই জলাধারে একটি বিরাট শঙ্খ আসে। যে শঙ্খটিকে এখানকার দেবী মন্দিরে সযত্নে রাখা হয়। তাছাড়া এই জলের নাকি নানা গুণ। এখানে স্নান করলে নানা জটিল রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

জলাধার থেকে পাহাডের পাদদেশের মন্দিরটিতে এসেছি। সুবৃহৎ মন্দির, নানা কারুকার্যের ঐশ্বর্য। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি, ভাবি—কোন্ সুদূর অতীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই মন্দির। মানুষ তার আরাধ্য দেবতাকে এই মন্দিরে অভিষিক্ত করেছিল। তারপর কতদিন গেছে, কালের কত আবর্তন, বিবর্তন—যুগ-যুগান্তর ধরে কত মানুষ এসেছে, গেছে,—মন্দিরের পাথরে পাথরে হয়তো তা গাথা হয়ে আছে। মন্দির আর দেবতা—পুরাতন ইতিহাসের নীরব সাক্ষী।

এবারে পাহাড়ে ওঠার পালা। পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়িপথ উঠে গেছে ওপরের দিকে। এমন কিছু উঁচু নয়, হয়তো পাঁচশ ফুট কিংবা আরো কিছু বেশি হবে।

পাহাড়ের সিঁড়িপথ ধরে উঠছি। সবুজ ছায়া-জড়ানো পথ। মনে হয় যেন এক কল্পলোকের পথ ধরে চলেছি। মাঝে মাঝে নিবিড় ছায়ার মধ্যে, থেকে থেকে চিকন রোদ এসে পড়েছে। বেশ লাগছে আলো-ছায়ার মিতালি।

পাহাড়ের ওপরে উঠেছি। ছোট মন্দির। মন্দিরের চত্বরে মদ্রদেশীয় পুরোহিত কয়েকজন। পুরোহিতেরা পক্ষী-দেবতার ভোগের আয়োজনে ব্যস্ত। আরো কিছু যাত্রীকেও দেখলাম।

পক্ষী-দেবতার উদ্দেশে আমরাও পূজা নিবেদন করেছি। পুরোহিত একটু দূরে গিয়ে পক্ষী-দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিতে লাগলেন। দেখলাম, ডাক শুনে দুটি সুন্দর পাখি উড়ে এল। পাখিগুলো দেখতে ভারি সুন্দর! গায়ের রঙ সাদা, ঠোঁট আর পা দুটি হলদে। দেখতে অনেকটা শঙ্খচিলের মত।

পাখিরা উড়ে এল, আহার্য গ্রহণ করে আবার উড়ে গেল পাহাড়ের সবুজ গাছ-পালার আড়ালে।

পুরাণে বর্ণিত আছে, এরা নাকি অভিশপ্ত দেবতা। ত্রিকালজ্ঞ। যুগ-যুগান্তর ধরে এরা নাকি পক্ষীরূপে এখানে অবস্থান করছে।

সত্য মিথ্যা যাচাই করার প্রবৃত্তি নেই। কিংবদন্তী এই, তবে এদেশে এই জাতীয় আরো অনেক পক্ষী দেখেছি।

পক্ষীতীর্থম থেকে মহাবলীপুরম।

দক্ষিণ-ভারতের অজস্র দর্শনীয় স্থানের মধ্যে মহাবলীপুরমের স্বকীয়তা আছে। শুনেছি, এখানে সাতটি প্যাগোডা আছে। যার সঙ্গে মহাভারতের নায়ক-নায়িকাদের স্মৃতি জড়ানো। অক্ষত অবস্থায় পাঁচটি প্যাগোডা দেখলাম। ষষ্ঠটি সমুদ্রের ধারে। যার অনেকখানি অংশ আজ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আর সপ্তমটির সন্ধান পেলাম না। হয়তো কালের গতির সঙ্গে কোন একদিন তা হারিয়ে গেছে সমুদ্র-সংঘাতে।

অখণ্ড পাথর কেটে তৈরি হয়েছে এই প্যাগোডা।

সমুদ্রের ধারে আলোকস্তম্ভ দেখলাম। যে আলোকস্তম্ভটি নিষেধের বাণী উচ্চারণ করছে: এখানে এসো না। তোমার জন্যে বিপদ অপেক্ষা করছে। সমুদ্রে রয়েছে গোপন পাহাড়ের অস্তিত্ব।

কিংবদন্তী আরো বলে, সুদূর অতীতে এখানে নাকি দানবরাজের রাজধানী

ছিল। মহাপরাক্রমশালী ছিলেন দানবরাজ। তাঁরই আমলে নির্মিত হয়েছিল মহাবলীপুরম। কিন্তু আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। শুধু এই কয়েকটি প্যাগোডা ছাড়া।

হয়তো একদিন এই মহাবলীপুরম ছিল নানা ঐশ্বর্যে ভরা। ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে সেই ঐশ্বর্য হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে দানবরাজের রাজধানীর গৌরব—যা আজ গাথা হয়ে গেছে!

ফিরে চাই চারিদিকের পরিবেশে। কোথাও কোন জনবসতির চিহ্নমাত্র নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় শূন্যপ্রান্তর ধূ-ধূ করছে। তারই মাঝে সমুদ্রবেলায় দাঁড়িয়ে আছে এই ক'টি প্যাগোডা।

প্যাগোডাগুলি দেখে আরো মনে হয়, হয়তো এগুলো অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। নয়তো এমন অবস্থায় থাকবে কেন? হয়তো কিংবদন্তীর সেই দানবরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির কাজও পরিত্যক্ত হয়েছিল।

আজ সেই দানবরাজ নেই। নেই তাঁর মহাবলীপুরমের গৌরব। অবশিষ্ট আছে শুধু নাম। হয়তো একদিন এই সমুদ্রসৈকতে মাটি আর পাথরের নীচে থেকে আবিষ্কৃত হবে ইতিহাসের কোন হারানো স্মৃতি।

বসেছিলাম সমুদ্র-সৈকতে একটি পাথরের ওপর। শুনছিলাম হারানো ইতিহাসের কান্না। হঠাৎ চমক ভাঙে সুধীরার ডাকে।—কী ভাবছ?

—কিছু না। বলে উঠে দাঁড়াই।

দৃষ্টিপাত করি দূরে, যেখানে বিরাট পাথরে খোদিত সিংহ, হাতি এবং ষণ্ড মূর্তি দাঁড়িয়ে বলছে,—আমরা এখানে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছি।

এবারে ফিরে চলার পালা। সমুদ্রের জল মাথায় তুলে নিলাম যাবার আগে। পাথরের সিংহমূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম চারদিকে।

শূন্য মনে হল সবকিছু। শুধু কানে এল সমুদ্রের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের শব্দ,—দানব-রাজের দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত।

মহাবলীপুরম থেকে আবার চিংলিপুট। চিংলিপুটে স্টেশনের রিফ্রেসমেণ্ট রুমে মধ্যাহ্নের আহার্য গ্রহণ করলাম।

তারপর আবার বাইরের দিকে ছুটে চলা।

স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে ফিরে আসার কিছুক্ষণ বাদেই জীতেন আর রামসেশান জানালে, আসছে কাল আমাদের জন্যে বার্থ রিজার্ভ করা হয়েছে। সুতরাং সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত।

আজ আর বেশি কথা নয়, গল্প নয়। সকাল থেকে এই সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা চলেছি—এবারে দেহ-মন যেন বিশ্রাম চাইছে।

জীতেন, কেষ্টবাবু আর রামসেশান বিদায় নিলে আমরাও রাতের আহার গ্রহণ করে শয্যা গ্রহণ করি।

এবারের মত প্রবাসে এই শেষ রাত।

৮ই ডিসেম্বর। সকাল থেকেই বসে আছি রিফ্রেসমেণ্ট রুমের বারান্দায়। কোন কাজে মন নেই, বসে থেকে কী করবো, তাই ডায়েরীর পৃষ্ঠাটা কালির আঁচড়ে ভরে রাখছি। ক'দিন কি করেছি, কি দেখেছি, সবটুকু ডায়েরীর পৃষ্ঠায় ধরে রাখার চেষ্টা। সুধীরা আমার পাশেই বসে আছে। মাঝে মাঝে এটা-ওটা কথা দিয়ে সময়ের গতি-চিহ্ন দেওয়া।

বেলা দশটা নাগাদ অরোরার গাড়ী নিয়ে এল জীতেন। সেখানেই দেখা হল কেষ্টবাবু আর রামসেশানের সঙ্গে। কথার মধ্যে একসময় জীতেনকে বললাম, এবারে তোমার পাওনা কি বল?

—কিসের পাওনা?

—সেদিন যে অত কেনাকাটা করলাম, তার দাম তো দিইনি।

—ওসব কথা থাক। জীতেন বললে, আপনার কাছ থেকে জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি। ওটুকুর দাম নিতে বলে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগটুকু হারাতে দেবেন না।

কেষ্টবাবুকেও আড়ালে ডেকে বললাম, জীতেনকে তুমি বুঝিয়ে বল।

কেষ্টবাবুও জীতেনের সঙ্গে কি আলোচনা করে এসে বললে, ও দাম নিতে চায় না। বলে, একসময়ে আপনার কাছ থেকে ও-অনেক উপকার পেয়েছে। শুধু সেই কথা মনে করেই ও আপনাকে একটু কৃতজ্ঞতা জানাবার অবকাশ পেয়েছে।

শেষটা এ-নিয়ে আর কোন কথা বললাম না।

এই প্রসঙ্গে পুরনো কথা মনে পড়লো। দেবুবাবুর সঙ্গে ও ক্যামেরার কাজ করতো। কিন্তু দেবুবাবু ওকে ক্যামেরায় হাত দিতে দিতেন না। একবার ছবি তোলা নিয়ে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। জীতেনকে একবার দেবীবাবু পাঠান মৃতের ছবি তুলতে, কিন্তু ছবি শেষ পর্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে যায়। দেবু যখন ওকে জিজ্ঞাসা করে, এটা কী হল জীতেন? জীতেন বলে, কী করবো, ওটা নড়ে গেছে।

—ওটা নড়ে গেছে মানে। ও তো মরা!

আসলে নড়েছিল জীতেনের ক্যামেরা। তার জন্যেই ছবিটা ঠিকমত হয়নি।

যাই হোক, জীতেনের এই কথা নিয়ে অবোবা স্টুডিও-য রীতিমত হাসাহাসি হত। ওকে দেখলেই সবাই বলতো, মডা নডে উঠেছে—পাগলা জীতেন।

পুবনো কথা মনে হতেই হেসে উঠি।

বেলা একটাব পরে ফ্রি-লান্সেব সাংবাদিক এলেন আমাব ইণ্টারভিউ নিতে। নানা কৌতূহলী প্রশ্ন। উত্তবও দিলাম। তাবপর সাংবাদিক বিদায নিযে গেলেন।

সাবা দুপুব অলসভাবেই কেটে গেল দেখতে দেখতে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। নির্দিষ্ট কামবায গিযে উঠলাম। জীতেন, কেষ্টবাবু, বামসেশান—ওবা এসেছে আমাদের বিদায় জানাতে। জীতেন টিফিন কেবিযাবে কবে আমাদের রাতের খাবারটুকু আনতে ভোলেনি।

বিদায়েব মুহূর্তটি বড় বেদনাদাযক। জীবনেব চল্‌তি পথে এই যে ক'দিনের জন্যে এখানে আসা, ক'দিনেব জন্যে নানাজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা—বিদায়েব মুহূর্তে স্মৃতির-পর্দায় সবকিছু যেন একই সঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয়।

ট্রেন ছাডল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িযে হাত নাডতে আবম্ভ করল কেষ্টবাবু, বামসেশান। আব জীতেন তো একেবাবে পাথবের মত দাঁডিযে বইল। ট্রেন ছাডাব মুহূর্তে দেখেছি তাব দুটি চোখ সজল হয়ে উঠেছে।

ধীবে ধীবে ট্রেন প্ল্যাটফর্মেব বাইবে এল। এই মুহূর্তে মনেব পর্দায ভেসে উঠলো ক'দিনেব স্মৃতি। স্মৃতি নয, যেন চলচ্চিত্র।

কত জনপদ দেখেছি, দেখেছি কত শহব। দেখেছি মন্দিব, দেখেছি দেবালয়। ক'দিন কত মানুষেব সংস্পর্শে এসেছি। এসেছে পরিচিতের মত, আবাব চলে গেছে অপরিচয়ের আডালে।

ক'দিন যে কথা ভাবিনি, আজ সেই কথাই ভাবছি। মনের মধ্যে থেকে খুঁজে বার কবতে চাইছি, পবিচিত দৃশ্যপট, পবিচিত মানুষেব মুখ।

মনে আসছে। কিন্তু কেমন যেন ম্লান হয়ে গেছে। হয়তো এমনি হয়! স্মৃতিও কালের গতির সঙ্গে হারিয়ে যায় বিস্মৃতির আডালে। তারপর ভবিষ্যতে কোনোদিন হয়তো মন চাইবে বিস্মৃতির দুয়ার খুলে অতীতের স্মৃতি-ছবিকে আবিষ্কার করতে।

চমক ভাঙলো সুধীরার কণ্ঠস্বরে।—কী ভাবছ!

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললাম—কিছু না।

সেই মুহূর্তে ট্রেনেব উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে-চলার শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ক্যালকাটা মেল ছুটে চলেছে রাতের অন্ধকারের বুক চিরে।

রাজমহেন্দ্রীতে পৌঁছুতে পুরনো দিনের কথা মনে এল। উনিশ-শ' বিশ

সালে আরো একবার এ-পথে এসেছিলাম। সেবারে রাজমহেন্দ্রীতে নেমেছিলাম রাতের আহারের জন্যে। কিন্তু আহার তখনো শেষ হয়নি, এমন সময় ট্রেন ছাড়ার সময়সংকেত শুনে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম খাবারের টেবিল ছেড়ে। কিন্তু শুনলাম, আমার আহার শেষ না-হওয়া পর্যন্ত ট্রেন অপেক্ষা করবে। উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে নাকি এইরকমই নিয়ম। যাই হোক, আমার আহার শেষ না-হওয়া পর্যন্ত ট্রেন অপেক্ষা করেছিল। এবারেও স্টেশন প্ল্যাটফর্মে নেমে এলাম। কিন্তু পুরনো দিনের কোন চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। তখন ছিল টানা-পাখা, এখন সেখানে বৈদ্যুতিক পাখা। তাছাড়া স্টেশন প্ল্যাটফর্মে রিফ্রেসমেণ্ট রুম, সবকিছুর আমূল পরিবর্তন চোখে পড়লো। সেদিনের রাজমহেন্দ্রী স্টেশনের সঙ্গে আজকের স্টেশনের কোথাও কোন মিল নেই। শুধু নামটার যা পরিবর্তন হয়নি।

রাজমহেন্দ্রীতে ক্ষণবিরতির পালা ফুরলো। আবার গোদাবরীর ব্রীজ—সেই ট্রেনের উর্ধ্বগতির সঙ্গে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে চলা।

ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। সুধীরার চোখেও তন্দ্রা-ঘোর। তবুও দু'চোখে দেখার নেশা। চেয়ে থাকি বাইরের দিকে। মাঝে মাঝে রাতজাগা স্টেশন। নামগুলো পড়তে চেষ্টা করি। কিন্তু নামটা স্পষ্ট করে দেখার মুহূর্তেই তা হারিয়ে যায়।

বহরমপুর স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াল। মাদ্রাজের মাটি পেরিয়ে এসেছি, আমরা চলেছি উড়িষ্যার ওপর দিয়ে।

অবসাদ কাটাতে বহরমপুরেও স্টেশন প্ল্যাটফর্মে নেমে খানিক পায়চারি করেছি। তারপর আবার যথানিয়মে ট্রেনের নির্দিষ্ট কামরায় এসেছি।

চলতি ট্রেনের ছন্দের সঙ্গে বাঁধা মন। নানা চিন্তার জটলা মনের মধ্যে। কখনো ভাবছি, ক'দিনের ভ্রমণের কথা। কখনো ভাবছি—এই তো বেশ ছিলাম ক'দিন। যাযাবরের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। কোন চিন্তা ছিল না, ভাবনা ছিল না, ছিল না দৈনন্দিন জীবনের জের টানা। ভাবছি, আবার ফিরে যেতে হবে পুরনো পরিবেশে। যেখানে আবার সেই অঙ্কের নিয়মের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া। নাটক, অভিনয় —যেটুকু বৈচিত্র্য তারই মধ্যে। এরই মধ্যে শান্তির আশ্রয় আমার সংসারটুকু।

চিন্তায় ছেদ পড়ে একসময় সুধীরার কথায়।—দেখেছো!

ফিরে চাই বাইরের দিকে। জ্যোৎস্না-ধোয়া রাতে চিল্কার প্রচ্ছদপট সামনে রেখে আমরা চলেছি। চিল্কার স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না রাতে কেমন যেন মায়াময় মনে হয় চিল্কার তরঙ্গবিলাস। দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থাকি অনুপমা চিল্কার দিকে। দেখতে দেখতে চিল্কার প্রচ্ছদপট হারিয়ে গেল।

খুরদা রোডে পৌঁছেছি যখন, তখন রাত গভীর। সুধীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমারও দু'চোখে নিদ্রার পদধ্বনি। জানালাটা বন্ধ করে আমিও একান্তে শুয়ে পড়ি। চিন্তার জাল বুনতে বুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, নিজেই জানি না।

খড়্গপুর পৌঁছেছি যখন, তখন দিনের আলো পরিষ্কার হয়ে ফুটেছে। খড়্গপুরেই সকালের চা গ্রহণ করলাম।

খড়্গপুর থেকে হাওড়া। কতটুকু সময়ই বা। বেলা এগারোটায় হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। ট্রেনের কামরা থেকে দেখতে পেলাম অনেক পরিচিত মুখ। বীরেন ভদ্র, জহর গাঙ্গুলী, প্রভাত, বিধু মল্লিক, এ-ছাড়া আরো অনেকেই এসেছে আমাকে স্বাগত জানাতে।

হাওড়া স্টেশন থেকে সরাসরি গোপালনগরের বাড়ীতে। কতোদিন বাড়ীছাড়া —বাড়ীতে পা দিয়েই যেন আর একটা জগত খুঁজে পেলাম। মা-কে প্রণাম জানালাম। কন্যা মীরা আর ভানু ছুটে এল। ওদের-কে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম।

এরই মধ্যে একটা মজার ব্যাপার ঘটলো। বাড়ীর ছোট্ট পোষা কুকুর যার নাম ছিল বিউটি, কোত্থেকে সিঁড়ি দিয়ে তর্‌তর্‌ করে ছুটে এসে, শেষটা একটা লাফ দিয়ে উঠলো আমার বুকের ওপর। বিউটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে তাকে আদর করলাম। বিউটি মানুষের মতো কথা বলতে জানে না, কিন্তু তার অভিব্যক্তিতে মনে হল, সে যেন বলতে চাইছে—এতোদিন কোথায় ছিলে তুমি?

আবার শুরু হল পুরনো নিয়মে দৈনন্দিন জীবনের জের টেনে চলা।

বিকেলে প্রভাত এল গাড়ী নিয়ে। প্রভাতের সঙ্গে প্রথমে গেলাম ধর্মতলায় অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের অফিসে। বন্ধু অনাদি বোসের সঙ্গে কিছু সময় গল্প-গুজব করলাম। সব কথাই ক'দিনের ভ্রমণ প্রসঙ্গে। তারপর অরোরা থেকে বেরিয়ে এলাম রঙমহলে।

রঙমহলে অনেকের সঙ্গে দেখা হলো। শচীনবাবুও এসেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে শচীনবাবু জানালেন, রঙমহল কর্তৃপক্ষ তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করতে ইতস্ততঃ করছে। অথচ আমি জানতাম, রঙমহলে এরপর শচীনবাবুর নাটক অভিনয় হবে।

এবারে আসল ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। অমর ঘোষের কে-এক গুরুভাই নাটক লিখেছেন, নাম 'ঘূর্ণি'—সেইটাই এবারে অভিনীত হবে।

যাই হোক শচীনবাবুকে একটু ক্ষুণ্ণ মনে হল। এ-ক্ষেত্রে আমিও নীরব।

রঙমহলে বসে থাকতে থাকতেই হাবুল এল। অল ইণ্ডিয়া রেডিও-য় রবীন্দ্রনাথের

'চিরকুমার সভা' অভিনীত হবে। সেইজন্যেই ও এসেছে কনট্রাক্ট ফরম্ সঙ্গে নিয়ে। কনট্রাক্ট সই করে দিলাম। হাবুল চলে গেল নমস্কার জানিয়ে।

এরপর নতুন নাটক 'ঘূর্ণি' নিয়ে আলোচনা শুরু হল। আলোচনা চললো, নাটকের বিষয়বস্তুর কথাও শুনলাম। কি জানি, ঠিকমত উৎসাহ পেলাম না। তবুও আমি নীরব, কেননা—আমি বেশ বুঝতে পারছি এ নাটক অভিনীত হবেই।

যাই হোক, সেদিন রাতে আলোচনা শেষে সোজা বাড়ী চলে এলাম।

১১ই ডিসেম্বর। সকাল থেকে একটার পর একটা ফোন আসতে লাগল। থিয়েটারের লোকজন তো আছেই, এছাড়া আরো অনেকেই যোগাযোগ করলে। এরই মধ্যে একসময় নাট্যভারতীর লেসী রঘুনাথের দাদা, রাধানাথ মল্লিক এসে হাজির হলেন। সঙ্গে নাট্যভারতীর প্রম্পটার কালী। মল্লিকমহাশয়ের সঙ্গে কালীই আমায় পরিচয় করিয়ে দিলে। প্রথমে সাধারণ কথার বিনিময়, তারপরেই আসল কথাটা পাড়লেন। ওঁরা চান আমি নাট্যভারতীতে যোগ দিই।

বললাম, সে তো হয় না মল্লিকমশায়! আমি প্রভাতকে বম্বে থেকেই কথা দিয়েছি রঙমহলের জন্যে।

রাধানাথবাবু তবুও বললেন, তবু ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের কথাটা মনে রাখবেন।

নিশ্চয়ই! রাধানাথবাবুকে যেটুকু আশ্বাস দেওয়ার, দিলাম।

একটু নিশ্চিত হবার জো নেই। রাধানাথবাবু বিদায় নেবার পরেই নিউ থিয়েটার্সের প্রোডাক্সান ম্যানেজার অমর মল্লিক এল। এসেই বললে, গতকাল স্টেশনে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কাজ এড়িয়ে কিছুতেই যেতে পারলাম না।

—তাতে কি হয়েছে। বললাম, সময় না পেলে আর কি করবে বলো।

অমর মল্লিকের সঙ্গে বসে খানিক সময় গল্পগুজব করলাম। একঘেয়ে কাজের মধ্যে গল্পের যেটুকু অবসর পাওয়া যায়।

অমর মল্লিক চলে গেল। মনে হল জীতেনকে আমার ছবি পাঠানোর কথা। মাদ্রাজে জীতেনকে কথা দিয়ে এসেছি, কলকাতায় ফিরেই তার ঠিকানায় আমার ছবি পাঠিয়ে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচখানি ছবি জীতেনের ঠিকানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম।

প্রভাত এল। বুঝতে পারলাম, ও এসেছে রঙমহলে যাবার কথা বলতে।

সন্ধ্যায় রঙমহলে এসে পৌছলাম। প্রভাত আর সমর ঘোষ এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওরা এসেছে আমার কন্ট্রাক্টের খসড়া নিয়ে।

বললাম, ওটা আমাকে দেখিয়ে কি করবে। অনাদিবাবুকে দেখিয়ে নিলেই চলবে।

আমার কথামত ওরা ড্রাফটের খসড়া নিয়ে অরোরায় অনাদি বোসের কাছে গেল। তারপর সেখান থেকেই কনট্রাক্ট টাইপ করিয়ে নিয়ে আমার কাছে এল সই করাতে। সই করে দিলাম। সেই সঙ্গে একটি চেকও দিলেন।

এরপব শুরু হল 'ঘূর্ণি'র রিহার্সাল। রিহার্সাল চললো বটে, কিন্তু নাটক যেন কারো পছন্দ হল না। অথচ মুখ ফুটে কেউ কিছু বললেও না।

রিহার্সাল চলছে। বীরেন ভদ্র, বিমল ঘোষ ছাডা আরো অনেকেই এলেন। এলেন না শুধু শচীনবাবু। তাঁর না-আসার অবশ্য একটা কারণ আছে। যাই হোক, শচীনবাবু প্রসঙ্গে আমিও কোন কথা তুললাম না।

সেদিন রাত্রে রিহার্সাল শেষে বাড়ী ফিরছি। ব্ল্যাক-আউটের রাত। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ল্যাম্প পোস্টের বাল্‌বে কালো ঠুসি লাগানো। যেটুকু আলো, তা যেন অন্ধকারকে ব্যঙ্গ করছে। তাছাড়া দোকান-পসারও বন্ধ হয়ে যায় সন্ধ্যের পরই। বাড়ী থেকে আলো আসার পথও বন্ধ।

কোথায় যুদ্ধ চলছে—অথচ যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা চলছে শহর কলকাতায়। কলকাতায় যেন সবকিছুর বাড়াবাড়ি। নযতো বম্বে-মাদ্রাজ তো দেখেছি, কই সেখানে তো ব্ল্যাক-আউটের এমন কড়াকড়ি নেই।

কলকাতা নয়, যেন ভূতুড়ে শহর। ভূতুড়ে শহরের অন্ধকার রাজপথ ধরে এক সময় আমার গাড়ী এসে দাঁড়ালো গোপালনগরের বাড়ীর দরজায়।

পরদিন শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। ভাবলাম, আজ আর দিনের মধ্যে কোন কাজ নয়—বিশ্রাম। দেখা-সাক্ষাৎও বন্ধ করেছি, নিজে টেলিফোনও অ্যাটেণ্ড করিনি বলতে গেলে। সকাল থেকেই নিশ্চিন্ত-বিশ্রামের জন্যে মনটাকে তৈরী করে নিয়েছি।

সারাটা দিন তো নিশ্চিন্ত-বিশ্রামেই কাটলো। কিন্তু এরপর আর বিশ্রামের অবসর কই। সন্ধ্যে ৬টায় রঙমহলের গাড়ী এল।

রঙমহল যাবার পথে অরোরায় এলাম। অনাদি বোস একাই ছিল। তার সঙ্গে খানিক কথাবার্তা বলে এলাম রঙমহলে।

নতুন নাটকের মহড়া চলবে। আর দু'দিন বাদেই নাটক মঞ্চস্থ হবে। অথচ সব যেন এলোমেলো।

সন্ধ্যের পর রিহার্সাল শুরু হবে কোথায়—তা নয়, রিহার্সাল আরম্ভ হতে রাত দশটা বাজলো।

রিহার্সাল চলছে। বেশ বুঝতে পারছি নাটক তেমন জমছে না। সকালের আকাশ দেখেই দিনের আবহাওয়া বোঝা যায়। তেমনি নাটকের রিহার্সালের সূচনা থেকেই বুঝতে পারি, এর ভবিষ্যৎ কি।

রিহার্সাল চলছে। তারই মধ্যে একজন যোগীপুরুষের আবির্ভাব ঘটলো। শুনলাম ইনি সমর ঘোষের গুরু। খানিক সময় বসে থেকে রিহার্সাল শুনলেন। তারপর শোনালেন আশার বাণী। বললেন, ভয় নেই—এ-নাটক জমবে।

মুখে কিছু না বললেও মনে বললাম, যদি দৈবের কৃপা থাকে, তবেই নাটক জমবে। নয়তো নয়। দেখা যাক যোগীপুরুষের কৃপায় কি হয়।

রিহার্সাল শুরু হয়েছিল রাত দশটায়। শেষ হল সকাল সাতটায়।

বাড়ী ফিরেছি। বাড়ী ফিরেও নানা কাজ। গোপালনগরের বাড়ীতে কাজ চলছে। সে-সবও খানিক না দেখলে নয়।

এরই মধ্যে খবর পেলাম, রামসেশান মাদ্রাজ থেকে নটরাজের মূর্তি পাঠিয়েছে শালিমারে। তারই রিসিট হাতে পেলাম। টাকা দিয়ে ওটা আনাতে হবে শালিমার থেকে।

নটরাজের মূর্তিটা আনাবার ব্যবস্থা করলাম। সারারাত কেটেছে নাটক রিহার্সালে। ভেবেছিলাম, দিনে একটু বিশ্রাম নেব। তা-ও হল না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর যা একটু বিশ্রাম নিয়েছি।

শীতের বিকেল, কতটুকু বা সময়। সন্ধ্যেয় আবার রঙমহলে যেতে হবে। আজও সারারাত রিহার্সাল চলবে।

ছ'টার পরে রঙমহলে পৌছেচি। সাতটা থেকে রিহার্সাল আরম্ভ হল।

রাত কেটে গেল। রিহার্সাল শেষ হতে সাড়ে সাতটা বাজবে। এত সময় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সওয়া ছ'ট' বাজতে আমি বেরিয়ে পড়লাম। দু'দিনের রিহার্সালে যেটুকু বুঝেছি, তাতে মনে হল 'ঘূর্ণি' ব্যর্থ হবে।

নাটকের মানুষ, কোন নাটক অভিনয়ের দিক থেকে ব্যর্থ হবে, কথাটা ভাবতে মন চায় না। তবু, এইটাই বাস্তব সত্য।

বাড়ী ফিরেছি। আজ নতুন নাটকের উদ্বোধন হবে, কিন্তু মনের মধ্যে তেমন উৎসাহবোধ করছি না। যাই হোক, আজ দিনটাকে রেখেছি বিশ্রামের জন্যে।

কিন্তু অভিনেতার মানসিক বিশ্রাম কোথায়? বিশ্রামের অবসরেও তো নাটক নিয়ে ভাবনা। বিশেষ করে কোন নাটকের উদ্বোধন রজনীর সঙ্গে যে অভিনেতার অনেক দায়িত্ব বাঁধা।

সকাল থেকে দুপুর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সাড়ে পাঁচটায় রঙমহলে পৌঁছেছি।

নতুন নাটক 'ঘূর্ণি' আজ দর্শকের বিচারশালায় দাঁড়াচ্ছে। বেশ সমারোহ করেই নাটকের উদ্বোধন হল। অগণিত দর্শক, মঞ্চের মায়াবী আলো—তারই মাঝে এক-একটা চরিত্রের মাধ্যমে অভিনেতার আত্মপ্রকাশ।

অভিনয় শুরু হল। যথারীতি শেষও হল। অভিনয়ও করলাম, কিন্তু মন ভরলো না। শিথিল নাটক—না অভিনেতা, না দর্শক কারো মনে দাগ কাটলো না। শুধু শেষের কয়েকটি দৃশ্য ছাড়া। যেটুকু নাটকীয়তা তা শেষের কয়েকটি দৃশ্যে। কিন্তু তা দিয়ে তো দর্শকচিত্ত জয় করা যায় না।

অভিনয় শেষে কথা উঠল প্রভাত মুখুজ্যের 'রত্নদ্বীপ' প্রসঙ্গে। রত্নদ্বীপ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। 'ঘূর্ণি' চলছে চলুক—রত্নদ্বীপেরও প্রস্তুতি চলবে। ভেবেছিলাম, শচীনবাবুর কথা উঠবে। কিন্তু আলোচনার মধ্যে একটিবারও শচীনবাবুর নাটক নিয়ে কথা উঠলো না।

যাই হোক, এই দিনটি আরো একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। কমলা টকিজ-এর 'রাজকুমারের নির্বাসন' ছবিটিও ঐ তারিখে মুক্তি পেল। যেটিতে আমি অভিনয় করেছিলাম, বম্বে যাবার আগেই ঐ ছবিটির কাজ শেষ করে গিয়েছিলাম।

ঐদিনে মিনার্ভা থিয়েটারে 'অর্জুন বিজয়'-এর উদ্বোধন হয়েছিল।

রবিবার এল। সেদিন রঙমহলে দুটি প্রদর্শনী। বিকাল চারটায়, এবং রাত আটটায়। প্রথম প্রদর্শনী যা হোক একরকম হল। দর্শকও কিছু বেশি হয়েছিল, অভিনয়ও নাটক হিসেবে মন্দ হয়নি। কিন্তু শেষ প্রদর্শনীর অবস্থা দেখে হতাশ হতে হল। প্রথম থেকে যে নাটক খুঁড়িয়ে চলে, সে তো দু'দিনের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। খারাপ যে হবে তা আগেই জানতাম, কিন্তু এমন খারাপ হবে একথা ভাবিনি। মনে হল সেই যোগীপুরুষের কথা।—এ নাটক বাজীমাৎ করবে। কিন্তু কোথায় সেই যোগীপুরুষ!

রাতে প্রভাত আর বিধায়ক এল। আলোচনা 'রত্নদ্বীপ' প্রসঙ্গে। আলোচনা-চক্র ভাঙলো রাত দুটোয়। তারপর বাড়ী।

সেদিন ১৬ই ডিসেম্বর। শরীরটা দুর্বল মনে হল।

প্রভাত আর বিধায়ক এল। রত্নদ্বীপের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাল বিধায়ক। ভালই লাগলো। তবু মনে হল কিসের যেন অভাব। গল্প আছে, নাটক আছে, তবু মূল সুরটা যেন খুঁজে পাচ্ছি না।

কথাটা ভেবে দেখতে বললাম।

সারাদিন বাড়ীতেই ছিলাম। সন্ধ্যে ৭-টায় রঙমহলের গাড়ী এল। রঙমহলে সেদিন মোহনবাগান ক্লাব 'মাটির ঘর' অভিনয় করবে। শুনলাম জহর গাঙ্গুলী, সত্যেন গাঙ্গুলী, বিমল ঘোষও আছে অভিনয় তালিকায়।

সে রাতে রত্নদ্বীপের রিহার্সাল হয়েছিল বারোটা পর্যন্ত। তারপর রত্নদ্বীপের পাশ ইস্যু করা হল। এর পরেও কিছু কথাবার্তায় খানিক সময় কাটলো। তারপর রঙমহল থেকে সোজা বাড়ী ফিরে এলাম।

পরদিন সকালেই পেলাম পরিচালক স্বকুমার দাশগুপ্তের ফোন। জানাল সে এখনি গাড়ী পাঠাচ্ছে আমাকে নিতে। ফোনে বেশী কথা হল না।

এর পর গাড়ীতে স্বকুমার আমাকে নিয়ে গেল মিঃ তুলশানের বাড়ী। মিঃ তুলশানের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ। প্রথম আলাপেই এই মাড়োয়ারী বুবককে বেশ সপ্রতিভ মনে হল। মিঃ তুলশান চিত্র-ব্যবসায়ে নেমেছেন। তাঁর কোম্পানীর নাম নিউ টকিজ লিমিটেড। যে ছবি করছেন, তার নামটিও বেশ—'এপার-ওপার'। আমাকে ঐ ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ করলেন। যা কিছু চুক্তি ঐ টেবিলেই হল। কণ্ট্রাক্ট সই করে দিতে একটি চেকও পেলাম।

মিঃ তুলশানের ওখান থেকে বাড়ী এলাম। এসেই অরোরার অনাদি বোসকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম নতুন ছবির কথা।

এরপর রঙমহলে এসেছি। ভূমেন রায়, প্রভাত—ওরা আগে থেকেই এসেছিল। ওদেরকে বললাম, স্টুডিয়োয় যাচ্ছি শ্যুটিং করতে।

'এবার-ওপার' ছবির শ্যুটিং হল ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত।

১৮ই ডিসেম্বর সকাল থেকে বাড়ীর কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। গোপালনগরের বাড়ীটি শেষ হবার মুখে। নিজে খানিকটা দেখাশুনো না করলে চলে না। বিশেষ করে বাড়ীটি শেষ হবার মুখে।

সারাদিনটা বাড়ীতেই ছিলাম। বিকেল পাঁচটায় নিউ টকিজের গাড়ী এল।

গাড়িতে সত্য মুখুজ্যেও ছিল। সে-আমলের নামকরা কমেডিয়ান সত্য মুখুজ্যে।

রাত নটায় নিউ টকিজের অফিস থেকে ফোন করলাম রঙমহলে। জানালাম, আমি যাব 'রত্নদ্বীপ' রিহার্সালে।

কিন্তু যাব বলেও যেতে পারলাম না। পরে আবার জানিয়ে দিলাম, আমার যাওয়া হবে না। মাড়ি ফুলেছে। যন্ত্রণা হচ্ছে। সুতরাং আমাকে বাদ দিয়ে যেন আজ তারা কাজ চালিয়ে যায়।

সুতরাং রঙমহল নয়, নিউ টকিজের কাজ সেরে সোজা বাড়ী চলে এলাম।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও-য় রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'-র অভিনয় হল ২০শে ডিসেম্বর। ২১ তারিখে আবার 'ঘূর্ণি'র অভিনয় হল। কিন্তু নাটক জমবার কোন লক্ষণই দেখলাম না।

'ঘূর্ণি' অভিনয় শেষে 'রত্নদ্বীপ'-এর রিহার্সাল চলতো। ২৪শে ডিসেম্বর রত্নদ্বীপের উদ্বোধন রজনী। কিন্তু ২৩ তারিখের রিহার্সালেও নাটক তেমন দানা বাঁধল না। ভাবলাম, নাটক যদি জমে, তবে তা গল্পের জন্যে। গল্পটা জোরালো। কাহিনীর একটা নিজস্ব আবেদন আছে।

রত্নদ্বীপের উদ্বোধন রজনী ২০শে ডিসেম্বর। দিনটি ছিল 'বড়দিন'-এর পূর্বাহ্ন।

তখনকার দিনে বড়দিনটা উদ্‌যাপিত হত বিশেষ সমারোহে। রঙ্গমঞ্চগুলো ঐ দিনে নানাভাবে সাজানো হতো। রঙ্গমঞ্চ সাজানো হতো দেবদারু পাতা, আর নানা জাতের গাঁদাফুল দিয়ে। নানা রঙের আলো দেওয়া হত। তখন তো এখনকার মত রঙিন বালব পাওয়া যেত না। সাধারণ বাল্‌বগুলোকে রঙিন করা হত ল্যাকারে ডুবিয়ে।

যাই হোক, রঙমহল বড়দিনে নতুন নাটক 'রত্নদ্বীপ' উপহার দেবে দর্শকসাধারণকে। রঙমহলে সেদিন মহোৎসব। দেবদারু পাতা আর অজস্র ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে রঙমহলের সম্মুখভাগ। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় নাটকের উদ্বোধন মুহূর্ত।

যথারীতি উদ্বোধন হল। ভূমিকালিপিতে ছিলেন স্বর্গত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, —এ ছাড়া আরো অনেকে। সোনার হরিণ চরিত্রটি দেওয়া হয়েছিল আমাকে। অভিনয় শেষে মনে হল, অভিনেত্রীরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করেননি। নাটকে স্ত্রী-চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বেশি, অথচ অভিনয়ে সেদিকটাই দুর্বল।

এই নাটকেই একটি নতুন ছেলেকে দেখলাম, যে গ্রাম্য ভদ্রলোকের ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছে—ছেলেটি নতুন হলেও তার মধ্যে শক্তির সন্ধান পেলাম। ছেলেটির নাম শম্ভু মিত্র। শুনলাম, একে এনেছেন মনোরঞ্জনবাবু।

তখনকার দিনে মঞ্চের শিক্ষানবীশ ছেলেদের জন্যে চারতলার সাজঘর নির্দিষ্ট ছিল; সেখানে তারা বসতো। এইসব ছেলেরা যে ধরনের আড্ডা দিত, আড্ডায় যে ধরনের অশ্লীল আলোচনা করতো, তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। শম্ভু মিত্রের জন্যও চারতলার সাজঘর নির্দিষ্ট। সে কিন্তু ওই আড্ডার সামিল হতে পারলো না। সে জানালো, চারতলার সাজঘরে তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। কর্তৃপক্ষ যেন অন্য

ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। একা শম্ভুর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করতে গেলেই কথা উঠবে।

আমি বললাম, শম্ভুর কথাটা শুনলে ভালো করতে। ছেলেটা উন্নতি করবে।

প্রভাত কিন্তু শম্ভুর জন্যে আলাদা বসবার জায়গার ব্যবস্থা করতে পারল না।

শম্ভু রঙমহল ছেড়ে চলে গেল।

কিন্তু সেদিন আমি চিনতে ভুল করিনি শম্ভু মিত্রকে।

২৪শে ডিসেম্বর রঙমহলে মঞ্চস্থ হল 'রত্নদ্বীপ'। নাট্যভারতীতে উদ্বোধন হল যোগেশ চৌধুরীর 'পরিণীতা'। আর স্টারে মহেন্দ্র গুপ্তের পৌরাণিক নাটক 'উষা-হরণ'-এর উদ্বোধন রজনী ঐদিনই।

যাই হোক, রত্নদ্বীপের উদ্বোধন রজনীর অভিনয় শেষে বাড়ী ফিরছি। এসপ্লানেডের কাছে এসে দেখলাম, অজস্র নর-নারীর ভিড়।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে সাহেবপাড়ার রোশনাই দেখতে বেরিয়েছে সবাই।

ব্ল্যাক-আউটের শহর কলকাতা। অন্যবারের মত এবারে সে আলোর রোশনাই নেই। এবারের বড়দিন অন্ধকারে।

বড়দিনের মরশুম। ক'দিন প্রতিটি মঞ্চেই দুটি করে প্রদর্শনী। রঙমহলেও দু'টি করে প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। 'ঘূর্ণি' আর 'রত্নদ্বীপ' দু'টি নাটকই চলবে।

এরই মধ্যে ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে নাট্যভারতীতে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'পি-ডবল্যু-ডি' নাটকের জুবিলী উৎসব হবে। ভূমিকালিপিতে আছেন দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু, রতীন, জহর গাঙ্গুলী, রাণীবালা, সুহাসিনী ছাড়াও আরো অনেকে। ২৫ তারিখে রঘুনাথ মল্লিক এসেছিল জুবিলী উৎসবে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে। অনেক করে বললে। যদিও সে জানে আমার অভিনয় আছে রঙমহলে—তবু সম্পর্ক বজায় রাখতে সৌজন্যের খাতিরে ও বলে গেল।

২৫ তারিখের আরো একটি সংবাদ—বড়দিনের উপহার। রঙমহল থেকে অমর ঘোষ ভেট পাঠিয়েছে। শীতের শব্জী, ফলমূল, বড় দুটি ভেটকী মাছ, তাছাড়া দু' বোতল দামী হুইস্কি।

বড়দিনে ভেট পাঠানোটা তখনকার দিনের একটা রেওয়াজ ছিল। এটা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রত্যক্ষ দান। এই বড়দিনের উপহারটা, নিছক প্রীতির উপহার হিসাবেই চালু হয়েছিল; কালে দেখা যায়, এর মধ্যেও এক ধরনের প্রবণতা। বড়দিনের উপহারের নামে অনেক সময় ব্যবসায়িক বুদ্ধির মানুষ তার কাজ হাঁসিলের পথ খুঁজে

নিত। মেমসাহেবকে উপহারের নামে যদি জড়োয়া পাঠালে সাহেবের মন ভেজে—তা মন্দ কি—স্বার্থ-সম্পর্কটা এইরকমই।

বড়দিনের দিনগুলো কাটল নানা বৈচিত্র্যে। এর মধ্যে ১৯৪৫-এর শেষ দিনটিও শেষ হল। জীবনের পৃষ্ঠা থেকে হারিয়ে গেল একটি বছর।

সময় তো কোথাও একটি মুহূর্তের জন্যেও স্থির নয়। কিন্তু জীবন? সময়ের সঙ্গে জীবনের পরিক্রমা-পথটা নিবিড় বন্ধনে বাঁধা। সময়ের সঙ্গে জীবনও এগিয়ে চলে। এই এগিয়ে চলার মধ্যে কোথাও কোন যতি চিহ্ন নেই, ছেদ নেই।

ডিসেম্বরের শেষ দিন। রঙমহল থেকে ফিরেছি ঘরে। আশ্রয় নিয়েছি শয্যায়। কিন্তু যত ক্লান্তি থাক, অবসাদ থাক, ঘুম নেই চোখে। ভাবছি ১৯৪০-এর ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা। আমার জীবনের মুখর অধ্যায় এই ফেলে-আসা বছরটি। নানা ঘটনার ঐশ্বর্যে ভরা—এমন বছর আমার জীবনে আর আসেনি।

মনে এল মন্মথ রায়ের চিঠির কথা: সে-ই আমাকে লিখেছিল, মধু বোসের নির্মীয়মান ছবি রাজনটীতে অভিনয়ের জন্য বোম্বে যেতে। প্রথমটা অনেক ইতস্তত করেছিলাম। কি জানি—বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে হবে, একথাটা আমি কোন সময়েই ভাবতে পারতাম না। তবু কি জানি কেন, মন্মথর চিঠি আমাকে নতুন করে ভাবিয়ে তুললো।

আমার সেন্টিমেণ্ট বুঝে মন্মথ তার চিঠি লিখেছে। লিখেছে, রূপসীনগরী বম্বের নানা আকর্ষণের কথা। সমুদ্রের বেলাভূমি, অজন্তা-ইলোরার শিল্পৈশ্বর্য, তারপর বম্বে থেকে দক্ষিণ-ভারতের রমণীয় তীর্থের কথা। শুধু আমাকে নয়, মন্মথ এই সঙ্গে সুধীরাকেও লিখেছে যাবার জন্যে। ও জানে—সুধীরা ভক্তিমতী নারী, তীর্থের ওপর তার সহজাত আকর্ষণ আছে; সুতরাং বম্বে যাবার তাগিদটা সেখান থেকেও আসুক। হলও তাই—মন্মথর চিঠি পেয়ে সুধীরাও বলতে লাগল, চল—বম্বে যাই। ওখান থেকে ফেরবার পথে দক্ষিণ-ভারতের তীর্থদর্শন করে ফিরবো।

সুতরাং আর কি!

আগস্টের মাঝামাঝি কলকাতা থেকে বম্বের পথে পাড়ি জমালাম। মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালী আমি, ভালবাসি বাংলাদেশ, বাংলার সমাজ, বাংলার পরিবেশ—কিন্তু কি এক আকর্ষণে আমিও কলকাতা ছেড়ে বম্বের পথে পাড়ি দেব ঠিক করলাম।

তারপরের দিনগুলোর কথা তো আগেই বলেছি। ক'মাস ধরে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। কাজের মধ্যেও সময় করে নিয়েছি ঘুরে বেড়াবার জন্যে।

দেখেছি বম্বের সমুদ্রতীর। ছেলেমানুষের মত সাগরবেলার ঝিনুক কুড়িয়েছি।

গিয়েছি অজন্তা-ইলোরায়, দেখেছি প্রাচীন ভারতের শিল্প-ঐশ্বর্য। ঘুরেছি দক্ষিণ-ভারতের পথে-প্রান্তরে, জনপদে, মন্দিরে—জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করেছি, অজস্রের ভিড়ে নতুন করে মূল্যায়ন করেছি জীবনের। জীবন-পাত্র পূর্ণ করেছি পথের ঐশ্বর্যে।

স্মৃতিচারণ করছি। বৎসরটি এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এখনো ঘোষিত হয়নি ১৯৪০-এর অন্তিম মুহূর্ত।

রাত বারোটা বাজার সময়-সংকেত ঘোষিত হল। সেই মুহূর্তে সাইরেন বেজে উঠলো বিলম্বিত সুরে। বর্ষ-বিদায়ের সুর—যতই করুণ হোক, তবু তার মধ্যে রয়েছে অনাগত বৎসরের সূচনা।

বর্ষ-বিদায়ের সুর হারিয়ে গেল। ডিসেম্বরের রাত পেরিয়ে নববর্ষের প্রথম সূর্য উঠবে।

উনিশ শ' চল্লিশ। একটি বিষণ্ণ বৎসর। পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধের বিভীষিকা। ত্রাসের কালোছায়া ভারতের আকাশে। একদিকে পরাধীনতার কঠিন নিগড়, অন্যদিকে শিকল-ভাঙার স্বপ্ন। এই দুর্যোগের মধ্যেও বর্ষ-বিদায়ের মুহূর্তে নববর্ষের উৎসবের সমারোহ। বিসর্জনের পালা শেষ হতে শুরু হল বর্ষ-আহ্বান।

স্বাগত নববর্ষ। উনিশ শ' একচল্লিশ সাল।

নববর্ষের প্রথম সূর্য উঠল। সেই সঙ্গে উদ্বোধন হল একটি দিনের। একটি নতুন বৎসরের।

কিন্তু বৎসরের প্রথম দিনটির জন্যে এমন একটা দুঃসংবাদ অপেক্ষা করবে এ তো স্বপ্নেও ভাবিনি।

বেলা সাড়ে ন'টায় মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনতে পেলাম। আমার একান্ত কাছের মানুষ, কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার, রায়বাহাদুর প্রভাত মুখার্জি মারা গেছেন। শুনলাম, প্রতিবারের মত এবারেও নববর্ষ উপলক্ষে কলকাতা পুলিশের প্যারেডে যোগদান উপলক্ষে ময়দানে যাচ্ছিলেন প্রভাতবাবু। কিন্তু অভিবাদন নেওয়া আর হল না; কলকাতা পুলিশের নববর্ষের প্যারেড বন্ধ হল। তাদের বিউগিলে বাজল প্রভাত মুখার্জির মৃত্যুতে শেষ বিদায়ের সুর।

প্রভাতের মৃত্যুতে মর্মাহত হলাম।

তবু তো দিন বসে থাকবে না। রঙমহলে আজো 'রত্নদ্বীপ'-এর দু'টি প্রদর্শনী। 'ঘূর্ণি' বন্ধ।

দুপুরের পর যথারীতি রঙমহলের গাড়ী এল। গেলাম রঙমহলে। মেক-আপ

নিলাম। আজ কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছি। প্রভাতবাবুর কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

কিন্তু রঙ্গমঞ্চে কী যে যাদু আছে! পাদ-প্রদীপের আলোয় যখন এসে দাঁড়ালাম, তখন ভুলে গেলাম আমার পরিচয়। আমি আর তখন অহীন্দ্র চৌধুরী নই, রত্নদ্বীপের 'সোনার হরিণ'।

এরপর থেকে রঙমহলে নিয়মিত 'রত্নদ্বীপ' অভিনীত হতে লাগলো। 'ঘূর্ণি' বন্ধ হয়ে গেছে। কখনো-সখনো এক-আধটা অভিনয় হত বৈ তো নয়।

নববর্ষ উপলক্ষে অমর ঘোষ ডিনার পার্টির আয়োজন করেছে ক্যালকাটা হোটেলে। জমিদারের ছেলে, সব তাতেই ওর এলাহী কাণ্ডকারখানা।

অমর ঘোষের ডিনার পার্টিতে সেদিন আমরা অনেকেই উপস্থিত ছিলাম।

পার্টি থেকে বাড়ী ফিরতে সেদিন বেশ রাত হয়েছিল।

৪ঠা জানুয়ারী উত্তর কলকাতার শ্রী-তে মুক্তিলাভ করলো মতিমহল পিক্‌চার্সের ভক্তিমূলক চিত্র 'নিমাই সন্ন্যাস'।

জানুয়ারীর ৮ তারিখে 'ঘূর্ণি'র একটি প্রদর্শনী হল। ১০ই জানুয়ারী রঙমহলে 'কেদার রায়' অভিনীত হল। সে-রাতের ভূমিকালিপি ছিল আকর্ষণীয়। নাম-ভূমিকায় ছিলাম আমি, মনোরঞ্জনবাবু ছিলেন শ্রীমন্তের ভূমিকায়। এছাড়া শিল্পী-তালিকায় ছিলেন ভূমেন রায়, রবি, শান্তি, উষাবতী, উষারানী।

এর আগেও বলেছি, আমার স্ত্রী সুধীরার সহজাত আকর্ষণ ছিল তীর্থের ওপর। ১১ই জানুয়ারী প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সুধীরা গঙ্গাসাগর যাত্রা করলো। সঙ্গে ছিলেন আমার শ্বশ্রূমাতা ছাড়া শ্বশুরবাড়ীর আরো অনেকেই।

কী জানি কেন, কোথাও গেলে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হত।

তাছাড়া তখন গঙ্গাসাগরে তো এখনকার মতো সুযোগ-সুবিধে ছিল না, নানা অসুবিধের মধ্যে যাত্রীরা সেখানে যেত। সুধীরা চলে যেতে মনটা কেমন যেন শূন্য হয়ে গেল।

১৪ই জানুয়ারী বাঙালী পল্টনের সাহায্যার্থে রঙমহলে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান এবং 'ঘূর্ণি' অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন শীলা হালদার, বিদ্যুৎ বোস, কুসুম গোস্বামী। 'ঘূর্ণি'-র ভূমিকালিপিতে কোন পরিবর্তন হয়নি।

তখনকার দিনে একটা রেওয়াজ ছিল বেনিফিট নাইটের। বিভিন্ন শিল্পীদের জন্যে এটা হত। ২০শে জানুয়ারী স্টার থিয়েটারে রঞ্জিৎ রায়ের জন্যে একটি বেনিফিট

নাইট দেওয়া হয়েছিল। সেদিন স্টারের চলতি নাটক 'উষাহরণ'-এর সঙ্গে 'কর্ণার্জুন' অভিনয়েরও আয়োজন হয়েছিল। বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সঙ্গীতে কে কে অংশ নিয়েছিলেন মনে নেই, উষাহরণের স্টারের শিল্পীগোষ্ঠীই ছিল, আর কর্ণার্জুনে আমিই অবতীর্ণ হয়েছিলাম কর্ণের ভূমিকায়।

তারিখটা ছিল ২১শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার। রঙমহলের শিল্পীগোষ্ঠী চললো আসানসোল সফরে। সেখানে নিউ এম্পায়ার টকিজ-এ ক'দিনের জন্যে নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। রঙমহলের অন্যান্য শিল্পীরা গেলেন ট্রেনে। কিন্তু আমি গেলাম ভূমেনের গাড়ীতে।

প্রথম রাতে অভিনীত হল 'রত্নদীপ'। অভিনয় শুরু হল রাত ন'টায়। প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের জায়গা ছিল না।

প্রথম রাতে আমরা দর্শক-সাধারণের অভিনন্দন পেলাম।

দ্বিতীয় রজনীতে অভিনীত হল 'কেদার রায়'। নাম-ভূমিকার শিল্পী আমি।

পরদিন ২৩শে জানুয়ারী রাত আটটায় মঞ্চস্থ হল 'মাটির ঘর'। কল্যাণের ভূমিকায় ছিলাম আমি।

'চরিত্রহীন' দিয়েই নাট্যোৎসবের শেষ রজনী। চরিত্রহীনের শিবপ্রসাদের চরিত্রটি ছিল আমার।

আসানসোলে থাকতে প্রত্যেকদিন রাতে অভিনয়-শেষে ভূমেনের গাড়ী নিয়ে আমরা বেড়াতে বেরোতাম। ভূমেনের এক বন্ধু বঙ্কিম—সে-ও আমাদের সঙ্গে থাকত। সে-ই আমাদের গাইড ছিল।

কোনদিন রাতে যেতাম বরাকরের দিকে ; কোনদিন দামোদরের পথে।

শীতের কুয়াশা জড়ানো রাতে—মন্দ লাগত না গাড়ী ছুটিয়ে বেড়াতে। যত সময় না ক্লান্তি আসতো, তত সময় বেড়িয়ে বেড়াতাম। তারপর ফিরে আসতাম আসানসোলের ডাকবাংলোয়।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতাম, ডাকবাংলোর প্রাঙ্গণে যুবক-ছাত্রেরা ভিড় করে আছে। তারা অটোগ্রাফ-শিকারী। শুধু তাই নয়—দিনের আলোয় তারা দেখতে চায় অভিনেতাকে।

কী জানি কেন, আমি কোনদিনই এসব পছন্দ করতাম না। অভিনেতা হিসাবে অজস্র দর্শকের সামনে মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় দাঁড়াতে আনন্দ পাই, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের বাইরে অভিনেতা হিসাবে দাঁড়াতে যেন মন সায় দিত না। তবু যারা

আসতো, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের খাতায় অটোগ্রাফ দিতাম। দু'চার কথা বলতেও হ'ত অনেক সময়।

যাই হোক ২৪শে জানুয়ারী 'চরিত্রহীন' অভিনয় শেষেই আমরা কলকাতায় পাড়ি জমাবো ঠিক করলাম।

আসানসোল থেকে রওনা হলাম রাত সাড়ে তিনটেয়।

টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। গাড়ির গতি ছিল মন্থর। একে জানুয়ারীর শীত, তার ওপর বৃষ্টি। এরপর অভিনয়ের ক্লান্তি তো আছেই। পানাগড়ে এসেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো মেমারিতে পৌঁছে। রাত ভোর হয়েছে। বৃষ্টিও থেমে গেছে। কন্‌কনে হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে।

মেমারি থেকে ভদ্রেশ্বর। একটানা ছুটে এসেছে আমাদের গাড়ী। কিন্তু ভদ্রেশ্বরে পৌঁছেই হ'ল বিপদ। গাড়ীর টায়ার ফাটল।

ওই অবস্থাতেই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে চলল ড্রাইভার। তবে মন্থরগতিতে, সাবধানে।

ভদ্রেশ্বর থেকে কলকাতা। রঙমহলে যখন পৌঁছেচি তখন বেলা সাড়ে ন'টা।

রঙমহলে ভূমেনের গাড়ী ছেড়ে দিলাম। ওখানে আর অপেক্ষা করলাম না। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়ী চলে এলাম। এসেই দেখা পেলাম সুধীরার। সে যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিল।

এবারে যেন বাইরে ছোটার পালা। শনিবার আর রবিবার রত্নদ্বীপের অভিনয় হল রঙমহলে। সোমবারে আবার বাইরে ছোটার পালা।

এবারে যেতে হবে ধানবাদ। সেখানে একজিবিশন উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রথম রজনীতে অভিনীত হল 'রত্নদ্বীপ'। দ্বিতীয় রজনীতে 'ঘূর্ণি' আর 'মালারাগ'। তারপরের রজনীতে দু'টি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটায় 'রত্নদ্বীপ', রাত ন'টায় 'মাটির ঘর'। পরদিন শুক্রবার। শেষ রজনী। দু'টি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমে 'ঘূর্ণি', তারপর 'মাকড়সার জাল'।

তারপর অভিনয় শেষে ধানবাদ থেকে কলকাতায় রওনা হবার পালা।

কলকাতায় ফিরেছি।

১লা ফেব্রুয়ারী ছিল সরস্বতী পূজা। রঙমহলে 'রত্নদ্বীপ'-এর পঁচিশতম রজনী ঐ দিন।

সকলেরই আশা ছিল, এই রজনীর অভিনয় সার্থক হবে। কিন্তু আশা পূর্ণ হল না। সুতরাং মনটা খারাপ হওয়া স্বাভাবিক।

এরপরও 'রত্নদ্বীপ' চলছিল, তবে কোনমতে।

২রা ফেব্রুয়ারীও 'রত্নদ্বীপ' অভিনীত হল।

৩রা ফেব্রুয়ারী স্টারে মিস লাইটের বেনিফিট নাটক উপলক্ষে অনুরূপা দেবীর 'মা', আর মহেন্দ্র গুপ্তের 'উষাহরণ' অভিনীত হল। শিল্পী তালিকায় সেদিন ছিলেন নির্মলেন্দু, মনোরঞ্জন, রবীন, সন্তোষ, প্রভাত, জয়নারায়ণ, রবি রায় আর আমি। আসেননি শুধু নরেশ মিত্র। অভিনেত্রীদের মধ্যে নাম মনে পড়ছে নীহারবালা, নিভা, পদ্মা, আর উষার।

নাট্যভারতীতে 'তটিনীর বিচার' অভিনীত হল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যে ৭টায়। আমিও ছিলাম ঐ নাটকে।

৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যে ৭টায় রঙমহলে 'ঘূর্ণি' অভিনীত হল। ওয়াদিয়া পিকচার্সের হিন্দী ছবি 'রাজনর্তকী', যে ছবিতে আমি আচার্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছি, ৮ই ফেব্রুয়ারী মুক্তিলাভ করলো বোম্বাই-তে।

সরযূবালা নাট্যভারতীতে যোগদান করার পর প্রথম 'সাজাহান' নাটকে জাহানারার ভূমিকায় অভিনয় করলেন ১১ই ফেব্রুয়ারী। পিয়ারা চরিত্রে ছিলেন রাণীবালা, ঔরংজীব ছিল নির্মলেন্দু, আর আমি ছিলাম নাটকের নামভূমিকায়।

রঙমহলে 'চরিত্রহীন' অভিনীত হল ১৩ই ফেব্রুয়ারী। পদ্ম আর উষা রঙমহল ছেড়ে দিয়েছে। এসেছে লাবণ্য আর-এক উষা। খেয়ালিপনার জন্যে যাকে অনেকে বলতো 'পাগলী উষা'।

১৫ই ফেব্রুয়ারী রত্নদ্বীপের একত্রিশতম রজনী। ঐ তারিখেই রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে 'কবি জয়দেব'। এর আগেও নির্বাক-যুগে একবার জয়দেবের জীবনী চিত্রায়িত হয়েছিল।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে' রঙমহলে অভিনীত হল ২০শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যা ৭টায়। আমি অবতীর্ণ হয়েছিলাম দুঃখহরণের চরিত্রে। সে রাতে রঙ্গালয় ছিল পূর্ণ। নাটকটা জমেছিল ভালই। দুঃখহরণ চরিত্রটি দর্শকসাধারণের ভালই লেগেছিল। সেদিন পেয়েছিলাম দর্শকের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন আর হাততালি—অভিনেতার কাছে যা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

আমি এখন শনি আর রবিবার রঙমহলের শিল্পী। নয়তো অন্যান্য মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করে চলেছি।

২১শে ফেব্রুয়ারী নাট্যনিকেতনে অভিনীত হল ছ'টি নাটক। 'কেদার রায়' আর 'সিরাজদ্দৌল্লা'। সিরাজদ্দৌলায় আমি অভিনয় করিনি।

২২শে এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী 'রত্নদ্বীপ-র চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশতম অভিনয়-রজনী।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ছিল শিবরাত্রি। শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রতিটি মঞ্চেই সারারাত ধরে বিভিন্ন নাটকের অভিনয় চলতো। রঙমহলে অভিনীত হয়েছিল 'শিবরাত্রি', 'মাটির ঘর', 'কেদার রায়' আর 'স্থদামা'।

আমি ছিলাম 'মাটির ঘর' আর 'কেদার রায়'-এর শিল্পী।

২৬শে ফেব্রুয়ারী রঙমহলে অভিনীত হল 'ঘূর্ণি'। পরদিন ২৭শে ফেব্রুয়ারীর নাটক ছিল 'বিশ বছর আগে'।

২৮শে ফেব্রুয়ারী নাট্যনিকেতনে দুটি নাটকের অভিনয় হল। 'কেদার রায়' আর 'সাজাহান'। কেদার রায়ে আমার সঙ্গে ছিলেন নরেশ মিত্র, ভূমেন রায় আর রবি রায়; সাজাহানে ছিল জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, ভূমেন, স্থশীলা (বড)। আর আমাকে যথারীতি নামভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

নাট্যনিকেতনে সে রাতে অভিনীত দু'টি নাটকের নামভূমিকায় শিল্পী ছিলাম আমি।

সে রাতে অভিনয় শেষ হয়েছিল রাত তিনটে পঁয়তাল্লিশে।

অভিনয় শেষে বাড়ী ফিরে এলাম যখন, তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে।

বাড়ীতে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়ালে মনে হত আমি ইতিহাসের কেদার রায়, কিংবা ভারতসম্রাট সাজাহান নই—আমি অহীন্দ্র চৌধুরী নামে চিহ্নিত একজন মানুষ।

ঘরে ঢুকেই ক্যালেণ্ডারের একটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেললাম। ফেব্রুয়ারী মাসটা হারিয়ে গেল।

কে জানত মার্চ মাসটা এমন বৈচিত্র্যহীন হয়ে দেখা দেবে। নতুনত্ব কিছু নেই। একঘেয়ে সেই পুরনো নাটকের অভিনয়। আজ 'রত্নদ্বীপ', কাল 'সাজাহান', তার পরদিন হয়ত 'চাঁদ-সদাগর'। একই নাটকে, একই চরিত্রে যন্ত্রের মত অভিনয় করে চলা।

যেটুকু বৈচিত্র্য তা শুধু পরিবেশে। আমার ছেলে ভানু, প্রীতিন্দ্র চৌধুরী যার ভাল নাম, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলে। ১০ই মার্চ ওদের পরীক্ষা আরম্ভ হল। ছেলে পরীক্ষা দেবে, এই নিয়ে মনের মধ্যে খুশির আমেজ। স্থধীরার তো ভাবনাচিন্তার অন্ত

নেই। তাছাড়া সংসারের ভাল-মন্দের চিন্তাটা তো সুধীরারই। কাজের তাগিদে আমার কতটুকু সময় সংসার দেখার। তবুও দেখতাম।

যাই হোক, মার্চ মাসটা একেবারে বৈচিত্র্যহীন। প্রভাত আর অমর ঘোষের ম্যানেজমেণ্টে রঙমহলের শেষ অভিনয় হল ২৩শে মার্চ। ঐদিনই 'রত্নদ্বীপ'-এর জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হল। যদিও কলকাতায় রত্নদ্বীপের ৩৮টি অভিনয় হয়েছে, সে-হিসেবে জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু মফঃস্বলে রত্নদ্বীপের আরো তিনটি অভিনয় হয়েছে—কলকাতার অভিনয়ের সঙ্গে সেই দিনটি যোগ করে নিয়ে তবেই এই জয়ন্তী উৎসব।

রঙমহলে রত্নদ্বীপের জয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস।

মার্চের আর একটা ঘটনার কথা মনে আছে। রঙমহল কর্তৃপক্ষ তার চুক্তিবদ্ধ শিল্পীদের নোটিশ দিল। নোটিশের মর্মার্থ, রঙমহল আপাততঃ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে ঐ নোটিশ আমাকে দেয়নি। কারণ, আমার চুক্তি তো আগে থেকে বাতিল হয়ে গেছে। কেননা, আমি তো আর শুধু রঙমহলের শিল্পী নই। আমার দাবিটুকু তারা এককভাবে মেটাতে অসমর্থ। সুতরাং আমাকে অন্যত্রও অভিনয় করতে হয়েছে।

নাট্যভারতীতে 'পি-ডবল্যু-ডি'-র শততম রজনীর অনুষ্ঠানে আমি আমন্ত্রিত হলাম। সে আমন্ত্রণ রক্ষাও করলাম।

ঐ অনুষ্ঠানেই নাট্যভারতীর কর্তৃপক্ষ আমাকে জানালেন, তাঁদের 'পি-ডবল্যু-ডি' নাটকের রায়বাহাদুর চরিত্রটি অভিনয় করার কথা। নাটকের ছোট চরিত্র এটি। একটি দৃশ্যেই চরিত্রটির অবতারণা।

রায়বাহাদুর চরিত্রটি অভিনয় করতেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। শুনলাম দুটি প্রদর্শনী হলে এই একটি দৃশ্যের অভিনয় শেষে নির্মলেন্দুবাবুকে গাড়ী করে বাড়ী পাঠাতে হত। বাড়ীতে পূজা-আহ্নিক সেরে নাট্যভারতীর গাড়ীতেই আবার তিনি থিয়েটারে আসতেন। এজন্যে কর্তৃপক্ষের অসুবিধে হত যথেষ্ট।

যাই হোক নাট্যভারতীর অনুরোধ আমি উপেক্ষা করলাম না। 'পি-ডবল্যু-ডি'-র রায়বাহাদুর চরিত্রের অভিনয়ে সম্মতি দিলাম।

৩১শে মার্চ শান্ত ব্যানার্জীর দল লক্ষ্ণৌ যাবে অভিনয়ের জন্যে। আমারও ওই দলের সঙ্গে যাবার জন্যে ডাক এলো।

এই প্রসঙ্গে শান্ত ব্যানার্জীর কথা কিছু বলা দরকার। সে আমলে শান্ত ব্যানার্জী নাটকের জন্যে প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন। এক হিসেবে এটা ছিল অপব্যয়। ব্যবসার

ভিত্তিতে নাটক-অভিনয়ের কথা চিন্তা করেও সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং চিন্তার অভাবে আর্থিক লোকসানের দিকটাই বড় হয়ে উঠেছিল।

যাক সে কথা, শান্ত ব্যানার্জীর দলের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ রওনা হলাম ৩১শে মার্চ, হাওড়া স্টেশন থেকে সকাল ১০-৫৮ মিনিটের ট্রেনে।

১লা এপ্রিল বেলা ৯টায় লক্ষ্ণৌ স্টেশনে পৌঁছলাম। উঠলাম গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে। শুধু গালভরা নাম। নয়তো হোটেলটি তৃতীয় শ্রেণীর।

সারাদিন হোটেলের নির্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যায় ট্যাক্সি করে গেলাম বেঙ্গলী ক্লাবে। দেখা হল দ্বিজেন সান্যালের সঙ্গে। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি পাহাড়ী সান্যালের দাদা।

সে রাত্রে অভিনয় হবে 'সাজাহান'। প্রথম রাত্রির অভিনয়, দর্শকরা আগ্রহ নিয়েই বসেছিল। কিন্তু 'সাজাহান' তাদের হতাশ করলো। এমন বাজে অভিনয় হবে, এ আমি ভাবতেও পারিনি। আমাকেও দুর্নামের অংশ নিতে হল।

২রা এপ্রিল স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রভাতী সংখ্যায় সাহাজান অভিনয়ের বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হল। সাজাহানের রাজকীয় পোশাক নিয়ে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তা এখনো আমার ডায়েরীর পৃষ্ঠায় ধরা রয়েছে। মন্তব্যে বলা হয়েছে, ভারতসম্রাট সাজাহান রঙ্গমঞ্চে যে পোশাকে অবতীর্ণ হয়েছেন, এদেশের ধোপা-নাপিতরাও অমন পোশাক পরতে চায় না।

সুতরাং মন্তব্যের পর টীকা নিষ্প্রয়োজন।

তবুও দ্বিতীয় রজনীতে 'চাঁদ-সদাগর' অভিনীত হল। সেদিন দর্শকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অভিনয়ও দর্শকমনে রেখাপাত করলো না।

পরদিন ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নানা জনের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল।

আমার মত অভিনেতা কেন এসেছে এমন দলের সঙ্গে—এই নিয়েই প্রশ্ন।

আমি নিরুত্তর। যা-কিছু বলার দ্বিজেন সান্যাল আমার হয়ে বলেছে। কী আর বলবে, বলেছে, আমার পক্ষে পূর্বাহ্নে দলের সম্পর্কে কিছু জানা তো সম্ভব নয়; বরং আমাকে ওরা নানাভাবে বুঝিয়ে দিল যে ওদের অভিনয়ের দলটি রীতিমতো ভালো।

অভিনয় শেষে সেই রাত্রেই একেবারে স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। টাঙ্গা পাইনি, দ্বিজেনের গাড়ীতে স্টেশনে এসেছি।

স্টেশনে আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল। দু'ঘণ্টা লেটে আসছে ট্রেন।

ট্রেনের অপেক্ষায় স্টেশনেই বসে রইলাম।

সকাল সাড়ে আটটায় ট্রেন এলো। ট্রেনে উঠেই শুয়ে পড়লাম। যেমন শোওয়া, তেমনি ঘুম।

ঘুম ভাঙলো এলাহাবাদ স্টেশনে পৌছে। তখন বেলা একটা।

এখানেও যে হোটেলে উঠলাম, সেটিরও গালভরা নাম। নিউ গ্রাণ্ড হোটেল।

এখানে রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুটে আজ রাত দশটায় 'সাজাহান' মঞ্চস্থ হবে।

দ্বিজেন সান্যাল আমাদের সঙ্গে এসেছে। সে-ই আজ ঔরংজীবের ভূমিকায় নামবে। লক্ষ্মৌতে দলের কর্মকর্তাদের আমিই বলেছিলাম, দ্বিজেনকে দিয়ে ঔরংজীব অভিনয় করানোর কথা। শুনেছি ও-তো ভালো অভিনয় করে।

দ্বিজেনও রাজী হল। ঔরংজীবের পোশাকও তার আছে। সুতরাং সে-ও এসেছে এলাহাবাদ।

অভিনয় শুরু হল রাত দশটায়। লক্ষ্মৌ-এর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে, ব্যক্তিগতভাবে যতোখানি শক্তি দিয়ে সম্ভব, সাজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করলাম। কিন্তু তাতে আর কতটুকু ফল ফলতে পারে। সামগ্রিক অভিনয় কোথাও দানা বাঁধলো না। দ্বিজেনও আমাকে হতাশ করেছে। দ্বিজেনের কণ্ঠস্বর অনুচ্চ, তাছাড়া অভিনয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য থাকা দরকার জায়গায় জায়গায়, তারও অভাব। তবুও বলবো, দ্বিজেনের অভিনয়ের ক্ষমতা আছে।

পরদিন। তারিখ ছিল ৪ঠা এপ্রিল। সকালে প্রয়াগে, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে স্নান করে হোটেলে ফিরে এসেছি। সারাদিন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের অবসর। তারপর রাত্রে যথারীতি অভিনয়। সে রাতের নাটক 'চাঁদ-সদাগর'।

অভিনয় হল। সেই মামুলি অভিনয়। নতুনত্ব নেই, বৈচিত্র্য নেই। 'চাঁদ-সদাগর' হল ৪ তারিখে, ৫ তারিখে 'মিশরকুমারী'। ৬ই এপ্রিল এলাহাবাদ ছেড়ে কানপুরের উদ্দেশে রওনা হওয়া।

এবার আর হোটেল নয়, স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে থাকা ঠিক করলাম। এখানে রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুটে এক রাত্রির অভিনয়ের ব্যবস্থা। নাটক 'চাঁদ-সদাগর'।

রাত দশটায় অভিনয় শুরু হল। কিন্তু এখানেও দর্শকসংখ্যা সীমিত। যা আশা করা গিয়েছিল, তেমন টিকিট বিক্রি হয়নি।

অভিনয় শেষে ফিরে এলাম স্টেশনে। ইণ্ডিয়ান রিফ্রেশমেণ্ট রুমে, খাওয়া-দাওয়া সেরে রিটায়ারিং রুমের নির্দিষ্ট শয্যায় আশ্রয় নেওয়া।

কানপুর থেকে দিল্লীর পথে রওনা হলাম ৭ই এপ্রিল।

সন্ধ্যে ৭টায় দিল্লী পৌছেচি। এখানে আশ্রয় নিয়েছি তাজমহল হোটেলে।

নতুন কোথাও এলেই আমার মনটা একবিন্দু স্থির থাকতে চায় না। এখানেও তাই হল। এসেই একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। উদ্দেশ্য রাজধানীর দর্শনীয় স্থানগুলো দেখা। ভাড়া ঠিক হল পঁচিশ টাকা।

সে রাতে আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নার রঙ মেখে রাজধানী দিল্লী সেদিন আমার চোখে অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

সন্ধ্যে থেকে রাত একটা। শহরের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। দেখেছি দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, লালকেল্লা—দেখেছি ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত আরো কত স্থান।

তারপর সেই রাতে তাজমহল হোটেলের নির্দিষ্ট কক্ষে।

হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরো একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতের রাজধানীর দিকে।

পরদিন। পৌনে দশটায় হোটেল থেকে বেরোলাম। দিনের আলোয় শহরটা দেখবো, এছাড়া কিছু কেনাকাটাও করতে হবে। মতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-খাস ছাড়া আরো কত ঐতিহাসিক প্রাসাদ দেখলাম। মনের মধ্যে ইচ্ছে ছিল, সাজাহান আর মমতাজের চিত্র সংগ্রহ করবো। পেলামও। মমতাজ আর সম্রাট সাজাহানের ছবি সংগ্রহ করে ফিরে এলাম হোটেলে।

শিশির ভাদুড়ীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূপতি মিত্র এখানে থাকেন। হোটেলে ফোন করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। শেষটা নিজেই এসে উপস্থিত হলেন হোটেলে।

ভূপতিবাবু আমাকে হোটেল থেকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে ভূপতিবাবুর সঙ্গেই তাল কাটোরা ক্লাব। নয়াদিল্লীর বিখ্যাত ক্লাব এটি। এখানেই আজ রাতে 'চাঁদ-সদাগর' অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

যথারীতি অভিনয় আরম্ভ হল। এখানেও দর্শকসংখ্যা কম। যে জন্যেই হোক, অভিনয়ও তেমন জমলো না।

রাতে অভিনয় শেষে ফিরে এলাম তাজমহল হোটেলে।

জ্যোৎস্না-ধোয়া রাজধানীর রাজপথের ওপর দিয়ে যখন হোটেলে ফিরে এসেছি, তখন গোটা শহর ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন। ৯ই এপ্রিল।

বেড়াতে বেরিয়েছি। প্রথমে গেলাম চাঁদনী চকে। তারপর সোনেরী মসজিদে, যেখান থেকে নাদির-শা দিল্লী ধ্বংস করার হুকুম দিয়ে নিজেই তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইতিহাসের সেই মর্মান্তিক অধ্যায়েরই সাক্ষ্য দিচ্ছে এই সোনেরী মসজিদ।

এখানে-ওখানে বেড়িয়ে সন্ধ্যেবেলা আমার টাঙ্গা এসে দাঁড়ালো অভিনয়মঞ্চের সামনে।

মঞ্চে এসে দেখা পেলাম মিহিরের। 'সোল অফ এ স্লেভ'-এর প্রফুল্ল ঘোষের ভাগিনেয় মিহির। ছেলেটি ভালো। শৌখীন অভিনেতা হিসাবে নামও আছে।

সে রাতের নাটক 'সাজাহান'। কদিনের ট্যুর-প্রোগ্রামে আজই বোধহয় নাটক জমলো। অভিনয়ে প্রচুর হাততালি পেলাম। এটাই আনন্দ। অভিনয় শেষে দর্শকদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অভিনন্দন জানাতে এলো। যা হোক, আজ যে অভিনয় ভালো হয়েছে—এটাই আনন্দ।

অভিনয় শেষে প্রথমে ভূপতির সঙ্গে তার বাড়ীতে গেলাম। আজ রাতের আহার ভূপতির বাড়ীতেই গ্রহণ করতে হল। কদিন একঘেয়ে হোটেলের খাবার খেয়ে আজ ঘরোয়া আহার ভালোই লাগলো।

ভূপতির বাড়ী থেকে হোটেলে ফিরেছি রাত আড়াইটেয়।

দিল্লীর শেষ রাত শেষ হল। শান্ত ব্যানার্জী, রাধাচরণ—সব এলো, হোটেলের চার্জ মিটিয়ে দিল। তারপর হোটেল থেকে দিল্লী স্টেশনে।

ক্যালকাটা মেলে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হল হাবুল, সিধু আর পদ্ম-র সঙ্গে। শুনলাম ওরা যাবে মথুরায়।

হাতরাস জংশন পর্যন্ত আমরা একই ট্রেনে ছিলাম। হাতরাসে ওরা নেমে গেল। ওরা যাবে মথুরায়, আর আমি চলেছি কলকাতায়।

১১ই এপ্রিল দুপুর সাড়ে বারোটায় আমি এসে পৌছলাম হাওড়া স্টেশনে।

নাট্যভারতীতে আজ দুটি প্রদর্শনী হবে। প্রথমে 'চিরকুমার সভা,' তারপর 'পি-ডবল্যু-ডি'। 'চিরকুমার সভা'র ভূমিকালিপিতে আমার সঙ্গে ছিলেন দুর্গাদাস, মনোরঞ্জন, তুলসী লাহিড়ী, রাণীবালা। অমরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তুলসী লাহিড়ী।

সে রাতে দ্বিতীয় প্রদর্শনীর নাটক 'পি-ডবল্যু-ডি'-তে আমি রায়বাহাদুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। এর আগে এই ভূমিকাটি ছিল নির্মলেন্দুবাবুর।

নতুন নাটকের সন্ধানে আমরা ফিরি; কিন্তু যখন দেখি কোন নতুন নাটক চললো না, তখন মনটা খারাপ হয়। নাট্যনিকেতনে অভিনীত হচ্ছিল শচীন সেনগুপ্তের 'ভারতবর্ষ'। কিন্তু নাটকটা ঠিকমতো চলছিল না। এই নাটক নিয়েই রঙমহল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শচীনবাবুর কিছুটা ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছিল।

যাই হোক, খবরটা শুনলাম নাট্যভারতীতে বসেই। ঐ রাতে আরো একটি

দুঃসংবাদ শুনলাম তুলসীবাবুর কাছে। তুলসীবাবুর ছোট ভাই, গোপাল লাহিড়ী—সে আমলের নামকরা ক্লারিওনেট বাদক, আমার সঙ্গে যার আলাপও ছিল—মালাবার হিল্‌স-এ মারা গেছে। মৃত্যুটা বড়ো মর্মান্তিক। শুনলাম, তার পাচকই তাকে গুলি করে মেরেছে। ঘটনাটা শুনে মনটা খারাপ হল। গোপাল আমার পরিচিত বলে শুধু নয়, সে ছিল একজন গুণী শিল্পী।

ঐ রাতে বাড়ী ফিরে দেখলাম, আমার টেবিলে সুধীরার চিঠি। সুধীরা চিঠিতে তার শিলং পৌঁছনোর খবর জানিয়ে লিখেছে, শিলং-এ নিউ কলোনীতে হাবুলের ভাইপো ডাঃ এল. কে. চক্রবর্তী একটি চমৎকার বাড়ী ঠিক করে দিয়েছেন।

চিঠিটা পড়ে আমিও ঠিক করলাম, দিন সাতেক ছুটি নিয়ে শিলং ঘুরে আসবো।

পরদিন ১২ই এপ্রিল। নাট্যভারতীতে সেদিন দুটি প্রদর্শনী। 'পি-ডবল্যু-ডি' 'কর্ণার্জুন'। কর্ণার্জুনে সেদিন আমি ছাড়াও শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দুর্গাদাস, মনোরঞ্জন।

ঐদিন কর্ণার্জুন দেখতে এসেছিল উত্তরপ্রদেশের কয়েকজন ছাত্র, অভিনয়শেষে যারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানাতে এসে অটোগ্রাফ চাইলো। অবাঙালী ছাত্রদের যে বাংলা নাটক ভালো লেগেছে, এটা আনন্দের কথা।

মনের মধ্যে শিলং যাবার তাগিদ আছে। ১৩ই এপ্রিল ছিল 'পি-ডবল্যু-ডি'-র একশ ১১তম রজনী। ঐ রাতে, অভিনয়শেষে, এক সপ্তাহের জন্যে ছুটির কথা জানালাম। ছুটি নিয়ে পরদিন শিলং-এর উদ্দেশে রওনা হলাম।

বেলা দেড়টায় কলকাতা থেকে রওনা হয়ে পার্বতীপুরে এসে পৌঁছলাম রাত ৯টায়। সারারাত গেল গাড়ীতে। ভোর হল রঙ্গিয়া স্টেশনে পৌঁছতে।

রঙ্গিয়া থেকে আমিনগাঁও। এখানে স্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে পাণ্ডুয়াঘাটে। স্টীমারেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিয়েছি।

পাণ্ডুয়াঘাটে নামতেই কামরূপের পাণ্ডারা ছেঁকে ধরলো। তাদের বোঝালুম, আমি শিলং-এর যাত্রী, তীর্থযাত্রী নই।

পাণ্ডুয়াঘাট থেকে কমার্শিয়াল ক্যারিয়িং কর্পোরেশনের গাড়ীতে শিলং-এর উদ্দেশে রওনা হলাম সকাল সাড়ে সাতটায়।

আমাদের পথ আসাম ট্রাঙ্ক রোড। জোড়হাট হয়ে নানপো এসে পৌঁছে ক্ষণিকের যাত্রাবিরতি। রোড ক্লিয়ারেন্স না-পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

বেলা দশটা। রোড ক্লিয়ারেন্স পেয়ে আমাদের গাড়ী চলতে শুরু করলো পার্বত্য পথ ধরে। সর্পিল গতিতে চলে গেছে পার্বত্য পথ। হিমালয়ের অন্যত্র যেমন,

এখানে ঠিক তেমন নয়। পথের ধারে খাদ, সর্বত্র সুগভীর নয়, মাঝে মাঝে অধিত্যকার ওপর দিয়ে চলে গেছে।

আঁকাবাঁকা পথ। চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে চলে গেছে। মনে হয় এ-পথ গেছে নিরুদ্দিষ্ট ঠিকানায়, কোন নিসর্গ-সৌন্দর্যের দেশে।

শিলং-এ স্ট্যাণ্ডে পৌঁছেও শেষ নয়, আমাকে যেতে হবে লাইটুংগ্রা অবধি। বাড়তি একটি টাকা দিতে ওই গাড়ীই আমাকে পৌঁছে দিলে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে ঘড়িতে সময় দেখলাম। বেলা একটা বেজে পনরো মিনিট।

ক'দিন পর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। যাই হোক, খানিক কথাবার্তার পর স্নানাহারের পালা চুকিয়ে ভাবলাম, একটু ঘুমিয়ে নিই। কিন্তু শয্যাগ্রহণ করতেই হল এক ঝামেলা। নিশ্চিন্তে শোবার জো আছে কি! দারুণ মাছির উৎপাত। ওই দিনের বেলাতেই মশারী টাঙাতে হল।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি যখন এসে পৌঁছেচি, তখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার হল।

সুতরাং আর চুপচাপ ঘরে বসে থাকা নয়, বেরিয়ে পড়লাম ট্যাক্সি নিয়ে। সঙ্গে বাড়ীর সবাই আছে। বিডন ফল্‌স্‌, বিশপ ফল্‌স্‌, শিলং লেক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, এ্যাসেম্বলি ভবন দেখে যখন ডাঃ এল. কে. চক্রবর্তীর বাড়ী এলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

ডাঃ চক্রবর্তী বেশ মজলিশি মানুষ। প্রবাসে আমাদের জন্যে উনি যথেষ্ট করেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে ডাঃ চক্রবর্তীকে আসছে কাল চেরাপুঞ্জী যাবার জন্যে একটা গাড়ী ঠিক করার কথা বললাম।

ডাঃ চক্রবর্তী কথা দিলেন।

পরদিন। ২৩শে এপ্রিল। সকালে বাড়ীতে এক কাশ্মীরি ফেরিওয়ালা এলো। তার কাছে নানা জাতের পাথরের মালা ছাড়া আরো কিছু জিনিসপত্তর ছিল। একটি এ্যাম্বারের মালা কিনলাম তিরিশ টাকা দিয়ে, আর ফাইবারে তৈরি একটা মণিপুরী ম্যাফলার।

একটু বাদেই ডাঃ চক্রবর্তী ট্যাক্সি নিয়ে এলেন। আমাদের রওনা হতে পৌণে এগারোটা বাজলো।

চেরাপুঞ্জীর পথ চলে গেছে আপার শিলং-এর ওপর দিয়ে। কিছু পথ অতিক্রম করে ট্যাক্সি দাঁড়ালো এ্যালিফ্যাণ্টা জলপ্রপাতের কাছে।

এ্যালিফ্যাণ্টা জলপ্রপাত দর্শন করলাম। ভালো লাগলো। আমরা সমতলভূমির মানুষ—পাহাড়ের যা-কিছু সৌন্দর্য আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, মনকে করে অভিভূত।

এবারের পথ পরমরমণীয়। সর্পিল গতিতে পথ চলে গেছে। দৃষ্টিপথেই পড়লো সবুজ পাইনের নিবিড় বন—পাহাড়ের গায়ে পাইনের ছায়ায় পাতা সবুজ ঘাসের কার্পেট। চলতি পথে অবাক চোখে চেয়ে থাকি সবুজ-সৌন্দর্যের দিকে।

এই পথে যেতেই দেখলাম, কয়লা সংগ্রহের কাজ চলছে। পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ কেটে কয়লা বার করে আনা হচ্ছে। আরো দেখলাম, চুনের কারখানা, পাথর পুড়িয়ে এখানে চুন তৈরি করা হয়। এই 'সিলেট চুন' কলকাতার বাজার আমরা পাই।

দেখতে দেখতে পথ ফুরিয়ে এলো। চেরাপুঞ্জীতে পৌছে চারদিকের পরিবেশে দৃষ্টিপাত করি। চেরাপুঞ্জীর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার ফুট। চিরকালের বৃষ্টিঝরার দেশ চেরাপুঞ্জী—চারদিকে নিবিড় সবুজ বনভূমি, সবুজ পাহাড়—শুধু আকাশের নীল রঙ ঢাকা থাকে ঘন কালো মেঘে।

চেরাপুঞ্জীতে একটি গুহা দেখলাম, যেটি সত্যিই বিস্ময়কর। গুহার ভিতরে বটের ঝুরির মতো কী যেন ওপর থেমে নেমেছে। ওগুলো কিন্তু পাথরের। সত্যি—দেখবার মতো। ভারতে যে এমন গুহা আছে একথা আমি আগে কখনো শুনিনি।

এরপর এলাম মসওয়াম্বি ফল্‌স্ দেখতে। বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দূর থেকেই দেখলাম। কাছে যাওয়ার পথ নেই। তবে যাওয়া যায় না এমন নয়। যাই হোক, দূর থেকে দেখলাম সুউচ্চ পাহাড় থেকে জলধারা নেমে আসছে প্রবল কলোচ্ছ্বাসে। শুনলাম, জলপ্রপাতের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের সুর। পাহাড়ের ওপর থেকে জলধারা পড়ছে ১৮০০ ফুট নীচে।

এখান থেকে দেখা যায় শ্রীহট্টের সমতলভূমি। বিহ্বলদৃষ্টিতে ছবির মতো মনে হয়। দাঁড়িয়ে দেখলাম। কয়েকটি ছবিও তোলা হল এখান থেকে।

ফিরতি পথে চেনা মুখের দেখা মিললো। কলকাতার বড়তলার ও-সি যতীনবাবুর দেখা পেলাম অপ্রত্যাশিতভাবে। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি বেড়াতে এসেছেন?

হ্যাঁ, না—কিছুই বলেন না যতীনবাবু। ভাবলাম, পুলিশের লোক—ওঁরা কোন কথাই বলতে চান না। হয়তো কোন কাজ নিয়ে এসেছেন।

এরপর শিলং শিখরে ওঠার পালা। উঠলামও। সাগরপৃষ্ঠ থেকে ছ' হাজার ফুট ওপরে শিলং শিখর। এখান থেকে শিলং শহরের দৃশ্যটি বড় সুন্দর।

শিলং শিখর থেকে ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড। তারপর হ্যাপী ভ্যালী হয়ে বাড়ী ফিরে এসেছি।

বাড়ীতে চায়ের আসর বসলো। আসরে ডাক্তার চক্রবর্তীও ছিলেন। ওখানেই কথা উঠলো, 'পাইন উসলা' দেখার। কিন্তু সেদিন যাবো কি যাবো না—সেটা ঠিক হল না।

চা-পানের পর সেদিনের মত ডাঃ চক্রবর্তী বিদায় নিলেন।

আমিও ক্লান্ত। এবারে একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রামের অবসর খোঁজা।

পরদিন ২৪শে এপ্রিল, বাড়ীওয়ালা ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য এলেন। সকালে তাঁর সঙ্গে খানিক গল্পগুজবও হল।

সকাল থেকে বাড়ীতেই ছিলাম। বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে নানা এলো-মেলো চিন্তার জাল বুনছিলাম। এর মধ্যে মাঝে মাঝে সুধীরা এসেছে, বসেছে, তার সঙ্গে কথা বলেছি, গল্প করেছি। ছেলেমেয়েরা এসেছে কাছে। তাদের সঙ্গেও হাসাহাসি করেছি।

এমনি করে সকালটা কেটে গেল।

দুপুরে দেড়টা নাগাদ ডাঃ চক্রবর্তী গাড়ী নিয়ে এলেন। বললেন, চলুন—'পাইন উসলা' যাবো, আমার গাডীতেই। এক্ষুণি তৈরি হয়ে নিন।

মিনিট-পনেরোর মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। বেলা তখন দেড়টা।

বেলা সাড়ে তিনটেয় পৌছলাম আমাদের গন্তব্যস্থানে। পাইন-উসলায়। পাহাড়ের রমণীয় পরিবেশে চমৎকার জায়গা। চারদিকে জড়িয়ে আছে প্রকৃতির গভীর প্রশান্তি।

এখানকার ডাকবাংলোটি বড়ো সুন্দর। ছবির মতো। রিফ্রেশমেণ্ট রুমটি ডাকবাংলোর সংলগ্ন। সবাই মিলে চা-পান করলাম। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে দেখার পালা।

সাগর পৃষ্ঠ থেকে ছ' হাজার সাতাশ ফুট ওপরে দাঁড়িয়ে দেখছি চারদিকের পরিবেশ। সিলেট রোড দেখতে পাচ্ছি, যেন পাহাড়ের গায়ে একটু সরু ফিতে ছড়িয়ে আছে।

ডাকবাংলোর বারান্দায় দাঁড়ালে শ্রীহট্টের সমতলভূমি নজরে পড়ে। দূর থেকে ভারি সুন্দর লাগে দেখতে।

পাইন-উসলা দেখা শেষ হল। ফিরে এলাম শিলং-এর নির্দিষ্ট ঠিকানায়। ডাঃ চক্রবর্তী বিদায় নিলেন আমাদের পৌছে দিয়ে।

ডাঃ চক্রবর্তীর শ্বশুর মিঃ এ. কে. ভট্টাচার্যের বাড়ীতে গেলাম। আলাপকুশলী মানুষ। সহজেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেন। মিঃ ভট্টাচার্যের বিরাট ব্যবসা আছে। কলকাতায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-তে ওঁদের ব্যবসায়ের শাখা-অফিস রয়েছে। ধনী হলেও ভট্টাচার্যের মধ্যে একটি সুন্দর মানুষ লুকিয়ে আছে।

এখানেই কথা উঠলো দেবীতীর্থ কামাখ্যা যাওয়ার। একটা গাড়ীর কথাও জানিয়ে রাখলাম। আসছে কালই যাবো।

এখানে মিসেস্ চক্রবর্তী ও মিসেস্ ভট্টাচার্যের সঙ্গেও দেখা হল। মিসেস্ ভট্টাচার্য আব তাঁর শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা হল।

পরদিন ২৫শে এপ্রিল। সকালে ডাঃ চক্রবর্তীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামাখ্যা যাত্রা করলাম সপরিবারে। বাসায় রইলো গোকুল। ভৃত্য হয়েও যে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছে।

গৌহাটির পথে ড্রাইভার জানালো বশিষ্ঠ আশ্রমের কথা। গৌহাটি থেকে ছ' মাইল দূরে বশিষ্ঠের আশ্রম।

যাচ্ছি যখন এই পথে—কেনই-বা বাকি থাকে বশিষ্ঠ আশ্রম যাওয়া।

ড্রাইভার আমাদের নিয়ে চললো বশিষ্ঠ আশ্রমের পথে।

সত্যি, বশিষ্ঠ আশ্রমটি দেখবার মতো। খরস্রোতা পার্বত্য নদী তিনদিক থেকে আশ্রমকে বেষ্টন করে রেখেছে। তুরন্ত জলধারা ছুটে চলেছে প্রবল কলোচ্ছ্বাসে।

ওপরে মন্দির দেখলাম। মন্দির-চূড়োটি উপুড়-করা ধামার মতো। কামরূপ অঞ্চলের প্রতিটি মন্দিরের গঠনশৈলী একই ধাঁচের।

মন্দির দেখলাম। কোন বিগ্রহ নেই। বিগ্রহ না থাক—তবু তো দেবতার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে এই মন্দির।

এবারে নীচে এলাম। মাটির নীচে ঘর। দেখলাম, এখানেও কোন বিগ্রহ নেই। শুধু একটি পাথর বসানো। শুনলাম—এটি একটি আসন। হয়তো বশিষ্ঠ এই আসনে বসে তপস্যা করেছিলেন। পরবর্তীকালে হয়তো আরো অনেক মহাপুরুষ এই আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

কামরূপ—তন্ত্রসাধনার পীঠভূমি। তন্ত্রসাধনা—শক্তিসাধনার আর এক রূপ।

বশিষ্ঠ আশ্রম দর্শনান্তে গৌহাটি ফিরে এলাম। গৌহাটিতে প্রথমে এলাম পানবাজারে, সতী সিনেমার সামনে, এন. কে. ভট্টাচার্য এ্যাণ্ড সন্সের অফিসে। ডাঃ চক্রবর্তী এই অফিসের মোহিনীবাবুকে দেওয়ার জন্যে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন আমার হাতে। সেটি মোহিনীবাবুকে দিয়ে এলাম।

তাড়া রয়েছে কামাখ্যা যাওয়ার। সুতরাং এখানে আর অপেক্ষা নয়, চললাম কামাখ্যার পথে। পথের দু'ধারের দৃশ্যপট মনোরম। সামান্য পথ দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো। গাড়ী এসে দাঁড়ালো কামাখ্যা পাহাড়ের পাদদেশে। দেখলাম, সামনেই পাহাড়ে ওঠার সিঁড়ি-পথ।

এসেই পাণ্ডার খোঁজ করলাম।

সামনের এক দোকানদার জানালো, আমাদের পাণ্ডা এতক্ষণ অপেক্ষা করে একটু আগে ওপরের দিকে উঠেছেন।

অগত্যা নিজেরাই চলতে আরম্ভ করলাম পাহাড়ের সিঁড়ি-পথে।

সিঁড়ি-পথ উঠে গেছে ওপরের দিকে। মাঝে মাঝে খাড়াই সিঁড়ি। তবে যাত্রীদের সুবিধার জন্যে লোহার রেলিং আর রড দেওয়া আছে। সুতরাং উঠতে কোন অসুবিধে নেই। তবে হাত আর পায়ের জোর থাকা চাই।

এইসব তীর্থের পথে মানুষ এক ধরনের শক্তি পায়। কত অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও দেখেছি, ওই পাহাডের সিঁড়ি-পথ ধরে উঠে চলেছে। আমরা কেন পারবো না!

ওঠার পথে আমি যদিও এক-আধবার থমকে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু সুধীরা একবারের জন্যেও দাঁড়ায় নি। ভানু, মীরা—ওরাও কত স্বচ্ছন্দে উঠে চলেছে।

দেড় ঘণ্টা লাগলো পাহাড়ের ওপরে উঠতে। উঠেই এক নজরে দেখলাম, দেবীর মন্দির।

মন্দিরের চত্বরের কাছেই একটি কুণ্ড। জলের রঙ গাঢ় সবুজ। শুনলাম এই পবিত্র কুণ্ডে স্নান করে মন্দিরে যাওয়া বিধি। কিন্তু আমরা স্নান করলাম না। কুণ্ডের জল মাথায় দিয়ে মন্দিরে এলাম।

ওপরের মন্দিরে কামাখ্যা দেবীর স্বর্ণমূর্তি। নীচে গর্ভমন্দিরে যোনীপীঠ। বাহান্ন পীঠের অন্যতম। এখানে কোন মূর্তি নেই। ফুলচন্দনে সাজানো একটি পাথর-খণ্ড। এখানেই পড়েছিল বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর দেহাংশ।

পূজা দিলাম। প্রণাম জানালাম দেবীর উদ্দেশে।

পূজান্তে বাইরে এলাম। পাণ্ডা নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। এখানেই পাণ্ডার বাড়ীতে দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করলাম। একে অনেক বেলা হয়েছে, তারপর শরীরের ওপর দিয়ে কম ধকল যায় নি। পরিতৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করলাম ভোগপ্রসাদ। পাণ্ডাঠাকুর বললেন, এবারে আমাদের যাত্রীনিবাসে বিশ্রাম করুন।

মন্দিরের কাছেই যাত্রীনিবাস। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। যাত্রীনিবাসে এলাম বিশ্রামের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু বিশ্রাম নিতে মন চাইলো না। পাহাড়ের শিখরে উঠবার আগ্রহ।

যেমন ইচ্ছে, তেমন কাজ। সবাই মিলে পাহাড়ের শিখরদেশে উঠতে আরম্ভ করলাম।

পাহাড়ের ওপরে দেবী ভুবনেশ্বরীর মন্দির। শূন্য মন্দির। এখানেও কোন মূর্তি নেই।

পাহাড়ের শিখরদেশ থেকে চারদিকের দৃশ্যাবলী অত্যন্ত সুন্দর। বিশেষ করে উচ্ছল ব্রহ্মপুত্রকে দেখবার মত। চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখতে পাই ব্রহ্মপুত্রের ছোট দ্বীপটি যেখানে উমানন্দ ভৈরবের মন্দির।

দেবী কামাখ্যা এখানে ভৈরবী, ভৈরব উমানন্দ।

দাঁড়িয়ে রইলাম পাহাড়ের শিখরদেশে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখি চারদিকের অনুপম দৃশ্যাবলী।

কিন্তু দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখার অবসর কই! আমাকে যে আজই ফিরতে হবে!

নীচে মন্দিরের কাছে নেমে এসেছি। এবারে আমার চলার পালা।

আজ আমি একাই যাবো, নয়তো আর সবাই এখানে থাকবে। সুধীরাকে বললাম, পুণ্যের অংশটা তোমাদের ভাগ্যেই বেশি পড়বে—তীর্থস্থানে রাত্রিবাস, এ তো ভাগ্যের কথা! ঠিক আছে—তোমরা থাক।

সুধীরা কী যেন বলতে যাচ্ছিল।

বললাম, কোন চিন্তা নেই—এখানে নির্ভয়ে থাকতে পার। তাছাড়া গাড়ী তো আছে, কাল যাবার পথে গৌহাটি শহরটা ভালো করে দেখে যেও।

ওরা সবাই রইলো। আমি একা ফিরে চললাম।

পাণ্ডুতে পৌঁছে ড্রাইভারকে বললাম, তুমি ওদের ঠিকমতো পৌঁছে দিও। দেখো, কোন অসুবিধা যেন না হয়।

ড্রাইভার বললে, কোন চিন্তা নেই, আপনি মনের মধ্যে কোন চিন্তা রাখবেন না।

পাণ্ডু থেকে আমিনগাঁও।

ফেরি স্টীমারে উঠেছি আরো যাত্রীর সঙ্গে।

পথশ্রমে ক্লান্ত আমি। তারপর এক-নাগাড়ে চলাফেরার দরুন ক্ষিধেও পেয়েছিল খুব। স্টীমারের দোতলায় ক্যান্টিনে খেতে বসেছি।

আমার কাছ থেকে একটু তফাতে, আর একটি টেবিলে দেখলাম, একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে। দেখেই মনে হল মিলিটারীর কোন জাঁদরেল ব্যক্তি। তিনি একা নন, তাঁর আশপাশে আরো কয়েকজন সৈনিকপুরুষ।

শ্বেতাঙ্গ মিলিটারী অফিসারটি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে মদ্যপান করছেন। টেবিলের ওপর বেশ কয়েকটি বোতল সাজানো। মদ্যপানে হয়তো কিছুটা উন্মাদনাও এসেছে। সঙ্গীদের সঙ্গে ভারীগলায় কি যেন বলছেন। আর কথার মাঝে মাঝে খানিকটা করে তরল পদার্থ গলার মধ্যে ঢেলে দিচ্ছেন।

অন্যান্য সৈনিকপুরুষরা, তাদের অফিসারটির অবস্থা বুঝতে পেরেছে। যারা দূরে ছিল, চোখ ইশারায় তাদের ডাকছে। ইশারায় বলতে চাইছে, ওরে, সুরার পাত্র এখানে আছে—যতো খুশি পান করো।

সুতরাং আর কি!

পানের আসর আরো জমে উঠলো।

এরপর ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ করলো। কথা শুনে এবং অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হল, কোন নির্মীয়মান পথের শ্রমিকদের নিয়ে ওরা কথা বলছে। যেসব কথা কানে এলো, তাতে বুঝলাম, ওরা শ্রমিকদের কাজ দেখে বিরক্ত হয়েছে এবং শ্রমিকরা যে কুঁড়ে, ঠিকমত কোদাল-বেলচা চালাতে চায় না, এইটাই ওদের কথার বিষয়।

পাণ্ডু থেকে আমিনগাঁও।

স্টীমারঘাট থেকে স্টেশনে এসেছি।

গাড়ীর নির্দিষ্ট কামরায় উঠতে যাবার সময় একজন অপরিচিত বাঙালী ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনাদের ট্রেনে একজন জেনারেল যাচ্ছেন।

বললাম, জানি—কিন্তু আমি তাঁদের চিনি না। বলে নির্দিষ্ট কামরায় উঠেছি।

ছুটন্ত ট্রেনের শব্দের মধ্যে একটা ছন্দ আছে, সুর আছে। সেই ছন্দ আর সুরের ভাষা শুনতে শুনতে এক সময় আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি।

বেলা দেড়টায় এসে পৌছলাম শিয়ালদা স্টেশনে। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সরাসরি বাড়ী।

বাড়ীতে পৌছে স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রাম। তারপর আবার সেই পুরনো পৃথিবী—রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো।

এলাম নাট্যভারতীতে। সেদিন 'পি-ডবল্যু-ডি'-র ১১২তম রজনী।

অভিনয়-শেষে দুর্গাদাস বললে, রঙমহলের ষষ্ঠীবাবু আমাকে তাঁদের ওখানে ডাকছেন। কী করি বলো তো? এখানকার তো এই হাল! 'রিহার্সাল' নাটক কি হবে, বুঝতে পারছি না।

বললাম, আমি কি বলতে পারি বলো। তুমি যা ভালো বুঝবে করবে।

ঐ সময় শনি-ববি চলছে পি-ডবলিউ-ডি। অন্যান্য দিন অন্য নাটক। ধীবেন মুখুজ্যের 'জযন্তী' নাটকেব ঐদিন উদ্বোধন হল মিনার্ভায। তারিখটা হল উনত্রিশে এপ্রিল।

ঐদিনই যথাসময়ে নাট্যনিকেতনে গিযেছি 'বিজিয়া' বিহার্সাল দিতে। গিয়ে দেখলাম, মঞ্চেব ওপব প্রবোধ গুহকে ঘিবে কযেকজন বসে। কী যেন হচ্ছে।

ইতস্ততঃ কবছি, ভিতবে যাবো কিনা, এমন সময প্রবোধবাবু ডাকলেন, এসো— নতুন নাটক পডা হচ্ছে।

নতুন নাটকেব নাম 'কালিন্দী'। নাট্যকাবেব নাম তাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যয়। স্ববচিত উপন্যাসেব নাট্যৰূপ তিনিই দিযেছেন।

প্রবোধবাবুব কাছে শুনলাম, তাবাশঙ্কব সিউডীব নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যাযেব আত্মীয এবং ভালো লেখেন।

সেইদিনই প্রথম দেখলাম তাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যে তাবাশঙ্কব পববর্তী কালে কথা-সাহিত্যেব ক্ষেত্রে একটা যুগ সৃষ্টি কবেছেন।

যাই হোক, ওদেব নাটক শোনা চলতে থাকলো।

আমি এলাম ভিতরে, যেখানে 'বিজিযা' রিহার্সালেব আসব বসেছে। বিজিযাব উদ্বোধন বজনী আসন্ন। আসছে পযলা মে।

পযলা মে সকালেই স্টুডিও যাবাব তাগিদ ছিল। স্টুডিও পৌছলাম সাডে দশটায। মেক-আপ নিযে তৈবি হযে বসে আছি। অন্যান্য শিল্পীবাও তৈরি। কিন্তু ফ্লোবে যাবাব ডাক আসছে না।

শুনলাম, ছবিব ক্যামেবাম্যান কাজে ইস্তফা দিযে চলে গেছে, তাই এ বিভ্রাট। তক্ষুণি অন্য ক্যামেবাম্যানকে নিযে আসা হল। কাজও শুরু হল দুটো পঞ্চান্ন মিনিটে। কিন্তু আবাব নতুন বিভ্রাট। একটা সট নিতেই দেখা গেল, পিকচার নেগেটিভ নেই। আবাব গাডী ছুটলো ফিল্ম আনতে। নতুন কবে শ্যুটিং আরম্ভ হল ৪টা ৫০ মিনিটে। ৫টা ৫৫-তে কাজ শেষ করলাম। থিযেটাবে যাবার তাডা রযেছে। আজই নাট্যনিকেতনে 'বিজিযা' আবম্ভ হবে।

সাডে সাতটায় 'বিজিয়া'-ব উদ্বোধন হল নাট্যনিকেতনে। সেদিনে বক্তিযারেব ভূমিকায় ছিলাম আমি, শৈলেন চৌধুবী নেমেছিলেন বীরেন্দ্রসিংহের ভূমিকায; পান্নালাল আর ঘটকেব ভূমিকায় ছিলেন নরেশ মিত্র এবং ভূমেন রায়। সমবেন্দ্রেব ভূমিকা ছিল উৎপল সেন। নাম-ভূমিকায় ছিলেন প্রভা, আর যশোর থেকে যে-মেয়েটি নতুন এসেছে, চলচ্চিত্রে এবং মঞ্চে অভিনয় করে ইতিমধ্যে কিছুটা পরিচিতিও পেয়েছে, সে ছিল ইন্দিরার চরিত্রে। মেয়েটির নাম ছায়া।

অভিনয় সেদিন আরো ভালো হত, যদি সবাই 'পার্ট' মুখস্থ করত। কিন্তু কেউ-ই তেমন 'পার্ট' মুখস্থ করেনি। সবাইকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রম্পটারের ওপর। আমি ঠিকমতো তৈরি হয়ে নেমেছিলাম। ওটা আমার চিরদিনের অভ্যাস। মঞ্চে নেমে প্রম্পটারের ওপর কান রাখবো, এটা আমি ভাবতেই পারি না। তবে কখনো কখনো এমনধারা যে ঘটেনি এমন নয়। যাই হোক, 'রিজিয়া' অভিনয় দর্শকরা মোটামুটি নিয়েছিল। বক্তিয়ার বারকয়েক হাততালিও পেয়েছিল সেদিন।

জোড়াসাঁকো রাজবাড়ীতে বিবাহের উৎসব উপলক্ষে নাটকাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। অভিনয় হয়েছিল 'কর্ণার্জুন'। রাত এগারোটায় অভিনয় শুরু হয়ে শেষ হয় রাত তিনটেয়। সেদিন তারিখ ছিল ২রা মে।

পরদিন ৩রা মে, ছুটির দিন। নাট্যভারতীতে 'পি-ডবল্যু-ডি'-র দুটি প্রদর্শনী ছিল।

এরই মধ্যে নাট্যভারতীতে 'সরলা'-র নতুন করে অভিনয়ের তোড়জোড় চলছিল। ৭ই মে 'সরলা'-র নতুন করে উদ্বোধন হল। সরলা সে-যুগে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

সেদিন ভূমিকালিপি ছিল আকর্ষণীয়। গদাধর—আমি, বিধুভূষণ—দুর্গাদাস, শশিভূষণ—সন্তোষ দাস, নীলকমল—কুমার মিত্র, সরলা—সাবিত্রী, প্রমদা—সুহাসিনী। সে-রাতে অভিনয় শুরু হয়েছিল ৭-৩০ টায়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, সে-রাতে গদাধরের চরিত্রে আমার অভিনয় দর্শক-মনকে খুশি করেছিল। কিন্তু এই হাল্কা রসের চরিত্রটি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। এই চরিত্রে দানীবাবুর অভিনয় আমি দেখেছি—সে অভিনয়ের তুলনা হয় না। এছাড়া আমি শুনেছি, এই গদাধর চরিত্রটিতে বেলবাবুর (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) অভিনয় ছিল নাকি আরো সুন্দর এবং প্রাণবন্ত। উনিশ শতকের শেষে সম্ভবতঃ ১৮৮৮ খৃঃ 'সরলা' প্রথম অভিনীত হয়েছিল, আর সে-রাতে বেলবাবু নেমেছিলেন গদাধরের ভূমিকায়।

মে মাসের দিনগুলো এইরকম ভাবে চলছিল। এর মধ্যে ২৫শে মে তারিখটি কিছুটা স্বতন্ত্র। ঐদিন ছিল 'পি-ডবল্যু-ডি'-র ১২৫তম রজনী। কিন্তু ঐদিন মঞ্চে গিয়ে শুনলাম দুর্গাদাস আসেনি, তার জায়গায় অভিনয় করবে 'হটু'।

দুর্গাদাসের জায়গায় হটু!

শুনে অবাক হলাম। হটু একজন প্রম্পটার।

দুর্গাদাসের জায়গায় সে অভিনয় করবে কেমন করে? শুনলাম, এর আগেও নাকি হটু দুর্গাদাসের বদলি হিসাবে অভিনয় করেছে।

যাইহোক, অভিনয় হল। বলা বাহুল্য, দুর্গাদাস আসেনি বলে কিছু টিকিটের মূল্য ফেরত দিতে হয়েছিল।

বলতে দ্বিধা নেই, ঐ দিনেই মনে হয়েছিল, 'পি-ডবল্যু-ডি'-র আয়ু আর বেশিদিন নয়।

২৬শে ও ২৭শে মে, দু'দিনই সারারাত ধরে রিহার্সাল চলেছিল নতুন নাটকের। নাটকের নামও 'রিহার্সাল'। নাট্যকার অয়স্কান্ত বক্সী। তবে এটা মৌলিক নাটক নয়, বিদেশী নাটক, 'He who gets slaped'-এর ছায়া নিয়ে লেখা।

২৮শে মে 'রিহার্সাল'-এর উদ্বোধন রজনী। উৎসাহী নাট্যরসিকদের ভিড়ও হয়েছিল সেদিন। নাটকের প্রথম দিকটা ভালোই জমেছিল, কিন্তু শেষটা তেমন হয়ে ওঠেনি।

মে মাসটা ফুরিয়ে গেল। দিনগুলো কত তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়।

২রা জুন শিলং থেকে আমার পরিবারবর্গ ফিরে এলো। কথা ছিল, আমি ওদের আনতে যাবো। কিন্তু কাজের চাপে আমি যেতে পারবো না—কথাটা ওদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। তাই আমার অপেক্ষায় না থেকে নিজেরাই চলে এসেছে।

৪ঠা জুন ছিল 'রিহার্সাল'-এর তৃতীয় অভিনয় রজনী। ঐদিন দুর্গাদাস অনুপস্থিত। শুনলাম, দুর্গাদাস নতুন কণ্ট্রাক্টের কথা তুলেছে। নতুন কনট্রাক্ট না হলে সে অভিনয় করবে না। রাধানাথবাবু তাকে বলেছেন, এ সম্পর্কে তিনি ভাবছেন, কিন্তু দুর্গা যেন অভিনয় বন্ধ না করে। কিন্তু দুর্গাদাস তার কথা কানে নেয়নি।

'পি-ডবল্যু-ডি'-তে দুর্গা অভিনয় করতো মিঃ সেন চরিত্রে। ঐদিন অনুরোধ এলো, আমি যেন ঐ ভূমিকাটি অভিনয় করি।

আপত্তি জানালাম। দুর্গাদাসের জন্যে ওই চরিত্র—ওটা আমার পক্ষে অভিনয় করা সম্ভব নয়।

শেষটা অনুরোধ এলো নানাদিক থেকে। মঞ্চের সাধারণ কর্মী থেকে আরম্ভ করে সবাই অনুরোধ করলো। শেষটা না করতে পারলাম না।

শচীন সেনগুপ্তের 'ভারতবর্ষ' নাটকটি বেতারে অভিনয় হল ৬ই জুন। নাটকে আমি ছাড়া দুর্গাদাস, সুনীল, সরযূ, ঊষা—এরাও ছিল।

৬ই জুন তারিখের আরো একটি সংবাদ, যে সংবাদটি নাটক বা চলচ্চিত্রের নয়। সংবাদটি নিতান্ত ঘরোয়া—ঐ তারিখেই ভানুর ম্যাট্রিক পরীক্ষার খবর বেরুলো। চারটি সাবজেক্টে লেটার পেয়ে ভানু ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। ভানুর খবর পেয়ে যারপরনাই আনন্দ পেয়েছিলাম। সেদিন বাড়ীতে তো রীতিমতো উৎসবের

সমারোহ। এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমার এক উকিল বন্ধু, যে নাকি আগে-ভাগে পরীক্ষার ফল জানতে পারতো, তাকে ভানুর রোল নম্বর দিয়েছিলাম। প্রথমটা আজ-না-কাল করে শেষটা খবর জানিয়েছিল। বলেছিল, ভানু সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেছে। এই খবরটা আমি শিলং-এ পাঠিয়েছিলাম। ফল হয়েছিল এই, ভানু খবর পেয়ে মন-মরা হয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে সে নাকি ভালো করে কথা বলতো না, বেড়াতো না—দিনরাত বসে থাকতো।

ফল প্রকাশিত হতে বুঝলাম, কেন সে মন-মরা হয়ে থাকতো।

যাইহোক, খবরটা কর্তব্য হিসাবে উকিলবাবুটিকেও জানিয়ে দিয়েছিলাম।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৭ই জুন। 'পি-ডবল্যু-ডি'-র ১৩০তম অভিনয় রজনী। ঐদিন আমি মিঃ সেনের ভূমিকায় অভিনয় করলাম। কেমন হয়েছিল জানি না, তবে আমার অভিনয় দর্শকদের মনে যথেষ্ট রেখাপাত করেছিল। দুর্গাদাসের অভিনয় আমি দেখেছি, আমি কিন্তু নিজস্ব রীতিতে চরিত্রটিকে রূপ দিয়েছিলাম।

এরপর আবার সেই একই দিনের পুনরাবৃত্তি। কখনো 'পি-ডবল্যু-ডি', কখনো 'রিহার্সাল'-এর অভিনয়। নতুন কিছু নেই।

১৯শে জুন তারিখে একটা চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হল, অভিনেতা জ্যোতিপ্রকাশ বিয়ে করেছে শীলা হালদারকে। জ্যোতিপ্রকাশ অল্পদিনেই যথেষ্ট নাম করেছিল। নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার' ছবিতে তার অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকার মত। ঐ ছবিতে আমি তার দাদুর ভূমিকায় ছিলাম। এ ছাড়া 'রাজনর্তকী'তেও জ্যোতিপ্রকাশ সুন্দর অভিনয় করেছিল। তার মত অভিনেতা যে শীলা হালদারকে বিয়ে করবে, এটা ধারণার বাইরে। শীলা ছিল নর্তকী। কখনো কখনো অভিনয় যে করতো না, তা নয়।

অপ্রত্যাশিত হলেও সেদিনের খবর ছিল তাই।

কলকাতা শহরে তখনো ব্ল্যাক-আউট চলছে। সন্ধ্যের পর থেকে মহানগরী একরকম অন্ধকারে ঢাকা থাকে। অনেকদিন থেকে এই অবস্থা চলছিল, কিন্তু এবারে কলকাতার থিয়েটারগুলোয় প্রদর্শনীর সময় পরিবর্তন করা হল। বেলা একটায় ম্যাটিনী শো, আর শেষ প্রদর্শনী শুরু হবে বেলা ৫টায়।

এতো যে নাটক অভিনীত হচ্ছে, তার মধ্যে 'সাজাহান' কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। যখন 'সাজাহান' অভিনীত হচ্ছে, তখনই দর্শকরা সেই আগের মতো আকর্ষণেই ছুটে আসছে।

এরই মধ্যে দুটি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করলো। বড়ুয়া-সরযূ অভিনীত 'মায়ের প্রাণ' মুক্তিলাভ করলো উত্তরায়। ছবির পরিচালক ছিলেন বড়ুয়া সাহেব। আর সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'প্রতিশোধ' মুক্তি পেল রূপবাণী চিত্রগৃহে।

৩০শে জুনের কথা মনে আছে। ঐদিন ভানু প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এস-সি-তে ভর্তি হল। বিষয় হিসাবে বিজ্ঞানটাই তার কাছে প্রিয়।

ঐ ৩০ তারিখেই একটি নতুন নাটক শোনা হল নাট্যভারতীতে। মনোজ বসু তাঁর 'প্লাবন' নাটকখানি নিজেই পড়ে শোনালেন।

নাটকের গল্পটা সবারই ভাল লাগলো। কিন্তু সংলাপবহুল বলে মনে হলো অনেকের। যাইহোক, মোটামুটি যখন ভালই লেগেছে—তখন নাটকের দুর্বল দিকটা পরে ঠিক করে নিলেই চলবে। রিহার্সাল তো চলুক।

কদিন আগে অভিনয়ের সময়সূচীতে যে পরিবর্তন করা হয়েছিল, নতুন করে আবার সময়সূচী বদলানো হল। প্রথম প্রদর্শনী আরম্ভ হবে বেলা দুটোয়, শেষ প্রদর্শনী হবে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়।

'প্লাবন' নাটকের রিহার্সাল শুরু হল ৭ই জুলাই।

ঐ দিনই খবর পেলাম বিশ্বস্তসূত্রে, রঙমহলের নতুন নাটক 'রক্তের ডাক' দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বলা বাহুল্য দুর্গাদাস তখন রঙমহলে যোগ দিয়েছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভাল খবর পেলে মনটা স্বভাবতঃ খুশি হয়। কেননা, আমরা থিয়েটারের মানুষ—জীবনের ভাল-মন্দের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছি নাটক আর মঞ্চকে—সুতরাং ভাল খবর পাওয়ার মধ্যে আনন্দ থাকে বৈকি।

আরো একটি নতুন নাটক, 'কবি কালিদাস'-এর উদ্বোধন হল মিনার্ভায় ১৯শে জুলাই। ঐ দিনই ছিল নাট্যভারতীতে 'পি-ডবল্যু-ডি'-এর ১৪৯তম অভিনয়। রাণীবালা ছুটি নিয়েছিলেন স্বাস্থ্যের কারণে—ঐ দিনের অভিনয়ে তিনি যোগ দিলেন। সাতটায় অভিনয় শুরু হয়েছিল। সেদিন রঙ্গালয় পূর্ণ ছিল প্রায়।

পরদিন ২০শে জুলাই, ১৫০তম অভিনয়। সেদিন দর্শকপূর্ণ ছিল রঙ্গালয়। অভিনয়ও জমেছিল। অভিনয় শুরু হয়েছিল বেলা চারটায়।

অভিনয় শেষে নতুন নাটক 'প্লাবন'-এর রিহার্সাল শুরু হল। রাত তিনটে পর্যন্ত চললো রিহার্সাল। তারপর ফিরে এলাম বাড়ী।

এরপর পর পব তিন রাত 'প্লাবন'-এর রিহার্সাল চললো। কোনদিন রাত তিনটের আগে রিহার্সাল শেষ হত না।

যে-কোনও নতুন নাটক মঞ্চস্থ হবার আগে অভিনেতার মনটা সেই নাটকের

কথাই চিন্তা করে। কী জানি—কেমন হবে নাটক। বিচারটা তো দর্শকসাধারণের। দর্শকের বিচারে উত্তীর্ণ হতে পারাটাই তো আসল কথা।

যাইহোক, ২৪শে জুলাই ছিল 'প্লাবন'-এ উদ্বোধন রজনী। সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হল অভিনয়। তিনঘণ্টা পনরো মিনিটের নাটক।

সেদিনে এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। এর আগে নতুন নাটকের উদ্বোধন রজনীতে দেখেছি দর্শকদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য থাকে, অনেক সময় কিছুটা হৈ-চৈও হয় অভিনয় চলাকালে। প্রশংসা বা নিন্দা—যাই হোক, নানা মন্তব্যও কানে আসে। কিন্তু আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল আমার। সেদিন শান্ত মনে দর্শকরা নাটক দেখলেন। এতটুকু হৈ-চৈ দূরের কথা, কোনও টুকরো মন্তব্যও কানে আসেনি।

প্রশ্ন জাগলো মনে—তবে কি নাটকটা ভালো লেগেছে? হয়তো তাই।

দারুণ দুশ্চিন্তা ছিল নাটক নিয়ে। কী হবে, কে জানে। তাছাড়া নাট্য-ভারতীর ভিতরের অবস্থাও ভালো নয়। রাধানাথবাবু তো একদিন গোপনে আমাকে বলেই বসলেন, দাদা—ভাবছি সবাইকে এক মাসের নোটিশ দেব। এভাবে আর কদিন থিয়েটার চালাবো। হয়তো কোন মতে খরচটা উঠছে—কিন্তু এ অবস্থায় থিয়েটার চালানো কি সম্ভব?

বললাম, অপেক্ষা করে দেখুন। এর মধ্যে নোটিশ দেওয়ার কথা চিন্তা করবেন না। 'প্লাবন'-এর ফলাফলটা একবার দেখা দরকার।

চিন্তাটা কেবল রাধানাথবাবুর নয়, আমারও। হয়তো অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মনেও এই একই চিন্তা। থিয়েটারের ভিতরের খবর তো আমরা জানি, নাটক যদি চলে তাহলে অর্থ যেমন আসে, না চললে সে অবস্থাটা ভাবাই যায় না। একটা থিয়েটার আর্থিক অনটনে বন্ধ হয়ে গেলে, দুঃখটা যে কোথায় বাজে তা বোঝানো যায় না।

যাই হোক, 'প্লাবন' আমাদের সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটালো।

'প্লাবন' দর্শকের বিচারে উত্তীর্ণ হল। দারুণ সুখ্যাতি পেল। সুতরাং আপাততঃ দুশ্চিন্তার শেষ।

'প্লাবন' অভিনীত হতে লাগলো পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। ২৫শে থেকে ২৭শে জুলাই পর পর তিনদিন প্লাবন অভিনীত হল। প্রতিদিনই আশাতীত দর্শকসমাগম হয়েছে। আর নাটক এবং অভিনয়ের উদ্দেশে বর্ষিত হয়েছে সাধুবাদ।

২২শে শ্রাবণ, ইংরেজী ৭ই আগস্ট, দিনটি শুধু বাংলাদেশ এবং বাঙালী জাতির নয়, সারা বিশ্বের কাছে বিয়োগ-ব্যথায় চিহ্নিত দিন। ঐদিন কবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ—এ খবর কদিন আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু মৃত্যু-সংবাদটা সব সময়ে আকস্মিক। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের সময় দুপুর ১২টা বেজে ১০ মিনিট।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহানগরীর জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হল অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ। বন্ধ হল থিয়েটার, সিনেমা।

রবীন্দ্রনাথকে শেষ দর্শনের উদ্দেশ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ঐদিন কলকাতা শহর ভেঙে পড়েছিল। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন এর আগে রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবি তুলেছিল। ৮ই আগস্ট সেইসব টুকরো ছবিকে একসঙ্গে গ্রথিত করে ধারাবিবরণী যোগ করা হল। ধারাবিবরণীতে আমিই কণ্ঠ দিয়েছিলাম।

এরই মধ্যে আর একটি ঘটনা। পেট্রল র‍্যাশনিং। ১৫ই আগস্ট থেকে পেট্রল র‍্যাশনিং শুরু হয়।

এদিকে শনি-রবিবারে যথারীতি 'প্লাবন' অভিনীত হচ্ছে নাট্যনিকেতনে। অন্যান্য দিনে বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে।

১৭ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথের তর্পণ দিবস। ঐদিন রঙমহলে এবং নাট্যনিকেতনে অভিনয়ের পূর্বে কবিগুরুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হল।

১৭ই আগস্ট শ্রী ও পূরবী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করলো ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'অবতার' ছবিখানি। ঐ ছবিতে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

ঐদিনেই আই-এফ-এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হল। মহমেডান স্পোর্টিং ২ গোলে বিজয়ী হয়েছে। প্রতিপক্ষ কে. ও. এস. ডি. কোন গোল করতে পারেনি।

২০শে আগস্টের একটি ঘটনা। 'তটিনীর বিচার' অভিনীত হচ্ছে নাট্যভারতীতে। অভিনয় দেখতে এসেছে দুর্গাদাস। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সে টিকিট কেটে এসেছে সাধারণ দর্শক হিসাবে। কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে দুর্গাদাসের কাছে গেল তার টাকা ফেরত দিতে। কিন্তু দুর্গাদাস জানালো, সে-তো স্ব-পরিচয়ে এখানে আসেনি, এসেছে সাধারণ দর্শক হিসাবে।

দুর্গাদাস কিছু সময় দর্শকদের মধ্যে বসে থেকে অভিনয় দেখলো, তারপর খেয়াল ফুরোতেই চলে গেল।

অভিনয় আর অভিনয়, এর মধ্যে মাঝে মাঝে বৈষয়িক ব্যাপারেও জড়াতে হয়। গ্রে স্ট্রীটে খানিকটা বসতবাড়ীর জমি সেদিন রেজেস্ট্রি করা হল হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাছ থেকে। রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ছিল ২৭শে আগস্ট।

২৯শে আগস্ট বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব লোকান্তর গমন করলেন। পরিচিত কারো মৃত্যু-সংবাদ পেলে মনটা খারাপ হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে আবার সবই স্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যায়।

আগস্ট মাসটা শেষ হয়ে গেল।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন, নাট্যভারতীতে মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটকের রিহার্সাল শুরু হল।

নতুন নাটক, বিষয়-বৈচিত্র্যও আছে। তাছাড়া নাটকে আমার ভূমিকাটিও বেশ মনের মত। অনেকদিন পর একটি ঘটনাবহুল নাটক পাওয়া গেল। তবে নাটকখানি রিহার্সালে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিবর্তন করা হয়েছিল।

এর পর বেশ কয়েকটা দিন কাটলো। প্রতিদিনই যেন একই দিনের পুনরাবৃত্তি।

এর মধ্যে একটি নতুন খবর হল ১৮ই আগস্ট তারিখে স্টার থিয়েটারে 'মদনমোহন'-এর উদ্বোধন।

এদিকে ১৯ তারিখে নাট্যভারতীর স্টেজ নিয়ে একটা ঝামেলা হল নাস্থবাবুর সঙ্গে। 'কঙ্কাবতীর ঘাট'-এর দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে আমি নিজে কয়েকটা স্কেচ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু বাদ সাধলো নাস্থবাবু। তার কথা, আমার পরিকল্পনা মত দৃশ্যপট তৈরি করা অসম্ভব।

কিন্তু আমি তা মানতে রাজী নই। অগত্যা মহেন্দ্র গুপ্তকে বললাম, স্টারের পটলবাবুকে যদি পাওয়া যায়, তবে সে নিশ্চয়ই পারবে এই দৃশ্যপটের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে।

মহেন্দ্রবাবু আমার কথামতো স্টারে সলিলবাবুর কাছে গেলেন পটলবাবুর ব্যাপারে অনুরোধ করতে। স্টার কর্তৃপক্ষ রাজী হলেন। পটলবাবু 'কঙ্কাবতীর ঘাট'-এর দৃশ্যসজ্জার দায়িত্ব নিলেন।

তবে একটা কথা দিতে হল, নাট্যভারতী যেন পটলবাবুর নাম ব্যবহার না করে। পটলবাবুর ভালো নাম পরেশ বোস। বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর নাম নাট্যভারতী ব্যবহার করেনি, দিয়েছিল বোস স্টুডিও-র নাম।

যাইহোক, আপাততঃ একটা ঝামেলা চুকলো।

কিন্তু সহজ পথ ধরে কি সব চলে? ২০শে আগস্ট রিহার্সাল চলছিল 'কঙ্কাবতীর ঘাট'-এর। দীর্ঘ সময় ধরে রিহার্সাল। কিন্তু শিল্পীগোষ্ঠীদের মধ্যে কেমন যেন শিথিলতা। যে শৈথিল্য নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর। বিশেষ করে নাটকের উদ্বোধন রজনী আসন্ন

—এবং যে নাটক নিয়ে অনেক প্রত্যাশা, সে নাটকের শুরুতে যদি এমন শিথিলতা দেখা যায়, তাহলে ভাববার কারণ বৈকি !

'কঙ্কাবতীর ঘাট'-এর উদ্বোধনের দিনটি এগিয়ে এলো। ২৫শে আগস্ট নাট্য-ভারতীর পাদ-প্রদীপের আলোয় এল মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট'। দিনটা ছিল মহাপূজার আগের দিন। দুর্গাপঞ্চমী।

সার্থক নাটক, সার্থক অভিনয়। 'কঙ্কাবতীর ঘাট'-এর ওপর আমার আশা অনেক।

২৬ তারিখে ছিল দেবীর বোধন। ঐ শুভদিনটি নাট্য-প্রযোজক প্রবোধ গুহের কাছে নিয়ে এলো অশুভ বার্তা। নাট্যনিকেতন থেকে তাঁকে উচ্ছেদ করা হল ঐ দিনেই।

২৭শে আগস্ট, মহাসপ্তমী। ঐদিন ছিল 'প্লাবন'-এর একুশতম রজনীর অভিনয়।

এ-ছাড়া রাধু লাহার বাড়ীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে নাটকাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে। সপ্তমীর রাত্রের নাটক ছিল 'সাজাহান' এবং 'সুদামা'।

'প্লাবন' অভিনয় শেষে আমরা রাধু লাহার বাড়ীতে গেলাম।

সপ্তমীর দিনে হরি ভঞ্জ পরিচালিত ইন্দ্র মুভিটোনের ছবি 'শ্রীরাধা' মুক্তিলাভ করলো।

মহাষ্টমীতে ছিল কঙ্কাবতীর ঘাটের দ্বিতীয় অভিনয় রজনী। ঐদিন প্লাবন অভিনীত হয়েছিল দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে। রাধু লাহার বাড়ীতে ঐ রাত্রের নাটক ছিল 'পি-ডবল্যু-ডি' এবং 'চৈতন্যলীলা'।

মহানবমীতে 'কঙ্কাবতীর ঘাট'-এর তৃতীয় রজনী। প্রেক্ষাগৃহ সেদিন ছিল পূর্ণ। দর্শকরা উচ্ছ্বসিত করতালিতে অভিনন্দিত করলো 'কঙ্কাবতীর ঘাট'-কে।

'কঙ্কাবতীর ঘাট' অভিনয় শেষে লাহাবাড়ীতে যেতে হবে। সেখানে আজকের নাটক 'পি-ডবল্যু-ডি' আর 'মধুমালা'।

পূজার পালা চুকলো।

বিজয়াদশমীর সানাই বাজলো মহানগরীর পূজামণ্ডপে।

বিজয়াদশমীর দিনটি বড়ো আনন্দের। ঐদিন প্রতিমা বিসর্জন শেষে প্রিয়-পরিজনদের মিলিত হওয়া—শুভেচ্ছা বিনিময়, এর মধ্যে যেন একটা আনন্দের সুর জড়িয়ে থাকে।

মাসগুলো কতো সহজে হারিয়ে যায়। সেপ্টেম্বর মাসটা ফুরিয়ে গেল।

অক্টোবর ৩ তারিখ—ঐদিনেই গ্রে স্ট্রীটের বাড়ীর ভিত্তি স্থাপনা করা হল।

দুঃসংবাদ আসে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে।

৮ই অক্টোবর খবর পেলাম, আর্য থিয়েটারের ডিরেক্টর-চেয়ারম্যান অ্যাটর্নী সতীন সেন গিরিডিতে মারা গেছেন।

কিন্তু অভিনেতার জীবনে শোকপ্রকাশের অবসর কই! নিজেরা আনন্দ পাই না-পাই, আনন্দের সুধাভাণ্ড তো আমাদের কাছে। রঙ্গমঞ্চে সে ভাণ্ড উজাড় করে দিতে হয়।

রেভারেণ্ড সুধীর চাটার্জী, মোহনবাগানের নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়, ছিলেন আমার শিক্ষক। তিনি ৮ই অক্টোবর নাট্যভারতীতে 'প্লাবন' দেখতে এলেন সপরিবারে।

অভিনয় শেষে ওঁরা ঘূর্ণ্যমান মঞ্চব্যবস্থাও দেখে গেলেন উৎসাহ নিয়ে।

অক্টোবরের ৮ তারিখেই শৈলজানন্দ পরিচালিত কে. বি. পিকচার্সের 'নন্দিনী' মুক্তিলাভ করলো রূপবাণীতে। নন্দিনীতে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

'কঙ্কাবতীর ঘাট' চলছে দর্শক এবং সুধীজনের আশীর্বাদ নিয়ে। দর্শকদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন আর প্রশংসা—নাটকের শিল্পীদের মনে নতুন উৎসাহের জোয়ার এনে দিয়েছে। আমাদের মধ্যে যেটুকু ভুল-বোঝাবুঝি ছিল, তাও নিঃশেষে ধুয়ে-মুছে গেছে।

অথচ, এই নাটক নিয়ে কারো সমর্থন আগে পাইনি, কিন্তু অভিনয়ের সাফল্যে তা পেলাম। এই সময় একটি কথাই মনে হয়েছিল—Nothing succeeds like success.

নাম ছিল তার 'বিউটি।' শুধু আমার নয়, সে ছিল আমাদের পরিবারের সবার প্রিয়। সেই 'বিউটি' মারা গেল ১০ই অক্টোবর।

'বিউটি'-র নামেই তার পরিচয়। পাঁচ বছর ধরে সে আমাদের ঘরে ছিল। এ-ঘর থেকে সে-ঘরে, ঘর থেকে ছাদে ছুটে বেড়াতো খেয়াল-খুশিতে। আদর করলে বুকের কাছে উঠতো, ধমক দিলে অভিমান করে চুপটি করে বসে থাকতো—সেই বিউটি মারা গেল।

কদিন থেকে বিউটির শরীর ভালো ছিল না। কিন্তু কী যে হয়েছে কেউ-ই ধরতে পারে না। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হল সেদিন। ডাক্তার দেখেশুনে ব্যবস্থা দিলেন।

রিক্শা করে 'বিউটি' আসছিল ডাক্তারের কাছ থেকে। কালীঘাট ব্রীজের কাছে

এসে ও রিক্‌শা থেকে লাফিয়ে পড়লো। ছুটে এলো গোপালনগরের মোড় পর্যন্ত। ওখানেই ওকে ধরে ফেললো গোকুল।

তারপর সঙ্গে করে বাড়ীতে নিয়ে এলো।

কিন্তু বাড়ীতে এসেই যেন কী হল বিউটির, সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে গেল ওপরে, চারতলার সিঁড়ির ওপরে চাতালে শুয়ে পড়লো। সুধীরার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো বিউটি। কী যেন দেখতে লাগলো। সবাই অবাক হয়ে গেছে সেই মুহূর্তে বিউটিকে দেখে।

আরো অবাক করে গেল সে যখন সুধীরার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

বিউটি ছিল আমাদের পরিবারের আদরের কুকুর।

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললাম, বিউটিকে যেন ডাস্টবিনে ফেলে দিও না। ওকে এই বাড়ীর মাটির নীচে কবর দিও।

কিন্তু কে যেন বললে, ওকে গঙ্গায ভাসিয়ে দাও। তাই হল।

প্রথমেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'উত্তরায়ণ' ছবিটি মুক্তি পেল ২১শে নভেম্বর উত্তরা এবং পূরবীতে। আমিও ঐ ছবিতে অভিনয় করেছিলাম।

২৮ তারিখে নাট্যনিকেতন নামটা মুছে গেল। শিশির ভাদুড়ী তার নতুন নামকরণ করলেন শ্রীরঙ্গম! নতুন শিল্পীদের নিয়ে 'জীবন রঙ্গ' নাটক উদ্বোধন হল শ্রীরঙ্গমে।

নাট্যনিকেতন নামটা তখন ইতিহাসের পাতায়। তার জায়গায় নতুন নাম —শ্রীরঙ্গম।

নাট্যজগতে এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়।

ডিসেম্বরের ৮ তারিখটি কালো অক্ষরে লেখা থাকবে। ঐদিন জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করলো বৃটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

১২ই ডিসেম্বর অভিনয়জগতেও একটি দুঃসংবাদ—গতকাল অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর বাম অঙ্গ পঙ্গু হয়ে গেছে।

প্রিয় অভিনেতার এই অসুস্থতার সংবাদটা নাট্যজগতের সকলের মনের ওপর রেখাপাত করলো। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম মনোরঞ্জনবাবু যেন সুস্থ হয়ে ওঠেন।

অভিনয়জগতে মনোরঞ্জনবাবুর মতো মানুষ হয় না। মনোরঞ্জনবাবু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে, আবার অভিনয় করতে আরম্ভ করলেন।

বেশ কিছুদিন থেকে কলকাতা শহরের মানুষদের মনে একটা দুঃস্বপ্ন জড়িয়ে ছিল। সে দুঃস্বপ্নের কালো ছায়াটা এবার শহরবাসীকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরলো।

জাপান বার্মা দখল করেছে—শুধু কলকাতা শহরবাসী নয়, প্রতিটি ভারতীয়ের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

শহরবাসীদের মনে ভয়টা আরো বেশি। কারণ সবাই জানে যুদ্ধের প্রথম লক্ষ্য-স্থল গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি। তারপর ইংরেজ যখন শত্রুপক্ষ, তখন ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের ওপর আক্রমণ ঘটাও নতুন কিছু নয়।

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন-জড়ানো দিনটি ছিল ডিসেম্বরের ১৫ তারিখটি।

এরই মধ্যে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হয়ে প্রকাশিত হল থাইল্যাণ্ডের দরিয়ায় 'এ. এম. এস. প্রিন্স অফ ওয়েলস্' এবং 'রিপাল্স'-এর ভরাডুবি। জাপানীরা জাহাজ দু'টির উপরে উড়ে এসে সরাসরি বোমা বর্ষণ করে। জাপানী 'সুইসাইড স্কোয়াডের' যুদ্ধরীতি ছিল এমনই।

শুধু একটা দিন, ১৬ই ডিসেম্বর শহরবাসীর আতঙ্ক যেন চরমে পৌঁছলো। শুরু হল শহরত্যাগের ধুম। কলকাতা শহর ছেড়ে মানুষ পাগলের মতো ছুটছে, শহর থেকে দূরে—যেখানে যুদ্ধেব উত্তাপ সহজে পৌঁছবে না।

যুদ্ধের আতঙ্ক যে থিয়েটারগুলোর কতো ক্ষতি করেছিল, তা ভাবা যায় না। শহরবাসী ছুটছে প্রাণের তাগিদে, সেখানে আনন্দ-উৎসবের অবসর কোথায়?

এতোর মধ্যেও রঙমহলে 'রক্তের ডাক'-এর জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হল ২১শে ডিসেম্বর।

প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা না-দেখা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি কোন্‌দিকে যাচ্ছে, জানতে আগ্রহ।

২৩শে ডিসেম্বর প্রভাতী সংবাদপত্রের শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে, জাপানীরা ব্যাপক বোমাবর্ষণ করেছে রেঙ্গুন শহরে।

ওদিকে যুদ্ধের বিভীষিকা, সেইসঙ্গে ভারত জুড়ে এক রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার পূর্বলক্ষণ সূচিত হচ্ছে।

২৪শে ডিসেম্বর সারা ভারত হিন্দুমহাসভার সভাপতি বীর সাভারকর ভাগলপুরের পথে মুঙ্গেরে গ্রেপ্তার হলেন। বিহার সরকার সে সময়ে নিরাপত্তার তাগিদে হিন্দু-মহাসভা নিষিদ্ধ করেছিলেন।

সাভারকর মহাসভার সম্মেলন উপলক্ষে ভাগলপুর আসছিলেন।

২৫ তারিখের খবর—হংকং-এর পতন। সেই সঙ্গে আরও একটি সংবাদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে ভাগলপুরের পথে।

এদিকে থিয়েটার মহলেও নানা দুশ্চিন্তা। এই অবস্থায় কি করে থিয়েটার চলবে! থিয়েটার যদিও বন্ধ হয়নি, কিন্তু এভাবে লোকসান সহ্য করে আর কতোদিন?

রাধানাথ মল্লিককে দস্তুরমতো চিন্তিত দেখলাম। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে, যেদিন সকালেই খবরের কাগজের পাতায় পড়েছি রেঙ্গুন শহরে জাপানী বোমার শিকার হয়েছে ছয় শতেরও অধিক নিরীহ নাগরিক, সেদিনেই রাধানাথকে বলতে শুনলাম—এই তো অবস্থা। আমি ভাবছি থিয়েটার কি করে চলবে। অন্য খরচের কথা থাক, মূলজীর বাড়ীভাড়াই বা দেব কোত্থেকে?

চিন্তাটা একা রাধানাথের নয়, আমাদেরও।

দিনটা ছিল বৎসরের শেষদিন। আনন্দের কি দুঃখের জানি না—তবে আমার কাছে বৎসরটা শেষ হল ভয়ানক দুঃস্বপ্নের মধ্যে।

পরদিন।

১৯৪২-এর প্রথম দিন। রবীন্দ্রনাথের একটি লাইন মনে পড়ে ঐদিনটির কথা স্মরণ করলে।

'নববর্ষ' এলো আজি দুর্যোগের
ঘন অন্ধকারে'

তবুও দিন আসে প্রতিদিনের নিয়মে।

শিলং থেকে ডাঃ চক্রবর্তী এসেছেন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে। সেই সঙ্গে আমাদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ করে যেতে চান। শুনলাম, উনি যুদ্ধে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে নামেরও তালিকাভুক্তি হয়েছে।

যুদ্ধের ভয়ে মানুষ পালাচ্ছে, আর সেই সময় একজন পরিচিত মানুষ যুদ্ধে যাচ্ছে —শুনে কিছুটা বিস্মিত হলাম।

নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে ছিল 'কঙ্কাবতীর ঘাট'-এর ৪৩ ও ৪৪তম অভিনয়।

যথারীতি অভিনয় হল। অন্যান্য বছর ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনটিতে রঙ্গমঞ্চে তিল ধারণের জায়গা থাকে না, আর এ বছর প্রথম দিনেতে দর্শকসংখ্যা যারপরনাই সীমিত। এভাবে নাটক আর কদিন চলবে?

মনটা আরো খারাপ হল, যখন রাধানাথবাবু এসে জানালেন থিয়েটারের দুরবস্থার কথা। বাড়ীভাড়া বাকি, তারপর থিয়েটারের এই রকম অবস্থা! কি করে

যে চলবে। কথা প্রসঙ্গে বললেন, ভাবছি, এবারে আর্টিস্টদের দক্ষিণা কমাতে হবে; নইলে চালাতে পারবো না।

রাধানাথবাবু আমাকে ভাবিয়ে তুললেন। বললাম, সাধারণ আর্টিস্টরা কি-ই বা বেতন পান। তাঁদের বেতন নাই বা কমালেন। তার চেয়ে আমার দক্ষিণা বরং কমিয়ে দিন।

রাধানাথবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললাম, আমি তো সুসময়ে থিয়েটার থেকে অনেক পেয়েছি। আমার দৈনিক পাওনার হিসাবের অঙ্ক যদি কিছু কমালে থিয়েটার চলে, তা হলে চলুক। আমার পাওনার অঙ্ক কমলে তেমন অসুবিধে হবে না; কিন্তু সাধারণ কর্মী এবং শিল্পীদের কম দিলে ওদের চলবে না।

রাধানাথবাবু তবু বললেন, ভাবছি বেতনের তিন ভাগের একভাগ কমাবো।

বললাম, তবে একবার বলে দেখুন।

রাধানাথবাবু কথাটা বললেনও। কিন্তু কর্মী বা শিল্পী কেউই রাজী হল না।

এর পরেই রাধানাথবাবু মুলজীবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন। কী কথা হল, জানি না। তবে মুলজী সিক্কা নিজেই এলেন।

রাধানাথবাবু তাঁর কথা জানালেন। কিন্তু সব শোনার পরেও মুলজীবাবু বললেন, আমি এভাবে ক্ষতি সহ্য করতে পারছি না। বারজোরজী ম্যাডানের সঙ্গে আমি একটা বন্দোবস্ত করেছি। তিনি বলেছেন, রীতেন কোম্পানীকে ভাড়া দেবেন। তাছাড়া রীতেন কোম্পানীর হয়ে গ্যারাণ্টার হবেন সুখলাল কারনানী।

জিজ্ঞাসা করলাম, রীতেন কোম্পানী কি করবে হাউস নিয়ে? থিয়েটার, না সিনেমা!

—না, তাঁরা থিয়েটারই করবেন। মুলজী বললেন, আরো একবার বুঝিয়ে বললাম, মুলজীবাবু—একটু ভেবে দেখুন, একজন থাকতে আর একজনকে হাউসটা দেওয়া কি ঠিক হবে! তাছাড়া এইরকম একটা সময়—সেটাও তো একবার ভাববেন?

মুলজীবাবু কী ভাবলেন, জানি না। যাবার সময়ে বলে গেলেন, আমি যেন কাল একবার তাঁর বাড়ীতে যাই দেখা করতে। সেখানেই কথাবার্তা হবে।

বলে মুলজীবাবু বিদায় নিলেন।

যাই হোক, তারপরেও খানিক সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম, নাট্যভারতীর কথা। ভাবতে মনটা খারাপ হল। কত উৎসাহ নিয়ে নাট্যভারতী চলছে—এই থিয়েটারে রাধানাথবাবুরও অবদান কম নয়—শেষটা থিয়েটারটা অর্থাভাবে হাতছাড়া হয়ে যাবে?

চিন্তা-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে থিয়েটার থেকে বাড়ী ফিরছি।

ব্ল্যাক-আউটের রাত। কালো ঠুসি লাগাতে ল্যাম্পপোস্টের বাল্বগুলো যেন অন্ধকারকে বিদ্রূপ করছে।

রাতের অন্ধকারে বাড়ী ফিরছি। ফিরতি-পথে বার বার মনে হল, আজ নতুন বছরের প্রথম দিন। কিন্তু কোথায় নতুন উৎসাহ! সব কিছু যেন স্তিমিত আর নিস্প্রভ হয়ে গেছে।

পরদিন। ২রা জানুয়ারী। সকালে ডাঃ এস. কে. চক্রবর্তী এলেন গোপালনগরের বাড়ীতে। সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলেন। বার বার তাঁর কথার মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ফুটলো, তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন।

যুদ্ধের কথায় মনে পড়ে ঐদিনই ম্যানিলার পতন হয়েছিল।

মুলজীবাবু আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন, দেখাও করেছি।

মুলজী আমাকে সাদরেই গ্রহণ করলেন।

বললাম, এটা কি করলেন মুলজীবাবু, পাঁচ হাজার টাকায় স্টেজ বিকিয়ে দিলেন। যার রিভলবিং স্টেজের দাম দশ হাজারেরও বেশি। তাছাড়া অমন নতুন সাজ-পোশাক, তাও ছেড়ে দিলেন ঐ টাকার মধ্যে। তাছাড়া টাকাও তো পাননি মুরলীবাবুর কাছ থেকে। কারনানী গ্যারাণ্টার হয়েছে এই পযন্ত। রাধানাথবাবুর কাছ থেকে এভাবে স্টেজটা না নিলেই ভাল করতেন।

উত্তরে মুলজীবাবু বললেন, ক্রেতা কোথায় পাব! তাই দিয়ে দিলাম।

বললাম, তবুও একটু ভেবে দেখলে পারতেন।

মুলজীবাবু আচমকা এধরনের প্রস্তাব করবেন, এটা ভাবিনি। বললেন, বেশ তো আপনিই নিন না নগদ টাকা দিয়ে। একবারে না পারেন, না হয় দুটো ইন্স্টলমেণ্টে দেবেন। কী, রাজী আছেন? আপনি নিলে কোন গ্যারাণ্টার লাগবে না।

বললাম, আপনার কথাটা শুনতে খুবই ভাল লাগলো। কিন্তু আপনার প্রস্তাব মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শুনে মুলজীবাবু একটু হাসলেন।

সত্যি, এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। আমি অভিনেতা, সাজ-পোশাক পরে রং মেখে অভিনয় করাই আমার ধর্ম। কোন ব্যবসাগত ব্যাপারে আমার জড়ানো অসম্ভব। অভিনয় করবো, না ব্যবসা দেখবো! সুতরাং মুলজীবাবুর প্রস্তাবে আমার রাজী হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়।

ফিরে এসে রতীনকে বললাম মুলজীবাবুর কথা।

রতীন শুনে বললে, সেকি—আপনি রাজী হলেন না কেন ?

—আমার পক্ষে এ কি সম্ভব !

—আপনি নিজের কথা ভাবছেন কেন, আমরা সবাই মিলে চাঁদা করে টাকা সংগ্রহ করতাম—আমরাই চালাতাম থিয়েটার।

—সবই তো বুঝলাম। কিন্তু অভিনয় করবে, না ব্যবসা দেখবে। তাহলে সব ছেড়েছুড়ে বুকিং-এ বসতে হয়। পারবে অভিনয় ছাড়তে ? যা তুমিও পারবে না, আমিও পারবো না—তার মধ্যে যাওয়া কেন ?

অগত্যা রতীন চুপ করলো।

যাই হোক, কাজ কারো অপেক্ষা করে না। ঐদিনও 'মীনাক্ষী' ছবির স্যুটিং-এ নিউ থিয়েটার্স গিয়েছি। স্যুটিং চলছে। ওখানেই তুলসী চক্রবর্তীর মুখে শুনলাম, রীতেন কোম্পানী নাট্যভারতীর দখল নিয়েছে।

কথাটা শোনার কিছুক্ষণ বাদেই নাট্যভারতী থেকে রতীনের ফোন পেলাম। রতীন বললে, মুরলীবাবু এসেছেন সতু সেনকে সঙ্গে নিয়ে নাট্যভারতীর দখল নিতে। আমি এখন কি করবো ?

বললাম, তুমি আমি কি করতে পারি এ অবস্থায়। কিছুই করার নেই।

ফোন ছেড়ে দিলাম তখনকার মত।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় স্টুডিওতে আবার রতীনের ফোন এল। এবারে নতুন কথা বললে। বললে, মুরলীবাবু বলছেন, শিল্পীদের বেতন কিছু কমাতে হবে। আমি তাঁকে কি বলতে পারি, বলুন। না পেরে, আমি বলেছি আপনার কথা। বলেছি, অহীনবাবু যা বলবেন, তাই হবে।

ফোনে বেশি কথা সম্ভব নয়। তবুও বললাম, ঠিক আছে আপাতত রাজী হয়ে যাও। আসছে শনি, রবিবারের অভিনয় তো হোক, তারপর ফলাফল দেখে যা হোক কিছু ভাবা যাবে। এখন সাময়িকভাবে রাজী হওয়া ছাড়া উপায় কি বল। তারপর আমরা আলোচনা করে যাহোক একটা ঠিক করবো।

বলে ফোন ছেড়ে দিলাম।

এদিকে নাট্যভারতী রাধানাথবাবুর হাত থেকে মুরলী চাটুজ্যের হাতে গেছে।

নাট্যভারতীর চলতি নাটক 'কঙ্কাবতীর ঘাট'। ৪ঠা জানুয়ারীর অভিনয় ছিল ৪৬ আর ৪৭তম অভিনয়।

যথারীতি অভিনয় হল। অভিনয় শেষে মুরলীবাবুর কাছে জানানো হল,

পঞ্চাশতম অভিনয় রজনী আসন্ন; ঐদিনে জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার।

মুরলীবাবু আপত্তি করলেন। এ-সময়ে ওসব উৎসব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

নাট্যজগতেরও যেমন খবর আছে, তেমনি প্রতিটি খবরের ওপর এখন যুদ্ধের খবর। ৪ঠা জানুয়ারীর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে রেঙ্গুন শহরে প্রচণ্ড বোমা বর্ষিত হয়েছে।

যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সবাই ওয়াকিবহাল থাকতে চায়। তাছাড়া যুদ্ধের বিভীষিকা যেভাবে ভারতের মাটির দিকে এগিয়ে আসছে—সেটাও মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে।

এদিকে কলকাতা শহরবাসীদের মনের ওপর আতঙ্কের ছায়াটা আরো জড়িয়ে বসেছে। এ আতঙ্ক যাবার নয়। প্রতিদিন হাজার হাজার নর-নারী শহর ছেড়ে চলেছে। যারা জীবনে কখনো শহর ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে পারেনি, তারাও চলেছে দূরের কোন গ্রামে—সেখানে কোন আত্মীয় কিম্বা বন্ধুর ঠিকানা জানা আছে।

স্টুডিও থেকে বাড়ী ফিরেছি। কিন্তু বাড়ী ফিরেও স্বস্তি নেই। নাট্যভারতীর সমস্যার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। এতগুলো কর্মী, অভিনেতা—সবাই আমার মুখ চেয়ে আছে—এইটাই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা। সবাই ভাবনা-চিন্তার দায় এড়িয়ে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

হঠাৎ রঙমহল বন্ধ হবে, একথাটা কেউই ভাবতে পারেনি। অথচ ৩রা জানুয়ারীতে বন্ধ হল রঙমহল। এতদিন যামিনী মিত্র, দুর্গাদাস রঙমহল চালাচ্ছিল 'রক্তের ডাক' নাটক নিয়ে। কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল।

মিনার্ভার ভূতপূর্ব অভিনেতা শরৎ চাটুজ্যে বর্তমানে স্টারের শিল্পীগোষ্ঠীর একজন। ৫ তারিখে শুনলাম, যামিনী মিত্র, দুর্গাদাসের পর সে-ই রঙমহল হাতে নিয়েছে। ভাল-মন্দ জানি না, তবে খবরটা এই।

এদিকে মুরলীবাবুর হাতে আসার পরেও নাট্যভারতীতে প্রতি শনিবার-রবিবার 'কঙ্কাবতীর ঘাট' অভিনীত হচ্ছে। অবশ্য দর্শক সমাগম মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। তবুও একরকম চলছে।

জানুয়ারীর প্রতিটি দিন যুদ্ধের স্মৃতি-চিহ্নে ভরা। প্রতিদিনের সংবাদপত্রের ভাষা যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে আসছে। আর প্রতিদিন কলকাতার ভয়-পাওয়া মানুষেরা দল বেঁধে চলেছে শহরের বাইরে।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, এই ভয়-পাওয়া-মানুষের চেহারা। কতদিন রাত্রে থিয়েটার সেরে ফিরে আসতে অন্ধকার রাজপথে দেখেছি এই সব ভীত নর-নারীর

মৌন মিছিল। দেখেছি, তারা ছায়ার মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে হাওড়া কিম্বা শিয়ালদা স্টেশনের দিকে। আরো দেখেছি, কত নর-নারী যারা ইট-কাঠের শহরে নানা আরামের মধ্যে দিন কাটায়, তারাও এই দারুণ শীতের মধ্যে একটু আশ্রয়ের সন্ধানে গেছে পল্লীবাংলার কোন গণ্ডগ্রামে। আশ্রয় না পেয়ে গোটা সংসার নিয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে দিন কাটাচ্ছে। এমনও দেখেছি, বাঁচার তাগিদে যারা গেছে, তারা শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারেনি। তবুও বাঁচার তাগিদে পালিয়ে যাবার নেশা —শহরবাসীকে যেন ব্যাধির মত পেয়ে বসেছে।

'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ, তবু রঙ্গে ভরা'—এত'র মধ্যেও নাটক চলছে, থিয়েটার চলছে। ভিড় করে না এলেও নাটক দেখতে আসছে মানুষ। নতুন নাটকও উদ্বোধন হচ্ছে কোন কোন মঞ্চে।

২৪শে জানুয়ারী স্টার থিয়েটারে উদ্বোধন হল মহেন্দ্র গুপ্তের নতুন ঐতিহাসিক নাটক 'রাণী ভবানী'। দুর্গাদাস মিনার্ভায় যোগ দিয়েছে এটা ২৮শে জানুয়ারীর খবর।

শান্তি গুপ্তাও মিনার্ভায় যোগ দিল ২৯শে জানুয়ারী।

'কঙ্কাবতীর ঘাট'-এর হীরক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হল ১লা ফেব্রুয়ারী। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন খ্যাতনামা শিল্পসমালোচক ও. সি. গাঙ্গুলী।

সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক শিল্পীকে নাটক এবং থিয়েটারের নামাঙ্কিত রৌপ্য-পদক উপহার দেওয়া হল।

৯ই জানুয়ারী আবার নাট্যভারতীর কলকাতার বাইরে যাবার পালা। যশোহরে বি. সরকার মেমোরিয়াল হলে চারদিনব্যাপী নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে।

প্রথম রাতের নাটক 'পি-ডবল্যু-ডি'। অভিনয় মন্দ হয়নি।

দ্বিতীয় রজনীর নাটক শচীন সেনগুপ্তের 'সংগ্রাম ও শান্তি'।

'কঙ্কাবতীর ঘাট' অভিনীত হল তৃতীয় রজনীতে। এ রাতে আশাতিরিক্ত দর্শক সমাগম হয়।

শেষ রজনীর নাটক 'সাজাহান'। এদিনেও অজস্র দর্শক-পরিপূর্ণ ছিল হলঘর। তারপর উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনও পাওয়া গেল।

স্থানীয় দর্শকরা প্রতিটি রাতের অভিনয়ে মুগ্ধ হলেও 'সাজাহান' এবং 'সংগ্রাম ও শান্তি' তাদের বেশী আনন্দ দিয়েছিল।

চতুর্থ রজনীর অভিনয়শেষেই রাতের ট্রেনেই যশোহর থেকে কলকাতায় পাড়ি দেওয়া।

৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী—এ ক'দিন আমরা নাট্যভারতী গোষ্ঠী

যশোহরে ছিলাম। ঐ ১২ তারিখেই বঙমহলে উদ্বোধন হয়েছিল নতুন নাটক 'জীবনপথে'। শিল্পী তালিকায় শরৎ, ভূমেন, জহব গাঙ্গুলী, রবি বায ছাডাও অনেকে ছিলেন।

১৩ই ফেব্রুয়াবী শিববাত্রি। ঐদিন নাট্যভাবতীতে সাবাবাত্রব্যাপী নাটকাভিনয়েব ব্যবস্থা। নাটক তালিকায আছে 'শিবরাত্রি', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'পি-ডবল্যু-ডি', 'সুদামা,' এবং 'বাতকানা'।

অভিনেতাব জীবনে বোধহয ক্লান্তি নেই। বাতেব পব বাত অভিনয আর অভিনয়—তাবই মধ্যে কত চবিত্রেব মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া, কত কল্পিত চবিত্রের সুখ-দুঃখটাকে নিজেব মধ্যে টেনে নেওয়া। নাটকেব চবিত্র হাসে, কাঁদে,—কথা বলে, দর্শকবা কী ভাবেন জানি না, তবে যে অভিনেতা, সে জানে অভিনযেব যন্ত্রণা কোথায়। যে যন্ত্রণাব মধ্যেই সৃষ্টিব উৎস।

সাবাবাত অভিনযেব শেষে বাডী ফেরাব পথে এই কথাই মনে হচ্ছিল।

কিছুদিন আগে 'জীবন বঙ্গ' নিযে শিশিববাবু শ্রীবঙ্গমেব উদ্বোধন কবেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই ১৫ই ফেব্রুয়াবী 'জীবন বঙ্গ'-এব অভিনয বন্ধ হল।

১৫ই ফেব্রুযাবী সিঙ্গাপুবেব পতনের সংবাদ প্রচাবিত হল। এশিয়ার মাটিতে দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধেব পটভূমিকা ক্রমেই প্রসাবিত হতে চলেছে।

বাংলা চলচ্চিত্রে 'ডাক্তাব' আলোডন সৃষ্টি কবেছিল। সেই 'ডাক্তাব'-এব হিন্দী চিত্ররূপ মুক্তি পেল ২০শে ফেব্রুয়াবী, চিত্রা এবং নিউ সিনেমায।

'ডাক্তার'-এব হিন্দী সংস্কবণও খুব জনপ্রিয হয়েছিল। ডাক্তারেব অন্যতম চবিত্রাভিনেতা আমি করাচী, লাহোব, কানপুর প্রভৃতি ভাবতেব বিভিন্ন শহর থেকে অগণিত চিঠি পেয়েছিলাম। প্রতিটি চিঠিব মূল কথা এক—আমার অভিনয সকলেব ভালো লেগেছে।

পরদিন ২১শে ফেব্রুযারী 'কর্ণার্জুন' চিত্রটি মুক্তিলাভ করলো। ঐ চিত্রে আমি রূপ দিয়েছিলাম শকুনি চরিত্রেব, আর ছবি বিশ্বাস ছিল কর্ণের ভূমিকায়। ছবিটির যুগ্ম পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায আর সতীশ দাশগুপ্ত।

সাতাশ বছর আগে আব সাতাশ বছর পরে—এটা কোন নাটক নিয়ে কথা নয়, নাটকের বাইরে আমার যে জীবন, সেই জীবনেব কথা।

বাগআঁচডা শান্তিপুরের কাছেই একটি গ্রাম। যে গ্রামটির সঙ্গে আমার জীবনের অনেক সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। বাবার মাতামহের সূত্রে বাগআঁচডা আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি।

সাতাশ বছর আগে সেই যে বাগআঁচড়া থেকে এসেছিলাম, সাতাশ বছর

পরে বাগআঁচড়ায় যাওয়ার পথে, সাতাশ বছর আগের একটি দিনের কথা মনে পড়লো।

সেদিন শান্তিপুর স্টেশনে না নেমে নেমেছিলাম গোবিন্দপুর বাগদে স্টেশনে। বাগআঁচড়ার বাড়ীতে মা'কে পূর্বাহ্নে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম আমি অমুক দিনে যাচ্ছি, গোবিন্দপুর বাগদে স্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে দিও। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। স্টেশনে নেমে কোন গাড়ীর সন্ধান পেলাম না। এখানে যাতায়াতের জন্যে কোন গাড়ী পাওয়া যায় না। বাইরে পানের দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম, বাগআঁচড়া কোন্ দিকে ?

দোকানী দূরের কতকগুলো তালগাছ দেখিয়ে জানালো, ওই দূরের তালগাছ বরাবর বাগআঁচড়ার পথ।

সুতরাং সেই মত হাঁটতে শুরু করলাম।

অচেনা-অজানা পথ। চলেছি পায়ে হেঁটে। পথে যেতে সন্ধ্যে হল।

সংকীর্ণ পথ। দুধারে আগাছার জঙ্গল। চলতে চলতে অন্ধকারে কখনো গর্তে পা পড়ছে, কখনো কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। এমনি করে পথ চলতে চলতে গ্রামের এক বাড়ীর খিড়কীতে এসে দাঁড়ালাম।

অচেনা-অজানা লোক খিড়কীতে এসেছে। বাড়ীর কর্তা তো রেগেই আগুন। বলে, ঠাওর পাওনা ? একেবারে গেরস্তবাড়ীর খিড়কীতে ঢুকেছ !

বললাম, আমি বিদেশী মানুষ—চিনতে পারিনি।

লোকটি আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলো।

বললাম, একটু জল খাওয়াবে কর্তা !

—জল ! লোকটি বললে, আপনারা কি জাত ?

আমি কায়স্থ শুনে লোকটি বললে, আপনাকে জল দিয়ে পাপের ভাগী হব না। আমরা জাতে বাগ্দী।

বললাম, একটু জল দাও—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। জল দিলে তোমার পাপ হবে না, আমার জাত যাবে না।

কিন্তু কোন কথাই শুনলো না সে। জল দিলে না। বললে, কোন ময়রার দোকানে গিয়ে জল খান গে—না হয় অন্য জেতের বাড়ীতে। আমি জল দিতে পারবো না।

এবারে জানতে চাইলাম বাগআঁচড়ার পথের নিশানা।

লোকটি বললে, ওই ভাগাড় ধরে যান।

ভাগাড় শব্দের একটা মানেই আমি জানি। গ্রামে যেখানে মরা গরু-মহিষ ইত্যাদি ফেলা হয়, তাকেই ভাগাড় বলে।

কিন্তু ভাগাড় মানে যে পায়ে-চলা গ্রাম্য পথ—আজই নতুন জানলাম।

কিছু পথ এসে দূরে আলো দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম, বাগআঁচড়ার বাজারের কাছে এসেছি।

এবারে বাড়ী চিনতে অসুবিধে হল না।

বাড়ীর দরজার কাছে মস্ত বড় ঝাঁকড়া বকুল গাছ। এ-জায়গাটায় এলেই মনে হয় ছোটবেলার কথা। এখানে নাকি ভূত থাকে! কুড়ি-একুশ বছরের যুবক আমি, তবুও গা-টা কেমন ছমছম করে উঠলো। সেই সঙ্গে সাপের কথাও মনে হল। এখানে আবার সাপের উপদ্রবও আছে।

বাড়ীর মধ্যে গেলাম। এবারে আর এক মুশকিল। দরজা তালা-বন্ধ।

ভাবলাম, মা নিশ্চয়ই প্রফুল্লর বাড়ীতে গেছে। প্রফুল্ল আমার সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই।

সেই বাড়ীতেই গেলাম। মা তো আমাকে দেখেই অবাক!

—হ্যাঁরে, তুই?

বললাম, বাঃ—আমি তো তোমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। লিখেছিলাম গাড়ী পাঠাতে।

শুনলাম মা আমার চিঠি পাননি।

তখন আর অন্য কথা নয়, ক্ষিধে-তেষ্টায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

বললাম, আগে একটু জল দাও—তেষ্টাটা মিটিয়ে নিই। কী যে দেশ, লোকে তেষ্টার জল পর্যন্ত দেয় না।

সে রাত্রে আর বাড়ী ফেরা হল না। কাকীমার বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করে সেখানেই দোতলার ঘরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাওয়া।

সাতাশ বছর পরে বাগআঁচড়ায় পৌঁছে সেই পুরনো কথা মনে হল। সেদিনের অপরিণত তরুণ, আজ পরিপূর্ণ যুবক অহীন্দ্র চৌধুরী। যার জীবনের প্রচ্ছদপট শুধু নয়, গোটা পটভূমিকা বদলে গেছে। সেই আমি বাগআঁচড়ায় এলাম পুত্র ভানুকে নিয়ে। স্ত্রী-কন্যা আগেই এসেছে।

অনেকদিন পর এক জীবনের বাইরে আর এক জীবনকে খুঁজে পেলাম।

আবার কলকাতা। আবার সেই দৈনন্দিন জীবনের জের টেনে চলা। ২৬শে ফেব্রুয়ারী মিনার্ভা মঞ্চে 'সুপ্রিয়ার কীর্তি'-র উদ্বোধন হল। শচীন সেনগুপ্তের এই

নাটকের পরিচালক দুর্গাদাস, আর নায়িকা সুপ্রিয়ার ভূমিকালিপিতে ছিল শান্তি গুপ্তা।

ফেব্রুয়ারী মাসটা গেল। মার্চের পাঁচ-ছয় তারিখে শ্রীরামপুরে গিয়েছিলাম নাটক অভিনয়ের জন্যে।

এরই মধ্যে ১১ই মার্চ একটি সরকারী ঘোষণায় শহরবাসীর আতঙ্ক চরমে পৌঁছল। সরকারী ঘোষণা হল, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার তাগিদে কলকাতা শহর থেকে স্ত্রীলোক, শিশু এবং সাধারণ নাগরিক যাদের শহরে না থাকলেও চলে, তারা যেন অবিলম্বে শহর ত্যাগ করে। কেননা যে-কোন মুহূর্তে চরম বিপর্যয় ঘটতে পারে।

এদিকে এই ঘোষণা, অন্যদিকে ওই একই তারিখে শিশির ভাদুড়ীর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'উড়ো চিঠি' নাটকের উদ্বোধন।

ক'দিন বাদে ১৯শে মার্চ নাট্যভারতী গোষ্ঠী চন্দননগরে সিনেমা-দ্য-প্যারীতে একটি অভিনয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল।

১৯শে মার্চ রঙমহলের পাদপ্রদীপে একটি নতুন নাটক অভিনীত হল। নাট্যকার ধীরেন মুখার্জী, পরিচালক প্রভাত সিংহ, আর প্রযোজক শরৎ চট্টোপাধ্যায়। নাটকের নাম 'স্রোতের ফুল'।

২০শে মার্চ তারিখেও চন্দননগরে দু'টি নাটক অভিনয় করেছিল নাট্যভারতী গোষ্ঠী।

২৩শে মার্চ বাগআঁচড়ায় পাঁচ বিঘে জমি রেজিস্ট্রি করা হল কলকাতা থেকে। ঐ জন্যে বিভূতি মিত্র এসেছিলেন কলকাতায়। ঐদিন রাত্রে আমাদের বাড়ীতেই তিনি ছিলেন।

মার্চ মাসের ২৮ তারিখটিতে একটি অপ্রত্যাশিত ঘোষণা—জাপানের নিকটে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু। ঘোষণাটি কিন্তু কোথাও কোন সরকারী সমর্থন পেল না।

ঘোষণা শুনে গোটা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে সেদিন একটি প্রশ্নই করেছিল, সত্যিই কি আমাদের প্রিয় নেতাজী মারা গেছেন ?

সেই প্রশ্নটা এখনো রয়েছে ভারতবাসীর মনে।

এদিকে যুদ্ধ ভারতের দরজায়। ২রা এপ্রিল জাপান আকিয়াব অধিকার করল।

দু'দিন যেতেই ৫ তারিখের সংবাদ, সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে জাপানীরা প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করেছে।

পরদিন ভারতের মাটিতে প্রথম জাপানী বোমা পড়ল। ভাইজাগ এবং

কোকোনাদ—এই দু'টি শহরে বোমারু বিমান থেকে জাপানীরা বোমাবর্ষণ করেছে। সেদিন তারিখটা ছিল ৬ই এপ্রিল। ঐদিনেই শিশির ভাদুড়ী অনির্দিষ্টকালের জন্যে শ্রীরঙ্গমের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সুসংবাদ বলে কিছু নেই। ৭ই এপ্রিল খবর পেলাম রাণীবালা কলকাতায় তার করে জানিয়েছে, উদীয়মানা অভিনেত্রী জ্যোতি মধুপুরে মারা গেছে। একজন প্রতিভা-ময়ী জনপ্রিয় অভিনেত্রীর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে ব্যথা পেলাম।

যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হল। ১৮ই এপ্রিলের সংবাদ তা প্রমাণ করল। জাপানের রাজধানীতে বোমাবর্ষণ করেছে মার্কিনরা।

ঐদিনই নতুন করে 'উড়ো চিঠি' নাটক নিয়ে শ্রীরঙ্গমের দ্বারোদ্ঘাটন হল। ঐদিনেই নাট্যভারতীতে অভিনয় শেষে আমি মুরলীবাবুর কাছে গেলাম। মুরলীবাবু কথা বলছিলেন সতু সেনের সঙ্গে। সেখানেই মুরলীবাবুকে বললাম, এই মাসের ৩০ তারিখ থেকে আমি চলে যাচ্ছি।

মুরলীবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললাম, এই কথাটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া আমার দরকার ছিল।

মুরলীবাবু কিছুই বললেন না। বুঝতে পারলাম, আমার কথাটা উনি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

পরদিন ১৯শে এপ্রিল যথারীতি নাট্যভারতীতে এসেছি। সেদিনে 'কঙ্কাবতীর ঘাট'-এর ১০০ ও ১০১তম রজনীর অভিনয়। শততম রজনীর অভিনয় হলেও কোন স্মারক অনুষ্ঠান হল না।

ঐদিনে অভিনয় দেখতে এসেছিল রঙমহলের শরৎ চ্যাটার্জি; নাটকের শেষের দিকে সে চলে গেল। কিন্তু অভিনয় শেষে আমি যখন মেক-আপ তুলছি, তখন আবার তার আবির্ভাব আমার কক্ষে। বললাম, ফিরে এলে যে?

শরৎ তখন বললে, দাদা—একটা কথা শুনছি, ওটা কি ঠিক।

—হ্যাঁ, যা শুনেছো তা কিছুটা সত্যি।

—তবে নিশ্চয়ই আমাদের কথাটা ভেবে দেখবেন।

ভেবে দেখা বলতে, শরতের ইচ্ছে আমি রঙমহলে যোগ দিই। বললাম, আচ্ছা—তোমার কথা নিশ্চয়ই মনে থাকবে!

২৩শে এপ্রিল সকালে বি. সি. মল্লিক ও শিশিরবাবু একবার ফোনে যোগাযোগ করে বলেছিলেন, আমি যদি তাঁদের ওখানে শনিবার আর রবিবার অভিনয়ে চুক্তিবদ্ধ হই।

আমি জানিয়েছিলাম, সে কী করে সম্ভব ? সম্ভব নয়।

ঐ তারিখেই নাট্যভারতীতে 'কর্ণার্জুন' অভিনয় হয়েছিল। কর্ণের ভূমিকায় ছিলাম আমি, নরেশ মিত্র ছিলেন শকুনির ভূমিকায়। বলা বাহুল্য, আগের দিনই নরেশ মিত্র যোগ দিয়েছেন নাট্যভারতীতে।

২৫শে এপ্রিল সতু সেন নাট্যভারতীতে রতীনকে বলেছিল, অহীনবাবু তো নাট্য-ভারতী ছাড়ছেন, তোমরা কি করবে ?

রতীনের কাছেই শুনেছিলাম কথাটা। সে বলেছিল, দাদা—কি বলবো বলুন ?

বলেছিলাম, তোমরা যেমন আছ, থাকো। তবে আমি তো তোমাদের ছাড়া নই। যখন যা দরকার বুঝবে জানাবে।

এপ্রিল মাস গেল। মে মাসের প্রথম তারিখে নাট্যভারতীতে 'কঙ্কাবতীর ঘাট'-এর একটি বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। 'কিলবার্ন কোম্পানী'-র জন্যে। কোম্পানীর কেরানী থেকে কর্তাব্যক্তি সবাই উপস্থিত ছিলেন। কর্মকর্তাদের অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ। অভিনয় দেখে তাঁরাও মুগ্ধ হয়েছেন রীতিমত। কোম্পানীর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতিতে ইংরেজ, এসে জানালেন, বড স্থন্দর অভিনয় দেখলাম। এমন মার্জিত রুচির অভিনয় আমাদের দেশেও কম দেখি।

একজন বিদেশীর মুখে এ ধরনের প্রশংসা শুনে আনন্দ হল।

ঐদিনের যুদ্ধের খবর—মান্দালয়ের পতন।

চিত্রজগতের একটি খবরই ছিল সেদিন, উত্তর কলকাতার 'মিনার' চিত্রগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন। এই দুর্দিনেও একটি চিত্রগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হল।

৩রা মে দুপুর এগারটা নাগাদ রঙমহল থেকে শরৎ এলো। আমাকে রঙমহলে যোগ দেওয়ার কথা বললে।

নাট্যভারতীতে 'কঙ্কাবতীর ঘাট'-এর ১০৮ ও ১০৯তম অভিনয় আমার কাছে ঐ থিয়েটারের শেষ অভিনয় রজনী। ঐদিন অভিনয় শেষে রাণীর বাড়ীতে এসেছি। মল্লিকমশায় ওখানেও আবার নতুন করে পুরনো কথা বললেন। শনি ও রবিবারের জন্য যাতে ওদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হই।

আমার উত্তর সেই একই। শনি-রবি যদি থাকবো, তাহলে চলে যাবো কেন !

নাট্যভারতী ছাড়তে বাধ্য হলাম। না ছেড়ে উপায় ছিল না। মুরলীবাবু হাউস নেবার পর থেকে অনেক শিল্পী আমার মুখ চেয়ে বেতন কমিয়েও থিয়েটারে ছিল ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কিন্তু যখন তারা দেখলো, 'দুই পুরুষ' খোলার আগে নতুন নতুন অভিনেতারা মল্লিকমশাই-এর কাছে যাতায়াত করছেন, এবং তাঁরা থিয়েটারে

ঢোকার পথ করছেন, সেই সময় স্বভাবতঃ আমাদের পুরনো শিল্পীরা আমার কাছে এলো। বললে, দাদা, এইজন্যে কি আমরা ত্যাগ স্বীকার করে থিয়েটারে রইলাম! এ যে দেখছি, ভিতরে ভিতরে অন্য ব্যাপার চলছে।

কথাটা বললাম মল্লিকমশাইকে।

মল্লিকমশাই বললেন, না না—এতে চিন্তার কি আছে!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝলাম যে এখানে আমাদের থাকা সম্ভব নয়, অন্ততঃ আমার পক্ষে। কারণ, যেখানে যারা আমার মুখ চেয়ে ছিল, তাদের কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত নাট্যভারতী ছাড়লাম। একদিন ফিল্ম সংক্রান্ত কাজে মুরলীবাবুর কাছে গিয়ে বলেও এলাম কথাটা। মুরলীবাবু শুনে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

যাই হোক, নাট্যভারতীতে আমার বিদায় রজনীতে অভিনেতা ও কর্মী সবাই এল। শুধু তুজন প্রম্পটার—কালি আর হট্টু ছাড়া।

শেষ রাতের অভিনয় শেষে আমরা রাণীবালার ওখানে মিলিত হলাম। আমি, রতীন, সন্তোষ, রাণী—মিলিত হয়ে ঠিক করলাম, রঙমহলে যোগ দেবার কথা। এই আলোচনায় শরৎও ছিল।

চার তারিখে একবার বাগআঁচড়া যেতে হয়েছিল নতুন বাড়ী তৈরীর কাজ দেখতে। ফিরে এসেছিলাম সাত তারিখে। কলকাতায় ফিরে শুনলাম, নতুন নাটকের রিহার্সাল চলেছে নাট্যভারতীতে। চলতি নাটক বন্ধ।

৯ই মে নাট্যভারতীতে অভিনীত হল 'সরলা'। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, রবি রায় ছাড়া আরো অনেকে।

১০ই মে নাট্যভারতীতে অভিনীত হল চন্দ্রগুপ্ত। ঐ রাতের শিল্পীতালিকায় ছিলেন নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, রবি রায়, অঞ্জলি রায়, হরিমতী।

আমার রঙমহলে যোগ দেবার তারিখ ১১ই মে। ঐদিনই রঙমহলের কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হলাম। মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর নতুন নাটক 'মধুসূদন দত্ত'-র গল্পাংশের প্রথমটা শোনালেন।

১২ই মে ছিল শান্তি গুপ্তার সম্মান-রজনী। নাটকটি ছিল সাজাহান। আমি ছিলাম নামভূমিকার অভিনেতা, জাহান-আরার ভূমিকায় ছিলো সরযূবালা। এছাড়া অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন রতীন, সন্তোষ ও সুহাসিনী।

যুদ্ধ-তহবিলে অর্থসাহায্যের উদ্দেশ্যে রাঘব বানার্জি 'সাজাহান' নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন হাওড়া রেলওয়ে ইউনিয়ন ইনস্টিটিউটে। আমার

সঙ্গে রাণীবালা, সুহাসিনী, রতীন, সন্তোষ, জহর গাঙ্গুলী ছাড়া আরো অনেকেই নাটকে অংশ নিয়েছিল।

ঐ দিনে আরও ঘটনা আছে। ঐদিনই প্রভাতের সঙ্গে আমার দেখা হতে সে বলেছিল, কেন আপনি রঙমহলে যোগ দিচ্ছেন! শরতের পয়সা নেই। ও কী করে থিয়েটার চালাবে!

আমি বলেছিলাম, শরতের আর্থিক অবস্থা কেন, তার সব কথাই আমার জানা হয়ে গেছে। সে যে চারশ' টাকা ধার করে ইলেকট্রিক কোম্পানীতে জমা দিয়েছে তা-ও জানি। কিন্তু তাই বলে থিয়েটার চলবে না, সে টাকা দিতে পারবে না, এমন ধারণা কি করে হল তোমার? ধনী হলেই কি থিয়েটার চালাতে পারে? থিয়েটার যদি নিজে থেকে না চলে, তাহলে কোন ধনীর পক্ষে টাকা ঢেলে থিয়েটার চালানো সম্ভব নয়। কতোই তো দেখেছি, দেখছি।

এই প্রসঙ্গে অমর ঘোষের কথা উল্লেখ করে বলেছিলাম, অমর ঘোষ তো ধনী—তবে তিনি থিয়েটার বন্ধ করে দিলেন কেন? সুতরাং শরতের অর্থ নেই বলে থিয়েটার চালাতে পারবে না, এটা কাজের কথা নয়। দেখাই যাক না কি হয়!

প্রভাতের সঙ্গে কথা ওইখানেই শেষ।

বড়ুয়া সাহেবের 'শেষ উত্তর' ছবির কাজ বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল। 'শেষ উত্তর'-এর কাজ শেষ হল ১৬ই এপ্রিল।

১৭ই মে আবার বাগআঁচড়া যাবার পালা। কলকাতা থেকে গোকুলকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে রওনা হলাম। শান্তিপুরে দেখা হল কালোর সঙ্গে। সে হরিপুর থেকে ডাক্তার-কবিরাজ সঙ্গে নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে।

বাড়ীতে পৌছেই দেখলাম, ভোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। দেখা হতেই বললে, বাবার ভীষণ অসুখ।

বললাম, শুনেছি। আমি যাচ্ছি তোমাদের বাড়ী।

বিভূতি মিত্রকে দেখতে পেলাম। রোগশয্যায় শায়িত বিভূতি-দা। কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও আমাকে দেখে যে তিনি খুশী হয়েছেন, তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম।

কিন্তু এতো শীগ্‌গির যে বিভূতি-দা চলে যাবেন, তা ভাবিনি। আমাদেরই চোখের সামনে ডাক্তার-কবিরাজ তখনো বসে, কিন্তু বিভূতি-দার শেষনিঃশ্বাস পড়লো। চোখের সামনে দেখলাম, মৃত্যু কেমন করে একজনের জীবনের ওপর কালো যবনিকা টেনে দেয়।

কাছেই গঙ্গা। বিভূতি মিত্রের মরদেহের সঙ্গে আমিও চললাম, গঙ্গাতীরের মহাশ্মশানে।

সব শেষ হয়ে গেলে রাত তিনটায় শোকসন্তপ্ত মনে আমিও ঘরে ফিরে এলাম।

বাগআঁচড়ার কাজ মিটিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম। ২২শে মে, বিভূতি মিত্রের স্মৃতিটা তখনো মনের মধ্যে। সঙ্গে ছিল নির্মলেন্দু লাহিড়ী। মিনার্ভা থিয়েটার পথে ওকে বিডন স্ট্রীটে নামিয়ে দিলাম।

ঐদিন ছিল অমল ব্যানার্জীর সম্মান-রজনী। নাটক ছিল 'সাজাহান'। নাটকের নামভূমিকায় ছিলাম আমি। জাহান-আরার ভূমিকায় ছিল সুহাসিনী, মোরাদের ভূমিকায় ছিল রতীন, আর সুজার ভূমিকায় ছিল সন্তোষ।

অভিনয় শেষে ঐদিন দুর্গাদাসের গাড়ীতে বাড়ী ফিরেছিলাম রাত বারোটায়।

২৩শে মে রঙমহলে 'কেদার রায়' অভিনীত হয়েছিল। আমার সঙ্গে সেদিনের শিল্পীতালিকায় ছিল ভূমেন রায়, রবি রায়।

ঐ দিনেই বাগআঁচড়া থেকে ভানু আর মীরাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলো আমার স্ত্রী সুধীরা।

'চরিত্রহীন' সে যুগের বহু-আলোচিত নাটক। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে রঙমহলে 'চরিত্রহীন' অভিনীত হল ২৪শে মে বেলা চারটেয়! উপেনের ভূমিকায় ছিলাম আমি, রাণীবালা ছিল 'কিরণময়ী' চরিত্রে। সন্তোষ ছিল ডাক্তারের চরিত্রে, আর সতীশের ভূমিকায় এর আগেও অভিনয় করেছে রতীন, সেদিনও তার কোন পরিবর্তন হয়নি।

২৮শে মে কলকাতার দর্শককে একটি নতুন নাটক উপহার দিল নাট্যভারতী। নাটকটি হল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ'।

নাটকটি প্রথমে আমার হাতেই আসে। নাট্যভারতী ছাড়ার আগে সেটি মল্লিকমশাইকে দিয়ে এসেছিলাম।

ঐদিন মিনার্ভায় অভিনীত নাটক ছিল 'সাজাহান'। আর রঙমহলে তখন নতুন নাটক 'মাইকেল'-এর রিহার্সাল চলছে পুরোদমে।

৩০শে মে তারিখে 'কেদার রায়' মঞ্চস্থ হল রঙমহলে। আমার সঙ্গে নির্মলেন্দু এবং ভূমেনও অংশ নিয়েছিল নাটকে।

এর মধ্যে একটা সুখবর আছে। যুদ্ধের জন্যে কলকাতা শহরের মানুষ শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছিল। সেই শহর-পালানো মানুষের দল আবার ফিরে আসতে লাগলো শহরে। বাঁচার তাড়নায় শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল এই মানুষেরা —ফিরে এলো তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে। শহরের জীবনযাত্রায় যারা অভ্যস্ত, তারা পারবে

কেন মফঃস্বলের জীবনের সঙ্গে নিজেদের মেশাতে। দু'চারদিন তো নয়, পরিচিত ঠিকানা ছেড়ে অনির্দিষ্ট ঠিকানায় থাকবে কতোদিন!

যাই হোক, শহর-পালানো মানুষেরা ফিরে আসছে—এটা নিঃসন্দেহে শুভলক্ষণ। অন্ততঃ আমাদের কাছে।

৩১শে মে রঙমহলে 'চরিত্রহীন' অভিনীত হয়েছিল। ঐদিনের শিল্পীতালিকায় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল নির্মলেন্দুবাবু। অভিনয় ভালোই হয়েছিল।

ঐ সময়ে নতুন নাটক 'মাইকেল মধুসূদন'-এর রিহার্সালও চলছিল। কখনো সকালে, কখনো বিকালে।

মাইকেলের উদ্বোধন রজনীর তারিখ ঠিক হয়েছিল ৫ই জুন। রঙমহল মঞ্চে সন্ধ্যা সাতটায় 'মাইকেল'-এর উদ্বোধন হল নির্দিষ্ট তারিখে।

নাটকের প্রথম রজনীর শিল্পীদের নাম মনে পড়ছে। নামভূমিকায় ছিলাম আমি। রাজনারায়ণ দত্তের ভূমিকায় ছিলেন শরৎ চ্যাটার্জী। আউন ছিলেন রতীন ব্যানার্জী। প্রভাত সিংহ অভিনয় করেছিলেন মনোমোহন ঘোষের চরিত্রে। সন্তোষ সিংহ সেজেছিলো গৌরদাস বসাক। হেনরিয়েটার ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেছিলো রাণীবালা। আলবার্ট, রমলা আর জাহ্নবী দেবীর ভূমিকায় ছিলেন যথাক্রমে রেখা দত্ত, পদ্মাবতী, বেলারাণী; সুহাসিনীও ছিলেন।

সেদিন নাটক দেখতে এসেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। সুস্থ হবার পর মনোরঞ্জনবাবুকে আজই প্রথম দেখলাম। এখন ভালোই আছেন মনোরঞ্জনবাবু। এ-ছাড়া সেদিন অভিনয় দেখতে এসেছিলেন রবি রায়, গরা ও দারা। তাছাড়া নাট্যভারতী থেকেও অনেকে এসেছিলেন।

অভিনয় শেষে এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা হল; দর্শকসাধারণকেও মোটামুটি খুশি করেছিল অভিনয়। তবে নাটকের প্রথমার্ধ ভালো হলেও, সে হিসেবে দ্বিতীয়ার্ধ তেমন জমেনি।

৬ই জুন মিনার্ভাতেও একটি নতুন নাটক পরিবেশিত হল। নাটকের নাম 'ডাক্তার', যার পরিচালক এবং অভিনেতা ছিল দুর্গাদাস।

রঙমহলে যথারীতি সুনামের সঙ্গে অভিনীত হতে লাগলো 'মাইকেল'। দর্শক-সংখ্যা ভালোই এবং নাটক সকলেরই ভালো লেগেছে।

এরই মধ্যে ১৯শে জুন তারিখে অল ইণ্ডিয়া রেডিওয় শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' অভিনীত হল। আমি ছিলাম ওথেলোর ভূমিকায়, নরেশ মিত্র ছিলেন ইয়াগো, সরযূবালা ছিল ডেসডিমোনা।

যুদ্ধ তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সিউড়ীর মহিলা সমিতি স্থানীয় দীননাথ হলে নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল। প্রথম দিন ১৩ই জুলাই-এর নাটক ছিল 'সাজাহান'।

এই অভিনয়প্রসঙ্গে একটি কথা মনে আসছে। মঞ্চে তাম্রকূটসেবনরত অবস্থায় সবে নাটকের প্রথম সংলাপ উচ্চারণ করেছি,—'তাই তো,—এ বড়ো দুঃসংবাদ দারা'—সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের বিজলী বাতি নিবে গেল! তারপর যা ঘটার তাই ঘটলো! মুহূর্তে দর্শকরা হৈ-হৈ করে উঠলো! অগণিত দর্শক—আর অন্ধকার মঞ্চ! সে-এক বিশ্রী ব্যাপার। সে আলো আর জ্বললো না। অগত্যা হাজ্যাকের ব্যবস্থা।

একে দারুণ গরম—পাখার ব্যবস্থা নেই, তারপর হ্যাজাকের গরম—তারই মধ্যে অজস্র দর্শকের হাততালি আর অভিনন্দনের মধ্যে অভিনয় শেষ হল।

১৩ই জুলাই থেকে ১৬ই জুলাই চার দিন ছিলাম সিউড়ীতে। কলকাতায় ফিরে এলাম ১৭ই জুলাই অপরাহ্ণে।

একটি সপ্তাহ গেল। তার মধ্যে নতুন খবর নেই। এক যুদ্ধের খবর ছাড়া।

২৫শে জুলাই প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত ও অভিনীত 'শেষ উত্তর' মুক্তিলাভ করলো। এ-ছবির অন্যতম একটি ভূমিকায় অভিনয করেছিলাম আমি। এ-ছাড়া কানন ও যমুনা একই সঙ্গে এই চিত্রে অভিনয় করেছিলো।

জুলাই-এর বাকি কয়েকটি দিন কাটলো। আগস্টের প্রথম সপ্তাহটাও গেল। এর মধ্যে সারাদেশ জুড়ে কেমন যেন রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ্য করেছি। কী যেন ঘটতে চলেছে। আমরা অভিনয়জগতের মানুষ, রাজনীতির অতোশতো বুঝি না—তবু এটুকু বুঝতে পারছি, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া যেন কেমন থমথম করছে।

এলো ঐতিহাসিক ৯ই আগস্ট। গান্ধীজির ঐতিহাসিক ৯ই আগস্ট। গান্ধীজির ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলেন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল থেকে আরম্ভ করে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করলেন ইংরেজ শাসক।

ভারত জুড়ে এক অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান শুরু হল। দুদিন না-যেতেই এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলো।

আমরা কান পেতে শুনলাম, বিপ্লবের পদধ্বনি।

সবদিকে কেমন যেন এক অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হল। এই অবস্থায় শহরের সিনেমা-থিয়েটারের অবস্থা যা হবার তাই হল।

শরতের তো মহাভাবনা রঙমহল নিয়ে। আমরা জানি, শরৎ সহ্য করতে

পারবে না এই ধাক্কা! যদি একটা সপ্তাহ মন্দা যায়, তাহলে কী যে করবে শরত, সে-ই জানে!

দেশের এই অবস্থার মধ্যেও আমার বাগআঁচড়ার বাড়ীর গৃহপ্রবেশ হল ১৫ই আগস্ট।

রঙমহলে মাইকেলের ৩২-তম অভিনয়ে দর্শক আসেনি বললেই চলে। যা টিকিট বিক্রি হল, তা থেকে দক্ষিণা পর্যন্ত দিতে পারলেন না কর্তৃপক্ষ।

দিনগুলো এইরকমই চলছে। ভারত জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশে মেদিনীপুরে তো রীতিমতো মুক্ত-এলাকার পত্তন হয়েছিল। এদিকে ইংরেজের বুলেটে বিপ্লবের আগুন নেভা দূরে থাক, আরো জ্বলে উঠলো।

এই অবস্থায় দেশের সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দিলে ইংরেজ সরকার। এই কাগজগুলো নাকি ইংরেজদের পিছনে লেগেছে!

কিন্তু সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে রাখা সম্ভব হল না। ৩১শে আগস্ট থেকে আবার বন্ধ সংবাদপত্রগুলি প্রকাশ পেতে লাগলো।

আবার চিত্র ও মঞ্চের কথায় ফিরে আসি।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'জীবনসঙ্গিনী' মুক্তিলাভ করলো। ছবিতে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

৫ই সেপ্টেম্বর শিশিরবাবু সম্প্রদায় গড়লেন অমৃতলালের 'খাস দখল' নাটকটি নিয়ে। সম্প্রদায়ে আশু বোস এবং রঞ্জিত রায় যোগ দিয়েছিল।

১২ই সেপ্টেম্বর শিশিরবাবু শ্রীরঙ্গমে একটি নতুন নাটক উপহার দিলেন—'দেশবন্ধু'-র জীবন নিয়ে রচিত নাটক।

ঐ দিনেই নাট্যভারতীতে 'দুই-পুরুষ' নাটকের জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হল মেয়র হেম নস্করের পৌরোহিত্যে।

১৬ই সেপ্টেম্বর দিনটির জন্যে দুটি মর্মান্তিক খবর অপেক্ষা করছিল। প্রখ্যাত নাট্যকার-অভিনেতা যোগেশ চৌধুরী, এবং বিখ্যাত দার্শনিক মনীষী হীরেন দত্ত—একই দিনে পরলোকগমন করলেন।

নাট্যভারতী এবং রঙমহল বন্ধ রাখা হল যোগেশ চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের জন্যে।

১৫ই অক্টোবর একটি নতুন নাটক উপহার দিল মিনার্ভা। নাটকের নাম 'কাঁটা

ও কমল', নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত। দুর্গাদাস এবং শান্তি গুপ্তা ছিল ঐ নাটকের অন্যতম শিল্পী।

সারা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা। তবু তার মধ্যেও মহাপূজা এসেছে। বোধন হয়েছে দেবীর। সপ্তমী পূজাও সম্পন্ন হয়েছে। উৎসবের মণ্ডপে সানাই বেজেছে, তবু কেমন যেন করুণ স্বরে বেজেছে সানাই!

এতোর মধ্যেও মহাষ্টমী রাত্রে রঙমহলে সারারাত্রব্যাপী অভিনয়-উৎসবের আয়োজন হয়েছে। 'চরিত্রহীন', 'কেদার রায়' ও 'রাতকানা'। প্রথম দুটি নাটকে আমি অভিনয় করেছিলাম। নির্মলেন্দু, ভূমেন, রঞ্জিত রায় এবং সরযূবালা ছিলেন এই নাটকের শিল্পী।

ঐ তারিখেই শিশির ভাদুড়ীর নাটক অভিনয় বন্ধ রইলো শ্রীরঙ্গমের কর্মী-ধর্মঘটের দরুন।

মিনার্ভাতেও আর এক অঘটন! দুর্গাদাসের অনুপস্থিতির দরুণ সেখানেও 'কাঁটা ও কমল'-এর অভিনয় বন্ধ রইলো।

'অশোক' ছবিটি মুক্তিলাভ করলো উত্তর কলকাতার চিত্রায়। আমি ছাড়া ছবি বিশ্বাসও ছিল ঐ চিত্রের অন্যতম শিল্পী। ছবিটির পরিচালক দ্বিজেন, অজয় ভট্টাচার্য। ছবিটির মুক্তির তারিখ ছিল ৩০শে অক্টোবর।

কয়েকদিন আগে থেকে শরীর কেমন দুর্বল বোধ হচ্ছিল। ২৭শে নভেম্বর তারিখে অভিনয় শেষে বুঝতে পারলাম আমি সত্যিই অসুস্থ। কেননা অভিনয় করতে এতো কষ্ট তো কোনদিন হয় না! যাই হোক, আর চুপ করে থাকা নয়। রক্ত পরীক্ষা করতে পাঠালাম। ব্লাড সুগার আগেই দেখা দিয়েছিল, সুতরাং সন্দেহটা সেইখানেই।

সন্দেহটা অমূলক নয়, রক্ত পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হল। যথারীতি চিকিৎসারও ব্যবস্থা করলাম।

২৯শে নভেম্বর ছিল রবিবার। সে রাতে দুটি প্রদর্শনী ছিল 'মাইকেল'-এর। কিন্তু দ্বিতীয় শো বন্ধ রইলো আমার অসুস্থতার জন্যে।

প্রথম প্রদর্শনীর পর অয়স্কান্ত বক্সীর 'ভোলা মাস্টার' নাটকটি শোনার ব্যবস্থা হয়েছিল। শচীন সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

নাটকটি মোটামুটি ভালো। অন্ততঃ গল্পের দিক থেকে। তবে অয়স্কান্তের কলম থেকে সংলাপ তেমন বেরোয় না। কেমন যেন আড়ষ্ট লাগে অভিনয় করতে; কিন্তু এটুকু ত্রুটি শুধরে নেওয়া যাবে। অন্ততঃ আমি তো সেই অভিমতই পোষণ করলাম।

কিন্তু অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হতে পারলো না। তা সত্ত্বেও ৩০ তারিখে 'ভোলা মাস্টার'-এর রিহার্সাল আরম্ভ হল।

ঐ ৩০ তারিখেই ভোর ছটায় অভিনেত্রী শীলা হালদার মারা গেল! শুধু অভিনেত্রী নয়, নর্তকী হিসেবেও সুনাম ছিল শীলার। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে সে জ্যোতিপ্রকাশের প্রণয়াসক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করেছিল।

এদিকে আমার অসুস্থতা তো আছেই। দুর্বলতা কমেনি। তবুও অভিনয় ছাড়িনি। চুপ করে বসে থাকি নি ঘরে। কিন্তু এই অত্যাচার সইবে কেন!

৩০ তারিখে আমাকে নিয়ে কলকাতা শহরে নাট্যজগতের ভিতরে-বাইরে গুজব রটলো। আমি নাকি প্রতাপাদিত্য অভিনয় করবার কালে মঞ্চের ওপর পড়ে গিয়েছি। গুজব যখন রটে তখন এমনি করেই রটে, কোথা থেকে কেমন করে রটে, তা কেউ বলতে পারে না। অথচ রটে যায়।

এই গুজবের পরিপ্রেক্ষিতেই ডাঃ রাম অধিকারীর কাছ থেকে ফোন পেলাম। ফোনে ডাঃ অধিকারী জানতে চাইলেন আমার শারীরিক সংবাদ।

জানালাম, গুজবে কান দেবেন না, কথাটা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এবং এটা যে নিছক গুজব, তা আরো সঠিকভাবে প্রমাণ করার জন্যেই বোধহয় আমি ডাঃ অধিকারীর বাড়িতে গেলাম ১লা ডিসেম্বর।

ঐ ১লা ডিসেম্বর তারিখেই শ্রীরঙ্গমে 'সাজাহান' মঞ্চস্থ হল। শিশির ভাদুড়ী ছিলো নাটকের নামভূমিকায়, দুর্গাদাস সেজেছিলো ঔরঙ্গজীব, ভূমেন রায়—যশোবন্ত সিং, আর জাহানারার চরিত্রে ছিলো সরযূবালা।

শ্রীরঙ্গমে সেদিন দর্শকসংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

মেদিনীপুরে প্রচণ্ড সাইক্লোন হয়েছিল। সাইক্লোন-অধ্যুষিত এলাকার মানুষদের সাহায্যার্থে কলকাতার মেয়রের তহবিলে অর্থদানের উদ্দেশ্যে রঙমহলে একটি সাহায্য-রজনী হয়েছিল। নাটক ছিল চন্দ্রশেখর। অভিনয়-লিপিতে আমি ছাড়া নির্মলেন্দু, ভূমেন, সরযূবালা—এঁরাও ছিলেন।

এদিকে আমি থিয়েটার নিয়ে যেমন ব্যস্ত, ঠিক তেমনি ব্যস্ত চলচ্চিত্র নিয়ে। তারপর শরীরও দুর্বল। অথচ কাজের চাপে বিশ্রামের অবসর নেই।

এরই মধ্যে ৭ই ডিসেম্বর এম. পি. প্রোডাকসন্সের ছবির শ্যুটিং ছিল। শ্যুটিং শেষ হবে, এমন সময় রায়বাহাদুর সুখলাল কারনানী এলেন। বললেন, অহীনবাবু, এবারে স্টেজ ছেড়ে দিন। ছবিতে এতো কাজ, এর মধ্যে স্টেজের কাজ আর রাখবেন না।

কী উত্তর দেব রায়বাহাদুরের কথার। শুনে হাসলাম মাত্র।

আমি তখন রেসের ঘোড়ার মতো ছুটছি। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, হোক শরীর দুর্বল—তবুও ভোলা মাস্টারের স্টেজ রিহার্সালে গেলাম। সেদিন ছিল ১৬ই ডিসেম্বর। সন্ধ্যে ৭-৩০টা থেকে ভোর ৫টা ২৫ মিঃ—সারারাত ধরে চললো 'ভোলা মাস্টার'-এর রিহার্সাল।

ঐ তারিখেই একটি জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির খবর শুনলাম। জ্যোতিপ্রকাশ আত্মহত্যা করেছে।

ক'দিন আগেই শীলা হালদার মারা গেছে—ক'দিন পরেই তার স্বামীর এই মৃত্যু! জ্যোতির মৃত্যুতে সেদিন একটি প্রশ্নই জেগেছিল—জ্যোতির মতো ছেলেব এই পরিণতি!

১৭ই ডিসেম্বর রঙমহলে অযস্কান্ত বক্সীর ভোলা মাস্টারের শুভ উদ্বোধনের দিন। সন্ধ্যা ৬-৩০টায় নাটকের উদ্বোধন হল। দর্শকদের অভিনন্দন পেল নাটক। বিশেষ করে নাটকের শেষ দৃশ্যে দর্শকরা রীতিমতো বিস্মিত এবং অভিভূত হল।

ভোলা মাস্টাব অভিনয় প্রসঙ্গে দর্শক-সমালোচকরা একমত। 'মিনার্ভায় অভিনীত বেহুলার চাঁদ-সদাগরের পর অভিনেতা অহীন চৌধুরীর ভোলা মাস্টারও এক অবিস্মরণীয় অভিনয়।'

মনে আছে, ভোলা মাস্টারের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে দর্শকরা এমনই হাততালি দিতেন যাতে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়তাম!

'ভোলা মাস্টার' নাটকটির চরিত্রলিপিতে যাঁরা ছিলেন, সেটুকু জানিয়ে রাখা দরকার।

ভোলা মাস্টার—আমি, সমরেন্দ্র—রতীন ব্যানার্জি, লোকনাথ—সন্তোষ সিংহ, মিঃ চ্যাটার্জি—শরৎ চ্যাটার্জি, সর্বেশ্বর—সন্তোষ দাস, তপন—ভানু চ্যাটার্জি, অমরনাথ—তারা ভট্টাচার্য, রাখাল—আশু বোস, কৃপাময়ী—বাণীবালা, ছোটবৌ—সুহাসিনী, রাধারাণী—রমা ব্যানার্জি, উল্কা—বন্দনা; এছাড়া আরও শিল্পী ছিলেন নাটকে।

রঙমহলে মহাসমারোহে চলছে অয়স্কান্ত বক্সীর ভোলা মাস্টার।

১৯শে ডিসেম্বর রূপবাণী চিত্রগৃহে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের ছবি 'পতিব্রতা' মুক্তিলাভ করলো। আমি ছাড়া ছবিতে ছিলো নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস ও আরো অনেকে। ছবিটির পরিচালক ছিলেন জগদীশ চক্রবর্তী।

ঐ তারিখে শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী 'পরিণীতা' ছবিটিও মুক্তি পেল শ্রী ও পূরবীতে। পরিণীতার পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

২০শে ডিসেম্বর ছিল 'ভোলা মাস্টার'-এর চতুর্থ ও পঞ্চম অভিনয়-রজনী। দর্শকের ভিড়ও ছিল প্রচুর।

ঐ তারিখেই নাট্যভারতীতে ছিল দুই পুরুষের শততম রজনী। কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক শিল্পীকে উপহার দিয়েছিলেন শীতবস্ত্র।

সেদিন 'ভোলা মাস্টার' অভিনয় শেষে, আমরা ছবি তোলায় ব্যস্ত—তারই মধ্যে রাত ১০টা ২৫ মিনিটে আমাদেরকে সচকিত করে সাইরেন বাজলো!

তবুও আমাদের ছবি তোলা বন্ধ হল না। এরই মধ্যে এক সময় স্টার থিয়েটারের ঘোড়ার গাড়ী এসে ঢুকলো রঙমহলে। গাড়ীতে স্টারের মেয়েরা রয়েছে। মেয়েরা তো সাইরেন শুনে রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে। দু'একজন তো ভয় পেয়ে কাঁপছে। উষা, যাকে আমরা উষা পাগলী বলতাম, সে তো গাড়ী থেকে নেমেই চিৎকার করতে লাগলো, তুলো কই—কানে দেব!

বললাম, আরে—তুলোটুলো সব হবে। বোমা তো পড়েনি! যাও—সাজঘরে গিয়ে বোসো গে সব!

তাই হল। সবাই এসে বসলো রঙমহলের সাজঘরে।

এতোর মধ্যেও আমি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। সবাই বলতে লাগলো, অহীনবাবু, আপনি বারান্দায় কেন?

বললাম, আরে বোমা যদি পড়ে, তাহলে ঘর আর বারান্দা!

রাত বারোটায়। সাইরেন বাজলো আবার। এবারে সাইরেনের ভাষা—অল ক্লিয়ার।

স্টার থিয়েটারের এবং আমাদের রঙমহলের মেয়েদের বাড়ী পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল।

এর মধ্যে একটা কথা বলা হয়নি। আমিও বিমানধ্বংসী কামানের আওয়াজ শুনেছি।

যাই হোক, মেয়েদের পাঠানো হয়ে গেলে আমিও বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

বাড়ী পৌছে দেখি, আমারই জন্যে সবাই গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমি পৌছতেই ওরা বলতে লাগলো, বাপরে কী আওয়াজ! বাড়ীর জানালার সার্শীগুলো কেঁপে উঠেছে! তারপর গোটা বাড়ীটা কেঁপে উঠেছে পর্যন্ত!

পরদিন ভোর হতেই নানা গুজব কানে আসতে লাগলো। কেউ বলে খিদিরপুরে বোমা পড়েছে, কেউ বলে ভূ-কৈলাসের রাজবাড়ীতে! সংবাদপত্রেও নানা ধরনের পরস্পরবিরোধী খবর প্রকাশিত হয়েছে। শোনার পরেই মনের মধ্যে বিশ্বাস জন্মালো যে, কলকাতায় ডক এলাকায় বোমা বর্ষিত হয়েছে।

বিধ্বস্ত এলাকা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে ঐদিন সকালে ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর কয়েকটি

ছেলে সাইকেল নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দেখতে পায়নি! বিধ্বস্ত এলাকার বাইরে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে রাখা হয়েছে।

যে যুদ্ধ এতোদিন দূরে ছিল, সেই যুদ্ধ খাশ কলকাতার দরজায় এসে পৌঁছলো। শহরবাসীরা দারুনভাবে ভীত হল! নতুন করে শুরু হল শহরবাসীর শহর থেকে পালানোর ধূম!

লক্ষ্মীপ্রিয়া আমাদের চল্‌তি নাটক 'ভোলা মাস্টার'-এ ছোট সময়ের ভূমিকায় অভিনয় করতো। তার ফোন পেলাম। তারাও শহর ছেড়ে চলে যেতে চায়। লক্ষ্মীপ্রিয়া চলে যাবে শুনে বিচলিত হলাম। কিন্তু উপায় কি? যে যাবে, তাকে তো ধরে রাখতে পারবো না।

ইন্দুবাবু কাশী থেকে এসেছেন। থিয়েটারে কাজও করছেন। ইন্দুবাবু এবং রতীনবাবুর কাছে শুনলাম বোমাবিধ্বস্ত হাতীবাগান বাজারের কথা।

২৩ তারিখে অভিনীত হয়েছিল 'চিরকুমার সভা'। এই সময়ে কি নাটক চলে? টিকিট বিক্রি হয়েছিল মোটে সাড়ে দশ টাকা।

২৩ তারিখের রাতটা শহরবাসী মোটামুটি শান্তিতে কাটিয়েছিল। সে রাতে আর বোমাবর্ষণ হয়নি।

২৪ তারিখে উঠে প্রভাতী সংবাদপত্র দেখলাম। না—গত রাত ভালোই গেছে।

যাই হোক, গতকাল লক্ষ্মীপ্রিয়া যে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল, আজ দুশ্চিন্তা ঘুচলো। ছোট সময়ের ভূমিকায় নামবে নর্তকী দুর্গার ছেলে।

কিন্তু এদিকে তো ফয়সলা হল। ওদিকে রঙমলের মালিক—অভিনেতা শরৎ চাটুজ্যেই বেপাত্তা! সে তার বাবাকে নিয়ে নবদ্বীপে গেছে।

নতুন ভাবনা এলো। শেষ পর্যন্ত অয়স্কান্তকে সামনে পেয়ে বললাম, ঠিক আছে —শরতের ভূমিকায় তুমিই নামবে।

—সে কী!

—হ্যাঁ, তুমিই ঠিক পারবে। তাছাড়া শরতের পোশাকও তোমার ঠিক হবে। আর দ্যাখোই না পোশাকগুলো পরে।

আমার সামনেই শরতের পোশাক পরলো অয়স্কান্ত। ভালোই হয়েছে। এতটুকু বেমানান হয়নি।

যথারীতি অভিনয় হলো। দর্শক-সমাগম তেমন সুবিধের নয়।

মানুষ যেখানে দলে দলে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে, সেখানে এর চেয়ে আর কি আশা করা যায়। তারপর আজকের দিনটা তো ভালো নয়ই! দিনের আলোয় বোমা

বর্ষিত হয়েছে কলকাতায়। স্থতরাং কাল রাতে নিশ্চিন্ত ঘুমোলে কি হবে, দিনটা বড়ই খারাপ।

এক রঙমহল ছাড়া সব থিয়েটারই বন্ধ হল। কিন্তু সিনেমা বন্ধ হয়নি।

এতো অস্থবিধের মধ্যেও আমাদের 'ভোলা মাস্টার' অভিনীত হচ্ছে। আর এক মুশকিল হলো রমা ব্যানার্জিকে নিয়ে। ২৫ তারিখে রমার বোন স্নেহ এলো আমার কাছে। বললে, আজই আমরা নবদ্বীপ চলে যাচ্ছি। রমাও যাচ্ছে।

বললাম, যাবে তো ঠিকই। কিন্তু আজ শুক্রবার, নাই বা গেলে। বরং সোমবারে যেও।

স্নেহকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, আজ বড়দিন—আজ আর যেও না।

বড়দিন! কোথায় আজ উৎসবের আলোয় ঝলমল করে উঠবে মহানগরী, কোথায় আজ দর্শকরা ভিড় করে আসবে মঞ্চে! তা নয়—সবই যেন বিপরীত।

বড়দিনে 'ভোলা মাস্টার'-এর সপ্তম রজনী। ঐ রাতে মাত্র ১০৫ টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল।

২৬ তারিখের অবস্থাও ঐরকমই! সে রাতে অভিনয় শেষে বীরেন ভদ্র আর অয়স্কান্ত আমার সঙ্গে কথা বলছিল। কথায় কথায় খানিক সময় গেল। কিন্তু যে গাড়ী আসার কথা ছিল, এলো না। অগত্যা ট্যাক্সির খোঁজ করলাম। অনেক সময় অপেক্ষা করার পর, একটা ট্যাক্সি পেলাম। কিন্তু রঙমহল থেকে গোপালনগরের জন্যে কুড়ি টাকা ভাড়া দিতে হল। ট্যাক্সিতে এইরকম চড়া হারে ভাড়া আর কখনো আমাকে দিতে হয়নি।

২৭শে ডিসেম্বর 'ভোলা মাস্টার'-এর দুটি প্রদর্শনী ছিল। শরৎ আজই ফিরেছে নবদ্বীপ থেকে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছে। আজকের অভিনয়ে দর্শকদের মধ্যে শচীন সেনগুপ্ত ছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম, দর্শকরা প্রতিটি দৃশ্য চমৎকার উপভোগ করেছে।

কিছুদিন বন্ধ থাকার পর স্টার থিয়েটার খুললো ২৮শে ডিসেম্বর।

২৮ তারিখের শেষ রাতে আচমকা ঘুম ভাঙলো। শহরবাসীকে সচকিত করে সাইরেন বাজলো—ঘড়িতে তখন রাত ৩-৩০ মিনিট।

উঠে পড়লাম। নিশ্চিন্ত শয্যা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে—নীচের তলার ঘরে।

যাই হোক, ঐ রাতে বোমা বর্ষিত হয়নি শহরে। পূর্ব-বাংলার সীমান্তে যুদ্ধের উত্তেজনার উত্তাপটুকু কিন্তু ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

২৯ তারিখে বিমানাক্রমণ ঘটেনি। শান্ত দিন। ঐদিন কোন অভিনয়ও ছিল না।

কিন্তু শহরে তখনো মানুষের মনে দারুণ দুশ্চিন্তা আর উত্তেজনা। দলে দলে মানুষ শহর ছেড়ে পালাচ্ছে! সাবদার বলে একজন হেডমিস্ত্রি কলকাতায় আমার বাড়ীতে কাজ করেছে। সে বলেছিল, আমার দেশের বাড়ী; বাগআঁচড়ায় যাবে। কিন্তু স্টেশন থেকে ফিরে এলো সে। শান্তিপুরের একটি টিকিটও সে চেষ্টা করে সংগ্রহ করতে পারেনি।

বছরের শেষ দিনটিও আজ শেষ হবে। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২—চলতি নাটক 'ভোলা মাস্টার' অভিনয় হবে রঙমহলে। সেদিন অন্যান্য বন্ধ রঙ্গমঞ্চের দরজাও খুলেছে। চলতি বছরের শেষ দিনটিতে ছিল 'ভোলা মাস্টার'-এর দশম রজনী। ঐ রাতে দর্শকের সংখ্যা একটু বেড়েছিল।

অভিনয় শেষে বাড়ী ফিরছি। বছরের শেষ রাত—মনটা পুরনো দিনের হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। কিন্তু কিসের হিসেব! এই ব্লাক-আউটের রাত্রের অন্ধকারে চলতে চলতে মনে হয়—একটি দুঃস্বপ্নের বছর পার হয়ে এলাম! বছরটা ছিল এই রাত্রির মতো কালো অন্ধকারের বোরখায় ঢাকা!

জানি না ১৯৪৩ সাল কোন্ স্বপ্ন নিয়ে আসছে। তবু বিগত বৎসরটা হয়তো একটি ঘটনার স্বর্ণ-স্মৃতি বহন করবে। সে স্মৃতি ১৯৪২-এর বিপ্লবের।

উনিশ শ তেতাল্লিশ এলো।

নতুন বৎসরকে স্বাগত জানালাম। আর পিছন দিকে ফিরে তাকানো নয়, সামনের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে চলা।

সকালে ফোন করলাম অরোরার অনাদিবাবুকে। অনেকদিন বাদে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতেই এই যোগাযোগ।

নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ, শিল্পী, কলাকুশলী এবং কর্মীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি দিয়ে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতেন তিনি। এবারেও চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো না।

এতো গেল কর্তৃপক্ষের ব্যাপার। নববর্ষ উপলক্ষে আমিও ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু উপহার দিতাম অধস্তন কর্মীদের। সেটা নাইবা উল্লেখ করলাম।

যাই হোক, নববর্ষে ছিল 'ভোলা মাস্টার'-এর ১১তম অভিনয় রজনী।

সেদিন একটি প্রদর্শনীই হয়েছিল, সংখ্যার দিক থেকে দর্শকের অবস্থাও ভাল ছিল।

ভালই গেল নতুন বছরের প্রথম দিনটি!

রঙমহলে চলতি নাটক 'ভোলা মাস্টার'।

মিনার্ভা ২রা জানুয়ারী একটি নতুন নাটক উপহার দিল। নাটকের নাম 'মাটির মায়া'। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, নিজেই নাটকটির পরিচালক। কিন্তু দুর্গাদাস এই নাটকের শিল্পী-তালিকায় ছিল না !

নতুন নাটক উদ্বোধনের পালা চলেছে। ৮ই জানুয়ারী নাট্যভারতী উপহার দিলে তারাশঙ্করের 'পথের ডাক'। পরদিন ৯ই জানুয়ারী স্টারের পাদপ্রদীপের আলোয় এল মহেন্দ্র গুপ্তের নতুন ঐতিহাসিক নাটক—'রাণী দুর্গাবতী'।

এদিকে রঙমহলে যথারীতি চলছে 'ভোলা মাস্টার'। এই চল্‌তি নাটকেরও মধ্যে মাঝে মাঝে পুরনো নাটক পরিবেশন করা হয়। ১৪ই জানুয়ারী 'মাইকেল' অভিনীত হল রঙমহলে। তবে তেমন উৎসাহ পেলাম না দর্শকসংখ্যা দেখে ।

বেশ কয়েকটা দিন শহরটা শান্ত ছিল। কিন্তু ১৫ই জানুয়ারীর শীতার্ত রাতটা আবার কেঁপে উঠলো সাইরেনের শব্দে। রাত দশটা থেকে এগারটা একটানা সাইরেন বেজে চললো।

পরদিন প্রভাতী সংবাদপত্রে খবর পেলাম, শহর থেকে দূরে তিনটি জাপানী বোমারু বিমান ভূপাতিত হয়েছে।

শহরের মানুষদের মন থেকে ভয়ের ছায়াটা সরে যাচ্ছিল, আবার নতুন করে জাঁকিয়ে বসলো শহরবাসীর মনে।

যাই হোক—চল্‌তি নাটক 'ভোলা মাস্টার'-এর অভিনয় বন্ধ হল না। ১৬ই জানুয়ারী ছিল নাটকের সপ্তদশ রজনী। ঐদিনই শিশিরবাবু 'মায়া' নামে একটি নতুন নাটক উপহার দিলেন।

১৯শে জানুয়ারী রাত নটায় আবার সাইরেন বাজলো। এই বিপদসংকেত ধ্বনিত হয়েছিল একঘণ্টা ধরে।

জাপ বোমারু বিমান শহরের আকাশসীমায় পৌছনোর আগেই ভারতীয় বিমান-বহর বাধা দেয়। জাপ বোমারু বিমান লক্ষ্যহীনভাবে বোমা ফেলে পালিয়ে যায়।

যুদ্ধের ব্যাপারটা কেমন যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে। নয়তো এর মধ্যেও নতুন নাটকের উদ্বোধন চলছে।

জানুয়ারী মাসে নতুন নাটক 'রাণী দুর্গাবতী'-র উদ্বোধন হয়েছে স্টারে ; ফেব্রুয়ারী মাসে ১১ই তারিখে স্টার আবার নতুন নাটক উপহার দিলে। এবারের নাটক 'কৃষ্ণার্জুন'। নাট্যকার বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। আগে এই নাটকটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'সুভদ্রা'।

কিন্তু রঙমহলে তখনো 'ভোলা মাস্টার' চলছে মহাসমারোহে।

'ভোলা মাস্টার' নিয়ে নাট্যরসিক মহলে যখন রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে সেই সময়ে একটি মজার কথা শুনলাম। তার আগে বলে রাখা দরকার, 'ভোলা মাস্টার' নাটকটি অভিনয়ের ব্যাপারে আমিই শরৎকে উৎসাহিত করেছিলাম। কিন্তু নাটকের খবরটা পেয়েছিলাম দুর্গাদাসের কাছ থেকে। দুর্গাদাস তখন কিছুটা অসুস্থ। সেই সময় একদিন দেখা হতে এটা-ওটা কথার পর আমাকে দুর্গাদাস বললে, শুনেছ, অয়স্কান্ত একটা নাটক লিখেছে, তুমি অভিনয় করো। ও নাটকে আমার ভূমিকা নেই। তবে তোমার উপযুক্ত ভূমিকা রয়েছে।

বললাম, বেশ তো, একদিন অয়স্কান্তকে পাঠিয়ে দিও। নাটক শুনবো।

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বললেন, ঠিক আছে, অয়স্কান্ত তো আমার কাছে প্রায়ই আসে। আমি তাকে পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে।

তারপর অয়স্কান্ত এল। তার কাছে 'ভোলা মাস্টার' শুনলাম। শুনে ভাল লাগলো। অযস্কান্ত যখন নাটক পড়ছিল, তখন আমার কান ছিল নাটকে, কিন্তু মন ছিল কল্পিত মঞ্চে। কল্পনা করছিলাম, এ নাটক মঞ্চে কেমন হবে। নাটকের বিচারটা এইভাবেই করা উচিত।

যাই হোক, শরৎকে বললাম নাটকের কথা। শরৎ মোটামুটি রাজী হয়ে গেল।

তারপর যথারীতি রঙমহলে 'ভোলা মাস্টার' অভিনীত হতে লাগলো।

জানি না কার মনে কি ছিল, তবে প্রথম দিন থেকেই নাটক জমলো এবং দিনের পর দিন নাটকের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে চললো।

ওরই মধ্যে একদিন অভিনয়ের শেষে শরৎ আমাক বললে, দাদা—একমাত্র আপনার উৎসাহে এই নাটক করা। নয়তো অনেকে আমাকে হতাশ করেছিল।

বলে প্রভাত সিংহের মন্তব্য শোনাল শরৎ। 'ভোলা মাস্টার' প্রসঙ্গে প্রভাত নাকি শরৎকে বলেছিল, ওহে তুমি নাকি 'ভোলা মাস্টার' করছো। ও-নাটক কোরো না; কিছু হবে না। দেখবে তোমার রঙমহলের মুখটাই ঘুরে গেছে!

শুনে দমে গিয়েছিল শরৎ। কিন্তু তখন আমাকে কিছু বলেনি—বললে যখন মহাসমারোহে 'ভোলা মাস্টার' চলছে।

কথাটা বলে শরৎ বললে, তখন আপনাকে বলিনি কথাটা, জানি শুনলে রাগ করবেন।

বললাম, না রাগ আর কি করব। বুঝলে ত ওরা কেমন নাটক বোঝে।

যাই হোক, আজ কোন কথাই কথা নয়—নাটক চলছে, এইটাই সত্যি কথা।

আর সবচেয়ে আনন্দ এই যে—বিচারে আমি ভুল করিনি।

২৬শে ফেব্রুয়ারী রূপবাণীতে নতুন ছবি 'অভিসার' মুক্তি পেল। ছবির পরিচালক হেমন্ত গুপ্ত।

এর পর ফেব্রুয়ারীতে নতুন খবর আর কিছু নেই।

মার্চ মাসে ৯ তারিখে শ্রীরঙ্গমে 'প্রফুল্ল' নাটক নিয়ে সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। নাটকের শিল্পীতালিকায় শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র, রবি রায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যতীন, শরৎ চাটুজ্যে ও শৈলেন চৌধুরীর সঙ্গে আমার নামও যুক্ত ছিল। স্ত্রী-চরিত্রে ছিলেন—প্রভা, কঙ্কা, নিভাননী, রাণীবালা, ঊষা (পটল) ছাড়া আরো অনেকে।

'প্রফুল্ল' চিরদিনের নাটক। কতদিন অভিনয় হয়ে আসছে, তবু তার আকর্ষণ কমেনি। বিশেষ করে সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন হলে দর্শকরা তো ভিড় করে আসে।

শুধু দর্শক নয়, 'প্রফুল্ল' নাটকটি অভিনেতাদের কাছেও প্রিয়।

১৪ই মার্চ তারিখটি রঙ্গজগতের স্মরণীয় দিন। ঐদিন মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হল রঙমহলে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন অধ্যাপক মন্মথ বসু। সেদিনের অনুষ্ঠানে রঙমহলের শিল্পী, কলা-কুশলী ছাড়া আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে যে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছিল, তার রচয়িতা ছিলেন অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে আজকের মত সেদিনও এই কথা প্রচলিত ছিল। তাঁকে বলা হত, বাংলার গ্যারিক, বাংলার শেক্সপীয়র, বঙ্গমঞ্চের জনক—হয় তো এতেও গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে বলা শেষ হত না।

গিরিশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানের স্মৃতিটা আজও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে আছে।

সে সময়ে একবার এক সপ্তাহের জন্যে অমৃতবাজার পত্রিকাকে বয়কট করেছিল কলকাতার বিভিন্ন থিয়েটার কর্তৃপক্ষ। কারণ, বিজ্ঞাপনের চাঁদার হারের বৃদ্ধি।

কিন্তু ১৬ই মার্চের অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখলাম, মিনার্ভা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন।

এদিকে শহরের অবস্থা তখনো স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। প্রতিটি থিয়েটারের অবস্থা সঙ্গীন! এক রঙমহল ছাড়া অন্যান্য থিয়েটারে একটির বেশি প্রদর্শনী হচ্ছে না। এতোর মধ্যেও 'ভোলা মাস্টার'-এর দু'টি প্রদর্শনী হল ১৯শে মার্চ!

২০শে মার্চ রঙমহলে 'ভোলা মাস্টার'-এর জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হল।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, জাস্টিস বি. কে. মুখার্জি, ডঃ হেমেন দাশগুপ্ত; শনিবারের চিঠির সম্পাদক

সজনী দাশ, বীরেন ভদ্র, শচীন সেনগুপ্ত, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, দুর্গা বসু ছাড়া বহু বিশিষ্ট নাট্যামোদী ব্যক্তি। সেদিনের অনুষ্ঠানে শরৎ প্রারম্ভিক অভিভাষণে সমবেত সুধী এবং রঙমহলের শিল্পী ও কলা-কুশলীদের সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিল।

সেদিনের অনুষ্ঠানে 'ভোলা মাস্টার'-এর নাম-ভূমিকার অভিনেতার স্মারক-উপহার হিসাবে আমাকে দেওয়া হয়েছিল রৌপ্যাধারে রক্ষিত একটি মানপত্র। মানপত্রটি পাঠ করেছিল শরৎ নিজে।

এ-ছাড়া ঐ অনুষ্ঠানে রাধু মল্লিক ব্যক্তিগতভাবে আমাকে উপহার দিয়েছিল কফি সেট এবং 'স্পোর্টস অ্যাণ্ড স্ক্রীন' পত্রিকার পক্ষ থেকে উপহার দেওয়া হয়েছিল একটি রৌপ্যপদক। এন. সি. বড়াল দিয়েছিলেন রৌপ্যনির্মিত একটি ফোটো ফ্রেম।

ঐ জুবিলী উৎসব প্রসঙ্গে মনে হয় এই 'ভোলা মাস্টার'-এর কথা। জীবনে এত নাটক করেছি, কিন্তু 'ভোলা মাস্টার'-এর অভিনয় করে আমার শিল্পীমন যেভাবে পূর্ণ হয়েছিল—এমন পূর্ণতর স্মৃতি খুব বেশি নেই।

প্রতি বৎসরের মত এবারেও দোলযাত্রার দিনটা এগিয়ে এল। কিন্তু এবারের উৎসব যেন ম্লান—বিবর্ণ। কোথায় সেই আবীর আর রঙের পিচকারী নিয়ে মাতামাতি! শুধু কোনমতে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে অনুষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধরে রাখা। শুধু কিছু বালক-বালিকা—যারা যুদ্ধ বোঝে না, যারা সহজ, সরল—তারাই পথে নেমেছে। রঙ না থাক, কালো কালি নিয়েও ছেলে-খেলা করছে।

দোলযাত্রার তারিখটি ছিল 'ভোলা মাস্টার'-এর ৫১ ও ৫২তম অভিনয়।

এই দুর্দিনেও 'ভোলা মাস্টার' চলেছে, চলবে। ২৮শে মার্চ তারিখের দু'টি প্রদর্শনীতেই হাউস ফুল ছিল। দর্শকদের মধ্যে সেদিন অনেক নাট্যকার এবং শিল্পীও অভিনয় দেখতে এসেছিলেন।

'ভোলা মাস্টার' শুধু সাধারণ দর্শক-চিত্ত নয়, সুধী ব্যক্তিদের মনেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

১৫ই মার্চ ছিল বাংলা নববর্ষ। ঐদিন রঙমহলে অভিনীত হয়েছিল 'মাইকেল' নাটকটি। কিন্তু তার আগে 'নববর্ষ বরণ' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বীরেন ভদ্র। শরৎ সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিল, আর অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। সেদিন সঙ্গীতাংশে ছিলেন তারা ভট্টাচার্য এবং সম্প্রদায়।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে বর্ষ-বরণের রেওয়াজ আগে ছিল না। এই প্রথম সূচনা হল এবং আমিই ছিলাম এর উদ্যোক্তা। অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়েছিল। মনে আছে, ঐদিন

আমরা নববর্ষের শুভেচ্ছা ছাপার অক্ষরে পরিবেশন করেছিলাম। ফুল এবং মিষ্টান্ন দিয়ে সেদিন আমরা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করেছিলাম নববর্ষের প্রীতি।

আমি যতদিন রঙমহলে ছিলাম, এমনই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নববর্ষকে বরণ করেছি অন্যান্যদের সঙ্গে।

১৭ই এপ্রিল সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'যোগাযোগ' ছবিটি মুক্তি পেল—শ্রী, পূরবী এবং পূর্ণতে। ছবিতে কানন আর জহর ছাড়া আমিও ছিলাম একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়।

মনে পড়ে, কয়েকদিন পরে ২২শে এপ্রিল স্টার একটি নতুন নাটক উপহার দিল। নাটকের নাম 'সুকন্যা'। নাট্যকারের নাম রবীন্দ্র পাণ্ডে।

পরদিন ছিল ২৩শে এপ্রিল। সেদিন শ্রীরঙ্গম মঞ্চে নিতাই ভট্টাচার্যের 'মাইকেল মধুসূদন' নামে একটি নতুন নাটক পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এলেন শিশির ভাদুড়ী। শিশিরবাবুই ছিলেন নাম ভূমিকার শিল্পী।

একই মানুষের জীবন নিয়ে দু'টি নাটক, দু'টি মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। যদিও রঙমহলে তখন 'মাইকেল'-এর নিয়মিত অভিনয় বন্ধ। মাঝে মাঝে অভিনয় চলছে 'মাইকেল'-এর।

শ্রীরঙ্গমে 'মাইকেল মধুসূদন' চলছে। এদিকে রঙমহলেও 'মাইকেল' নাটকের শততম অভিনয় অনুষ্ঠিত হল ৫ই মে তারিখে। ঐ নাটকের নাম-ভূমিকার শিল্পী, আমি।

রঙমহলে 'মাইকেল'-এর শততম রজনীর অভিনয়ে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে এসেছিলেন ডাঃ মদন দত্ত, মন্মথ পাল (হাঁদুবাবু), ক্ষেত্র মিত্র, ডাঃ বি. কে. রায়, ডাঃ হেমেন দাশগুপ্ত, তারাশঙ্কর ব্যানার্জি, শচীন সেনগুপ্ত, মন্মথ বসু। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত সেদিন অভিভাষণের সঙ্গে শিল্পীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেছিলেন।

কলুটোলা ষ্ট্রীটের গিরি মল্লিক, যিনি একসময়ে থিয়েটারের মালিক ছিলেন, তাঁর ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বাড়ীতে নাটকাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। তখনকার দিনে কলকাতার বনেদী বড়লোকদের মধ্যেই এই রেওয়াজটা ছিল। একটা শুভ-অনুষ্ঠান কিছু হলেই বাড়ীতে নাটকাভিনয় এবং গান-বাজনার আয়োজন করা—চলতি নিয়মের মধ্যেই পড়তো।

গিরি মল্লিকের ছেলের বিয়েতে অভিনয় হবে দু'টি নাটক। 'সাজাহান' আর 'সুদামা'।

সে রাতে অভিনয় আরম্ভ হয়েছিল রাত এগারটার পর। সারারাত ধরে চলেছিল অভিনয়। তারিখটা মনে আছে, সেদিনটা ছিল ৭ই মে।

৯ই মে নাট্যভারতীতে 'পথের ডাক'-এর ৬০তম অভিনয় অনুষ্ঠিত হল। পবদিন ১০ই মে মিনার্ভা কর্তৃপক্ষেব নতুন ঘোষণা পডলাম। নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ভূমেন রায় এবং জীবন গাঙ্গুলী—মিনার্ভা মঞ্চে যোগ দিযেছেন। ঘোষণার ভাষা ছিল এই।

অনেকদিন পর যুদ্ধেব একটি খোশ-খবব পেলাম ১২ই মে। ঐ দিনই টিউনিসিযাব যুদ্ধে মিত্রশক্তিব কাছে আত্মসমর্পণ কবলো দুর্ধর্ষ নাৎসীবাহিনী। প্রতিপক্ষেব সৈন্যাধ্যক্ষ ভাবতীয় বাহিনীব হাতে আত্মসমর্পণ কবেছেন, এটা একটা খববেব মত খবব।

কিন্তু এই খোশ-খববে কি ভুলে থাকাব জো আছে। সাধাবণ মানুষ তখন নিজেকে নিযেই ব্যস্ত। শহবে খাদ্যাভাব সূচিত হযেছে। চাল পর্যন্ত মেলে না। সামান্য চালেব জন্যে সাবাবাত লাইনে দাঁডিয়ে থাকতে হয। নযতো সকালে দোকান খুললে চাল মিলবে না।

চোখেব সামনে দেখছি সাধাবণ মানুষেব অবস্থা। কোনমতে দৈনন্দিন জীবনেব জেব টানতেই মানুষেব নাভিশ্বাস উঠেছে। দেখেছি, কাতাবে কাতারে চালেব দোকানেব সামনে মানুষগুলো সাবাবাত লাইনে দাঁডিযে আছে। দেখেছি, আর ভেবেছি—এ দুঃখেব দিন কবে শেষ হবে।

২১শে মে তাবিখটি উদ্যাপিত হল 'টিউনিসিযা দিবস'রূপে।

টিউনিসিযা যুদ্ধেই বিশ্বযুদ্ধের গতিপথেব পবিবর্তন ঘটেছে, ঐদিন থেকেই মিত্র-শক্তিব অনুকূলে এসেছে যুদ্ধেব প্রকৃতি।

টিউনিসিয়া দিবস সাধাবণ ছুটি রূপে ঘোষিত হয়েছিল। ঐদিন কলকাতায় মিত্র-বাহিনীব প্যাবেড অনুষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন গভর্ণর স্যার জন হারবার্ট চৌবঙ্গী স্কোয়ারে স্যার আশুতোষেব স্ট্যাচুব নীচে অভিবাদন মঞ্চ থেকে সৈন্যবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেছিলেন।

শহরবাসীব মনেও সেদিন নতুন আশাব সঞ্চার হযেছিল। সবাই ভেবেছিল, হয়তো বিশ্বযুদ্ধের অবসান এবাবে ঘটবে।

এসময়ে মনোমোহন থিয়েটারে 'কণ্ঠহার' প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সে সময়ে 'কণ্ঠহার'-এ রণলালেব ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন দানীবাবু। এবং দানীবাবুর অবিস্মরণীয় অভিনযের স্মৃতি তখনো মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি।

সেই 'কণ্ঠহার' নতুন করে মিনার্ভায় এল ২২শে মে। রণলালের ভূমিকায় অভিনয় করলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

কিন্তু যে আশা নিয়ে 'কণ্ঠহার'-এর পুনরভিনয়, সেই আশা বা উদ্দেশ্য সফল হল না। 'কণ্ঠহার' দর্শক-মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করলো না।

আমার জীবনের সব কথা নাটক বা অভিনয় নিয়ে নয়; তার বাইরেও অনেক কথা আছে। বিচিত্র খেয়াল আছে। একটা বিচিত্র খেয়ালের কথা বলি। এই বয়সে আমার ইচ্ছে হল সংস্কৃত শিখতে। কথাটা ভান্নুকে বললামও। ভান্নু তার স্কুলের সংস্কৃতের মাস্টারকে নিয়ে এল আমার জন্যে। ঘটনাচক্রে দেখা গেল, সে আমার সহপাঠী বিপিন। অনেকদিন স্কুলে একই সঙ্গে পড়েছি এবং বন্ধুত্বও ছিল যথেষ্ট।

বললাম, কী, ভাল আছ তো!

বিপিন কিন্তু ইতস্তত করতে লাগলো। আমি যত সহজে পুরনো কথা মনে করে তার নাম ধরে ডেকেছি, সে কিন্তু ততখানি সহজ হওয়া দূরের কথা—বরং তাকে কেমন জড়ের মত মনে হল। আমাকে সে 'আপনি' বলে সম্বোধন করলে।

বললাম, তুমি আমাকে 'আপনি আপনি' করছো কেন?

বললে, তা-হোক—আপনি কত বড়ো হয়ে গেছেন!

যাই হোক বিপিনকে এ-নিয়ে আর কিছু না বলে, আমার সংস্কৃত পড়ার ইচ্ছেটা ব্যক্ত করলাম।

শুরু হল সংস্কৃত 'সাহিত্য-দর্পণ' পাঠ। কিছুদিন পড়লামও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম, এ-ভাবে পড়া মানে কিছু অর্থ এবং সময় অপচয় করা। বিপিন আমাকে কিছুই পড়ায় না। পড়ে যায়—আমি শুনি। এবং নিজে থেকেই তার মানে বলি। এ-ভাবে পড়ে কি হবে। তাই আপাততঃ বিপিনের কাছে সংস্কৃত পড়ায় ছেদ পড়লো।

নাট্যভারতী কর্তৃপক্ষ রঙমহলে অভিনীত 'তটিনীর বিচার'-এর ওপর হাইকোর্ট থেকে নিষেধাজ্ঞা এনেছিল। সেই 'নিষেধাজ্ঞা' উঠে গেল। কারণ আইনের কাছে ন্যায্য বিচারই সম্ভব। 'তটিনীর বিচার' রঙমহলেরই নাটক। নাট্যভারতী ওই নাটক পরে অভিনয় করেছিল। তাতে নাট্যভারতীর দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় না।

রঙমহল থেকে 'তটিনীর বিচার'-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল ২৪শে মে।

মে মাসের বাকি কয়েকটা দিনের ঘটনা-বৈচিত্র্য এমন কিছু ছিল না।

১লা জুনের দিনপঞ্জীর পৃষ্ঠা থেকে জানতে পারি, ঐদিন মেগাফোন কোম্পানী 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি রেকর্ড করেছিল। রেকর্ড-নাটকে আমি সেলুকাস চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম।

৩রা জুন রঙমহলে 'তটিনীর বিচার' নতুন করে অভিনীত হল। ঐদিনে দর্শকে পূর্ণ ছিল রঙ্গালয়।

এইদিনে শ্রীরঙ্গম এবং স্টারে নতুন নাটকের প্রস্তুতির জন্যে অভিনয় বন্ধ ছিল।

পরদিনই স্টারে মহেন্দ্র গুপ্তের নতুন ঐতিহাসিক নাটক 'মহারাজা নন্দকুমার'-এর শুভ উদ্বোধন হল।

এই চার তারিখেই আর্য ফিল্মের নতুন ছবি 'দ্বন্দ্ব' মুক্তি পেল রূপবাণী চিত্রগৃহে। ছবিতে আমিও ছিলাম।

সবই তো হচ্ছে, সবই চলছে, কিন্তু দেশের অবস্থা দিন-দিন যেদিকে চলেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে যে কী হবে, তা ঈশ্বরই জানেন!

প্রতিদিনের খবরে পড়ছি, দেশের খাদ্যাবস্থা একটা চরম জায়গায় পৌঁছেচে। কলকাতা শহরে চাল মেলে না বললেই চলে। সামান্য চালের জন্যে রোদ জল ঝড় মাথায় নিয়ে নারী, বৃদ্ধ এমনকি শিশুরা পর্যন্ত লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। কত সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েরা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। যে মেয়েরা ঘরের বার হয়নি, তারা পারবে কেন এই ভাদ্রমাসে এই কাঠ-ফাটা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে। তবুও মানুষের ক্ষুধা এমনই জিনিস যে কোন-কিছুই মানে না। ক্ষিদে পেয়েছে, চাল চাই—এর চেয়ে সত্যি কথা আর কিছু নেই।

তবু যখনই ভাবতে বসি দেশের হালচালের কথা, তখনই কেমন যেন হতাশ হয়ে যাই। ভাবি, না-জানি আরো কত দুঃখ আছে সাধারণ মানুষের জীবনে।

১০ই জুন তারিখে 'তটিনীর বিচার' দেখতে রঙমহলে এসেছিলেন অবিভক্ত বাংলার আই-জি, স্যার এডওয়ার্ড গর্ডন। অভিনয় দেখে সামগ্রিক অভিনয় এবং নাটকের তারিফ করেছিলেন, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও।

১২ই জুন তারিখে দিনপঞ্জীতে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে ভানুর আই. এস-সি পাশের খবর। ভানু আই. এস-সি পাশ করেছে প্রথম বিভাগে। মাত্র দশ নম্বরের জন্যে স্টার পায়নি।

এটি যেমন সুসংবাদ, তেমনি ঐ তারিখটি আর একটি দুঃসংবাদ বহন করছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চ এবং চিত্র-জগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ঐদিন কক্ষচ্যুত হল।

অভিনেতা দুর্গাদাসের অকাল-মৃত্যুর সংবাদ শুনেই কেমন যেন মুহ্যমান হয়ে গেলাম। একজন কাছের মানুষ সে-যে নেই, কথাটা ভাবতেই মন চায় না। অথচ এর চেয়ে সত্যি খবর আর কিছু নেই।

দুর্গাদাস আমার চেয়ে বছর দেড়েকের বড়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল একান্ন বছর। এই বয়সেই সে চলে গেল।

দুরারোগ্য ব্যাধিতে দু-তিন বছর ধরে ভুগছিল দুর্গাদাস। সেই অসুস্থ অবস্থাতে

সে অভিনয় করেছে প্রথম দিকে। কিন্তু শেষটায় আর পারতো না। শেষটা রোগ-শয্যায় শুয়েও তার মনটা থাকতো মঞ্চের দিকে। কিন্তু কোনদিন আর সে আসতে পারেনি রোগমুক্ত হয়ে।

দুর্গাদাসের কথাতেই বলি, 'দুর্গাদাস গেলে আর দুর্গাদাস হবে না।' সত্যি, সে ছিল আশ্চর্য অভিনেতা। আপন রাজ্যে আপনি সম্রাট।

দুর্গাদাসের মৃত্যুতে সেদিন সমস্ত অভিনয় বন্ধ রইলো। খবর পেয়েই আমি, শরৎ, রতীন, সন্তোষ সিংহ, অয়স্কান্তের সঙ্গে গেলাম কেওড়াতলা মহাশ্মশানে।

প্রিয় বন্ধু দুর্গাদাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম মনে মনে। প্রার্থনা করলাম, তার আত্মা যেন স্থান পায় ইপ্সিত স্বর্গে।

ঐদিনের ডায়েরীর পৃষ্ঠায় আরও একটি দুঃসংবাদ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঐ দিনেই হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট নেতা, বি. সি. চ্যাটার্জি বার-এ্যাট্-ল' ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

দুঃসংবাদ কখনো একা আসে না। ক'দিন যেতে না-যেতেই ২৬শে জুন আরো একটি মর্মান্তিক খবর, বিশিষ্ট নাট্যরসিক রাধাচরণ ভট্টাচার্যের মৃত্যু। ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে রাধাচরণ ভট্টাচার্য মারা গেছেন। রাধাচরণের মৃত্যুতে প্রিয়জন-বিয়োগ ব্যথা অনুভব করলাম।

৩০শে জুন দুর্গাদাসের শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান ছিল। রংমহলের অনুষ্ঠান শেষে, রংমহলের গাড়ীতেই সন্তোষ, রতীন, নৃপেন প্রভৃতিকে নিয়ে দুর্গাদাসের বাড়ীতে এলাম। দুর্গাদাসের স্ত্রী কিছুতেই ছাড়লো না। মিষ্টিমুখ করালো। কিন্তু সে মিষ্টির স্বাদ উপলব্ধি করতে পারলাম না। মন যে বিস্বাদ হয়ে গেছে দুর্গার মৃত্যুতে।

৩০শে জুন রংমহলে দুর্গাদাসের স্মৃতি-বাসর অনুষ্ঠিত হল। স্মৃতিবাসরে দুর্গাদাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিছু বললাম। একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলাম। এতে আমার বন্ধু দুর্গাদাস সম্পর্কে আমি আমার কথা ব্যক্ত করেছিলাম।

যেদিন দুর্গাদাসের স্মৃতিতর্পণ হচ্ছে একটি মঞ্চে, যেদিন তার শ্রাদ্ধবাসর রচিত হয়েছে, ঠিক সেই তারিখেই শ্রীরঙ্গমে 'ভিখারীর মেয়ে'-র উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হল।

রেডক্রশ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উত্তর কলকাতার পুলিশ অফিসারগণ 'মাইকেল' অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। ঐদিনের সাহায্য অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার। ঐদিনের অনুষ্ঠানে 'মাইকেল' অভিনয়ের জন্য রংমহলের পক্ষ থেকে আমার হাতে একটি রৌপ্যাধার উপহার দেওয়া হয়েছিল। সেদিন সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৫,০০০৲ টাকা।

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'-এর নাট্যভারতীতে উদ্বোধন হল ৩রা জুলাই। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শচীন সেনগুপ্ত।

গত কয়েকদিন যুদ্ধের খবরে তেমন কিছু নতুনত্ব ছিল না। ১০ই জুলাই তারিখে একটি অপ্রত্যাশিত সংবাদ ঘোষিত হল। সংবাদটি হল—সিসিলি দ্বীপে যুক্তরাজ্য বাহিনীর অবতরণের।

সংবাদটি পাঠ করে মনে হল, এবারে হয়তো যুদ্ধের একটা ফয়সলা হবে।

'ভোলা মাস্টার'-এর শততম রজনীর স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হল ১১ই জুলাই তারিখে। ৭-৩০ মিনিটে তদানীন্তন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব সেদিনের স্মারক উৎসবে পৌরোহিত্যে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু ফজলুল হক সাহেবের অন্যত্র কাজ থাকায়, তিনি মন্মথ বোসের হাতে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন।

সেদিনের বিশিষ্ট সমাবেশের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, নীহার-বালা, মন্মথ পাল, কুঞ্জ চক্রবর্তী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দুর্গা বোস, অসি বোস, শচীন সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, ডাঃ রাম অধিকারী, পি. কে. মুখার্জি ছাড়াও আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। সেদিনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন বীরেন ভদ্র।

কর্তৃপক্ষ 'ভোলা মাস্টার'-এর শততম রজনীর স্মারক-উৎসবে রংমহলের শিল্পী এবং কলাকুশলীদের মধ্যে পুবস্কার বিতরণ কয়েছিলেন।

১৫ই জুলাই ভানু প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এস-সিতে ভর্তি হল।

১৬ই জুলাই মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক 'সাবিত্রী' বীরেন ভদ্রের পরিচালনায় হিজ মাস্টারস ভয়েস রেকর্ড-এ গৃহীত হল। ঐ নাটকে আমি ছিলাম দ্যুমৎসেনের ভূমিকায়। এছাড়া মিহির ভট্টাচার্য, ধীরাজ, রাজলক্ষ্মী (বড), উষা (পটল)—এরাও অংশ নিয়েছিল।

এর পরের সপ্তাহটিকে একরকমের বন্ধ্যা সপ্তাহ বলা যেতে পারে। এর মধ্যে আমরা একটু-আধটু 'রিজিয়া' রিহার্সাল দিচ্ছিলাম। নয়তো নতুন কিছু নেই। অগ্নি নিরোধক ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যে মিনার্ভার অভিনয় বন্ধ হলো ১৮ই জুলাই।

৩০শে জুলাই রূপবাণীতে 'নীলাঙ্গুরীয়' ছবিটি মুক্তি পেল। পরদিন ৩১শে জুলাই মিনার্ভার বন্ধ দরজা খুললো।

এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্মরণ-তিথিটি এগিয়ে এল। ৮ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হল। ছেলেমেয়েরা 'জন-গণ-মন অধিনায়ক' গানটি গাইলো সমবেত কণ্ঠে। তারপর আরো গান, আবৃত্তি পরিবেশিত হল। সেইসঙ্গে কিছু আলোচনাও।

রবীন্দ্র স্মরণোৎসবটি সেদিন বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

রেকর্ড-নাটকের পালা পড়েছে। ১০ই আগস্ট মেগাফোন কোম্পানী 'মীরকাশিম' নাটকটি রেকর্ড করালেন। আমি ছাড়াও ঐ নাটকের শিল্পী ছিল নির্মলেন্দু, নরেশ মিত্র, শৈলেন চৌধুরী, রতীন, সন্তোষ সিংহ, প্রভা, রাণীবালা এবং আরো অনেকে।

ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় ডি-জি নামে পরিচিত। ডি-জি পরিচালিত নিউ টকীজের 'দাবী' ছবিটি মুক্তি পেল ১৪ই আগস্ট।

পরদিন পনরোই আগস্ট আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু কেষ্ট মুখার্জি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এলেন এবং রংমহলে 'ভোলা মাস্টার' অভিনয় দেখলেন। তার দু'দিন বাদেই কেষ্টবাবু আমার গোপালনগরের বাড়ীতে এসে বাড়ীর সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেদিন ভোজের আসরে কেষ্টবাবুর সঙ্গে নানা ধরনের গল্পগুজব হল।

১৯ই আগস্টের সংবাদে প্রকাশিত হল, মিত্রশক্তি-বাহিনী কর্তৃক সিসিলি অধিকার।

কিন্তু বাংলাদেশে যে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ছে, সেখানে দূর-দেশের খবরে কি হবে!

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর আসছে বন্যার। প্রলয়ঙ্করী বন্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তাছাড়া সারা দেশে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। গ্রাম-বাংলার মানুষ, যাদের ঘরে নেই খাবার, মাথা গোঁজার ঠাঁইও হয়তো ভেসে গেছে বন্যার জলে—সেই বন্যাপীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষেরা দলবেঁধে শহরে ছুটে আসছে বাঁচার তাড়নায়।

কিন্তু এত মানুষের মুখের অন্ন শহর জোগাবে কেমন করে। এখানেও তো মানুষ চালের জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছে। তা-ও জুটছে না। তারপর এইসব গ্রাম থেকে আসা ক্ষুধার্ত নরনারী ও শিশুর ভিড়। খাদ্য ত দূরের কথা—মানুষ এলে আশ্রয় নেবে কোথায়? শহরের গাড়িবারান্দা, রেল স্টেশন, এখানে আর কত মানুষের জায়গা হবে! তবুও মানুষ ভিড় করলো রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, গাড়িবারান্দার নীচে, না-হয় খোলা আকাশের নীচে—শহরের ফুটপাতে।

কিন্তু খাবার কোথায়?

প্রশ্ন আছে, উত্তর নেই।

এই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও ২০শে আগস্ট মিনার্ভা মঞ্চে নিরুপমা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হল। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য।

হোক না নতুন নাটক, কিন্তু দর্শক-মনে তেমন দাগ কাটতে পারলো না।

নাটকটির পরিচালকরূপে ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

২৩শে আগস্ট ছিল জন্মাষ্টমী। ঐ দিন সারারাত্রব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন হয়েছিল রঙমহলে।

'ভোলা মাস্টার', 'জন্মাষ্টমী', 'নন্দোৎসব', 'তটিনীর বিচার' ছাড়াও 'সুদামা' অভিনীত হয়েছিল। শহরে বিরূপ অবস্থা সত্ত্বেও প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল।

অভিনয় শেষে বাড়ী ফিরছি।

শেষ রাতের শহরকে দেখেছি অবসন্ন চোখে। পথের ধারে খোলা ফুটপাথে, গাড়িবারান্দায় নিরন্ন মানুষের ভিড়। শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসেছে ক্ষিধের জ্বালা মেটাতে। কিন্তু এই সব হতভাগ্য নর-নারীরা কি জানে, বন্ধ্যা শহর এই সব মানুষের ক্ষিধে মেটাতে পারে না। হোটেলের পরিত্যক্ত ফ্যান, নয়তো গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট খেয়ে এই মানুষেরা বাঁচবে কেমন করে!

বাড়ী ফিরেছি। মনটা এই সব হতভাগ্য নর-নারীদের চিন্তায় ভারাক্রান্ত।

কী করবো চিন্তা করে! নিয়তির নির্মম পরিহাস। প্রতিদিন যাওয়া-আসার পথে দেখছি অসহায় মানুষের অবস্থা। দেখছি, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ক্ষুধার্ত মানুষ মৃত্যুবরণ করছে শহরের রাজপথে। চোখের সামনে কতদিন দেখেছি, শবদেহ পড়ে আছে প্রকাশ্য রাজপথে। জীবন আর মৃত্যুর এক বিচিত্র সহাবস্থান দেখছি কলকাতার নগর-জীবনে।

রিজিয়ার রিহার্সাল চলছে প্রতিদিন। রিজিয়ার উদ্বোধনের দিন আসন্ন। আসছে মাসের ২ তারিখে উদ্বোধন তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে।

১লা সেপ্টেম্বর রঙমহলে 'মাইকেল'-এর ১১৮তম রজনীর অভিনয় ছিল। অভিনয় শেষে, রাত আড়াইটে পর্যন্ত 'রিজিয়া'-র রিহার্সাল চললো। পরদিন রিজিয়ার উদ্বোধন। সংবাদপত্রে ফলাও করে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। টিকিটের অগ্রিম বিক্রি দেখে মনে হল, নাটকটি ইতিমধ্যে নাট্যামোদীদের কাছে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

মহাসমারোহে 'রিজিয়া'-র উদ্বোধন হল। দর্শকসাধারণ ভিড় করে এল।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন নাটকের অভিনয় দেখতে দর্শকসাধারণের এতখানি আগ্রহ, এ-যেন প্রত্যাশার বাইরে। যাই হোক—'রিজিয়া' যে দর্শকসাধারণকে খুশি করতে পেরেছে, এইটাই আমাদের আনন্দ।

'রিজিয়া' নিয়ে আমরা যে পরিশ্রম করেছি তা সার্থক। কিন্তু এই নিয়ে কম কথা শুনতে হয়নি। কেউ বলেছিল এই বয়সে অহীনবাবু রিজিয়ার প্রেমে পড়েছেন। কেউ বলেছিল, পুরনো নাটক নিয়ে এত বাড়াবাড়ি ঠিক হচ্ছে না। এর খরচা কি উঠবে?

নাটকের ফলাফলই প্রমাণ করলো রিজিয়ার অভিনয় ব্যর্থ হয়নি।

এই নাটকে আমার ভূমিকা ছিল বক্তিয়ারের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চতুর্থ বার্ষিকী ছিল ৩রা নভেম্বর।

এই দিনেই মিত্রশক্তিবাহিনী ইটালীর মাটিতে অবতরণ করলো।

আবার এই তারিখেই স্টারে মহারাজা নন্দকুমারের ৫০তম অভিনয় রজনীর স্মারক-উৎসব অনুষ্ঠিত হল। ঐ উৎসবে পৌরোহিত্য করেছিলেন ফজলুল হক সাহেব। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নিজে যেতে পারিনি, তবে শুনেছি সেদিন স্টারের উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

ক'দিন আগে ইটালীতে মিত্রশক্তিবাহিনীর অবতরণের সংবাদ পেয়েছি। ৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশিত হল মিত্রশক্তির কাছে ইটালীর আত্মসমর্পণের কথা।

মুসোলিনীর দর্প চূর্ণ হল। যুদ্ধের খবরের সঙ্গে মঞ্চের খবরও আছে। ৮ই সেপ্টেম্বর 'মাইকেল' অভিনয় শেষে রিজিয়া রিহার্সাল চললো।

পরদিন 'রিজিয়া'-র ২য় রজনী। নাটকটি তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এরপর দিনগুলো প্রত্যহের নিয়মেই চললো।

অনেকদিন পর আবার বাগআঁচড়ায় গেলাম ২০শে সেপ্টেম্বর।

বর্ষার জের তখনো মেটেনি। দারুণ মশার উপদ্রব চলেছে গ্রামাঞ্চলে। সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়ার যথেচ্ছ আক্রমণ।

ভয় হল, ম্যালেরিয়া না পেয়ে বসে।

যাই হোক, ভয়ে ভয়ে ফিরেছি কলকাতায়। আবার সেই প্রত্যহের নিয়মের চাকায়-বাঁধা জীবন নিয়ে দৈনন্দিন জীবনের জের টেনে চলেছি।

২৪শে সেপ্টেম্বর বর্ধমান বন্যা তহবিলের সাহায্যার্থে 'রিজিয়া' অভিনীত হল রঙমহলে।

এরই মধ্যে ২৯শে সেপ্টেম্বর স্টার একটি নতুন নাটক উপহার দিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস 'দেবীচৌধুরাণী'। নাট্যরূপ দিয়েছেন মহেন্দ্র গুপ্ত।

যা মনে হয়েছিল তাই হল। বাগআঁচড়া থেকে ফেরার কয়েকদিন বাদেই ২রা অক্টোবর সুধীরাকে ম্যালেরিয়া ধরলো। জ্বর উঠলো ১০৪ ডিগ্রি।

সে রাত্রে প্রচণ্ড জ্বরে অস্থির হয়ে পড়েছিল সুধীরা। প্রায় রাত দুটো অবধি জেগেছিলাম তার জন্যে।

'রঙমহল সংবাদ'-এর পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হল ৩রা অক্টোবর। ৮-পৃষ্ঠার পুস্তিকা। নাটক এবং অভিনয়ের নানা টুকিটাকি খবর এতে থাকতো।

এদিকে আমার শরীর খারাপ হল। ইনফ্লুয়েঞ্জার মত। অসুস্থতার মধ্যেও 'ভোলা মাস্টার' অভিনয় করলাম। তাছাড়া এদিনে আবার দু'টি প্রদর্শনী ছিল।

ফিরে এসেছি অভিনয়-শেষে বাড়ীতে। শরীর অসুস্থ।

রাত্রের দিকে একটু কাঁপুনিও অনুভব করলাম। একটু জ্বরও হয়েছে।

আমার শরীর যে অসুস্থ শরৎ গতকালই তা জেনেছে। পরদিন সকালে আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক এসেছেন আমার জন্যে, তারপর শরৎ এল আর-একজন ডাক্তার নিয়ে। তিনিও আমাকে পরীক্ষা করলেন।

দুর্গাপূজার আগেই শরীর খারাপ হল ? কিন্তু ভেবে মন খারাপ করে কি হবে ? শরীর আছে, অসুখ-বিসুখও থাকবে। এখানে তো আমার নিজের হাত কিছু নেই।

আমার জন্যে রঙমহলের অসুবিধে হল বৈকি ! কোনমতে সেদিন 'ভোলা মাস্টার' অভিনয় করেছি, কিন্তু যেরকম শরীর, তাতে পূজোর মধ্যে আর অভিনয় করতে পারবো না। রঙমহলের পূজোর মরশুমের নাটক 'ভোলা মাস্টার', 'আগমনী' এবং 'কেদার রায়'। আমার জায়গায় অভিনয় করবে সন্তোষ সিংহ আর সন্তোষ দাস।

মহাসপ্তমীর দিনে দারুণ জ্বর হল। ডাক্তার জানালেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়—ম্যালেরিয়া,—বাগআঁচড়া থেকে সঙ্গে করে এনেছি।

রাত্রে শরৎকে ফোন করলাম। ফোনে সে জানাল, ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে সে আসছে। কিন্তু রাত্রে সে আর এল না। এল পরদিন সকালে। সঙ্গে বেঙ্গল ড্রাগস-এর ডাক্তার বি. বি. সেন। ডাক্তার পরীক্ষার জন্য রক্ত নিয়ে গেলেন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে পরীক্ষা করিয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, অসুখটা ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

আজ মহাষ্টমী। সারারাত্রব্যাপী অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে রঙমহলে, আর আমি বিছানায় পড়ে রইলাম। শরতের কাছেই শুনলাম, আজকের নির্ধারিত নাটক রিজিয়া, ভোলা মাস্টার, সুদামা, রাতকানা। শরৎ আজ বক্তিয়ারের ভূমিকায় অভিনয় করবে 'রিজিয়া' নাটকে।

ডাক্তার রাম অধিকারীকে ফোন করেছিল শরৎ। কথা ছিল আসার, কিন্তু এলেন না। কুইনিন ইন্‌জেকশন নেওয়াও হল না।

পরদিন মহানবমী। ডাক্তার ডি. আর. ধরকে নিয়ে শরৎ আমার বাড়ীতে এলো। ডাক্তার ধর আমাকে পরীক্ষা করে কুইনিন ইন্‌জেকশন দিলেন।

কিন্তু আমার স্ত্রীকে নিয়ে হল মুশকিল। সে কুইনিন ইন্‌জেকশন সহ্য করতে পারে না। জ্বর চলছে। অথচ ইন্‌জেকশন সে নিলে না।

মহানবমীতেও রঙমহলে সারারাত্রব্যাপী অভিনয় হবে। নাটক—ভোলা মাস্টার, তটিনীর বিচার আর প্রতাপাদিত্য। সন্তোষ সিংহ আজ তটিনীর বিচারে ডাঃ ভোস এবং ভোলা মাস্টারের নাম ভূমিকার অভিনেতা।

বিছানায় শুয়ে আছি। কিন্তু মন পড়ে আছে রঙমহলে। যেখানে হাজার হাজার দর্শক এসেছে অভিনয় দেখতে।

নবমীর রাত শেষ হল।

পূজা-মণ্ডপের সানাই বাজলো বিজয়া-দশমীর সুরে।

আজও ডাক্তার ডি. আর. ধরকে নিয়ে শরৎ আমার বাড়ীতে এল। আজও ডাক্তার আমাকে কুইনিন ইন্‌জেকশন দিলেন।

গতকালের চেয়ে আজ শরীর যেন অনেকটা সুস্থ। দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। বারান্দায় ডেক-চেয়ারে এসে বসেছি। চেয়ে আছি বাইরের রাজপথের দিকে। রাজপথে বর্ণাঢ্য নর-নারীর মিছিল চলেছে যেন। দূর থেকে কানে আসছে বিজয়ার বাজনা, সানাই-এর সুর।

বিজয়ার দিনে প্রিয়-পরিজনের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পালা। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা ভিড করে এল। তারপর আমার অসুস্থতার সংবাদ যারা পেয়েছে, তারাও এসেছে।

যাই হোক, অন্যদিনের চেয়ে সেদিন কিছুটা সুস্থই ছিলাম।

পরদিন, শরীরটা কিছুটা ঝরঝরে মনে হল। জ্বর না হলেও দুর্বলতা এখনো আছে। এটুকু কি সহজে যাবে!

আমার স্ত্রীও আগের চেয়ে কিছুটা সুস্থ। তবে তার জ্বর এখনো একেবারে যায়নি।

অনেকদিন এমন গৃহে বন্দী হয়ে থাকিনি। জ্বর উপলক্ষ করে দু'সপ্তাহের মত চুপচাপ ঘরে বসে রইলাম।

সবচেয়ে মন খারাপ হল 'রিজিয়া'র ব্যাপারে। এত পরিশ্রম গেল নাটকটির জন্যে, অথচ নাটকটি বন্ধ হল আমার অসুস্থতার জন্যে। যাই হোক, যা ঘটেছে, তার ওপর তো আমার হাত নেই। তবু মন কি বোঝে?

এদিকে রঙমহলে শচীন সেনগুপ্তের 'স্বামী-স্ত্রী' নাটকটির পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা হল। 'স্বামী-স্ত্রী' একসময়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, জানি না, এবারে কেমন চলবে।

রঙমহলে 'স্বামী-স্ত্রী' মঞ্চস্থ হল ২১শে অক্টোবর।

ক'দিনের জন্যে হাওয়া-বদল করতে কলকাতার বাইরে যাওয়া ঠিক করলাম। ডেহরি-অন-শোন, স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল জায়গা। তাছাড়া এখানে একটা সুবিধেও পেলাম।

একসময়ে ডালিমতলায় যে বাড়ীতে ছিলাম, সেই বাড়ীর মালিক উমেশ মিত্রের বাড়ী আছে ডেহরি-অন-শোনে। উমেশবাবুর ছেলে যাকে আমরা তার ডাক-নামেই চিনি, সেই 'গোলা' আমাকে ডেহরি-অন-শোনের কথা বললে। বললে, কোন অসুবিধে হবে না, ওখানে আমাদের বাড়ী আছে। খালি আছে ঘর। যেমন খুশি থাকবেন—। সুতরাং ডেহরি-অন-শোনে যাওয়াই স্থির হল।

আমার বাইরে যাবার কথা চলছে। তারই মধ্যে ২১শে অক্টোবর তারিখে অভিনেতা ভানু আর আশু বোস এল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

কয়েকদিন শরৎ আসেনি। কিন্তু ঐ দিনেই তার ফোন পেলাম। জানাল, আমার সঙ্গে সে হাওড়া স্টেশনে দেখা করবে।

সেদিন ছিল বাইশে অক্টোবর। হাওড়া থেকে তুফান এক্সপ্রেস ধরেছি। একা নই, সুধীরা আছে, আছে ভানু, মীরা। ভাগনে বিশুও সঙ্গে যাচ্ছে। এ-ছাড়া হরিদাস কাকার মেয়ে নেড়ী, ডালিমতলার বাড়ীওয়ালার ছেলে গোলা, তার কর্মচারী হাবুও চলেছে আমাদের সঙ্গে। পাণ্ডে, তারিণী, লক্ষ্মণও বাদ যায়নি। অর্থাৎ প্রায় গোটা সংসার নিয়ে চলেছি ডেহরি-অন-শোনে।

রঙমহলের শরৎ চাটুজ্যে, নাট্যভারতীর বিজয় মুখার্জী, আমার কনিষ্ঠ পঞ্চু, অধ্যাপক মন্মথ বোসের ছোট ছেলে লালমোহন—এরা সবাই এসেছে হাওড়া স্টেশনে। আমাদের অনেক সাহায্যও করলো তারা।

তারপর যথাসময়ে ট্রেন ছাড়লো। স্টেশনে যারা এসেছিল, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বিদায় জানালাম। তারাও শুভেচ্ছা জানাল হাত নেড়ে।

তুফান এক্সপ্রেস ছুটে চললো। ছুটন্ত-ট্রেনের জানালার পথে বাইরের দিকে চেয়ে থাকি।

বর্ধমান জেলার ভয়ংকর বন্যার কথা কাগজে পড়েছি। বন্যার্তদের সাহায্য-রজনীতে নাটক অভিনয় করেছি, এবারে শক্তিগড় পেরিয়ে বন্যার তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করলাম।

রেল-লাইন বরাবর জল উঠেছে। কোথাও কোথাও ধ্বস নেমেছে রেলের বাঁধে। তাই মন্থর গতিতে ট্রেন চলেছে। শুধু তাই নয়, জায়গায় জায়গায় ট্রেন থেমে যাচ্ছে। চলার সংকেত পেলে আবার মন্থর গতিতে চলতে আরম্ভ করছে।

বন্যার সঙ্গে মানুষের লড়াই প্রত্যক্ষ করলাম। বাঁচার তাগিদে মানুষ বন্যার জলের সঙ্গে লড়াই করছে। হাজার হাজার মানুষ কাজ করছে। কোথাও বাঁধ কেটে বন্যার জল বার করে দিচ্ছে, কোথাও ভাঙ্গা-বাঁধ মেরামতের চেষ্টা-চলেছে।

এই রাতেও দেখছি, উজ্জ্বল আলোয় কাজ করছে মানুষ। মনে মনে তারিফ করলাম এই সব মেহনতী মানুষদের।

অবশেষে বর্ধমান স্টেশনে এসে পৌছলাম। বর্ধমান স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ভিড় করেছে বন্যাপীড়িত নর-নারী। দু'চোখে প্রত্যক্ষ করলাম বন্যার্তদের দুর্গতি।

বর্ধমানে ক্ষণিক-বিরতির পালা ফুরলো। ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো।

যে স্টেশনে দাঁড়ায়, সেখানে যাত্রীর ভিড লক্ষ্য করি। মানুষের জীবনযাত্রা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে।

দুর্বল শরীর। একসময়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি।

রাত শেষ হয়ে যায় গাঢ় ঘুমের মধ্যে। ভোরের আলোয় চোখ মেলে চাই। বিহারের পাহাড়-প্রান্তরের মৃদু কুয়াশা জড়ানো প্রচ্ছদপট। তারপর ভোরের বাতাসে মৃদু শীতের আমেজ।

ডেহরি-অন-শোনে পৌছলাম সকাল দশটা বিশ মিনিটে।

নেমে এসেছি প্ল্যাটফর্মে। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি চারদিকের দৃশ্যপটে। তারপর ওভার-ব্রীজ পেরিয়ে এসেছি প্ল্যাটফর্মের বাইরে। শরীর এতই দুর্বল— ওভার-ব্রীজে উঠতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসেই দেখলাম কয়েকজন বাঙ্গালী যুবককে। যারা আমাকে সানন্দে ঘিরে ফেললো। কেউ কেউ বললেও আমার শরীরের কথা। তাদের চোখে আমাকে নাকি অসুস্থ দেখাচ্ছে।

বললাম, হ্যাঁ ভাই—ক'দিনের জ্বরে বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছি। সেইজন্যেই এখানে আসা। বায়ু-পরিবর্তনে যদি কিছুটা সুস্থ হতে পারি।

স্টেশন প্ল্যাটফর্মের বাইরেই অপেক্ষমান টাঙ্গা। স্টেশন থেকে টাঙ্গায় চেপে সরাসরি আমাদের নির্দিষ্ট বাংলোয় এসেছি।

সুন্দর ছিমছাম বাংলো। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। শুনলাম, এটি খেলার মাঠ।

তাছাড়া বাড়ীটির পরিবেশও মনোরম। শোনের বেলাভূমি চোখের সামনেই ছড়িয়ে আছে। দীর্ঘ রেল-সেতুটিও এখান থেকে সুন্দর দেখায়।

পাশাপাশি দু'টি বাংলো। আমরা আছি প্রথমটিতে। বাংলোতে পৌছে কী খেয়াল হল—সামনে সদর রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। বাংলো থেকে সদর রাস্তা, কতটুকুই বা দূরত্ব। এইটুকু হাঁটতে নিজেকে অশক্ত মনে হল। শরীর আমার এতই দুর্বল।

সারাদিন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিলাম। বিকেলের দিকে এসে বসেছিলাম বারান্দায়। চেয়ে ছিলাম শোনের দিকে। দৃষ্টিটা মাঝে মাঝে আরো দূরে ছড়িয়ে দিচ্ছিলাম বিস্তৃত শোনের পারে।

রাত্রে সুনিদ্রাই হল।

সূর্য ওঠার আগেই ঘুম ভেঙ্গেছে। শরীরও বেশ ঝরঝরে। মনেই হয় না যে, আমি অসুস্থ।

উঠে বাইরে এলাম। শোনের পারে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম। ভানু, মীরা, বিশু—ওরা তো বেড়াতে বেড়াতে বেশ দূরেই চলে গেল। কলকাতা শহরের বন্দী মানুষ, বাইরে এলে কোন বাধাই মানতে চায় না।

সকালটা আর দূরে কোথাও যাইনি। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরোলাম। শহরের বাজার, থানা, শোনের তীরে রাধা-কৃষ্ণ, শিব এবং শ্রীরামের মন্দির দর্শন করেছি।

যেখানেই মানুষ, সেখানেই মন্দির—আর দেবতা। বিশ্বাসকে বিগ্রহ করে মন্দির গড়েছে মানুষ। সেই বিশ্বাসের দেবতা যে নামেই চিহ্নিত হোক না কেন।

এইদিনেই সন্ধ্যের আগে গোলা, হাবু, বিশু—ওরা সবাই গেল ডালমিয়ানগরে ডালমিয়া-জৈন প্রতিষ্ঠানের অফিসার মিস্টার বর্মনের সঙ্গে দেখা করতে।

এইদিনেই সাসারাম যাওয়ার আয়োজন সম্পূর্ণ করলাম।

পরদিন শেরশাহের স্মৃতি-বিজড়িত সাসারামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কিন্তু যাওয়ার পথেই পড়লো বাধা। একটা সাইকেল রিক্শার টায়ার ফেটে গেল। রওনা হতে চারটের জায়গায় সাড়ে চারটে হল।

আমাদের নিয়ে চারখানি রিক্শা ছুটে চললো সাসারামের পথে।

ডেহরি থেকে সাসারামের দূরত্ব বারো মাইলের মত। দেড়ঘণ্টা সময় লাগলো সাসারাম পৌঁছতে।

একজন গাইড সঙ্গে নিয়েছি। শেরশাহের সমাধি এবং যা কিছু দর্শনীয় দেখাবে।

গম্বুজাকৃতি সমাধি-মন্দির। ইতিহাসের অনেক অব্যক্ত কাহিনী জড়িয়ে আছে এর পাথরে পাথরে। পাঠান সম্রাট শেরশাহ ভারতের পাঠান আমলের একমাত্র মুসলমান সম্রাট, যিনি ভারতের কল্যাণ কামনা করেছিলেন। ভারতের মাটিকে যিনি স্বদেশের মাটি মনে করেছিলেন।

সমাধি-মন্দিরটি পর্যায়ক্রমে কয়েকতলা উঁচু। উপরে গম্বুজাকৃতি খিলান। গাইড সবই দেখালো। কিন্তু সমাধি-মন্দিরটি জড়িয়ে কেমন যেন এক শূন্যতা।

সমাধি-মন্দির দর্শনান্তে স্থানীয় বাজারে এসেছি। যেটুকু দেখার দেখেছি। তারপর জলযোগান্তে ধরেছি প্রত্যাবর্তনের পথ।

আসার পথে দিনের আলোয় দেখেছি চলতি পথের দৃশ্য। একদিকে রেলপথ, অন্যদিকে ছোট ছোট পাহাড় আর টিলা। দেখেছি শ্রমিকেরা পাথর কাটছে, পাথর ভাঙছে। পাথর কেটে শিল, চাকি তৈরি করছে। কিন্তু ফিরছি রাতের অন্ধকারে। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখছি না। মাঝে মাঝে জনপদের আলো।

ফিরে এসেছি বাংলোয়। রাত তখন দশটা। এসেই শুনলাম, ডালমিয়ানগর থেকে মিঃ বর্মন এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। অনেক সময় অপেক্ষা করছেন তিনি।

পরদিন ২৬শে অক্টোবর। সকালে তুফান এক্সপ্রেসে গোলা, হাবু, ভানু, বিশু রওনা হল বেনারসে।

আমরা সারাদিন বাংলোতেই রইলাম। বিকেলে আমরা মিলিটারী রোড ধরে স্টেশনের দিকে গেলাম। কিন্তু ব্রীজের কাছে এসেই বাধা পেলাম। ব্রীজের ওপর দিয়ে যাওয়া নিষেধ। সৈনিক প্রহরা মোতায়েন। অগত্যা ব্রীজের নীচে শোনের বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। যেখানে শোনের জলধারা বয়ে চলেছে, সেই পর্যন্ত এলাম। এখানে দাঁড়িয়েই দেখলাম, শোন ব্রীজের ওপর দিয়ে ট্রেন চলেছে।

যত সময় দিনের আলো রইলো, শোনের বালিরাশির ওপর বেড়িয়ে বেড়ালাম। তারপর সন্ধ্যা নামতে আবার পায়ে পায়ে হেঁটে ফিরে এলাম বাংলোয়।

পাণ্ডে আমার কর্মচারী। তার বাড়ী এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সাসারাম হয়ে যেতে হয়। মেন লাইন ধরে বিহিয়া স্টেশনে নেমে যেতে হয় তার বাড়ী। সাতাশ তারিখেই সে বাড়ী গেল। এত কাছে এসে বাড়ী যাবে না, সে তো হয় না।

এইদিনেই যারা বেনারস গিয়েছিল, ফিরে এল। শুনলাম বেনারসে তারা ইন্দু ভট্টাচার্য এবং নরেন-দা'র ছেলের সঙ্গে দেখা করেছে। এদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়।

গোলা আর হাবু আজই কলকাতায় যাবে। ওদের পৌঁছে দিতে স্টেশনে এলাম।

স্টেশনের কাছেই সৈন্যবিভাগের জন্য সরকারের সংরক্ষিত পেট্রল ট্যাঙ্ক। বিয়াল্লিশের আগস্ট বিপ্লবে বিদ্রোহীরা এই পেট্রল ট্যাঙ্কে আগুন দিয়েছিল। সেই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন এখনো বর্তমান।

পেট্রল কোম্পানীর কর্মীর কাছে শুনলাম, বিয়াল্লিশের কথা। বিদ্রোহীরা আগুন দিয়েছিল পেট্রল ট্যাঙ্কে, রীতিমত সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল এই এলাকায়; কিন্তু সৈন্যবাহিনীর রাইফেলের সামনে বিপ্লবীরা দাঁড়াতে পারেনি। প্রচুর সংখ্যক বিপ্লবী এখানে প্রাণ দিয়েছে, আহত হয়েছে, এবং অনেকে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছে।

সেদিন ডেহরি-অন-শোন থেকে শোন ইস্ট ব্যাঙ্ক পযন্ত সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

অনেকসময় দাঁড়িয়ে থেকে বিয়াল্লিশের সেই ভয়ংকর দিনের কাহিনী শুনলাম।

সুধীরার শরীর ভাল ছিল না। এখনো তার কাশি আছে। স্টেশন থেকে ফিরে এলাম বাংলোয়। ভানু আর বিশু গিয়েছিল ডালমিয়ানগরে মিঃ বর্মনের বাড়ীতে। সেখানে অনেক বেড়িয়েছে তারা, শুনলাম ডালমিয়ানগরের বাঙ্গালী রেলকর্মীদের সঙ্গেও তারা আলাপ-পরিচয় করে এসেছে। ডেহরি-অন-শোনের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশনমাস্টার মিঃ চাটার্জির সঙ্গেও তারা রীতিমত বন্ধুত্ব জমিয়েছে শুনলাম।

বিকেলে আমরা বেড়াতে বেরোলাম। মীরা, ভানু, বিশুর সঙ্গে লক্ষ্মণও আছে।

আমাদের গন্তব্য স্থান 'এ্যানিকাট' সাইডে। শোনের ওপর এখানে একটি বাঁধ আছে। পূব থেকে পশ্চিমে। যে বাঁধ একটি বিরাট জলাধার সৃষ্টি করেছে। জলাধারের উদ্বৃত্ত জল উত্তর দিক থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই জল মিশে যায় শোনের মূলধারার সঙ্গে।

বাঁধ থেকে বেরিয়েছে সুন্দর একটি খাল। যার দু' তীরে সুন্দর সবুজের সারি।

ডেহরি থেকে বক্সার পর্যন্ত এই জলপথ চলে গেছে। যে জলপথে স্টীমার যাতায়াত করে। জলপথে এই ভ্রমণটুকু নাকি খুবই মনোরম।

এই বাঁধ, জলাধার এবং জলপথের নির্মাণ কাল ১৮৭০ থেকে ১৮৭৪ খৃস্টাব্দ।

শোনের বাঁধ, জলাধার প্রভৃতি দেখে বাজারে এসেছি। আজ দেওয়ালীর সন্ধ্যা। আশা করেছিলাম, বাজারে আলোর উৎসব দেখবো। কিন্তু যেমনটি আশা করেছিলাম, তেমনটি দেখলাম না। বুঝতে পারলাম, এ-মহল্লার অধিকাংশ দোকান-পসার, বাড়ী-ঘর, মুসলমানদের। তবে হিন্দুর দোকান এবং বাড়ী-ঘরে যথারীতি আলোর উৎসব লক্ষ্য করলাম।

এখানে এসে পর্যন্ত মনের মধ্যে ঐতিহাসিক রোটাস দুর্গ দেখার বাসনা। ৩১শে অক্টোবর, রাত সাড়ে তিনটায় টাঙ্গা নিয়ে রওনা হলাম ডেহরি-রোটাস লাইট রেলওয়ের স্টেশনে। উদ্দেশ্য রোটাসগামী ট্রেন ধরা।

রাত থাকতে রওনা হবার একমাত্র কারণ, যত সকাল সকাল রোটাসে

পৌছনো যায়, ততই ভাল। পাহাড়ের ওপর দুর্গ। রোদের তেজ বাড়ার আগে উঠতে পারলে কষ্টটা কম হয়।

কিন্তু মাঝপথে আমাদের টাঙ্গা দাঁড়াতে বাধ্য হল। মিলিটারী কনভয় চলেছে! পথ বন্ধ।

কনভয় চলে গেল। আমাদের টাঙ্গা আবার চলতে আরম্ভ করলো।

ডেহরী সিটি স্টেশনে পৌছতে পাঁচটা বাজলো। টাঙ্গাওয়ালাকে বললাম, ডেহরি-রোটাস রেলওয়ের টার্মিনাসে পৌছে দিতে। দিলেও।

কিন্তু স্টেশনে পৌছে দেখি, স্টেশনমাস্টার ঘুমিয়ে আছেন। ডাকাডাকি করতে তবে ঘুম ভাঙলো। ঘুম-ভাঙা চোখে তাকালেন আমার দিকে। দেখে মনে হল ভদ্রলোক একটু কুড়ে ধরনের।

যাই হোক, স্টেশনমাস্টার ভদ্রলোক উঠলেন। তারপর খবর নিলেন টার্মিনাসে। মিঃ বর্মন টার্মিনাসেই আছেন। ডাউন ট্রেনে আমরা ডেহরিতে গেলাম। সেখানেই দেখা হল মিঃ বর্মনের সঙ্গে। মোটর-চালিত গাড়ী আমাদের জন্যে ঠিক করে রেখেছেন।

এই গাড়ীর জন্যে কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিতে হয়েছে।

আমাদের গাড়ী যথাসময়ে ছাড়লো। গাড়ী বলতে এন্‌জিন এবং তার সঙ্গে যুক্ত একটি ছোট কামরা। ড্রাইভারের কাছেও চার-পাঁচজন বসতে পারে।

গাড়ী চলতে শুরু করলো। শীত-শীত ভোরে এই আঁকা-বাঁকা ছোট রেলপথ ধরে মোটর-চালিত গাড়ীটি ছুটে চললো রোটাস দুর্গের দিকে।

রোটাস ফোর্ট স্টেশনে নেমেছি যখন, তখনো দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি।

গাড়ী থেকেই পাহাড়ের ওপর দুর্গ দেখে ছেলে-মেয়েদের কী আনন্দ! কিন্তু এ-আনন্দের অংশ আমি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারলাম না। কারণ, এই পাহাড়ে ওঠা আমার পক্ষে এই শরীরে সম্ভব নয়। তাছাড়া জোর করে উঠবো, সে ইচ্ছেও নেই। এসেছি অসুস্থতার জন্যে হাওয়া বদল করতে। চিন্তাটা—এই পাহাড়ে উঠে আবার যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি!

শুধু আমি ছাড়া আর সবাই গেল দুর্গ দেখতে। সাত মাইল হাঁটতে হবে এখান হতে।

ওরা ফিরে আসুক, ওদের মুখেই শুনবো'। সবাই চলে গেল। আমি একা রইলাম। কখনো চুপচাপ বসে, কখনো স্টেশনের আশপাশে পদচারণা করে সময় কাটালাম।

রোটাস ফোর্ট দেখে সবাই ফিরে এল। এবারে ডালমিয়া-জৈনের সিমেণ্ট কারখানা দেখার পালা।

দেখতে গেলাম। দেখলাম যন্ত্রের বিরাট কর্মকাণ্ড। দেখে বিস্মিত হতে হয়—যন্ত্র আর যন্ত্রকুশলী মানুষের এক বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে এখানে। রজ্জুপথে পাথর এসে পৌঁছচ্ছে। সে পাথর যন্ত্রের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। তারপর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চলেছে মিশ্রণের পালা। অবশেষে সিমেণ্ট তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসছে।

সিমেণ্ট কারখানার প্রতিটি ক্ষেত্রই দেখেছি। খুঁটিয়ে দেখেছি। আর ভেবেছি, যন্ত্রের অবদানের কথা।

দেখেছি, একালের বিশ্বকর্মাদের। দেখেছি, কারখানার শ্রমিকদের।

সব দেখার পরেও মনে হল, যেন এই কর্মযজ্ঞের অনেক কিছু দেখা হল না।

এ-তো আজকের কথা নয়। আজ থেকে দু' যুগ আগের কথা। যখন আমাদের দেশের কৃষি একান্তভাবে প্রকৃতিনির্ভর ছিল।

কিন্তু ডেহরি-অন-শোনের কাছেই শোনের তীরে দেখলাম আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষির কাজ চলেছে।

সেদিন জ্ঞানচাঁদের নৌকোয় শোনের ওপর বেড়াতে বেরিয়েছি। এক সময় পারে এসে ভিড়লো জ্ঞানচাঁদের নৌকো। নেমে এলাম পারে। শোনের তীর বরাবর মাটির পথ চলে গেছে। এই পথ ধরে চলতে চলতে এক জায়গায় দেখলাম, আধুনিক সেচ-পরিকল্পনা। গভীর নলকূপ বসিয়ে বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প দিয়ে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে কৃষি এলাকায়। দেখলাম রবিশস্য, আর আখের চাষ হয়েছে বিরাট এলাকা জুড়ে। রুক্ষ মাটি প্রাণ পেয়েছে জলসিঞ্চনে। বন্ধ্যা মাটি প্রসব করছে সোনার ফসল।

আখের ক্ষেত দেখলাম। আখের ক্ষেত দেখতে গিয়েই কয়েকজন চাষীর সঙ্গে দেখা হল। আমরা তাদের এখানে বিদেশী, আগন্তুক, দেখতে পেয়েই ভিড় করে এলো।

নানা কথা হল এইসব সরল প্রাণের মানুষদের সঙ্গে। তারা আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখালো।

বিদ্যুৎচালিত পাম্পে জল ওঠে গভীর নলকূপ থেকে। সেই জল সংরক্ষিত হয় একটি জলাধারে। এই জলাধার থেকে পাইপ-লাইন টানা আছে কৃষি এলাকায়। প্রয়োজন মতো সেই জল দেওয়া হয়।

কাটা নালা-পথ থেকে সেই জল মাটির সরু সরু খাড়ি দিয়ে যে যার নির্দিষ্ট এলাকায় টেনে নেয়। যার যেমন প্রয়োজন, সে সেইটুকু জলই গ্রহণ করে। এই জলের জন্যে প্রয়োজনীয় করও দিতে হয়।

একজন বর্ষীয়ান চাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন ফসল হচ্ছে?

যে উত্তর দিলে, ফসল ভালই হচ্ছে, বাবু। জলের জন্যে আমাদের আর আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হয় না।

বললাম, তাহলে ভালোই হয়েছে বলো।

বললে, হ্যাঁ ভাল তো সবই হয়েছে। তবে জলের জন্যে আমাদের যে দাম দিতে হয়, তার হিসেবটা বুঝি না।

—তার মানে?

—মানে আর কিছু নয়, কতোখানি সরকারের খাতায় জমা পড়ে, আর কতোখানি পাম্পের বাবুর হাতে যায় তা বুঝি না।

—তা কেন হবে। তোমরা টাকা দাও কিসের হিসেবে?

—ওই যে ঘড়ি আছে না বাবুজী—ওই ঘড়ির কাঁটা দেখেই বাবু জলের হিসেব করে। তবে টাকা আমরা সবই দিয়ে দিই।

ঘড়ি বলতে ওরা 'মিটার'কে বোঝাতে চায়,—যে মিটারে জলের হিসাব ধরা পড়ে।

যাই হোক, সেচ এলাকা যতটুকু দেখার দেখলাম। দেখে আনন্দ হল। মান্ধাতার আমলের রীতি-নীতি বদলে যাচ্ছে। জানি না, কবে এই বিরাট ভারতবর্ষের কৃষিযজ্ঞে এমনি আধুনিক ধারার প্রবর্তন হবে।

বেশ কয়েক দিন হয়ে গেছে কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছি। কলকাতায় যখন থাকি তখন মানসিক অবস্থা থাকে এক, আর যখন বাইরে আসি তখন মনের চেহারাটাই যায় বদলে।

কদিনে শরীরের দুর্বলতা কেটে গেছে। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ।

এর মধ্যে আবার নতুন খেয়াল হয়েছে নৌকোয় বেড়ান। প্রতিদিন অপরাহ্ণে নৌকোয় বেড়াই শোনের বুকে। আমাদের নৌকোর মাঝির নাম জ্ঞানচাঁদ। সে আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

কখনো জ্ঞানচাঁদ আমাদের নিয়ে যায় দূরে, কোনদিন শোনের পাড়ে নিয়ে যায়। যেখানে আমরা বালির ওপরে হেঁটে বেড়াই। কখনো নদীর পাড়ে কোন অজানা গ্রামের প্রান্তে বেড়িয়ে আসি। দেখি অপরিচিত পরিবেশ, কত অপরিচিত চরিত্র!

ডেহরী-অন-শোনের দিনগুলো বেশ আনন্দেই কাটে। এরই মধ্যে এক-এক সময় আসে যখন কলকাতার খবরের জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়।

কলকাতার খবর পেলাম নভেম্বরের প্রথম দিনটিতে। কয়েকজনের চিঠি পেলাম

সকালে। বিকেলের ডাকে এল রঙমহলের শরৎ চাটুজ্যের চিঠি। চিঠিটা পড়ে মনটা খারাপ হল। চিঠিতে রঙমহলের দুরবস্থার কথা জানিয়েছে শরৎ। রঙমহল চালানোই তার পক্ষে মুশকিল। তারপর সবচেয়ে দুঃখের কথা, শরৎ যখন বিপর্যয়ের মুখোমুখি, তখন সমবেদনা আর সহানুভূতি জানানোর মতো মানুষও তার পাশে নেই।

শরতের চিঠিটা বার-বার পড়লাম। পড়ে সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি।

সেই রাত্রেই শরতকে চিঠি লিখলাম তার দুর্দিনে সহানুভূতি জানিয়ে।

এর পরেও কদিন ডেহরী-অন-শোনে ছিলাম। প্রতিদিন এখানে-ওখানে বেড়িয়েছি। দেখেছি আশ-পাশের গ্রাম। দেখেছি, সেখানে এক এলাকার আধুনিক সেচ ব্যবস্থা; সেই অঞ্চলের অন্য এলাকায় দেখেছি ইঁদারা থেকে পারসীয়ান হুইল পদ্ধতিতে জল তুলে চাষের জমিতে দেওয়া হচ্ছে। দেখেছি, ফসলের জন্যে কী প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে এই অঞ্চলের চাষীরা।

কতদিন দূর গ্রামে বেড়াতে গিয়েছি। এরই মধ্যে এক-আধ দিন মনের মধ্যে শিকারের বাসনা জেগেছে। যেখানেই যাই, আমার দোনলা বন্দুকটি সঙ্গেই থাকে। এক-আধ দিন শিকার করব বলে বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছি; কিন্তু শিকার করা হয় নি।

যাই হোক, দিনগুলো এমনি করেই কাটছে।

৬ই নভেম্বর ভানু চলে যাবে কলকাতায়। তার কলেজ খুলেছে, থাকার উপায় নেই। ভানুর সঙ্গে তারিণীও যাবে। আমি ওদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলাম। ওদের পৌঁছে দিয়ে বাসায় ফিরেছি যখন তখন সন্ধ্যা ৭-৩০। আজ আর কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে নেই, নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিই। তাই নিলাম।

এই দিনের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখেছি, 'দেবর' চিত্রটি মুক্তিলাভ করছে কলকাতায়। ঐ চিত্রে আমিও অংশ নিয়েছি।

ডেহরী-অন-শোনের দিনগুলো ফুরিয়ে এলো।

সুধীরার ইচ্ছে ফেরার পথে কাশীধাম দর্শন করে যাবে। ইচ্ছেটা শুধু তার নয়, আমাদেরও।

১৮ই নভেম্বর সকালে বিশুকে আগেভাগে বেনারস পাঠালাম। আমরাও আজই যাব, তবে পরে। বিশুকে আগে পাঠানোর উদ্দেশ্য, ও কাশীতে সব ব্যবস্থা করে রাখুক। বিশুর হাতে ইন্দুবাবুকে চিঠিও দিলাম।

বিশু চলে গেল। আমরা বিকেল তিনটে পঞ্চান্ন মিনিটে গয়া-বেনারস এক্সপ্রেস ধরলাম। তখন বেশ বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

ট্রেনে দারুণ ভিড়। একটিমাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা। তা-ও বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। ছাদ থেকে জল পড়ছে। প্রথম শ্রেণীর কামরার হাল এই।

লটবহর নিয়ে কামরায় উঠেছি। একটি বরযাত্রী দল এল কামরায়। তারাও আমাদের সহযাত্রী।

বৃষ্টি তখন সমানে চলছে, জলও পড়ছে ফুটো ছাদ দিয়ে। তারপর জানালার কয়েকটা সার্সীও ভাঙা। জলের ছাট আসছে। চলমান ট্রেনে এ-এক দুর্ভোগ।

ডেহরী-অন-শোন থেকে বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট। এমন কিছু দূরের পথ নয়। রাত সাড়ে নটায় বেনারস ক্যান্টনমেণ্টে পৌছলাম।

স্টেশনে বিশুর সঙ্গে ইন্দুবাবুকেও দেখলাম। ইন্দুবাবুর ভাগনে গদুও এসেছে।

অনেকদিন পরে কাশীতে এসে পুরনো কথা মনে এল। কাশীতে এর আগেও এসেছি। কাশীতে আমি পরিচিত অতিথি।

সুন্দর একটি বাড়ীর ব্যবস্থা করেছেন ইন্দুবাবু। বিদেশে এসে মনের মতো থাকবার জায়গা না পেলে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি জড়িয়ে থাকে।

কাশীতে আসার পরদিন শুধু বিকেলের দিকে একবার দুর্গাবাড়ী গিয়েছিলাম সকলের সঙ্গে। তারপর ফিরে এসেছি বাসায়।

সুধীরা তীর্থস্থানে এলেই মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়াবে। দেব-দ্বিজে ওর দারুণ ভক্তি। শরীর খারাপ—তাও ওর মন্দিরে যাবার আগ্রহ।

একটা দিন কোনমতে ঘরে বন্দী ছিলাম। তার পরদিন থেকেই কাশীর মন্দির-পরিক্রমা শুরু হল। অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথ ছাড়াও কাছাকাছি আরো যত মন্দির সবই দেখলাম। সবারই ইচ্ছে ছিল গঙ্গা-স্নান করবে। কিন্তু নিষেধ করলাম।

বাসায় ফিরেছি অনেক বেলাতেই। তারপর রান্না-বান্না শুরু হল। খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকলো বেলা আড়াইটেয়।

সুধীরা ততক্ষণে জ্বরে শয্যা নিয়েছে। জ্বর উঠেছে ১০৩ ডিগ্রি। জ্বর গায়েই সে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ঘুরেছে।

বিশুকে ইন্দুবাবুর কাছে পাঠালাম, ডাক্তারের জন্যে। ডাক্তার সেনকে নিয়ে এলেন ইন্দুবাবু। সুধীরার জ্বর ততক্ষণে ১০৪ ডিগ্রীতে উঠেছে।

ডাক্তার ভূপেন ভট্টাচার্য নামকরা দন্ত-চিকিৎসক। আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ। কাশীতেই প্র্যাকটিশ করেন। সন্ধ্যের পর দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে। রাত সওয়া দশটা পর্যন্ত রইলেন।

ডাক্তার সেনের ওষুধে কাজ হয়েছে। পরদিন সুধীরার জ্বর আসেনি। মোটা-

মূর্তি সুস্থই মনে হচ্ছে তাকে। আজ মীরা আর বিশুকে নিয়ে দুর্গাবাড়ীর দিকে গেলাম, পথে সংকটমোচন এবং কুমারেশ্বর মহাদেবের মন্দির। কুমারেশ্বর মন্দিরটির কারুকার্য বড় সুন্দর। এটি নির্মাণ করেছেন মির্জাপুরের রাণী। ব্যক্তিগত জীবনে যিনি ছিলেন ভাস্করাচার্যের শিষ্যা।

বেড়িয়ে ফিরেছি। এমন সময় ইন্দুবাবু এলেন, সঙ্গে নিতাই মতিলাল। এদের সঙ্গে খানিক গল্প-গুজব করলাম।

এর মধ্যে একদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনের দিকে গেলাম। সঙ্গে বিশু আর মীরা।

স্টেশনে গিয়ে দেখলাম, কলকাতা থেকে আপ ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে। দেখলাম —ট্রেনে ভিড় করে এসেছে পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা-পীড়িত অজস্র অসহায় শিশু। যাদের চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা—আমরা কোথায় এলাম, আর আমাদের মা-বাবাই বা কোথায়? যারা একটু পরিণত, চোখ মুখ দেখে মনে হল তাদের মন থেকে এখনো দাঙ্গার বিভীষিকার ছায়াটা সরে যায়নি।

এইসব দাঙ্গা-পীড়িত শিশুর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনটাও ব্যথায় কাতর হল।

ফিরতি পথে দেখলাম ভারতমাতার মন্দির। এ আমলে নির্মিত। মন্দিরে বিগ্রহের প্রতীক বলতে ভারতের একটি বিরাট মানচিত্র। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের প্রতিরূপ। দেখে অভিভূত হয়ে যাই। ভাবি, কবে ভারতের প্রতিটি মন্দিরে এমনই বিগ্রহের প্রতীক দেখতে পাব। এই ভারতমাতার রূপকল্পনার পিছনে একজনের নাম যুক্ত হয়ে আছে। সে নাম শিবপ্রসাদ গুপ্তের। ব্যক্তিগত জীবনে যিনি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী।

কাশীতে থাকতে অনেক পরিচিতের সঙ্গে দেখা তো হলই, এ-ছাড়া অনেক অপরিচিত মানুষকেও কাছে পেলাম।

এরই মধ্যে একদিন সদলে সারনাথ দেখতে গেলাম। এর আগেও দেখেছি, আবার দেখলাম। এ-দেখার যেন শেষ নেই।

আমি নাটকের মানুষ। নানা চরিত্রে রূপ দেওয়াই আমার ধর্ম। কিন্তু সেই নাট্য-জগতের বাইরের আলোয় এসে যখন দাঁড়াই তখন যেন আর এক আমাকে খুঁজে পাই। বিশেষ করে কলকাতার বাইরে যখন প্রবাসে আসি, তখনই মনটা নতুন উপলব্ধিতে পূর্ণ হয়।

এর মধ্যেও মাঝে মাঝে কলকাতার খবরের জন্য মনটা উদগ্রীব হয়। খবর

পাইও। তাছাড়া নাটক এবং ছায়াছবির খবর তো বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতেই পাই।

খবর পেলাম, ২৫শে নভেম্বর অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিপ্রদাস' শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হয়েছে। বলা বাহুল্য নাটকটির প্রযোজক-পরিচালক হলেন শিশির ভাদুড়ী। নাট্যরূপ বিধায়ক ভট্টাচার্যের। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শৈলেন চৌধুরী, মিহির ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত রায়, জীবেন বোস ছাড়াও আরো অনেকের নাম যুক্ত হয়েছে শিল্পী তালিকায়।

কাশীতে এসেছি, কিন্তু ক'দিনের মধ্যে রামনগর যাওয়া হয়নি। ২৬শে নভেম্বর তারিখ দুপুরে হরিশ্চন্দ্রঘাট থেকে বোটে করে রামনগরে গেলাম। কাশী-নরেশের প্রাসাদ এবং দুর্গ দেখলাম। প্রাসাদের হাতীর দাঁতের কারুকার্যও দেখবার মতো।

রামনগরের খ্যাতি আছে। কিন্তু কেমন যেন অবহেলিত মনে হয় শহরটিকে। শুধু রাজপ্রাসাদের আশ-পাশের পরিবেশটিই ভাল।

রামনগর দেখে কাশীতে ফিরতে সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হল। বাসায় ফিরে মনে হল, আর একদিন সারনাথে যাব। হাতে তো আর সময় নেই, সুতরাং পরদিন যাওয়াই ঠিক করলাম। কি জানি কেন, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলির ওপর আমার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। কোথাও ইতিহাসের গন্ধ পেলে আমি স্থির থাকতে পারি না।

২৭শে তারিখে সারনাথ গেলাম নারায়ণ-দার সঙ্গে। কতবার দেখেছি—ক'দিন আগেও দেখেছি—তবু নতুন করে দেখার আগ্রহ।

সারনাথের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভগবান তথাগতের স্মৃতি। জড়িয়ে আছে এক স্বর্ণ-অধ্যায়ের কাহিনী। মন্দির আর স্তূপের পাথরে পাথরে যা গ্রথিত হয়ে আছে। সারনাথকে ঘিরে হয়তো একদিন সমৃদ্ধ জনপদের পত্তন হয়েছিল—যার ধ্বংসাবশেষ আজ দেখতে পাই। না জানি কোন্ দুর্বিপাকে শহর ধ্বংস হয়েছিল।

যে জন্যেই হোক, শরীরটা কেমন ভাল ছিল না। সারনাথ থেকে ফিরে এসেই মনে হল, কেমন যেন জ্বর-জ্বর ভাব। হয়তো ঠাণ্ডা লেগে থাকবে। ঠিক করলাম, আর নয়, মাঝের দু'তিনটে দিন বিশ্রাম নিয়েই কাটাব।

২৮শে তারিখটিতে আমাকে সম্বর্ধনা জানাবে ঠিক করেছে স্থানীয় মিত্র বান্ধব সমাজ। ডাক্তার সত্যেন মুখার্জী গাড়ীও পাঠালেন যথাসময়ে। কিন্তু আমি যেতে পারলাম না। ক্লাব-কর্তৃপক্ষ হতাশ হয়ে ফিরে গেল। কিন্তু আমি ওদের ফেরাতে চাইনি। শরীর বাদ সাধলে আমি আর কি করতে পারি।

শেষটা ক্লাবের ছেলেরা এল। সিল্কের কাপড়ে মুদ্রিত মানপত্রটি আমার হাতে অর্পণ করার আগে পড়ে শোনালো। ডাক্তার সত্যেন মুখোপাধ্যায় দস্তুরমতো নাট্য-রসিক। ১৯৩১ কিম্বা ১৯৩২ সালে তিনি আমার সঙ্গে অভিনয়ও করেছিলেন দু-একটা নাটকে। তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র অর্ধেন্দু এই ক্লাবের একজন উৎসাহী সভ্য। ঘরোয়া অনুষ্ঠানের উদ্যোগটা সে-ই করেছে।

২৯শে নভেম্বর।

সুধীরা, মীরা ও আরো সবাই মন্দিরে গেল। মন্দির, বাজার এ-সব বেড়াবে ওরা।

আমি আজ নারায়ণ-দার সঙ্গে সাইকেল রিক্শা নিয়ে বেরোলাম অন্য ধান্দায়। চুণার পাথরের মহাবীর-এর মূর্তির অর্ডার দেওয়া ছিল। সেটি আনতে গেলাম। কলকাতা পর্যন্ত যাবে, সেইভাবে প্যাক করে দিলে। পথে এবার একটি দোকানে গেলাম। দোকানটিতে জয়পুরী পাথরের অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায়। এখানে একটি সুন্দর গণেশ-মূর্তি কিনলাম। যে মূর্তিটি এখনো আমার গোপালনগরের বাড়ীতে রয়েছে।

বাসায় ফিরে এসে দেখলাম, তখনো সুধীরা ফেরেনি। ভাবলাম, বাইরে বেরোলে ওরা কি সব ভুলে যায়!

৩০শে নভেম্বর। আশা ছিল ট্রেনে রিজার্ভেশন পাব। কিন্তু কোন মতেই পাওয়া গেল না। অথচ আমরা আশা করে বসেছিলাম। সেই মতো যাওয়ার প্রস্তুতি-পর্বও সমাপ্ত।

বিছানা-পত্তর বাঁধা-ছাঁদা শেষ। যা বাঁধা হয়ে গেছে, তা আর খোলা হল না। একটি বেডিং আধখোলা হয়ে পড়ে ছিল, সেইটি খুলে ফেলে তক্তাপোষের ওপর বসে রইলাম। রান্নাও হল না আজ। কেনা খাবারেই দিন কাটালাম।

দিনের মতো রাতটাও গেল এক বিশ্রী দুশ্চিন্তার মধ্যে। রিজার্ভেশন পাওয়া না গেলে এখান থেকে যাওয়াই মুশকিল।

পরদিন ১লা ডিসেম্বর। আমাদের কলকাতা যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হল। অনেক চিন্তা করে তবে ঠিক হল, স্টেশন-মাস্টারকে ধরতে হবে, বারোটি আসনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করার জন্য। চাপাচাপি করতে সেই ব্যবস্থাই করলেন স্টেশন-মাস্টার। যদিও আমরা সব মিলিয়ে সাতজন, তবুও প্রয়োজনের তাগিদে বারোজনের সীটই রিজার্ভ করলাম।

স্টেশনে এসে গনুকে বললাম, রঙমহলের শরৎকে তার করে যেন আমাদের কাশী থেকে রওনা হবার খবরটা জানিয়ে দেয়।

বারাণসী থেকে এলাম মোগলসরাই-এ। আমাদের রিজার্ভ করা বগী মোগলসরাই-এ তুফান একস্‌প্রেসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

আমরা যে কলকাতায় চলেছি এতে আর কোন সন্দেহ রইল না।

ঊর্ধ্বগতিতে ছুটে চলা তুফান একস্‌প্রেসের কামরায় বসে একটা কথা মনে হল, ঘরের চৌহদ্দি ছেড়ে বেরুতে যত আনন্দ, আবার ঘরে ফিরতেও সেই আনন্দ। আমার আনন্দ ছড়ানো আছে ঘরে-বাইরে।

কলকাতায় ফিরেছি। সেদিন তারিখ ছিল ২রা ডিসেম্বর। আবার সেই পরিচিত পরিবেশ, পরিচিত মহল।

বাড়ী এসেই অনাদিবাবুকে ফোন করেছি। ফোনে পরস্পরের কথা-বিনিময় হল।

শরতের ফোন পেলাম। সে জানালো, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

বেলা দুটোয় শরৎ তার সহকারী সন্তোষ ব্যানার্জীকে নিয়ে আমার বাড়ীতে এল। কিন্তু আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বেলা চারটেয় ঘুম ভাঙতে তবে দেখা হল ওদের সঙ্গে।

শরতের কাছে রঙমহলের খবরাখবর শুনলাম। শুনলাম, রতীন রঙমহলে পদত্যাগ করে চিঠি দিয়েছে। শরৎ দুঃখ পেয়েছে রতীনের সিদ্ধান্তে। কিন্তু তাকে পত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেনি।

এ-ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করলাম না।

শ্রীরঙ্গমে বিপ্রদাস চলছে খুব সমারোহের সঙ্গে সে-কথাও শুনলাম। এ-ছাড়া নাট্যভারতীতে শচীন সেনগুপ্তের 'ধাত্রীপান্না'ও নাট্য-রসিকজনকে সমানভাবে আকর্ষণ করছে। যে-কোন মঞ্চের ভাল খবর পেলে আনন্দ পাই। আমি সব সময়ে কামনা করি, প্রতিটি মঞ্চই সুন্দরভাবে চলুক। ধাত্রীপান্নার নাম-ভূমিকায় শিল্পী সরযূবালা, শীতলশেনীর ভূমিকায় প্রভা, বলবীর চরিত্রে জহর গাঙ্গুলী, আর জগমল চরিত্রের নির্ধারিত শিল্পী রবি রায়।

৩রা তারিখে রঙমহলে গেলাম। প্রতিটি কর্মীর সঙ্গে দেখা হল। বড়দিনের নাটক নিয়ে আলোচনাও হল। কিন্তু বড়দিনের প্রোগ্রাম সম্পর্কে সেই দিনই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না।

বেশ কয়েকটা দিন পর, আবার সেদিন মঞ্চাবতরণ করলাম 'ভোলা মাস্টার'-এর নাম-ভূমিকায়।

পরদিন ৫ই ডিসেম্বর। এই দিনেই প্রথম দিবালোকে কলকাতায় জাপানী বোমারু বিমান থেকে বোমা বর্ষিত হল।

শহরবাসীর মনে নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি হল। যদিও যুদ্ধের ব্যাপারটা এতদিনে অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে।

ঐ দিনেই রঙমহলে দুটি নাটকের অভিনয়—'রিজিয়া' আর 'ভোলা মাস্টার'।

পরদিন অনেকেই দেখা করতে এল আমার সঙ্গে। তার মধ্যে বীরেন ভদ্রও এল। কথা প্রসঙ্গে নতুন নাটক সম্পর্কে সে তার মতামত আমাকে জানালো। তার ইচ্ছে প্রমথ বিশীর কমেডী নাটক 'সানি ভিলা' অভিনয় আমরা করি।

কাশী থেকে ফেরার পর পরিচিত বন্ধু-বান্ধব সবাই এসেছে দেখা করতে, কিন্তু শচীনবাবু এলেন না।

বীরেন ভদ্রকে জিজ্ঞাসাও করলাম শচীনবাবুর কথা। সে একটি মর্মান্তিক খবর জানালো। শুনলাম, শচীনবাবুর মেয়েটি টি-বি'তে মারা গেছে। মেয়ের বয়স হয়েছিল মাত্র একুশ বছর।

খবরটা শুনে মনটা খারাপ হল। একদিন গেলামও শচীনবাবুর বাড়ীতে।

শচীনবাবুর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল মেয়েটির কথা বলতে।

নাটক চলছে। নতুন নাটক, পুরনো নাটক দুই-ই। রঙমহল তখন পুরনো নাটক অভিনয় করে চলেছে। সাজাহান, ভোলা মাস্টার, রিজিয়া, কর্ণার্জুন—এ-ছাড়া অন্য নাটকও আছে।

কয়েকটা দিন গেল।

২২শে ডিসেম্বর স্টার একটি নতুন নাটক উপহার দিলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', নাট্যরূপ মহেন্দ্র গুপ্তের।

প্রথম দিনেই দর্শক ভেঙে পড়লো 'দুর্গেশনন্দিনী'-র জন্যে। স্টারের দুর্গেশনন্দিনী যে দর্শক-চিত্ত জয় করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্টারের শিল্পীতালিকায় ছিলেন ভূমেন রায়, সিধু গাঙ্গুলী, বিপিন গুপ্ত, অপর্ণা, ঊষা দেবী এবং বীণা ছাড়াও আরো অনেকে।

পরদিন রঙমহলে উদ্বোধন হল প্রমথ বিশীর হালকা হাসির নাটক 'সানি ভিলা'। নাটক কেমন হয়েছে সে বিচার করিনি, তবে এইটুকু দেখলাম, দর্শকসাধারণ দারুণ-ভাবে হেসেছে।

দু' একটা দিন আসে দুঃখের খবর নিয়ে। ২৪শে ডিসেম্বর জনপ্রিয় গীতিকার ও সুরকার অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুসংবাদ শুনলাম। গীতিকার এবং সুরশিল্পী ছাড়াও অজয় ভট্টাচার্যের আরো পরিচয় আছে, সে ছিল একজন লেখক এবং চিত্র-পরিচালক। 'অশোক' ছবিটি সে-ই পরিচালনা করেছিল। রচনাও ছিল তারই।

অজয় ভট্টাচার্য মারা গেল মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে। একটি সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের অবসান হল।

দুর্গেশনন্দিনী স্টারে চলছে, আবার ২৫শে ডিসেম্বর সেই একই কাহিনী-নির্ভর দুর্গেশনন্দিনীর উদ্বোধন হল মিনার্ভায়। শিল্পীতালিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, আর শান্তি গুপ্তার নামও যুক্ত হল। কিন্তু নাটক দর্শককে খুশি করতে পারলো না। অথচ এই দুর্গেশনন্দিনী দেখতে দর্শকসাধারণ বিপুল সংখ্যায় ভিড় করছে স্টারে। মিনার্ভায় দর্শকের অভাব। মিনার্ভার শিল্পীতালিকাটা বেশি জমকালো।

স্টারে দুর্গেশনন্দিনীর দৃশ্যপট ছিল আকর্ষণীয়। একই সঙ্গে একতলা এবং দোতলায় চারটি দৃশ্যের অবতারণাও সুন্দর। এটি ছিল নাটকের অন্যতম আকর্ষণ।

প্রশ্ন জাগলো মনে, মিনার্ভায় দুর্গেশনন্দিনী জমলো না কেন? কীসের অভাব?

নাটক নিয়ে যত না চিন্তা, তার চেয়ে বেশি চিন্তা সুধীরাকে নিয়ে। আমি যা-ও বা এক রকম আছি, কিন্তু সুধীরার শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে। এত ডাক্তার, এত চিকিৎসা—তবু রোগের উপশম নেই। কোন ডাক্তার কিছু করতে পারছে না, কোন ওষুধেই ফল ফলছে না।

বড়দিনের উৎসবে কোথায় নাটক নিয়ে ভাববো, কিন্তু তা হল না। সুধীরার চিন্তাতেই ডুবে রইলাম।

এরই মধ্যে কখন যেন বড়দিন ফুরিয়ে গেল। যথারীতি একদিন সকালে উঠে দেওয়ালপঞ্জীর শেষ পাতাটা ছিঁড়ে ফেললাম।

একটি বছর হারিয়ে গেল। ১৯৪৩ নামে চিহ্নিত বছর।

বাড়ীর পূবের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম ১৯৪৪-এর প্রথম সূর্যোদয়।

নতুন বছরের খবর, শ্রীরঙ্গমের বিপ্রদাসই চলতি নাটকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য। যদিও স্টারের 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং রঙমহলের 'সানি ভিলা' বেশ ভালই চলছে, কিন্তু 'বিপ্রদাস'-এর মতো নয়। তবে রঙমহলের 'সানি ভিলা'র দর্শকদের মধ্যে বেশ কিছু অভিজাত মানুষের ভিড় দেখেছি। অনেকের ধারণা, হয়তো প্রমথ বিশীর ব্যক্তিগত মহলের নাটক দেখার আগ্রহই এর কারণ।

২রা জানুয়ারীর একটি বিশেষ খবর নাট্যভারতীর বিলুপ্তি।

নাটকের মানুষদের কাছে এর চেয়ে দুঃসংবাদ আর কি আছে! মুরলীধর চাটুজ্যে লীজ নিয়ে নাট্যভারতী চালাচ্ছিলেন, মালিকপক্ষ নতুন করে লীজ দিলেন না মুরলীধরবাবুকে। শুনলাম, নাট্যভারতী রূপান্তরিত হবে সিনেমা-হলে। তা-ও হিন্দী ছবির জন্যে।

নাট্যভারতীর শেষ অভিনয় 'ধাত্রীপান্না'। অভিনয় শেষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে নাট্যভারতীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হল।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের তালিকায় নাট্যভারতীর নাম শুধু ইতিহাস হয়ে রইল।

জানুয়ারী মাসটা বন্ধ্যা মাস। নতুন নাটকের বাইরে একটি খবর আছে। ৩১শে জানুযারী খাদ্যশস্যের রেশনিং প্রথা চালু হল। রেশনিং প্রথা এ-দেশে এই প্রথম।

'তাইতো' নাটকটি বিধায়কের লেখা। শ্রীরঙ্গমে উদ্বোধন হল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। চলতি নাটক যথারীতি চলবে, শুধু সপ্তাহের মাঝামাঝি একটি দিন অভিনীত হবে 'তাইতো'। এই তারিখেই তুলসী চক্রবর্তী রঙমহলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী 'আলমগীর' রেকর্ডে গৃহীত হল। শিশির ভাদুড়ী, ছবি বিশ্বাস, রতীন, সন্তোষ সিংহ, প্রভা, রাণীবালা, ছোট রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে আমিও অংশ নিয়েছিলাম অভিনয়ে। শৈলেন চৌধুরী ছিলেন পরিচালক।

৯ই ফেব্রুয়ারী তুলসী চক্রবর্তী রঙমহলে প্রথম অভিনয় করলেন।

পরদিন মাদ্রাজপ্রবাসী জীতেন মুখার্জী এবং কেষ্ট মুখার্জী এলেন থিয়েটারে আমার সঙ্গে দেখা করতে। অনেকদিন পর ওঁদের দেখে আনন্দ হল। ওঁরা আবার ১৩ তারিখে 'ভোলা মাস্টার' অভিনয় দেখতে এলেন।

রাণীবালা অনেকদিনই রঙমহলে ছিল। একই সঙ্গে অনেকদিন অভিনয় করেছি। কিন্তু ১৩ই ফেব্রুয়ারীর অভিনয় তার রঙমহলের শেষ অভিনয়। অভিনয় শেষে সে আমাকে প্রণাম করতে এলো।

মতিলাল সেন এককালে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে নলিনী সরকার তাঁকে কাজ দিয়েছিলেন হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে। তারপর যোগ দেন শ্রীরঙ্গমের অন্যতম অফিসকর্মী হিসেবে, সেখান থেকে রঙমহলে। রঙমহলের সকলেই মতিলাল সেনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। সেই মতিলালবাবু মারা গেলেন ১৯শে ফেব্রুয়ারী সকালে।

এর কয়েকদিন পরেই বন্দনা রঙমহল ত্যাগ করলো।

ঐ ২৭ তারিখেই গিরীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হল রঙমহলে। পি-ডব্লিউ-ডি-তে সে অভিনয়ও করলো। পি-ডব্লিউ-ডি'-র আকর্ষণ আগের মত না থাকলেও, আছে। সেদিনের অভিনয়ে দর্শকসংখ্যা থেকে সেটা প্রমাণিত হল।

কিন্তু চলতি নাটক 'সানি ভিলা' পড়তির দিকে। অথচ 'ভোলা মাস্টার' যথারীতি চলছে।

৯ই মার্চ তারিখে ছিল দোলযাত্রা। ঐদিনে রঙমহলে অভিনীত হল 'কর্ণার্জুন' আর 'দোললীলা'। আমি অংশ নিতে পারিনি অসুস্থতার দরুণ।

নিজে তো অসুস্থ, কিন্তু সুধীরার অসুস্থতা আবো বেড়ে চললো। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি তার অন্য উপসর্গও বাড়লো। যেমন জ্বর, তেমনি বমি। এদিকে কাশি তো আছেই।

একেবারে শয্যাশায়ী হল সুধীরা। এত ডাক্তার, এত চিকিৎসা—কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আমার অভিনয় বন্ধ। আমার জায়গায় রঙমহলে সানি ভিলায় অভিনয় করছে সন্তোষ দাস।

বাড়ীতেই থাকি। তবে থিয়েটারে মাঝে মাঝে যাই না এমন নয়। ২২শে মার্চ তারিখে খবর পেলাম, শান্তি গুপ্তা আর অমল ব্যানার্জী রঙমহলে যোগ দিয়েছে। রঙমহলে আরো একজন যোগ দিলে, তার নাম পূর্ণিমা। ৭ই এপ্রিল তারিখে সে 'ভোলা মাস্টার'-এ উল্কার চরিত্রে অভিনয় করলে। পরদিন আরো একজন অভিনেত্রী বেলা, সে-ও রঙমহলের শিল্পীতালিকায় নাম লেখালো। অভিনয় করলে ঐ তারিখের নাটক চরিত্রহীনে, জগত্তারিণীর ভূমিকায়।

আমি বাড়ীতেই আছি। না থেকে উপায় কি! ৮ই এপ্রিল সুধীরার জ্বর উঠলো ১০৫'৩ ডিগ্রি। কুইনিন প্রয়োগ করলেন ডাক্তাব।

তিন দিন পর জ্বর ছাড়লো। কিন্তু জ্বর ছাড়লে কী হবে, অতিরিক্ত মাত্রায় কুইনিন প্রয়োগেব প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সে আর এক দুশ্চিন্তা। ডাক্তার জে. এন. রায়কেও রীতিমত চিন্তিত দেখলাম। বেলা বারোটা নাগাদ অবস্থা এমনই হল, যে কী হবে ভেবে পেলাম না! দেখে যা মনে হল, তাতে মনটা মুষড়ে গেল। আর বোধ হয় ধরে রাখা গেল না সুধীরাকে। শেষপর্যন্ত ডাক্তার এইচ. সি. বোসকে ফোন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এলেন। সুধীরাকে দেখে তাঁরও মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো! ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে নিজে বসে রইলেন। বাড়ী থেকেই ভবানীপুরে রাইমার কোম্পানীকে ফোন করলেন, একটি দুষ্প্রাপ্য ওষুধের জন্যে। বাড়ী থেকে পাণ্ডে ছুটলো। ওষুধ নিয়ে এল। একমাত্রা প্রয়োগ করে ডাক্তার বোস বসে রইলেন প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে। আধ ঘণ্টা বাদে ডাক্তার সুধীরার নাড়ির স্পন্দন পেলেন। তবুও বসে রইলেন ডাক্তার। আরো আধ ঘণ্টা কাটলো। তারপর ডাক্তার যেন কিছুটা ভরসা পেলেন। বললেন, আর ভয় নেই।

বলে ডাক্তার ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে দিলেন। ডাক্তার বোস থাকতে থাকতে ডাক্তার রায় ওষুধ নিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর ওষুধ আর কাজে লাগলো না।

যাই হোক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—আজকের বিপদ থেকে তিনিই যেন উদ্ধার করেছেন।

সুধীরা ক্রমশঃ সুস্থ হতে লাগলো।

আরো একটি সুখবর, জহর গাঙ্গুলীর রঙমহলে যোগ দেওয়া। ১২ই এপ্রিল রঙমহলের "সরলা" নাটকে নীলকমলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল সে।

যদিও রঙমহলে একটির পর একটি পুরনো নাটক অভিনীত হচ্ছে, কিন্তু চিন্তাটা রয়েছে নতুন নাটকের জন্যে।

বাংলা নববর্ষের ইংরেজী তারিখ ছিল ১৪ই এপ্রিল। দিনটি কিন্তু শুভবার্তা নিয়ে আসেনি। ঐদিনে বোম্বাই বন্দরে মাল বোঝাই জাহাজে পর পর দু'বার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। যার ফলে হাজার খানেক বাড়ী দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অসংখ্য নরনারী গৃহহীন তো হয়ই, এ-ছাড়া কিছু মৃত্যুও ঘটে। ঐ বিস্ফোরণে 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র বাড়ীটিও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

আমার বাড়ীতে সিঁড়িতে ওঠার মুখে দোতলায় একটি জানালার ধারে যে পাথরের গণেশ মূর্তিটি রয়েছে, মূর্তিটি হাওড়া স্টেশনে এসেছিল রেলওয়ে পার্সেলে। ১৭ই এপ্রিল তারিখে গণেশ মূর্তিটি বাড়ীতে আনা হয়।

জানিনা কেন, গণেশ মূর্তিটি বাড়ীতে আনার পরেই বেশ কিছুদিন আমার কর্ম-ক্ষেত্রে কেমন যেন ভাঁটা পড়েছিল। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাস—নির্দিষ্ট কোন কাজ ছিল না বলতে গেলে। তবে রঙমহলে যেতাম-আসতাম এই পর্যন্ত। কখনো রঙমহল থেকে ফেরার পথে ময়দানের কোন নির্জনে বসে থাকতাম, কিংবা বেড়িয়ে বেড়াতাম।

দিনগুলো ছিল একরকম বন্ধ্যা। আমার দিন যাই হোক, অন্যদিকে কিন্তু নতুন খবর ছিল। ২৫শে মে তারিখে মিনার্ভায় একটি নতুন নাটকের উদ্বোধন হল। নাটকের নাম 'পুরোহিত', নাট্যকার কৃষ্ণদাস। অভিনয়ে ছিলেন নির্মলেন্দু, রাণীবালা, রতীন, মনোরঞ্জন, বন্দনা ছাড়া মিনার্ভার নিয়মিত শিল্পীরা।

অনেকদিন পর 'সাজাহান' নাটকের একটি বিশেষ অভিনয় হল মিনার্ভায়। তারিখ ৩০শে মে। তবে ঐ দিনে সাজাহানে আমি অংশ নিইনি। সাজাহানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল ছবি বিশ্বাস। নির্মলেন্দু, রবি রায়, সরযূবালা, রাণীবালাও ছিল সেদিনের অভিনয়ে।

রঙমহলে তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকের নতুন করে অভিনয় শুরু হয় ৪ঠা জুন তারিখে। শুনলাম নাটকের আকর্ষণ তখনো কমেনি।

ডায়েবীব পাতায় শুধু কি নাটক আব অভিনযেব খবব, কত খববই কালিব আঁচডে ধবে বেখেছি। ৭ই জুন বোমেব পতন হল মিত্রশক্তিব হাতে, সে খববও ডাযেবীর পাতা ওল্টালে পাই।

যুদ্ধেব খববেব সঙ্গে নাটকেব খববও থাকে। ৭ই জুন শ্রীবঙ্গমে 'সাজাহান' অভিনীত হল। বিশ্বনাথ ভাতুডী নেমেছিলেন ঔবঙ্গজীবেব ভূমিকায, সাজাহানেব ভূমিকায অভিনয কে কবেছিল নাম মনে নেই।

নিজেব খবব না থাক, অন্য খবব কিন্তু আছে। ৯ই জুন তাবিখে সবযূবালাব সম্মানে মিনার্ভায অভিনীত হল 'চন্দ্রশেখব'। নির্মলেন্দু, ছবি বিশ্বাস, জহব গাঙ্গুলী, বতীন, বাণীবালাব সঙ্গে সবযূবালাও নাটকে অংশ নিযেছিল।

চুপচাপ ঘবে বসে থাকি, নযতো কখনো-সখনো থিযেটাবেব দিকে যাই। এতদিন হল, তবু শবীবটা আমাব ঠিক হল না।

১৬ই জুন তাবিখটিব কথা মনে আছে। বাংলাব বিশিষ্ট মনীষী আচায প্রফুল্লচন্দ্র বায ঐদিন পবলোকগমন কবলেন। আচায বাযেব মৃত্যুতে সাবা দেশে শোকেব ছাযা নামলো। আমিও ব্যক্তিগতভাবে সেই শোকেব অংশীদাব। আচায বাযেব সঙ্গে সঙ্গে একজন খাঁটি বাঙালীকে আমবা হাবালাম।

২২শে জুন বথযাত্রা। শবৎ চট্টোপাধ্যাযেব 'বামেব সুমতিব' নাট্যরূপ দিযেছে দেবনাবাযণ গুপ্ত। সেই নাটকেব উদ্বোধন হল বথযাত্রাব দিনে। বঙমহলেব এই নাটকে শিল্পীতালিকায ছিল সন্তোষ সিংহ, জহব গাঙ্গুলী, সুহাসিনী ছাডা আবো অনেকে। নাটকটিব পবিচালক ছিল সতু সেন।

'বামের সুমতি' সে-সমযেব একটি সফল নাটক।

এত নাটক, এত অভিনয, আমি কিন্তু অসুস্থ শবীব নিযে বাডী বসে আছি। আমি তো অসুস্থ—তাবপব আমাব স্ত্রী-ও দারুণভাবে হাঁপানীতে আক্রান্ত হযেছে।

তাবিখটা ছিল ১২ই জুলাই—হাঁপানীব আক্রমণে সুধীবা অস্থিব হয়ে পডলো। তাব বোগ-যন্ত্রণা দেখে আমিও ভয় পেলাম। একে ভাঙা শবীব, তারপব হাঁপানীর বাডাবাডি—কী যে হবে। ডাক্তাব গোবিন্দ মিত্র এলেন। ডাক্তাবের মুখে-চোখেও দুশ্চিন্তাব চিহ্ন, যদিও মুখে তিনি অভয দিলেন। শেষে ডাক্তাব গোবিন্দ মিত্র নিজে ভবসা না পেয়ে ডাক্তাব নলিনীবঞ্জন সেনগুপ্তকে ডাকলেন। ডাক্তাব সেনগুপ্ত এলেন। পরীক্ষা করলেন সুধীবাকে। চিকিৎসাব ব্যবস্থাও করলেন। পবে এলেন ডাঃ রাম অধিকাবী।

সুধীবা যাও-বা একটু ভালোর দিকে, এদিকে আমাকেও আবার ইনফ্লুয়েঞ্জায়

ধরলো। কিন্তু আমার জন্যে ভাবি না, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি, সুধীরা যেন সুস্থ হয়ে ওঠে। সে-ই তো আমার লক্ষ্মী।

এর মধ্যে সুধীরাকে ইলেকট্রো-কার্ডিয়োগ্রাম পরীক্ষা করানো হল। রিপোর্ট অস্বাভাবিক কিছু নয়। এর পরেই ২৪শে জুলাই ডাক্তার রাম অধিকারী এবং গোবিন্দ মিত্রের সঙ্গে ডাক্তার শিব ভট্টাচার্য এলেন সুধীরাকে দেখতে। নতুন করে প্রেসক্রিপসন করলেন। ওষুধে সুধীরার যন্ত্রণার আরো উপশম হল। কিছুক্ষণ বেশ সহজেই ঘুমলো। মনে হল, হয়তো এবারে সুস্থ হয়ে উঠবে সুধীরা।

হেমন্ত গুপ্ত একজন নামকরা চিত্র-পরিচালক, তার মৃত্যুসংবাদ পেলাম ২৭শে জুলাই। একজন উদীয়মান চিত্র-পরিচালকের অকালমৃত্যুতে মনে ব্যথা পেলাম। কিন্তু মৃত্যু তো কারো হাত-ধরা নয়, পরদিন ২৮শে জুলাই আরো একটি মৃত্যুসংবাদ অপেক্ষা করছিল। অভিনেতা ক্ষেত্রমোহন মিত্রের মৃত্যু পরিণত বয়সে হলেও, সংবাদটা নিশ্চয়ই শোকাবহ।

জুলাই মাসের বাকি ক'টা দিন কাটলো। ২রা আগস্ট ছিল 'ভোলা মাস্টার'-এর দ্বিশততম অভিনয়-রজনী। যে নাটকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলাম আমি—অসুস্থতার জন্যে আমিই অভিনয় করতে পারছি না সেই নাটকে। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। যাই হোক, দুইশত-রজনীর স্মারক-অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ জানাতে এল শরৎ। শুনলাম, ফজলুল হক সাহেব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। শরৎকে বললাম, ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারছি না। তোমরা দুঃখু কোর না।

শরৎ চলে গেল।

আজ ভোলা মাস্টারের দুইশত রজনীর স্মারক-উৎসব। আর আমি বসে রইলাম ঘরে।

রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' সেনোলা কোম্পানী রেকর্ড করালেন ৩রা আগস্ট। পরদিন ৪ঠা আগস্ট মিনার্ভায় উদ্বোধন হল শচীন সেনগুপ্তের 'রাষ্ট্রবিপ্লব' নাটকটি। ঐ নাটকের শিল্পীতালিকায় যুক্ত ছিল নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ছবি বিশ্বাস, শৈলেন চৌধুরী, রতীন ব্যানার্জী, জীবেন বসু, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সরযূবালা, রাণীবালা, লাবণ্য এবং বন্দনার নাম।

আমি তখনো অসুস্থ শরীরে একরকম বাড়ীতেই আছি। এরই মধ্যে ১২ই আগস্ট তারিখে আমার ছোট ভাই পঞ্চু চৌধুরীর বিয়ে হল। পরদিনই আবার নতুন করে ম্যালেরিয়া চেপে ধরলো। যথারীতি ডাক্তার গোবিন্দ মিত্রও এলেন আমাকে দেখতে।

বাড়ীতেই আছি অসুস্থ শরীর নিয়ে। বাড়ীতে বসেই যেটুকু খবর পাই তাই দিয়েই ডায়েরীর পাতা ভরিয়ে রাখি। নানা খবরের মধ্যে দেশ-বিদেশের খবরও থাকে। আগস্টের শেষ সপ্তাহে ফরাসী দেশপ্রেমিকেরা প্যারী মুক্ত করলেন। একটি দেশ রাহু-মুক্ত হল, এখবরটা নিঃসন্দেহে সুখের।

এদিকে নাটকের খবর বলতে মিনার্ভায় 'রাষ্ট্রবিপ্লব' তেমন সুবিধে করতে পারলো না। নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাছ থেকেই খবরটা পেলাম। আরো শুনলাম, হাবুল গিয়েছিল মন্মথবাবুর কাছে নতুন নাটকের জন্যে। শরৎবাবুও নতুন নাটকের জন্যে মন্মথবাবুর কাছে গিয়েছিল।

মন্মথবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে তাঁর মুখ থেকেই একথা শুনেছিলাম।

কলকাতার চলতি থিয়েটারের মধ্যে স্টারে মহেন্দ্র গুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক টিপু সুলতানের ৫০ অভিনয়ের স্মারক-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ঐ দিনেই নতুন বাংলা ছবি 'সমাজ' মুক্তিলাভ করলো মিনার, বিজলী এবং ছবি-ঘরে। নিউ টকীজের এই ছবিটির পরিচালক হেমন্ত গুপ্ত, কিন্তু নিজে তার ছবিটির মুক্তি দেখে যেতে পারলো না। ক'দিন আগেই সে মারা গেছে। একেই বলে নিয়তির নির্মম পরিহাস।

ঘরে বসে ভালমন্দ কত খবর পাই। উদীয়মানা অভিনেত্রী ঊষা দেবীর মৃত্যু-সংবাদ পেলাম ১১ই আগস্ট। এদিন সকালেই সে মারা গেছে। ঊষা দেবীর প্রথম মঞ্চাবতরণ রঙমহলে স্বামী-স্ত্রী নাটকে। ঊষা দেবীর মৃত্যুতে মনটা খারাপ হল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, সে যেন স্বর্গে ঈপ্সিত স্থান পায়।

ঐ দিনেই রঙমহলে অভিনীত হল 'সাজাহান'। সাজাহানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎ চাটুজ্যে নামলেন ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায়। শান্তি গুপ্তা, সুহাসিনী, আর জহর গাঙ্গুলী ছিল যথাক্রমে পিয়ারা, জাহানারা এবং দিলদারের ভূমিকায়।

'রাতকাণা' প্রহসনটির কথা জানা নেই এমন মানুষ কম আছেন এ-দেশে। 'রাতকাণা'র রচয়িতা রায় বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়; এ-ছাড়া আরো অনেক সফল নাটকের রচয়িতা। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করলেন ২রা সেপ্টেম্বর।

ঐ দিনে বাংলা চলচ্চিত্রের যুগান্তকারী চিত্র নিউ থিয়েটার্সের বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' মুক্তিলাভ করলো চিত্রা এবং রূপালীতে। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত জনপ্রিয়তা অর্জন করলো এই ছবিটি। শুধু তাই নয়, বাংলা চলচ্চিত্রের গতিপথ পরিবর্তিত হল 'উদয়ের পথে'র পর।

৩রা সেপ্টেম্বর তারিখটি ভাল কি মন্দ জানি না, তবে ঐ তারিখটি চিহ্নিত ছিল বিশ্বযুদ্ধের স্মারক দিবসরূপে।

রঙমহলে সাজাহান অভিনীত হয় ৭ই সেপ্টেম্বর। বলা বাহুল্য তখনো আমি ঘরে বসে। তবে শরীরের দিক থেকে আগের চেয়ে অনেক সুস্থ আমি।

১০ই সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় শরৎ চাটুজ্যে, সন্তোষ সিংহ, সন্তোষ দাশ, আর আশু বোস এল আমার কাছে। নানা কথার মধ্যে কথা তাদের একটাই, আমি যাতে তাদের সঙ্গে যোগ দিই।

বললাম, ঠিক আছে, আমাকে একটু ভাবতে দাও।

শরৎ নাছোড়বান্দা। বললে, ও-সব জানি না, আপনাকে কথা দিতেই হবে।

বললাম, আজ এই পর্যন্ত থাক। আমি আসছে মঙ্গলবারে যাব তোমাদের ওখানে। তখনই আমার কথা জানাব।

সেদিনের মতো ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

পরদিন বিকালে মিনার্ভার দিলওয়ার হোসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার বক্তব্য, আর কিছু নয়, আমাকে মিনার্ভায় যোগ দেওয়ার কথা বলতে এসেছে সে। এর আগেও সে এসেছিল, বলেছিল মিনার্ভায় যোগ দেওয়ার কথা। তখনো যে উত্তর দিয়েছিলাম, এবারেও সেই একই উত্তর দিলাম। বললাম, পার্ট-টাইম হোক, আর ফুল-টাইম হোক—আমি খুব সম্ভবত পারবো না মিনার্ভায় যোগ দিতে। তাছাড়া রঙমহলের শরৎকে না জিজ্ঞাসা করে আমি কিছু বলতে পারবো না।

দিলওয়ার নাছোড়বান্দা। বলে, দোস্ত, আপনাকে কথা দিতেই হবে।

বেশ জোরের সঙ্গেই বললাম, আমার পক্ষে এখনি কিছু বলা সম্ভব নয়।

এবারে দিলওয়ার আমার হাতে পাঁচশ টাকা গুঁজে দিলে। বললাম, এ-টাকা কি হবে?

—রাখুন না।

—না, না—এ টাকা তুমি নিয়ে যাও।

—আরে, রাখুন না দোস্ত! পরে যাহোক হবে। বলে সেদিনের মতো বিদায় নিলে দিলওয়ার।

১২ই সেপ্টেম্বরের প্রভাতী সংবাদপত্রে দেখলাম, মার্কিনী সৈন্য জার্মান এলাকার দশ মাইল ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ভাবলাম, তবে কি এবারে যুদ্ধের অবসান ঘটবে?

ঐ বারো তারিখেই রঙমহলে 'মঞ্চ মায়াকর'-এর সম্মান-রজনীর নাটক 'রিজিয়া' অভিনযের আয়োজন হয়েছিল। নাটকে অংশ নিতে রতীন, রাণীবালা, বন্দনা প্রমুখ মিনার্ভার শিল্পীরাও এল। শরৎ অভিনয করেছিল বক্তিয়ারের ভূমিকায়।

আমন্ত্রিত হয়ে আমিও গিয়েছিলাম অভিনয় দেখতে। আমি এসেছি শুনে দেখা কবতে এল বন্দনা, রতীন, সুহাসিনী, রাণীবালা ছাড়া আরো মেয়েরা। সবারই এক কথা, আমি কেমন আছি?

শচীন সেনগুপ্ত বঙমহলেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আবো অনেকে দেখা করতে এলেন। তাব মধ্যে বিমল ঘোষ, সত্যেন ঘোষাল, হাবুল, সতু সেন এবং ডাক্তাব রাম অধিকারীও ছিলেন। প্রত্যেকেই এসেছেন, আমার খবব জানতে। দীর্ঘদিন অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘরে বসে থাকার পর, এই থিযেটার দেখতে আসা।

অয়স্কান্ত বক্সীব নাটক 'অধিকার', পরিচালনা সতু সেনের, নাটকে অংশ নিলে সন্তোষ সিংহ, অমল বন্দ্যোপাধ্যায, জহর গাঙ্গুলী, শান্তি গুপ্তা, সুহাসিনী, পূর্ণিমা ছাড়া আরো অনেকে। এই নাটকের উদ্বোধন হল রঙমহলে ১৪ই সেপ্টেম্বর। ভেবেছিলাম, শরৎ নিশ্চয়ই দেখা করবে, কিন্তু দেখা করেনি। কেন সেই জানে!

যাই হোক, দিলওয়ারের ব্যাপারটার একটা ফয়সালা হওযা দরকার। ১৪ই তাবিখেই সে আমাকে ফোন করে জানালো যে সে আমার কাছে আসছে।

বললাম, ঠিক আছে, তুমি এস। আমি আজই শরতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যাহোক ঠিক করবো।

রঙমহলে শরৎকে ফোন করলাম! সন্তোষ ব্যানার্জি ফোন ধরলে। বললে, শরৎবাবু থিয়েটার দেখছেন।

শুনে আশ্চর্য হলাম! থিয়েটারের মালিকরা সাধারণতঃ দর্শকের আসনে বসে থিয়েটার দেখেন না।

পরে শরৎ আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় দিলওয়ারের ফোন পেলাম। সামনাসামনি বসে শরৎ, এক্ষুনি কিছু বলা সম্ভব নয়, সুতরাং 'পরে কথা হবে' বলে ফোন ছেড়ে দিলাম।

দিলওয়ারের সঙ্গে আমার যা যা কথা হয়েছে, সবই বললাম শরৎকে। জিজ্ঞাসা করলাম, এবারে বল, তুমি কি বলবে? দিলওয়ার তো এখুনি পূজোর সময়ের অভিনয়ের জন্যে তারিখ নিতে চায়।

শরৎ একটু চিন্তা করে বললে, ঠিক আছে, আপনাকে আমি ছাড়ছি না।

শরতের সঙ্গে যখন কথা চলছে, তারই মধ্যে দিলওয়ার আমাকে দু'বার ফোন

করেছিল। কোন রকমে তাকে নিরস্ত করেছিলাম। কেননা, শরতের সামনাসামনি তাকে কী বলবো।

যাই হোক, বিকেলে দিলওয়ার ফোন করতে তাকে জানিয়ে দিলাম, আমার পক্ষে মিনার্ভায় যাওয়া আপাততঃ সম্ভব নয়। কারণ শরৎ আমাকে ছাড়ছে না।

শুনে দিলওয়ার চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বেশ একটু স্বর টেনেই বললে, ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করবো।

স্বকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত 'নন্দিতা' ছবিতে আমিও অভিনয় করেছিলাম। রূপশ্রীর এই ছবিটি মুক্তিলাভ করলো ১৬ই সেপ্টেম্বর।

ঐ দিনেই বিকেল পাঁচটায় রঙমহলের গাড়ী এল আমাকে নিতে। রঙমহলের সেদিনের নাটক 'রামের স্নমতি'। অভিনয় শুরু হবে সাড়ে ছটায়। নাটক আরম্ভ হবার পূর্বমুহূর্তে পৌঁছেছি। আমি এসেছি শুনে স্নহাসিনী, বেলা এবং অন্যান্য শিল্পীরা দেখা করতে এল।

অভিনয় শেষে শরৎ এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। তারাশঙ্করবাবুর নতুন নাটক 'বিংশ শতাব্দী' আমাকে পড়বার জন্যে দিতে চাইল। নিজের পারিবারিক ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার কথা জানিয়ে বললাম, এখন কি আমার নাটক পড়ার মতো মন আছে?

শরৎ জিজ্ঞাসা করলে, আবার কি ঝামেলা হলো আপনার?

বললাম, তুমি তো জান এ্যামেচার অভিনেতা মণীন্দ্র মিত্র আমার মামাত ভাই। সে তো আজ দু-বছর চলে গেছে। সেই ভাই-এর স্ত্রী আর তার মেয়ে মঞ্জু এসেছে আমার বাড়ীতে। মঞ্জু অসুস্থ। কী যে হয়েছে, কেউ-ই ধরতে পারছে না। এত ডাক্তার-বদ্যি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। এই অবস্থায় কী যে করবো বুঝতে পারছি না। তাছাড়া মঞ্জুর যা শরীরের অবস্থা, তাতে মন আমার স্বস্তি পাচ্ছে না।

এত কথা শোনার পরেও শরৎ আমাকে 'বিংশ শতাব্দী' না দিয়ে ছাড়লো না। নিয়েও এলাম শেষ পর্যন্ত।

যা মনে হয়েছিল, তাই বুঝি ঘটতে চললো। মঞ্জুর অসুখ আরো বাড়লো। ডাঃ কনক সর্বাধিকারী মঞ্জুর নিকট-সম্পর্কের মামা—তিনি তো দেখছেনই, তাছাড়া আরো কত ডাক্তার। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হল না।

মঞ্জুর মায়ের দিকে তো ফিরে তাকানো যায় না। দু' বছর আগে ওর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। মঞ্জুর আর এক ভাই ছিল, সে-ও চলে গেছে, আর মঞ্জুর তো এখন-তখন অবস্থা।

সেদিন ছিল ১৮ই সেপ্টেম্বর। সারাদিন ধরে চলেছে যমে-মানুষে টানাটানি।

সারাদিন গেল, সন্ধ্যে হল। সন্ধ্যে গড়িয়ে এল রাত। বাড়ীর কারো চোখে ঘুম নেই। আমি তো অস্থিরভাবে ঘর-বার পায়চারি করছি। মাঝে মাঝে দেখছি মঞ্জুর রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে। মঞ্জুর দৃষ্টিতে কেমন যেন শূন্যতা। সবারই মুখের দিকে বোবা দৃষ্টিতে ফিরে চাইছে।

মঞ্জুর ওই শূন্য দৃষ্টির ভাষা আমি যেন শুনতে পেলাম।

আমার শুনতে পাওয়াটাই সত্যি হল। রাত ২টা ৫৫ মিনিটে মঞ্জুর শেষ নিঃশ্বাস পড়লো।

একটি ফুল না ফুটতে ঝরে গেল।

আশ্চর্য অমলা! তার চোখে কিন্তু জল ঝরলো না। তার এই নীরবতা যেন এই মুহূর্তের ব্যথাটাকে আরো গভীর করে তুললো।

সবাই কাঁদলো, কিন্তু অমলা কাঁদলো না।

আমার দু চোখে জলের ধারা। নিঃশব্দে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। শেষ রাতের আকাশে তখন নক্ষত্রগুলো জ্বলছে। চেয়ে রইলাম নিঃসীম শূন্যতার দিকে।

সব ফুরিয়ে গেল। পরদিন অমলা চলে গেল তার আত্মীয়ের সঙ্গে বাড়ীতে। সে তো গেল কিন্তু এখানে আমাদের জন্যে রেখে গেল মঞ্জুর স্মৃতি। আর সেই সঙ্গে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হলো, কেন আমি ওদেরকে আমার বাড়ীতে নিয়ে এলাম।

এদিকে আমার স্ত্রীর অসুস্থতাও বাড়লো। নতুন করে আরম্ভ হল তার হাঁপানীর টান।

সারাদিন বাড়ীতে রইলাম। বিকেলে চলে এলাম রঙমহলে। সেখানেই দেখা হল তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে, নাটক নিয়ে খানিক কথাবার্তাও হল। কিন্তু বেশি সময় থিয়েটারে থাকতে পারলাম না। ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম বাড়ী।

বাড়ীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাওয়া দুঃখটাই আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

কত দিন হবে?

মনে মনে হিসেব করলাম। দীর্ঘ সাত মাস হবে মঞ্চে অবতীর্ণ হইনি। এই সাত মাসের কথা তো আগেই বলেছি। যাই হোক, এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ এমন কথা বলি না। তবুও ২১শে সেপ্টেম্বর রঙমহলে 'সাজাহান' নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করলাম। সেদিনের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শরৎ, সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী,

সুহাসিনী এবং শান্তি গুপ্তা। সেদিনের অভিনয় শেষে বুঝলাম, সাজাহানের জনপ্রিয়তা ঠিক আগের মতোই আছে।

'সন্ধ্যা' নামে অরোরার বাংলা ছবিটি মুক্তিলাভ করল উত্তরায়, ২৩শে সেপ্টেম্বর। মণি ঘোষ পরিচালিত এই ছবিতে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

২৫শে সেপ্টেম্বর অভিনয় হল 'চরিত্রহীন'। আমি ঐ নাটকে শিবপ্রসাদের ভূমিকায় অভিনয় করলাম।

অভিনয় যদিও করছি, কিন্তু শরীর ঠিকমতো চলছে না। শেষপর্যন্ত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ডাক্তার ডবলিউ. এইচ. চাও নামে একজন চীনা ডাক্তারকে দেখালাম। অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, কবিরাজী সবই তো হয়েছে, এবারে দেখি চীনা ডাক্তারের দাওয়াই কী বলে।

চীনা ডাক্তারের দাওয়াই চলতে লাগলো।

পূজোর দিনগুলো এবারে এমন করেই গেল। এক মহাষ্টমীর দিন ছাড়া অন্যদিন অভিনয় করিনি।

অক্টোবরের আট তারিখে আবার 'সাজাহান' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হল রঙমহলে। সেদিনও প্রচুর দর্শকসমাগম ঘটলো। শিল্পীতালিকাও আগের মতোই ছিল, শুধু জহর গাঙ্গুলী সেদিন ছিল না। জহর যোগ দিয়েছে মিনার্ভায়।

ঐ রাতে অভিনয় শেষে অশোক শাস্ত্রী এবং বাণীকুমার আমাকে ঘরের বইরে নিভৃতে ডাকলেন। তাঁরা গোপনে আমাকে জানালেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর কথা। সরকারের কাছ থেকে 'আনন্দমঠ' অভিনয়ের অনুমতি মিলেছে। তবে নাটকের 'সন্তান' নামটাই থাকবে। নাট্যরূপ দিয়েছেন বাণীকুমার।

এর পরেই সংবাদপত্রে এবং পোস্টারে বিজ্ঞাপিত হল 'সন্তান'-এর সম্ভাব্য উদ্বোধনের দিন। ২০শে অক্টোবর ছিল বিজ্ঞাপিত দিন।

এদিকে ১৫ই অক্টোবর 'বিজয়া' নাটকটির পুনরভিনয়ের আয়োজন করা হল। ঐদিন বিজয়া নাটকে আমি নেমেছিলাম রাসবিহারী চরিত্রে। নরেনের ভূমিকাটি ছিল অমল ব্যানার্জীর। বিলাস চরিত্রে ছিল মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ ছিল দয়ালের ভূমিকায়, নামভূমিকার শিল্পী ছিল শান্তি গুপ্তা, নলিনীর চরিত্রে ছিল রমা ব্যানার্জী, আর রাধা নেমেছিল দয়ালের স্ত্রীর ভূমিকায়।

সেদিনের বিজয়া নাটকে আশাতীত দর্শকসমাগম ঘটেছিল।

২৬শে অক্টোবর শ্রীরঙ্গমের পাদপ্রদীপের আলোয় এল একটি নতুন নাটক। নাটকটির নাম 'বন্দনার বিয়ে', নাট্যকার ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

ঐদিনে চিত্ররূপার ছবি 'সন্ধি' মুক্তিলাভ করলো মিনার, বিজলী এবং ছবিঘরে। ছবিতে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

দু'দিন না যেতেই মলিনার অসুস্থতার জন্যে শ্রীরঙ্গমে 'বন্দনার বিয়ে'র অভিনয় বন্ধ হল।

কিছুদিন আগে থেকে একটি নাটকের কথা শুনে আসছিলাম। নাটকটি হল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। শুনেছি চলতি ধারা থেকে এ নাটকটি স্বতন্ত্র। একটি সুনিশ্চিত বক্তব্য নিয়ে 'নবান্ন'কে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

নবান্ন নাটকটি বিভিন্ন জায়গায় মঞ্চস্থ করেছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সেই সময়কার বাংলার তরুণ সাহিত্যিক, শিল্পী, নাট্যকার, গায়ক এবং গায়িকা—আজ অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

যাই হোক, 'নবান্ন' সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলাম। নাটকটি দেখলামও শেষ পর্যন্ত। রঙমহলেই সেদিন 'নবান্ন'-এর অভিনয় হল।

সত্যি বলতে দ্বিধা নেই, নাটকটি আমার ভালই লেগেছিল। আরো ভাল লেগেছিল নাটক এবং তার অভিনয়-ধারা, যে অভিনয়-ধারার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও নতুনত্ব ছিল।

'নবান্ন' সে-সময়ে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছিল মানুষের মনে।

রাণীবালার সম্মান-রজনী হিসেবে ৩রা নভেম্বর মিনার্ভায় 'মিশর কুমারী' অভিনয় হল। নাটকে আমার সঙ্গে নির্মলেন্দু লাহিড়ী, জহর, রতীন, সন্তোষ সিংহ, শৈলেন চৌধুরী, রঞ্জিত রায়, সরযূবালা, বন্দনা তো ছিলই, তারপর রাণীবালা নিজেও নাটকে অংশ নিয়েছিল।

যে আনন্দমঠ নিয়ে এত আলোচনা, সেই আনন্দমঠের নাট্যরূপ 'সন্তান'-এর রিহার্সাল আরম্ভ হল ১০ই নভেম্বর। 'বন্দেমাতরম্' গানে নতুন করে সুর দিলেন পঙ্কজ মল্লিক।

'সন্তান'-এর ওপর আমাদের অনেকেরই অনেক প্রত্যাশা।

'সন্তান' রিহার্সাল চলছে। এর মধ্যে এ-নাটক, সে-নাটক অভিনয়ও হচ্ছে। কখনো 'মিশরকুমারী', কখনো 'ভোলা মাস্টার', কখনো অন্য নাটক। অভিনয়ও করছি।

শ্রীরঙ্গম ক'দিন বন্ধ ছিল। শিশিরবাবুও অনেকদিন অভিনয় করেননি, অনেকদিন পরে শ্রীরঙ্গমে আবার পুরনো নাটকের অভিনয় শুরু করলেন ২৫শে নভেম্বর তারিখ থেকে।

পুরনো নাটকের মধ্যে 'মিশরকুমারী'র অভিনয়ে দর্শকসাধারণকে রীতিমতো

আকৃষ্ট করছে। মিনার্ভায় মিশরকুমারীর অভিনয়ে দর্শক-সমাগমে উৎসাহিত হয়ে দিলওয়ার তো ১লা ডিসেম্বরের অভিনয় শেষে বলেই বসলো, আগামী সপ্তাহে আবার মিশরকুমারী অভিনয়ের কথা।

বললাম, না, না, ও-কাজ কোরো না। বরং দু'চার সপ্তাহ যাক, তারপর অভিনয় হবে। নয়তো আসছে সপ্তাহে এই 'মিশরকুমারী' অভিনয় হলে এত টিকিট বিক্রি হবে না। সব কিছু ভেবেচিন্তে করতে হয়। একমাস বাদে 'মিশরকুমারী' অভিনয় হোক, দেখবে আজকের মতো টিকিট বিক্রি হয়েছে।

আপাততঃ ক্ষান্ত হল দিলওয়ার।

১লা ডিসেম্বরের আরও খবর, সন্তোষ সিংহের মিনার্ভায় যোগদান, আর শৈলেন চৌধুরীর মিনার্ভা ত্যাগ।

আসা-যাওয়ার পথ তো খোলাই আছে।

আনন্দমঠ নিয়ে এ-দেশের মুসলমান সমাজের একাংশের বিরূপ মনোভাবের কথা কারো অজানা নয়। বিশেষ করে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি সম্পর্কে তাদের মনোভাব আরো কঠোর।

আনন্দমঠের নাট্যরূপ 'সন্তান' রিহার্সাল চলছে। এরই মধ্যে ৮ই ডিসেম্বর আজাদ পত্রিকায় 'আনন্দমঠ' এবং 'বন্দেমাতরম্' সম্পর্কে মুসলিম সমাজের প্রতিবাদের ভাষা প্রকাশিত হল। ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধেও সেই একই প্রতিবাদ।

'আনন্দমঠ' এবং 'বন্দেমাতরম্' মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানবে—সুতরাং এ নাটক অচিরেই বন্ধ হওয়া উচিত, এই হল আজাদের মোদ্দা-কথা।

ঐ দিনেই আমরা আজাদের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করলাম নাটকের পাণ্ডুলিপি শোনার জন্যে। শোনানোও হল। বলা বাহুল্য, শোনানোর দায়িত্বটা আমার ওপরেই পড়লো।

নাটকের সংলাপ বা অন্য কিছুর ওপর তাঁদের আপত্তি নেই—যত আপত্তি 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত নিয়ে।

বললেন, গানটা বাদ দিন।

বললাম, সে কী করে সম্ভব ?

—কেন, ওর জায়গায় ওই রকম কোন গান লিখিয়ে নিন।

—আপনারাই বলুন না, সেটা কী করে সম্ভব। এই গানের পরিপূরক কি অন্য কোন গান হতে পারে ?

আরো নানাভাবে বোঝানো হল আজাদের প্রতিনিধিদের। কিন্তু তাঁদের এক

কথা, এ গান রাখা চলবে না। তাঁদের কথা, নাটক সম্পর্কে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু বন্দেমাতরম্ গান নাটক থেকে বাদ দিতে হবে।

কথার মধ্যে চা-পানের জন্যে তাঁদের অনুরোধ করলাম। সৌজন্যের খাতিরে তাঁরা চা-পানও করলেন না। জানালেন, এই অসময়ে তাঁরা চা-পান করবেন না।

আজাদের প্রতিনিধিরা চলে যেতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু হল। কারো বক্তব্য, এ নাটক বন্ধ থাক আপাততঃ, কারো বক্তব্য, বিজ্ঞাপনে না জানিয়ে বন্দেমাতরম্ গাইলেই হবে।

এই জোলো বক্তব্য শুনে বললাম, সে কি হয়? এই মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া ঠিক হবে না। বরং বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত নাটকে থাকবে, এই কথাটাই জানিয়ে রাখা ভাল। তবে আমার মনে হয়, বর্তমানে এ ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। শেষটা থিয়েটারকে কেন্দ্র করে যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে, তাহলে কী ঘটবে, তা তো বুঝতেই পারছো!

দেখলাম, আমার কথা অনেকেরই মনে ধরলো না। যাই হোক, আমি পরে শুনলাম এই ব্যাপার নিয়ে বাণীকুমার, শরৎ এবং অশোক শাস্ত্রী শেষ পর্যন্ত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাছে গেলেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তাঁর যোগ্য কথাই বলেছেন, নাটক চালিয়ে যাও—বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতও গীত হোক। আজাদ প্রতিবাদ করেছে এবং করুক।

পরদিন আজাদে প্রকাশিত হল একটি খবর, যেটি সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুললো। সংবাদে প্রকাশিত হল, রঙমহল কর্তৃপক্ষ নাকি 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত বাদ দিয়েই 'সন্তান' অভিনয় করবে।

সেদিনের রঙমহলের অভিনয় শেষে আমরা এক বৈঠকে মিলিত হলাম। অশোক শাস্ত্রী, বাণীকুমারও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা চললো। দেখলাম, অধিকাংশের মনোভাব একই। 'সন্তান' অভিনয় হবে, বন্দেমাতরম্ও থাকবে।

আমি বললাম, আমিও তাই চাই! কিন্তু অন্য দিকটা চিন্তা করা দরকার। এই রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ধরে নেওয়া যাক, আমরা 'সন্তান' অভিনয় করছি। অগণিত দর্শক এসেছে। তার মধ্যে নারী, বৃদ্ধ, শিশুও আছে। তারই মধ্যে থিয়েটার আক্রান্ত হল। হবে না, একথা কি কেউ বলতে পারে? যদি তেমন অঘটন কিছু ঘটে, তখন কি হবে?

কথাটা সবাই ভাবলো। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, অনেকেই মত দিলেন আপাততঃ বন্ধ থাক 'সন্তান' অভিনয়।

তাই সাব্যস্ত হল। ১২ই ডিসেম্বর থেকে 'বিংশ শতাব্দী' নাটকের রিহার্সাল

শুরু হল। পরদিন ১৩ই ডিসেম্বর সংবাদপত্র মারফত ঘোষণা করা হল, 'সন্তান'-এর অভিনয় আপাততঃ স্থগিত থাকবে। কারণ, কিছুই বলা হল না।

এর ফলে, আমাকে এক বিচিত্র অবস্থায় পড়তে হল। আমার নামে বিরূপ মন্তব্য প্রচারিত হল। আমিই নাকি 'সন্তান'-এর অভিনয় বন্ধ হবার জন্যে দায়ী; আমিই নাকি বন্দেমাতরম্ বিরোধী। আর এই অপপ্রচারের মূলে ছিলেন অশোক শাস্ত্রী এবং বাণীকুমার।

রঙমহল নতুন করে 'সাজাহান' নাটকের অভিনয়ের কথা ঘোষণা করলো। কিন্তু নাটকে আমি অংশ নিতে পারলাম না। দুর্বল স্বাস্থ্যই এর কারণ।

১৫ই ডিসেম্বর তারিখ রঙ্গজগতের কাছে নতুন খবর দিলে। দক্ষিণ কলকাতায় কালিকা থিয়েটারের উদ্বোধন নিঃসন্দেহে নতুন খবর। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী থিয়েটার হলের উদ্বোধন করেন। কিন্তু কালিকা মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলোয় প্রথম অভিনয় হল ২২শে ডিসেম্বর। প্রথম নাটক শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল'।

সব খবরই ভাল, কিন্তু আমাকে নিয়ে একী শুরু হল! রঙমহলের বাইরের দেয়ালে বাংলা ও ইংরেজীতে পোস্টার পড়লো, বন্দেমাতরম সঙ্গীতকে অবমাননা করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, তাই পোস্টার পড়েছে 'বয়কট অহীন্দ্র চৌধুরী'।

রঙমহলের দেয়ালের পোস্টার যদিও সন্তোষ ব্যানার্জী তুলে ফেললেন, কিন্তু উত্তর কলকাতার অন্যত্র যে পোস্টার পড়েছে সেগুলো তুলে ফেলা তো সম্ভব নয়। তবুও থিয়েটারের লোক গিয়ে যতদূর পারলো তুলে ফেললো। আমার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের নেপথ্যে ছিলেন অশোক শাস্ত্রী এবং বাণীকুমার।

পোস্টার পড়ুক আর যাই হোক, রঙমহলে সেদিন অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বরের নাটক ছিল 'ভোলা মাস্টার'। বুকিং অফিসে 'বয়কট অহীন্দ্র চৌধুরী'-র কোন প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। অভিনয় চলাকালীন কিম্বা তার আগে-পরে আমার সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্যও উচ্চারিত হয়নি। তবে রাত্রে অশোক শাস্ত্রী, বাণীকুমার এবং মাসিক 'বাসন্তী' সম্পাদক ভারতী পণ্ডিত এলেন। তাঁরা অফিসে জানতে চাইলেন, 'সন্তান' কবে থেকে আরম্ভ হবে। শুনলাম, কর্মী ও আর আর সবাই বলেছেন, 'আমরা তো বলতে পারবো না, আপনারা অহীনবাবুর কাছে যান'। তাঁরা কেউ-ই আমার কাছে আসতে রাজী হলেন না।

রঙমহল থেকে ফিরে তাঁরা শচীন সেনগুপ্তের কাছে গেলেন। সেখানে শচীনবাবুকে তাঁরা বললেন, আমার বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন যথারীতি চালিয়ে যাবেন। শচীনবাবুও নাকি আমার সম্পর্কে কিছুটা বিরূপ কথা বলেছেন শুনলাম।

আমি কেমন যেন বিব্রত বোধ করলাম এই 'বয়কট অহীন্দ্র চৌধুরী' আন্দোলনে। আন্দোলন বললে ভুল হবে, ক'জনের খাম-খেয়ালী ব্যাপার ছাড়া এটা আর কিছু নয়। তাছাড়া আমি তো এ-ব্যাপারের বাইরে। 'বন্দেমাতরম' আমারি কাছেও জীবনের মন্ত্র, আমি ভাবতেই পারি না 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতকে অমর্যাদা করার কথা—অথচ আমাকেই সেই দুর্ভাগ্যের অংশীদার করতে চাইছেন কয়েকজন। আশ্চর্য!

ঘটনা এর পর বেশী দূর এগোয়নি। অশোক শাস্ত্রী, বাণীকুমার এঁরা মিটিং করলেন কলেজ ছাত্র নিয়ে। উদ্দেশ্য অহীন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করা। সেখানে শরৎ গিয়েছিল। সে-ই শুনে আসে সভার বক্তব্য। তারপর শরৎ সমস্ত ব্যাপারটা বসুমতীর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কাছে প্রকাশ করে। হেমেন্দ্রবাবু সমস্ত ব্যাপার শুনে একটা মীমাংসার সূত্র বার করেন এবং শরৎকে বলেন, আমি যেন আসল ঘটনা বিবৃত করে স্টেটমেণ্ট তৈরি করে দিই। দিলামও।

এই প্রসঙ্গে অসঙ্কোচে সত্য প্রকাশ করলাম। শাস্ত্রী মহাশয়রা চেয়েছিলেন যে, আমরা মুখে বলবো, নাটক থেকে 'বন্দেমাতরম' বাদ দেব, কিন্তু মঞ্চে গাইবো। আমি বলেছিলাম, এ-ধরনের মিথ্যার প্রশ্রয় নেওয়া ঠিক নয়। যদি 'বন্দেমাতরম' গাইতে হয়, তাহলে সে-কথা জানিয়ে রাখাই ভাল। তা নইলে ও-নাটক বন্ধ থাক।

হেমেন্দ্রবাবু আমার বিবৃতিটুকু পড়ে, শুধু একটি লাইনের পরিবর্তন করতে বলেছিলেন। নয়তো আর সবই ঠিক ছিল।

শেষপর্যন্ত হেমেন্দ্রবাবু আমাদের এই মিথ্যা বিরোধে বিচারকের ভূমিকা নিলেন। বিরোধ মিটিয়ে দিলেনও। শুনেছি, অশোক শাস্ত্রীকে নাকি তিনি বলেছিলেন, "তুমি বাপু পণ্ডিত মানুষ, অধ্যাপনাই তোমার কাজ। এই সব নাটকের ব্যাপারে তুমি মাথা গলিও না। এসব তোমার জন্যে নয়"।

কিন্তু ইতিমধ্যে 'ভগ্নদূত'-এ আমার বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলনের কথা প্রকাশিত হয়েছে। ফোনে সে-খবরটা আমরা পেলাম রঙমহলে বসে নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাছ থেকে। শুনে আমি 'ভগ্নদূত'-এর শিশির বোসকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি এটা কী করলে, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে পারলে না?

শিশির বললে, বেশ তো—তুমি বক্তব্য রাখ, আমি কাগজে ছেপে দিচ্ছি।

কিন্তু সে-সবের আর দরকার হল না। হেমেন্দ্রবাবু সবকিছুর ফয়সালা করে দিলেন। আমি যে বিবৃতি লিখেছিলাম, সেটি লিখতে সাহায্য করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

'অহীন্দ্র চৌধুরীকে বয়কট করুন' আন্দোলন শুরুতেই শেষ হল। তার জন্যে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে ধন্যবাদ।

রঙমহলে এরপর আরম্ভ হল 'বিজয়া'। আমি এ-নাটকের একজন অভিনেতা।

এই সময়ে শ্রীরঙ্গম দিন-দুয়েক বন্ধ ছিল। তারপর সেখানে আরম্ভ হল শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'। এ-নাটকে বিন্দুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সাবিত্রী (পঞ্চি)। এছাড়া প্রভা ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যও ছিলেন। শিশিরবাবু এ নাটকে অংশগ্রহণ করেননি। তিনিই ছিলেন পরিচালক।

বড়দিনের সপ্তাহে প্রতিটি মঞ্চে নতুন নাটকের আকর্ষণ। স্টারে 'অযোধ্যার বেগম' উদ্বোধন হল ২১শে ডিসেম্বর, ঐ দিনই মিনার্ভায় শুরু হল তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ'। দুই পুরুষের বিশিষ্ট শিল্পী নির্মলেন্দু লাহিড়ী সেদিন অভিনয় করতে পারেননি অসুস্থতার জন্যে। তাঁর জায়গায় অভিনয় করলেন শৈলেন চৌধুরী।

পরদিন ২৩শে ডিসেম্বর কালিকায় আরম্ভ হল 'বৈকুণ্ঠের উইল'।

রঙমহলের প্রতীক্ষিত নাটক তারাশঙ্করের 'বিংশ শতাব্দীর' শুভ উদ্বোধন হল ২৫শে ডিসেম্বর।

নাটক ভালই জমলো। দর্শক সমাগমও ভাল। তবে নাটকের কয়েকটি দৃশ্য যেন একটু পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে।

'বিংশ শতাব্দী'র নিয়মিত অভিনয় চললো। বড়দিনের আকর্ষণ হিসেবে এ-নাটক দর্শককে আকৃষ্ট করলো।

১৯৪৪-এর বিদায়ের দিন এগিয়ে এল। পুরনো দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকালাম। আমার কাছে এই বছরটি যেন একটি দুঃস্বপ্নের বছর।

দুঃস্বপ্নের বছরের শেষ দিনটিও শেষ হল।

'বিংশ শতাব্দী' যথারীতি চলতে লাগলো। অনেক আশা ছিল এই নাটকটির ওপর। তারাশঙ্করবাবু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নাটক সম্পর্কে অনেক আশা পোষণ করতেন, কিন্তু 'বিংশ শতাব্দী' সে-আশা পূর্ণ করলো না। তবে নাটক খারাপ—এ-কথা বলবো না এবং কেউ-ই বলেনি। বরং বিদগ্ধজনের প্রশংসাই পেয়েছিল 'বিংশ শতাব্দী'।

এর মধ্যে নতুন করে 'সন্তান'-এর কথা সবার মনে এল। যে সন্তান নিয়ে এত কাণ্ড, আবার সেই নাটক অভিনয়ের আয়োজন শুরু হল। বাণীকুমারের সঙ্গে যোগাযোগও করা হল, কিন্তু শরতের পক্ষে অসুবিধে হল সন্তানের পাণ্ডুলিপি পেতে।

এদিকে রঙমহলে 'ভোলা মাস্টার' অভিনীত হল ৪ঠা জানুয়ারী। ভালই হয়েছে সবদিক থেকে। এই সময়েই ফরিদপুর থেকে আমন্ত্রণ এসেছে রঙমহলের কাছে।

সে আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছে রঙমহল। যদিও আমি প্রথমে ফরিদপুর যেতে চাইনি। পরে অবশ্য রাজী না হয়ে পারিনি।

৫ই জানুয়ারী শরৎ দেখা করলো বাণীকুমারের সঙ্গে। বাণীকুমার 'সন্তান' পড়ে শোনালো, কিন্তু সেদিনই সে পাণ্ডুলিপি দিলে না শরতের হাতে।

এদিকে যথারীতি চলছে 'বিংশ শতাব্দী।' তেমন সুবিধে হচ্ছে না। সন্তানের পাণ্ডুলিপিও এখনো হাতে আসেনি। সন্তানের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বাণীকুমার এল থিয়েটারে। সেদিন ছিল ৭ই জানুয়ারী। নিজে হাতে সে পাণ্ডুলিপি দিয়ে গেল। ভালই হল।

পরের দিন থেকেই সন্তানের রিহার্সাল আরম্ভ। রিহার্সাল দিতে বোঝা গেল, বাণীকুমার নাটকটির অনেক পরিবর্তন করেছে।

বাণীকুমারের সঙ্গে শরতের কথাবার্তা হয়েছে নাটক সম্পর্কে—সে-কথা বাণীকুমারই আমাকে বললো। কিন্তু শরৎ এখন নেই। কোন কাজে বেরিয়ে গেছে। নয়তো বাকি কথাও হতো এখানে।

পরদিন বাণীকুমার আবার থিয়েটারে এল। কথা হল 'সন্তান' উদ্বোধনের তারিখ নিয়ে। ১৮ই জানুয়ারী নাটকটির উদ্বোধন হবে। কিন্তু আমি আপত্তি জানাবো ভেবেছিলাম। কারণ, দল যাচ্ছে ফরিদপুরে। ফরিদপুর মুসলমান-প্রধান অঞ্চল —আমাদের দল 'সন্তান' অভিনয় করবে এ-কথা যদি জানাজানি হয়, তবে সেখানে কিছু অঘটন ঘটা বিচিত্র নয়। দেশের এই রাজনৈতিক আবহাওয়ায় এ-চিন্তাটা খুব অমূলক নয়। সুতরাং ফরিদপুর থেকে না ফিরে কি 'সন্তান' অভিনয় যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু চিন্তাটা আমার মনের মধ্যেই রয়ে গেল। এ নিয়ে কিছু বললাম না। কারণ, 'না' বলতেই এর আগে এই নাটকের ব্যাপারে আমাকে নিয়ে অনেককিছু ঘটে গেছে। সুতরাং চুপ করে থাকাই ভাল।

৮ই জানুয়ারী রঙমহলের কক্ষেই শরতের সঙ্গে বাণীকুমারের লিখিত চুক্তি হল। চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে অশোক শাস্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন।

'সন্তান' উদ্বোধন হল ১৮ই জানুয়ারী। এ-নাটক উদ্বোধন হবে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সুধী দর্শকদের মনে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। উদ্বোধন রজনীর অভিনয়ে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

নাটকে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম সত্যানন্দের ভূমিকায়, মহেন্দ্রের ভূমিকা ছিল শরতের, জীবানন্দ ছিলেন অমল, আর ভবানন্দের ভূমিকাটি ছিল মিহির ভট্টাচার্যের; স্ত্রী-ভূমিকার অন্যতম শিল্পী ছিল শান্তি গুপ্তা আর সুহাসিনী।

নাটকে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি গাইতো মৃণালকান্তি ঘোষ। এই 'বন্দেমাতরম'

সঙ্গীত গীত হবার সময়ে দর্শক-সাধারণ উঠে দাঁড়াতেন। নাটকের মাঝখানে এ-গান, অথচ মৃণালকান্তি গাইবার সময়ে ছ' হাত তুলে দর্শক-সাধারণকে উঠে দাঁড়াতে বলতো। দর্শকরা উঠে দাঁড়াতেন।

প্রথমদিনে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস আমাদের উৎসাহিত করলো। প্রথম-দিনের অভিনয় সবদিক থেকে সার্থক, শুধু 'আনন্দমঠের' দৃশ্যে ঘূর্ণ্যমান মঞ্চ-ব্যবস্থা কিছুক্ষণের জন্য বিকল হয়ে অস্বাভাবিক অবস্থায় ফেলেছিল আমাদের।

পরদিন 'সন্তান'-এর দ্বিতীয় রজনীর অভিনয় শেষে অশোক শাস্ত্রী, বাণীকুমার, নিবারণ দত্ত প্রমুখ সঙ্গীতসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং কিছু-সংখ্যক ছাত্র আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল।

বুঝলাম, 'সন্তান' একটি মঞ্চসফল নাটক। শুধু তাই নয়, এই নাটকের আবেদনও সর্বজনীন।

এরপর ছুদিন, ২০শে এবং ২১শে জানুয়ারী 'বিংশ শতাব্দী' অভিনীত হল। 'সন্তান'-এর পর এ-নাটকের ওপর আশা রাখা মিছে।

২২শে জানুয়ারী আমাদের ফরিদপুর রওনা হবার পূর্ব-নির্ধারিত দিন। ঐদিন ঢাকা মেলযোগে আমরা রওনা হলাম। এ-যাত্রায় আমার ভৃত্য নিলু আমার সঙ্গেই ছিল। আমি আর শরৎ একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় ছিলাম। অন্য যাত্রীরা অপর কামরায়। কোন রিজার্ভেশন ছিল না।

সারারাত আমাদের জেগে কাটাতে হল। ভোর ছ'টায় ফরিদপুর পৌছলাম। তখনও অন্ধকার ছিল।

ফরিদপুর শহরের একান্তে, কিছুটা জনকোলাহলের বাইরে আমাদের জন্যে আশ্রয় নির্দিষ্ট হয়েছে। সেখানে গেলাম। সারাদিনটা একরকম বিশ্রামের মধ্যে কাটলো। ঐদিনেই আমাদের 'সাজাহান' অভিনয় করতে হবে, মেলা-প্রাঙ্গণে।

প্রথম দিনের নাটক ছিল 'সাজাহান', দ্বিতীয় দিনের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল ছ'টি নাটক। প্রথম নাটক 'কর্ণার্জুন', অভিনীত হল বিকেল তিনটায়। নাটকে তেমন দর্শক সমাগম হয়নি। দ্বিতীয় নাটক 'ভোলা মাস্টার' মঞ্চস্থ হল রাত আটটায়। অজস্র দর্শক সমাগম হয়েছিল। তিল ধারণের জায়গা ছিল না কোথাও।

ফরিদপুরে এর পরের ছ'দিনের অনুষ্ঠানে আরো ছ'টি নাটক অভিনীত হয়েছিল। 'মাটির ঘর' এবং 'বিজয়া'। শেষের দিন মেয়েরা মঞ্চে নৃত্যও পরিবেশন করেছিল। ফরিদপুরের অনুষ্ঠান শেষে আবার কলকাতায় ফেরার পালা। যথাদিনে ট্যাক্সি নিয়ে রাজবাড়ী স্টেশনে এলাম।

আমাদের প্রত্যাবর্তনের ট্রেন গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার।

কলকাতায় ফিরেছি। ফিরে আসার পরে 'বিংশ শতাব্দী'-র বিংশতিতম রজনীর অভিনয়ে অংশ নিলাম।

একটি দুঃসংবাদ পেলাম ৮ই ফেব্রুয়ারী। অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত। কিছুদিন আগেও সে ছিল শ্রীরঙ্গমের শিল্পী। কিন্তু তার শ্রীরঙ্গমের কাজ চলে যায়। তারপর থেকে থিয়েটারে আর কাজ নেই। শুনেছি, মধ্যবর্তী সময়ে সে একটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে কাজ নিয়েছে। কাজের সঙ্গে সে একটা থিয়েটার খোলার উদ্যোগ-আয়োজনেও ব্যস্ত। আর ঠিক এমনি সময়ে সে এমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হল—খবরটা আমার কাছে দারুণ দুঃখের।

১০ই ফেব্রুয়ারী ছিল 'সন্তান'-এর সপ্তম অভিনয় রজনী। ঐ দিনেই রঙমহলে সন্তোষ ব্যানার্জির কাছে শুনলাম বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর মর্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদ।

বিশ্বনাথের মৃত্যুর খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন প্রিয়জন বিয়োগ-ব্যথায় কেঁদে উঠলো।

আজ থিয়েটার বন্ধ থাকবে, এ আর বড কথা কী! রঙমহলে অভিনয় বন্ধ রইলো।

বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর মৃত্যুতে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে-ব্যথা পেলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। তাছাড়া বার বার মনে হল শেষটা বড় কষ্ট পেয়েছে সে। তারপর মৃত্যুর সময়ে সে স্ত্রী আর পাঁচটি শিশুসন্তান রেখে গেছে—যাদের কথা মনে হতে দুঃখটা আরো বেশি করে বাজলো।

১১ই ফেব্রুয়ারী ছিল শিবরাত্রি উৎসব। এদিন সারারাত্রব্যাপী নাটকাভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল রঙমহলে। তবে ম্যাটিনীর নাটক ছিল 'বিংশ শতাব্দী'।

রঙমহলের সারারাতের অভিনয় শুরু হল সন্ধ্যা সাডে সাতটায়। সে-রাতের নাটক ছিল 'সন্তান', 'শিবচতুর্দশী', 'রামের সুমতি' আর 'কর্ণার্জুন'।

এক বছর আগে গিরিশচন্দ্রের শতবাষিকীর সূচনায় রঙমহলে যেমন অনুষ্ঠান হয়েছিল, ঠিক তেমনি শতবর্ষের সমাপ্তি দিনটিতে রঙমহলে 'গিরিশ-তর্পণ'-এর আয়োজন করা হয়। রঙমহলের গিরিশ-তর্পণ অনুষ্ঠানে সেদিন আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন অশোক শাস্ত্রী, ডাঃ প্রেমচাঁদ নিয়োগী এবং ভূতনাথ মুখার্জি। এছাড়া অনুষ্ঠান-সূচীতে ছিল গিরিশচন্দ্র রচিত সঙ্গীত, বিভিন্ন নাটকের নির্বাচিত অংশের অভিনয়।

সেদিনের নির্ধারিত নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়েছিল সাড়ে সাতটায় গিরিশ-তর্পণের পর।

সেদিন গিরিশ-তর্পণ অনুষ্ঠানে 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের নির্বাচিত অংশের অভিনয়ে আমি ম্যাক্‌বেথের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। সেদিন আমার ম্যাক্‌বেথের রূপ-সজ্জা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

অভিনেত্রী শান্তি গুপ্তার সম্মান-রজনীর নাটক 'সাজাহান'। তারিখ ২৭শে ফেব্রুয়ারী। স্থান—রঙমহল। আমি যথানীতি অভিনয় করেছিলাম সাজাহানের নাম-ভূমিকায়, দিলদারের ভূমিকা ছিল নির্মলেন্দুর, জাহানারার ভূমিকা ছিল সুহাসিনীর। এছাড়া রঙমহলের শিল্পীরাও নাটকে অংশ নিয়েছিলেন।

'অভিনয় নয়' সেকালের বহু-প্রশংসিত চলচ্চিত্র। শৈলজানন্দ পরিচালিত এই ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল ২রা মার্চ, রূপবাণী চিত্রগৃহে।

৬ই মার্চ 'মিনার্ভা' আজিমগঞ্জে অভিনয় করবে 'মিশরকুমারী'। আমাকেও যেতে হবে ঐ সঙ্গে। একথা আগেই ঠিক ছিল।

নির্দিষ্ট তারিখে খুব সকালেই আমি প্রস্তুত হলাম। সকাল ৭-৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার ছাড়ে।

ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার নির্দিষ্ট সময়েই ছাড়লো। আমার সঙ্গে ছিল সন্তোষ সিংহ।

আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশনে পৌছলাম বেলা আড়াইটেয়। স্টেশনে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন ডাক্তার রাম অধিকারী, দিলওয়ার হোসেন, হাবুল ছাড়া আরো অনেকে।

কাছেই গঙ্গার ধারে বাহাদুর সিং সিংহানিয়ার প্রাসাদোপম বাড়ী। স্টেশন থেকে সামান্য পথ। এ-পথটুকু আমরা পায়ে হেঁটেই গেলাম।

চা-পান এবং বিশ্রামের পর বিকালের দিকে বাহাদুর সিং-এর পূর্বপুরুষদের নির্মিত পুরাতন প্রাসাদ দেখতে এলাম। এখানে দর্শনীয় বলতে রাজপুত এবং মুঘল চিত্রকলা। এঁদের কলকাতার বাড়ীতেও গিয়েছি, দেখেছি সংগ্রহশালা। সেখানে নানা দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ দেখেছি।

আজিমগঞ্জ শহরটি গড়ে উঠেছে এই পরিবারের ঐশ্বর্যকে কেন্দ্র করে। বিখ্যাত ব্যাংকার জগৎ সিং-এর বাড়ী। এখানেই তাঁদের উত্তরাধিকারীরা বর্তমানে রয়েছেন।

এখানে এসে আরো একটি সুন্দর জিনিস দেখলাম, সেটি হল নওলক্ষ গোলাপ বাগ। নানা জাতের গোলাপের বর্ণাঢ্য সমারোহ এখানে।

গঙ্গার রূপ এখানে কলকাতার চেয়েও সুন্দর। গঙ্গায় জিয়াগঞ্জঘাট থেকে সিং-পরিবারের নিজস্ব মোটর লঞ্চ তাঁদের বাড়ীর কাজে যাতায়াত করে।

আজিমগঞ্জে যেটুকু দেখার দেখেছি, তারপর ফিরে এসেছি অভিনয় মঞ্চে।

আজকের নাটক 'মিশরকুমারী'তে আমি ছাড়া মিনার্ভার শিল্পীরা অংশ নিলেন। এক নির্মলেন্দু লাহিড়ী আসেননি।

অভিনয়ের পর নৈশ ভোজের আসর। ভোজের আসরে বিশিষ্টেরা সবাই উপস্থিত। আহারের আয়োজনও রাজকীয়। ডাঃ রাম অধিকারী আবার পূর্বাহ্নে রাজেন্দ্র সিংজীকে বলে রেখেছিলেন আমার কথা। দেখলাম, সে এক এলাহী ব্যাপার!

নৈশ ভোজের পর ঘুমের পালা। শুধু রাতটুকু। সকালেই আবার রওনা হতে হবে কলকাতায়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখছি, আজিমগঞ্জের এই পরিবার কয়েক শত বছর আগে সুদূর পাঞ্জাব থেকে বাঙলা দেশে এসেছিলেন। এখন এঁরা মনে-প্রাণে বাঙালী হয়ে গেছেন। বাংলা নাটক সম্পর্কে এঁরা বিশেষ উৎসাহী।

পরদিন সকাল সাতটা পঁচিশ মিনিটে আমরা রওনা হলাম আজিমগঞ্জ থেকে। হাওড়া স্টেশনে পৌছলাম বিকাল সাড়ে চারটায়। রঙমহলের গাড়ী অপেক্ষা করছিল। স্টেশন থেকে সরাসরি থিয়েটারে চলে এলাম। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয়নি বলতে গেলে, থিয়েটারে এসে হাত-মুখ ধুয়ে চিঁড়ে দই খেলাম। রঙমহলে সেদিনের নাটক ছিল 'বিজয়া'।

মন্মথনাথ পালের ডাক নাম হাঁদুবাবু। নামকরা অভিনেতা। নায়কের ভূমিকায় তো অভিনয় করতেনই, সিরিও-কমিক অভিনেতা হিসাবে তাঁর একটা বিশেষ পরিচিতি ছিল। আমিও অনেক নাটকে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছি। সুতরাং তাঁর পরলোক-গমনের সংবাদ পেয়ে দুঃখ পাবো, এ আর নতুন কথা কি! হাঁদুবাবু মারা গেলেন ৯ই মার্চ।

দিনপঞ্জীতে কত মানুষের মৃত্যু-সংবাদ কালির আঁচড়ে ধরে রেখেছি। ডায়েরীর পাতা ওল্টালে এখনো দেখতে পাই, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর তারিখটি ১২ই এপ্রিল। যখন যা কিছু খবর বলে মনে হয়েছে, তাই ধরে রেখেছি ডায়েরীর পাতায়। আর এই ডায়েরীর পাতার মধ্যে নিজের ছায়াটাও দেখতে পাই।

বাংলা বছর শেষ হল। বছরের শেষের দু'টি মাস মোটামুটি ভালই ছিলাম। আমার স্ত্রীর শরীরও আগের চেয়ে ভাল।

যাই হোক, এই অবসরে ক'দিনের জন্যে বাগআঁচড়ায় গেলাম। সেখানে বাড়ী তৈরী হচ্ছে—সেই জন্যেই যাওয়া।

ক'দিন বাগআঁচড়ায় কাটিয়ে আবার ফিরে এসেছি কলকাতায়।

কলকাতায় মাঝে মাঝে আমাকে জ্যোতিষীর হাতে পড়তে হতো। হাত বাড়িয়ে

দিতাম হস্তরেখা বিচারের জন্যে। যদিও আমি এ-সবে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসী নই। আমার ধারণা, মানুষের কর্মই মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। তবু জ্যোতিষীকে হাতের কাছে পেলেই হাত বাড়িয়ে দিতাম। কিন্তু মনে ভাবতাম, আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমি জীবনের পথপরিক্রমা শুরু করেছি, এবং শেষ করবো এই বিশ্বাস নিয়েই।

জীবন যখন আছে, তখন জীবনের পথে চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করতে হবে বৈকি। এইতো ক'মাস আগেও নিজের শরীর নিয়ে কত বিব্রত হয়েছি। আর স্ত্রীকে নিয়ে তো রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। অথচ আবার তো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছি। আবার সুস্থ শরীরে অভিনয় করছি। জ্যোতিষীদের কথায় ভাবি ছ' মাস আগেও হাতে যে রেখা ছিল, এখনো তো সেই রেখাই রয়েছে। তবে ছ'মাস আগের দিনের সঙ্গে আজকের দিনের এ তফাত কেন?

অনেকদিন পর শহর কলকাতা আবার আলোর মুখ দেখল। ব্লাক আউটের অবসান ঘটলো।

৩রা মে'র খবর মিত্রশক্তির হাতে রোমের পতন। রোমের পতনের পর একটা বিষয় নিশ্চিন্ত যে, যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়েছে। হয়তো যুদ্ধ শেষের দিনটি আসতে আর দেরি নেই।

দেখতে দেখতে 'সন্তান'-এর ৫০তম অভিনয় রজনীর দিনটি এগিয়ে এল। ৫ই মে ছিল সেই দিন। অভিনয়ের পূর্বে প্রবীণ অভিনেতা কুঞ্জলাল চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে যে অনুষ্ঠান হল, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর ভাষণ দিলেন অশোক শাস্ত্রী।

অভিনয়ের প্রথম দিনে 'সন্তান' যেমনভাবে দর্শক-সাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল, সে আকর্ষণ এখনো অম্লান আছে।

রঙমহলে যখন 'সন্তান' চলছে, স্টারে চলছে 'কঙ্কাবতীর ঘাট', আর মিনার্ভায় চলছে 'ধাত্রীপান্না'।

'সন্তান' যদিও চলছে রঙমহলে, তবু এরি মধ্যে ৭ই মে তারিখে 'খনা'র পুনরভিনয় হল।

ঐ ৭ই মে তারিখ ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ঐদিন ইউরোপে যুদ্ধের রণদামামা বন্ধ হলো। জার্মান আত্মসমর্পণ করলে মিত্রশক্তির কাছে। এই সমর্পণের সময়টিও আমার ডায়েরীতে ধরা আছে। ভারতীয় সময় বেলা ২টা ৪১ মিনিটে জার্মান আত্মসমর্পণ করে।

এই যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস

ত্যাগ করলো। বলদর্পী হিটলারের পতনে আরো একবার প্রমাণিত হল যে পৃথিবীর ইতিহাস একই ধারায় চলে। আসুর শক্তি কখনো কোন অবস্থাতে জয়ী হয়নি।

৭ই মে ইউরোপ খণ্ডে জার্মান যুদ্ধের অবসান ঘটে। আর ১৪ই মে সারাদেশে প্রতিপালিত হল শান্তির উৎসব। ঐ দিন সরকারী ছুটিও ঘোষিত হয়েছিল।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, ১২ই মে তারিখে নিউ টকীজের 'বন্দিতা' ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল মিনার, বিজলী, ছবিঘরে। ছবিতে আমিও অংশ নিয়েছিলাম।

জহর গাঙ্গুলী রঙমহলে যোগ দিলে ১৫ই মে। ঐ দিনেই দীপক সিনেমার ম্যানেজার বিজয় মুখার্জী রঙমহলের স্টেজ ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিলেন।

মে মাসের বাকি দিনগুলোর মধ্যে না ছিল নতুনত্ব, না ছিল বৈচিত্র্য। প্রতিদিনের নিয়মে সেই এক-একটি দিনের জের টেনে চলা।

১লা জুন মিনার্ভায় ছিল সরযূবালার সম্মান-রজনী। ঐ দিনে অভিনীত হল 'মিশরকুমারী'। নাটকে নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী, শান্তি গুপ্তা ও সরযূবালার সঙ্গে আমিও অবতীর্ণ হয়েছিলাম আবনের ভূমিকায়।

মিনার্ভায় সেদিনে বিজয় রায় আগের মত আমাকে রঙমহল ছেড়ে মিনার্ভায় যোগ দেওয়ার কথা জোরের সঙ্গেই বলেছিল। আমি সেদিনেও তার প্রস্তাবে রাজী হতে পারিনি।

অনেকদিন পরে না হলেও বেশ কিছুদিন পরে আবার মন্মথ রায়ের 'খনা' রঙমহলে অভিনীত হল ১৩ই জুন তারিখে। নাটকের টিমওয়ার্ক ভালই ছিল। অভিনয়ও ভাল হল, কিন্তু 'বক্‌স অফিসে'র খবর তেমন আশাপ্রদ ছিল না। সেদিনের অভিনয় দেখতে নাট্যকারের সঙ্গে অখিল নিয়োগীও উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যুর চেয়ে জীবনে সত্যি আর কিছু নেই। কিন্তু এত বড় সত্যিকে যখন চোখে দেখা যায়, কিংবা কোন কাছের মানুষের মৃত্যু হয়েছে, এ খবর কানে আসে—তখন দুঃখটাই বড় হয়ে বাজে।

রতীন ব্যানার্জীর মৃত্যুর খবর শোনার পরেই মনের মধ্যে এই কথাগুলো জাগলো।

রতীন একজন অভিনেতা। প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে সে এসেছিল। কিন্তু মৃত্যুর অপচ্ছায়া সব কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেল।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো, যখন শুনলাম—রতীন আজও সকালে এসেছিল রঙমহলে। অনেকের কাছে ছোট-খাটো ঋণ ছিল, সেগুলো সবই শোধ করে দিয়ে

গেছে। তারপর সেখান থেকে গেছে শচীন সেনগুপ্তের বাড়ী। সেখানে কথা বলেছে, গল্প করেছে এবং সুস্থ শরীরেই ফিরে এসেছে বাড়ী।

বেলা একটায় রতীন আক্রান্ত হয়েছে সন্ন্যাস-রোগে। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বেলা চারটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

রতীনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নামলো রঙ্গজগতে। বন্ধ হয়ে গেল—রঙমহল, মিনার্ভা। তারপর রতীনের মরদেহ নিয়ে শোকার্ত শোভাযাত্রা এল বিভিন্ন থিয়েটারে।

রতীনের শবাধারে আমি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করতে চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। মৃত্যুর পরে রতীনের মুখে জড়িয়ে ছিল এক গভীর প্রশান্তি।

আমিও নিমতলা মহাশ্মশানে চললাম। শুধু আমি নই, সেদিন বাংলা রঙ্গমঞ্চ এবং চিত্রজগতের বহু অভিনেতা অভিনেত্রী নিমতলা মহাশ্মশানে সমবেত হয়েছিলেন।

রতীন বাংলা রঙ্গমঞ্চের একজন শক্তিশালী অভিনেতা। 'চরিত্রহীন'-এর সতীশ চরিত্রে, এবং 'তটিনীর বিচার'-এ বসন্তের চরিত্র তার জীবনের স্মরণীয় অভিনয়।

রতীন হারিয়ে গেল। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তার নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার জীবনে আজও তার স্মৃতি অম্লান।

দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে 'সন্তান' অভিনীত হল। রঙমহলে। আর সেইটাই ছিল এই নাটকের ৭১তম অভিনয়। সেদিনে অভিনয়ের পূর্বে যে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে পৌরোহিত্য করেছিলেন কলকাতার তদানীন্তন মেয়র দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সেদিনের সাহায্য-রজনীর অভিনয়ে সবচেয়ে দৃষ্টিকটু লেগেছিল, রঙমঞ্চের সাজসজ্জা। থিয়েটার হলটি ফুল দিয়ে এমনভাবে সাজানো হয়েছিল, যা রাজকীয় ব্যাপার। কী দরকার ছিল এভাবে সাজানোর? তাছাড়া অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পুরস্কৃত করার ব্যাপারটাও ছিল দুর্বোধ্য। সাহায্য-রজনীর অভিনয়ে এভাবে অর্থের অপচয় অশোভন নয় কী? সে অর্থ যিনিই ব্যয় করুন না কেন।

মিনার্ভায় 'মিশরকুমারী' অভিনীত হল জুলাই মাসের ছ' তারিখে। এ-নাটক তো অনেকবার অভিনীত হয়েছে, কিন্তু সেদিনের অভিনয়ে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। অভিনয়ে আমার সঙ্গে নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ছবি বিশ্বাসও ছিলেন। নির্মলেন্দুবাবু অসুস্থ ছিলেন সেদিন। দারুণ জ্বর নিয়েই অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু প্রথমটা যাও-বা করছিলেন, শেষটা নির্মলেন্দুবাবু ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেন। তবু সেই অবস্থায় একটার পর একটা দৃশ্য অভিনয় করছিলেন। কিন্তু শেষটা আর পারছিলেন না। এদিকে দর্শকদের মনে ধারণা জন্মেছে, নির্মলেন্দুবাবু বোধহয় অতিরিক্ত মদ্য পান

করেছেন, তাই অভিনয়ে এই অবস্থা। এই চিন্তা থেকে শুরু হল হৈ-চৈ, নির্মলেন্দু-বাবুর নাম করে নানা কটূক্তিও বর্ষিত হতে লাগলো।

নির্মলেন্দুবাবু আমাকে বললেন, কী করবো—দর্শকরা যে যা-ইচ্ছে তাই বলছে।

বললাম, সাধারণভাবে একথা তো সবাই জানে যে, তুমি মদ্য পান করো না। তাছাড়া তুমি যে অসুস্থ একথাটা জানানো দরকার।

ছবি বিশ্বাস কাছেই ছিল। তাকে বললাম, তুমি যাও, দর্শকদের বুঝিয়ে বল —সত্যি কথাটা।

ছবি রাজী হল না। অগত্যা আমিই দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে নির্মলেন্দুবাবুর অসুস্থতার কথা বললাম। দর্শকরা চুপ করলো। কিন্তু বিপদ হল আমার একটি শব্দ নিয়ে। আমি আমার বক্তব্যে বলেছিলাম, নির্মলেন্দুবাবু প্রবীণ অভিনেতা—এই 'প্রবীণ' কথা নিয়েই এত ঝামেলা। নির্মলেন্দুবাবু তো চটেই লাল। বললে, আমি কি বুড়ো হয়েছি, যে প্রবীণ? তুমি আমাকে প্রবীণ বললে কেন? জানো, অভিনেতা বুড়ো হয়েছে শুনলে দর্শকরা তাকে বাতিল করে দেয়?

আমি যেন কেমন অপ্রস্তুত বনে গেলাম। বললাম, আমি সেভাবে বলিনি। আমি বলতে চেয়েছি তুমি একজন বিদগ্ধ অভিনেতা—'প্রবীণ' শব্দটা ওভাবে নাইবা নিলে।

তবু নির্মলেন্দুবাবুর রাগ গেল না। আমিও এই নিয়ে আর কথা বাড়াইনি।

মন্মথ রায়ের 'চাঁদ-সদাগর' এইচ. এম. ভি. রেকর্ডে গৃহীত হল ১৭ই জুলাই। আমিও অংশ নিয়েছিলাম ওই নাটকে।

জুলাই মাসের বাকি দিনগুলো কাটলো। ভেবেছিলাম আগস্ট মাসে প্রথম ডায়েরীর পৃষ্ঠায় বুঝি তেমন খবর থাকবে না।

কিন্তু ৬ই আগস্ট তারিখটা ডায়েরীর পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে চিহ্নিত করা আছে। ঐদিনে জাপানের হিরোসিমায় আমেরিকা এ্যাটম বোমা বর্ষণ করলে।

এ্যাটম বোমা বিস্ফোরিত হল হিরোসিমায়, তার দু'দিন বাদেই ৯ই আগস্ট রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করলো জাপানের বিরুদ্ধে।

সারা বিশ্বের তখন একটিই খবর 'হিরোসিমা'। সবারই এক কথা—বলদর্পী হিটলার যে মারণাস্ত্রের কথা বলতো, হয়তো সেই অস্ত্র আমেরিকার হাতে পড়েছিল, জার্মানীর আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে। যাই হোক—যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে হোক, তাই বলে জীবন তো থেমে যাবে না, নাটক তো বন্ধ হবে না। রাশিয়া যেদিন যুদ্ধ ঘোষণা করলো, সেই দিনই রঙমহলে অভিনীত হবার কথা ছিল 'খনা' নাটকটি। কিন্তু অভিনয় বন্ধ ছিল।

রবীন্দ্র-স্মৃতি তহবিলে সাহায্যের জন্যে মিনার্ভায় ১৩ই আগস্ট তারিখে 'চিরকুমার সভা' অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। অভিনয়ে আমি ছাড়া আর যারা ছিল, তাদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, তুলসী চক্রবর্তী, সরযূবালা, রাণীবালা, সুহাসিনী, পদ্মা, ফিরোজাবালার কথা মনে আছে।

সেদিনের অভিনরে দর্শক সমাগম ভালই হয়েছিল।

১৫ই আগস্ট; পরবর্তীকালে ঐদিনই ভারত স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৫-এর পনরোই আগস্ট ছিল মিত্রশক্তির কাছে জাপানের আত্মসমর্পণের দিন। জাপানের আত্মসমর্পণের কথা ঐদিন সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

এরপর দু'দিন 'বিজয় উৎসব'-এর জন্যে ছুটি ঘোষিত হল। সারা দেশে ইংরেজরা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করলো এই 'বিজয় উৎসব'।

আমাদের মনেও স্বস্তি—এবারে সত্যিই হয়তো বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধের অবসান ঘটলো।

একটা কথা বলা হয়নি, দু'দিন আগে থেকেই আমার জ্বর হয়েছিল—আর এই জ্বরের জন্যেই ১৫ই আগস্ট তারিখের 'চরিত্রহীন' এবং 'কর্ণার্জুন'-এ আমি অংশ নিতে পারিনি।

জ্বর নিয়ে বাড়ী বসে আছি। বাড়ীতে বসেই শুনলাম, ১৬ই আগস্ট তারিখে স্টারে 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয় হবে।

অনেকদিন ঘরের খবরও বলিনি। এবারে ঘরের খবর বলতে ১৮ই আগস্ট তারিখে আমার ছেলে ভানুর সায়েন্স কলেজে ভর্তি হওয়া। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনার্স নিয়ে বি. এস-সি. পাশ করে এবারে এম. এস-সি. পড়বে সায়েন্স কলেজে।

২৩শে আগস্ট সংবাদ এল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু টোকিওর কাছে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। সংবাদটা বিনা-মেঘে বজ্রপাতের মত। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু? না না—মৃত্যু নেই সুভাষচন্দ্রের। মিথ্যে কথা—মিথ্যে ঘোষণা। এটা শত্রুপক্ষের প্রচার। তবু সেদিন বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষ শুনলো এই মর্মান্তিক সংবাদ। শুনলো, কিন্তু বিশ্বাস করলো না। 'শরতের সব্যসাচী'র মৃত্যু নেই।

সেদিনের সংবাদ কিন্তু সংবাদ হয়েই রইলো। এদেশের মানুষের এখনো বিশ্বাস, তাদের প্রিয় সুভাষচন্দ্র আজও জীবিত।

২৩শে তারিখে কিন্তু আমার কলকাতায় থাকার কথা নয়, কেননা রঙমহলের দলবল নারায়ণগঞ্জে গেল অভিনয় করতে, আমি যেতে পারলাম না অসুস্থতার জন্যে।

রঙমহল আজ গেল, আর মিনার্ভা-গোষ্ঠী দু'দিন আগেই গেছে ময়মনসিংহে।

ক'দিন বিশ্রাম নিয়ে শরীরটাকে কিছুটা ঠিক করে নিলাম। ১লা সেপ্টেম্বর আবার বাগআঁচড়া যেতে হল্ বাড়ী তৈরির কাজ দেখতে।

বাগআঁচড়ায় পৌঁছে হঠাৎ কী খেয়াল হল, সবাই মিলে গঙ্গা পেরিয়ে বেলেডাঙার দিকে গেলাম।

বাড়ী থেকে গঙ্গা এটুকু পথ হেঁটেই এসেছি।

একঘেয়ে ইঁট-কাঠ-পাথরের শহরে থেকে গ্রামের পরিবেশে এলে ভালই লাগে। পথের দুধারে পাটক্ষেত, ফলের বাগান দেখতে ভাল লাগে।

এবারে নৌকো করে বেলেডাঙা যাবার পালা। আমার সঙ্গে সুধীরা তো আছে, এছাড়া প্রফুল্ল বোস ও বোস-বাড়ীর ছোট-বড় ছেলে-মেয়েরাও আছে। এরা আমাদের বাগআঁচড়ার জীবনের খুব কাছের মানুষ। আত্মীয় তো বটেই।

যাবার সময় দেখলাম, গঙ্গার পারে অনেকগুলো চিমনী রয়েছে। ভাবলাম, হয়তো কোন কারখানার পত্তন হয়েছে। কিন্তু ওগুলো কারখানা নয়। ইঁদারা। গঙ্গার ভাঙ্গন এখানে এমনই বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে যে, গঙ্গার মাটি জলের নীচে তলিয়ে গেছে। কিন্তু এখনো মাটির নীচেকার বাঁধানো ইঁদারাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এখন জল নেমে গেছে, মনে হয়, যেন কতকগুলো চিমনী দাঁড়িয়ে।

বেলেডাঙায় গেলাম। এখানে বিখ্যাত তাঁতীদের বাস। গেলাম তাঁতীপাডায়। নানারকম তাঁতবস্ত্র দেখলাম। বহু দামী দামী কাপড়। কিন্তু সঙ্গে তো টাকা পয়সা তেমন আনিনি, তাই বললাম, কাপড় নিয়ে ওরা যেন আমার বাগআঁচড়ার বাড়ীতে যায়।

আমার কথায় রাজী হল তাঁতীরা।

বেলেডাঙা থেকে ফেরার পথে কিন্তু দারুণ বিপদের মুখে পডতে হয়েছিল আমাদের। একে তখন বর্ষার সময়, বৃষ্টিও হচ্ছিল। তাছাড়া বর্ষায় তো গঙ্গার চেহারা খুব শান্ত নয়।

এবারে স্রোতের বিপরীতে যেতে হবে আমাদের। নৌকো কি যায়! তাছাড়া পারের দিকে চোখ পড়তেই দেখা গেল, এক জায়গায় মাটিতে এক ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

কিন্তু বিপদ হল, নৌকো কিছুতেই এগোয় না। শেষটা মাঝির সঙ্গে আমরা সমর্থ পুরুষেরা বাঁশ দিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করলাম। নৌকো হাত দশ পনরো এগুলো। ঠিক সেই মুহূর্তে পারের সেই মাটির চাপ ধ্বসে পড়লো জলে। নৌকো দুলে উঠল, কাদা জল ছিটকে এল আমাদের গায়ে। ভাবলাম, একটা বিপদ গেল বটে।

সেদিন বাড়ী ফিরতে দেখি সবাই ভাবছে আমাদের জন্যে। ভাবনা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, অনেকগুলি কচি ছেলে-মেয়ে ছিল আমাদের সঙ্গে।

সেবারে বাগআঁচড়ায় আর বেশিদিন থাকা নয়, পরদিনই কলকাতায় এলাম।

সেদিন মিত্রশক্তির সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলো জাপান। মিত্রশক্তির পক্ষে সেদিন ছিলেন জেনারেল ম্যাকআর্থার—আমেরিকার পয়লা নম্বরের যুদ্ধ-বিশারদ।

শরতের সঙ্গে আমার মনোমালিন্য ছিল একথা ঠিক নয়, তবে মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতো। ওর একটা অভ্যেস ছিল, থিয়েটারের ম্যানেজমেণ্ট বা অনুরূপ দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে ও নিজে খুশিমত চলতো, ফিরতো। কিছু হলেই বলতো, আমি জানি না, দাদা জানে। আমাকে ও 'দাদা' বলেই ডাকতো। গণ্ডগোল বা ভুল বোঝাবুঝি যা-কিছু এই নিয়ে। নয়তো আমাদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল না। যাই হোক, শেষটা যেটুকু ভুল-বোঝাবুঝি হল, তা মিটিয়ে নিলে শরৎ, আমার উকীল বন্ধু চাঁদমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

কথাশিল্পী শরৎ চাটুয্যের ছোটগল্প 'অনুপমার প্রেম'-এর নাট্যরূপ দিয়েছে দেবনারায়ণ গুপ্ত। ৭ই সেপ্টেম্বর নাট্যরূপটি পড়ে শোনালো নাট্যকার।

ঐ তারিখে শৈলজানন্দ পরিচালিত 'মানে-না-মানা' চিত্রটি মুক্তিলাভ করলো উত্তরায়। চিত্রটিতে আমি ছাড়া—জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ফণী রায়, রেণুকা রায়, মলিনা, সন্ধ্যারাণীও অভিনয় করেছিল।

৮ই সেপ্টেম্বর তারিখটি যুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণীয়। ঐদিন মিত্রশক্তি-বাহিনী জাপানের রাজধানী টোকিওর রাজপথের ওপর দিয়ে মার্চ করে গেল। মিত্রশক্তির যুদ্ধ-বিজয় সম্পূর্ণ হল।

ঐদিনই জেনারেল ম্যাক আর্থার ফিলিপাইন ত্যাগের প্রাক্কালে বলেছিলেন, 'আমি স্বদেশে যাচ্ছি, কিন্তু আবার আসবো'। এই কথাটির রাজনৈতিক তাৎপর্য সেদিন কম ছিল না।

'অনুপমার প্রেম' নাটকটি রঙমহলে মুক্তিলাভ করলো। ২৭শে সেপ্টেম্বর। নাটকটিতে আমি অবতীর্ণ হয়েছিলাম। সুহাসিনী, মিহির, রাজলক্ষ্মী (ছোট) ছাড়া রঙমহলের নিয়মিত শিল্পীরাও ছিলেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি ছিল না। সাজসজ্জাতেও কমতি কিছু ছিল না। কিন্তু নাটকের শেষাংশে শিল্পীরা নাটক ধরে রাখতে ব্যর্থ হলেন। তবুও নাটকটি প্রশংসা পায়নি এমন নয়।

এ-সময়ে সাধারণভাবে শহরের যানবাহনের সমস্যাটা খুব প্রকট হয়েছিল বাস ধর্মঘটের দরুণ। ২৯শে তারিখে বাস ধর্মঘট যদিও প্রত্যাহৃত হল, কিন্তু ট্রেন ধর্মঘট তখন চলছে। 'অনুপমার প্রেম' না চলার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল—এই ধর্মঘট। তবুও বলব, শিল্পীদের ব্যর্থতার দরুণ নাটক জমল না। এ ব্যর্থতা আমারও। এই

ব্যর্থতা যে শিল্পীর জীবনে কতখানি লজ্জার—আমি অভিনেতা, তা অনুভব করি। তাছাড়া পূজোর আগে, কোন নতুন নাটকের এভাবে মার-খাওয়া ভাল কথা নয়।

পূজোর আগে শহরের বিভিন্ন মঞ্চে নতুন নাটক অভিনয়ের তোড়জোড় চলছে। ১১ই অক্টোবর স্টারে উদ্বোধন হল একটি ঐতিহাসিক নাটক। নাম 'পলাশী'। এর পরদিন মিনার্ভা উপহার দিলে শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা'। নাটকে শিবাজীর ভূমিকার কমল মিত্র রূপদান করলে।

মহাসপ্তমীর দিনে একটা দুর্ঘটনার খবর পড়লাম। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের নারিকেলডাঙার গুদামে আগুন লাগার খবরটা পড়েই অনাদি বসুকে ফোন করলাম। ফোন ধরলো অনাদিবাবুর ছেলে 'ছোট'। তার কাছেই সব শুনলাম। তারপর অনাদিবাবু ফোন ধরলেন। কথায় বুঝলাম, অনাদিবাবু খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

ফিল্মের গুদামে আগুন লাগলে যে কত ক্ষতি হয়, তা বলা যায় না। কত মূল্যবান ছবি চলে যায়। যেমন এর আগে ম্যাডানের গুদামে আগুন লাগতে 'সোল-অব-এ-স্লেভ'-এর মত ছবির নেগেটিভও পুড়ে যায়। অরোরার গুদামে আগুন লাগলেও অনুরূপ কত ছবি চলে গেল।

শিশির ভাদুড়ী আবার পুরনো নাটকে অভিনয় আরম্ভ করলেন শ্রীরঙ্গমে। কখনো 'ষোড়শী', কখনো 'আলমগীর', কখনো আর কোন নাটক। যাই হোক, এই সব পুরনো নাটকের আকর্ষণ তখনও বিন্দুমাত্র কমেনি। তাছাড়া শিশিরবাবুর অভিনয় দেখার আগ্রহ তো আছেই। ভালই চলতে লাগলো শ্রীরঙ্গম।

এই সময়েই মধ্য-কলকাতায় একটি চিত্রগৃহের উদ্বোধন হল। চিত্রগৃহটির নাম 'বীণা'।

'চন্দ্রশেখর' এক সময়ের জনপ্রিয় নাটক। নাটকটি দক্ষিণ কলিকাতায় কালিকা থিয়েটারে অভিনীত হল ২রা নভেম্বর। আমি অভিনয় করেছিলাম বিশ্বাসের ভূমিকায়, নির্মলেন্দু সেজেছিল নবাব, ধীরাজ নেমেছিল প্রতাপের ভূমিকায়, নরেশ মিত্র ছিলেন ফস্টারের চরিত্রে। আর শৈবলিনীর চরিত্রে রূপ দিয়েছিল মলিনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবক্ষ মর্মর-মূর্তির উন্মোচিত হয়েছিল ঐ সময়ে। ঐ দিনের মূর্তির উন্মোচন উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে পৌরোহিত্য করেছিলেন শৈলপতি চ্যাটার্জী, প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক মন্মথ বসু, আর উৎসবে মঙ্গলাচরণ করেছিলেন অশোক শাস্ত্রী।

মানুষ যা ভাবে, তা হয় না, আর যা হয় তা ভাবার বাইরে। অমল ব্যানার্জী মারা যাবে এটা অভাবনীয় ঘটনা।

অমলের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে কেমন যেন বিস্মিত হলাম। মানুষটা ক'দিন আগেও ছিল, এই তো বিজয়ার পর সে আমাকে ফোনে শুভেচ্ছা জানাল, তারপর এ কথাও বললে, দিন কয়েকের জন্যে দেওঘর যাচ্ছে হাওয়া বদলের উদ্দেশ্যে। দেওঘর গেল, ফিরে এল। ফিরে এসে আমাকে ফোন করলে। সবই তো ক'দিন আগের কথা। অথচ সেই মানুষটা আজ আর নেই!

অমলের মৃত্যুতে মঞ্চের অপূরণীয় ক্ষতি হল। প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল সে। রঙমহলের চলতি নাটক 'অনুপমার প্রেম'-এও সে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করত। এখানেও তো তার অভাব পূরণ হবার নয়।

অমলের মৃত্যুতে সেদিন ৩রা নভেম্বর কলকাতার রঙমহল আর মিনার্ভায় অভিনয় বন্ধ ছিল।

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা আবর্ত সৃষ্টি হচ্ছিল। বিশেষ করে নেতাজীর বিমান-দুর্ঘটনায় মৃত্যু, আজাদ হিন্দ ফৌজের কারাবরণ এবং তার বিচার—এই নিয়ে সমগ্র দেশের যুবমানসে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

২১শে নভেম্বর অপরাহ্ণের স্মৃতি এখনো কলকাতার মানুষের মনে। সেদিন ছিল ছাত্রশোভাযাত্রার দিন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তির দাবিতে সেদিন কলকাতার ছাত্রসমাজ মিছিল করে আসছিল রাজভবনের দিকে। সে মিছিলের গতি ছিল দুর্বার। এসপ্ল্যানেডের কাছে ম্যাডান স্ট্রীট আর ধর্মতলা স্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে পুলিশ সে মিছিলের গতিরোধ করে। মিছিল তবু এগিয়ে যেতে চায়। তারপর যা হবার তাই হল। শুরু হল পুলিশের গুলিচালনা। এই গুলিচালনার ফলে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয়, তাছাড়া সেদিনের আহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন ২২শে নভেম্বর কলকাতা শহরে হরতাল প্রতিপালিত হল। সেদিনও পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করলে। সেদিনও বেশ কিছু লোক হতাহত হল। এ-ছাড়া গতদিনের ঘটনায় আহত অবস্থায় যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, তাদের মধ্যেও কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে এ সংবাদও পেলাম।

সারা দেশে ঝড়ের পূর্বাভাস। পরদিনেও গোটা শহরে হরতাল প্রতিপালিত হল। এমন হরতাল বোধহয় এর আগে হয়নি। কোন যানবাহন নেই, কোন কিছু নেই—এমন কি রাস্তার আলোগুলোও জ্বলেনি। সারা শহরে সে যেন এক অভাবনীয় অবস্থা। যুবশক্তির এমন উত্তাল তরঙ্গ এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

সারা শহরে সেনাবাহিনীর টহল, তবুও ছাত্রদের মধ্যে সে কী উন্মাদনা! সেনা-

বাহিনীর খালি ট্রাকে তারা অগ্নিসংযোগ করলো। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তারা এগিয়ে গেল রাইফেল আর মেসিনগানের সামনে।

ঐদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ছাত্র-সভায় ভাষণ দিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ছাত্রদের শান্ত এবং সংযত থাকতে বললেন। এ-ছাড়া ঐদিন রাত্রে বাংলার গভর্নরও বেতার-ভাষণ দিলেন।

পরদিন ২৪শে নভেম্বর। কলকাতায় তখনো স্বাভাবিকতা ফিরে আসেনি। তবুও আগের দিনের চেয়ে আজ যেন কিছুটা শান্তি বজায় রইলো। সেনাবাহিনীর অবিরাম টহলের মধ্যে দু'চারখানি ট্রাম-বাস চললো। তবে তা না চলারই সামিল। এদিনের সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী ক'দিনের ঘটনায় মোট নিহতের সংখ্যা ৫৪, আর আহতের সংখ্যা ১৩২ জন।

২৫ তারিখ থেকে কলকাতা কিছুটা স্বাভাবিক হলেও কর্পোরেশনের ধর্মঘট তখনো অব্যাহত রইলো। কিন্তু এর পরের দিন কর্পোরেশন-ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হলেও—সেদিনেও কিন্তু কর্মীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কাজে যোগ দেয়নি।

কলকাতা শহরের স্বাভাবিকতা ধীরে ধীরে ফিরে এলেও একটা চাপা বিক্ষোভ জমা হয়ে রইলো ছাত্র এবং যুবসমাজে। যে-কোন মুহূর্তে এই বিক্ষোভ আবার চূড়ান্ত আকার ধারণ করতে পারে।

এ-ছাড়া দেশের রাজনীতিতেও একটা চাপা উত্তেজনা—তারও প্রকাশ মাঝে মাঝে দেখা যায় না এমন নয়। ঘটনার গতি কোন দিকে যাবে, ভবিষ্যৎই তা প্রমাণ করবে।

নিশিকান্ত বসুরায়ের 'বঙ্গে বর্গী' নাটকটি পুরনো হবার নয়। রঙমহলে এই নাটকটির পুনরভিনয় তা প্রমাণ করলো। ১৩ই ডিসেম্বরের এই অভিনয়ে ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, আর আমি নেমেছিলাম আলীবর্দির ভূমিকায়। শরৎ অভিনয় করেছিল তানোজীর চরিত্রে। সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ভূপেন চক্রবর্তী। স্ত্রী-চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দুর্গাবালা, মমতা, পদ্মা এবং আরো অনেকে। তুলসী চক্রবর্তী এবং আশু বোস ছিলেন সেদিনের ভূমিকালিপিতে।

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'গৃহলক্ষ্মী' ছবিতে আমিও অভিনয় করেছিলাম। ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল ১৪ই ডিসেম্বর।

১৭ই ডিসেম্বরের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখলাম, মিনার্ভায় আসছে ২১ তারিখ থেকে অভিনীত হবে 'মেবার পতন'।

'মেবার পতন' যেদিন মিনার্ভা নতুন করে অভিনয় শুরু করলে, সেই দিনই

কালিকা মঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি'র উদ্বোধন হল। 'মেজদিদি'-র নাট্যরূপ বিধায়ক ভট্টাচার্যের। আবার ঠিক ঐদিনেই স্টার মহেন্দ্র গুপ্তের নতুন ঐতিহাসিক নাটক উপহার দিলে। নাটকটির নাম 'শতবর্ষ আগে'—সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা।

প্রমথেশ বড়ুয়ার 'আমিরী' ছবিটিও ঐ একই তারিখে মুক্তিলাভ করেছিল।

২১শে ডিসেম্বর যদিও মিনার্ভায় 'মেবার পতন' অভিনয় শুরু হল, তবুও আমরা রঙমহলে ঐ নাটক অভিনয় আরম্ভ করলাম ২৯শে ডিসেম্বর। আমি ঐদিনের অভিনয়ে গোবিন্দ সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। এ-ছাডা নির্মলেন্দুবাবু ছিলেন সাগর সিংহের ভূমিকায়, শরৎ অভিনয় করেছিল রাণা সমর সিংহের চরিত্রে। এ-ছাড়া অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিল সুহাসিনী, ছোট রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী। সেদিন অভিনয়ে আশাতীত দর্শকসমাগম হয়েছিল।

এবারে 'মেবার পতন' নাটকটিকে নতুন করে পরিমার্জিত করার দায়িত্ব ছিল আমার হাতেই। এই কাজটি করেছিলাম বাঘআঁচড়ায় থাকতে।

১৯৪৫ সালের শেষ রজনীর নাটক ছিল 'মেবার পতন' আর 'চরিত্রহীন'। দুটিই পুরনো নাটক। কিন্তু দর্শকদের কাছে নাটক দুটির আকর্ষণ তখনো কমেনি।

সে-রাত্রে অভিনয় শেষে বাড়ী ফিরছি—ফিরতি পথে দেখলাম আলোয় আলোয় ভরে গেছে চৌরঙ্গী-অঞ্চল।

বাড়ীতে এলাম। প্রতিদিনের নিয়মে সে-রাত্রেও আহারাদির পর শয্যা গ্রহণ করেছি। পিছন ফিরে তাকাতে চাই না, তবু পিছন দিকে ফিরে চাই। ফিরে চাই ফেলে-আসা পুরনো বছরটির দিকে।

নানা ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে মনের অঙ্গন-প্রাঙ্গণ জুড়ে।

স্বাগত জানালাম ১৯৪৬-এর প্রথম দিনটিকে।

নববর্ষের নাটক ছিল 'মেবার পতন' আর 'বঙ্গে বর্গী'। দু'টি নাটকই দর্শকবৃন্দকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সেদিক থেকে নতুন বছরের সূচনা ভালই। এরই মধ্যে রাণীবালার সম্মানে মিনার্ভায় মিশরকুমারী অভিনীত হল ৪ঠা জানুয়ারী। বলা বাহুল্য, সেদিনের অভিনয়ে আমি নেমেছিলাম আবনের ভূমিকায়। এ-ছাড়া সে রাতে শিল্পী ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, কমল মিত্র, সরযূবালা, শান্তি গুপ্তা এবং রাণীবালা।

জানুয়ারী মাসে নতুন খবর তেমন নেই। যেমন চলছিল, তেমনই চললো। শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত 'উল্কা' নাটকটি শ্রীরঙ্গমে প্রথম অভিনীত হল ৮ই ফেব্রুয়ারী।

অনেকদিন শান্ত ছিল কলকাতা শহর। নভেম্বরের সেই ছাত্র-আন্দোলনের পর

থেকে আর তেমন কিছু ঘটেনি। কিন্তু ১১ই ফেব্রুয়ারী এক ছাত্র-মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হল।

এই উত্তেজনা চরমে পৌছলো পরদিন ১২ই ফেব্রুয়ারী। বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্র-বিক্ষোভ শুরু হল। এই বিক্ষোভ অন্যান্য স্তরেও ছড়িয়ে পড়লো। পুলিশ এই সব বিক্ষোভকে উপলক্ষ করে গুলি চালালো, কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়লো। ফলে বিক্ষোভ আরো ছড়িয়ে পড়লো।

চার পাঁচদিন ধরে এই বিক্ষোভ, অশান্তি সমানে চললো। তারপর কলকাতা শহরে কিছুটা শান্তি ফিরে এল। অবস্থা একেবারে স্বাভাবিক না হলেও কিছুটা স্বাভাবিক হল বৈকি!

কিন্তু কলকাতা স্বাভাবিক হয়ে এলেও সুদূর বোম্বাই-এ নৌ-বিদ্রোহ দেখা দিল ২০শে ফেব্রুয়ারী। এই নৌ-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক। হয়তো ইংরেজ-শাসনের শেষ দিনটিকে নিকটবর্তী করে, বোম্বাই-এর এই ক্ষণস্থায়ী নৌ-বিদ্রোহ।

২০শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ ঘটে, আর ২৩ তারিখে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে। সেইটাই বড কথা নয়। সেদিন বিদ্রোহের বাণীটাই ছিল চরম সত্য।

এই সময় কলকাতাতেও অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। শিয়ালদা এবং হাওড়া স্টেশন থেকে কোন ট্রেন-চলাচল করেনি একদিনের জন্যে।

কলকাতা থেকে বোম্বাই পর্যন্ত এই যে অস্থিরতা, এই অস্থিরতা যে-কোন মুহূর্তে চরম বিদ্রোহের রূপ নিতে পারে। এ-ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন ইংরেজ সরকারও বেসামাল হয়ে পড়েছেন। এদিকে ভারত তখন স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার—এ দাবি তখন ভারতের কোটি কোটি নরনারীর কণ্ঠে।

একটা একটা করে দিন যায়। প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের পাতায় চোখ দেবার আগেই ভাবতে হয়, না জানি কি নতুন খবর পড়বো।

নানা খবরের মধ্যেও অভিনেতার জীবনে অভিনয়ের খবর থাকেই। ১২ই মার্চ তারিখে 'আনন্দমঠ' এইচ. এম. ভি. রেকর্ডে গৃহীত হল—এটাও একটা খবর বৈকি! রেকর্ডে 'আনন্দমঠ'-এ আমি ছাড়া শিবকালী, সিধু গাঙ্গুলী, শান্তি গুপ্তা, সুহাসিনীও অভিনয় করেছিল। নাটকটির পরিচালক ছিলেন মন্মথ রায়।

এর পরেই আবার নাটকের কথায় ফিরে আসি। ২০শে এপ্রিল আবার আমরা 'রিজিয়া' নাটকের পুনরাভিনয় করলাম। ভালই হল ফল। সেদিন নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছিল রাণীবালা।

অনেকদিনের ব্যবধানে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় হল ৮ই মে। ভূমিকালিপিও দুর্বল নয়। তুলসী লাহিড়ী, নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সঙ্গে আমিও অভিনয় করেছিলাম, কিন্তু সহ-অভিনেতাদের ব্যর্থতার জন্যে অভিনয় জমলো না।

অভিনয় যদি ভাল না হয়, তাহ'লে যে অভিনেতা, সে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়। 'চিরকুমার সভা'র মত নাটক—কত সার্থক অভিনয় হয়েছে, অথচ সেদিন দর্শকরা আশা করে এসেও নিরাশ হয়ে গেল—এ-লজ্জার অংশ আমাকেও নিতে হল বৈকি!

যদিও এমন ঘটনা নতুন নয়, কতবার নিজেকে ব্যর্থ অভিনয়ের সামিল করেছি, তার হিসেব নেই!

আমার সঙ্গে দিলওয়ার হোসেনের বন্ধুত্ব কি আজকের! অনেকদিনের পুরনো বন্ধু সে। ১৯৩০-এর আগেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। তারপরেই রীতিমত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দিলওয়ার আমাকে ডাকতো 'দোস্ত' বলে।

সেই দিলওয়ার হোসেনের মত অকৃত্রিম বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ শুনে দারুণ মর্মাহত হলাম। উচ্চ রক্তচাপ ছিল দিলওয়ারের। মৃত্যুটা তারই জন্যে।

দিলওয়ায়ের মৃত্যুর খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, কী যেন হারিয়ে গেল যা ছিল একান্তভাবে আমার। অথচ এই হারিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে সত্যি! চোখের সামনে দিয়ে কত লোক চলে গেল—আমি দেখলাম, শুনলাম। তারপর দুঃখ পেয়ে দু'ফোটা চোখের জল ফেললাম। এ-ছাড়া আর কী আছে।

কিন্তু দিলওয়ারের মৃত্যু আমার মনে গভীর রেখাপাত করে গেল।

দিলওয়ারের নামে কত মানুষ কত কথা বলতো। কিন্তু আমি তো জানি সে ছিল একজন খাঁটি মানুষ। একদল বলতো, দিলওয়ার হল গুণ্ডার সর্দার। কিন্তু মিথ্যে কথা। সে ছিল দুঃসাহসী—তাই তো সে গুণ্ডাদের ওপর সর্দারী করতেও ভয় পেত না। আমি তো দেখেছি, নিজের এলাকায় কোন অশান্তি ঘটলে সে ছুটে যেত। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব শান্ত। তাছাড়া দিলওয়ারের মতো মদ্যপকেও দেখেছি রমজানের মাসে কী নিষ্ঠা নিয়ে সে রোজা করছে! ওই একমাস সে মদ্য স্পর্শ করতো না। এই যে মানসিকতা, এটা দিলওয়ারের মতো মানুষেরই থাকা সম্ভব।

যাই হোক, আমার একটা আক্ষেপ রয়ে গেল দিলওয়ারের দেহ সমাধিস্থ করার সময় যেতে পারিনি বলে। আমি খবর পেয়েছিলাম দেরিতে। তখন সব হয়ে গেছে। রঙমহল থেকে শরৎ, বিজয়, ইন্দুবাবু সবাই গেল, শুধু আমি যেতে পারলাম না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম। ভাবলাম, বন্ধুর দেহ সমাধিস্থ হবে, সে দৃশ্য নাই বা দেখলাম।

দিলওয়ারের মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ যেতে-না-যেতে চিত্রজগতের আর একজন দিক্‌পাল গেলেন চিরবিদায় নিয়ে। ইনি হলেন রায়বাহাতুর স্থখলাল কারনানী। বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রশিল্পের স্থচনা থেকে কারনানী সাহেব এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন।

এ-বছরটা যেমনই হোক, বৈচিত্র্য কম। অর্ধেক তো চলে গেল, জানিনা বাকি ক'মাস কেমন যাবে।

প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ প্রথমনাথ বস্থর স্মৃতি-তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে মধু বস্থ মিনার্ভায় 'মিশর কুমারী' অভিনয়ের আয়োজন করেন। মধু বস্থ হলেন প্রমথনাথ বস্থর ছেলে।

এই রজনীর 'মিশর কুমারীর' অভিনয়ে শিল্পী-তালিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, ভূমেন রায়, সন্তোষ সিংহ, সরযূবালা, রাণীবালার সঙ্গে আমারও নাম যুক্ত ছিল।

সেদিন মিনার্ভায় এসে বার বার একটি মানুষের কথা মনে হয়েছিল, সে মানুষটি হল আমার বন্ধু দিলওয়ার হোসেন।

পরদিন ১৩ই জুলাই রঙমহলে নাটক ছিল 'চরিত্রহীন'। ঐ রাত্রে অভিনয় শেষে বাড়ীতে ঢুকেই দেখলাম, দোতলায় দালানে আলো জ্বলছে। কিছু ব্যস্ত কণ্ঠও শুনলাম।

ভাল খবর থাক না থাক, মন্দ খবর যেন লেগেই আছে। ১৭ই জুলাই শরতের বাবা যামিনী চ্যাটার্জীর মৃত্যুর খবর পেলাম। শরৎ বাড়ী নেই। কলকাতার বাইরে আছে। খবর পেয়ে কি চুপ করে বসে থাকা চলে? তখুনি ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম। এটা আমার কর্তব্য।

শরৎ পরের দিনই বহরমপুর থেকে ফিরে এল। রঙমহলেই দেখা হল। সেদিন রঙমহলে নাটক ছিল 'কর্ণার্জুন'।

রঙমহলের নিয়মিত শিল্পী হলেও আমাকে অন্য থিয়েটারেও মাঝে মাঝে যেতে হয়। ১৯শে জুলাই কালিকা থিয়েটারে 'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হল। নাটকে নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মলিনা, রাণীবালার সঙ্গে আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম।

২৪শে জুলাই। বেলা সাড়ে দশটা। স্টুডিও-য় শ্যুটিং চলছে হিন্দী ছবি 'গিরি-বালা'-র। সেখানেই হঠাৎ খবর পেলাম, অভিনেতা শৈলেন চৌধুরী মারা গেছে। শৈলেন নেই—খবরটা শুনে শুধু আমি নই, আমরা যারা স্টুডিও-য় ছিলাম, কেমন যেন বোবা হয়ে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মধু বোস, ধীরাজের সঙ্গে এলাম কেওড়াতলায় শৈলেনের অন্তিমশয্যা দেখতে।

শৈলেনকে দেখলাম। চিতাশয্যায় শায়িত তার দেহ। সর্বাঙ্গ শ্বেত বস্ত্রে ঢাকা। শুধু তার সুন্দর মুখখানি অগ্নিস্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

মৃত্যুর পরেও এত প্রশান্তি? দূরে দাঁড়িয়ে আছি, দৃষ্টি আমার শৈলেনের মুখের দিকে। দেখছি—চিতার আগুন এসে স্পর্শ করছে শৈলেনের সুন্দর মুখখানিকে, অথচ কত শান্ত সে!

ভাবলাম, এই তো জীবন—এমনি করে নিঃশেষে সবাইকে তো শেষ হয়ে যেতে হবে!

তবু মনে ব্যথা বাজে। কতই-বা বয়স হয়েছে শৈলেনের, মাত্র উনপঞ্চাশ, অথচ এরই মধ্যে চলে গেল সে!

ব্যক্তিগত জীবনে সে ছিল সপ্রতিভ, অভিনয় ছিল তার সাধনার ধন। একই সঙ্গে মঞ্চে কতবার নেমেছি, কত অভিনয় করেছি—অথচ সে-ই চলে গেল জীবনের মঞ্চ ছেড়ে, সবার অলক্ষ্যে।

গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করলাম। প্রার্থনা জানালাম ঈশ্বরের কাছে শৈলেন যেন তার ঈপ্সিত স্বর্গে স্থান পায়।

অশান্তির শেষ নেই। আজ হরতাল, কাল বিক্ষোভ—একটা-কিছু লেগেই আছে। আগস্ট মাস পড়তে অশান্তির আগুনটা আরো ছড়িয়ে পড়লো। পোস্টাল ধর্মঘট চলছিল, সেটা যদিও মিটলো, কিন্তু কলকাতা শহরের মানুষের মনে নতুন দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো।

ব্রিটেনের ক্যাবিনেট মিশন এসেছিল ভারতে—ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সাড়া দিয়ে। তারা একটা সিদ্ধান্তও রাখলো তদানীন্তন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুস্লিম লীগের প্রাদেশিক শাখা কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলায় হরতালের আহ্বান জানালো ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট। সেই সঙ্গে তারা জানালো, ঐদিন থেকে মুস্লিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবে।

কিন্তু ১৬ই আগস্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপটা যে এমন ভয়ংকর হবে, একথা শহরের মানুষ স্বপ্নেও ভাবেনি।

১৬ই আগস্ট। সাধারণভাবে হরতাল সফল হল। কিন্তু দুপুর থেকে কলকাতায় আরম্ভ হয়ে গেল ভয়াবহ দাঙ্গা।

সমগ্র শহরটা যেন মৃত্যুপুরীর আকার ধারণ করলো। শহরের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা অচল হল। সিনেমা-থিয়েটার যে বন্ধ থাকবে এ আর আশ্চর্য কি!

দিল্লী থেকে ছুটে এলেন তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল। দাঙ্গাবিধ্বস্ত

এলাকা সরেজমিনে দেখে আবার দিল্লীতে ফিরে গেলেন ২৬শে আগস্ট। এর দু'তিন দিন বাদেই দিল্লী থেকে ঘোষিত হল অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা। মন্ত্রীদের নামও জানানো হল এবং সেই দিনই দিল্লী থেকে বেতারে কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কেও অনেক কথা বলা হল।

গোটা আগস্ট মাসটাই থিয়েটারগুলো বন্ধ ছিল। কেবল ৩১শে আগস্ট স্টার খুললো এবং পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার কালিকা থিয়েটারের বন্ধ দরজা উন্মুক্ত হল। ঐ তারিখে রঙমহল যদিও 'সাজাহান' অভিনয়ের কথা বিজ্ঞপ্তিতে জানালো, কিন্তু অভিনয় অনুষ্ঠিত হল না শেষ পর্যন্ত।

এতদিনে কলকাতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলেও মোটামুটি অবস্থা তখন ভাল। শহরের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এলেও তখনো মানুষের মন থেকে দাঙ্গার দুঃস্বপ্ন মুছে যায়নি। হিন্দু এলাকায় মুসলমানরা আসে না, আর মুসলমান এলাকার ত্রিসীমানায় হিন্দুরা যায় না। রাজনৈতিক অবস্থাও ঘোরালো হয়েছে। কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের সাধনা যায় যায়,—লীগপন্থী মুসলমানেরা পাকিস্তানের দাবিতে সোচ্চার।

আমরা অভিনয় জগতের মানুষ, রাজনীতির মারপ্যাঁচ বুঝি না—কিন্তু এটুকু তো বুঝতে পারি যে অদৃষ্ট আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে।

এদিকে এক-এক করে থিয়েটারগুলো আবার চালু হল। রঙমহলে আবার সেই 'সন্তান' চলতে লাগল, মিনার্ভাও খুলল, শ্রীরঙ্গমেও চলতে লাগল 'বিন্দুর ছেলে'। কিন্তু চলা মানে, কোন মতে খুঁড়িয়ে চলা। না আছে তেমন দর্শক, না আছে তেমন উদ্যম। সব কেমন যেন শিথিল হয়ে গেছে।

তবে সিনেমার কাজ কিছুটা চলছে। আমাকেও প্রায়ই স্টুডিও-য় যেতে হয় শ্যুটিং-এ। রাধা ফিল্মসে এমনি একদিন শ্যুটিং চলাকালীন খবর পেলাম, অনাদি বোস মারা গেছেন। সেদিন তারিখ ছিল ২১শে সেপ্টেম্বর। ঐদিন দুপুর দেড়টায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়েই আমি স্টুডিও থেকে অনাদি বসুর বাগবাজারের বাড়ীতে এলাম।

অনাদিবাবু ছিলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু, জীবনে অনেকখানি জড়িয়ে ছিলাম তাঁর সঙ্গে। তাঁর মতো আপনজনের বিয়োগে ব্যথা পাওয়াই স্বাভাবিক।

সেদিন কাশীমিত্র ঘাটে অনাদিবাবুর শেষকৃত্যেও যোগ দিয়েছিলাম।

তারপর উত্তর কলকাতায় দাঙ্গার বিভীষিকা জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আমি সপরিবারে অনাদিবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের দুঃখের অংশ নিতে।

ঐদিনই আমি বেচুকে কথাপ্রসঙ্গে বললাম আমার কথা। বললাম, আর এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার শহরে নয়, ভাবছি পুরী যাব।

১৫ই সেপ্টেম্বর, রঙমহলে অভিনয় হচ্ছে 'মাটির ঘর'। দর্শকসমাগম হয়নি বললেই হয়। অভিনয়ের অবস্থা দেখে হতাশ হলাম। শরৎকে ডেকে বললাম, এভাবে থিয়েটার চালিয়ে কী হবে? আমাকেই বা কী দেবে! টিকিট বিক্রির তো এই অবস্থা!

শরৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বললাম, ঠিক করেছি পুরী যাব। তুমি আর আপত্তি কোরো না।

শরৎ কোন কথাই বললে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে চলে গেল।

পুরী যাওয়া ঠিক হল। পুরীতে ডাক্তার কণক সর্বাধিকারীর বাড়ীতে উঠব ঠিক করলাম। সেই মতোই ব্যবস্থা হল।

কলকাতার বাইরে এসে যেন স্বস্তি পেলাম। শহরে থাকতে দম আটকে এসেছিল—কতদিন পরে সাগর থেকে আসা বাতাসে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিলাম।

সাগর-বেলায় পুরীর চক্রতীর্থের ডাক্তার সর্বাধিকারীর বাড়ীটিও সুন্দর।

পুরীতে দু'দিন বিশ্রামের পর ভুবনেশ্বরে এলাম। বিন্দু সরোবরের ওপর ধর্মশালাতেই উঠলাম। চা-পানের পর পায়ে হেঁটে কেদার গৌরীকুণ্ডের দিকে চললাম। গৌরীকুণ্ডে একটি জলের প্রস্রবণ আছে। স্বতঃউৎসারিত এ জলের খ্যাতি সুবিদিত। স্বাস্থ্যের পক্ষে দারুণ উপযোগী।

গৌরীকুণ্ডের ওপরেই কয়েকটি মন্দির। প্রত্যেকটির কারুকার্য দেখবার মতো। কিন্তু কুণ্ডের পথে মুক্তেশ্বর মন্দিরের তুলনা নেই। আকার বৃহৎ না হলেও মুক্তেশ্বর মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকাজের তুলনা পাওয়া যায় না। বিন্দু সরোবরের তীরে অনন্তদেবের আরো একটি মন্দির, যেটি সত্যি দেখবার মতো; সেটিও দেখলাম। কুণ্ডের আশপাশে বেড়িয়ে এবারে এলাম ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দিরে। মন্দিরে দেবতার প্রতি আমার যত-না আগ্রহ, তার চেয়ে বেশি আগ্রহ এর কারুকাজ দেখার। কিন্তু আমার স্ত্রী বিপরীত স্বভাবের। তার লক্ষ্য দেবতা।

লিঙ্গরাজ মন্দির দেখলাম। আশপাশে ছোট-বড় আরো কত মন্দির। কিন্তু সর্বত্র কেমন যেন শূন্যতা ছড়ানো।

এবারে বসুধারা, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি দেখার পালা। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবাই সঙ্গে আছে। সবাই মিলে উঠেছি উদয়গিরি, খণ্ডগিরির ওপরে। হিন্দু এবং জৈন গুহা দেখেছি। হাজার হাজার বছর আগেকার গুহা—অতীতের কোন এক যুগের সাক্ষ্য

দিচ্ছে। আজ হয়তো এই গুহা মূক, নীরব—কিন্তু দূর অতীতে এই গুহায় কত জ্ঞান-তাপস হয়তো তপস্যা করেছেন। তখন হয়তো এইসব পাহাড় ছিল শ্বাপদশংকুল অরণ্যে পরিবৃত।

সে দিন নেই! কিন্তু সেদিনের স্মৃতি এখনো ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে এইসব শূন্য গুহার পাথরের নীরব দেয়ালে।

গুহামুখে দাঁড়িয়ে অতীত দিনের কথা চিন্তা করি।

সকাল থেকে দুপুর ভুবনেশ্বরেই কাটালাম। বিকেলের গাড়ীতে আবার পুরীতে ফিরে আসা। আবার সেই সাগর বেলায় বিশ্রাম শেষে সন্ধ্যের পর বেড়াতে যাওয়া। বেড়াতে বেড়াতে সেদিন সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে এলাম।

ক'দিন খবরের কাগজের সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক ছিল না বলতে গেলে। ১লা অক্টোবর একখানি স্টেট্‌সম্যান সংগ্রহ করলাম। স্টেট্‌সম্যান ছাড়া কলকাতা থেকে আর কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে না। প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ। দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে এই জরুরী অর্ডিন্যান্স জারী করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে।

দিনের খবরটুকু রেডিও মারফতে শুনতাম, জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে। রেডিও-র খবরে যেটুকু জানতাম, তাতে বুঝতাম শহরের অবস্থা মোটামুটি শান্ত হলেও এখনও অশান্তির আগুনটা ছাই-চাপা রয়েছে।

কিন্তু বেড়াতে এসে এ কী অশান্তি! ১১০০৲ টাকা হারালো কি করে! আমি কি জানতাম? প্রথমটা আমাকে কেউ কিছু বলেনি। শেষটা পরস্পরের কথা শুনে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে—কি বলছো তোমরা?

এবারে আসল কথা শুনলাম। ১১০০৲ টাকা খোয়া গেছে। সবারই সন্দেহ রঘুয়ার ওপর। সে স্থানীয় মানুষ, এখানে এসেই তাকে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সে বোবা সেজেই রইলো। অগত্যা পুলিশে খবর দিলাম। রঘুয়াকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশের লোক। অনেক রকমে চেষ্টা চললো, কিন্তু হারানো টাকা আর ফিরে পাওয়া গেল না।

বাইরে এসে এ আবার এক ঝামেলা! কলকাতার বাড়ীতে টেলিগ্রাম করলাম রঘুনাথ পাণ্ডেকে। যেন সে তার পাওয়া মাত্রই পাঁচ'শ টাকা পাঠায়, 'টি. এম. ও.' করে। সেই মতো টাকা পাঠালো সে।

কিন্তু হারানো টাকা পাওয়া গেল না। যদিও পুলিশ থেকে নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল।

পুরীর অস্থায়ী বাসাও জমজমাট হল। আমি তো এসেছি সপরিবারে, তারপরে কলকাতা থেকে আমার বেয়াই বেয়ানও এলেন। সেদিন ছিল ৩রা অক্টোবর। স্থানীয় অন্নপূর্ণা থিয়েটারে নিমন্ত্রণ ছিল ওড়িশী নাটক "কবিসূর্য" অভিনয় দেখার। সবাই মিলে গেলাম। থিয়েটার কর্তৃপক্ষ আমাকে মঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দর্শকবৃন্দ ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি মেশানো অভিনন্দন পেলাম।

তারপর আরম্ভ হল নাটক। নানা অসুবিধার মধ্যেও এখানে নাটক অভিনয় হল। অভিনয় ভালই। চতুর্থ অঙ্কের পর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুরোধ এল, আমাকে কিছু বলার জন্যে। বললামও। মঞ্চের অভিনেতা হিসাবে যতটুকু বলা উচিত ঠিক ততটুকু।

বলাবাহুল্য আমি বক্তব্য রেখেছিলাম বাংলায়।

সেই এগার শ' টাকা চুরির জের তখনো চলছে। রঘুয়া হাজতে। এদিকে পুলিশ ইন্সপেক্টর আবার এলেন। নানা কথার মধ্যে তিনি জানালেন, বাড়ীর প্রত্যেকের বাক্স, সুটকেস সার্চ করবেন। এ ব্যবস্থায় আমি আপত্তি জানালাম। বললাম, টাকা গেছে যাক—এ সবে আর দরকার নেই। শুনে পুলিশ ইন্সপেক্টর নিরস্ত হলেন।

সত্যি কথা বলতে, স্থানীয় পুলিশ এই টাকা চুরির ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে দারুণভাবে এগিয়ে এসেছিল। হেড কন্সটেবল তো প্রতিদিন আসতো আমার বাসায়। অনেক সময় থাকতো। তাদের ঐকান্তিকতায় খুশি না হয়ে পারি নি।

পুরীর দিন ফুরিয়ে এলো। পূজোর কদিন কাটলো ভালোই। থিয়েটারের মঞ্চে নানা রঙের সাজে নয়, প্রকৃতির কোলে কটা দিন বেশ আনন্দেই কেটে গেল।

বিজয়ার পর স্থানীয় বাঙালীরা আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে এলো। প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে পেলাম অকৃত্রিম শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা। জীবনে এর চেয়ে বড় পাওনা আর কি আছে। কিন্তু ফিরে যাবার দিন এগিয়ে এলো। ৭ই অক্টোবর রাতের গাড়ীতে পুরী থেকে যাত্রা করলাম। পরদিন ভোরে আবার সেই পরিচিত হাওড়া স্টেশনে এসে দাঁড়ালাম। স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের বাইরে পাণ্ডে আমাদের অপেক্ষাতেই ছিল। ফিল্মের কাজের তাগিদে আমাকে ফিরতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। আবার আরম্ভ হল দৈনন্দিন কাজের জের টেনে চলা।

কিন্তু কলকাতায় কিছুতেই মন বসছে না। থিয়েটার তখনো বন্ধ। এক ফিল্মের কাজ যা হচ্ছে। তাও এমন কিছু নয়।

এদিকে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরাও ফিরে এসেছে পুরী থেকে। বেয়াই শচীন বসুও এসেছেন।

আবার বাইরে যেতে মন চাইছে। শেষটা ঠিকও করলাম। এবারেও আমাদের যাওয়ার পথ উড়িষ্যা দিয়ে। গোপালপুরের সমুদ্রসৈকতে।

এবারেও চললাম সপরিবারে। এমন কি আমার ছোট শ্যালক ভানুও চললো আমাদের সঙ্গে। যাওয়ার তারিখ ছিল ২১শে অক্টোবর।

চলতি পথে ট্রেন থেকে দেখলাম চিল্কা হ্রদের অনুপম নিসর্গশোভা। তখন রাতশেষের চাঁদ দিগন্তপটে, তারপর কুয়াশার ওড়না জড়ানো রাত-জাগা প্রকৃতি-সুন্দরীর সর্বাঙ্গে—চলমান ট্রেনের জানালায় বসে দু' চোখে অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে দেখলাম সুন্দরী চিল্কাকে।

শুধু আমি নই, আমাদের সবারই মুগ্ধ দৃষ্টি তখন চিল্কার বুকের দিকে।

রাতের বাকি সময়টুকু ফুরিয়ে গেল চলমান ট্রেনের জানালায় বসে চলমান ছবি দেখতে দেখতে।

সকাল আটটায় পৌঁছলাম বহরমপুরে। ট্রেন থেকে নামলাম। রিফ্রেশমেণ্ট-রুম থেকে চা-পানের পাট চুকিয়ে তারপর মোটরযোগে গোপালপুরের পথে পাড়ি দেওয়া।

বহরমপুর থেকে গোপালপুর—এমন কিছু দূরের পথ নয়।

গোপালপুর সমুদ্রসৈকতে সুন্দর নবনির্মিত একটি বাংলো। নাম হলিউড বাংলো। এই বাংলোতেই আমরা উঠলাম।

বিকেল চারটে পর্যন্ত আমরা বাংলোতেই রইলাম। তারপর সবাই মিলে বেড়াতে বেরোলাম। সুধীরা, ভানু, আমার ছোট শ্যালক—সবাই সঙ্গে আছে। গেলাম গোপালপুর মন্দিরে। মন্দিরের বিগ্রহটি অত্যন্ত প্রাচীন। মন্দিরটি কালে হয়তো সংস্কার করা হয়েছে।

তারপর আমরা এখানে-ওখানে বেড়িয়ে ফিরে এসেছি বাংলোয়।

রাতটুকু শেষ হবার অবসর দিতে রাজী নই, রাত থাকতে উঠে এসেছি সমুদ্র-সৈকতে সূর্যোদয় দেখবো বলে।

সূর্যোদয় দেখলাম। নানা রঙের আলপনা দেখলাম সূর্যোদয়ের মুহূর্তে।

সূর্যোদয় দর্শন করে ফিরে এসেছি বাংলোয়। বাংলোর বারান্দায় বসেও প্রকৃতিকে কাছে পাওয়া যায়। বাংলোর পিছনেই মনোরম পাহাড়তলী, যেখানে নানা সবুজ বৃক্ষের বিন্যাস।

ঐ দিন বিকেলেই 'ঝটকা' চেপে আমরা গেলাম বহরমপুর শহরটি দেখতে। বাইরে এসে শহর দেখতে মন চায় না, তবু দেখতে হয়। নইলে বাইরে আসার একটা দিক অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। 'ঝটকা'গুলো মন্দ লাগে না। ঘোড়ায়-টানা এই মধ্যযুগীয় যানে চলার মধ্যে একটা ধ্রুপদী আমেজ আছে।

আশপাশে দেখার মতো আর কি আছে। এই নিয়েই একদিন কথা হচ্ছিল ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে।

শেষটা ঠিক হল 'তপ্তপানি' যাওয়া। গোপালপুর থেকে বহরমপুর হয়ে যেতে হয় 'তপ্তপানি'। পাহাড়ের ওপর উষ্ণ-প্রস্রবণ 'তপ্তপানি' নামে খ্যাত। কলিঙ্গ রোড ধরে আস্‌কা পাশ দিয়ে তবে যেতে হয়। 'তপ্তপানি' প্রস্রবণে পৌঁছতে বেশ খানিকটা পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। সাগরপৃষ্ঠ থেকে সহস্রাধিক ফুট ওপরে এই প্রস্রবণ। শেষপর্যন্ত গাড়ী উঠতে পারে না। পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে গাড়ীর পথ শেষ, সেখানে রয়েছে বন-বিভাগের মনোরম বাংলো। এই বাংলোর পর পায়ে হেঁটেই ওপরে উঠতে হয়।

ওপরে উঠেছি। 'তপ্তপানি'তে স্নানের পালা এবারে। সবাই স্নান করলো, কিন্তু আমি পারলাম না মূল প্রস্রবণে স্নান করতে। দ্বিতীয় কুণ্ডে, যেখানে জলের তাপমাত্রা কিছু কম, সেখানে কোনমতে স্নান করলাম। 'তপ্তপানি'তে স্নানে অপরিসীম তৃপ্তি। 'তপ্তপানি'তে দুটি সুন্দর বাংলো রয়েছে। স্নান করে আমরা বাংলোর কাছে ফিরে এলাম। মনোরম বাংলোটি দেখে আক্ষেপ হল মনে এ-যাত্রায় এখানে থাকতে পারছি না বলে। আগে জানলে বিছানাপত্তর সঙ্গে নিয়ে আসতাম। এমন একটা জায়গায় রাত কাটাবার সৌভাগ্য হল না—তবু মনকে সান্ত্বনা দিলাম, আর যদি কখনো এ-পথে আসি, এখানেই উঠবো।

এর পরের দিনটা আমরা গোপালপুর ছেড়ে বাইরে যাইনি। গোপালপুরের মধ্যেই ঘুরে বেড়িয়েছি। ঐ দিনই ঠিক করলাম পরদিনের ভ্রমণসূচী। ঠিক হল চিল্কা যাবার।

চিল্কা যাবার দিন গোপালপুরে অনেক সময় ধরে আমরা সবাই সমুদ্র-স্নান করলাম। সমুদ্রে স্নান করতে গেলে বরাবরই আমাকে এক ছেলেমানুষীতে পেয়ে বসে। ভুলে যাই আমার বয়স হয়েছে, ভুলে যাই এতো মাতামাতি আমার সাজে না। যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে পড়ি, ততক্ষণ সমুদ্রের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নিজের উচ্ছ্বাস মিশিয়ে দিয়ে স্নান করি।

সেদিন দীর্ঘ সমুদ্র-স্নানে সত্যিই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

এবারে চিল্কা যাওয়ার পালা। 'রম্ভা' হয়েই আমরা চিল্কায় এলাম। আমাদের আশ্রয় নির্দিষ্ট হল 'রম্ভা' স্টেশনের কাছে একটি ডাকবাংলোতে।

চিল্কায় নৌকাভ্রমণ সত্যিই উপভোগ্য। চিল্কার ছোট ছোট ঢেউ-ওঠা জলে মরাল-গতি নৌকো, আর নৌকোর ওপর বসে চারিদিকের দৃশ্যপট দেখা—এ আমার জীবনের এক আশ্চর্য উপলব্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমি অভিনেতা—চরিত্রে রূপদানই আমার ধর্ম। কিন্তু তার বাইরেও আমার আর এক জীবনে আছে, যে জীবনের ধর্মবোধ স্বতন্ত্র।

চিল্কায় নৌকোযোগে অনেক সময় ভ্রমণ করলাম। জলের ওপর ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে গেলাম—একেবারে 'বরকুণ্ডা' দ্বীপ পর্যন্ত। এ দ্বীপটিও সুন্দর। কিন্তু ঘন জঙ্গলে ঢাকা। এরপর যে দ্বীপটিতে এলাম, এখানেই খাল্লিকোটের রাজার সুন্দর বাংলোটি রয়েছে। যে বাংলোটি আজ জীর্ণ হয়ে পড়েছে লবণাক্ত আবহাওয়ায়। আমরা এই বাংলোতেই দুপুরের আহার গ্রহণ করেছিলাম।

এর আগে বালুগাঁও থেকে চিল্কা দেখেছি, কিন্তু 'রম্ভা' থেকে চিল্কা দেখা আরো সুন্দর।

চিল্কা থেকে আবার গোপালপুর। গোপালপুর ছাড়ার আগের দিন আমরা সমুদ্র-সৈকতে পাম বীচ হোটেলটি এবং তার আধুনিক পরিবেশটি দেখলাম। ভালো লাগলো। তারপর যথারীতি সাগরবেলায় বেড়িয়ে বেডানো, সমুদ্রের ছুটে-আসা ঢেউ-এর সঙ্গে মাতামাতি করা—কিংবা বালির ওপর শুয়ে-থাকা। রাত না হলে আমরা কোনদিনই বাংলোয় ফিরতাম না।

ইচ্ছে ছিল গোপালপুর থেকে ওয়ালটেয়ার যাবো। তারপর সীমাচলম্। কিন্তু ওয়ালটেয়ারে আর থাকা হল না। কেননা, অনেক চেষ্টা করেও ধর্মশালায় জায়গা পেলাম না। শেষটা একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। সুতরাং আর অপেক্ষা নয়, সরাসরি সীমাচলম্।

এই আসার পথে পারলিয়াকিমেডিতে গিয়েছিলাম। ছোট অথচ সুন্দর শহরটি। এই নামেই দেশীয় রাজ্যের রাজধানী এটি। পারলিয়াকিমেডিতে নেমে কোথাও জায়গা পাইনি—শেষটা একটা রেস্ট হাউসে জিনিসপত্তর রেখে জলযোগ সেরে শহর দেখতে বেরোলাম। রাজপ্রাসাদটি সুন্দর। অতীতের ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজার কাহিনীও শুনলাম। খেয়ালী রাজা। নিজেকে খেয়ালের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন। শুনলাম, রেস-খেলা এবং অনুরূপ কোনো-কিছুতে রাজার আগ্রহের কথা।

রাজা-রাজড়ার ব্যাপারই আলাদা।

পারলিয়াকিমেডির ভ্রমণসূচী ছিল সংক্ষিপ্ত। সীমাচলমে পাহাড়ের ওপর মন্দির। ১১০০ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। মন্দিরটির কারুকাজ সুন্দর। দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে গঠিত। মন্দিরে অনন্তনারায়ণের মূর্তি।

এই মন্দির দর্শনান্তে আমরা প্রধান মন্দিরে এসেছি। মন্দিরে বিগ্রহ নেই, শুধু মন্দিরের বাইরে পর্দা দিয়ে ঢাকা নৃসিংহ মূর্তি খোদাই করা। সুন্দর লাগলো নৃসিংহের খোদিত মূর্তি। দেখলাম। কিন্তু মন্দিরের বিস্তৃত অঙ্গনটি সবচেয়ে সুন্দর লাগলো। মন্দিরের সামগ্রিক পরিবেশ জুড়ে বিরাজ করছে গভীর প্রশান্তি আর পবিত্রতা।

সেদিন দেবতার ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করলাম। তিন রকমের ভোগ। দেবতার প্রসাদ। তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছি।

কোথাও স্থির থাকতে চাই না। সীমাচলম্ থেকে ভাইজাগে এলাম। সেখান থেকে ওয়ালটেয়ারে। বাকি ছিল অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় দেখা—দেখলাম।

এখানে তালবনের মধ্যে দিয়ে সমুদ্র-সৈকতে যাবার পথ। তারপরেই সমুদ্র-কিনারে সুন্দর একটি হোটেল। সেখানে বসে আমরা ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণ করেছিলাম।

ওয়ালটেয়ারেই থাকেন ডাক্তার ভট্টাচার্য। তার সঙ্গে কথা হল। এখানকার বাঙালীদের ক্লাব এবং থিয়েটারের কথাও বললেন। দেখলাম, ভদ্রলোক বাংলার বাইরে এসেও বাঙালীর সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত।

এখানেই স্টেশনে রেলওয়ে রিফ্রেশমেণ্ট-রুমের ম্যানেজার এ. কে. গাঙ্গুলী আলাপ করতে এলো আমাদের সঙ্গে।

আলাপের আরম্ভেই সে বললে, আমাকে চিনতে পারছেন?

তারপরেই সে পুরনো প্রসঙ্গ তুললে। আমরা একবার আদ্রায় অভিনয় করতে গিয়েছিলাম। তখন গাঙ্গুলী ছিল আদ্রার রিফ্রেশমেণ্ট-রুমের ম্যানেজার।

তারপর আরো বললে, আপনার দেশেই আমার বিয়ে হয়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী বাগআঁচড়ার মেয়ে।

সুধীরা এবারে গাঙ্গুলীকে নিয়ে পড়লো। দূরদেশে এসে এমন একটি আত্মীয়তার গন্ধ পাওয়া—এ যেন দুর্লভ কিছু!

তাছাড়া গাঙ্গুলীর বিয়ে হয়েছে বাগআঁচড়ার অধিকারী বাড়ী, যাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। সুধীরা গেল গাঙ্গুলীর বাড়ীতে। সুধীরাকে তো জানি, তার মনটা মাতৃত্বের সুষমায় ভরা। দূরের মানুষকেও সে যে কত সহজে কাছে টানত, তার

ঠিক নেই। আর এ. কে. গাঙ্গুলীর সঙ্গে তো পরিচয়ের সূত্র বেরিয়ে পড়েছে। আর গাঙ্গুলীর শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সুধীরারও পরিচয় আছে।

সেদিন গাঙ্গুলী সত্যিই আমাদের কাছে পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছিল। সে-ই টিকিট কালেক্টর ভাদুড়ীকে বলে আমাদের জন্যে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল।

গোপালপুর ফিরে কলকাতার কথা মনে এল। কদিন তো কলকাতা ছাড়া—এবারে যেন ফিরে যেতে মন চাইছে। অথচ কাগজে দেখছি, কলকাতার অবস্থা এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। তাই বাড়ীতে পাণ্ডে, আর এদিকে চিত্র-পরিচালক বন্ধু মধু বসুকে তার করলাম কলকাতার খবর জানতে। উত্তরে মধু বসু জানালো, এখন কলকাতা মোটামুটি শান্ত, ফেরা যেতে পারে।

এর পরেও আরো দিনদুয়েক গোপালপুরে ছিলাম। গোপালপুর থেকে যেদিন কলকাতায় ফিরে এলাম, সেদিনটা ৪ঠা নভেম্বর।

কলকাতার যে খবরই থাক, আমাদের কাছে থিয়েটারের খবরটাই আগে। থিয়েটারের খবর বলতে গেলে এক শ্রীরঙ্গম ছাড়া আর সব কটি থিয়েটার ততদিনে খুলে গেছে। স্বাভাবিক অভিনয়ও শুরু হয়েছে।

কলকাতার আর-আর অবস্থা ভালোর দিকে গেলেও দাঙ্গার আগুনটা তখন বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিহারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার খবরটি তখন শিরোনামায় স্থান পাচ্ছে।

নভেম্বর মাসটা যেমন তেমন করে কাটলো। সামনে বড়দিনের মরশুম—থিয়েটারে কতো সমারোহ করে নাটক হবে, তা নয়—দিন-রাত শুধু অশান্তির প্রহর গোনা।

তবু এর মধ্যে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ২৭ তারিখে কালিকা থিয়েটারে একটি নতুন নাটকের উদ্বোধন হল। নাটকটির নাম হল 'রামপ্রসাদ'।

স্টারে সেই সময় সকালের দিকেও অভিনয় হয়েছে, কেননা বিকেলের দিকে মানুষ বেরোতে ভয় পায়। বিশেষ করে সন্ধ্যের পর কেউ আর বাইরে থাকতে চায় না।

১লা ডিসেম্বর সকাল ৯টায় স্টারে 'প্রফুল্ল' অভিনীত হল নোয়াখালি দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্যের জন্যে। ঐ দিনের অভিনয়ে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রথম যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ঐ দিনের অভিনয়ে আমি অভিনয় করেছিলাম রমেশের ভূমিকায়। ঐ দিনের ভূমিকালিপি ছিল আকর্ষণীয়। ভূমেন রায়, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, নরেশ মিত্র, কেষ্টধন, সরযু, রেবা—ভূমিকালিপি কম আকর্ষণীয় হয়নি এদের নামে।

এর মধ্যে একদিন চণ্ডী ব্যানার্জী আমাকে মিনার্ভায় 'মিশরকুমারীতে' অভিনয় করার অনুরোধ করে ফোন করল। কিন্তু আমি রাজী হলাম না।

এরপরেও চণ্ডী ব্যানার্জী এবং বিজয় রায়ের কাছ থেকে অনুরোধ এলো সাময়িক-ভাবে বড়দিনের মরশুমে অভিনয় করার জন্যে। কিন্তু রাজী হতে পারি নি। কারণ আমার প্রাপ্য দক্ষিণা ওরা দিতে অসমর্থ। এই নিয়ে এন. সি. গুপ্তের কাছ থেকেও বার বার অনুরোধ এসেছিল।

তুলসী লাহিড়ীর বিখ্যাত নাটক 'দুঃখীর ইমান' উদ্বোধন হবার কথা ছিল ১২ই ডিসেম্বর। কিন্তু দাঙ্গার জন্যে সেদিন নাটকটির উদ্বোধন হয়নি।

অনেকদিন পর বিজয় রায়ের কাছ থেকে ফোন পেলাম ২৪শে ডিসেম্বর। আমার দক্ষিণা তারা দিতে সমর্থ—সুতরাং এবারে যেন আর অভিনয়ে আপত্তি না করি।

আপত্তির আর কি কারণ থাকতে পারে? ২৫শে ডিসেম্বর মিনার্ভায় 'মিশর-কুমারী'তে আমি অংশ নিলাম।

পরদিন ২৬ তারিখের নাটক ছিল 'প্রফুল্ল'। তারপর 'সাজাহান', 'দুই পুরুষ', 'মিশরকুমারী', 'চন্দ্রশেখর'—এগুলিও বড়দিনের ছুটিতে অভিনীত হয়েছিল মিনার্ভায়। প্রতিটি নাটকেই আমি অংশ নিয়েছিলাম।

মিনার্ভায় ক'দিনের অভিনয় ভালোই জমেছিল।

১৯৪৬-এর শেষ রজনীর নাটক ছিল 'মিশরকুমারী'। আর ১৯৪৭-এর প্রথম রজনীর নাটক ছিল 'মিশরকুমারী'। আজ যে ভারতসম্রাট 'সাজাহান', কাল সে 'আবন'।

মিনার্ভায় প্রতিদিন অভিনয় শেষে প্রচুর খাদ্য-পানীয় আমার টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া হতো। আগে একদিন আপত্তি করেছি, কিন্তু আমার আপত্তি শোনেনি বিজয় রায়। এরপরেও প্রতিদিন অভিনয় শেষে আমার টেবিলে রাখা হতো খাদ্য-পানীয়। আর আপত্তি করতাম না।

৫ই জানুয়ারী অভিনয় শেষে যথারীতি আমার নির্দিষ্ট আসনে বসেছি। টেবিলে খাদ্য-পানীয়ের সেই পরিচিত ব্যবস্থা। এতদিনে বুঝলাম, এই আপ্যায়নের অর্থ কী। ঐদিনেই বিজয় রায় আর চণ্ডী ব্যানার্জীর কাছ থেকে অনুরোধ এলো মিনার্ভায় স্থায়িভাবে যোগ দেবার। অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিনি। জানালাম—পরে জানাব।

সায়গলের কথা মনে পড়লে এখনো মনের ভিতরটা হু-হু করে ওঠে। একজন অবাঙালী—বাংলাদেশের মাটি-জলের মধ্যে সে যে কোন্ প্রাণের স্পর্শ পেয়েছিল সে-ই জানে। আপন করে নিয়েছিল বাংলাদেশটিকে। আর বাংলাদেশও তাকে হৃদয়রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিল।

সায়গলের পুরো নাম কুন্দনলাল সায়গল। সে ছিল এমন এক সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী যার তুলনা সে নিজে। সে আমলে বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠে তার গানের ভাষা অহরহঃ উচ্চারিত হতো। রেকর্ডে, চিত্রে তার অজস্র গান বাণীবদ্ধ হয়েছে। তারপর সে ছিল একজন সু-অভিনেতা।

এই মানুষটি চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে—খবরটি পেলাম রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে বসে।

জলন্ধরে পরলোকগমন করেছিল কে. এল. সায়গল।

আমার জীবনের পটভূমিকা নাটককে ঘিরে। নাটক বাদ দিলে আমার কি আছে?

একটির পর একটি নাটকে অংশ নিয়ে চলেছি। কখনো পুরনো নাটক, কখনো নতুন নাটক। এ যেন এক জোয়ারে ভেসে চলা। তারই মধ্যে সংসার আছে, সংসারের ধর্ম পালন করা আছে। কোনটাই বাদ দেবার নয়। আর মনের দেয়ালে সংসারের কথাগুলো ডায়েরীর পাতায় ধরে রেখেছি। জানুয়ারী মাসের সতরো তারিখে বসন্ত রায় রোডে জমি কিনলাম, যত্ন করে সেটিও লিখে রেখেছি ডায়েরীতে।

কলকাতা মোটামুটি শান্ত হয়ে এসেছিল। কিন্তু ২১শে জানুয়ারী 'ভিয়েৎনাম দিবস' উপলক্ষে ছাত্র-শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে আবার অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়লো। ঐদিনে ছাত্রদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছিল। পরদিন হরতাল প্রতিপালিত হয়েছিল, সেদিনেও পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় গুলি চালিয়েছিল ছাত্র এবং জনতার ওপর।

এই অশান্তির মধ্যেও রেডিও-য় 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকে অংশ নিলাম।

এদিকে মিনার্ভার সঙ্গে কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ না হলেও সেখানে অভিনয় করতে হচ্ছে আমাকে। কখনো 'সাজাহান', কখনো 'মিশরকুমারী', কখনো অন্য কোন নাটক।

অনেকদিন পুরনো নাটক অভিনয়ের পর মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাশীনাথ' নাটকটির রিহার্সাল আরম্ভ করলেন।

কাশীনাথের রিহার্সাল চললো।

শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রতিবারের মতো এবারেও বিভিন্ন মঞ্চে সারারাত্রিব্যাপী নাটক-অভিনয় হল। মিনার্ভাতেও ছোট-বড়ো পাঁচটি নাটক অভিনীত হল সে রাত্রে।

অ্যাসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটরের ছবি 'মন্দির' মুক্তিলাভ করলো ২২শে ফেব্রুয়ারী। এর কয়েকদিন পরেই ২৮শে ফেব্রুয়ারী মিনার্ভায় 'কাশীনাথ' আরম্ভ হল। ছবি বিশ্বাস, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, শ্যাম লাহা, শিবকালী, সরযূ, সীতা দেবী, সুহাসিনী, মুকুলজ্যোতি ছাড়া আমিও ছিলাম সে নাটকে।

কাশীনাথ চলতে লাগলো মিনার্ভায়।

কলকাতা শহরটা তখন যেন চরম অশান্তির শহর। আজকের অবস্থা দেখে কালকের অবস্থা অনুমান করা যায় না। কে ভেবেছিল ২৬শে মার্চ থেকে আবার নতুন করে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হবে কলকাতায়?

ভয়াবহ দাঙ্গা আরম্ভ হল। আবার শহরবাসীর মনে ভীতির সঞ্চার। সান্ধ্য-আইন জারী হল বিভিন্ন এলাকায়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ সকাল নটায় 'কাশীনাথ' অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন পরীক্ষামূলকভাবে। অভিনয় হল যদিও, কিন্তু দর্শকসংখ্যা ছিল নগণ্য।

'এতো ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা'—দাঙ্গা চলেছে, তার মধ্যেও নাটক! ২৫শে এপ্রিল রঙমহল নতুন নাটক 'ভুলের মাশুল' উপহার দিলে। কিন্তু এই অবস্থায় কি নাটক জমে!

কলকাতার অবস্থা তখনো অশান্ত। কয়েকটি থানা সেনাবাহিনীর অধীনে গেল।

কলকাতার থিয়েটারগুলোর অবস্থা তখন কাহিল। মিনার্ভায় 'কাশীনাথ' বন্ধ হল। পুরনো নাটক 'ধাত্রীপান্না'-র কথা বিজ্ঞাপিত হল। এ নাটকে আমি ছিলাম না।

'কাশীনাথে'-এর শেষ অভিনয় হয়েছিল ২৭শে এপ্রিল।

মনে হয়েছিল এবারে শহরের অবস্থা বোধ হয় স্বাভাবিক হবে। ১৪ই মে কয়েকটি থানা থেকে সান্ধ্য-আইন উঠে গেছে—কিন্তু কদিন না যেতেই ১৯শে মে থেকে আবার নতুন করে অশান্তির আগুন জ্বললো।

স্টার ছাড়া সব থিয়েটারের দরজা বন্ধ হল।

অশান্তি চলছে তো চলছে—মে মাস গেল; মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতা শহরের বেলিয়াঘাটা, তালতলা এলাকা সেনাবাহিনীর হাতে গেল।

এদিকে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া জটিল হয়ে উঠছে। কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার, আর মুস্লিম লীগ তাদের পাকিস্তানের দাবিতে অনড়।

ভারতব্যাপী তখন এক বিচিত্র রাজনৈতিক জটিলতার উদ্ভব হয়েছে।

এই অবস্থা যখন চলছে, ঠিক তখনই ৩রা জুন ব্রিটেন ঘোষণা করলো ভারত এবং পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা। ঐদিনেই খণ্ডিত ভারতের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল।

৩রা জুন তারিখে ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় বেতারভাষণ দিলেন। ঐদিনেই পণ্ডিত নেহরু, মিঃ জিন্না, সর্দার বলদেও সিং—এঁরাও জাতির উদ্দেশ্যে বেতারভাষণ দিলেন।

১২ই জুন ভারতসম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে ছুটি ছিল। ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তিম মুহূর্তেও দেশের বিভিন্ন জায়গায় যথারীতি প্রাণহীন উৎসব উদ্‌যাপিত হল। এই দিনেই ফাইন আর্ট প্রিন্টিং-এর চণ্ডী ব্যানার্জীর উদ্যোগে মিনার্ভায় 'মিশরকুমারী' অভিনীত হল। যথারীতি ঐদিনেও আমাকে আবন-এর রূপসজ্জায় মঞ্চাবতরণ করতে হয়েছিল।

চণ্ডীবাবু এর আগেও যে অনুরোধ করেছেন, এবারেও তাঁর কাছ থেকে অনুরোধ এল, আমি কবে আবার অভিনয়ের তারিখ দিতে পারবো। সেদিন কোন কথা দিতে পারলাম না। বললাম, আজ কিছু বলতে পারছি না, শনিবারে আপনি ফোন করবেন, সেদিন যা হোক বলবো।

২০শে জুন।

বাঙলাদেশের ইতিহাসে এইটেই বোধ হয় চরম মসীলিপ্ত দিন। ঐ দিন বাংলা বিভাগের কথা ঘোষিত হল।

ঐদিন বাঙলাদেশ আর বাঙালী জাতির চরম দুঃখের দিন। এই চরম দুঃখের দিনটিতে কালিকা থিয়েটারে একটি শিশু-নাটকের উদ্বোধন হল। নাটকটির নাম 'বিষ্ণুশর্মা'।

নানা কথার মধ্যে সিনেমা জগতের কথা তেমন বলা হয়নি। আর কথাও তেমন নেই। যা আছে, সেটুকু বলা দরকার। যুদ্ধের সময়ে দেশে একদল মানুষের হাতে প্রচুর অর্থ এসে পড়লো। কেন এল, সে কথাটা খুবই স্পষ্ট। কেউ প্রযোজক হয়ে এল নতুন জগতের আলো দেখতে, কেউ এল গল্পে-শোনা এই রূপকথার রাজ্যে, আবার কেউ এল অন্য কারণে। যাই হোক, এই সময়ে কত যে ছবি আরম্ভ হল তার হিসেব নেই। নিত্য নতুন প্রযোজক আসছে, দু'দিন ছবির শ্যুটিং ক'রে, কিছু অর্থ দিয়ে সেই যে ডুব দিচ্ছে তারপর আর দেখা নেই। এমনিভাবে কত ছবির কাজ যে শুরুতেই শেষ হল তার হিসেব নেই। তবে কোন কোন ছবি যে শেষ হয়নি এমন নয়।

যুদ্ধের সময়ে কালোবাজারের কালো টাকা সে সময়ে সিনেমা-শিল্পের ক্ষতিই করেছিল।

১৯৪৭-এর ছ'মাস কাটলে জুলাই মাসের প্রথম দিনটিতে মিনার্ভায় 'দুই পুরুষ' সম্মিলিত অভিনয় রজনী হিসেবে অভিনীত হয়েছিল।

এই সময়ে প্রবোধ গুহ মহাশয় একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার লিমিটেড নামে একটি সংস্থার পত্তন—এই হল পরিকল্পনা। প্রবোধবাবু তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে আমাকে ডিরেক্টর হতে বললেন।

আমি বললাম, উত্তম উদ্যোগ—কিন্তু আমি কি করে থাকি বলুন? আমি থিয়েটার করছি—তার মধ্যে এ-সবে যাওয়া কি আমার পক্ষে ঠিক হবে?

যদিও এর পর প্রবোধবাবুর পরিকল্পনা আর বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

সেদিন ৭ই জুলাই, একটা ছবির কাজে বারাকপুরে ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিও-য় গিয়েছিলাম। সেখানেই শুনলাম, কলকাতায় বৌবাজার এবং ধর্মতলা এলাকায় ভয়ঙ্কর দাঙ্গা শুরু হয়েছে।

ফিরবার পথে বিকোনন্দ রোডের কাছে এমন 'ট্র্যাফিক জাম' যে যাওয়ার কোন উপায় নেই। শেষটা স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে আমাদের গাড়ী কোনমতে বেরিয়ে এল। তারপর ময়দান হয়ে সোজা গোপালনগরের বাড়ীতে।

বারাকপুর থেকে বাড়ীতে আসতে প্রায় তিন ঘণ্টার মতো সময় লেগেছিল সেদিন।

সেদিনের দাঙ্গায় সরকারী হিসেবে মৃতের সংখ্যা ছিল পঁচিশ, আর আহতের সংখ্যা ছিল দুইশতেরও অধিক।

গোটা শহরে যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছিল, সেকথা মনে করলে আজও বুকটা কেঁপে ওঠে।

মনে আছে সেই ভয়ঙ্কর দিনের একটি অশুভ মুহূর্তের কথা। সেদিন ইংরেজী তারিখ ছিল ৯ই জুলাই। বসে আছি গোপালনগরের বাড়ীতে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। মধু বোসের ফোন। খবর, বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষের শোচনীয় মৃত্যু। ধর্মতলায় ওয়াছেল মোল্লার দোকানের ওপরের ঘরে হরেন ঘোষের টুক্‌রো টুক্‌রো দেহ বাক্সবন্দী অবস্থায় পাওয়া গেছে।

খবরটা শুনেই কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। এর পর আর কোন কথা নয়, রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। ভাবলাম, এমন পৈশাচিক ঘটনাও ঘটতে পারে। হরেন ঘোষের মতো গুণী মানুষও দাঙ্গার বলি হল!

মানুষ যখন পশু হয়, হয়তো তার পৈশাচিক বৃত্তি দেখে হিংস্র পশুও লজ্জা পায়।

এই অবস্থার মধ্যেও বাংলা বিভাগ নিয়ে আইনজীবী ও সাহিত্যবিদ্‌ শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয় জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে সীমানা-কমিশনের সামনে সওয়াল করলেন।

জুলাই মাসের শেষ দিকে, তারিখটা ছিল ২৭শে জুলাই, 'পুতুলের দেশ' নামে

একটি শিশু-নাটকের উদ্বোধন করতে হল আমাকে। সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসাবে পশ্চিম বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং নিকুঞ্জবিহারী মাইতি। পৌরোহিত্য করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য।

মনে আছে আগস্ট মাসের ৮ তারিখে, যেদিন ন্যাশনাল স্টুডিও-য় আমাকে একটা ছবির কাজে যেতে হয়েছিল, সেই দিনই স্টুডিও-র কাজ সেরে রঙমহলে এলাম শরতের সঙ্গে। শরৎই আমাকে আনতে গিয়েছিল রঙমহলের নতুন নাটক শচীন সেনগুপ্তের 'বাংলার প্রতাপ'-এ কার্ভালো চরিত্রে অভিনয় করার জন্যে।

শচীনবাবুর সঙ্গে দেখা হল রঙমহলে। তাঁর কাছে সবই শুনলাম।

বললাম, আমার পক্ষে কি সম্ভব হবে কার্ভালো করা ?

শচীনবাবু বললেন, আপনার পক্ষে এ-চরিত্রে অভিনয় করা সম্ভব নয়—এই কথাটাই যে অসম্ভব।

আর 'না' বলতে পারলাম না। 'বাংলার প্রতাপ'-এ কার্ভালো অভিনয় করেছিলাম আমি।

এদিকে নোয়াখালিতে দাঙ্গা শুরু হতে মহাত্মা গান্ধী ছুটে এলেন। কলকাতা হয়ে তিনি নোয়াখালি গেছেন। মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালির পথে কলকাতায় এসেছিলেন ১৯৪৭-এর ৯ই আগস্ট।

একটু আগে যে 'বাংলার প্রতাপ'-এর কথা বলেছি, সেই 'বাংলার প্রতাপ'-এর উদ্বোধন হল ১৪ই আগস্ট রঙমহল মঞ্চে। ১৪ই আগস্ট 'বাংলার প্রতাপ'-এর প্রথম রজনী, কিন্তু সেই দিনই বেজেছিল ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের শেষ বিউগিল।

'বাংলার প্রতাপ'-এ কার্ভালোর ভূমিকা ছিল আমার। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শরৎ, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, সন্তোষ দাস, মিহির ভট্টাচার্য, বিজয়, কার্তিক, প্রভাত সিংহ, রাণীবালা, বন্দনা, বেলা—এবং আরো অনেকে।

মনে আছে 'বাংলার প্রতাপ' অভিনয় শেষে যখন বাড়ী ফিরছিলাম, তখনো চৌরঙ্গী-পাড়ায় ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে। এই পতাকা কাল থাকবে না ; কাল ওখানে উড়বে ভারতের জাতীয় পতাকা।

প্রত্যহের নিয়মে ১৪ই আগস্টের রাত্রি ভোর হল। ১৫ই আগস্ট—জাতির জীবনের স্মরণীয় দিন। ঐদিন পরাধীন ভারতের মুক্তি হল।

হয়তো গোটা ভারতের মানুষ সেদিন উৎসবে মেতেছিল—কিন্তু তবুও সেদিন ভারতের মানুষের মনে একটা ব্যথার সুরও বেজেছিল। খণ্ডিত হল ভারতবর্ষ।

এক টুকরো হল ভারত, আর এক টুকরো হল পাকিস্তান। একটা জাতি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করলো।

তবু স্বাধীনতার দিনটি আমাদের জীবনের একটি আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্ত। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মনে সেদিন বিন্দুমাত্র স্বস্তি ছিল না। সোনার বাংলা খণ্ডিত হয়ে গেছে—হিন্দু-মুসলমানের রক্তে মাটি ভিজে গেছে। এ রক্ত ঝরেছে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে।

পশ্চিম বাংলায় অনুষ্ঠিত হল স্বাধীনতা-উৎসব। ১৮ই আগস্ট পর্যন্ত ছুটি ঘোষিত হল। গোটা কলকাতা শহর সেদিন উৎসবসজ্জায় সজ্জিত হলেও মানুষের মনে স্বস্তি ছিল না। পূর্ব-বাংলায় তখন চলেছে ভয়াবহ দাঙ্গা। মহাত্মা গান্ধী তখন সফর করছেন নোয়াখালি অঞ্চল, যদি তাঁর সদিচ্ছা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে!

আর কলকাতার রাজপথের তখন এক নতুন রূপ। হিন্দু-মুসলমান মিলিত কণ্ঠে বলছে—হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই।

অনেক সময় আসা-যাওয়ার পথে দেখেছি চলতি ট্রাম-বাস, এমন কি প্রাইভেট গাড়ীতেও মুসলিম ছেলেরা উঠে পড়ে চিৎকার করে বলতো,—হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই।

অথচ কলকাতার মাটি থেকে তখনো রক্তের দাগ মুছে যায়নি।

স্বাধীনতা উপলক্ষে চার দিন ছুটি ঘোষিত হয়েছিল। সেই ছুটির চার দিনই প্রতিটি রঙ্গমঞ্চে দু'টি করে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। একে শরীর ভাল চলছিল না, তারপর পর পর ক'দিন দু'টি অনুষ্ঠানেই কার্ভালোর অভিনয়; নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হতো।

কিন্তু অভিনেতার জীবনে দু'দণ্ড বিশ্রামের অবসর কই। দর্শকের বিশ্রামের অবসর আমরা পূর্ণ করি, কিন্তু আমাদের অবসর পূর্ণ করার আর কে আছে?

মুসলমানদের পবিত্র ঈদ উৎসবের দিনটি এই সময়েই পড়েছিল। ঈদ উপলক্ষে হিন্দুরা গিয়েছিল মুসলমানদের মসজিদে। মুসলমান ভাইরা হিন্দু ভাইদের আপ্যায়িত করলেন। আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন। ভয়াবহ দাঙ্গার পর এ দৃশ্য যেন অভূতপূর্ব।

এতদিন রঙমহলে 'বাংলার প্রতাপ' চলছিল। কিন্তু আগস্ট মাসের ২৮ তারিখে রঙমহলে আবার 'সাজাহান'-এর পুনরভিনয় হল। সেদিনের সাজাহানে দুটি অপরিচিত মুখ দেখা গিয়েছিল পরিচিত মুখের জায়গায়। সেদিন রাণীবালা করেছিল জাহানারা, আর রেডিও-র রাধারাণী করেছিল পিয়ারা।

২৯শে আগস্ট তারিখটিতে সুশীল মজুমদার পরিচালিত বাসন্তিকা ফিল্মের

'অভিযোগ' আব ইউনিভার্সাল ফিল্মেব হিবন্ময সেন পবিচালিত 'বর্মাব পথে' ছবি দুটি মুক্তিলাভ কবেছিল। দু'টি ছবিতেই আমি অভিনয কবেছিলাম।

ক'দিন আগে বক্তক্ষয়ী দাঙ্গাব পব স্বাধীনতা উপলক্ষে আমরা শুনেছি হিন্দু-মুসলমানেব মিলিত কণ্ঠস্বব, ক'দিন বাদে ১লা সেপ্টেম্বব থেকে আবাব নতুন ক'বে বক্তক্ষয়ী দাঙ্গা আবম্ভ হল। মহাত্মা গান্ধী ছুটে এলেন কলকাতায। বেলিযাঘাটাব বস্তিতে অনশন শুরু কবলেন।

আবাব ধীবে ধীবে কলকাতা শান্ত হল। মহাত্মা গান্ধী অনশন ভঙ্গ কবলেন ৪ঠা সেপ্টেম্বব বাত ৯টা ১০ মিনিটে।

মহাত্মাজীব কি স্বস্তি আছে! একে তাব মনে তখনো ভাবত-ভাগেব বেদনা, তাবপব এই আত্মঘাতী দাঙ্গা। কলকাতা থেকে দিল্লী হযে মহাত্মাজী আবাব ছুটে গেলেন পাঞ্জাবে। দাঙ্গায তখন পাঞ্জাবও ক্ষতবিক্ষত।

এতোব মধ্যেও জন্মাষ্টমীতে সাবা বাত নাটক অভিনীত হল। 'বাংলাব প্রতাপ', 'চবিত্রহীন', 'জন্মাষ্টমী', 'নন্দোৎসব' এবং 'কর্ণাজুন'—এই ছিল জন্মাষ্টমীব নাটক।

জন্মাষ্টমীব দিন উত্তব কলকাতাব সমস্ত চিত্রগৃহ বন্ধ ছিল—হাউসেব সামনে টিকিট নিযে হাঙ্গামাব দরুন। টিকিটেব কালোবাজাবীই তাব উপলক্ষ।

ববীন্দ্রনাথেব গল্প 'গিবিবালা' নিযে বাংলা ও হিন্দী ছবি কবেছিলেন মধু বসু। দু'টিতেই আমি অভিনয কবেছিলাম। গিবিবালাব হিন্দি চিত্ররূপ বোম্বেতে অপেবা হাউসে মুক্তিলাভ কবল ১২ই সেপ্টেম্বব।

সেপ্টেম্বব মাসটা কাটলো। বাকি দিনগুলিতে এমন কিছু খবব নেই। শুধু মিনার্ভা বন্ধ হওযাব খবব ছাড়া। আব শ্রীবঙ্গম চলছিল 'ষোড়শী' নিযে।

অক্টোববেব ৭ ও ১০ তাবিখ দু'টিতে বেনিফিট নাইটেব আযোজন হযেছিল। প্রথম রজনীটি ছিল বাণীবালাব, আব দ্বিতীযটি বঙমহলেব স্টাফের জন্যে। দু'দিনেই নাটক ছিল 'সাজাহান'। দ্বিতীয দিনে নাটকেব সঙ্গে সঙ্গীতানুষ্ঠানেবও ব্যবস্থা হযেছিল।

মিনার্ভা বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকাব পব আবাব সেখানে অভিনয় শুরু হল দেবনাবাযণ গুপ্তের 'শ্রীমতী' নাটক দিয়ে। 'শ্রীমতী' নাটকটি লেখা হয়েছিল প্রবোধ সান্যালেব 'প্রিযবান্ধবী' উপন্যাসকে অবলম্বন কবে। নাটকটির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন জহব গাঙ্গুলী আর সরযূবালা।

এবারে শাবদোৎসবেব দিনগুলিতে শহর আনন্দমুখব হযে বইল। এত সার্বজনীন পুজো এর আগে দেখা যায়নি।

কিন্তু নাটক আর সিনেমা জগতে এবারে তেমন উৎসবের স্পর্শ লাগেনি। তেমন নাটক অভিনীত হয় নি যে কিছু লিখবো, আর সিনেমা-জগতেও এমন কিছু নতুন খবর ছিল না।

অক্টোবর মাসটা নিঃশব্দে কেটে গেল। নভেম্বরের প্রথমার্ধের একটি উল্লেখ-যোগ্য খবর, বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর'-এর চিত্ররূপের মুক্তিলাভ। অশোককুমার, কানন দেবী অভিনীত এই ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন দেবকী বসু।

কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গা দেখে যে কথা বলতে চেয়েছে শান্তিপ্রিয় নর-নারী, সেই কথাই বলল মিনার্ভার নতুন নাটক জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'থামাও রক্তপাত'।

নভেম্বর মাসটাও ফুরলো। ডিসেম্বরের ৫ তারিখে সরযূবালার বেনিফিট নাইট হিসাবে মিনার্ভায় মিশরকুমারী অভিনীত হল। নাটকে আমি অংশ নিলাম। আরো শিল্পীদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, রাণীবালা, শান্তি গুপ্তা, রঞ্জিৎ রায়, এবং রবি রায়ের নাম মনে পড়ছে। সে রাতের আরো আকর্ষণ হিসাবে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল মিনার্ভায়।

সেদিন ১১ই ডিসেম্বর, রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে 'জাতীয় রঙ্গশালার সম্ভাবনা'-শীর্ষক একটি ভাষণ আমাকে দিতে হল। এই দিনই একটি দুঃসংবাদ শুনলাম। অভিনেতা দেবী মুখার্জীর মৃত্যু হয়েছে হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হবার দরুন। আরো শুনলাম, তার মৃত্যুর পিছনে রহস্যের গন্ধ পেয়ে ডাক্তার 'ডেথ সার্টিফিকেট' দেননি। শেষ পর্যন্ত দেবী মুখার্জীর মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হল।

দেবী মুখার্জী অভিনয় জগতে এসেছিল প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে। তার অকাল-মৃত্যু নিঃসন্দেহে একটি ক্ষতি। ব্যক্তিগত জীবনে সে দু'বার বিয়ে করে। তার প্রথমা স্ত্রী এবং একটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও দিন দশেক আগে দ্বিতীয়বার সে চিত্রাভিনেত্রী সুমিত্রা দেবীকে বিয়ে করেছিল।

মৃত্যুর পরদিন দেবী মুখার্জীর মরদেহ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে অজস্র গুণমুগ্ধের সামনে ভস্মীভূত হল।

রঙমহলের শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে কৃষ্ণনগরে আমাকে অভিনয় করতে যেতে হয়েছিল। 'বাংলার প্রতাপ' আর 'সেই তিমিরে' অভিনীত হয়েছিল। নদীয়ার কুমার সৌরীশ রায়ের বিবাহ উপলক্ষে এই নাটকাভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল।

১৮ই ডিসেম্বর কলকাতার মঞ্চে দু'টি নাটকের উদ্বোধন হল। একটি রঙমহলে 'ক্ষুদিরাম', আর একটি হল শ্রীরঙ্গমে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা'।

এর পরের দিনই দক্ষিণ কলকাতায় বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহ 'বসুশ্রী'র উদ্বোধন

হল এম. এস. শুভলক্ষ্মী অভিনীত 'মীরা' ছবি দিয়ে। এই দিনই স্টারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' নাটকটির শুভ উদ্বোধন হয়েছিল।

দেবী মুখার্জীর স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২১শে ডিসেম্বর। সভায় পৌরোহিত্য করেছিলাম আমি। চিত্র ও মঞ্চের শিল্পীদের অনেকেই সেদিনের স্মরণ-সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

যে ক'টি নতুন নাটক, তার কথা তো আগেই বলেছি। বড়দিনের চলতি নাটক সেগুলিই। আর রঙমহলে তখনো চলছে 'বাংলার প্রতাপ' ও 'ক্ষুদিরাম'। আমি তখনো 'বাংলার প্রতাপে' কার্ভালোর ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছি।

বছরের ক'দিনই বা বাকি ছিল। শেষ দিনটিও নিঃশব্দে ফুরিয়ে গেল।

যেমন নিঃশব্দে ১৯৪৭ বিদায় নিল, ঠিক তেমনি এল ১৯৪৮।

নাটকে কত কথাই না লেখা হয়! নাটকের সব কিছুই নাটকীয়। কিন্তু এই নাটক, নাটকের বাইরেও ঘটে।

কে জানতো, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ পদত্যাগ করবেন, আর সেই শূন্য আসনটি পূর্ণ করবেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। অথচ ১৫ই জানুয়ারীর নাটকীয় খবর এই।

কিন্তু ৩০শে জানুয়ারী যে চরম বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটলো, তা নাটককেও হার মানায়।

ঐদিন বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো চরম দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্বে। মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা-সভায় আততায়ীর গুলীতে প্রাণ দিয়েছেন। খবরটা শোনার পরেও মনের মধ্যে কেমন যেন অবিশ্বাস মিশে রইলো। তবু সেদিন এর চেয়ে সত্যি খবর আর ছিল না।

শুধু খবরটি আসার অপেক্ষা। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত হল। বন্ধ হল দোকানপাট, অফিস-আদালত—জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু কার হাতের নির্মম বুলেট বিঁধলো মহাত্মার বুকে? সে কে? উত্তর এল—তার নাম নাথুরাম বিনায়ক গডসে। মহারাস্ট্রীয় যুবক।

'হা রাম'—এই ছিল গান্ধীজীর শেষ কথা!

পরদিন ছিলো জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর অন্তিমকৃত্য অনুষ্ঠানের দিন। দিল্লীর যমুনাতটে রাজঘাটে মহাত্মার নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হল। ভস্মশেষ বিসর্জিত হল যমুনায়। চিতাভস্ম মিশিয়ে দেওয়া হল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে—স্রোতোস্বিনীর গর্ভে।

একটি মানুষ হারিয়ে গেলেন চিরদিনের জন্যে। কিন্তু ইতিহাস হয়ে বেঁচে রইলেন ভারত তথা বিশ্ববাসীর মনে।

'রাণা প্রতাপ' নামে একটি নাটক আমাকে সম্পাদনার জন্যে দেওয়া হয়েছিল। কাজটা খুব দুরূহ। তবুও কাজ করে চলেছি।

নানা কাজের মধ্যে নাটক সম্পাদনার কাজ—তবুও না করে পারিনি।

শৈলজানন্দের ছবি 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম' মুক্তিলাভ করলো ১৩ই ফেব্রুয়ারী। ছবিতে আমিও অভিনয় করেছি।

এর কয়েকদিন পরে, ২৪শে ফেব্রুয়ারী রঙমহলের হয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল শিমুরালীর এক নাট্যানুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে একটি স্কুলের সাহায্যকল্পে অভিনীত হয়েছিল কর্ণার্জুন।

'মিশরকুমারী' নাটক পুরনো হবার নয়। এখনো অভিনয় হলে দর্শকেরা ভিড় করে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী মিনার্ভায় 'মিশরকুমারী' অভিনীত হল।

ঐদিনের একটি বিশেষ সংবাদ—শিশির ভাদুড়ী শ্রীরঙ্গমে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবেন, এ-কথা ঘোষণা করা হল। যদিও শেষ পর্যন্ত ঘোষিত দিনে নাটক অভিনীত হয়নি। কয়েকজন শিল্পীর অসুস্থতাই নাকি তার কারণ।

মার্চ মাসের ৬ তারিখটা আমার নয়, আমার পরিবারের সকলের কাছে আনন্দের। ঐদিনেই আমার ছেলে ভানুর এম.এস-সি. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান লাভ করেছে ভানু।

কিন্তু সংসারের আনন্দ-উৎসবের কতটুকু স্বাদ আমি নিতে পারি! দিন তো ফুরিয়ে যায় নাটকের চিন্তায়।

ক'দিন বাদেই শিবরাত্রি। সারারাত ধরে চলবে অভিনয়। তারই প্রস্তুতি চলছে তখন।

শিবরাত্রিতে রঙমহলে অভিনীত হল 'বাংলার প্রতাপ', 'ভোলা মাস্টার', 'শিবরাত্রি', 'কর্ণার্জুন'। দু'টি নাটকেই অংশ নিলাম আমি।

এই যে নাটক, অভিনয়—এর মাঝেও ক্লান্তি আসে বৈকি! মনে হয়, যেন আমার সত্যি জীবনটা হারিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হয় আমি অভিনেতা, এ-দুর্বলতা আমার সাজে না। নাটক আর অভিনয় বাদ দিলে আমার আর কিছুই থাকে না।

মনের মধ্যে নিত্য ভাঙা-গড়ার পালা। সে আর এক নাটক। আজ আমি যে নাটক নিয়ে আছি।

যাই হোক, আজকের কথা নয়, যে কথা বলছি, তাই বলি।

দিনগুলো একই নিয়মে চলছিল। একই নিয়মে ডায়েরীর পাতায় লিখেছি।

নাটক আর অভিনয় ছাড়াও কত কথা, যে-সব কথা একান্তভাবে আমার। সে-সব কথা নাই বা লিখলাম।

দেবকী বসুর ছবি 'স্যর শঙ্করনাথ' মুক্তিলাভ করলো ২৫শে মার্চ। যে ছবির নাম-ভূমিকায় ছিলাম আমি। অতীতের ছবি 'সোনার সংসার'-এর সঙ্গে এ ছবির একটা যোগসূত্র আছে। যোগসূত্র বলতে সোনার সংসারে বর্তমান ছবি স্যর শঙ্করনাথের জীবনের প্রথম অধ্যায়ের কথা দেখানো হয়েছিল।

এই তারিখেই রঙমহলে ডি. এল. রায়ের রাণা প্রতাপের অভিনয় শুরু হল।

এরপর বেশ কিছুদিন ডায়েরীর পৃষ্ঠায় নাটক বা অভিনয়ের কথা তেমন কিছু নেই। এপ্রিলের ৬ তারিখে 'সাজাহান'-এর সম্মিলিত অভিনয় হল রঙমহলে। এই মাসের ১৪ তারিখে কালিকা থিয়েটারে নতুন নাটক 'অতঃপর'-এর অভিনয় আরম্ভ হল। নাটকটিতে ছবি বিশ্বাস ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যও অভিনয় করেছিলেন।

কে জানতো একই সপ্তাহে দু'টি মৃত্যু-সংবাদ শুনবো। মিনার্ভার ভূতপূর্ব কর্তৃপক্ষ, বর্তমানে স্টারের উপেন্দ্রকুমার মিত্র ইহলোক ত্যাগ করেছেন ১৫ই এপ্রিল তারিখে। আর, এর ক'দিন পরেই ১৯শে এপ্রিল বাংলার বিখ্যাত অভিনেত্রী তারাসুন্দরী পরলোকগমন করলেন।

একজন নাট্যোৎসাহী, অন্যজন বিশিষ্টা অভিনেত্রী—দু'জনের মৃত্যুতেই নাট্য-জগতের যে ক্ষতি হল তা অপূরণীয়।

তারাসুন্দরী বাংলা রঙ্গমঞ্চের শুধু বিখ্যাত অভিনেত্রীই নন, তিনি ছিলেন মহৎ শিল্পী।

এই সময়ে বিশেষ কাজে একবার বাগআঁচড়ার বাড়ীতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন নারায়ণদা, আমার স্ত্রী, পাণ্ডে আর চাকর-বাকর।

বাগআঁচড়ায় যেদিন গেলাম, সেদিন কালবৈশাখীর যে রূপ দেখেছিলাম, তা আজও আমার মনে পড়ে। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। তারপর ঝড় ছিল ঘূর্ণি ঝড়ের মতো। সেদিন বাগআঁচড়ার বাড়ীতে বসে কালবৈশাখীর যে রূপ দেখেছিলাম, তেমনটি আর দেখিনি।

এরপর কলকাতায় ফিরে এলাম। মহামারীর কলকাতা। প্লেগ আর কলেরা।

সারা শহরের মানুষের মনে দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছিল।

এপ্রিল থেকে মে মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মহামারীর আতঙ্ক জড়িয়ে রইলো শহরবাসীর মনে।

এরপর নতুন নাটক আর নতুন ছবির খবর বলতে—২৫শে জুন তারিখে

'ভাইবোন' নামে একটা বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করলো মিনার, বিজলী, ছবিঘরে। ঐদিনই স্টারে তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' নিয়ে লেখা নাটকের শুভ উদ্বোধন হল। কালিন্দীর নতুন করে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত।

কালিন্দী সে-সময়ের একটি মঞ্চ-সফল নাটক, যে নাটকের কাহিনী এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট নতুনত্বের স্বাদ ছিল।

জুন মাস গেল। জুলাই মাসের ৫ তারিখে রঙমহলে শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী' নাটকের শুভ উদ্বোধন হল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, নাট্যকার শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাংসারিক জীবনে যাঁর নাম অনিল মুখোপাধ্যায়, তিনি নিজেই ছিলেন একজন বিপ্লবী। তিনি থাকতেন রাঁচীতে।

নাটকটির বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব থাকলেও 'বিপ্লবী' দর্শকদের মনে তেমন রেখাপাত করেনি। তাছাড়া 'বিপ্লবী' নাটক সম্পর্কে তখনকার অনেক রাজনৈতিক বিপ্লবী সে-সময়ে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

নাটক নিয়েও আইন-আদালত হয়। ১৪ই জুন নিউ এম্পায়ারে শচীন সেনগুপ্তের নাটক 'কামাল আতাতুর্ক'-এর উদ্বোধন হল। ঐ নাটকের 'কামাল' চরিত্রের নির্বাচিত শিল্পী ছিল নীতিশ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু অভিনয়ের দিনই কালিকা থিয়েটারের রাম চৌধুরীর পক্ষে হাইকোর্ট নীতিশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। কারণ, নীতিশ ছিল কালিকার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।

তবু নিউ এম্পায়ারে নাটক হল। নীতিশের জায়গায় অভিনয় করলেন ছবি বিশ্বাস। কিন্তু অমন বিরাট ভূমিকা, তৈরী না হয়ে অভিনয় করতে যাওয়াই মিছে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষেই অভিনয় বন্ধ করতে হল।

নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত চিত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রেও একসময় সুনাম অর্জন করেছিলেন। দেবনারায়ণ পরিচালিত ছবি 'বিচারক' মুক্তিলাভ করলো ৩০শে জুলাই।

'তটিনীর বিচার' নিয়ে আগে থেকে আইন-আদালত গড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১২০০৲ টাকার জন্যে রিসিভার বসলো ১১ই আগস্ট তারিখে। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়।

এদিকে যে 'বিপ্লবী' নাটক শুরু হয়েছিল কিছুদিন আগে, সে নাটক কিছুতে জমানো গেল না। অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি নাটক দেখেছিলেন, তাঁদের মতামতও আমরা পেয়েছিলাম। মনোজ বসু বলেছিলেন, অভিনয় সুন্দর, কিন্তু নাটকটি দুর্বল। নাট্যকার মন্মথ রায়ের মন্তব্য ছিল, অভিনয় সফল—কিন্তু এ ধরনের নাটক ঠিক মঞ্চ-সফল হয় না। কথাশিল্পী তারাশঙ্করের মতামত ছিল ঠিক এই ধরনের। এ-ছাড়া তিনিও আর কিছু বলতে চাননি।

সুতরাং 'বিপ্লবী' যে আর চলবে না—এটা বেশ বোঝা গেল। সেই সময়ের যুগান্তর পত্রিকার মতামতের কথা মনে আছে। 'বিপ্লবী' সম্পর্কে যুগান্তর লিখেছিল, "পরিশেষে নাট্যকারকে একটি প্রশ্ন আছে। পিতা-পুত্রের পরিচয়েই এতবড় বিপ্লবীর পরিকল্পনার সব পথ রুদ্ধ হইল কেন? বিপ্লবের পথ চিরকালই সুদূরপ্রসারী—এইরকম একটা ইঙ্গিত থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে সেই সন্ধানই দিয়াছেন।

নাট্যকার এ-প্রশ্নের জবাব তাঁর নাটকের ভূমিকায় দিয়েছিলেন।

যাই হোক, আমাদের তখন একটিই চিন্তা—নতুন নাটক চাই।

ভারত স্বাধীনতা পেলেও খণ্ডিত ভারত-রাষ্ট্রে তখনো নানা সমস্যা। বিশেষ করে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে তখন নানা জল্পনা। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের হস্তক্ষেপে যদিও এই সমস্যা সমাধানের পথ পাচ্ছিল, তবুও কয়েকটি রাজ্যের ব্যাপারে সমস্যা আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। 'হায়দারাবাদ' নিয়ে চরম গণ্ডগোল দানা বেঁধে উঠলো। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে হায়দারাবাদ রাজ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী অভিযান শুরু করলে। চারদিন সঙ্ঘর্ষের পর নিজাম বাহাদুর আত্মসমর্পণ করলেন ভারতের সেনাধ্যক্ষের কাছে। হায়দারাবাদের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ হল।

না জানি ভারত-রাষ্ট্রের সামনে আরো কত সমস্যা!

সমস্যা সব ক্ষেত্রেই। এই তো সেদিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর মিনার্ভায় 'কেদার রায়' অভিনয় হওয়ার কথা ছিল। কথা ছিল ছবি বিশ্বাস চাঁদ রায় করবেন। কিন্তু যথাসময়ে ছবি বিশ্বাস অভিনয় করতে পারবেন না শুনে কর্মকর্তারা মহা বিপদে পড়লেন। শেষটা রঙমহল থেকে রবি রায়কে নিয়ে গেলেন চণ্ডী ব্যানার্জী।

এদিকে যে নতুন নাটকের সন্ধান আমরা করছিলাম, সেই নাটক হাতে এল। মনোজ বসুর 'নলিনের মৃত্যু'। রিহার্সালও আরম্ভ হল। নাটকটি ভালই। তবে নামটা যেন কারো মনে ধরলো না। শেষটা মনোজবাবুকে বলাও হল নাম পরিবর্তনের কথা। নাম ঠিক হল 'বিপর্যয়'।

'বিপ্লবী'-র পর রঙমহলে নাটক নির্বাচিত হয়েছে 'বিপর্যয়'। তারই প্রস্তুতি চলছে।

এরই মধ্যে একদিন 'বিপ্লবী'-র নাট্যকার শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ওরফে অনিল মুখোপাধ্যায় এলেন তাঁর নাটকের ছাপা-কপি নিয়ে। রঙমহলের শিল্পীদের উপহার দিলেন ছাপা নাটক। সবাই খুশি মনে গ্রহণ করলো নাট্যকারের এই উপহার।

শারদোৎসবের প্রাক্কালে ৭ই অক্টোবর রঙমহলে 'বিপর্যয়'-এর শুভ উদ্বোধন হল।

কিন্তু যা আশা করা গিয়েছিল, তা পূর্ণ হল না। উদ্বোধন-রজনীর দর্শকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল না।

পূজোর সময়, নাটক চলবে মহাসমারোহে, তার ওপর নতুন নাটক, কিন্তু 'বিপর্যয়' শুরুতেই আমাদের হতাশ করলে। অথচ নাটকটি সুন্দর। সেই নাটকের ভাগ্য এরকম হবে বুঝতে পারিনি।

নাটকের শেষ বিচার যে দর্শকেরাই করেন—এ-কথাটাই আসল সত্যি।

পূজো গেল 'বিপর্যয়' নিয়ে। তবে শুরুতে যেমন হতাশ হতে হয়েছিল, পরে তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটলো। এই নাটকের অভিনেত্রী বন্দনাকে তার অভিনয়ে খুশি হয়ে কথাশিল্পী তারাশঙ্কর আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। এ-ছাড়া সামগ্রিক অভিনয়ের প্রশংসাও করেছিলেন তারাশঙ্করবাবু।

এদিকে 'বিপর্যয়' নিয়ে আর চলা যায় না, সুতরাং আপাততঃ পুরনো নাটকের পুনরভিনয়ের তোড়জোড় চললো রঙমহলে।

নভেম্বরের ১০ তারিখে রঙমহলে অভিনীত হল 'বঙ্গে বর্গী'। রঙমহলের শিল্পীরা ছাড়া সেদিন নির্মলেন্দু লাহিড়ীও অংশ নিয়েছিলেন নাটকে।

'বঙ্গেবর্গী'র পর 'সাজাহান', 'মিশরকুমারী'ও অভিনীত হল রঙমহলে, যাতে নরেশ মিত্র, বিপিন গুপ্তও অভিনয় করেছিলেন।

এ-সব নাটকের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি। যখনই এই নাটকের পুনরভিনয় হয়, তখনই দর্শকেরা ভিড করে আসেন।

ডিসেম্বরের ডায়েরীটা হাতে নিলেই দেখতে পাই সেখানে কালির আঁচড়ে ধরা রয়েছে একজন অভিনেত্রীর মৃত্যুর কথা। যাঁর নাম ছিল কুসুমকুমারী। কুসুমকুমারী সে যুগের নামকরা অভিনেত্রী। স্বর্গত অমর দত্ত যখন নায়ক সাজতেন, তখন তাঁর বিপরীতে থাকতেন কুসুমকুমারী। 'আলিবাবা' নাটকের মর্জিনার ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের কথা রঙ্গশালার ইতিহাসে চিরদিন লিপিবদ্ধ থাকবে। মৃত্যুকালে কুসুম-কুমারীর বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বছর।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'কিন্নরী' নৃত্য-গীতবহুল নাটক। যাকে ইংরেজীতে বলে 'অপেরা-টাইপ'। ২রা ডিসেম্বর মিনার্ভায় 'কিন্নরী'-র পুনরভিনয় আরম্ভ হল। এই পুরনো নাটকটির নতুন করে প্রযোজনা করতে কর্তৃপক্ষ প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন। তবে এবারে সুবাসিনী নয়, নাম-ভূমিকার শিল্পী হিসাবে এলেন সীতা দেবী।

রঙমহলেও শচীন সেনগুপ্তের নাটক 'গৈরিক পতাকা'র নতুন করে অভিনয় আরম্ভ হল এই ডিসেম্বরের ১১ তারিখ থেকে। নির্মলেন্দু লাহিড়ী অভিনয় করেছিলেন

শিবাজীর ভূমিকায়, আমি অবতীর্ণ হয়েছিলাম বাজী ঘোড়পুরের ভূমিকায়। এ ছাড়া রবি রায়, ভূপেন চক্রবর্তী, সন্তোষ সিংহ, রাণীবালা, বন্দনা, বেলা প্রমুখ শিল্পীরা নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্রে অংশ নিয়েছিলেন।

তবে এই পাঁচ অঙ্কের নাটকটি এবারে তিন অঙ্কের মধ্যেই রাখা হয়েছিল। তবু নাটকটি শেষ হতো সাড়ে তিন ঘণ্টায়।

'গৈরিক পতাকা'-য় আমার 'ঘোড়পুরে' চরিত্রটি দর্শকমনে যথেষ্ট রেখাপাত করেছিল।

গৈরিক পতাকার পুনরভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হলেও, বড়দিনের নাটক কী হবে তাই নিয়ে আলোচনা চললো। শচীন সেনগুপ্ত বললে, 'আবুল হাসান'-এর কথা। আমিও মত দিলাম সেই মতে।

এ কথা হল ১২ই ডিসেম্বর গৈরিক পতাকা অভিনয় শেষে। সে-রাত্রে এখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়লো আলোচনার।

সব মঞ্চেই পুরনো নাটকের অভিনয় চলেছে। তবে কি নতুন নাটকের বাজারে মন্দা পড়েছে? শ্রীরঙ্গমেও শিশিরবাবু 'রিজিয়া' আরম্ভ করলেন। বক্তিয়ার এবং ঘাতকের চরিত্রটি তাঁর একারই, আর 'রিজিয়া'-র ভূমিকায় ছিল রেবা দেবী।

আমার ছেলের ডাকনাম ভানু, যে-নামে তাকে আমরা ডাকি। কিন্তু তার যে-নামে সে অন্যত্র পরিচিত, সে-নামও আমি রেখেছিলাম প্রীতীন্দ্র। প্রীতীন্দ্র এবারে বিলেত যাবে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে। তার কলকাতা ছেড়ে বোম্বাই যাওয়ার দিন ঠিক হয়েছে ২২শে ডিসেম্বর। বোম্বাই থেকে জাহাজে সে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করবে।

বোম্বে মেল ছাড়বে হাওড়া স্টেশন থেকে। ভানুকে ট্রেনে তুলে দিতে সেদিন আমরা অনেকেই উপস্থিত ছিলাম স্টেশনে। এমন কি বন্ধুবান্ধবরাও।

আর পাণ্ডে তো ভানুর সঙ্গে বোম্বে পর্যন্ত যাবে।

আমরা সবাই গেলাম। কিন্তু আসেনি শুধু সুধীরা! মা কি পারে ছেলেকে বিদেশের পথে বিদায় জানাতে!

২২শে ডিসেম্বর রওনা হয়ে ২৪শে ডিসেম্বর ভানু বোম্বে পৌছলো। বোম্বে পৌছেই সে তারবার্তায় তার শুভ-সংবাদ জানালো আমাকে। এর পরদিনই ভানু জাহাজযোগে ইংল্যাণ্ডের পথে পাড়ি দিল।

আমরা কলকাতার বাড়ীতে বসে প্রার্থনা করলাম, যেন ভানুর বিদেশযাত্রা শুভ হয়।

বছরের ক'টা দিনই বা বাকি! বাকি দিনগুলো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

এই সময়, বোধ হয় ২৩শে ডিসেম্বর জেমিনীর বিখ্যাত ছবি 'চন্দ্রলেখা' মুক্তিলাভ করেছিল কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে। ছবিটি মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল দর্শক-সাধারণের মনে।

অভিনয় করা ছাড়াও মাঝে মাঝে সভাসমিতি কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমায় যোগ দিতে হয়।

যুগান্তরের 'সব পেয়েছির আসর'-এর বার্ষিক সমাবেশ ছিল। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে হল আমাকে। আর সভাপতি ছিলেন শোভাবাজারের রাজা।

এদিকে 'আবুল হাসান'-এর প্রস্তুতি-পর্ব চলছে। রঙমহলের মঞ্চসজ্জারও পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। 'আবুল হাসান' একটি জাঁকজমকপূর্ণ নাটক। সুতরাং মঞ্চসজ্জাও করতে হবে নাটকের চাহিদা মতো।

আবুল হাসানের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল ৩০শে ডিসেম্বর। মহা সমারোহ করে সেদিন নাটকটির উদ্বোধন হল। নতুন মঞ্চসজ্জা, নতুন দৃশ্যপট, তারপর নৃত্যের সমারোহ নাটকটিকে সেদিন সাফল্যমণ্ডিত করেছিল। সেদিনের অভিনয়ে আমার সঙ্গে আরো যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম বলছি। সরযূবালা, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, রঞ্জিৎ রায়, গোপাল ভট্টাচার্য, বিজয় কার্তিক, জীবন গোস্বামী, কার্তিক সরকার, বন্দনা, লীলাবতী (করালী), রমা, আন্না—এঁরা ছিলেন আবুল হাসানের শিল্পী-তালিকায়।

অনেকদিন পরে অভিনয় করে আনন্দ পেলাম। 'আবুল হাসান' প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। এই নাটকটি পুনরভিনয়ের আগে একবার সম্পাদনা করা হয়েছিল, আর সে দায়িত্বটি ছিল আমারই।

এরপর আবুল হাসানের অভিনয় প্রসঙ্গে বলবো। নাটকে পণ্ডিত মদন্নার ভূমিকায় অভিনয় করতাম আমি। আমার অভিনয় দর্শকমনে রেখাপাত করেছিল। প্রথম অঙ্কের শেষে ড্রপ-সিন পড়ার আগে পণ্ডিত মদন্নার ভূমিকা দেখে দর্শককুল শুধু যে হাততালি দিতেন তাই-ই নয়, উঠে দাঁড়াতেন অধীর উত্তেজনায়। নাটকের এই-জাতীয় মুহূর্ত সৃষ্টির মধ্যেই তো অভিনেতার সার্থকতা।

কিন্তু দুর্গাদাসের অভাব পূরণ হবার নয়। আবুল হাসানের ভূমিকায় দুর্গাদাস যেভাবে রূপদান করেছিল, তার তুলনা নেই। নাটকে পণ্ডিত মদন্নার মৃত্যুর পর আবুল হাসান-ই নাটকটিকে টেনে নিয়ে যেত একমাত্র দুর্গাদাসের জন্যে। কিন্তু দুর্গাদাস নেই, পণ্ডিত মদন্নার মৃত্যুর পর আবুল হাসানও ম্লান মনে হত। সুতরাং এক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

১৯৪৮ শেষ হল আবুল হাসান নাটক নিয়ে। নতুন বছর শুরু হল সেই একই নাটক নিয়ে।

কিন্তু রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তখনো নিত্য-নতুন নাটকের অভিনয়। স্বাধীনতার পরেও দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এল না।

কিছুদিন আগে হায়দ্রাবাদ নিয়ে যেমন অভিযান চালাতে হয়েছিল এবং তাতে সমস্যার সমাধানও হয়েছিল, কিন্তু কাশ্মীরের ব্যাপার আরো ঘোরালো হয়ে উঠলো। পাকিস্তানীরা কাশ্মীর আক্রমণ করলে, কাশ্মীর শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতের হস্তক্ষেপ কামনা করল। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হল কাশ্মীরে। ভূ-স্বর্গে পড়লো যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন।

পাকিস্তান কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। ভারতীয় বাহিনী তাদের হটিয়ে দিতে আরম্ভ করলে। কিন্তু আর দু'দিনের সবুর সইলো না। ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণাপন্ন হতে, অস্ত্রসংবরণ চুক্তি সম্পাদিত হল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। আর রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী মোতায়েন হল যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখায়।

১৯৪৮-৪৯-এর সেই সমস্যা বিশ বছর পরেও এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে। এখনো কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড পাকিস্তানের হাতে।

জানি না এ সমস্যার সমাধান হবে কবে!

ভানুর বিলেত রওনা হবার পর থেকেই আমি কেন, আমার পরিবারের সবাই উন্মুখ হয়ে থাকতো ভানুর খবরের জন্যে।

প্রায়ই ভানুর চিঠি পেতাম। এই চিঠিতেই পেলাম তার ইংল্যাণ্ড পৌছনোর সংবাদ। সে যে ম্যাঞ্চেষ্টার ওয়ার্কশপে কাজে যোগ দিয়েছে, সে খবরও পেলাম তার চিঠিতে।

১৯৪৯-এর জানুয়ারীর দিনগুলো শুধু নয়, এর পরের দিনগুলোও ছিল বৈচিত্র্যহীন। নতুন কিছু ছিল না। শুধু প্রত্যহের নিয়মে দৈনন্দিন জীবনের জের টেনে চলা।

ফেব্রুয়ারী মাসটাও এই রকম গেল। মার্চও তথৈবচ। কেবল ১লা মার্চের একটি ঘটনা আমাকে যে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে ফেলেছিল, সেটা না বললে নয়।

১লা মার্চ ছিল অভিনেতা শরৎ চাটুজ্যের বড় মেয়ের বিয়ে। শরতের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড়—কিন্তু বিয়ের দিনেও নিমন্ত্রণ এল না ভেবে অবাক হলাম। অথচ ভেবেও পেলাম না, নিমন্ত্রণ না-পাওয়ার কারণ কি? অথচ বিয়ের কথা আমি জানি। তাছাড়া শরৎ আমার মেয়ের বিয়েতে এসেছিল নিমন্ত্রিত হয়ে। প্রচুর উপহার

দিয়েছিল আমার মেয়েকে। সুতরাং নিমন্ত্রণের কথা বাদ দিয়ে, আমার কর্মচারী পাণ্ডেকে পাঠালাম শরতের বাড়ীতে। তারই হাতে দিলাম শরতের মেয়ের বিয়ের উপহার।

এদিকে মজার ব্যাপার হল, আমার কথা শরৎ পাণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আমি কেন যাইনি তখনো। কিন্তু শরৎ তখনো আসল ব্যাপারটা জানে না। সে জানে, আমি যথারীতি নিমন্ত্রণ পেয়েছি। কিন্তু আমি যাইনি দেখে শরৎ বিনয়কে জিজ্ঞাসা করে, অহীনবাবুকে নিমন্ত্রণ করেছিলে তো? বিনয় নাকি বলে, সে আমার দেখা না পেয়ে বাড়ীর দারোয়ানের হাতে চিঠি দিয়ে এসেছে। পরে অবশ্য সত্যি কথাই বলেছিল, আমাকে চিঠি দিতে সে ভুলে গেছে।

যাই হোক, এ ঘটনায় শরৎ যে লজ্জিত হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। একদিন অভিনয় শেষে সে আমার কাছে এল। সবই বললে।

হেসে বললাম, ভুল হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

শরৎ বললে, কিন্তু আমি যে কিছুতেই এ ভুলের ব্যাপারটা হজম করতে পারছি না।

সত্যি, শরৎ এ ব্যাপারে দারুণ লজ্জিত হয়েছিল। শেষটা আমিই ওকে বলেছিলাম, শরৎ যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। তা'ছাড়া তোমার লজ্জা পাওয়ার কি আছে। তুমি তো আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলে—তোমার বার্তাবহ আমার কাছে আসেনি। এতে তোমার কি দোষ আছে?

এরপর শরৎ আমাকে অনেক করে তার মেয়ের বৌভাতে যাওয়ার কথা বলেছিল। আমি 'যাবো' বলেছিলাম। কিন্তু যথাদিনে শরতের সঙ্গে দেখা করে বললাম, আমার কি যাওয়া ঠিক হবে ভাই? তবে 'যাবো' বলেছিলাম, পাছে তুমি মনে করো আমি মনের মধ্যে অকারণ অভিমান পুষে রেখেছি।

শরৎ ব্যাপার বুঝলো। আমি তাকে বললাম, তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি তো জানি তোমাকে!

শরতের মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, এবারে সে আমার কাছে সহজ হতে পেরেছে।

মাঝে মাঝে থিয়েটারে কত মজার ঘটনা ঘটে। রঙমহলে 'আবুল হাসান' অভিনয় চলছে, তারই মধ্যে একদিন অঘটন ঘটলো। উপলক্ষ ছারপোকা। কিছু হাতল-ভাঙা কিংবা এই রকম চেয়ার ছিল, সেখানে ছারপোকাদের আশ্রয়। তাদের জ্বালায় দর্শকদের কেউ কেউ অতিষ্ঠ হয়ে চিৎকার শুরু করলে। নাটক বন্ধ হবার

যোগাড়। শেষটা কর্তৃপক্ষ চেয়ারের ব্যবস্থা করতে তবে দর্শকেরা শান্ত হল। এই ঘটনার পর হাউসের ভাঙা-চেয়ার মেরামত শুরু হল।

'আবুল হাসান' চলাকালীন মাঝে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় হল রঙমহলে। আমি চন্দ্রগুপ্তে কাত্যায়নের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। হেলেনের ভূমিকায় ছিল সরযূ আর নাম-ভূমিকার অভিনেতা ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

'চন্দ্রগুপ্ত'-এর দর্শকসংখ্যা দেখে কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত হলেন। চন্দ্রগুপ্তের আরো কয়েকটি অভিনয় হল। প্রতিটি অভিনয় সব দিক থেকে সার্থক হয়েছিল।

এরই মধ্যে রঙমহল-গোষ্ঠী বনগ্রামে অভিনয়ের জন্যে চললেন। নাটক 'কর্ণার্জুন'। অভিনয়ের তারিখ ৬ই এপ্রিল। স্থান : স্থানীয় সিনেমা-হল। কর্ণার্জুনে আমি শকুনির ভূমিকায় ছিলাম। অভিনয় শেষে সেই রাত্রেই আমি রওনা হয়েছিলাম কলকাতায়। আমার সঙ্গে শরৎ ছাড়া রঙমহলের আরো কয়েকজন শিল্পী ছিলেন।

এরপর ৮ই এপ্রিলেও বনগ্রামে আবার 'সাজাহান' অভিনয় করলাম।

সেদিন অভিনয় শেষে আমাকে প্রচুর দর্শনার্থীর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আমি সকলের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে পারিনি। অভিনেতা হিসাবে আমাকে ভালবাসে বলেই তো মানুষ আমাকে এমন করে কাছে পেতে চায়।

মঞ্চে অভিনয়ের মধ্যেও ছবির কাজ নিয়মিত করতে হয়। এই তো সেদিন আমাকে সুধাংশু গুপ্ত পরিচালিত 'অভিজ্ঞতা' ছবির শ্যুটিং করতে যেতে হল বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে—এম. পি. স্টুডিও-তে।

শুধু কি অভিনয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানেও মাঝে মাঝে অংশ নিতে হয়। রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মতিথি উদ্‌যাপিত করল 'অমৃত চক্র'। সভায় আমাকে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে হল। ঐ অনুষ্ঠানের পর বাড়ীতে ফিরছি। আমার ফিরতি পথের সঙ্গী বিকাশ রায়, আর পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত।

এই সময়ে ১লা মে তারিখে স্টার থিয়েটার তাদের নতুন নাটকের কথা ঘোষণা করলে। এবারের নাটক রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'। নাট্যরূপ দিয়েছেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তাঁদের ঘোষণায় সন্তোষ সিং, সুহাসিনী, ফিরোজা, বন্দনা ছাড়া অনেক নতুন শিল্পীর নামও যুক্ত দেখলাম। শুধু তাই নয়, এই নাটকের অন্যতম অভিনেতা নাট্যকার-পরিচালক মহেন্দ্র গুপ্ত স্বয়ং।

'নৌকাডুবি'-র শুভ উদ্বোধন হল ৭ই মে।

ঐ তারিখেই 'নিরুদ্দেশ' চিত্রটি কলকাতায় মুক্তিলাভ করলো।

অনেকদিন পরে গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল' অভিনীত হল রঙমহলে। ১২ই মে'র

সেই অভিনয়ে যোগেশের ভূমিকায় ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, আমি ছিলাম রমেশের ভূমিকায় আর জহর গাঙ্গুলী ছিল ভজহরি চরিত্রে। নাম-ভূমিকায় ছিল সরযূবালা।

পুরনো নাটক অভিনয়ের যেন ধুম পড়েছে। 'প্রফুল্ল'-র পর হল 'কেদার রায়'। তারপর আবার কাশিমবাজার যেতে হল রাজা কমলারঞ্জনের বাড়ীতে। সেখানে কমলারঞ্জনের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে অভিনয় হবে দু'দিন। প্রথম দিনের নাটক 'ভোলা মাস্টার'। ঐদিনই আমি গেলাম। দ্বিতীয় দিনের নাটকে আমি অংশ নিইনি। সুতরাং সেদিন আর কাশিমবাজার থাকতে হয়নি আমাকে।

২৩শে মে 'মিশরকুমারী'র সম্মিলিত অভিনয় হল মিনার্ভায়। ঐদিন 'মিশর-কুমারী' অভিনয় শেষে মিনার্ভায় অভিনীত হল হিন্দী নাটক 'রুক্মিণী হরণ'। এই নাটকে অংশ নিতেন সে-সময়ের বিখ্যাত অভিনেত্রী পেশেন্স কুপার।

এই নতুন নাটকের খবর না থাক, নতুন ছবির খবর আছে। এম.-পি. প্রোডাকসন্সের ছবি 'আভিজাত্য' এই সময়ে মুক্তিলাভ করলো। ছবিতে আমিও অংশ নিয়েছিলাম। একই নাটক, একই দিনে দু'টি মঞ্চে অভিনীত হবে, একথা অনেকে ভাবতে পারেন না। অথচ তখন এমনধারা ঘটনা ঘটত। ২রা জুলাই তারিখে 'রিজিয়া' নাটক রঙমহলে এবং শিশিরবাবুর শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হল। বলতে দ্বিধা নেই, সেদিনের অভিনয়ে রঙমহলের বক্স-অফিসই ভাল ছিল।

জুলাই মাসে অনেকগুলি নতুন নাটকের খবর আছে। কালিকায় ভক্তিমূলক নাটক 'মীরাবাই'-এর শুভ উদ্বোধন হল ১৪ই জুলাই। পরবর্তী সপ্তাহে মিনার্ভা উপহার দিল নতুন ঐতিহাসিক নাটক 'ঝাঁন্সীর রাণী'। এর দু'দিন বাদেই স্টারে আরো একটি নাটকের উদ্বোধন হল। নাটকটি মহেন্দ্রগুপ্তের 'বিজয়নগর'।

আর জুলাই-এর শেষ সপ্তাহে ২৯শে জুলাই রঙমহলের পাদপ্রদীপের আলোয় এল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'। রজনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন শচীন সেনগুপ্ত। রজনীর প্রথম অভিনয়ের শিল্পী-তালিকায় আমার সঙ্গে ছিলেন নির্মলেন্দু, শরৎ, রবি রায়, রঞ্জিত রায়, বিজয় কার্তিক, সরযূ, অপর্ণা, বেলা, করালী ছাড়া আরো অনেকে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। জীবনে যে ক'টি নাটকে নতুন অভিনয়-ধারা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তার মধ্যে 'রজনী' একটি। এর আগে 'বিপ্লবী' এবং 'বিপর্যয়' নাটক দু'টিতেও আমি চরিত্রে নতুন রূপ দেবার চিন্তা করেছিলাম, দিয়েও ছিলাম; অভিনয় যে সব সময়ে বহিরঙ্গমুখী নয়—সে কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম এইসব নাটকে আমার অভিনীত চরিত্রে। সেখানে আমি মানসিকতার উপর প্রাধান্য দিতে চেয়েছি। জানিনা দর্শকেরা সে-সময়ে কি বলেছিলেন! তবে বিরূপ মন্তব্য কানে

যায়নি। অভিনয় যে সূক্ষ্ম শিল্প, সেখানেও যে কারুকাজের প্রয়োজন আছে—এই চিন্তা নিয়েই আমার এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এর পরের নতুন নাটক শ্রীরঙ্গমে শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত এবং অভিনীত 'পরিচয়'। বলেছি তো, আমাকে অভিনয় ছাড়াও আরো কিছু করতে হয়। অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে 'সার্থক রূপায়ণ' পর্যায়ে অভিনেতা শীর্ষক ভাষণ দিলাম ৯ই আগস্ট।

প্রতিবারের মতো এবারেও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সারারাত নাটক অভিনীত হল বিভিন্ন মঞ্চে। সে রাতে রঙমহলে নাটক ছিল—'কারাগার', 'কেদার রায়', 'কর্ণার্জুন', 'জন্মাষ্টমী' ও 'নন্দোৎসব'। রাত সাড়ে নটায় অভিনয় শুরু হয়েছিল আর শেষ হয়েছিল ভোর সাড়ে পাঁচটায়। সারারাতের অভিনয়ের শেষে ক্লান্ত হয়ে আমি বাড়ী ফিরবার পথে ভাবতাম, আমি অভিনেতা, এ ক্লান্তি আমার সাজে না।

নানা অভিনয়ের মধ্যে এক-একটি অভিনয়ের কথা মনে থাকে বিশেষ করে। ৩০শে আগস্ট 'দুই পুরুষ' নাটকের সম্মিলিত অভিনয়ের কথা এখনো আমার মনে আছে। সেদিন নাটকে জমিদারের চরিত্রে রূপ দিয়েছিলাম। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, কালী সরকার, মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, শ্যাম লাহা, অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, সরযূ, রাণীবালা, পূর্ণিমা ও ছায়া ছাড়া আরো অনেকে। 'দুই পুরুষ' নাটকের কথা মনে এলেই প্রথমে ছবি বিশ্বাসের কথা মনে হয়; সে করতো নুটবিহারীর ভূমিকা। এ ভূমিকায় সে ছিল তুলনার বাইরে।

নানা কথার ভিড়ের মধ্যে থেকে কত কথাই না খুঁজে বের করতে হয়। কবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সরযূবালার সম্মান-রজনীতে 'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হল, কবে ভানু ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লণ্ডনে গেল, সেই তারিখটিও খুঁজে বার করি। আমার ব্যক্তিগত রূপসজ্জাকর মণি মিত্র, যে ১৯২৭ সালে মনোমোহন থিয়েটার থেকে আমার সঙ্গে ছিল, তার মৃত্যুর তারিখটিও আমি খুঁজে পাই ডায়েরীর পাতা থেকে।

ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লণ্ডনে এসেছিল ভানু, ক'দিন বাদেই সে সাদাম্পটন থেকে জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করলে। সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে সেটিও যত্ন করে লিখে রেখেছি। এমন কি এস. এস. ব্যালেরিনা জাহাজের নামটিও।

সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। কিন্তু মিনার্ভায় অনুষ্ঠিত এই সভা শুরুতে ভেঙে গেল। কারণ সদস্যদের একাংশের অভিযোগ যে, সভায় সাংবিধানিক নিয়মের ত্রুটি ঘটেছে নোটিশ দেওয়ায়। সুতরাং এ-সভা চলতে পারে না। এই নিয়ে বেশ হৈ-চৈও হয়েছিল।

অভিনেতা ইন্দু মুখোপাধ্যায় আমার পুরনো বন্ধু। অনেকদিন থেকেই সে কণ্ঠনালীর ক্যান্সারে ভুগছিল। তার অসুস্থতা চরমে পৌছনোর সংবাদ পেয়েই ছুটে গেলাম তার জুবিলী পার্কের বাড়ীতে।

দেখলাম, ইন্দুর বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে আছে সে। শয্যা-প্রান্তে তার বড় ছেলে শৈলেন। আমি যেতে সে বাবাকে ডেকে বললে, বাবা,—কে এসেছেন ছাখো।

ইন্দু ফিরে তাকালো। কিন্তু কথা বলার শক্তি তার নেই, শুধু গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে আসছে মাত্র।

বসে রইলাম ইন্দুর শয্যার কাছে। বসে দেখতে লাগলাম প্রিয় বন্ধুর অন্তিম মুহূর্তটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

প্রায় দেড ঘণ্টা—তারপর চোখের সামনে সব শেষ হয়ে গেল। চিরদিনের জন্য চলে গেল ইন্দু।

নানা খবরের মধ্যে প্রতিদিন ভানুর খবরের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি। খবরও পাই। মনটা ভরে যায় তার চিঠিগুলো হাতে পেতেই। ইতিমধ্যে সে নিউইয়র্ক থেকে শিকাগো এসে যথারীতি ক্লাস করতে আরম্ভ করেছে।

এদিকে পূজো শেষ হলেও, শহরে তখন কিছুটা উৎসবের মেজাজ। এখানে-ওখানে বিভিন্ন নতুন-পুরনো নাটক চলছে। তবে নতুন নাটক তেমন নেই বললেই চলে।

লক্ষ্মীপূজোর দিন অভিনয় করলাম 'চন্দ্রশেখর' নাটকে। তার ক'দিন পরেই রবিবাসরীয় অনুষ্ঠানে 'চরিত্রহীন' অভিনয়ের পরেই অচলাবস্থার সৃষ্টি হল রঙমহলে। অনেকদিন থেকেই রঙমহলে কর্মীদের বিভিন্ন স্তরে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। নানা কারণ ছিল তার পিছনে। প্রধান কারণ হল ঠিকমত বেতন না পাওয়া। এই নিয়ে শরৎকে একদিন বলেওছিলাম, একটা কিছু ব্যবস্থা করো কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে। কিন্তু শরৎ কিছুতেই রাজী হল না। শেষটা এই অচলাবস্থার সৃষ্টি।

একথাও বললাম, শরৎ, গোলমাল মিটিয়ে নাও—নয়তো ওরা ধর্মঘট করবে।

সে কথাতেও কান দিল না শরৎ। উল্টে ঠিক করলো, কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে 'রঙমহল' সংস্কারের জন্য সাময়িকভাবে থিয়েটার বন্ধ থাকবে। এবং তার পরেই 'লালকেল্লা' নিয়ে নূতন পর্যায়ে রঙমহলে অভিনয় শুরু হবে।

শেষপর্যন্ত কর্মীদের সঙ্গে কোন ফয়সালা হল না। রঙমহল বন্ধ হল।

এদিকে, অভিনয় বলতে বিভিন্ন নাটকের সম্মিলিত অভিনয়ে অংশ নিতে হচ্ছে। কথনো 'সাজাহান', কথনো 'মিশরকুমারী', কথনো অন্য নাটক।

নতুন নাটকের এত অভাব কেন? তবে কি নাটকের ক্ষেত্রে বন্ধ্যা যুগ এলো!

ক'দিন পরে রঙমহলে আবার অভিনয় শুরু হল। তা-ও পুরনো নাটক 'হাটে হাঁড়ি'র নবসংস্করণ 'আদর্শ স্ত্রী' নিয়ে। এ-নাটকে আমি ছিলাম না।

এদিকে শুনলাম, শরতের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে সত্যেন ঘোষাল অর্থ সন্ধান করছে। যদি কেউ এই দুঃসময়ে রঙমহলে অর্থবিনিয়োগ করে, তার জন্যই উঠে-পড়ে লেগেছে সে। শেষপর্যন্ত সে-ই রঙমহলের ম্যানেজার হয়ে এল।

কিন্তু তবু স্বস্তি নেই। নতুন ঝামেলা সৃষ্টি হল রঙমহলকেই কেন্দ্র করে। শেষটা মামলা-মোকর্দমা এবং ফলে রিসিভার বসলো।

যদিও এর পরেও ২৩শে নভেম্বর রঙমহলে অভিনীত হল 'সিরাজদ্দৌলা'। নির্মলেন্দু, সরযূবালা তখন রঙমহলের শিল্পী-তালিকায়।

নতুন নাটক কোথায়? চারিদিকে পুরনো নাটকের অভিনয়। 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'কেদার রায়', 'মিশরকুমারী', 'বঙ্গেবর্গী' ও 'চরিত্রহীন', 'সাজাহান'—এইসব নাটকের অভিনয় চলছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক 'পলিন' নতুন করে পরিমার্জিত করা হল। তার নাম হল 'সিস্তানের রাণী'। এই বহুদিনের পুরনো নাটকটির নতুন পরিমার্জিত রূপের উদ্বোধন হল রঙমহলে।

এদিকে সুধীন রাহার 'বিক্রমাদিত্য' নাটকটিরও রিহার্সাল আরম্ভ হল। রাণীবালা, সীতা, রাণী ব্যানার্জী নামে একজন নতুন অভিনেত্রী, সন্তোষ সিংহ, নরেশ মিত্র, অজিত ব্যানার্জীর সঙ্গে আমি তো ছিলামই, এছাড়া প্রবীণ অভিনেতা কুঞ্জ সেনও রিহার্সালে উপস্থিত থাকতেন।

'আলমগীর' সে আমলের মঞ্চ-সফল নাটক। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই নাটকটির বিশেষ একটা স্থান আছে। সেই 'আলমগীর' নাটকের ২৮তম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল ডিসেম্বরের ১২ তারিখে। শ্রীরঙ্গমের ঐ উৎসবে শিশির ভাদুড়ী একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন।

যে 'বিক্রমাদিত্য' নাটকটি এতদিন উদ্বোধনের অপেক্ষায় ছিল, সে-টি উদ্বোধন হল ২২শে ডিসেম্বর। এই নাটকটির পরিচালক ছিলেন নরেশ মিত্র। আমাকে আলো, সাজসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করতে হয়েছিল। এই নাটকে আমার ভূমিকা

ছিল মিহিরকুলের। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন। নাটকটির নৃত্যাংশ পরিচালনা করেছিল গোপাল পিল্লাই।

এর পরদিন স্টারে মহেন্দ্র গুপ্তের নতুন ঐতিহাসিক নাটক 'সমুদ্রগুপ্ত'-এর উদ্বোধন হল।

বছরের শেষ দিনটি এগিয়ে এল। পৃথিবী তার চিরদিনের নিয়মে বৎসরের পথ-পরিক্রমা শেষ করলো।

যে-কথা আগেও বলেছি, সে-কথা আবার বলছি যে, ১৯৪৯ সাল নাটকের ক্ষেত্রে একটি অনুর্বর বৎসর।

জানিনা নতুন বৎসরটিতে আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে কিনা।

১৯৫০ সালের শুরুতে সেই পুরনো বছরের জের চললো। কোথাও কোন নতুন নাটক নেই। সেই পুরনো নাটকের অভিনয়ই চলছে বলতে গেলে।

আমরা নাটকের মানুষ, নাটককে ভালবাসি—সব সময়েই চেয়ে থাকি নতুন নাট্যকার আর নতুন নাটকের দিকে।

কিন্তু আপাততঃ তেমন সম্ভাবনার আভাস কোথাও পাচ্ছি না।

জানুয়ারী মাসও শেষ হয়ে এল। রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রজগতের ক্ষেত্রে নতুন কিছু খবর নেই। তবে দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হল, ২৬শে জানুয়ারী ভারতরাষ্ট্র সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষিত হল। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

পুরনো নাটকের কথা আর নতুন করে বলতে চাই না, বিভিন্ন মঞ্চে পুরনো নাটক চলছে। অভিনয় করছি। কিন্তু মন ভরছে না।

মাঝে মাঝে ভাবছি, সব-কিছু এমন বিপরীত হয়ে পড়ছে কেন? এটা কি আমার ভ্রান্ত চিন্তা? না বাস্তব ঘটনা এই-ই? প্রশ্নটা মনের মধ্যে থাকে, সাহস করে বলতে পারি না। কি জানি কেউ যদি কিছু ভাবে!

এরই মধ্যে একটা ঘটনায় বড় ব্যথা পেলাম। শরৎ চাটুজ্যেকে নিয়ে অনেকদিন অনেক গোলমাল চলছিল—এবারে অবস্থা চরমে পৌঁছলো। ২২শে ফেব্রুয়ারী শরৎ হাইকোর্টে নিজেকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করলো।

শরতের জন্য কষ্ট হয়। এত ভাল সে, এত তার উদার মন—শুধু নিজের অদূর-দর্শিতার জন্যে সবকিছু নষ্ট করলে। ওকে তো দেখেছি, টাকা নেই—অথচ ধার করে খরচ করছে। থাকলে তো কথাই নেই। কতবার বন্ধুবান্ধবেরা বলেছে শরৎকে—শরৎ, নিজেকে সামলাও। কিন্তু কে কথা শুনছে! ও তখন খেয়ালের স্রোতে পা ভাসিয়ে দিয়েছে।

সেই শরৎ আদালতে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছে।

এর ক'দিন বাদেই আর একটি সংবাদ; নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অসুস্থতা। উচ্চ রক্তচাপ ছিল নির্মলেন্দুর। কিছুদিন আগে থেকেই সে অসুস্থ বলে শুনেছিলাম। ইচ্ছে ছিল দেখা করতে যাব। বলেওছিলাম সন্তোষ সিংহকে। কিন্তু নির্মলেন্দুকে আর দেখতে যাওয়া হল না। ক'দিন বাদে ২৮শে ফেব্রুয়ারী নির্মলেন্দু দেখাশোনার বাইরে চলে গেল।

নির্মলেন্দু বাংলা রঙ্গমঞ্চে এমন একজন অভিনেতা, যার স্থান পূরণ হবার নয়।

নির্মলেন্দু লাহিড়ী বাংলা রঙ্গালয়ে যোগ দিয়েছিল ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে। বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর ম্যাডান থিয়েটারে অভিনীত 'প্রতাপাদিত্য' নাটকেই তার প্রথম মঞ্চাবতরণ। বলা বাহুল্য, সে প্রথমে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

উদাত্ত এবং মধুর কণ্ঠ ছিল তার। সে কণ্ঠের জুড়ি নেই। তারপর অভিনেতা হিসেবেও সে ছিল একজন জাত-অভিনেতা। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজের ভূমিকা, 'গৈরিক পতাকা'য় শিবাজী, আর 'বঙ্গেবর্গী'তে ভাস্কর পণ্ডিত। এ অভিনয় ভুলবার নয়। তার যাদুকরী কণ্ঠে যে দরদ ফুটে উঠতো, যে আবেগ মথিত হতো, তাতে দর্শকরা অভিভূত না হয়ে পারতো না।

নির্মলেন্দু ছিল সার্থক রূপকার। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি অভিনয়-ধারার বিশেষ উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গেল।

নির্মলেন্দুর মৃত্যুর খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনটা সত্যিই দুঃখে কাতর হয়ে উঠলো। একই সঙ্গে কত অভিনয় করেছি। কত সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছি—আর যাকে কোনদিন কাছে পাব না, কিন্তু মনের মধ্যে অম্লান হয়ে থাকবে।

নির্মলেন্দুর মরদেহ শোকযাত্রা সহকারে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে নীত হল। শেষটা মিনার্ভার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম মিনার্ভায়, এখানেই আরো শিল্পীর সঙ্গে আমিও মাল্যদান করলাম মরদেহে।

অজস্র ফুলের সমারোহে নীরব অভিনেতা—অথচ এর উদাত্ত কণ্ঠ একদিন দর্শক-বৃন্দকে অভিভূত করে রাখতো।

শোকযাত্রা চললো নিমতলা মহাশ্মশানে। এই শোকযাত্রায় সেদিন অংশ নিয়েছিল অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলাকুশলী থেকে আরম্ভ করে স্বর্গত অভিনেতার গুণমুগ্ধগণ।

নির্মলেন্দুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি অধ্যায়ের যেন শেষ হল।

নাট্য-শিক্ষালয়ের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। এই প্রয়োজনের তাগিদেই বৌবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি নাট্য-শিক্ষালয়। এই শিক্ষায়তনের এক অনুষ্ঠানে

আমাকে পৌরোহিত্য করতে হল ২৭শে মার্চ তারিখে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, পশুপতি চ্যাটার্জি প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন। আমি বক্তব্যে একটি কথার ওপরই জোর দিয়েছিলাম, এইসব শিক্ষায়তনের জন্যে প্রথম দরকার একটি বিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রম।

একটা কথা অনেকদিন থেকেই বুঝতে পারছি যে, রঙ্গালয়ের জন্য কেমন একটা যেন অন্ধকার দিন ঘনিয়ে আসছে। কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়গুলির মধ্যে এক স্টার ছাড়া সব ক'টির অবস্থাই খারাপ।

নাটক নেই, নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে সে প্রতিশ্রুতি নেই, তারপর রঙ্গালয়ের এই অবস্থা। ভাবতেও পারি না। অথচ বাস্তব অবস্থা অস্বীকার করে লাভ নেই।

এই সবের মধ্যে মাঝে মাঝে আত্মচিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। ভাবি, পুরনো দিনের কথা। জীবনে আমি তো এই অভিনয়ের পথটাই বেছে নিয়েছিলাম—আর সেই পথের পথিক হয়েই তো জীবনের এতটা পথ পরিক্রমা করেছি, কিন্তু প্রশ্ন এই, ভবিষ্যতের পথ আমায় কোথায় নিয়ে যাবে?

এখনো আমার পরিচয়—আমি অভিনেতা। আর এ-পরিচয়ের বাইরে আর কোন পরিচয় আছে কি? মাঝে মাঝে এ-জিজ্ঞাসাও আসে মনের মধ্যে। কিন্তু উত্তর খুঁজে পাই না। তাই চুপচাপ বসে থেকে একটি পথ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করি, যে পথটা আমার কাছে নতুন হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু সে পথটা কিসের তা বুঝে উঠতে পারি না।

এই সব প্রশ্নের মধ্যে ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে—তারপর সব চিন্তার বাইরে নিয়ে আসি নিজেকে। ভাবি মানুষের নিজের ইচ্ছেটা উপলক্ষ মাত্র। এই ইচ্ছেকে নিয়ন্ত্রিত করে অন্য কোন শক্তি—তাকে যে আখ্যাই দিই না কেন।

কিন্তু এইসব চিন্তা যদিও আসে মনের মধ্যে, তবু অভিনয় করতে হয়। যেন কতকটা যন্ত্রের মতো। তার মধ্যে নিজের ইচ্ছেটা আর তেমন মেশাতে পারি না।

নতুন নাটক নেই। পুরনো নাটকের অভিনয় চলছে। তারপর আরও একটা রেওয়াজ শুরু হয়েছে, সম্মিলিত অভিনয় রজনীর। কোন নাটকে বিভিন্ন মঞ্চের খ্যাতনামা শিল্পীদের একত্র করে, দর্শকবৃন্দকে আকৃষ্ট করে, হয়তো সাময়িক ব্যবসা-বুদ্ধির সাফল্য হচ্ছে—কিন্তু এর পরিণতি কি!

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের সম্মিলিত অভিনয়ের বিরোধী। কারণ এতে সাধারণভাবে রঙ্গালয়ের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়বেই। যদি এইটেই রেওয়াজ হয়ে বসে

তবে দর্শকরা এই সম্মিলিত অভিনয়ের দিকেই ঝুঁকবে। যেখানে একসঙ্গে অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীকে দেখা যায়। তা'হলে সাধারণভাবে মঞ্চের অবস্থা কি দাঁড়াবে?

এ ছাড়া আরো একটা দিক আছে, আজ কিছু কিছু লোক হয়ত সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করে কিছু রোজগারের পথ করছেন, কিন্তু এতে ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক স্বার্থ পূরণ ছাডা আর কিছু কি হচ্ছে? সুতরাং বারবার বলতে চেয়েছি, এই পথে মঞ্চ বাঁচবে না, সাধারণ শিল্পীরা বাঁচবে না। এই সর্বনাশা পথ বন্ধ করো।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! শেষটা এ নিয়ে আমিও আর বেশী কিছু বলতাম না। তবে রঙ্গালয়ের ভবিষ্যতের কথা যখনই মনে আসতো, তখনই কেমন অসহায় বোধ করতাম।

তবুও আমি আর অসহায় বোধ করতাম না, যখন মঞ্চে এসে দাঁড়াতাম।

মিনার্ভায় নতুন করে 'চাঁদসদাগর'-এর অভিনয় আরম্ভ হল। পুরনো নাটক যে এমনভাবে দর্শক আকর্ষণ করবে, এটা ভাবা যায়নি। 'চাঁদসদাগর' নতুন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো নাট্যরসিক মহলে।

চাঁদসদাগরের এই সাফল্য দেখে একদিন শরৎ আমাকে বললে, দাদা, আমি কতবার বলেছিলাম, রঙমহলে এই নাটকটা করুন, কিন্তু আপনি শুনলেন না।

এর বেশ কয়েকদিন পর ১৬ই জুন তারিখে নতুন করে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' অভিনয় শুরু হল মিনার্ভায়। আমি দেবদাসে অংশ নিতাম বসন্ত চরিত্রে, ধর্মদার ভূমিকা ছিল নরেশবাবুর, আর নাম-ভূমিকায় অভিনয় করতো ছবি বিশ্বাস।

অনেকদিন পর নতুন করে বিশ্ব-রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি হল। উত্তর কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ—এই সংবাদ শিরোনামায় স্থান পেল জুন মাসের শেষ সপ্তাহে। আমেরিকা সরাসরি দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ নিলে, আর রাশিয়া ছিল উত্তর কোরিয়ার পক্ষে।

মানুষের মনে আতঙ্ক—কোরিয়ার যুদ্ধ আবার না বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়।

কোরিয়া-খণ্ডে যুদ্ধ হলেও এই যুদ্ধে প্রত্যেক দেশেরই নৈতিক দায়িত্ব জড়িয়ে ছিল। ভারতেরও দায়িত্ব এসে গেল। তবে সে বিতর্কমূলক প্রশ্নে আমার যাওয়ার ইচ্ছা নেই। পৃথিবীর প্রতিটি শান্তিকামী মানুষের মতো আমিও চাই এই যুদ্ধের অবসান হোক।

অনেকদিন পর বাংলায় একটি যুগান্তকারী চিত্রের মুক্তিলাভ ঘটলো ১৪ই জুলাই। এই চিত্রটি হল মধু বসু পরিচালিত 'মাইকেল মধুসূদন'। ছবিতে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

'মাইকেল' ছবিটি নিয়ে একটি সাহায্য-প্রদর্শনী হয়েছিল, সাধারণ্যে মুক্তিলাভের আগের দিন। এই প্রদর্শনীতে বাংলার রাজ্যপাল ডঃ কাটজু উপস্থিত ছিলেন।

বলা বাহুল্য মাইকেল মধুসূদন একটি অনুপম সৃষ্টি। এই চিত্র বাংলাদেশের মানুষের কাছে একজন নতুন অভিনেতাকেও প্রতিষ্ঠা দিল, সে হল উৎপল দত্ত। উৎপল দত্ত'র মাইকেল—বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন ভুলবে না।

ফিল্ম এনকোয়ারী কমিশন ভারত সরকার বসিয়েছিলেন। এই কমিশনের বৈঠক হল কলকাতায়। চলচ্চিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এই শিল্পের উন্নতির জন্যে সুষ্ঠু পথ-নির্দেশ করা কমিশনের উদ্দেশ্য। ১৭ই জুলাই তারিখে এই কমিশনের সামনে আমার বক্তব্য রাখলাম। সেদিন আরো যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিঃ বি. এন. সরকার, ভি. শান্তারাম ও এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো অনেকে।

এর কয়েকদিন বাদেই শচীন সেনগুপ্ত, অহর গাঙ্গুলীর সঙ্গে আমিও গেলাম তদানীন্তন মন্ত্রী ভূপতি মজুমদারের ময়রা স্ট্রীটের বাড়ীতে। বাংলা থিয়েটারের একে এই দুর্দিন, তারপর থিয়েটার হলের সিনেমা হলে রূপান্তর—আরো সর্বনাশ ডেকে আনছে। তাই মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে আমাদের যাওয়া—যাতে সরকার থিয়েটারগুলো বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। এ ছাড়া থিয়েটারের অন্যান্য অসুবিধের কথাও জানানো হল, যেমন প্রমোদকর ইত্যাদি। এ সম্পর্কে মন্ত্রীমহোদয় আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। যদিও সেই মুহূর্তে আমরা আশ্বস্ত হতে পারিনি। তবে পরবর্তীকালে প্রমোদকর উঠে গিয়েছিল এবং তাতে একমাত্র লাভবান হলেন থিয়েটারের মালিক-পক্ষ। সাধারণ অভিনেতা এবং কর্মীদের ভাগ্য এতে পরিবর্তিত হয়নি।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'তপোবল' নাটকটি অনেকদিন সাধারণ মঞ্চে অভিনীত হয়নি। নতুন করে কালিকায় নাটকটির অভিনয় আরম্ভ হল ৫ই আগস্ট।

পুরনো নাটক, পুরনো অভিনেতা—এই নিয়ে টানাটানি চলেছে যেন! নতুনের পা যেন বন্ধ। যে ক'জন প্রতিষ্ঠিত মঞ্চাভিনেতা অবলম্বন, তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন মঞ্চের মধ্যে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতাও কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি। এটা খুব ভাল কথা নয়। আমরা যে আমলে মঞ্চে যোগ দিয়েছি, সে আমল ছিল অন্য রকমের। প্রতিযোগিতা ছিল, কিন্তু তার মধ্যে এমন স্বার্থবুদ্ধি কাজ করত না।

পুরনো দিনের সঙ্গে আজকের মঞ্চের তুলনামূলক বিচার করলে বলতে হয়, সেদিনের মঞ্চ ছিল নাট্য-পীঠ, আর আজকের মঞ্চ শুধু রঙ্গালয়।

অন্যান্য থিয়েটারের মতো শ্রীরঙ্গমেও 'বিজয়া' নতুন করে মঞ্চস্থ হচ্ছে শিশিবাবুর পরিচালনায়।

আগস্ট মাসটা গেল। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কালিকা থিয়েটার বন্ধ হল কর্পোরেশনের নির্দেশে, কারণ আর কিছু নয়, অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থার ত্রুটি। এদিকে শ্রীরঙ্গমে জহর গাঙ্গুলীকে নিয়ে শিশিরবাবু আরম্ভ করলেন রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটক।

সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে ছিল জন্মাষ্টমী। প্রতি বছরের মতো এবারেও সারারাত নাটক অভিনয় হবে বিভিন্ন মঞ্চে।

চলতি দিনের মধ্যে কিছু কিছু দিন থাকে, যে দিনগুলো নিঃসন্দেহে অন্য দিন থেকে স্বতন্ত্র।

১৭ই সেপ্টেম্বর 'চাঁদসদাগর' অভিনয় হচ্ছে মিনার্ভায়। সেদিন দু'টি প্রদর্শনী। প্রথম প্রদর্শনীতে বিশিষ্ট দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের তদানীন্তন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল কারিয়াপ্পা, মেজর কাটজু (ইনি কে. এন. কাটজুর পুত্র) এবং মার্কিন দূতাবাসের জনৈক উচ্চপদস্থ আমেরিকান ভদ্রলোক। অভিনয় সেদিন কারিয়াপ্পার খুবই ভাল লেগেছিল। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে এঁরা মঞ্চে এলেন এবং আমাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ বিনিময় করলেন।

কথাপ্রসঙ্গে তাঁরা বলেছিলেন, কলকাতায় কি কোন নাট্য-শিক্ষালয় আছে—যেখানে এমন সুন্দর অভিনয় শেখানো হয়?

আমরা বলেছিলাম প্রতিটি মঞ্চ এক-একটি শিক্ষায়তন। আমাদের যা-কিছু শিক্ষা এই মঞ্চে।

শুনে খুশি হয়েছিলেন জেনারেল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখছি। আমি যখন 'পদ্মশ্রী' পেলাম, তখন জেনারেল কারিয়াপ্পা আমাকে তারবার্তায় অভিনন্দিত করেছিলেন। দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও কারিয়াপ্পা আমাকে বিস্মৃত হননি, তারবার্তায় তার প্রমাণ পেলাম।

যেদিনের কথা বলছিলাম, সেদিনের আর একটি কথা বলে রাখি। দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে সস্ত্রীক এসেছিলেন বিখ্যাত জার্মাণ চিকিৎসক ডাক্তার ফেল্ডম্যান এবং দু'জন আমেরিকান, যাঁদের নাম জানি না। অভিনয় শেষে আমেরিকান দু'জন মঞ্চের অভিনেতা, অভিনেত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলেছিলেন, আমরা বাংলা নাটক এবং মঞ্চকে আবিষ্কার করে গেলাম। সত্যিই, আপনাদের অভিনয় মুগ্ধ করেছে আমাদের।

পুরনো নাটক অভিনয়ের যেন ধুম পড়েছে। শারদীয়া উৎসবের প্রাক্কালে স্টারে শুভ উদ্বোধন হল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর-নারায়ণ' নাটকের। নাটকটির পরিচালক ছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত এবং তিনিই নতুন করে নাটকটি সম্পাদনা করেছিলেন।

শারদীয়ার আরো একটি আকর্ষণ শ্রীরঙ্গমে শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত এবং অভিনীত 'জনা' নাটকটি। শিশিরবাবু অভিনয় করতেন বিদূষক চরিত্রে।

ঐ দিনেই রঙমহলে উদ্বোধন হল শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'।

আর এর পরদিন মিনার্ভায় যদিও মঞ্চ-সফল নাটক ভোলা মাস্টারের পুনরভিনয় শুরু হল, কিন্তু দর্শকবৃন্দের কাছ থেকে ঠিক আগের মতো সাড়া পাওয়া গেল না। কেননা, নাটকটি এর আগেই অনেকে দেখেছেন, যাঁদের স্মৃতিতে তখনো উজ্জ্বল রয়েছে সেদিনের অভিনয়।

মহানবমীর রাতে নাটক অভিনয় চলে সারারাত ধরে। তেমনি কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাতে মিনার্ভায় সারারাত ধরে বিভিন্ন নাটক অভিনীত হল। আগে এই ধরনের অভিনয়ে আমি ক্লান্তি বোধ করতাম না। এমন রাতও গেছে, সারা রাত ধরে চার-পাঁচটি নাটকে অভিনয় করেছি। আজকাল ক্লান্তি আসে। দেহ, মন দু'দিক থেকেই। সেই পুরনো নাটক, পুরনো সংলাপ, আর যন্ত্রের মতো অভিনয় করে পুরনো একজন অভিনেতা—ক্লান্তি আসাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অভিনেতার জীবনে ক্লান্তির স্থান নেই।

এই সময়ের চলতি নাটক বলতে নভেম্বরের ৯ তারিখে স্টারে মন্মথ রায়ের নাটক 'সাবিত্রী' শুরু হল। আর রঙমহলে তখন তো 'পথের দাবী' চলছে। ক'দিন কমল মিত্রের অসুস্থতার জন্যে জহর গাঙ্গুলী অভিনয় করতে লাগলো সব্যসাচীর ভূমিকায়।

শ্রীরঙ্গমে চলছিল গিরিশচন্দ্রের 'জনা'। নাটকটির শেষ সপ্তাহ ঘোষণা করা হল এই সময়ে।

এরই মধ্যে ১৪ই নভেম্বর তারিখে চাঁদমারী রিফিউজী ক্যাম্পে গিয়েছিলাম মন্মথ রায়ের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের ইচ্ছা, ওখানে রিফিউজী ক্যাম্পে কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হোক, সেই জন্যে দেখতে যাওয়া যে ওখানে কোন অভিনয়ের আয়োজন করা যায় কিনা।

এখানে সর্বহারা মানুষের বাস্তব অবস্থা দেখলাম। বাস্তুচ্যুত মানুষের অসহায় অবস্থা চোখে দেখা যায় না! তবুও এইটেই আজ এদের জীবনের বাস্তব চেহারা!

এমনিতে এখানে আনন্দ-উৎসব বলতে সাধারণভাবে গ্রামে যেমন থাকে, তাই আছে। তাই ইচ্ছা তার বাইরে কিছু করা যায় কিনা। কিন্তু সব অবস্থা বিচার করে মনে হল, এতো মানুষকে এখানে অভিনয় দেখানো অসম্ভব। তাছাড়া সে প্রচুর খরচের ব্যাপার। তার চেয়ে স্থানীয়ভাবে যদি থিয়েটার যাত্রার দল তৈরী হয়, সেই ভাল।

কলকাতা থেকে নাটকের দল নিয়ে গিয়ে অভিনয় করার বাস্তব সার্থকতা নেই। শুধু অর্থের অপচয়। সুতরাং আপাততঃ চাঁদমারীর উদ্বাস্তু শিবিরে থিয়েটারের ব্যাপারটা চাপা পড়ল।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের একজন শক্ত মানুষ। ইনিই ছিলেন ভারতের তদানীন্তন সহকারী-প্রধানমন্ত্রী। বোম্বাই শহরে সর্দার প্যাটেল পরলোকগমন করলেন ১৫ই ডিসেম্বর সকালে। সংবাদটা ভারতবাসীর কাছে নিঃসন্দেহে চরম শোকাবহ।

সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী সবচেয়ে শক্ত মানুষটিকে হারাল। সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুতে কলকাতা শহরে শোকের ছায়া নামলো। বন্ধ হল অফিস, আদালত, সিনেমা, থিয়েটার। সেই দিনই ছিল নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর পরিবারের সাহায্যকল্পে শ্রীরঙ্গমে 'বিজয়া'-র অভিনয় রজনী। তা-ও বন্ধ হল।

আমার অভিনয় জীবনে নানা ঘটনার মধ্যে কিছু কিছু ঘটনায় নতুনত্ব থাকে বৈকি। সিরাজদ্দৌলা নাটকে আমি গোলাম হোসেনের ভূমিকায় সেই প্রথম মঞ্চাবতরণ করলাম ২২শে ডিসেম্বর।

নিজের বিচার নিজে করা যায় না। তবে আমার আনন্দ এই যে, আমি সেদিন অজস্র দর্শকের অভিনন্দন পেয়েছিলাম। আমার শিল্পী-মন শুধু সেইটুকুই তো চায়।

১৯৫০-এর সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দী তার অর্ধেক পথ পরিক্রমা শেষ করলো। সেদিক থেকে এই শতাব্দীর মানুষের কাছে এটা ক্রান্তিকাল বৈকি।

শেষ হল ১৯৫০।১৯৫১-র প্রথম দিনের ডায়েরীর পাতা উল্‌টিয়ে এমন কিছু খবর পাইনি যা এখানে লিখব।

আগে ঝামেলার মধ্যে যেতে এমন বিব্রত বোধ করতাম না। কিন্তু আজকাল ওসবের মধ্যে যেতে ইচ্ছে হয় না। তবু মাঝে মাঝে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট এসে যায় বৈকি।

আমার অকৃত্রিম বন্ধু দেলওয়ারের কথা তো আগেই বলেছি। দেলওয়ারের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিণী হল তার স্ত্রী। এই স্ত্রীর পক্ষের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল পিতুর ওপর। পিতুই মিনার্ভায় দেলওয়ারের স্ত্রীর হয়ে যা কিছু করতো। মিনার্ভার অন্যান্য অংশীদারের মধ্যে চণ্ডী ব্যানার্জী প্রমুখ আরো অনেকে ছিলেন। মুশকিল হতো নাটকের ব্যাপার নিয়ে। এখানে নানা মুনির নানা মত। পিতু যদি বলে এ-নাটক হবে, চণ্ডীবাবু বলতেন ও-নাটক। আর নাটক নিয়ে এই ঝামেলার মধ্যে আমাকে পড়তে হতো। বলতাম, এভাবে থিয়েটার চালানো দায়। সবাই একমত না হলে কাজ হবে কি করে! শেষ পর্যন্ত আমাকে একথাও জানাতে হল, এরকম চললে আমার পক্ষে এখানে যুক্ত থাকা সম্ভব নয়।

এইসময়ে স্টারে কিছুদিন 'সাজাহান' অভিনয় হয়েছিল। তবে আমি ছিলাম না সে নাটকে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য করতেন সাজাহান। ক'দিন পরে সে ভূমিকালিপির পরিবর্তন চোখে পড়লো বিজ্ঞাপনে। দেখলাম সন্তোষ সিংহ অভিনয় করবে সাজাহান।

ঐ একই সময়ে শ্রীরঙ্গমে সাজাহান অভিনীত হল। সেখানে নাম-ভূমিকায় ছিলেন শিশির ভাদুড়ী। শ্রীরঙ্গমে ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায় ছিল ছবি বিশ্বাস, আর পিয়ারা চরিত্রে ছিল রাণীবালা।

পুরনো নাটক নিয়ে এই কাড়াকাড়ি—এর মধ্যে নতুন নাটকের সম্ভাবনা কোথায়। এই একই সময়ে কালিকায় একটি নতুন নাটক এল। নাম 'রাজধর্ম'। নাটকটি তেমন আসর জমাতে পারেনি।

বেশ কিছুদিন থেকেই নাটকের জগতে দুর্দিন চলেছে। এমন বন্ধ্যা দিন আগে আসেনি। কেন এমন হল! নাট্যকারের এমন অভাব কেন? আমরা অভিনেতা—আমাদের মনে সব-সময়ে নতুন নাটকের প্রত্যাশা। কিন্তু সে প্রত্যাশা বোধ হয় পূর্ণ হবার নয়।

এরই মধ্যে 'চন্দ্রনাথ'-এর নাট্যরূপের কথা হল। বীরেন ভদ্র নাটকের নতুন পাণ্ডুলিপি নিয়েও এলেন একদিন। কয়েকদিন বাদেই সম্ভবতঃ মার্চ মাসের ৯ তারিখ থেকে রিহার্সাল শুরু হল 'চন্দ্রনাথ'-এর।

দোলযাত্রা আর গুড-ফ্রাইডে একই দিনে। ঐ শুভদিনটিতে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ'-এর নাট্যরূপের শুভ উদ্বোধন হল মিনার্ভায়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। এর আগে উপেন মিত্র যখন মিনার্ভার মালিক, তখন অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'চন্দ্রনাথ' অভিনীত হয়েছিল। সেবারে চন্দ্রনাথের নাট্যরূপ দিয়েছিলাম আমি। আর এবারের নাটকটি বীরেন ভদ্রের।

'চন্দ্রনাথ'-এ আমার চরিত্র ছিল কৈলাশ খুড়োর। আর নাম-ভূমিকায় ছিল ছবি বিশ্বাস। নায়িকা সরযূর চরিত্রটি ছিল সরযূবালার। এছাড়া নাটকটিতে ছিল করালী, অপর্ণা, ঊষা (পটল), শিবকালী। চন্দ্রনাথের শিল্পী-তালিকায় আরও একটি নাম যুক্ত ছিল, সে নাম নরেশ মিত্রের।

এইসময়ে কালিকা থিয়েটার ঘোষণা করল তারাশঙ্করের 'দ্বীপান্তর' তাদের আগামী আকর্ষণ। 'দ্বীপান্তর'-এর উদ্বোধন রজনীর তারিখটি ছিল ৩০শে মার্চ। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং রাণীবালা ঐসময় কালিকায় যোগ দিয়েছেন।

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে মিনার্ভায়। ঐ উপলক্ষে শিল্পী-সমন্বয়ে অভিনয় হবে শচীনবাবুর 'গৈরিক পতাকা' এবং অভিনয়ের

সংগৃহীত অর্থ ২২শে এপ্রিলের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে নাট্যকারের হাতে দেওয়া হবে, এইরূপ ঠিক হয়েছে।

'গৈরিক পতাকা' অভিনীত হল ২০শে এপ্রিল। শিল্পীতালিকায় ছিলেন নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সরযূ, রাণীবালা, অর্পণা, রাজলক্ষ্মী (বড়), জহর গাঙ্গুলী ছাড়া আরো অনেকে। আমিও এই নাটকের শিল্পীতালিকায় যুক্ত ছিলাম।

সেদিনের অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চের ভিতরে-বাহিরে যে জনসমাগম হয়েছিল, তা এখনো আমার মনে আছে। সেদিন কোনমতে গাড়ী থেকে নেমে ভিড় ঠেলে মিনার্ভার ভিতরে এসেছিলাম।

এর দু'দিন বাদেই ২২শে এপ্রিল সকালে এক অনুষ্ঠানে শচীন সেনগুপ্তকে পুষ্প-স্তবক ও ৫৫৫১৲ টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন ও. সি. গাঙ্গুলী।

সেদিন বিশিষ্টের মধ্যে আরো অনেকে শচীনবাবুকে পুষ্পস্তবক উপহার দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তারাশঙ্কর, সজনী দাস, দেবকী বসু, প্রফুল্ল রায়, মন্মথ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, ধীরাজ ভট্টাচার্য, বি. সি. মল্লিক, সুধীরেন্দ্র সান্যাল প্রমুখ অভিনেতৃগণ ছিলেন।

সেদিনের অনাড়ম্বর অথচ সুন্দর অনুষ্ঠানটির কথা ভুলবার নয়।

অনেকদিন পরে ২৪শে মে শ্রীরঙ্গম একটি নতুন নাটক উপহার দিলে। নাটকটি হল প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'তখত-এ-তাউস'। এ নাটকের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন শিশিরবাবু স্বয়ং।

সে-আমলের নামকরা অভিনেতা অহী সান্যাল। আলিপুর কোর্টে তাঁর মৃত্যু হল ২৫শে মে। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার দরুন তাঁর এ-মৃত্যু।

অহী সান্যালকে আজ হয়তো অনেকের মনে নেই, কিন্তু সে সময়ে অভিনেতা হিসাবে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। শুধু কি এক অহী সান্যাল, কতো শিল্পী আছেন যাঁরা পরিচয়ের আড়ালে হারিয়ে গেছেন। কাল বড় নির্মম!

মহেন্দ্র গুপ্ত যে হঠাৎ পুরনো নাটক 'দেবলা দেবী' নিয়ে স্টারের আসর জমাবেন —এটা আশা করা যায়নি। অবশেষে মহেন্দ্রবাবুও পুরনো নাটক আরম্ভ করবেন, এটা প্রত্যাশার বাইরে ছিল।

সে-আমলে শিল্পীদের মধ্যে বিরোধ ছিল না এমন নয়, তবু একাত্মবোধের অভাব ছিল না। পরস্পরের সম্মান রজনীর অভিনয়ে সে কথা প্রমাণিত হয়। আবার অনেক সময় পারিবারিক অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে সম্মিলিত অভিনয় হয়েছে, এমন ঘটনাও

বিরল নয়। চণ্ডী ব্যানার্জীর মেয়ের বিয়ে হবে, তারই জন্যে ২৯শে মে তারিখে 'গৈরিক পতাকা' অভিনীত হল মিনার্ভায়। সে অভিনয়ে অংশ নিলেন নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, নীতিশ, ভূপেন রায়, মিহির ভট্টাচার্য, রাজলক্ষ্মী, জহর গাঙ্গুলী, সরযূবালা-প্রমুখ বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীরা। বলা বাহুল্য, আমিও অংশ নিয়েছিলাম নাটকে। সেদিনের অভিনয় অনুষ্ঠানের আগে সীতা দেবী, রঞ্জিৎ রায় প্রভৃতি গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানও হয়েছিল।

'পণ্ডিত মশাই' কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বহু-পঠিত উপন্যাস। এই উপন্যাসের নাট্যরূপের উদ্বোধন হল রঙমহলে ৭ই জুন তারিখে। শরৎচন্দ্রের কাহিনীর একটা নিজস্ব আবেদন আছে যা দর্শক-সাধারণকে আকৃষ্ট করে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নাটকের মানুষ হলেও, সংসার বাদ দিয়ে তো আমি নই। সংসারের অনেক কথা থাকে আমার ডায়েরীতে। আমার ছেলে ভানু যার পোশাকী নাম প্রীতিন্দ্র—সে বিজ্ঞানে এম. এস. পেল শিকাগোর ইলিনিয়স ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি থেকে। তার কয়েকদিন পরেই সে পিটস্‌বার্গ হাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশনে কাজে যোগ দিলে। এটা নিঃসন্দেহে আমার পরিবারের কাছে সুখবর।

আজ অস্তিত্ব নেই বঙ্গীয় নাট্য-সম্মেলনের। অথচ এই প্রতিষ্ঠান একদিন কলকাতার নাট্যোৎসাহী মানুষদের একত্রিত করেছিল।

যে সময়ের কথা বলছি, সময়টা হল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস। এই জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বঙ্গীয় নাট্য-সম্মেলনের বৈঠক বসল নির্মলচন্দ্রের বাড়ীতে। এই সম্মেলন আগে পরিচালিত হত শিশিরবাবুর সভাপতিত্বে। সেই সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্বটা সেদিনের বৈঠকে আমার ওপর ন্যস্ত করা হল। কারণ শিশিরবাবু বঙ্গীয় নাট্য-সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। যাই হোক, এই দায়িত্বপালনে আমি সক্ষম কিনা জানি না, তবু নির্মলচন্দ্র, হেমেন দাশগুপ্ত প্রমুখের অনুরোধ আমি এড়াতে পারিনি।

অভিনেতা প্রভাত সিংহ সে-সময়ের দুর্লভ চরিত্রের মানুষ। অমন কর্মচঞ্চল পুরুষ-চরিত্র আমি কমই দেখেছি। ব্যক্তিগত জীবনে এই মানুষটির সঙ্গে আমার ছিল নিবিড় সম্পর্ক। প্রভাতবাবুর মৃত্যুর খবরটা শুনে আমি বিচলিত হয়েছিলাম।

কিছুদিন আগে থেকে বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন প্রভাত সিংহ। ভর্তি হয়েছিলেন আর. জি. কর হাসপাতালে। ৯ই জুলাই রাত দেড়টায় তার মৃত্যু হল।

মানুষটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যজগৎ থেকে একজন বিরল ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটল্লো।

শরৎবাবুর নাটকেরই তো তখন বাজার। মিনার্ভায় চলছিল 'চন্দ্রনাথ'; এবারে

নতুন করে আরম্ভ হল 'বিজয়া'। 'বিজয়া'-য় আমি অভিনয় করলাম রাসবিহারী চরিত্রে, নরেনের ভূমিকায় ছিল ছবি বিশ্বাস। আর নামভূমিকায় ছিল সরযূবালা।

১৫ই আগস্ট তারিখটি স্বাধীনতা দিবসরূপে চিহ্নিত। ঐদিনে বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন নাটকের অনুষ্ঠান হল। মিনার্ভায় অভিনীত হল 'মিশরকুমারী', শ্রীরঙ্গমে 'চন্দ্রগুপ্ত'। 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয়ের পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছিলেন শিশির ভাদুড়ী, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৬শে আগস্ট 'রিজিয়া' নাটক দেখতে এসেছিলেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। অভিনয় শেষে আমার সঙ্গে দেখা হল। নানা কথার মধ্যে জিজ্ঞাসা করলাম, গণদেব গাঙ্গুলীর খবর কী ?

খবর জানতে চেয়ে যে এমন খবর পাব, এটা কি ভেবেছিলাম ! শুনলাম, গণদেব গাঙ্গুলী মারা গেছেন প্রায় তিন সপ্তাহ আগে। শুনে মর্মাহত হব, এ আর নতুন কথা কি ! গণদেব গাঙ্গুলী আমার অনেক দিনের বন্ধু।

সেদিন থিয়েটার থেকে বাড়ী ফিরে এলাম ভারাক্রান্ত মনে।

চল্‌তি দিনের মধ্যে যখনই কোন কাছের মানুষের হারিয়ে যাওয়ার খবর শুনি, তখনই একটা কথা মনে হয়, জীবনে বোধ হয় এমনি করে সবাইকে হারিয়ে যেতে হয়। আগে এমন করে ভাবতাম না, কিন্তু আজকাল ভাবি। নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে ভাবি। ভেবে কূল-কিনারা পাই না।

মিনার্ভা থেকে ছবি বিশ্বাস কেন যে চলে গেল, বুঝলাম না। তার জায়গায় এল কমল মিত্র। এদিকে কর্পোরেশন কোন কারণে মিনার্ভার প্রদর্শনী বন্ধ করে দিলে।

নাট্যমঞ্চের ওপর যখন এইসব ঝামেলা আসে, তখন মনটা স্বভাবতঃ খারাপ হয়। তবে এ-সব ঘটনার মধ্যে আজকাল আর নিজেকে জড়াতে চাই না।

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' নিয়ে বিজয়া নাটক তো চলছে। আবার এই কাহিনীর চিত্ররূপ মুক্তি পেল অক্টোবরের ৫ তারিখে। পরিচালক সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়। 'বিজয়া' চরিত্রে রূপ দিয়েছেন সুনন্দা ব্যানার্জী, আমিও অভিনয় করেছি রাসবিহারীর ভূমিকায়। এছাড়া জহর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এঁরাও চিত্রের অন্যতম অভিনেতা।

দুর্গাপূজায় সপ্তমীর দিনে মিনার্ভায় একটি নতুন ধরনের নাটকের উদ্বোধন হল। নাটকটি হল ইংরেজী 'স্নো হোয়াইট'-এর ভাবানুবাদ। নামও 'তুষার-কণা'। বলা বাহুল্য নাটকটি এসেছে শচীন সেনগুপ্তের কলম থেকে।

কিন্তু পূজোয় আর তেমন নাটক কই? নাটকের ক্ষেত্রে এ-দুর্দিন কি ঘুচবে না ?

নতুন নাটক নেই, সুতরাং পুরনো নাটক নিয়ে আসর জমাবার চেষ্টা। রঙমহলে নতুন করে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' অভিনয় আরম্ভ হল।

কলকাতার প্রতিটি থিয়েটার চলছে, চলতে হয় তাই; চলার মধ্যে কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রজগতে প্রমথেশ বড়ুয়া নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় নাম। শুধু স্মরণীয় নয়, বরণীয়ও।

বাংলাদেশে এমন একটা সময় ছিল, যখন চিত্রামোদীদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম ছিল 'বড়ুয়া'। 'বড়ুয়া'কে অনুসরণ করে একটা 'ফ্যাসান'-ও তখন চালু হয়েছিল। বিশেষ করে 'দেবদাস' ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়াকে যাঁরা নাম-ভূমিকায় দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, শরৎচন্দ্রের দেবদাস আর প্রমথেশের মধ্যে কোথাও এতটুকু অমিল নেই। এই যে চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, এ একমাত্র সার্থক রূপকারের পক্ষেই সম্ভব।

প্রমথেশ বড়ুয়ার মৃত্যুর খবরটা যখন শুনলাম, তখন মনে-মনে একটি কথাই উচ্চারণ করতে চেয়েছিলাম, না—না—এ মিথ্যে, প্রমথেশের মতো শিল্পীর মৃত্যু নেই।

আভিধানিক অর্থে হয়তো একথা বলার কোন যুক্তি নেই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি —বাংলা তথা ভারতের চিত্রজগতে প্রমথেশ বড়ুয়া একটি অবিনশ্বর নাম।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর প্রমথেশের লোকান্তর গমনের তারিখ। মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে শহরের চিত্র ও মঞ্চ জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গিয়েছিলেন স্বর্গত শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। এ-ছাড়া সাধারণ মানুষও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন স্বর্গত শিল্পীর উদ্দেশে।

অভিনয় জীবনে কতো না আজব ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আজ অবসর-জীবনে যখন বসে বসে পুরনো দিনের ঘটনা-স্মৃতি রোমন্থন করি, তখন সেই সব টুকরো ঘটনার কথা মনে আসে।

ডিসেম্বরের শীতের রাত্রে আরো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে কদমতলায় গিয়েছিলাম 'সাজাহান' অভিনয় করতে। কিন্তু কী বিপদ! সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু ড্রেসার কই, আর মেক-আপ ম্যানও তো আসেনি। সুতরাং কী হবে? শেষটা দর্শকবৃন্দ হৈ-চৈ আরম্ভ করে দেবে। করবে বৈকি? তাদের তো কোন দোষ নেই। ব্যাপারটা ঠিক সুবিধের মনে হল না। শেষটা নিজেরা মেক-আপে বসে গেলাম। পোশাকও যে যার মতো নিজেরা পরে নিলে। নাটকও আরম্ভ হল—কিন্তু রাত বারোটায়। তবু শেষ রক্ষে হল শেষপর্যন্ত।

এর কয়েকদিন বাদেই আবার আমরা কয়েকদিনের ব্যবধানে দু'বার কদমতলা গিয়েছিলাম 'সিরাজদ্দৌলা' আর 'মিশরকুমারী' অভিনয় করতে।

'আলমগীর' নাটক প্রথম অভিনীত হয়েছিল ১৯২১-এর ১০ই ডিসেম্বর। ১৯৫১-র ১০ই ডিসেম্বর শিশির ভাদুড়ী, নাটকের একত্রিংশ বার্ষিকী উদ্‌যাপন করলেন। এই উপলক্ষে 'ত্রিশ বৎসরের কৈফিয়ৎ' শীর্ষক দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন শিশিরবাবু।

অনেকদিন পরে মিনার্ভায় একটি নতুন ঐতিহাসিক নাটক 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র'-র উদ্বোধন হল ২১শে ডিসেম্বর। নাটকটির রচয়িতা বেনারস প্রবাসী ইন্দু ভট্টাচার্য, আর পরিচালক রঞ্জিৎ রায়।

মিনার্ভায় অভিনীত—স্বর্গত শরৎ ঘোষের 'জাতিচ্যুত'-র নতুন করে স্টারে অভিনয় শুরু হল ২২শে ডিসেম্বর তারিখে।

অভিনয়ের মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতেও যোগ দিতে হয়। আর্টিস্ট অ্যাসো-সিয়েশনের সভা ছিল ২৩শে ডিসেম্বর। পৌরোহিত্য করলাম আমি। সেদিনের সভায় ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সুশীল মজুমদার, পাহাড়ী সান্যাল, সন্তোষ সিংহ, শিপ্রা মিত্র, তুলসী লাহিড়ী, মলিনা, সুনন্দা, শিশির মিত্র প্রমুখ শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন।

ভেবেছিলাম বছরের শেষটা ভালয় ভালয় কাটবে। কিন্তু যা ভাবা যায়, তা হয় না। স্ত্রী সুধীরা অনেকদিন থেকেই ভুগছিল, এবারে সে একেবারে শয্যা নিল। বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা চালানো এ অবস্থায় সম্ভব নয়। সুতরাং তাকে কারমাইকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হল ২৯শে ডিসেম্বর।

বছরের বাকি দু'টি দিন স্ত্রীর অসুখের চিন্তা নিয়েই কাটালাম।

শেষ হল একটি বছর। পুরনো দেয়ালপঞ্জীর শেষ পৃষ্ঠাটিও ছিঁড়ে ফেললাম।

বছরের প্রথম দিনটিতেই কলকাতার বাইরে যেতে হল 'কেদার রায়' নাটকে অংশ নিতে। এমন কিছু দূরে নয়—হাওড়ার কদমতলায়। স্থানীয় কৃষ্ণশ্রী চিত্রগৃহে নাটক অভিনীত হল।

বছরের প্রথম দিনে কলকাতার বাইরে নাটক অভিনয় করতে যাওয়া—এমনটি খুব ঘটেনি বললেই হয়।

পৃথ্বীরাজ কাপুর নাম-করা অভিনেতা। একসময় কলকাতায় তিনি অনেক নাটক অভিনয় করেছেন। ১৯৫২-র জানুয়ারীতে তিনি আবার সদলে কলকাতায় এলেন নাটক অভিনয় করতে। শহরের বিভিন্ন সিনেমা হলে, বিভিন্ন নাটক অভিনয় আরম্ভ করলেন।

এই সময়ে পৃথ্বীরাজ কাপুরকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিনন্দিত করা হল। আমি সভাপতিত্ব করলাম সেই-সব অনুষ্ঠানে।

ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে শিশিরবাবু দেওঘর গেলেন। ঐসময় শ্রীরঙ্গমেই একজন অভিনেতা পুরু মল্লিক, শ্রীরঙ্গম চালাতে আরম্ভ করলেন 'চরিত্রহীন' নাটক নিয়ে; যে-নাটকে আমি অংশ নিতাম উপেনের চরিত্রে।

'চরিত্রহীন' সে সময় মন্দ চলেনি।

যে-সময়ের কথা বলছি, সে-সময়ে আমি কোন মঞ্চের সঙ্গে স্থায়িভাবে যুক্ত ছিলাম না। বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয় করে চলেছি। শুধু কলকাতায় নয়, মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরেও যেতে হয়। কদমতলায় এর আগেও ক'বার গিয়েছি, আবার ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে গেলাম 'প্রতাপাদিত্য' নাটক অভিনয় করতে। সেদিন শৌখিন অভিনেতাও আমাদের সঙ্গে নাটকে অংশ নিয়েছিল।

শৌখিন অভিনেতাদের সঙ্গে নাটকে অংশ নেওয়ার মধ্যে একটি আনন্দ আছে।

পরদিন ৫ই ফেব্রুয়ারী 'নাট্য-সঙ্ঘ' নামে একটি শৌখিন নাট্যসংস্থা আয়োজন করেছিল নাটকাভিনয়ের। নাটক হল 'প্রফুল্ল'। শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি চক্রবর্তী ছিলেন নাটকটির নির্দেশক। এ নাটকে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম আমরা মঞ্চের কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনকড়িদাকে আমি গুরু বলে মানি। স্নেহ পেয়েছি, শিক্ষা পেয়েছি, শাসন সহ্য করেছি। তবেই তো পেয়েছি তাঁর আশীর্বাদ।

অভিনয়ের আগে তিনকড়িদা প্রসঙ্গে এককালে নাট্যামোদীদের কাছে কিছু বক্তব্য রাখলাম। বক্তব্য বলতে শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি চক্রবর্তীর নাট্য-জীবন প্রসঙ্গে। তিনকড়িদা নিজেই একটা যুগ—যে যুগকে আমরা তখন পেরিয়ে এসেছি।

যাই হোক, 'প্রফুল্ল' সেদিন ভালই জমেছিল। তিনকড়িদা যেখানে আচার্য—নাটক তো সেখানে জমবেই।

এইসব সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছি, তার মধ্যে অনেক সময় বৈচিত্র্যও খুঁজে পেয়েছি, স্থায়ী মঞ্চে যেটা দুর্লভ।

ডায়েরীর পৃষ্ঠায় কতো কথাই না লিখেছি। ইংলণ্ডেশ্বর ষষ্ঠ জর্জের লোকান্তর গমনের তারিখটিও লিখে রেখেছি। তারিখটি ছিল ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ই।

আবার ওই দিনে আমার স্ত্রী সুধীরা হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে এল, সে-কথাও লিখে রেখেছি।

যে-কথা আগেও বলেছি, সেই কথাই নতুন করে বলছি। কোন মঞ্চেই নতুন নাটক নেই। পুরনো নাটক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অভিনীত হচ্ছে। আমিও অনেক নাটকে অংশ নিচ্ছি। কিন্তু মন থেকে তেমন সাড়া পাই না, তেমন উন্মাদনাও জাগে না মঞ্চে

দাঁড়ালে। যন্ত্রের নিয়মে অভিনয় করে চলা। তবে একটা দিক থেকে সব সময়ে সচেতন থাকি, যেন আমার কষ্টার্জিত প্রতিষ্ঠার আসন থেকে বিচ্যুত না হই।

এই সময়ে আরো মনে হত যে, আমাদের দিন যেন শেষ হয়ে আসছে। এবারে পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে, আগামীকালের পথিকরা যে-পথ দিয়ে আসছে।

আবার একথাও ভাবি, কই—আগামীদিনের পথিক তো তেমন কাউকে দেখছি না, যারা আমাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করবে।

অথচ বিগত যুগের আমরা যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর তো আগের মতো উৎসাহ পাই না। দেহের সঙ্গে মনটাও আস্তে আস্তে স্থবির হয়ে আসছে। জীবনে নানা আলোর রোশনাই থেকে এখন একটা ছোট্ট বাতির শিখা দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে ইচ্ছাটুকুও তো পূর্ণ করতে পারছি না। আবার সেই মঞ্চের আকর্ষণেই ছুটে যাচ্ছি।

অভিনয় জীবন—কী এক যাদুর মায়ায় জড়ানো। নয়তো এখনো কলকাতার বাইরে অভিনয় করতে ছুটে যাওয়া।

এই তো সেদিন শিবরাত্রিতে গেলাম শ্রীরামপুরে। আগে জানলে কী যেতাম!

কী কুক্ষণে যে শ্রীরামপুরে এসেছিলাম—এমন ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি।

সারারাত ধরে নাটকাভিনয় হবে স্থানীয় শ্রীরামপুর টকীজে। শিল্পীরা অনেকেই আগে থেকে এসেছে। তারাই উদ্যোগ আয়োজন করেছে। সকালে তাদের অনেকে গাড়ী চেপে রাস্তায় প্রচারপত্র বিলি করতে চরম বেলেল্লাপনা করেছে মদ্যপান করে; যার মাশুল দিতে হল সেই রাত্রে। দর্শক-সাধারণ বর্জন করলো এই অনুষ্ঠান। শিল্পীরা দিনের আলোয় যা করেছে, রাতে না-জানি তারা আরও কি করবে! এই ভয়েই অনুষ্ঠান বর্জন। বেলেল্লাপনার খেসারত দিতে হল সে রাত্রে। অনেকেই রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বাঁচলো। এ-প্রসঙ্গে বেশী কথা না-লেখাই ভাল। শুধু একটি কথা বলতে পারি, সেদিন শ্রীরামপুরের মানুষ এই অনুষ্ঠান বর্জন করে তাদের ঘৃণা প্রকাশ করেছিল।

এই বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে আমি আর কী করবো। নীরবে সব সহ্য করেছিলাম। শান্ত মনে ফিরে এসেছিলাম কলকাতায়। জিজ্ঞাসা করেছিলাম পুরু মল্লিককে ডেকে, এ কী হল? কেন এমন হল!

তারপর পুরু মল্লিকের কাছেই শুনেছিলাম আনুপূর্বিক ঘটনা। যে কথা না লেখাই ভাল।

অভিনেতৃ-সঙ্ঘের তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে ২৯শে ফেব্রুয়ারী 'মিশরকুমারী' অভিনীত হল। ঐদিনেই গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে একটা পার্টি দিয়েছিলেন বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক ফ্রাংক কাপরার সহকারী, যেখানে আরো শিল্পীদের সঙ্গে আমিও উপস্থিত হয়েছিলাম।

এর পরের সপ্তাহ, অর্থাৎ মার্চের ২ তারিখে স্নেহাংশু আচার্যের বেকার রোডের বাড়ীতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে রাশিয়া, চীন এবং রুমানিয়ার চলচ্চিত্র প্রতিনিধিগণকে সম্বর্ধনা জানানো হল। চলচ্চিত্র-উৎসব উপলক্ষে ঐ প্রতিনিধি দল কলকাতায় এসেছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। দেবকী বসু, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখার্জী ছাড়া আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এই অনেকের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত কথাশিল্পী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। আর ছিলেন বিখ্যাত চরিত্রাভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। সেদিনের অনুষ্ঠানে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ভাষণ দিযেছিলেন।

রুশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে মনোরঞ্জনবাবুর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। কেননা, কয়েক বছর আগেই তিনি রাশিয়া সফর করেন।

এই প্রসঙ্গে বলছি, রাশিযার প্রতিনিধিগণকে এর পর শহরে আরো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপ্যায়িত করা হযেছিল। এদেশের চিত্র ও মঞ্চ জগতের বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে আমিও যোগ দিয়েছি এইসব অনুষ্ঠানে।

প্রতিটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে যোগ দিতে হচ্ছে। এই মার্চের ৫ তারিখে ব্রিস্টল হোটেলে 'মিলনী'-র ভোজসভায় যোগ দিলাম। এখানে দেখা হল পুরনো বন্ধু নীতিশচন্দ্র লাহিরীর সঙ্গে। অনুষ্ঠানে চীনা অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে দেবকী বসু, শ্রীমতী কানন দেবী ও তাঁর স্বামী হরিদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফিল্ম ফেস্টিভল নিয়ে বেশ ক'টা দিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। উৎসব শেষ হল ৭ই মার্চ।

অভিনেতা ছবি বিশ্বাস একটি সম্প্রদায় করলেন। নাম সুন্দরম্। সুন্দরম্ সম্প্রদায় করিন্থিয়ান থিয়েটার, আজ যেখানে অপেরা সিনেমা হাউস, সেখানে 'মন্ত্রশক্তি' অভিনয় আরম্ভ করলেন। সুন্দরম্ গোষ্ঠীতে সরযূবালা, তুলসী লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, বিজয়, কার্তিক প্রমুখ ছিলেন। সুন্দরমের উদ্বোধনের তারিখটি ছিল ১১ই মার্চ।

'সুবর্ণ গোলক' নাটকটির অভিনয় আরম্ভ হল মিনার্ভায়। বীরেন ভদ্র এর নাট্যকার। ১৩ই মার্চ এর উদ্বোধনের তারিখ।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস। এরই চিত্ররূপ কলকাতায় মুক্তি পেল ১৪ই মার্চ। আমি ছিলাম নামভূমিকার শিল্পী।

'পথের দাবী' এর আগেও অনেক বার হয়েছে। পুরু মল্লিক শ্রীরঙ্গমে আবার 'পথের দাবী' অভিনয়ের আয়োজন করলো। এ-নাটকের শিল্পী তালিকায় সে আমলের বিখ্যাত শিল্পীদের নাম যুক্ত ছিল।

কী নাটকের ক্ষেত্রে, কী মঞ্চের ক্ষেত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র আর শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নিজস্ব আবেদন আছে। তাই তো বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মঞ্চে দেখেছি, এই দুই ঔপন্যাসিকের কাহিনী-নির্ভর নাটকই অভিনীত হচ্ছে। নব-গঠিত সুন্দরম্ সম্প্রদায় শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' মঞ্চস্থ করলেন। এই নাটকের পরিচালক ছিলেন ছবি বিশ্বাস।

দিনগুলো কেমন যেন খুঁড়িয়ে চলছে। অভিনয় করছি—করতে হয়, তাই করা। স্টুডিও-য় যাচ্ছি ছবির কাজে—সে-ও যেন তেমনি। জীবনের যে অধ্যায় পেরিয়ে এসেছি, তার সঙ্গে বর্তমানের মিল খুঁজে পাই না। থাক না অমিল—কিন্তু নতুন কিছু পাব তো! তাই বা পাচ্ছি কই। সেই গড্ডালিকা-স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছি।

নাটক চলছে। পুরনো নাটক। অভিনয়ও করছি না এমন নয়। তবে এ-যেন সেই পুরাতনের জের টেনে চলা।

যে কথাটা এতকাল ভাবিনি, সেই কথাই আজ ভাবতে শুরু করেছি। অনেক দিন তো নাটক আর অভিনয় নিয়ে জীবন কাটালাম—এবার অন্য জগতের পথে পা বাড়ালে কেমন হয়। কিন্তু যখনই ভেবেছি, সেই অন্য জগৎটা কেমন—তখনই কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তবুও মনের মধ্যে সেই অদেখা জগতের খোঁজ নিতে চেয়েছি।

চলতি দিনগুলো নিয়মের মধ্যেই চলেছে। পৃথিবীর আহ্নিক-গতি, বার্ষিক-গতি—নিয়মের চাকায় বাঁধা।

জীবনের দিনগুলোও একটা নিয়ম মেনে চলে।

এরই মধ্যে একদিন অপ্রত্যাশিত ফোন পেলাম স্টারের মহেন্দ্র গুপ্তের কাছ থেকে। শুনলাম, মহেন্দ্র গুপ্ত আর সলিল মিত্র আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। কেন আসছেন, সে কথাটা কিন্তু তখনো জানতে পারি নি।

কয়েকদিন বাদেই সলিলবাবুকে নিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত আমার কাছে এল। অনেক-দিন বাদে সলিলবাবুকে দেখলাম। আগে যখন দেখেছি, তখন সে ছিল নিতান্ত শিশু। আজ সে পরিণত যুবক।

আমাকে স্টারে যোগ দেওয়ার কথা ওঁরা বলতে এসেছেন। সেই প্রসঙ্গে কথাবার্তা হল। আমি রাজী হলাম স্টারে যোগ দিতে। এখন মে মাস, আগামী

জুলাই থেকে আমি স্টারের শিল্পী-তালিকায় যুক্ত হব এই কথাই হল। তবে কী নাটক হবে, তা তখনো মহেন্দ্র ঠিক করেনি। তবে প্রথমটা পুরনো নাটক 'কঙ্কাবতীর ঘাট' কিম্বা অন্য নাটক অভিনীত হবে। তার মধ্যে মহেন্দ্র নতুন নাটক তৈরী করে নেবে।

সেদিন কথাবার্তা পাকা করে মহেন্দ্র আর সলিলবাবু চলে গেলেন।

'তুমি কি হবে—অভিনেতা ?'—শীর্ষক একটি বেতার ভাষণ দিলাম ২৩শে জুন তারিখে। এই পর্যায়ে অভিনয় জগতের বিষয় নিয়ে আরো অনেকে ভাষণ দিয়েছিলেন।

এই জুন মাসের ২৫ তারিখে রঙমহলে 'জীবন সংগ্রাম' নামে একটি নাটকের উদ্বোধন হল। নাটকটি ছিল অধ্যাপক শ্যামসুন্দরের লেখা।

নয়তো অন্য কোন মঞ্চে নতুন নাটক নেই। বিভিন্ন পুরনো নাটকের অভিনয় চলেছে বিভিন্ন মঞ্চে।

কতদিন পরে স্টারে এলাম ?

সেদিন ২রা জুলাই সন্ধ্যে সাতটায় স্টারে এসেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল। এই স্টারের নাম তখন ছিল আর্ট থিয়েটার। সে কি আজকের কথা! ১৯২৩ সাল। এই আর্ট থিয়েটারেই আমার পেশাদারী মঞ্চ-জীবনের শুরু। এই মঞ্চেই প্রথম অভিনয় করেছিলাম কর্ণার্জুন নাটকে অর্জুনের ভূমিকায়।

পুরনো দিনের স্মৃতি মনের পর্দায় ফুটে উঠলো। স্মৃতি নয়—আমারই অভিনয়-জীবনের প্রতিচ্ছবি।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আবার সেই পুরনো মঞ্চে এলাম। সেদিনের আর্ট থিয়েটার আজকের 'স্টার'।

গেলাম সলিলবাবুর কক্ষে। কথা হল। আমি এখনই এই মঞ্চের শিল্পী তালিকায় নিজের নাম লিপিবদ্ধ করেছি। গেলাম পুরোনো দিনের সেই কক্ষটিতে, যেখানে আমি 'মেক-আপ' নিতাম। দেখা হল, পুরনো দিনের অনেক কর্মী ও কলাকুশলীর সঙ্গে। বেশ বুঝতে পারলাম, সময়ের সঙ্গে আমারও কতো পরিবর্তন। সেদিনের সেই উচ্ছ্বাস আজ স্তিমিত হয়ে এসেছে। আজ আমি শান্ত, ধীর, সংযত। তবুও সেই পুরনো স্মৃতি মনে আনতে কখন যেন অন্যমনে অতীতের পটভূমিকায় হারিয়ে গেলাম।

সলিলবাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ের কথা হল। তারপর মহেন্দ্র গুপ্ত তার নাটক 'পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিং'-এর কথা তুললো। এই নাটকে আমাকে অভিনয় করতে হবে নাম-ভূমিকায়।

এর ক'দিন বাদেই ১১ই জুলাই রঞ্জিৎ সিং-এর অভিনয় আরম্ভ হল। মহেন্দ্র

গুপ্তই নাটকে কর্ণ সিং-এর চরিত্রে রূপ দিলে। সরযূ, পূর্ণিমা, ফিরোজা, রাণীবালা—এরাও ছিল এই নাটকের শিল্পীতালিকায়।

এদিকে মিনার্ভায় যে বাংলা নাটকের অভিনয় হতো, তা বন্ধ হল। সংবাদটা নিঃসন্দেহে দুঃখদায়ক।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন 'বহুরূপী' সম্প্রদায় প্রায়ই নাটক অভিনয় করছেন। 'বহুরূপী'র সঙ্গে বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের একটা বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। শম্ভু মিত্র এই সংস্থার কর্ণধার। তারপর তুলসী লাহিড়ীর মত প্রগতিশীল নাট্যকার এবং অভিনেতা এই সংস্থার আর এক উদ্যোগী পুরুষ।

ঐ সময়ে তুলসী লাহিডীর নাটক 'ছেঁড়া তার' রঙমহলে অভিনয় করেন বহুরূপী সম্প্রদায়। বলা বাহুল্য, 'সমকালীন' সমাজ-ব্যবস্থাই এই নাটকের পটভূমিকা। এই ধরনের নাটক লিখে তুলসী লাহিড়ী বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন।

এই সময়ের আর একটি সফল নাটক 'নতুন ইহুদী'—যেটি বহুরূপী সম্প্রদায় প্রায়ই অভিনয় করতো। রঙমহলেও ঐ সময়ে 'নতুন ইহুদী'র নিয়মিত অভিনয় চলছিল।

স্টারের কথা বলতে বলতে অন্য কথায় চলে এসেছি। স্টারে যে শুধু 'রঞ্জিৎ সিং' অভিনীত হচ্ছে, তাই নয়। মাঝে মাঝে 'মিশরকুমারী', 'গৈরিক পতাকা', 'সাজাহান' প্রভৃতি নাটকও অভিনীত হচ্ছে।

চলতি দিনের মধ্যে একটি দিন, ৩০শে আগস্ট—অভিনয় শেষে আমরা নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের বাড়ীতে গেলাম সহানুভূতি জানাতে। শচীনবাবু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে কেমন যেন ভেঙে পড়েছেন।

তিনকড়ি চক্রবর্তীকে আমি বরাবরই তিনকড়িদা বলে ডাকি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আমার অভিনয়-গুরু। কতদিন পরে তিনি আবার শ্রীরঙ্গমে অভিনয় আরম্ভ করলেন শিশিরবাবুর সঙ্গে। বৃদ্ধ মানুষ, ঠিক মতো পারবেন কেন চিরকুমার সভায় অক্ষয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে। বয়সের তো একটা ধর্ম আছে! শ্রীরঙ্গমের আরো নাটকে তিনি অভিনয় করতে আরম্ভ করলেন। একদিন কোন এক অপেশাদার দলের হয়ে তিনকড়িদা শ্রীরঙ্গমে এলেন। সেদিন নাটক ছিল 'প্রফুল্ল'। যে-মানুষ একদিন বাংলা রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে হাজার দর্শককে চমৎকৃত করেছেন, সেই মানুষ আজ কতো অসহায়! অভিনয়ের পর পায়ে হেঁটে এলেন আমার কাছে। বললাম, একে চোখে কম দেখেন, তারপর এই শরীর—এভাবে আপনার পক্ষে পায়ে হেঁটে এত দূর আসা ঠিক নয়।

সেই দিনই বুঝলাম, তিনকড়িদার দুঃখের কথা। মানুষটি সর্বরিক্ত। ভাবলাম, কেন এমন হল? বাংলাদেশের প্রতিভাশালী অভিনেতা, যিনি নিজেই একটি যুগ—সেই মানুষটি আজ আর্থিক দিক থেকে কতটা অসহায়!

ভাবলাম, আমরা কি কিছু করতে পারি না! আমাদের দেশবাসী, আমাদের সরকার কি এমন কিছু করতে পারেন না, যাতে এই গুণী মানুষেরা জীবনের শেষদিনগুলো স্বস্তিতে কাটাতে পারেন। করুণা নয়, এই সব কৃতী পুরুষকে প্রণামী দিয়ে।

কিন্তু কে শুনবে আমার কথা, আর কাকে বা বলব!

কতোদিন আর পুরনো নাটক নিয়ে চলবে। স্টারের ভাবনাটা আমারও ভাবনা। নতুন নাটক কই? ক'মাস গেল—একনাগাড়ে একের পর এক পুরনো নাটক নিয়েই চলেছি।

সর্বত্রই একই অবস্থা। একমাত্র সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মিনার্ভায় শচীন সেনগুপ্তের নাটক 'কাঁটা ও কমল' অভিনয় আরম্ভ হল। নাটকটির পরিচালক শচীনবাবু নিজে, আর প্রযোজিকা ছিলেন অঞ্জলি রায়।

স্টার তখন বিভিন্ন নাটক নিয়ে চলেছে। কখনো 'মিশরকুমারী', কখনো 'সাজাহান', কখনো 'কঙ্কাবতীর ঘাট', কিংবা অন্য নাটক।

এই একঘেযেমির মধ্যে একটি নতুন ধরনের নাটকের কথা শুনলাম। এই নাটকটি হল রঙমহলে অভিনীত—গণনাট্য সংঙ্ঘের 'আবাদ'।

গণনাট্য সঙ্ঘ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সমাজবাদে বিশ্বাসী একদল প্রগতিশীল তরুণ—যারা এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত, তারা নাটকে, গানে একটা পরিবর্তন আনতে চায়। একদিক থেকে এইসব তরুণদের মধ্যে একটা সংগ্রামী মন ছিল। নয়তো প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ ব্যাহত হয়নি।

এখানে আর একটি নাটকের কথা বলি। নাটকটি হল মিনার্ভায় অভিনীত ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানীর জীবন', যার পরিচালক রঞ্জিৎ রায়।

সেদিন ৩০শে অক্টোবর, স্টারে নাটক ছিল 'চন্দ্রশেখর', বাইরে লবীতে এসে দেখা হল নাটুবাবুর সঙ্গে। খবর জিজ্ঞাসা করাতে শুনলাম, সরযূবালার কথা। সে নাকি আজই স্টার ছেড়ে চলে যাবে। কোন কথাই শুনবে না। বলছে, আজই তার স্টারের শেষ রজনী।

যে যাবে, তাকে তো ধরে রাখা যাবে না। এক মঞ্চ ছেড়ে আর এক মঞ্চে যাওয়া—এ-ঘটনা তো নতুন কিছু নয়।

কিন্তু প্রভা চলে গেল জীবনের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে। কেউ তাকে ধরে রাখতে পারল না। বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটা দীপশিখা নিবে গেল প্রভার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে।

সেদিন তারিখ ছিল ৮ই নভেম্বর। প্রভার মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো শহরে। বন্ধ হল থিয়েটারের দরজা। অনুরাগীরা গেল প্রভাকে শেষদর্শন করতে।

পরদিন রঙমহলে যে শোকসভায় স্বর্গত প্রভার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হয়, তাতে পৌরোহিত্য করেন শচীন সেনগুপ্ত। আর প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরঙ্গমেও সেদিন অভিনয় অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রভার স্মরণে শিশির ভাদুড়ী একটি ভাষণ দিয়েছিলেন।

নাটক আর অভিনয়ের কথার মধ্যেও নতুন পর্যায়ে ডি. এল. রায়ের 'দুর্গাদাস' নাটকের উদ্বোধন হবে স্টারে। নাটকের শিল্পীতালিকায় আমি ছিলাম ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায়, মিহির ভট্টাচার্য ছিল নাম-ভূমিকার শিল্পী, আর মহেন্দ্র গুপ্ত ছিল দিলীর খান চরিত্রে। নারীচরিত্রে ছিল রাণীবালা, বন্দনা ও পূর্ণিমা।

এই প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। আমি মিনার্ভায় এই নাটকের অভিনয় দেখেছি। দানীবাবু অভিনয় করতেন 'দুর্গাদাস'-এর ভূমিকায়; সে-অভিনয়ের স্মৃতি আমার মনের মধ্যে আছে। সেদিনের অভিনয়ের কথা স্মরণে রেখেই মহেন্দ্রবাবুকে বললাম, দুর্গাদাসের ভূমিকাটা আপনি নিন। মিহিরকে দিন দিলীর খানের ভূমিকা। তাতে নাটকের অভিনয়ের দিকটা জোরালো হবে। কেননা, মিহিরের অভিনয়ে দুর্গাদাসের ব্যক্তিত্ব রূপ পায় না।

মহেন্দ্রবাবু সেই মুহূর্তে কিছু বললেন না। তবে আমার কথাটা তাঁকে ভাবিয়ে তুললো বৈকি।

শ্রীরঙ্গমে অভিনয় বন্ধ হল ২৫শে ডিসেম্বর থেকে। শুনলাম, পরবর্তী নাটক 'প্রশ্ন'-র প্রস্তুতি চলছে শ্রীরঙ্গমে।

বছরের যে-ক'টি দিন বাকি ছিল, একটা একটা করে সে-ক'টি দিনও ফুরিয়ে এল।

জীবনের ওপর দিয়ে এমনি করে কত বছর পেরিয়ে গেছে। প্রতিটি বছরের শেষের দিনটিতে পিছনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি।

কিন্তু এবারে আর পিছনের দিকে নয়, তাকিয়ে আছি সামনের দিকে। নানা চিন্তার মধ্যে থেকে একটি নতুন চিন্তাকে আজ মনের মধ্যে স্থান দিয়েছি। সেটি হল অভিনয়-জগৎ ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা। ভেবেছি, আর না—অনেক রঙ মেখেছি, অনেক চরিত্রে রূপ দিয়েছি, নাটকের অনেক সংলাপ উচ্চারণ করেছি—এবারে দেখতে চাই এ-সবের বাইরে কি আছে।

এই চিন্তার মধ্যেই ১৯৫২ শেষ হল।

যে ক্লান্তি, যে অবসাদ ছিল বছরের শেষ দিনটিতে,—ঠিক সেই সুরটিই মনের মধ্যে ছিল বছরের প্রথম দিনটিতেও।

মুক্তি চাইছি, তবু মুক্তি পাচ্ছি না। নিজের বন্ধনে নিজে জড়িয়ে আছি। নাটকের সংলাপ উচ্চারণ করব না, এ-কথা ভাবলে কী হবে, তবু সেই একই মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় ঔরঙ্গজীবের রূপসজ্জায় অভিনয় করলাম আমি।

১৯৫৩ সালের ডায়েরীতে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে রেখেছিলাম, আমার ক্লান্তির কথা, অবসাদের কথা।

ক'দিন বাড়ীতে বেশ সানন্দেই ছিলাম ভানুকে নিয়ে। কিন্তু তারও আবার সাগরপারে যাবার সময় হল। ১৮ই জানুয়ারী এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে কলকাতা থেকে জুরিখ যাত্রা করল সে। পরদিন দুপুরে তার ফোন পেলাম। জুরিখ থেকে সে তার পৌঁছনোর সংবাদ দিলে।

জানুয়ারী মাসের বাকি দিনগুলো একরকম কাটল। তবে শেষের দিকে একটা বিশেষ খবর—দিল্লীতে ফাইন আর্টস্ আকাদমির উদ্বোধন। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বয়ং এর উদ্বোধক। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যে কলকাতা থেকে শিশিরবাবু, শচীনবাবু এবং আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। কিন্তু যেতে পারিনি। শচীনবাবু আকাদমির সদস্য মনোনীত হলেন, আর শিশিরবাবুকে ফেলোশিপ দেওয়া হল। কিন্তু শিশিরবাবু আকাদমিতে যোগ দেননি।

একটা কথা বলা হয়নি, জানুয়ারীতেই স্টারে অভিনয় হতে লাগল গিরীশচন্দ্রের জনা। ঐ নাটকে আমি বিদূষক চরিত্রে অংশ নিতাম্। এই সঙ্গে ঐতিহাসিক নাটক দুর্গাদাসও চলছিল।

এই পুরনো নাটকের ভিড়ে ছবি বিশ্বাস মিনার্ভায় একটি নতুন নাটক উপহার দিলেন। রচয়িতা মন্মথ রায়। নাটকটির নাম 'জীবনটাই নাটক'। নাটকের নামকরণটি বড় চমৎকার লাগল।

মার্চের প্রথম পৃষ্ঠায় কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে একটি মানুষের মৃত্যুর খবর, যে মানুষটি হলেন কলকাতার মেয়র নির্মল চন্দ্র। বাংলাদেশকে যাঁরা ভালবেসেছেন, নির্মলচন্দ্র তাঁদেরই একজন। বাংলাদেশের জনসেবার ক্ষেত্রে তিনি একজন নীরব সেবক। এছাড়া মঞ্চের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাঁর। একসময় আর্ট থিয়েটারের তিনি কর্তৃপক্ষস্থানীয় ছিলেন। নির্মলচন্দ্রের মৃত্যুতে সেদিন শহরে শোকের ছায়া নেমেছিল।

ক'দিন আগে ছবি বিশ্বাস মিনার্ভায় 'জীবনটাই নাটক' উপহার দিয়েছে। ক'দিন পরেই মিনার্ভায় ছবি বিশ্বাস 'ঝিন্দের বন্দী' অভিনয় শুরু করলে।

মিনার্ভায় 'ঝিন্দের বন্দী'র উদ্বোধন হল ৫ই মার্চ।

ঐদিনই আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কেমন যেন দুর্বল, অশক্ত মনে হল নিজেকে। স্নায়বিক দৌর্বল্য—এর আগেও মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে, কিন্তু এমন অসহায় অবস্থায় পড়িনি।

আবার ঐদিনেই ছিল শৈলজানন্দের কঙ্কাবতীর শেষ রিহার্সাল। জানালাম মহেন্দ্রবাবুকে, আমার পক্ষে নাটকে অংশ নেওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না।

তবু অংশ নিতে হল। শরীর অশক্ত, মন অবসর নিতে চায়—তবু মুক্তি নেই। নিজেকে এক কঠিন নিগড়ে বেঁধে ফেলেছি।

৬ই মার্চ উদ্বোধন হল কঙ্কাবতীর। মঞ্চে নামতে হল। তবে নিজেকে অবলম্বন নিতে হল—একটা লাঠি।

তবে কি এবারে সত্যিই বার্ধক্যের দরজায় এসে দাঁড়াচ্ছি? এ প্রশ্ন আমার মনে। কিন্তু আমার মন তো এখনো সতেজ। এখনো সবুজের নেশায় ভরে আছে। তবে দেহটা হয়তো জীর্ণ হয়ে পড়ছে। পড়বে বৈকি। দেহটা তো যন্ত্রের সামিল। কিন্তু যন্ত্রী আমিটা তো অন্যজন। তার বয়স নেই। বয়সের রেখা সেখানে পড়ে না।

যেদিন 'কঙ্কাবতী'-র উদ্বোধন হল, সেইদিনই অরোরার ছবি 'মুস্কিল আসান' মুক্তিলাভ করলো। সে ছবিতে আমিও অভিনয় করেছি।

শরীর অসুস্থ, তবু অভিনয় করে চলেছি। এদিকে চিকিৎসাও চলছে যথারীতি। কিন্তু মন চায় না যে আর অভিনয় করি। অথচ ছাড়তে পারছি না।

এরই মধ্যে একদিন ডাঃ রাম অধিকারী তাঁর এক অধ্যাপক বন্ধুকে নিয়ে আমার বাড়ীতে এলেন। নানাকথার পর আমাকে পরীক্ষা করলেন।

ডাঃ অধিকারী বললেন, আমি তো জানি আপনার নার্ভ যে-কোন মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। সুতরাং যেটুকু দুর্বলতা এটা কিছুটা পরিশ্রমের জন্যে।

সেদিন ডাঃ অধিকারী ব্যবস্থাপত্রও দিলেন আমার জন্যে।

'কঙ্কাবতী' তেমন জমলো না। মাঝে মাঝে অন্য নাটকও অভিনীত হচ্ছে স্টারে। ২রা এপ্রিল পদ্মিনী, আর ৯ই এপ্রিল 'দুর্গাদাস' অভিনীত হল। এই দু'টি নাটকে আমিও অংশ নিতাম।

দিনগুলো এই ধারায় চলছে। নতুনত্ব কিছু নেই। সেই পুরাতনের পথ ধরেই চলা। এ যেন আর ভাল লাগছে না। মনে হয়, সব ছেড়ে দিনকতক কোথাও ঘুরে আসি।

এইরকম যখন মানসিক অবস্থা, তখনই একটি মনের মতো খবর শুনলাম। আমার মেয়ে, জামাই, আর তাদের ডাক্তার বন্ধু দেবেশ মল্লিক সস্ত্রীক কাশ্মীর যাচ্ছে। শুনে স্থির থাকতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-জামাইকে জানালাম, তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব। সুধীরাও অবশ্য সঙ্গে থাকবে। সেই মতো টিকিট কাটাও হল।

আমার মন তখন বাইরে যাবার জন্যে উন্মুখ। তবু যে ক'টা দিন মাঝখানে আছি সে ক'দিন কিন্তু আমাকে যথারীতি অভিনয় করতে হবে।

এই দুর্বল শরীরেও 'মিশরকুমারী'র মতো নাটকে অভিনয় করতে হল। ঐ নাটকে আবন চরিত্রটি ছিল আমার। আমি তো জানি, ঐ চরিত্রটিতে যথাযথ রূপ দিতে কতখানি শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি নেই—অথচ মঞ্চে দাঁড়ালে কী এক শক্তির গোপন উৎসমুখ খুলে যায়। নয়তো অভিনয় করবো কেমন করে।

কিন্তু অভিনয় শেষে যখন আমি মঞ্চের বাইরে এসে দাঁড়াতাম—তখনই মনে হতো আমি দুর্বল, আমি অশক্ত। এই মঞ্চে অভিনয়, আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

স্টারে যোগ দিয়েছিলাম ক'মাস আগে। এবারে স্টার ছেড়ে যাবার পালা। কর্তৃপক্ষ ছাড়তে না চাইলেও আমাকে ছাড়তে হল।

আমাদের কাশ্মীর যাবার দিন আগে থেকেই ঠিক ছিল। ৫ই মে। দিনটি দেখতে দেখতে এসে গেল।

যেদিন কাশ্মীর যাব, ঐদিনই সংবাদপত্রে দেখলাম, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত মিনার্ভায় যোগ দিয়েছেন পরিচালক হিসাবে।

কাশ্মীর যাব—মনে তখন এই একটিই চিন্তা। আর একটি চিন্তা আমাদের সহশিল্পী ভূমেনের জন্যে। ভূমেন অসুস্থ, রোগটাও সামান্য নয়—সম্ভবতঃ টি. বি.—মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম ভূমেন যেন সেরে ওঠে।

৫ই মে আমরা কাশ্মীর রওনা হলাম। আমি, সুধীরা, কন্যা মীরা, জামাতা ডাঃ সন্তোষ বসু এবং সস্ত্রীক ডাক্তার দেবেশ মল্লিক। নাতনী গৌরীও সঙ্গে আছে।

পথে যখন চলি, দু'চোখ খুলে রেখে চলি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা ট্রেনের জানালায় বসে চলমান ছবি দেখতে দেখতে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

দিন গেল। রাত গেল। ৬ই মে-র সূর্য-ওঠা দেখলাম ট্রেনে বসে। প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে। সেদিনও গেল চলন্তি ট্রেনে। ৭ই মে একটু বেলা হতেই পৌছলাম পাঠানকোট স্টেশনে।

পাঠানকোটে ক্ষণিকের যাত্রা-বিরতি। কিন্তু বিরতির ক্ষণ কতটুকুই বা।

আবার আমাদের চলার সময় হল। এবারের পথ সমতলভূমি ধরে নয়, হিমালয়ের পাদদেশ ধরে জম্মু পেরিয়ে পাহাড়ের দুর্গম পথ ধরে কাশ্মীর উপত্যকা।

পথে জম্মুতেও কিছুক্ষণের জন্যে অবসর পেলাম। অবসরের ক্ষণটুকু ভরিয়ে নিতে চাই। যতটুকু দেখার দেখে নিই। শহরের প্রাণকেন্দ্রে বলদেওজীর মন্দির। দর্শন করলাম, কিন্তু দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখার অবসর কই! তবু সংক্ষিপ্ত অবসরটুকু পূর্ণ করে নিই।

হিমালয়ের পাদদেশে জম্মু শহর। শহরটাকে যেটুকু দেখেছি তাতে প্রাণচঞ্চল মনে হল।

জম্মু থেকে যাত্রা শুরু হল। উধমপুরের নাম শুনেছি। এবারে চোখে দেখলাম। এখানে সেনাবাহিনীর বিরাট ছাউনী রয়েছে।

উধমপুর পার হবার পরেই হিমালয়ের বিরাট রূপের কিছুটা চোখে পড়লো।

পথটি দুর্গম হলেও মনোরম। পথের একদিকে পাহাড়ের দেয়াল, অন্যদিকে গভীর খাদ। সবুজ সরলবর্গীয় বৃক্ষের সমারোহ পাহাড়ের অঙ্গ জুড়ে।

চল্‌তি পথে সন্ধ্যা নামলো। সবুজ বনভূমির রূপটা অস্পষ্ট লাগলেও এক বিচিত্র রূপে দেখা দিল। যেন প্রকৃতির ক্যানভাসে আঁকা জলরঙের ছবি।

একটানা চড়াই পথ ধরে চলেছি। চলার মুহূর্তগুলি সুদূর এবং রোমাঞ্চকর।

অবশেষে 'কুদ'-এ বাস দাঁড়াল। এখানেই আজকের মতো যাত্রা-বিরতি।

পাহাড়ের ওপর মনোরম এই কুদ। চারিদিকে পাহাড়ের হাতছানি, তারই মাঝে চল্‌তি পথের সরাইখানা। অনেকগুলো পাঞ্জাবী হোটেল রয়েছে,—যেখানে যাত্রীদের জন্যে সবরকমের খানাপিনার ব্যবস্থা।

হোটেল থেকে রাতের আহার গ্রহণ করে আমরা স্থানীয় ডাকবাংলোয় এলাম। এখানেই রাত কাটাতে হবে।

ক'দিনের ক্লান্তিতে দেহে অবসাদ জড়িয়ে আছে। রাত এগারটা বাজতে আমরা শয্যা গ্রহণ করলাম।

শুধু রাতটুকু। ভোরেই আবার কুদ ছেড়ে রওনা হবার পালা।

প্রাতরাশ সেরে যখন আমরা কুদ ছাড়লাম, তখন সকাল সাতটা।

এবারের পথ আরো দুর্গমে চলেছে। পথে একটি জায়গার নাম দেখলাম রামবান। যেখানে সামগ্রিক পরিবেশ জুড়ে রয়েছে সুরম্য বনভূমি।

এবারে আমাদের যেতে হবে বানিহালের সুড়ঙ্গপথ পেরিয়ে। এখন আমরা চলেছি সুউচ্চ বানিহাল পর্বতমালার ওপর দিয়ে।

মাঝে পড়ল 'চিনাব' নদীর তীরে ক্ষুদ্র অধিত্যকা। তারপর আবার সেই চড়াই পথ ধরে ওঠা।

বানিহাল টানেলের মুখে কিছুক্ষণের জন্যে বাস দাঁড়াল। আমরা প্রায় ন'হাজার ফুট ওপরে এসেছি। এখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে লক্ষ্য করি। দেখি, যদি কোথাও চোখে পড়ে 'স্বর্ণ ঈগলের' বাসা। শুনেছি হিমালয়ের এই সব অঞ্চলে স্বর্ণ ঈগলের সন্ধান পাওয়া যায়।

যদিও থাকে, তবে তারা কি মানুষের আসা-যাওয়ার পথের ধারে থাকবে? তারা নিশ্চয়ই আছে কোন নিরাপদ, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। মানুষের পায়ের চিহ্ন যেখানে পড়ে না।

এবারে বানিহাল সুড়ঙ্গপথে আমাদের বাস ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো। দীর্ঘ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। ওপর থেকে অহরহ জল চুঁয়ে পড়ছে। ঠিক যেন বৃষ্টি ঝরছে। হেডলাইট জ্বেলে বাস চলেছে—ধীর গতিতে। কেমন যেন গা-ছমছম করে এই সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করার সময়ে। সুড়ঙ্গপথ পেরিয়ে এলাম। পথের পরিবেশ এবং পটভূমিকা মুহূর্তে বদলে গেল।

ওপর থেকে বিহঙ্গ দৃষ্টিতে দেখলাম, নীচে রমণীয় উপত্যকা। মনে হল, কে যেন একটি চিত্রায়িত সবুজ কার্পেট ছড়িয়ে রেখেছে। এবারে আমাদের পথ উৎরাই ধরে নেমে গেছে উপত্যকার সন্ধানে। অবশেষে উপত্যকার পথে নেমে এলাম। সমতল পথ চলে গেছে বিরি, সফেদ বৃক্ষের বিন্যাস দু'পাশে রেখে।

পথের দু'পাশে দৃষ্টিপাত করি। সবুজ ফসলের ক্ষেত, ফলের বাগান, ছায়াঘন চিনার বৃক্ষ, তারপর মাঝে মাঝে জনপদ, বসতি। দূরে দৃষ্টি দিই, যেখানে হিমালয়ের স্বপ্ন জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুদূর ছুটে এসে আমরা রাজধানী শ্রীনগরে এসে পৌঁছলাম।

আমরা উঠব মিস্টার কে. রায়ের বাসভবনে। সুতরাং সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত। আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন রায়-দম্পতি। সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের। আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি রাখেননি রায়-দম্পতি। মুহূর্তে ভুলে গেলাম পথের কষ্ট। মনেই হল না আমরা দূরদেশে এসেছি। শ্রীনগরে মিস্টার রায়ের বাসভবনে এসে একটি কথাই মনে হল, যেন আমরা কোন আপনজনের কাছে এসেছি।

চিরকাল আমার ওই এক স্বভাব। কোথাও এলে বিশ্রামের কথা ভুলে যাই। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না। ক্ষণ-বিশ্রামের পর বেরিয়ে পড়লাম। যে ঝিলমের কথা শুনেছি, সেই ঝিলম চোখে দেখলাম। এই ঝিলমের ধারার সঙ্গে ভারত উপ-

মহাদেশের ইতিহাসের অনেককিছু ধারা প্রবাহিত হয়েছে। ঝিলমের তীরে বাঁধের ওপর নিবিড় বৃক্ষ-বিন্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সুসজ্জিত হাউস-বোটগুলোকে। দেখলাম, ভাসমান শিকারা। হাউস-বোট আর শিকারা—এই দুয়ের মধ্যে কাশ্মীরের শুধু বিশিষ্টতা নয়, বৈচিত্র্যও মিশে রয়েছে। ঝিলমের তীরে ইতস্ততঃ বেড়িয়ে ফিরে এসেছি নির্দিষ্ট আশ্রয়ে। দ্বিতীয় দিনের সকাল থেকে আরম্ভ হল কাশ্মীর দেখার পালা।

ভোর হতে চা-পানের পর বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই গেলাম ঝিলমের তীরে। ঝিলমের তীরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, দূরে তুষারাচ্ছাদিত গিরি-শিখর। দেখলাম, বিস্তৃত হিমালয়ের প্রচ্ছদপট।

দেখলাম, শহরের প্রাণকেন্দ্র ডাল হ্রদের তীরে শঙ্কর পর্বত। ভারত-ঋষি শঙ্করাচার্যের স্মৃতিবিজড়িত শঙ্কর পর্বতের ওপরে রয়েছে মন্দির। সোপান বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। ওপরে ওঠা আজই হল না। তবে ইচ্ছে রইলো। এলাম ডালের তীরে। রমণীয় ডাল হ্রদ—হাউস-বোট আর শিকারার ভিড়। দেখলাম, এপারে ওপারে নানা বৃক্ষের বিন্যাস। ডাল-এর তীরে মহারাজার প্রাসাদ। রাজকীয় প্রাসাদ। যেদিকে তাকালেই মনে পড়ে কয়েকটি বছর আগের কথা। যেদিন ওই প্রাসাদকে ঘিরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবা-খেলা বসেছিল। এখনও সে খেলার শেষ হয়নি। তবে সেদিনের মতো সে উত্তেজনা আজ আর নেই।

ডাল-এর রূপের তুলনা নেই। তবে এ রূপের মধ্যে প্রসাধনের চিহ্নটা সুস্পষ্ট। মানুষের হাতের ছাপ পড়েছে—কৃত্রিমতার চিহ্ন সেখানে। তবু ভাল লাগে, তবু মনে হয় দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকি ডাল-এর পারে—আর কিছু না হোক, একটু তৃপ্তি তো পাব। কাশ্মীরকে বলা হয় ভূস্বর্গ। আমি তা বলতে চাই না। তবে এটুকু বলবো, কাশ্মীরের রূপের তুলনা নেই। যুগে যুগে কাশ্মীর উপত্যকাকে মানুষ নানা অলঙ্কারে সাজিয়েছে। এখনো চলেছে তার সাজানোর পালা। কাশ্মীরের রূপের মধ্যে কোথাও বৈরাগ্যের চিহ্ন নেই। কাশ্মীর যেন নানা অলঙ্কারে ভূষিতা বনিতা—যে যেমন ভাবে পারে, তার মনোরঞ্জন করতে চেয়েছে।

তাইতো কাশ্মীরকে এমন করে কাছে পাওয়ার বাসনা মানুষের। আমিও তার বাইরে নই।

যে ক'দিন থাকব, অবসর পেলেও অবসর যাপন করবো না। দেখবো ঘুরে ঘুরে যা-কিছু দেখার। মনের মধ্যে তার ছবি এঁকে নেব।

ঐতিহাসিক মোগল উদ্যানগুলো দেখলাম। নিশাতবাগ, শালিমারবাগ; দেখলাম

চশমাশাহী, দেখলাম টাঙ্গমার্গ। টাঙ্গমার্গ পেরিয়ে গেলাম সবুজ পাহাড়ের চড়াই পথে গুলমার্গ। ভাল লাগল গুলমার্গের রমণীয় পরিবেশ। দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখলাম পাইনের বন, দেখলাম মরশুমী ফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহ। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই, যেখানে মন্দির নেই। কাশ্মীরের ক্ষীরভবানী মন্দিরের প্রসিদ্ধির কথা শুনেছি, দেখলাম। পূজো দিলাম, প্রসাদ গ্রহণ করলাম। রাজধানী শ্রীনগরের যা-কিছু দর্শনীয় দেখেছি। তবু মনে হয় যেন দেখার শেষ নেই। সবচেয়ে সুন্দর লাগতো ডাল-এর বুকে সন্ধ্যা কাটান। শিকারায় চেপে ডাল-এর বুকে ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ান—মনে হত যেন কোন স্বপ্নলোকে বিহার করছি।

আরো ভাল লাগত যখন ডালের তীরে কোন নির্জন ভূমিখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতাম পাইনের মর্মরধ্বনি, মনে হ'ত স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে তা এখানে। এই কাশ্মীরে।

মানুষের মন তো, স্বপ্ন সেখানে থাকবেই। স্বপ্ন বাদ দিয়ে জীবনকে চিন্তা করা যায় না।

আমি তো দেখেছি—বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন বস্তুবাদী মন নিয়ে জীবনকে চেয়েছি, তখন সে-চাওয়ার মধ্যে সব পেয়েছি, কিন্তু আনন্দ খুঁজে পাইনি। আমার যা-কিছু আনন্দ, সে যেন স্বপ্নের মধ্যে। আমার স্বপ্নলোকের চাবিটি খুঁজে পাই পরিচিত পরিবেশের বাইরে এলে। আর এরই জন্যে বোধহয় এমনি করে ছুটে চলার নেশা।

শ্রীনগর থেকে একদিন এলাম পহলগাঁও-এ।

নতুন করে বিস্মিত হলাম পহলগাঁও-এর সৌন্দর্য-সুষমা দেখে। লীডারের পাহাড়ের পাদদেশে রমণীয় পহলগাঁও। এক নজর দেখলাম। পীর পাঞ্জালের পাদদেশে সাগরপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাত হাজার ফিটের ওপরে এই রমণীয় অধিত্যকা পহলগাঁও। পহলগাঁও-এর অর্থ নাকি মেষপালকদের গ্রাম।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখলাম চারদিকে পাহাড়ের প্রচ্ছদপট, চিনার আর পাইনের বন। সবচেয়ে সুন্দর লাগে লীডারের দিকে তাকালে। অজস্র উপলখণ্ডের মধ্যে দিয়ে চঞ্চলা লীডার ছুটে চলেছে। হয়তো ওরও মনে সাগরের নেশা! কিন্তু আমার দু'চোখে কীসের নেশা? হয়ত ভালবাসার নেশা। প্রকৃতি এখানে যেন আমার পরমা।

পহলগাঁও থেকে গেলাম চন্দনবাড়ী। হিমালয়ের বিরাট রূপ যেখানে আরো স্পষ্ট। চন্দনবাড়ীই শেষ জনপদ। এখানে আরণ্যক পরিবেশে কয়েকটি রমণীয় বাংলো রয়েছে। যেখানে ভ্রমণ-বিলাসী মানুষ এসে আশ্রয় নেয়। এই চন্দনবাড়ী হয়েই চলে গেছে অমরনাথের পায়ে চলা পথ। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম, সামনে পিস্থু ঘাঁটির সেই

চড়াইপথ। শ্রাবণী পূর্ণিমার প্রাক্কালে যে চড়াই পথ পেরিয়ে স্বামী অমরনাথের উদ্দেশে চলে যাত্রীর মিছিল।

যত আগ্রহ-ই থাক, এখন তো উপায় নেই অমরনাথ যাবার। তবু চন্দনবাড়ীর পথের ধুলো মাথায় নিয়ে ভাবলাম, এই আমার তীর্থদর্শন, এই আমার পথের সম্বল। একটি বরফের সেতুও পেরিযে এলাম ওপারের পাহাড়ে। তারপর একটি পাথরখণ্ড কুড়িয়ে ফিরে এলাম।

চন্দনবাড়ী ত্যাগ করে আবার ফিরে এলাম পহলগাঁও-এ।

পহলগাঁও থেকে আবার শ্রীনগর।

আসা-যাওয়ার পথে দেখেছি অবন্তীপুর, দেখেছি কোকরনাগ, দেখেছি মার্তণ্ড মন্দির। ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত আরো কত শহর, জনপদ দেখেছি। দেখেছি যা কিছু দেখার। ফিরে এসেছি শ্রীনগরে। কিন্তু ফিরে যাবার সময় তো হল—সুতরাং এবার ফিরে যাওয়ার চিন্তা।

দূরদেশে এলে জীবনে যেন নতুন উপলব্ধি আসে। জানি না এটা ক্ষণিকের কিনা। হোক না ক্ষণিকের, তবুও এই ক্ষণটুকু তো সত্যি। কিন্তু উলারে এসে সবচেয়ে আনন্দ পেলাম। মনে হল সুন্দর যদি কিছু থাকে তবে তা এখানে।

যে পথ ধরে এসেছিলাম সে পথে নয়, বিমানে এলাম পাঠানকোট।

কোথাও আসতে যত আনন্দ, আবার ফিরে যেতে তত বেদনা। পথের যত আনন্দ-সঞ্চয় সবই তো পথেই ফেলে যেতে হয়। সঞ্চয় তো কিছুই থাকে না। শূন্য পাত্র পূর্ণ করে নিই পথের সঞ্চয়ে। আর সে সঞ্চয় কখন যেন পথেই হারিয়ে যায়। ফিরে আসি আরো শূন্যমনে।

কিন্তু ভ্রমণে এখনো পূর্ণচ্ছেদ পড়েনি। এখনো বাকি রয়েছে অমৃতসর যাওয়া। সেখানে স্বর্ণমন্দির দেখবো, আর দেখবো শহীদতীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ।

অমৃতসরের কথা শুনেছি, পড়েছি—কিন্তু চোখে দেখা এই প্রথম।

মন্দিরের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে একনজরে চারিদিকের পরিবেশ লক্ষ্য করলাম। ভাল লাগলো। এবারে ভিতরে যাবার পালা। ভিতরে যাবার আগে জুতো খুলে রাখতে হল। তারপর হাত-পা ধুয়ে, হাতে রুমাল জড়িয়ে, এগিয়ে চললাম মন্দিরের দিকে। এখানকার বিধি এই। মুক্তহস্তে মন্দির-প্রবেশ নিষিদ্ধ।

প্রথমে পরিক্রমা করলাম অমৃতসাগর। এটি কৃত্রিম জলাশয়। জলাশয়ের চারিদিকে প্রশস্ত পথ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারপর ঐতিহাসিক স্বর্ণমন্দির দেখার পালা। যে স্বর্ণমন্দিরের কথা শুনেছি, পড়েছি—আজ শিখতীর্থ সেই স্বর্ণমন্দির প্রত্যক্ষ

করলাম। এখানে বিগ্রহ নেই। 'গ্রন্থসাহেব' এখানে দেবতা। প্রথম থেকেই মনে কৌতূহল ছিল, পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিংহের স্মৃতির কোন নিদর্শন এখানে দেখতে পাব কিনা। পেলাম না তেমন কিছুর সন্ধান। স্বর্ণমন্দির দর্শনান্তে এসেছি ভারতের মুক্তিতীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখতে। অপরিসর পথ ধরে গেলাম সেই চিহ্নিত স্থানটিতে, যেখানে মিশে আছে ভারতের মানুষের রক্ত। আর যে রক্তে লেখা আছে শাসক ইংরেজের কলঙ্ককথা। জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতের আর এক তীর্থ। বিগ্রহ যেখানে ভারতের নর-দেবতা। প্রার্থনা যেখানে স্বাধীনতার শপথ-মন্ত্রে। অঞ্জলি যেখানে আত্মদানে। জালিয়ানওয়ালাবাগ, যেখানে একদিন ইংরেজের নির্মম বুলেট এসে বিঁধেছিল নিরস্ত্র ভারতবাসীর বুকে। সেদিন যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই হিংস্র বর্বরতায় বোধহয় পশুও লজ্জা পায়।

মনে মনে ভারতের মুক্তিতীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা ভেবেছি—আজ সেই তীর্থ দর্শন করে ধন্য হলাম।

দেখলাম, দেয়ালে সেই নির্মম বুলেটের ক্ষতচিহ্ন, দেখলাম সেই অন্ধকার ইঁদারা, —নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মানুষ। দাঁড়িয়ে রইলাম। কান পেতে শুনলাম ইতিহাসের কান্না। উপলব্ধিতে স্পষ্ট শুনেছি সেদিনের কণ্ঠস্বর। নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধের মিলিত কণ্ঠস্বর—'আমাদের রক্তে তোমরা শপথ নাও, ভারতের মুক্তির। তোমাদের মুক্তিতে আমাদেরও মুক্তি।'

কী ভাবছো?

সচকিত হয়ে আমি ফিরে তাকালাম। সুধীরা ডাকছে। মীরাও রয়েছে তার মায়ের পাশটিতে।

জালিয়ানওয়ালাবাগে এসেছি যখন, তখন আকাশ থেকে আগুন ঝরছে। দেখলাম, ছোট ছোট গাছগুলির সবুজ পাতা ঝলসে গেছে প্রচণ্ড দাবদাহে। দেখলাম, চারদিকের পরিবেশ জুড়ে কেমন যেন তৃষ্ণার আবহাওয়া।

এর পরেই এলাম রামবাগে। যেখানকার জল শুধু সুপেয়ই নয়, টনিক বিশেষ। সেই জল পান করলাম।

রামবাগ থেকে এসেছি অমৃতসর স্টেশনে। স্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল।

স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে বসে মনে মনে ক'দিনের হিসেব করছিলাম। কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি, আবার কোথায় যাব?

কিন্তু যাবার ঠিকানা তো একটাই। জীবনে যতই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাই, ততই তো ঘরের চৌহদ্দিতেই বার বার ফিরে যেতে হয়। তবু ভাল লাগে

এই বাধা-বন্ধনহীনভাবে ছুটে চলতে। এর মধ্যে জীবনকে আর একভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। ফিরে যেতে হবে সেই পুরনো পরিবেশে। ফিরে যেতে মন চায় না। যে বিহঙ্গ একবার আকাশে ডানা মেলেছে, সে কি আর খাঁচায় যেতে চায়! কিন্তু আমি তো বিহঙ্গ নই। আমি মানুষ। আমার নির্দিষ্ট নাম আছে, নির্দিষ্ট ঠিকানা আছে —যে নামে আমার পরিচয়, যে ঠিকানায় আমার আশ্রয়। চিন্তায় ছেদ পড়লো। ডাউন অমৃতসর মেল প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফিরে এসেছি কলকাতায়। সেই পুরনো ঠিকানায়। পথের ক্লান্তিতে দেহ আচ্ছন্ন। বাড়ী ফিরে আজ আর কোন কাজ নয়, নিশ্চিন্তে বিশ্রাম।

কিন্তু বিশ্রাম চাইলে কি পাওয়া যায়? দুপুরের পর ফোন এল। বিজয় ফোন করছে। রাসবিহারী সরকার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বললাম, আজ কোন কাজ নয়, কথা নয়—বরং আগামীকাল কথা হবে। রাসবিহারীবাবুকে জানিয়ে দিও, কাল যেন আসেন।

পরদিন। ডায়েরীর পাতায় সেদিনটি চিহ্নিত ১৮ই মে বলে। সেদিন রাসবিহারী-বাবু এলেন। সঙ্গে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত আর সীতানাথ মুখার্জী। ওঁরা আমাকে নতুন করে থিয়েটারের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে চাইলেন। কিন্তু আমি নাটক বা থিয়েটারের ব্যাপারে আজকাল তেমন উৎসাহ পাই না। তবে সেকথা বাইরে বলার নয়। সেটা আমার মনের কথা। অথচ আমি তো জানি, আমি এখন ছুটি চাই—নিজের কাছে ফিরে যেতে চাই। দিনের সঙ্গে আমার মানসিক চেহারা অনেক বদলে গেছে। হয়তো আরো যাবে।

ঐদিনে মিঃ এন. সি. গুপ্ত এলেন। এঁর পরিচয় বোধহয় আগেই দিয়েছি কোন সময়, কথা-প্রসঙ্গে। মিঃ গুপ্ত থিয়েটারে অনেক সময় অর্থ লগ্নী করতেন।

মিঃ গুপ্ত তাঁর কথার মধ্যে একসময় বললেন, আপনার ছেলের সঙ্গে জুরিখে আমার আলাপ হয়েছিল। বড় ভাল আপনার ছেলে।

যাই হোক, বাড়ীতে ফিরে আসার পরেই আবার পুরনো কথা, পুরনো পরিবেশের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম।

এর ক'দিন বাদে ২১শে মে স্টারে মহেন্দ্র গুপ্তের নতুন নাটক 'রাজনর্তকী'-র শুভ উদ্বোধন হল। কিন্তু এ-সম্পর্কে আমাকে মহেন্দ্রবাবু কিছু জানাননি। তাঁর কাছ থেকে একটা ফোন অন্ততঃ আশা করেছিলাম। তবে স্টারের অনিল বসু আমাকে ফোন করে মহেন্দ্রবাবুর অসুবিধের কথা জানিয়েছিলেন।

মে মাসের শেষদিকে শিশিরবাবুর ভাই হৃষীকেশ ভাদুড়ী আমাকে ফোন করলেন

শ্রীরঙ্গম থেকে। জানালেন, পরদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অথচ কারণ কিছুই বললেন না।

পরদিন ২৯শে মে হৃষীকেশবাবু এলেন। যে কথা ফোনে বলেননি সেকথা সাক্ষাতে বললেন।

শ্রীরঙ্গমে শিশিরবাবু 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। তাঁর ইচ্ছে আমি ঐ-নাটকে রমেশের ভূমিকায় অভিনয় করি।

একটু চিন্তা করে বললাম, শিশিরবাবু আমাকে ডেকেছেন—এ তো আনন্দের কথা। কিন্তু— বলে চুপ করে গেলাম।

হৃষীকেশবাবু বললেন, কোন কিন্তু নেই। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।

বললাম, ঠিক আছে, বড়বাবুকে জানাবেন আমি অভিনয় করবো।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার শিশিরবাবু থিয়েটার জগতে 'বড়বাবু' নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাদের সবার কাছে বডবাবু।

বলা বাহুল্য শ্রীরঙ্গমে পর পর দুদিন 'প্রফুল্ল' অভিনীত হয়েছিল। শিশিরবাবুর সঙ্গে অনেকদিন বাদে আবার একসঙ্গে মঞ্চে নামলাম।

সেদিন ১লা জুন। ইস্ট এণ্ড ফিল্মসের ছবির কাজে স্টুডিও-য় গিয়েছিলাম। ছবির নাম ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে একটা কথা মনে আছে, সেদিন স্টুডিও-ফ্লোরে একটি নতুন মেয়েকে দেখেছিলাম, যার নাম সুচিত্রা সেন।

অনেকদিন পরে একটি মুখের রেখায় সম্ভাবনার আভাস পেলাম, যদি নিষ্ঠা থাকে, তাহলে এ-মেয়ে একদিন চিত্রজগতের শিরোনামায় স্থান পাবে।

৩রা জুন তারিখটির মধ্যে বিশিষ্টতা আছে। ঐদিনেই শ্রীরঙ্গমে গেলাম। দেখা হল শিশিরবাবুর সঙ্গে। দীর্ঘদিন পরে দেখা। এক যুগ হয়ে গেছে। সেই ১৯৪০-এর প্রথমদিকে মিনার্ভায় 'মিশরকুমারী' অভিনয়ের মঞ্চে দেখা হয়েছিল, তারপর আজ এই দেখা। অথচ আমরা পরস্পরের কতো কাছের মানুষ।

দেখা হতেই পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে দু'জনের মনের সঞ্চিত আবেগ উজাড় করে দিলাম।

তারপর দু'জনের মধ্যে আরম্ভ হল অন্তরঙ্গ আলাপ।

৬ই জুন তারিখে শ্রীরঙ্গমে অভিনয় হল 'প্রফুল্ল'। দর্শকপরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সেদিনের অভিনয়ের কথা ভুলবার নয়। শিশিরবাবু অভিনয় করলেন যোগেশের ভূমিকায়। আর রমেশ চরিত্রটি ছিল আমার। নাম-ভূমিকার শিল্পী ছিল সরযূবালা। রেবা দেবী, নিভাননী, নিরোদা, ইন্দুবালা এরাও ছিল সেদিনের অভিনয়ে।

পরদিনও 'প্রফুল্ল' অভিনীত হল। সেদিনেও অগণিত দর্শকসমাগম হয়েছিল।

এরপর আবার শ্রীরঙ্গমে 'সাজাহান' অভিনীত হল ১৩ই ও ১৭ই জুন। দু'দিনে অজস্র দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল প্রেক্ষাগৃহ।

কী জানি কেন, নতুন করে যেন উৎসাহ পেলাম। মনে হল, এখনই ছুটি নয়, এখনই অবসর নয়—এখনো মঞ্চ আমাকে আকর্ষণ করে, এখনো মুক্তির প্রহর আসে নি।

শ্রীরঙ্গমে অভিনয় চলতে লাগলো। একই মঞ্চে শিশির ভাদুড়ী আর আমি। এছাড়া অন্যান্যেরা তো আছেনই।

অনেকে বলে থাকেন, শিশিরবাবুর সঙ্গে আমার বরাবর একটা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু তাঁরা জানেন না, আমাদের মধ্যে কতো নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তফাৎ যেটুকু ছিল, সেটুকু পারস্পরিক চিন্তার। বাইরে থেকে অনেকে যাকে দ্বন্দ্ব বলে মনে করতেন। কিন্তু এখানে আমি দ্বিধা না রেখেই বলতে পারি, আমাদের মধ্যে কোথাও দ্বন্দ্ব ছিল না। তবে দু'জনের মধ্যেই ছিল আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ। এখানেই ছিল আমাদের মিল, আর যত অমিল তাও এখানে।

বাংলাদেশ তথা ভারতের মানুষের কাছে ২৩শে জুন তারিখটি চরম দুঃখের। ঐদিনেই বাংলার বরেণ্য সন্তান, ভারতের জনপ্রিয় লোকনেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে অন্তরীণ অবস্থায় পরলোকগমন করলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু যেমন আকস্মিক, তেমনি বেদনাদায়ক। তাছাড়া এই মৃত্যুর মধ্যে সেদিন কি যেন রহস্যের গন্ধ পেয়েছিল মানুষ, যে রহস্য আজো ভারতবর্ষের একদল মানুষের মনে প্রতিভাত হয় আছে।

এর ক'দিন পরে ২৯শে জুন বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটি জ্যোতিষ্ক খসে গেল। ভূমেন রায় মারা গেল। ভূমেনের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের তো কমদিনের নয়। অনেকদিনের। একই সঙ্গে অভিনয় করেছি, একই সঙ্গে সুখ-দুঃখের অংশ নিয়েছি—কিন্তু আজ সে সব ছেড়ে চলে গেল।

এই প্রসঙ্গে বলবো, প্রথম জীবনে জাহাজী শুল্ক-বিভাগে চাকরী করত ভূমেন, পরে স্থায়িভাবে মঞ্চে যোগ দেয়। এবং আপন নিষ্ঠার জোরে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল অল্পদিনের মধ্যেই। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তার শান্তি ছিল না। আমি জানতাম, তার এই অশান্তি কেন। কিন্তু আজ সে-সব অশান্তির বাইরে চলে গেছে, আজ তো তার কাছে শান্তির অভাব নেই।

ভূমেনের মৃত্যুতে ব্যথা পেলাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরের কাছে, সে যেন স্বর্গে স্থান পায়।

বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন নাটক চলছে। চলতে হয় তাই চলা। নয়তো নতুন এমন কোন নাটক আসছে না, যা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

মহেন্দ্র গুপ্ত স্টার ছেড়ে চলে গেল। কেন সে-ই জানে। ভাবলাম হঠাৎ সে স্টার ছাড়লো কেন? তাছাড়া তখন সে করবেই বা কি। তবে একটা কথা বুঝেছিলাম, মহেন্দ্রের মধ্যে অস্থিরতা পেয়ে বসেছে।

চল্‌তি দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই, এক শ্রীরঙ্গমে চিরকুমার সভার অভিনয় ছাড়া। শিশিরবাবু নেমেছিলেন রসিকের ভূমিকায়, আর আমি ছিলাম চন্দ্রবাবুর চরিত্রে। কিন্তু কী জানি কেন, সেদিন নাটক তেমন জমেনি।

আজকাল প্রায়ই শিশিরবাবুর সঙ্গে অভিনয় করছি শ্রীরঙ্গমে। একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বড়বাবুর সঙ্গে।

এমনি করে দিন, মাস কাটছে। অভিনয় করছি। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছি না। মঞ্চের মায়া আর আমাকে ধরে রাখতে পারছে না। তবু যেদিন রথযাত্রার তারিখটি ছিল, আমার ব্যক্তিগত জীবনের তা স্মরণীয় দিন। তিরিশ বছর আগে আমি এই দিনটিতে প্রথম পেশাদারী মঞ্চে অভিনেতা রূপে যোগ দিয়েছিলাম। প্রথম নাটক ছিল অপরেশবাবুর কর্ণার্জুন। আর আমার ভূমিকা ছিল অর্জুনের।

মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। কিন্তু একবার কি ভেবে দেখেছি, তিরিশ বছরের পথ পিছনে পড়ে রয়েছে! যে পথে রয়েছে নানা ঘটনার স্মৃতি!

এতোর মধ্যেও সামনের দিকে তাকালে তেমন উৎসাহ পাই না। মনে হয়—আর অভিনয় নয়, এবারে জীবনে ফিরে যেতে হবে।

আর এই জীবনে যতো ফিরে যেতে চাই, ততোই যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আবার হারিয়ে-যাওয়া আমাকে নতুন করে আবিষ্কার করি।

এই যখন মানসিক অবস্থা, ঠিক সেইসময় নেপাল যাওয়ার চিন্তাটা মাথায় এল।

আমি নেপাল যাব শুনে অনেকেই নিষেধের বাণী উচ্চারণ করলেন। বিশেষ করে কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, আর ডাক্তার রাম অধিকারী বললেন, এই ঠাণ্ডায় নেপাল যাবেন? না যাওয়াই উচিত।

কিন্তু বাইরে যাওয়ার ডাক এলে আমি কোন বাধাই মানি না। আর একথাও ঠিক—বাইরে বেরোলে আমি যেন বদলে যাই। মনে হয় না আমি দুর্বল, আমি অশক্ত।

অক্টোবর মাসের ২৯ তারিখ সকালে আমি নেপালের উদ্দেশে দমদম

বিমানবন্দর থেকে রওনা হলাম। পথে পাটনায় ক্ষণিকের যাত্রাবিরতি। তারপর কাঠমাণ্ডুর পথে যাত্রা শুরু।

আগে থেকেই কংগ্রেসনেতা অতুল্য ঘোষের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে কাঠমাণ্ডুতে সামশের জং বাহাদুর রাণাকে পাঠিয়েছিলাম। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে নেপালের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এম. পি. কৈরালার কাছে গুরুত্ব দিয়েই বলা হয় যে, কলকাতা থেকে মিঃ অহীন্দ্র চৌধুরী আসছেন, তাঁকে যেন বিমানঘাঁটি থেকে সরাসরি সরকারী অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী মিঃ প্রধান, গৌচর বিমানঘাঁটি থেকে আমাদেরকে নিয়ে এলেন সরকারের অতিথিশালায়। সেই দিনই আমি তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, তিনি যেন আমার জন্যে সে ব্যবস্থাটুকু করেন।

প্রথম দিনেই দুপুর পর্যন্ত বিশ্রামের পর, চা-পানান্তে বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরুলাম। বেশি দূর নয়, এলাম বাগমতীর সেতু পর্যন্ত। দেখলাম কয়েকটি মন্দির—প্রতিটি মন্দিরের গঠনশৈলী এক। প্যাগোডার মতো।

আজ আর বেশী সময় নয়, সন্ধ্যে হতেই ফিরে এলাম।

ইচ্ছে ছিল পরদিন প্রথমেই শ্রীশ্রীপশুপতিনাথের মন্দিরে যাব দেব-দর্শন করতে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সবসময় সবকিছু হয় না। রাত্রেই ফোন পেলাম মিঃ প্রধানের কাছ থেকে, আগামীকাল সকালে প্রধানমন্ত্রী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

যাই হোক, পরদিন সকালে ট্যাক্সি করে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এলাম। প্রবেশপথেই সান্ত্রী আমাকে আটকাল। মুখে বললেও ওরা কিছু শুনলে না। শেষটা মিঃ প্রধানের কাছে আমার নামের কার্ড পাঠালাম। এবারে মিঃ প্রধান নিজে এলেন আমাকে ভিতরে নিয়ে যেতে।

ভিতরে এলাম। প্রশস্ত হলে রাজকীয় আড়ম্বরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এম. পি. কৈরালা উপবিষ্ট। তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু লোকজন। বুঝলাম, এঁরা সবাই শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি। ঘরে ঢুকবার সময় মিঃ কৈরালা একনজরে আমাকে দেখেছিলেন।

এবারে মিঃ কৈরালা উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে সানন্দে কাছে ডাকলেন। পাশেই একটি সোফা। বসতে অনুরোধ করলেন।

প্রথমেই চিন্তা হল, কী ভাষায় কথা বলব, ইংরেজী না হিন্দী? এমন সময় মিঃ কৈরালা পরিষ্কার বাংলায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রথম কথা—আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—না,— তারপরেই বললাম, বাঃ আপনি এত চমৎকার বাংলা বলেন !

মিঃ কৈরালা হেসে বললেন, আমি আপনাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। অনেকদিন কলকাতায় ছিলাম।

তারপর বেশ খানিক সময় কথাবার্তা বলে, বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে চলে এলাম মিঃ প্রধানের সঙ্গে।

অতিথিশালায় এসেই আবার সুধীরাকে নিয়ে মন্দিরে ছোটা।

ট্যাক্সি নিয়ে সরাসরি শ্রীশ্রীপশুপতিনাথের মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

জীবনে পশুপতিনাথের কথা কতবার শুনেছি। শুনেছি, হিমালয়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে ভারত ভূখণ্ড থেকে তীর্থযাত্রীদল শ্রীশগিরি, চন্দ্রগিরির চড়াই পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে আসে পশুপতিনাথ দর্শন করতে।

মনের মধ্যে চাপা কৌতূহল নিয়ে মন্দিরের তোরণ পেরিয়ে এলাম। সামনেই বিরাটকায় নন্দীবৃষ আর গরুড়স্তম্ভ—তারপরেই স্বর্ণশীর্ষ পশুপতিনাথের মন্দির।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি! দেবতা নয়—মন্দিরের দিকে। মন্দিরের কারুকার্য দেখে অভিভূত হতে হয়। তার ওপর রাজৈশ্বর্যের প্রলেপ জড়িয়ে আছে মন্দিরের সর্বাঙ্গে।

লক্ষ্য করলাম, পশুপতিনাথের গঠনশৈলী প্যাগোডা ধাঁচের। অবাক হয়ে দেখছি সব কিছু।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সুধীরার জিজ্ঞাসা, দেব-দর্শন করবে না?

—ও, হ্যাঁ। মুহূর্তে নিজেকে সহজ করলাম। —চলো।

মন্দিরে এলাম। দর্শন করলাম ভগবান পশুপতিনাথকে। যুগ যুগ ধরে মন্দিরে বিরাজ করছেন ভগবান। যাঁর দর্শন-মানসে কত যুগ যুগ আগে থেকে হিমালয়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে ছুটে এসেছে মানুষ। দর্শন করেছে দেবতা। কী পেয়েছে জানি না, তবু মানুষ এসেছে দেবতার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করতে।

আমরা করজোড়ে প্রণাম করেছি। পূজা দিয়েছি। কিন্তু কিছুই চাইতে পারিনি। সর্বরিক্ত দেবতার কাছে কী চাইব? চাইবার তো কিছু নেই। শুধু একটি কথাই বলতে চেয়েছি মনে মনে, হে ভগবান—তোমাকে বিশ্বাস করে যেন শান্তি পাই। আর কিছু নয়।

মন্দির দর্শনান্তে বাগমতীর কাছে এলাম। বাগমতীর ওপর দিয়ে সেতু। ওপারে যাবার পথ। ওপারে টিলা পাহাড় পেরিয়ে সতীপীঠ গুহ্যেশ্বরী। গুহ্যেশ্বরী এখানে ভৈরবী আর ভৈরব পশুপতিনাথ।

সিঁড়ি-পথ দিয়ে টিলায় উঠতে হয়। টিলার ওপরে গোরক্ষনাথজীর মন্দির শুধু নয়, আরো ছোট-বড় মন্দির। কেমন যেন শূন্যতা এইসব মন্দিরের পরিবেশ জুড়ে।

এসেছি গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে। পূজা দিয়েছি। দর্শন করেছি দেবীকে। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীদেহের গুহ্যদেশ পড়েছিল এখানে।

মন্দিরের দেশ নেপাল। এতো মন্দির, এতো দেবতা কোথাও দেখিনি। আর প্রতিটি মন্দিরের গঠনশৈলী একই ধাঁচের। একমাত্র ব্যতিক্রম পাটনের কৃষ্ণজী মন্দির, আর স্বয়ম্ভূ মন্দির। স্বয়ম্ভূ মন্দিরের আর এক নাম 'বোধনাথ'।

দেখেছি কাঠমাণ্ডু ঘিরে যত শহর আর জনপদ। অবাক বিস্ময়ে দেখেছি, আর একটি কথাই ভেবেছি, দেশটা এখনো অতীতের ঐতিহ্যের কথা ভুলতে পারেনি। সর্বত্র প্রাচীনত্বের ছাপ আর অতীতের গন্ধ। ভাল কি মন্দ জানি না, তবে একটা কথা ঠিক—যদি প্রাচীনত্বের মধ্যে কোনকিছু বৈচিত্র্য থাকে, তবে সে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাবে নেপালে।

হিন্দু সংস্কৃতি, বিশেষ করে তন্ত্রের পীঠভূমি নেপাল। যদিও এখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি এমন নয়। তবুও হিন্দুত্বের ছাপটাই এখানে সুস্পষ্ট।

কতো মন্দির দেখেছি। তার মধ্যে শহর থেকে দূরে দক্ষিণা কালীর কথাটাই আগে মনে পড়ে। এখানে ডিম পর্যন্ত পূজা দেওয়া হয়। এর মধ্যে আমি নির্বিকারত্বের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছি।

আর একটি মন্দির—দেবতা যেখানে ভদ্রকালী, সেটি শহরের প্রাণকেন্দ্রেই অবস্থিত। মন্দির বলতে প্রশস্ত চত্বরের মধ্যে চতুষ্কোণ জায়গায় ছোট একটি মন্দির। সেখানে অধিষ্ঠিতা ভদ্রকালী। যেখানে প্রতিদিন সকালে ও রাত্রে দেবীর উদ্দেশে নানা ধরনের ভক্তিগীতি এবং রাগ-সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সকালে এই সঙ্গীতের আসরে আমি প্রায় নিয়মিতভাবে একবার যেতাম।

মন্দিরের মধ্যে বালাজু মন্দিরের প্রসিদ্ধি আছে। পাহাড়ের পাদদেশে এই মন্দিরটি। এখানে জল-শয্যায় শায়িত নীলকণ্ঠের বিশাল মূর্তি—দেবতার প্রতীক।

মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির শহর থেকে বেশ দূরে—ভাতগাঁও-এ। আর এই মন্দিরে যাওয়ার পথটি অত্যন্ত বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ ধরেই গাড়ী চলে। 'নাথ-পন্থী' সম্প্রদায়ের অন্যতম পীঠ এই মচ্ছেন্দ্রনাথ। এই সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলাদেশেও বেশ কিছু আছেন। গোরক্ষনাথজী এঁদের ধর্মগুরু।

কাঠমাণ্ডুর প্রতিটি মন্দির দেখেছি, দেখেছি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি। শহরের হনুমান ঢোকা, উপকণ্ঠে ললিতপুর বা পাটন, ওদিকে ভকতপুর—সবই দেখেছি।

দেখেছি ললিতপুরের প্রাচীন দরবার-গৃহ। যার কারুকার্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। তাছাড়া সবচেয়ে আকর্ষণীয় এইসব প্রাচীন ভবনগুলির সুদৃঢ় কারুকাজ। কতদিন গেছে, ইতিহাসের কত উত্থান-পতন, তবু তার মধ্যেও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো দিনের এইসব মন্দির, ভবন, আর প্রাসাদ !

পুরনো দিনের অনেক নিদর্শন দেখা যায় মিউজিয়মে। যেখানে অতীত ইতিহাসের অনেক স্মৃতি বর্তমান।

তন্ত্রের দেশ নেপালে কালীপূজা দেখলাম। মহাসমারোহে তন্ত্রমতে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় এদেশে। এই শুভ দিনটিতে পশুপতিনাথের মন্দিরে গেলাম দেব-দর্শন করতে। এদিনে দেখলাম দেবতার শৃঙ্গার বেশ। বহুমূল্য রত্নখচিত নানা অলঙ্কারে ভূষিত দেবতা। জানি না, সর্বত্যাগী শঙ্করকে এ বেশে মানায় কিনা। তবুও দেখলাম। দেখলাম শয়নারতি। তারপর এলাম বাগমতীর তীরে, যেখানে অন্ধকারের মধ্যে সন্ন্যাসীদের ধুনি জ্বলছে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে গেলাম 'সুন্দরী' জল-ঝর্ণা দেখতে। শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে এই সুন্দরী জল-ঝর্ণা। যেখান থেকে কাঠমাণ্ডু শহরে জল সরবরাহ করা হয়।

এইদিনে যাওয়ার পথে লক্ষ্য করলাম নেপালের প্রতিটি জনপদ, গ্রাম যেন উৎসবে মেতেছে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া রূপ নিয়েছে সার্বজনীন লোক-উৎসবের। ছেলেমেয়েরা মালা পরেছে, কপালে দিয়েছে চন্দনের টিপ—পথ চলছে গান গাইতে গাইতে। এ উৎসব যেন এক খুশীর উৎসব। তারপর জায়গায় জায়গায় দেখলাম দোলনা তৈরী করা হয়েছে। দোলনায় দোল খাচ্ছে ছেলেমেয়েরা—হাসছে, গান গাইছে। নেপালের প্রতিটি ঘরে উৎসবের স্পর্শ।

সুন্দরী জল-ঝর্ণা এলাকা সংরক্ষিত। কারণ, এখান থেকে শুধু জল সরবরাহ হয় না, বিদ্যুৎও সরবরাহ করা হয় শহরে। তবুও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাকে কিছুটা দেখার সুযোগ করে দিলেন।

শহরে, শহরের বাইরে যা-কিছু দর্শনীয়, প্রায় সবই তো দেখা হল। বাগমতী পেরিয়ে গ্রামীণ পরিবেশে টিলার ওপর লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির, তা-ও দেখেছি। যত মন্দির, যত-কিছুর সন্ধান পেয়েছি সবই দেখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু নেপালে আমায় যদি কিছু মুগ্ধ করে থাকে, তবে তা হল এর প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, আর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। শহরে, জনপদে দেখেছি ইতিহাসের চিহ্ন, আর দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখেছি হিমালয়ের প্রচ্ছদপট। দেখেছি তুষারমৌলী গিরিশিখর, দেখেছি সবুজ

অরণ্য, দেখেছি পার্বত্য নদী, ঝর্ণা। আর দেখেছি, উপত্যকার পথে ফসলের ক্ষেত, দেখেছি পরিশ্রমী চাষী কেমন করে পাহাড়ের গায়ে সব্জী ফলায়, দেখেছি দেহাতী কাঠুরিয়া দূরের পাহাড়ে থেকে কেমন করে কাঠ বয়ে আনে শহরে।

কিন্তু রাজধানী কাঠমাণ্ডুর বাইরের ঐশ্বর্য দেখে মন যতই ভরুক না কেন, তার চেয়ে অধিক বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। দারিদ্র্যের এমন নির্মম চেহারা যেখানকার সাধারণ সমাজে, সেখানে মুষ্টিমেয় পরিবারের ঐশ্বর্যের প্রকাশে কী আসে যায়!

সাধারণ মানুষের দীর্ঘশ্বাস হয়তো একদিন নেপালের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে বিস্ফোরণ ঘটাবে।

কাঠমাণ্ডুর দিন ফুরিয়ে এল। এবারে ফিরে যাবার পালা।

নভেম্বরের শীতের সকালে গৌচর বিমানঘাঁটি থেকে আমরা পাটনার পথে রওনা হলাম। ঐদিনই বিকালে পাটনা থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম।

কলকাতায় ফেরার পরদিনই ঋষি ভাতুড়ীর ফোন পেলাম। সবে বাইরে থেকে ফিরছি—নাটকের কথায় মন নেই, তবু আবার নাটক নিয়েই কথা আরম্ভ হল।

বাইরে থাকলে সবকিছু ভুলে থাকা যায়। কিন্তু ফিরে এলে আবার সেই নানা ঘটনার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা।

যাত্রাজগতের নামকরা অভিনেতা এবং সুখ্যাত নাট্যকার ফণী রায় মারা গেল ১৭ই নভেম্বর। 'বান্ধব সমাজ'-এ সে অভিনয় করতো। একসময় অনেক যাত্রার পালাও সে রচনা করেছে।

পরদিন ১৮ই নভেম্বর, শ্রীরঙ্গমে এলাম। শিশিরবাবুর সঙ্গে সেদিন অনেক কথা হল। আমার কাছ থেকে নেপালের কথা আগ্রহ নিয়ে শুনলেন। তারপর শিশিরবাবু বললেন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের সঙ্গে জাতীয় রঙ্গশালা নিয়ে আলোচনার কথা। এ ব্যাপারে শিশিরবাবুর দৃঢ় মত—সরকার কখনো নাট্যশালার চিন্তাকে রূপ দিতে পারবে না। তবে কথা হচ্ছে হোক।

আমিও এ-বিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করি। শিশিরবাবুকে সে কথা বললামও। জাতীয় রঙ্গশালার এই পরিকল্পনা, পরিকল্পনা হয়েই থাকবে।

যাই হোক, শিশিরবাবুর সঙ্গে শ্রীরঙ্গমে বিভিন্ন নাটকে অংশ নিচ্ছি। কখনো 'সাজাহান', কখনো 'রঘুবীর' কিংবা অন্য কোন নাটক—যার আকর্ষণ আছে।

একই মঞ্চে শিশিরবাবু আর আমার অভিনয়—এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় এবং নাট্যামোদী মহলে নানা ধরনের আলোচনা প্রকাশিত হতে লাগল। কারণ আর কিছু নয়—শিশির ভাদুড়ী আর অহীন্দ্র চৌধুরী, একই নাটকে একই মঞ্চে অভিনয় করা, এ-

রকম ঘটনা আগে খুব বেশী ঘটেনি। বরং আমরা যেন সাধারণের কাছে বিপরীত শিবিরের অভিনেতা হয়ে উঠেছিলাম। এ-সম্পর্কে আমার কথা, আমরা একই শিবিরের, আমাদের একই পরিচয়—অভিনেতা। তবে উভয়ের মত আলাদা হলেও পথ আলাদা নয়, ধর্মও আলাদা নয়।

শ্রীরঙ্গমে থাকতে প্রায়ই শিশিরবাবুর সঙ্গে নানা ধরনের সুখ-দুঃখের কথা হ'ত। শিশিরবাবুর সঙ্গে কথা হওয়া মানে, মঞ্চ কিংবা নাটক নিয়ে। আমাদের দু'জনেরই তো নাটকঅন্ত প্রাণ। এই সময়ে কতো কথা হত। মনে আছে, শিশিরবাবু তখন চোখে কম দেখতেন, অথচ অভিনয়ের সময়ে মঞ্চে এসে দাঁড়ালে কে বলবে যে, উনি চোখে কম দেখেন। এক-একদিন পর্দা পড়লে, ওঁকে বেশ অসুবিধেয় পড়তে হত। দেখতাম, হয়তো ওঁকে হাত ধরে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক সময় কেউ দাঁড়িয়ে থাকত না। তবে তার জন্যে কারো ওপর উনি অনুযোগ করতেন না।

মনে আছে, সে রাত্রে রঘুবীর নাটকের অভিনয় ছিল। রঘুবীর চরিত্রটিতে শিশিরবাবুর অভিনয় ছিল অসাধারণ। আমি করতাম অনন্তরাও। রঘুবীর চরিত্রে শিশিরবাবু যে দরদ দিতেন, তার তুলনা মেলে না। কিন্তু আজকাল বেশ কষ্ট হয় তাঁর। তবুও করেন। মঞ্চে দাঁড়ালে অভিনেতার জীবনে যেন এক শক্তি এসে ভর করে! যাই হোক, এই অভিনয়ের সময়ে মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন, ব্রাদার—দেখছো, দৃশ্যপটগুলোর অবস্থা। কী যে কষ্ট হয় আমার। কিন্তু কী করব। মনের জোর আছে বলেই চলছি। এক-একদিন বলেছি, এই দুরূহ চরিত্র আর করেন কেন? বলেছেন, কী করবো। এছাড়া যে দর্শক হবে না। তাই মৃত্যুপণ করে অভিনয় করি।

তারপর আরো কত কথা হত এই সময়। প্রায়ই অভিনয়ের অবসরে আমরা কথায় বসতাম। কত কথা। যেগুলো এখনও মনের মধ্যে বাজে।

জীবন গাঙ্গুলী সে আমলের নামকরা অভিনেতা। বিরাট প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন। মারা গেলেন ২৮শে ডিসেম্বর। অনেক দিন থেকেই টি. বি.-তে ভুগছিলেন। তারপর ছিল অর্থাভাব। যদিও নানাভাবে সাহায্য তুলে তাঁকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তবুও কোন ফল ফলল না। হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হল।

জীবন গাঙ্গুলীর মৃত্যুতে ব্যথা পেয়েছিলাম সেদিন। আর এ ব্যথার মুহূর্ত তো আমার জীবনে কম আসেনি। আমি তো দেখছি, চোখের সামনে দিয়ে এক-এক করে কত জন চলে গেল। কিন্তু আমি বসে আছি, যেন তাদের স্মৃতি বহন করার জন্য।

নানা রঙের দিনের মধ্যেও কত বেদনার রঙ। তবু তার মধ্যে দিন ঠিকই কেটে যায়।

বছরের যে ক'টা দিন বাকি ছিল কেটে গেল। শেষ হল ১৯৫৩। বছরের শেষ দিনটিতে বসে বসে একটি কথাই ভাবছিলাম, কবে আমার নাটক নিয়ে খেলা শেষ হবে। আমি আর পারছি না। অভিনয় তো অনেক করেছি, আর কেন?

নতুন বছর যে এমনি দুঃসংবাদ দিয়ে শুরু হবে, এ কী আগে ভেবেছিলাম!

আমার নট-জীবনের আচার্য তিনকড়ি চক্রবর্তী পরলোকগমন করলেন ২রা জানুয়ারী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

তিনকড়িদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যজগতের এক অধ্যায়ের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র যেন ছিন্ন হয়ে গেল। মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা, ভবানীপুরের সেই বান্ধব সমাজের যাত্রাভিনয়ের কথা, যেখানে আমার অভিনয়-জীবনের শুরু। তারপর বান্ধব সমাজ থেকে তিনকড়িদার সঙ্গে আর্ট থিয়েটারে যোগ দেওয়া, এবং মঞ্চে অভিনয় শুরু—সবই মনে পড়ে।

তিনকড়িদার মৃত্যুতে আমি দারুণ মর্মাহত হয়েছিলাম।

পরদিনই আর এক দুঃসংবাদ—আমার শ্বশ্রূমাতার মৃত্যু। খবর পেয়েই ছুটে গেলাম শ্বশুরালয়ে। শবানুগমন করে এলাম কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। শেষকৃত্য সমাপনান্তে ফিরে এলাম ভারাক্রান্ত মনে।

সময়ের সঙ্গে সব দুঃখই মানুষ ভুলে যায়। কিন্তু সাময়িকভাবে সে-দুঃখ যেভাবে জড়িয়ে থাকে, তাতে বড় কষ্ট হয়।

কিন্তু নট-জীবনের আনন্দ বোধহয় বাইরের সব দুঃখকষ্টকে দূরে সরিয়ে দেয়।

আমার নট-জীবনের শেষ অধ্যায় চলেছে। এখন মনস্থির করে ফেলেছি এবারে অবসর নেব।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন শ্রীরঙ্গমে 'চন্দ্রগুপ্ত', আর স্টারে সমারোহের সঙ্গে 'শ্যামলী' অভিনীত হচ্ছে। শ্যামলীর অন্যতম আকর্ষণ উত্তমকুমার আর সাবিত্রী চ্যাটার্জি। এরই মধ্যে অভিনেতা রবি রায় যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। তারই কাছে 'শ্যামলী'-র সাফল্যের কথা শুনলাম।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের অন্যতম সৃষ্টি 'বলিদান'। 'বলিদান' নতুন করে শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হল। যাতে করুণাময় চরিত্রে ছিলেন শিশিরবাবু স্বয়ং, আর আমি ছিলাম রূপচাঁদের ভূমিকায়।

আগেই বলেছি এ বছরটা শুরু হয়েছে দুঃসংবাদ নিয়ে। আবার মর্মান্তিক

দুঃসংবাদ পেলাম ২১শে জানুয়ারী। নাট্যকার-অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হওয়াতেই তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু। চোখের সামনে দেখছি, এক-এক করে কতজন চলে যাচ্ছে। কত পরিচিত মুখ আজ হারিয়ে যাচ্ছে মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলো থেকে। কিন্তু আমরা যারা আছি, তারা এদের স্মৃতিভার বহন করবো জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

জীবনে পরিচিত মানুষদের হারিয়ে কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হয়। মনে হয়, আমারও থাকার অধিকার যেন ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু তো থাকতে হবে। ছুটি চাইলেও তো ছুটি পাওয়া যায় না। এই তো মনে করছি অভিনয়জগৎ ছেড়ে যাব, তা-ই বা পারছি কই! কতজন জীবনের মঞ্চ ছেড়ে অন্য জগতে চলে যাচ্ছে।

ছেড়ে যাব বলছি, অথচ অভিনয় করছি বিভিন্ন নাটকে। কখনো 'মিশরকুমারী', কখনো 'ভোলা মাস্টার', কখনো অন্য কোন নাটক।

এরই মধ্যে পশ্চিম বাংলার প্রচার-অধিকর্তা প্রকাশস্বরূপ মাথুরের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। চিঠিতে জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

২৩শে এপ্রিল রাইটার্স বিল্ডিংসে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে গেলাম। সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন প্রকাশস্বরূপ মাথুর, জহর গাঙ্গুলী, চীফ সেক্রেটারী এস. এন. রায়, ডঃ ডি. এম. সেন। এখানে ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু হল। ডাঃ রায়ের ইচ্ছা, সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির আঞ্চলিক সংস্থা গঠিত হোক কলকাতায়। আর নাটক-শাখার দায়িত্বটা যাতে আমি গ্রহণ করি, সে অনুরোধও এল। ডাঃ রায়ের ইচ্ছায় আপত্তি করলাম না। তারপর ডাঃ রায় জানালেন নাট্যশিক্ষার জন্যে একটা পাঠক্রম তৈরীর জন্য। আর সে দায়িত্বও আমার ওপরই পড়লো।

সেদিন ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলোচনান্তে বাড়ী ফিরেছি। ভাবলাম, হয়তো এবারে সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি উপলক্ষ করে অভিনয়জগৎ ছাড়তে পারবো।

এরই মধ্যে আকাদেমির জন্যে নাটকের সিলেবাস তৈরী করে প্রচার-অধিকর্তা মাথুরের কাছে দিলাম। তার ক'দিন বাদেই আবার একদিন রাইটার্সে গেলাম মাথুরের কাছে। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর এবং অমলাশঙ্কর। সেদিন নানা আলোচনার মধ্যে নাট্যচর্চার জন্যে অধ্যাপক নিয়োগ সম্পর্কে কথা হল। ঠিক হল সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করা হবে। সে দায়িত্বটাও আমার ওপর।

যাই হোক, আকাদেমির প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল। ভালই

হল, এবারে আকাদেমি নিয়ে পড়বো। এতদিন ধরে মঞ্চজগৎ ত্যাগ করবো ঠিক করেছি, এবারে সত্যি ত্যাগ করতে পারব।

আজকাল মাঝে মাঝে নানা অনুষ্ঠানেও আমাকে যোগ দিতে হয়। সেদিন ১লা আগস্ট দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় গিরিশ-তর্পণ অনুষ্ঠানে গেলাম। যে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বর্ষীয়সী অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরী, যিনি গিরিশচন্দ্রের কাছে অভিনয়ে হাতেখড়ি নিয়েছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক ডঃ হেমেন দাশগুপ্ত ছিলেন অন্যতম বক্তা।

সেদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে। 'আমি কি ভাষণ দেব, ভাবিনি। অথচ ঠাকুরকে স্মরণ করে ভাষণ শুরু করেছিলাম। নিজেই বুঝতে পারিনি, কোন্ প্রেরণায় সেদিন অমন ভাষণ দিতে পেরেছিলাম! সত্যি, সেদিন আমি মনে মনে ভেবেছিলাম, কোন ঐশী প্রেরণা ভিন্ন এ-ধরনের ভাষণ আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

অনুষ্ঠান আজকাল লেগেই আছে। ক'দিন বাদেই আবার ল্যান্সডাউন রোডে ইউ. এস. এ. থিয়েটার আর্টসের প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা-সভায় আমাকে যেতে হল। যেখানে সভাপতি ছিলেন ডঃ কালিদাস নাগ।

মাথার মধ্যে আকাদেমির চিন্তাটাই তখন বড। তবুও নাটকের ভাবনা নেই এমন নয়। বেশ বুঝতে পারছি এবারে সত্যিই অভিনয়জগতের সঙ্গে আমার বন্ধনটা শিথিল হয়ে আসছে।

তবুও মঞ্চের খবর রাখি বৈকি। স্টারে 'শ্যামলী'-র দ্বি-শততম অভিনয়-রজনীর স্মারক অনুষ্ঠান হল ২৫শে আগস্ট। তার পরদিনই ছিল ভারতলক্ষ্মীর 'রাজপথ' চিত্রের মহরৎ। যে মহরৎ অনুষ্ঠানে চিত্রজগতের অনেকের সঙ্গেই দেখা হল।

অভিনেতৃ-সঙ্ঘের মিটিং ছিল বসুশ্রী সিনেমায়। মিটিং-এ নানা আলোচনার মধ্যে রাজ্যপালের যক্ষ্মা-আরোগ্যত্তর নিকেতনের সাহায্যার্থে, ভেটারন বনাম অভিনেতৃ-সঙ্ঘ ফুটবল ম্যাচের বিষয় আলোচনা হল। প্রস্তাবিত ফুটবল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ১৮ই সেপ্টেম্বর।

সেদিনের চ্যারিটি ম্যাচে অতীতের ফুটবলজগতের অনেক দিকপাল উপস্থিত ছিলেন। সুধীর চ্যাটার্জি ছাড়াও, পুরাতন দিক্‌পাল খেলোয়াড়দের আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এই চ্যারিটি ম্যাচে সংগৃহীত হয়েছিল চোদ্দ হাজার, ছ'শ দু' টাকা। যে টাকাটা রাজ্যপালের যক্ষ্মা-আরোগ্যত্তর নিকেতনের তহবিলে দেওয়া হয়েছিল।

বেশ কিছুদিন পর আবার একটা ভ্রমণসূচী তৈরী হল। এমন কিছু দূরে নয়—হাজারীবাগ যাওয়াই ঠিক হল। ১৬ই অক্টোবর রাঁচী এক্সপ্রেস যোগে রওনা হলাম। দলটিও খুব ছোট নয়; সপরিবারে চলেছি।

রামগড় পৌছলাম পরদিন ১৭ই অক্টোবর। ঐ দিনেই হাজারীবাগ।

একটি মনোরম বাংলো আমাদের আশ্রয়। এই হাজারীবাগের বাংলোয় অমৃতবাজার পড়তে গিয়ে একদিন নজরে পড়লো একটি খবর—যেখানে সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে একটি সংবাদ। পড়লাম, উদয়শঙ্কর নিযুক্ত হয়েছেন 'ডীন অব ড্যান্স'। আর আমার নামও প্রকাশিত হয়েছে, ওই একই বিশেষণ নিয়ে। 'ডীন অফ ড্রামা'।

বাইরে এসে কোথাও স্থির থাকতে পারি না। যেটুকু সময়, ভরিয়ে নিই ঘুরে বেড়িয়ে। যা-কিছু দেখার সবই দেখি। এতো দেখি, তবু হয়তো অনেক কিছু অদেখা থেকে যায়।

তিলাইয়া বাঁধ, রামগড রাজের প্রাসাদ প্রভৃতি আরো অনেক-কিছু দেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে চারদিকের পাহাড় আর অরণ্যকে। এই আরণ্যক পরিবেশে কোন পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও একটা অব্যক্ত আনন্দ মিশে থাকে, যে-আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

জীবনে আমি এমন একটা জগৎ বেছে নিয়েছিলাম কর্মক্ষেত্র হিসেবে—যেখানে সবই আছে, শুধু আপনাকে আত্মস্থ করার অবসর নেই। অথচ নিজের মধ্যে নিজেকে দেখার একটু অবসর—এই তো খুঁজে বেড়িয়েছি সারা জীবন। এই অবসর যদি কোথাও পেয়ে থাকি, তবে তা জনকোলাহলের বাইরে, হয় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্রে, না হয় কোন আরণ্যক পরিবেশে।

নানা জায়গায় বেড়াই। হাজারীবাগ এসে কাছেপিঠে যতটুকু দেখার, দেখলাম। বোকারো দেখতে গেলাম একদিন, আধুনিক বিশ্বকর্মার বিরাট কর্মযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করলাম।

কিন্তু এত-র মধ্যেও নতুনত্বের স্বাদ পেলাম 'নরসিংহ স্থান' মেলায়। হাজারীবাগ থেকে মাইল তিনেক দূরে একটি গ্রামের মন্দিরকে ঘিরে এই মেলা উপলক্ষে দূর-দূর গ্রাম থেকে অজস্র নর-নারী আসে। বিচিত্র এই মেলার চরিত্র। সর্বত্র যেমন, এখানেও তেমন। মেলার সর্বাঙ্গীণ চেহারার মধ্যে সঙ্গতির চেয়ে অসঙ্গতিই যেন বেশী। তাই বোধ হয় মেলা এমন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে আমাদের কাছে।

হাজারীবাগ থাকতে একদিন গয়া গেলাম। গয়াতে এসে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-

তর্পণ না করলে নয়। আমিও ফল্গু-নদীর তীরে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণাদি করলাম।

এতদিন শুনে এসেছি রাজরোপ্পার ছিন্নমস্তা মন্দিরের কথা। এবারে দর্শনের সুযোগ পেলাম। দামোদরের ওপর, ভেরা নদীর ধারে বিখ্যাত ছিন্নমস্তার মন্দির। শুনেছি, দেবী এখানে জাগ্রতা।

রামগড গোলা রোড হয়ে আমরা সদলে এসেছি দেবী ছিন্নমস্তার মন্দিরে। দর্শন করেছি দেবী—পূজা দিয়েছি, গ্রহণ করেছি দেবীর প্রসাদ। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম পাহাড়ের পটভূমিকা। দেখলাম, গভীর ঘাসের ভিতর দিয়ে প্রবল কলোচ্ছ্বাসে জলপ্রপাতের জল ছুটে চলেছে। সত্যি, এখানেই মানায় দেবী ছিন্নমস্তাকে।

দেবী ছিন্নমস্তাকে নিয়ে নানা কাহিনী লোকমুখে ছড়িয়ে আছে। সে-সব কাহিনীর অবতারণা এখানে করতে চাই না—তবু মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, আমরা যেন এক কিংবদন্তীর রাজ্যে এসে সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে এসে পৌঁছেছি।

হাজারীবাগের দিন ফুরিয়ে এল। হয়তো কলকাতা থেকে বাবুলালজীর তার না পেলে আরো কয়েকটা দিন থাকতাম।

কিন্তু আর থাকার উপায় নেই। এখনো নির্মীয়মাণ ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আছি —না গেলে তো চলবে না।

১৭ই নভেম্বর হাজারীবাগ থেকে রওনা হয়ে পরদিন কলকাতায় এসে পৌঁছলাম।

আবার সেই পুরনো পরিবেশ, আবার সেই দৈনন্দিন জীবনের জের টেনে চলা।

তবু একটা বৈচিত্র্য খুঁজে পেলাম আকাদেমি নিয়ে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীর জন্যে। দরখাস্তও এসেছিল। তাদের ইণ্টার-ভিউ নেওয়া হল ২০শে নভেম্বর।

পরদিন সকালে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, বীরেন ভদ্র, সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি এলেন আমার বাড়ীতে। প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটল নানা গল্পে।

আজকাল এ-ধরনের বৈঠকী গল্প মন্দ লাগে না। কিন্তু গল্প করে কাটাবার মতো সময় কই! সামনে তো কাজের দিন পড়ে রয়েছে।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করতে রাজভবনে যেতে হল ২৭শে নভেম্বর।

বোম্বে এবং কলকাতার শিল্পীদের নিয়ে একটি ক্রিকেট খেলার আয়োজন চলছে, উদ্দেশ্য রাজ্যপালের তহবিলে সাহায্য।

আবার ঐদিনেই লোকরঞ্জন-শাখার জন্যে কয়েকজনের ইণ্টারভিউ নেওয়া হল। সেখানে আমি ছাড়াও পঙ্কজ মল্লিক এবং মাথুর উপস্থিত ছিলেন।

এ-সবের মধ্যেও ছবির কাজ আছে। শ্রীমতী পিকচার্সের 'দেবত্র' ছবির শুটিং ছিল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। শিল্পীদের মধ্যে কানন দেবী এবং গুরুদাসও ছিলেন।

অভিনেতা শরৎ চাটুজ্যের জীবন এভাবে শেষ হবে, এ স্বপ্নেরও অতীত। মৃত্যু তার আকস্মিক, কিন্তু দুঃখ তাব জন্য নয়,—দুঃখ তার জীবনের শেষ দিনগুলোর জন্যে।

শরতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল নিবিড। তাকে তো দেখেছি, মানুষ হিসেবে সে ছিল সাধারণ মানুষের চেয়ে বড। বিশেষ করে তার হৃদয়-মনের ব্যাপ্তি ছিল অনেকখানি। স্বার্থপরতা ছিল না এমন কথা বলবো না, কিন্তু হীন স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে সে কখনো চলেনি। নিজে থিয়েটার করেছে, মালিক হয়েছে, অনেক গর্বও করেছে —কিন্তু যত না রোজগার করেছে তার চেয়ে খরচ করেছে অনেক বেশী। ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করা দূরে থাক. হয়তো ভবিষ্যতের কথা ভাবেওনি। আর তারই জন্যে হয়তো এই পরিণতি।

যে মানুষ ছিল থিয়েটারের মালিক, অভিনেতা,—যে দামী গাডী ভিন্ন চড়তো না, দামী পোশাক ছাড়া পরতো না, খরচ করতো দু' হাতে—সেই মানুষ শেষটা যাত্রা করতে আরম্ভ করেছিল আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে।

আর মরবার আগের রাত্রেও সে যাত্রাভিনয় করে ভোরে বাডী এসেছিল। বাডী ফেরার কিছুক্ষণ বাদেই মানুষটা আচমকা ফুরিয়ে গেল!

শরতের মৃত্যুর খবর পেলাম স্টুডিও-য় বসে। মনটা খারাপ হল। শিল্পী-জীবনের এমন মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি কোন শিল্পীই কামনা করে না। বিলাসের মধ্যে, প্রাচুর্যের মধ্যে যার দিন কেটেছে, তার জীবন শেষ পর্যন্ত কাটলো চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। আর এই দারিদ্র্যই বোধ হয়, তাকে এমনভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

বছরটা শেষ হতে আর ক'দিনই বা বাকী। বাকী দিনগুলোব কথা আর কি বলবো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা, অভিনেতৃ সঙ্ঘ—এ সব নিয়েই কাটলো। এর মধ্যে দু'টি ছবির কাজ অবশ্য করেছি, ছবি দুটো ভারতলক্ষ্মীর 'রাজপথ' আর শ্রীমতী পিকচার্সের 'দেবত্র'।

শেষ হল উনিশ শ' চুয়ান্ন। নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে স্বাগত জানালাম প্রতিবারের মতো।

বছরের প্রথম দিনটিতে অনুরোধ এল মহেন্দ্র গুপ্তের কাছ থেকে। মহেন্দ্রবাবু মিনার্ভা নিয়েছেন। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' অভিনয়ের আয়োজন করছেন। মহেন্দ্রবাবু এলেন আমার কাছে। অনুরোধ, আমি যেন মিনার্ভায় যোগ দিই।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি আর পারবো না অভিনয় করতে।' আমার কথা আমি জোরের সঙ্গেই বললাম। নতুন করে আর নিজেকে জড়াতে চাই না, যেটুকু জড়িয়ে আছি, তা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছি।

মহেন্দ্রবাবু চলে গেলেন। এ ব্যাপারে মণিলালবাবুও আসতে চেয়েছিলেন আমার কাছে। আমি বারণ করলাম।

আর অভিনয় নয়, আর পারবো না। এবারে নতুন করে জীবনকে দেখতে চাই। জানি না আমার সে আশা পূর্ণ করতে পারবো না কিনা। কিন্তু আশা নিয়েই তো মানুষ বাঁচে। আমি তো তার বাইরে নই।

তবুও নাট্যজগতের খবর রাখি। শুনলাম, শিশিরবাবু শ্রীরঙ্গমে 'মিশরকুমারী' করছেন ; আর তিনি অভিনয় করছেন আবনের ভূমিকায়। কিন্তু 'মিশরকুমারী' ক'দিন চলেই বন্ধ হল। আবার ঐ একই নাটক মিনার্ভায় অভিনীত হল মহেন্দ্রবাবুর পরিচালনায়। সেখানে আবনের ভূমিকায় আছেন মহেন্দ্রবাবু।

ভারত-চীন সুহৃদ সমিতির সহ-সভাপতি ছিলাম আমি। সুতরাং চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের কলকাতা আগমন উপলক্ষে আমার কাজ কিছুটা বাড়লো বৈকি।

চীনা প্রতিনিধি দল হাওড়া স্টেশনে এলে তাঁদের স্বাগত জানাতে আমাকেও যেতে হয়েছিল। সেদিন তারিখ ছিল ৬ই জানুয়ারী। ঐদিনই কলকাতার মেয়র নরেশ মুখার্জী চীনা প্রতিনিধি দলকে পৌর সম্বর্ধনা জানালেন। সেখানে আমাকেও উপস্থিত থাকতে হয়েছিল।

পরদিন ৭ই জানুয়ারী চীনা প্রতিনিধিগণকে সম্বর্ধনা জানালো চীনা কন্সাল অফিসে। সেখানেও কলকাতার শিল্পীগোষ্ঠীর অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অর্ধেন্দু মুখার্জী, সুপ্রভা মুখার্জী, জহর গাঙ্গুলী, বিকাশ রায়, সরযূবালা, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত প্রমুখ ছিলেন।

চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলকে আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। আর প্রতিটি অনুষ্ঠানেই আমি উপস্থিত ছিলাম।

অভিনেতৃ-সঙ্ঘ যে চীনা প্রতিনিধিগণকে সম্বর্ধিত করেছিল, সেখানে শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে অভিনীত হয় শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা'। নাটকে আমি ছিলাম গোলাম হোসেন, আর নাম-ভূমিকায় ছিলেন ছবি বিশ্বাস।

পুরনো দিনের কথা লিখতে বসলে সব-কিছুর যেন খেই হারিয়ে যায়! ছোট বড় কত ঘটনা দিনপঞ্জীর পাতায় পাতায়। তার মধ্যে কতক লিখি, কতক লিখি না।

'শ্যামলী' সে সময়ের একটি মঞ্চসফল নাটক। ঐ নাটকটির তিনশত রজনীর স্মারক অভিনয় অনুষ্ঠিত হল ১৫ই জানুয়ারী। ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ তারিখে আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে ললিতকলা আকাদেমির উদ্যোগে 'হাঙ্গারীর লোকশিল্প' প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল। এখানেই লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় আমার সঙ্গে অধ্যক্ষ রমেন চক্রবর্তীর আলাপ করিয়ে দিলেন। শ্রীচক্রবর্তী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ।

দিল্লীতে যে ফিল্মস্ সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে, তাতে বাংলাদেশ থেকে যোগ দেবার কথা ছিল ছবি বিশ্বাসের। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাকেই যেতে হল।

বাইরে যাবার নামেই আমি মানুষটা যেন বদলে যাই। দিল্লীর পথে রওনা হলাম ২৪শে ফেব্রুয়ারী। আমি একা নই—চলেছি সপরিবারে। এ-ছাড়া আছেন দেবকী বসু, সৌরীন সেন ছাড়া আরো অনেকে। পথে মথুরা দর্শন করলাম। বৃন্দাবনও বাদ গেল না।

তীর্থস্থানে এলে সুধীরা তো কোন মন্দিরই বাদ দেয় না। বৃন্দাবনে যত মন্দির সর্বত্র গেল। দেবতা দর্শন করলো। আমিও এ-সবের বাইরে নই। তবুও সুধীরার সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক তফাত। ও যখন দেবতার কাছে করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করে, হয়তো আমি তখন মন্দিরগাত্রে কোন শিল্প-নিদর্শন দেখতে ব্যস্ত।

যাই হোক, যেতে হবে দিল্লী। সুতরাং তীর্থের আকর্ষণে আর বসে থাকা নয়।

দিল্লীর স্টেশনে পৌছতেই সেমিনার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমাদের স্বাগত জানানো হল, কিন্তু সবকিছুর মধ্যে আসল ব্যাপার হল ভাবের আদান-প্রদান।

আগ্রায় এলেই মনটা কেমন একটা ব্যথায় ভরে যায়। হয়তো দু'এক ফোঁটা জলও ঝরে পড়ে চোখ দিয়ে। মুহূর্তে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। মনে হয়, আমি অহীন্দ্র চৌধুরী নই—বৃদ্ধ সাজাহান, আগ্রা দুর্গে বন্দী। জীবনে আমার একমাত্র সান্ত্বনা ওই প্রেমের মন্দির তাজমহল। হয়তো সাজাহানের ব্যথাটা নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছিলাম বলেই বোধ হয়, আমার নাটকের সাজাহান ব্যর্থ হয়নি। আমি তো জানি, মঞ্চে সাজাহান অভিনয় করতে কখনো মনে হয়নি আমি অভিনয় করছি, মনে হয়েছে সত্যিই আমি ভারতসম্রাট সাজাহান।

যাক সে কথা। আগ্রায় এসে উঠেছি আগ্রা হোটেলে। হোটেল থেকে তাজমহল স্পষ্ট দেখা যায়।

দেখলাম ইতিহাসের স্মৃতির স্বাক্ষর। আগ্রা এবং তার আশেপাশে যা-কিছু দর্শনীয়—দেখেছি। দেখেছি আগ্রা ফোর্ট, সেকেন্দ্রা, দেখেছি মৃতনগরী ফতেপুর সিক্রী। ফতেপুর সিক্রীতে গেলে মনটা কেমন প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। মনে হয়, কোথাও প্রাণের উত্তাপ নেই, চারদিক জুড়ে শুধু ইতিহাসের ব্যর্থ কান্না।

আগ্রার দিন ফুরিয়ে এল। ১১ই মার্চ আমরা আগ্রা থেকে রওনা হলাম কলকাতার পথে।

কলকাতায় এসেই আবার সেই নানা কাজের মধ্যে দিন কাটানো। আর ভাল লাগে না এত কাজ। তবু একেবারে তো কাজের বাইরে যেতে চাইছি না। থিয়েটার-সিনেমা ছাড়তে চেয়েছি, হয়তো শীগ্‌গির ছেড়ে দেব। তখন সময় কাটানোর জন্যে অন্য কোন কাজ চাই তো। তাই আজকাল আমার নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর্বটা বেড়ে গেছে।

থিয়েটার সেণ্টার এক নাটোৎসবের আয়োজন করলে। আমাকে ভাষণ দিতে হল অনুষ্ঠানে। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করলেন অনুষ্ঠানের।

নীহারবালা সে আমলের বিখ্যাত অভিনেত্রী। মঞ্চে তার জুড়ি ছিল না। কী অভিনয়ে, কী নাচে, কী গানে—মঞ্চে সে ছিল অদ্বিতীয়া। নীহারবালার মৃত্যুর খবর আমরা কেউই সহজভাবে নিতে পারিনি। নীহারবালার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে আমলের একটি যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

যে নীহারবালা জীবনে অভিনয়কে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল, যে অভিনেত্রীরূপে খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছিল—সেই অভিনেত্রী একদিন শুধু মঞ্চ ত্যাগ করে নয়, একেবারে সমাজ-সংসারের বাইরে চলে গিয়েছিল। তার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে। অভিনেত্রী নীহারবালার মৃত্যু হল আশ্রমিকারূপে। পণ্ডিচেরীর আশ্রমের পবিত্র পরিবেশেই তার শেষনিঃশ্বাস পড়ে।

আমরা কলকাতায় বসে সে খবর পেলাম। দূর থেকে স্বর্গতা শিল্পীকে স্মরণ করলাম।

সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির পশ্চিমবঙ্গ শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় বাংলা নববর্ষে। সেদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ করে বাংলা দেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এর মধ্যে একদিন রাজভবনে শেক্সপীয়র সোসাইটির একটি সভা হয়। রাজ্যপাল উপস্থিত ছিলেন সেদিনের সভায়।

'কঙ্কাবতীর ঘাট' সে আমলের বিখ্যাত নাটক। এইটিই চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল,

যেটিতে আমি মিঃ মুখার্জীর চরিত্রে রূপ দিয়েছিলাম। জীবনে যে-সব চরিত্রে রূপ দিয়ে আনন্দ পেয়েছি, এইটি তার মধ্যে অন্যতম। চিত্রটি কলকাতায় মুক্তি পেল ১২ই আগস্ট।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ডাকনাম হাবুল। আর সেই নামেই সে থিয়েটার মহলে পরিচিত। পরিচিত মানুষটি হারিয়ে গেল, কিন্তু নামটা হারিয়ে যাবার নয়। হাবুল একসময়ে মঞ্চে যোগ দিয়েছিল প্রম্প্টার হিসাবে, পরে অভিনেতা হিসাবে নাম করে। সে ছিল প্রত্যেকের কাছে প্রিয়। এই সবার প্রিয় মানুষটির মৃত্যু-সংবাদ পেলাম ১২ই আগস্ট তারিখে।

জীবনের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে এক-এক করে কত জন চলে যাচ্ছে। যাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি মঞ্চে, রং মেখেছি, সংলাপ উচ্চারণ করেছি—তারা যখন চলে যায়, তখন নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবি, আমাকে আর কতকাল এখানে থাকতে হবে। কিন্তু যাব বললেই তো আমি পালিয়ে যেতে পারবো না। ডাক যতদিন না আসবে, আমাকে থাকতে হবে। তবে একটা ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। অনেকদিন থেকেই মনে করছিলাম মঞ্চ ছেড়ে দেব, ছেড়ে দেব অভিনয় করা—এবার সত্যি বোধহয় অভিনয় জগতের বাইরে আসতে পারবো। এতদিন মঞ্চে আমার পরিচয় ছিল অভিনেতা। পরিচয় হারিয়ে যায়নি, তবে আগে মঞ্চে দাঁড়াতাম অভিনয়ের সাজে, আজকাল মঞ্চে দাঁড়াতে হয় বক্তা হিসাবে। এক দিনের অভিনেতা, অন্য দিনের বক্তা। আর এই বক্তৃতার মঞ্চ 'আকাদেমি'। আমাকে নাটকের ছাত্রদের পড়াতে হয়, অভিনয়-কলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হয়। অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী করছে মাস্টারী—মন্দ নয়!

অভিনেতার জাতবদল হয়েছে। আকাদেমির কাজ তো আছেই, তারপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে হচ্ছে প্রায়ই। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীকে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হল স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে। আমাকে সভাপতিত্ব করতে হল। শিশিরবাবুকে সম্বর্ধনা জানিয়ে কংগ্রেস একজন সত্যকার গুণীকে সম্বর্ধনা জানালেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে ও. সি. গাঙ্গুলী, সজনী দাস, বিমল সিংহ, সুনীতি চ্যাটার্জী, নরেন্দ্র দেব, কালিদাস রায়, তারাশংকর প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এ-ছাড়া চিত্র ও মঞ্চ জগতের অনেকেই ছিলেন সেদিনের উৎসব-মণ্ডপে। সেদিন শিশির-সম্বর্ধনায় আমি শিশিরবাবুকে 'আমাদের অগ্রণী পথ-নির্দেশক' বলে অভিহিত করেছিলাম। কিছুদিন বাদেই নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তকে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্টুডেন্টস্ হলে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সেখানে আমি ছিলাম প্রধান অতিথি।

বাইরে যাবার সুযোগ খুঁজছিলাম, সুযোগ করেও নিলাম। এবারে যাব রাজস্থানের পথে। ভারতের ইতিহাস-তীর্থ রাজস্থান—যেখানে উষর মাটিতে, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছ ইতিহাসের নানা স্মৃতি।

রাজস্থান ভ্রমণ-সূচীর প্রথমেই এলাম বিখ্যাত জৈনতীর্থ মাউন্ট আবুতে।

প্রবাসে কোথাও এলে স্থির থাকতে পারি না। এ-অস্থিরতা আমার আজকের নয়, অনেকদিনের। আর এইজন্যেই বোধ হয় ঘরের বাইরে ছুটে চলার এত আগ্রহ আমার। তাছাড়া কোথাও বিশ্রামের অবসর যাপন করতে আসি না। মাউন্ট আবুতে এসে প্রথমেই আমাদের নির্দিষ্ট হোটেলে আশ্রয় নিলাম। তারপরই কোথায় কি দেখবো, তারও ছক ঠিক করে ফেললাম মনে মনে।

রাতটা হোটেলেই কাটলো নিশ্চিন্ত বিশ্রামে। দারুণ শীতের রাত। যেন শেষ হতে চায় না। তবু শেষ হল। রাত ভোরে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সূর্যোদয়।

সকালে আর কোথায় যাব—হোটেলের কাছাকাছি রাস্তায় বেড়ালাম। ঘুরতে ঘুরতে একবার বাজারের দিকেও গেলাম। তারপর দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিখ্যাত হ্রদ নক্ষীতালাও দেখতে গেলাম। রমণীয় হ্রদ। পাহাড়ের মনোরম পাদদেশে পরম রমণীয় হ্রদে বিহার, আর এক অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে হ্রদের বুকে ছোট ছোট দ্বীপখণ্ডের পাশ দিয়ে যখন আমাদের স্পীড-বোটগুলো ছুটে চলছিল, তখন বার বার একটি কথাই মনে আসছিল, যদি এখানে এই নির্জন দ্বীপে দিনকতক থাকতে পারতাম। কিন্তু এ-চিন্তা ক্ষণিকের। এ-চিন্তাকে কোনদিন বাস্তবে রূপ দিতে পারবো না। সুতরাং স্বপ্নবিলাসী মনকে পিছনে রেখে বাস্তব চিন্তায় ফিরে এসেছি। বস্তুবাদী মন নিয়ে দেখেছি চারিদিকের রমণীয় পরিবেশ। দেখেছি, যা-কিছু দর্শনীয়।

অচলগড়ের কথা শুনেছি, দেখার আগ্রহও অনেকদিনের। তাছাড়া ইতিহাস-বিখ্যাত স্থানগুলো দেখবার জন্যে মনের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ জমা হয়ে থাকে। চিরদিন নাটক করেছি, এবং ইতিহাস-আশ্রিত নাটকের চরিত্রে রূপ দিতে দিতে এমনই হয়ে গিয়েছি যে, ইতিহাসের কথা শুনলে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ি।

শিরোহী রাজপুতদের দুর্গ ছিল এই অচলগড়ে, যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনো বর্তমান।

দুর্গ দেখলাম। দুর্গের পাথরে পাথরে পুরনো ইতিহাসের কথা। কান পেতে শুনি সেই অব্যক্ত কথা।

ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত এইসব দুর্গ দেখলে বারবার অতীতের রাজপুত শৌর্যের

কথা মনে পড়ে। সে-যুগ আমাদের চোখে অদেখা, কিন্তু এইসব জায়গায় এসে দাঁড়ালে সেদিনের অদেখা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আজকাল একটা ঝোঁক আমাকে পেয়ে বসেছে। ঝোঁকটা ছবি তোলার। যেখানেই যাকিছু সুন্দর—সবকিছুকে ক্যামেরায় ধরে রাখার ঝোঁক।

এবারে শারদোৎসবের দিনগুলি প্রবাসেই কাটছে। বাংলাদেশের পূজোর চেহারাটা এসব দেশে পাওয়া যায় না। তবে দশেরা উৎসবটি এসব দেশে জমকালো।

পূজোর মধ্যে একটি দিনে দিলওয়ারা মন্দির দেখতে গেলাম। এটি একটি জৈন তীর্থ। মার্বেল পাথরে নির্মিত এই মন্দিরটি সত্যই দর্শনীয়।

বলেছি তো, আমার ছবি তোলার ঝোঁক। অনেকগুলি ছবি তুললাম।

প্রতিদিন অভ্যাস মতো বেড়াতে যাই। আজ এখানে, কাল সেখানে। প্রবাসের দিনগুলো নানা রঙে ভরিয়ে তুলি।

বিজয়াদশমীর পর একটা কাজ হল পরিচিত প্রিয়জনদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানানো। অনেক চিঠি লিখলাম মাউণ্ট আবু থেকে। দূরদেশে এলে কি হবে, পিছনের টান ঠিকই থাকে।

মাউণ্ট আবু থেকে রওনা হয়ে, যোধপুরে এসে পৌছলাম সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়।

স্টেশন থেকে সার্কিট হাউস। আশ্রয় নিলাম সার্কিট হাউসে। সুন্দর ব্যবস্থা। কোথাও কোন অসুবিধে নেই।

আজ আর বেড়ানো নয়, নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। রাত ন'টায় রাতের আহার্য গ্রহণ করে শয্যা গ্রহণ করলাম। শুধু রাতটুকু—রাত ভোর হতে আবার বাইরে যাবার নেশা। সকাল সাড়ে সাতটায় স্নান ও প্রাতঃরাশ সেরে যোধপুরে দর্শনীয় স্থানগুলি পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়লাম।

জীপে করে পরিক্রমায় বেরিয়েছি। সঙ্গে গাইডরূপে পেয়েছি ইসাককে। প্রথমেই এলাম মহামন্দিরে। মহারাজার গুরুমন্দির এটি। পথে দেখলাম ঐতিহাসিক যোধপুরের নানা দৃশ্যপট। প্রাচীন রাজধানী দেখলাম। রাঠোর রাজপুতদের স্মৃতি-বিজড়িত এই প্রাচীন রাজধানী। দেখলাম রাজবাড়ী। দেখলাম, বিরাট হলঘর—যেখানে বিরাজ করছে ঐতিহাসিক শূন্যতা। প্রাচীন রাজধানীর অনেক কিছুর মধ্যে আমাকে আকৃষ্ট করলো 'জেনানা মহল'। জেনানা মহলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করলাম—এই প্রাসাদের পাষাণে-পাষাণে কতো নারী-হৃদয়ের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস মিশে রয়েছে।

ঘুরে ঘুরে দেখলাম আরো যা কিছু দর্শনীয়, দেখলাম রমণীয় উদ্যান, রমণীয় প্রাসাদ—সব আছে, কিন্তু সব কিছু আজ অতীতের স্মৃতি হয়ে গেছে। এখানে আর প্রাণ নেই, নেই উচ্চারিত কণ্ঠস্বর—যা আছে তা যেন দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো। রাণা অজিত সিংহের স্মৃতিসৌধটি দেখে এই কথাটাই মনে হল।

যোধপুরে আর একটি স্থান সুন্দর লাগলো। এটি হল কৃত্রিম হ্রদ 'বাল সমুদ্র'। মরুভূমির দেশে এই রমণীয় হ্রদের আকর্ষণ কম নয়।

এরপর এলাম যোধপুর দুর্গে। যেখানে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে রাজপুত যুগের নানা কাহিনী। আজ সবটাই অতীত, তবু বর্তমানের পথিক আমি, আগ্রহভরে সবকিছুই দেখি।

যোধপুর দুর্গ থেকে আমরা এলাম মহারাজা যশোবন্ত সিংহের স্মৃতিবিজড়িত প্রাসাদ দেখতে। আমার অভিনয়-জীবনে 'সাজাহান' নাটকে এই চরিত্রটি উচ্চকণ্ঠে কতো কম্পিত সংলাপ উচ্চারণ করেছে—আজ চোখের সামনে ইতিহাসের সেই রাজপুত বীরের অনুচ্চারিত সংলাপ শুনলাম। যা নাটককেও হার মানায়। এখানে আমি অভিনেতা নই, এখানে ভারতসম্রাটের 'মেক-আপ' নিয়ে আসিনি। এখানে নির্বাক নাটকের দর্শক আমি। আমি দেখেছি,—আমি কান পেতে নয়, হৃদয়ের সূক্ষ্ম উপলব্ধিতে শুনেছি, যশোবন্ত সিংহের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

রাতের মধ্যে শরতের কোজাগরী পূর্ণিমার রাতটাই আমার কাছে সবচেয়ে রমণীয়। এই রাতের তুলনা নেই।

এবারে কোজাগরী পূর্ণিমার সৌন্দর্য আমি উপভোগ করছি রাজস্থানের ঊষর পরিবেশে।

রাজস্থানের মানুষের কাছে দিন ও রাতের কী মূল্যায়ন তার খবর রাখি না—তবে আমার কাছে রাজস্থানের রাতের তুলনা নেই। রাত এখানে আমার কাছে একটা বিরাট সান্ত্বনা।

এইদিনে আমরা দর্শন করলাম বৈষ্ণবদের প্রিয় মন্দির—দেবতা যেখানে কুঞ্জবিহারী। তারপর দেখলাম এখানকার হ্রদসদৃশ একটি মনোরম জলাধার।

যোধপুর থেকে চল্লিশ মাইল উত্তরে মরুভূমির মধ্যে দর্শনীয় স্থান ওসিয়াঁ। আমাদের ওসিয়াঁর সহযাত্রী প্রসাদবাবু এবং তার এক ডাক্তার বন্ধু।

বন্ধুর পথ ধরে আমরা চলেছি ওসিয়াঁর দিকে। পথের দুধারে ছড়িয়ে রয়েছে ঊষর এলাকা, যাকে মরুভূমি বললেও ভুল হয় না। মাঝে মাঝে দেখছি ছোট ছোট জনপদ, দেখছি সবুজ উদ্যানের স্পর্শ। দেখছি উটের মিছিল।

এই রুক্ষতা—তবু তার মধ্যে কী যেন এক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, যা রাজস্থান ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

চল্‌তি পথে দেখলাম একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এটি আর কিছু নয়—বিবাহের শোভাযাত্রা। রাজপুত যুবক চলেছে বিয়ে করতে। পরনে মূল্যবান বর্ণাঢ্য পোশাক—সঙ্গে যারা চলেছে তারাও কম যায় না। দেখতে ভারি সুন্দর লাগলো। মনে হল কোন ধ্রুপদী শিল্পীর আঁকা বহু বর্ণে রঞ্জিত ছবি দেখলাম।

বন্ধুর পথ অতিক্রম করে যখন ওসিয়াঁ পৌছলাম, তখন বেলা পৌনে বারোটা।

এখানে এসে প্রথমেই গেলাম চামুণ্ডা মন্দিরে। সুন্দর মন্দির। চারদিকে দুর্গপ্রাকারের মতো সুউচ্চ প্রাচীর। দেখলাম মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। পূজা দিলাম—প্রণাম করলাম দেবীকে। তারপর এলাম অন্যত্র, যেখানে সুন্দর একটি দীর্ঘিকা, যেখানে 'গাগরী ভরণে' এসেছে রাজপুতবালারা।

রাজপুতরা রং ভালবাসে। তাদের পোশাকে তাই নানা রঙের বিন্যাস।

সত্যই বিচিত্র এই ভারতবর্ষ। একটি বিরাট দেশ, বিরাট জাতি—যার বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও এদেশে সমন্বয়ের সুর।

সুদূর বাংলাদেশ থেকে রাজস্থানে এসেছি। দেখছি যা-কিছু দেখার। সংগ্রহ করছি যা-কিছু পাই। আমার সংগ্রহশালায় গোটা ভারতবর্ষকে বন্দী করার ইচ্ছা। যেখানে যা-কিছু পেয়েছি, তার মধ্যে কিছু-না-হোক, একটি চিহ্নও সংগ্রহ করে এনেছি। রেখেছি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। আর কিছুর জন্যে নয়—জীবনে যখন চার দেয়ালে বন্দী হয়ে থাকবো—তখন এইসব চিহ্নের মধ্যে আমি ভারতবর্ষকে দেখবো—এই আমার ইচ্ছা। আরো একটি ইচ্ছা—হয়তো এইসবের মধ্যে আমি একজনকে আবিষ্কার করবো, যার পরিচয় পথিক অহীন্দ্র চৌধুরী।

চল্‌তি পথে ছেদচিহ্ন টানতে আমার মন চায় না। এবারে আমি চলেছি উদয়পুরের পথে।

উদয়পুর রাজপুত বীরদের স্মৃতি নিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর।

উদয়পুরের আকর্ষণ আমার কাছে কোন জায়গার চেয়ে কম নয়। রাজপুত রাণাদের উত্থান-পতনের বহু কাহিনী জড়িয়ে আছে এখানকার প্রাসাদে, রাজপথে, ঊষর মরুপ্রান্তে।

শহর দেখলাম। প্রাচীনত্বের গন্ধ সর্বত্র ছড়ানো। দেখলাম রাণা অমরসিংহের প্রাসাদ, দেখলাম জয়সমুদ্র, রাজসমুদ্র, দেখলাম রাণাদের পূজিত দেবতা একলিঙ্গেশ্বর। শহর থেকে এই মন্দির বেশ কিছু দূরে।

আরো দেখলাম মোগল-সম্রাট সাজাহানের সহেলীবাগ, যেখানে সাজাহান নর্তকীদের নিয়ে প্রমোদে মত্ত থাকতেন। আজ সে সাম্রাজ্য নেই, নেই সম্রাট সাজাহান। কিন্তু তাঁর স্মৃতিটা এখনো জড়িয়ে আছে সহেলীবাগে।

সহেলীবাগের মনোরম উদ্যানে দাঁড়িয়ে মনে মনে দেখছি সেদিনের কল্পিত ছবি। দেখছি যেন সম্রাট এসেছেন সহেলীবাগে—তাঁকে ঘিরে ক্রীতদাসীরা, যার মধ্যে অজস্র সুন্দর মুখ রয়েছে; দেখছি—সুন্দরী নর্তকীরা সাজাহানকে ঘিরে আছে নৃত্যের মুদ্রায়, সম্রাটের নির্দেশ পেলেই শুরু হবে নৃত্য।

কিন্তু পরক্ষণে কল্পনার ছবিটা মন থেকে সরে যায়। মনে হয়, বাস্তবে যা ঘটতো —হয় তো আমার কল্পনা সেখানে পৌছতে পারবে না।

বেশ কয়েকটা দিন উদয়পুরে কাটলো। দেখলাম অনেক কিছু। কিন্তু সমরসিংহের বিরাট প্রাসাদে এসে দাঁড়াতে একটা কথাই মনে হয়েছিল, ইতিহাস এক বিন্দুতে স্থির থাকে না। ইতিহাস তলিয়ে যায় তার স্বাভাবিক পথে। পড়ে থাকে ইতিহাস —শুধু স্মৃতি হয়ে।

চিতোরগড দেখার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। সেই স্বপ্নের চিতোরগড়ে এসে পৌছলাম নভেম্বরের এক শীতের দুপুরে।

স্থানীয় ডাকবাংলোতে আমাদের আশ্রয় নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে অনেকের কাছ থেকেই একটি কথাই শুনলাম যে, ডাকবাংলোর চেয়ে রেলওয়ে রিটায়ারিং-এ থাকা ভালো। তখন সহকারী স্টেশন মাস্টার একজন বাঙালী যুবক। সে-ও বার বার বলতে লাগলো, ডাকবাংলো যেখানে, জায়গাটা বড় নির্জন, তার চেয়ে রিটায়ারিং-রুমে থাকুন। শুধু নির্জন নয়, রাতের বেলা ওখানে নানারকম উপদ্রব ঘটাও অসম্ভব নয়।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ডাকবাংলোয় আর থাকা হল না।

চিতোরগড় রাজপুত ইতিহাসের পাতায় একটি বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। রাজপুত বীরেরা এই চিতোরগড় রক্ষা করতে আত্মবলিদান দিয়ে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সেই আত্মবলিদানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। চিতোরগড় শুধু রাজপুতদের কাছে নয়, সারা ভারতের দেশপ্রেমিকের কাছে শহীদ-তীর্থ। স্বাধীনতাকামী রাজপুতদের রক্ত ঝরেছে রাজস্থানের মাটিতে, বীরাঙ্গনারা জহরব্রত অবলম্বন করে বীরপুরুষদের অনুগামিনী হয়েছে।

নানা কথা মনের মধ্যে নিয়ে আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি। চিতোরগড়ের প্রধান ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালাম একসময়। এখানে সম্রাট আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে

সুরযমল আর বাদল প্রাণত্যাগ করেছিলেন। রাজপুত বীরেদের রক্ত ঝরেছিল যেখানে, সেখানে রয়েছে স্মৃতিফলক। শুধু এক জায়গায় নয়, চিতোরগড়ে এমন অনেক স্মৃতিফলক রয়েছে। যেখানে পাথরে ক্ষোদিত রয়েছে সেই অমর বীরদের কথা।

নওলক্ষ ভাণ্ডার দেখলাম, দেখলাম রাণা কুম্ভের প্রাসাদ, দেখলাম ধাত্রীপান্নার মহল। দেখলাম পূজামণ্ডপ, দেখলাম দরবার-গৃহ, দেখলাম অতীতের অনেক ধ্বংসাবশেষ।

মীরাবাঈ—ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাজ্ঞী। মীরাবাঈ-এর স্মৃতি-বিজড়িত গিরিধারী মন্দির দেখলাম। দেখলাম ভক্তিমতী মীরার মর্মরমূর্তি। মনটা ভরে গেল।

চিতোরের জয়স্তম্ভটি আজ দু'চোখে প্রত্যক্ষ করলাম। দেখতে পেলাম কালিকা-মাতার মন্দির। দেখলাম সম্বা দেবী এবং চিতোরেশ্বরী। রাজপুতরাও ছিলেন শক্তির পূজারী।

এত দেখলাম, এত ঘুরলাম—কিন্তু পদ্মিনী মহলে এসে যেন আর এক জগতে হারিয়ে গেলাম। রাণী পদ্মিনীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি করুণ কাহিনী। তবুও দেখলাম। পদ্মিনী মহলের পাথরে পাথরে কান পেতে শুনলাম, পদ্মিনীর অব্যক্ত বেদনার কথা। তারপর ব্যথাতুর মন নিয়ে এলাম হাওয়াই মহলে। সেখানে এসে মনের ব্যথাটা দূরে সরিয়ে ফেললাম।

এতো দূরদেশে এসেছি, দেখছি কতো ঐতিহাসিক স্থান; কিন্তু এই দেখার মধ্যেও স্টেশনের সহকারী স্টেশনমাস্টার জনৈক চৌধুরীর ছোট্ট সুন্দর সংসারটিও আমাকে কম মুগ্ধ করেনি।

চৌধুরীর ছোট্ট সংসার—ঘরে সুন্দরী তরুণী স্ত্রী। আর আছে এক রাজপুতানী—যে ঘর-কন্নার কাজে এদের সাহায্য করে। এই ছোট্ট সংসারের পরিবেশে এসে আমি বাংলাদেশকে খুঁজে পেলাম।

কতদিন হয়ে গেছে, স্মৃতির দরজা খুললে এখনো দেখতে পাই মনের কোণে, ঠাণ্ডা পানীয় হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই তরুণী বাঙালী বধূটি। মুখে যার ভীরু লজ্জা-মেশানো হাসি।

এই স্মৃতি নিয়ে আছি। স্মৃতির মধ্যেই নিজেকে আবিষ্কার করি। আমারই স্মৃতির দর্পণে, আমারই নানা রূপ—এ যেন এক অপরূপ দৃশ্য।

বেরিয়েছি ভ্রমণে। কোথাও আমি তখন স্থির নই। এবারে আমরা চললাম মহাতীর্থ পুষ্কর এবং সাবিত্রী দর্শন করতে।

পুষ্করে এসে প্রথমে দর্শন করলাম রনজীর মন্দির। দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য-রীতিতে গঠিত মন্দির। যেখানে রয়েছে বিরাট গোপুরম।

দেখলাম পুষ্কর হ্রদ এবং ব্রহ্মা মন্দির। ব্রহ্মা এবং গায়ত্রী—বিশ্বপিতা এবং বিশ্বমাতার প্রতীক। এখানে দেখা হল ভাটপাড়ার একটি দলের সঙ্গে, যাঁরা তীর্থদর্শনে বেরিয়েছেন। ওঁরা আগ্রহভরে আমার ছবিও নিলেন। দূরদেশে এসে বাংলাদেশের মানুষ দেখে আনন্দ হল। আবার তাদের ছবিও আমি তুললাম।

এবারে সাবিত্রী পাহাড়ে ওঠার পালা। আগে হলে হয়তো পায়ে হেঁটেই উঠতাম। কিন্তু এখন আর সে সামর্থ্য নেই। অগত্যা আমরা ডুলি করে নিলাম।

পাহাড়ের ওপরে উঠেছি—দর্শন করেছি মন্দিরের দেবীকে। এখানেও অনেক বাঙালী তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দেখা হল।

মন্দিরে পূজা দিয়ে আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। দুপুরে আহারাদির পর বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হল না। রাজস্থানের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী জয়নারায়ণ ব্যাস আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সঙ্গে একজন বাঙালী ভদ্রলোক। বাঙালী ভদ্রলোক একজন ডাক্তার, কিষেণগড়ে ওঁর চেম্বার। ব্যাসজীর সঙ্গে আমার অনেকদিন আগেই পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। নিউ এম্পায়ার মঞ্চে একটি হিন্দী নাটকের অভিনয় কালেই এই পরিচয় হয়।

বিশ্রাম আর হল না। এঁদের সঙ্গে চললাম কিষেণগডে বেড়াতে।

কিষেণগডের যা-কিছু দর্শনীয় দেখলাম। জয়নারায়ণ ব্যাস এবং ডাঃ এস. কে. বসুর সঙ্গেই রয়েছি। দেখাশোনার পর ব্যাসজীর বাড়ীতে এলাম। সেখানে এক দফা আপ্যায়নের পালা।

সেদিন গেল। পরদিন চিশ্‌তীর বড় দরগা দেখতে যাওয়ার পালা। সঙ্গে আছেন মিস্টার এন. এন. সেন।

দরগার সামনে বৃহৎ তোরণ। গম্বুজটি সোনার পাতে মোড়া। রামপুরের নবাবের দানে এই স্বর্ণগম্বুজ নির্মিত। দরগার কাছেই মুসাফিরখানা। সেখানে প্রবেশ-পথে রয়েছে পোলাও-ভর্তি দুটি বিরাট আকারের ডেকচি। সে পোলাও তীর্থযাত্রীদের জন্যে পরিবেশিত হয়।

নগ্ন মস্তকে দরগায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। অগত্যা আমরা মাথায় রুমাল বেঁধে নিলাম।

দরগা দর্শন করে গেলাম 'আড়াই দিন কা ঝোপরা' দেখতে। এটি আগে হিন্দু-মন্দির ছিল। মুহম্মদ ঘোরী এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। এটি নাকি নির্মিত হয়েছিল আড়াই দিনে। তাই এই নাম।

এক এক করে দর্শনীয় স্থান পরিক্রমা করে চলেছি। তবে পাহাড়ের ওপর উঠতে গেলে ডুলিতে উঠি। এবারে উঠলাম তারাগড় পাহাড়ে। এখানে দেখলাম প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

এর পর সান্নাসাগর হ্রদ দর্শন করে ফিরে এলাম হোটেলে। সান্নাসাগরের মার্বেল পাথরের সোপান-দেওয়া ঘাট এবং সংলগ্ন উদ্যান নাকি সম্রাট সাজাহান তৈরী করেছিলেন। সম্রাট সাজাহান যে সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন সেকথা অনস্বীকার্য।

সম্রাট আকবরের স্মৃতিবিজড়িত দুর্গটি আজ মিউজিয়মে পরিণত। এখানকার সংগ্রহও দেখবার মতো। মিউজিয়মের কিউরেটর একজন বাঙালী, নাম অমূল্য ভট্টাচার্য। তাঁর কাছ থেকেই নানা তথ্য সংগ্রহ করলাম।

তারপর এলাম মেয়ো কলেজে। এই কলেজটি নানা দিক থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ। শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা এখানে। একমাত্র নাটক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত হয়নি। এই কলেজে কয়েকজন বাঙালী অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

যাই হোক, ক'দিনের ভ্রমণে যা কিছু দেখেছি, ভালই লেগেছে। এবারে আমাদের জয়পুর যাওয়ার পালা।

জয়পুরে এসে ঐতিহাসিক 'অম্বর প্রাসাদ' দেখতে এলাম প্রথম দিনে। এর আগে ১৯৩৪ সালে একবার জয়পুর এসেছিলাম, কিন্তু সেদিনের জয়পুরে দেখার স্মৃতি মন থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল। এবারে নতুন করে সেদিনের স্মৃতিটাকে মনের মধ্যে পাকাপোক্ত করে নিলাম।

ঐতিহাসিক প্রাসাদ দেখলাম, কিন্তু দুর্গে যাওয়া হল না। দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবুও বাইরে থেকে দেখলাম।

এরপর বাদল প্রাসাদে এলাম। এখানেও নানা ইতিহাসের স্মৃতি জড়ানো। এলাম 'চন্দ্রলেখা' প্রাসাদে—যেখানে বৃন্দাবন থেকে আনীত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত,—সেটিও দেখমাম।

জয়পুর শহরে প্রাচীনত্বের ছাপ সর্বত্র। কিন্তু প্রাচীন জয়পুরের ওপর পড়েছে আধুনিকতার প্রলেপ।

এবারে একটু অন্য প্রসঙ্গে বলি, জয়পুরে যে হোটেলটিতে ছিলাম, সে হোটেলটি স্থানীয় মানুষের। কিন্তু ম্যানেজার ছিলেন একজন ইউরোপীয়ান। হোটেলটিতে আমাকে খুব যত্ন করে রাখা হয়েছিল। আমি এবং আমার স্ত্রী যখন খেতে বসতাম, তখন প্রধান-পাচক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এমন করে দাঁড়িয়ে থাক কেন—আর এতো যত্ন করই বা কেন ?

ইংরাজীতে কথা বললাম। কিন্তু উত্তর পেলাম বাংলায়। লোকটি জানালো সে বাঙালী। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব বাংলা থেকে এখানে সে চাকরী নিয়ে এসেছে। তাছাড়া আরো বললে, সে আমাকে চেনে এবং জানে।

পরে আরো শুনলাম, সে আমার সম্পর্কে হোটেলের ম্যানেজারকে এমন করে বলেছে যে, ম্যানেজারও তাতে আমার ওপর বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে পারেনি।

হোটেলের প্রতিটি কর্মচারী আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করতো তা কোনদিন ভুলবো না। আমার দ্বিতীয় দফার জয়পুর ভ্রমণে এদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছিলাম।

এবারে দেওয়ালী উৎসবের রাতটি জয়পুরেই রইলাম। দেওয়ালী উৎসবের দিনে যে আলোকসজ্জা দেখলাম—তার স্মৃতি আমার কাছে চিরদিনের।

জয়পুর শহরের যা-কিছু দর্শনীয়, তা দেখা শেষ করে নিলাম ক'দিনে। বাকি ছিল গলতা এবং রামবাগ দেখা। তাও দেখলাম।

গলতা জায়গাটি সুন্দর এবং মনোরম। পাহাড়ের উপরে সূর্যমন্দিরটি দেখবার মতো। আর এখানে-ওখানে ছোট ছোট গম্বুজাকৃতি ছত্রীগুলিও পথিক মানুষকে আকর্ষণ করে। ১৯৩৪ সালে এখানে এসে এই ছত্রীতে বিশ্রাম নিয়েছি কতসময়।

কিন্তু রামবাগে যে ঐতিহাসিক পোলো-গ্রাউণ্ড রয়েছে, এটি নাকি পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত এবং সুবৃহৎ পোলো-গ্রাউণ্ড। রামবাগের উদ্যানটিও দর্শনীয়।

ক'দিনের জয়পুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার চিরদিন মনে থাকবে। জয়পুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দু'জন বাঙালীর নাম। যাঁদের একজন হলেন বিদ্যাধর ভট্টাচার্য— যিনি জয়পুরের রাণা শিওয়াই জয়সিংহের আমলে জয়পুর শহরের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁরই পরিকল্পনা মতো গড়ে ওঠে জয়পুর। সেটা আজকের কথা নয়। পরবর্তী আর একজন বাঙালী, জনৈক সেন, যিনি রাণার দেওয়ান ছিলেন। এই শহরে তাঁরও অবদান কম নয়। আর এই দুই বাঙালীর কথা স্মরণ করে জয়পুরে বাঙালীরা সকলেরই প্রিয়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমানেও জয়পুর এবং বাংলার মধ্যে কিছুটা আত্মীয়তার বন্ধন জড়িয়ে আছে বৈকি। বর্তমান মহারাণীও তো একজন বাঙালী মহিলা।

এবারে আবার ফিরে যাওয়ার পালা। জয়পুর থেকে আবার একদিন কলকাতার পথে রওনা হলাম।

কিন্তু পথে আমি আগ্রায় না নেমে পারলাম না, কী জানি কেন, আগ্রা আমাকে অহরহ আকর্ষণ করে। যতবার এপথে আসা-যাওয়া করেছি, ততবারই আগ্রায় নেমেছি।

হয়তো জীবনে সাজাহান চরিত্রে অভিনয় করেই বোধহয় তাজমহলের ওপর এই দুর্বলতা।

আবার সেই পুরনো পরিবেশে ফিরে এলাম। তবুও ক'দিন বাইরে কাটিয়ে মনটা যেন আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়েছে।

এখন কর্মজগতের সঙ্গে চিন্তার জগৎটাই অনেক বদলে গেছে। অভিনয় জীবন থেকে প্রায় অবসর নিয়েছি। যে ক'টি ছবির কাজ বাকি আছে, সেগুলি শেষ করলে ছবির জগৎ থেকে ছুটি। আর মঞ্চ? মঞ্চের মায়াও প্রায় কাটিয়েছি। এখন শুধু ছুটির ঘোষণাটুকু বাকি।

চিন্তা এখন আকাদেমি নিয়ে। ২৮শে নভেম্বর আকাদেমির ক্লাস উদ্বোধন হল। আমিই উদ্বোধনী বক্তৃতা দিলাম। আরো যাঁরা শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা হলেন ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, সতু সেন এবং সুধাংশু সান্যাল। এছাড়া উনিশ জন ছাত্রকেও আমরা পেয়েছি।

পরদিন ২৯শে নভেম্বর। ঐ দিনটি নানা দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সোভিয়েত দেশের দুই প্রধান রাষ্ট্রনায়ক, মার্শাল বুলগানিন এবং ক্রুশ্চেভ ঐদিন পশ্চিম বাংলায় পদার্পণ করলেন। ঐ দুই রাষ্ট্রনায়ককে বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল, তা পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছিল। ঐদিন সম্মানিত অতিথিদের রাজভবনে যে অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা ছিল, সেটি বাতিল হয়ে যায়, কারণ অতিথিরা সেদিন ক্লান্ত ছিলেন।

রাশিয়ার এই দুই রাষ্ট্রনায়ককে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে যে অভিনন্দন জানানো হয়, সেটিও নানা কারণে ঐতিহাসিক। সেদিনের বিপুল জনসমাবেশে এই দুই রাষ্ট্রনায়কও অভিভূত না হয়ে পারেননি।

সেদিন যে জনসমাবেশ হয়েছিল, সে রেকর্ড বোধ হয় আজো ভঙ্গ হয়নি।

এখন ব্যস্ত আছি আকাদেমি এবং সভাসমিতি নিয়ে। ৩রা ডিসেম্বর নেপালের রাজা এবং রাণী এলেন আকাদেমি পরিদর্শন করতে। আকাদেমিব পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলাম। আকাদেমি দর্শন করে তাঁরা খুশীই হলেন।

ক'দিন বাদেই কৃষ্ণনগরের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলাম।

এর মধ্যে আর এক ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। উজবেকী নৃত্যশিল্পী দল কলকাতায় আসছেন—তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে এ ব্যস্ততা। একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হল লেডী রাণু মুখার্জীকে নিয়ে।

বছরের কটি দিন বাকি ছিল। দেখতে দেখতে কেটে গেল। এর মধ্যে যেটুকু চিন্তা, তা এক আকাদেমি নিয়ে।

জীবনে অবসর চেয়েছিলাম, অবসর পেলাম না। চিত্র আর মঞ্চ ছাড়লে কী হবে, আকাদেমি তো আছে, আমাকে এখন এই নিয়েই থাকতে হবে।

আমার জীবনে এ-ও এক নতুন অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীর মন নিয়ে এতদিন নাটকের সেবা করেছি, এবার আমাকে করতে হবে শিক্ষকতা।

এক জগৎ থেকে আর এক জগতে এলাম। জানি না, এরপর আবার কি কাজের দায়িত্ব এসে পড়বে আমার ওপর।

উনিশ শ' ছাপান্ন সালের প্রথম দিনটিতে এলাম পুণ্যপীঠ দক্ষিণেশ্বরে। কল্পতরু উৎসবের সঙ্গে সেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অজস্র নর-নারীর শুভাগমন ঘটেছে। আমিও এসেছি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার কথা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মল সিদ্ধান্তের। কিন্তু তিনি এলেন না। অগত্যা আমাকে পৌরোহিত্য করতে হল।

বছরের প্রথম দিনটিতে দক্ষিণেশ্বরে এসে ভালই লাগলো। মনে হল, হয়তো এটা কোন শুভ সূচনার ইঙ্গিত করছে।

আমার জীবনে নতুন বছর শুরু হল।

রবি রায় আমাদেরই সমসাময়িক। অভিনেতা হিসাবে সে বিখ্যাত। শুধু তাই নয়, মানুষ হিসাবেও তার একটা স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল।

১৪ই জানুয়ারী সকালে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রবি রায়ের মৃত্যু হয়, রোগটা ছিল করোনারী থ্রম্বসিস্।

কালীশ মুখার্জীর কাছ থেকে ফোনে খবর পেয়ে তখনই ট্যাক্সি নিয়ে স্টার থিয়েটারে গেলাম। সেখানে রবি রায়ের মরদেহ শায়িত রয়েছে ফুলের সমারোহে।

রবি রায়ের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হল নিমতলা মহাশ্মশানে। শবানুগমন করলেন মঞ্চ ও চিত্র জগতের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ; যাঁদের মধ্যে শিশির মল্লিক, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী, শ্যাম লাহা, সুশীল মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে রবি রায় ছিল আমার একান্ত অন্তরঙ্গ। যদিও আমরা সাধারণভাবে একদলে ছিলাম না। ১৯২৩ সাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের বন্ধনটা অটুট ছিল।

চোখের সামনে দিয়ে এক এক করে কতজন চলে গেল, যারা ছিল আমার

কালের পথিক। মনে হয়, হয়তো আমাকে সাথীহীন হয়ে আরো অনেক পথ-পরিক্রমা করতে হবে।

উজবেকী নৃত্যশিল্পী দল হাওড়া স্টেশনে পৌছল ১৬ই জানুয়ারী। তাদের স্বাগত জানাতে আমাকেও যেতে হল হাওড়া স্টেশনে।

আজকাল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ব্যাপার তো আছেই, তারপর আছে আকাদেমির কাজ। আকাদেমির সম্পর্কে ভাবতে হয়। আমি একা নয়, আরো যাঁরা আছেন, তাঁরাও চিন্তা করেন। কীভাবে আকাদেমি চলবে। কী হবে তার কার্যক্রমের ব্যাপার। এছাড়া এর আয়োজনের সঙ্গে প্রয়োজনের দিকটাও দেখতে হবে। আকাদেমি নিয়ে তাই প্রায়ই আমাদের বসতে হয়।

শ্রীরঙ্গম বলতে শিশিরবাবুকেই বোঝাতো। শ্রীরঙ্গম আর শিশির ভাদুড়ী—এই দু'টি নাম একসঙ্গে জড়িয়ে। শ্রীরঙ্গমে 'প্রফুল্ল' চলছিল। বন্ধ হল এবারে। আর বোধ হয় চালাতে পারবেন না শিশিরবাবু।

জীবনে কম নাটক তো দেখিনি। কিন্তু বিখ্যাত চীনা সাহিত্যিক লু-সুনের কাহিনী নিয়ে তুলসী লাহিড়ী একটি একাঙ্ক নাটক লিখলেন, নাম 'নববর্ষা'। নাটকটির পরিচালনার দায়িত্ব এসেছিল আমার ওপর। অনেকদিন পরে একটি সার্থক একাঙ্ক অভিনীত হল। সেদিনে অভিনয়ে ছিলেন অনেক তরুণ অভিনেতা-অভিনেত্রী। সবিতাব্রত দত্ত, নিবেদিতা দাস, তৃপ্তি মিত্র—এঁরা ছিলেন নাটকে। তুলসীবাবুও একটি চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন।

বিদেশী অতিথিরাও সেদিন নাটক দেখে আমাদের পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের বরেণ্য সন্তান ডঃ মেঘনাদ সাহা। বিশ্বজোড়া খ্যাতির আসনে বসেছিলেন এই বাঙালী বিজ্ঞানী। তাঁর মৃত্যু যেমন আকস্মিক, তেমনি মর্মন্তুদ। দিল্লীতে একটি সভায় যোগ দেওয়ার সময় ট্যাক্সি থেকে ফুটপাথে নেমে চলতে চলতে তাঁর মৃত্যু হয়। ডঃ সাহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে বাঙলাদেশ তথা ভারত জুড়ে নামলো শোকের ছায়া। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ডঃ সাহার লোকান্তর গমনের তারিখ। পরদিন কলকাতায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। ডঃ সাহার পরিচয় কেবল একজন বিজ্ঞানী হিসাবে নয়, তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক।

২৫শে মার্চ থেকে সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির উদ্যোগে রাজধানী দিল্লীতে 'নাটক সেমিনার' আরম্ভ হবে। এই সেমিনারে যোগ দিতেই ২২শে মার্চ কলকাতা থেকে দিল্লীর পথে রওনা হওয়া।

দিল্লীর সপ্রু হাউসে ডঃ রাধাকৃষ্ণান সেমিনারের উদ্বোধন করেন। সেদিন মিসেস যোশীর অনুরোধে ডঃ রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে উপস্থিত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিতে হল আমাকে।

২৮শে মার্চ রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করলাম।

সেমিনারে আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল কলকাতার পেশাদারী মঞ্চ সম্পর্কে। আমি যে ভাষণ তৈরী করেছিলাম, তাতে প্রমোদকর এবং নাটক আইনের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য ছিল।

সেমিনারের দিনগুলিতে নানাভাবে আমাকে কর্মব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। সেমিনার শেষ হয় ২৯শে মার্চ। ঐদিনেই প্রেমচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে লেখা হিন্দীতে 'গো-দান' নাটকটির অভিনয় দেখলাম সপ্রু হাউসে।

সেদিন রাত একটায় ক্লান্ত হয়ে ফিরেছিলাম নির্দিষ্ট আশ্রয়ে।

একবার বাইরে আসার সুযোগ পেলে হয়, ফিরে যাবার কথা মনে থাকে না। দিল্লী থেকে সিমলা যাব এ চিন্তা আগে ছিল না। কিন্তু সিমলায় যখন এলাম, ভাবলাম এসেছি যখন, ক'টা দিন ঘুরেই যাই। আমার স্ত্রী সুধীরারও তাই ইচ্ছে।

সিমলায় এসে একটি অভিজাত হোটেলে উঠলাম! হোটেল থেকে দেখতে পেলাম সিমলার প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের বিস্তৃত পটভূমিকা।

এপ্রিলের প্রথম দিনেই আমরা গেলাম চিলি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে।......বাংলোয় দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম, আপেলের বাগান, খোবানী বৃক্ষ, দেখলাম সরলবর্গীয় বৃক্ষের সবুজ শোভা। সেখান থেকে রওনা হলাম চেল-এর দুর্গম পথে। সতের মাইলের মতো পথ অতিক্রম করে আমরা গন্তব্যস্থানে এসে পৌছলাম। এখানে 'পাতিয়ালা প্যালেস' এবং সংলগ্ন মনোরম উদ্যান, ঝর্ণা, আর বিচিত্র ফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহ। দেখে মুগ্ধ হলাম।

দেখতে গেলাম ক্রিকেট গ্রাউণ্ড। পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও সমতল থেকে এত ওপরে ক্রিকেট গ্রাউণ্ড নেই।

চেল দেখা শেষ করে হোটেলে ফিরেছি বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তারপর আর বেরোইনি।

পরদিন। জাকো হিল্‌সের দিকে যাব। যাওয়ার পথেই দেখলাম বাঙালীদের কালীবাড়ি, দেখলাম বিখ্যাত ফুটবল ময়দান, রাষ্ট্রপতি ভবন। তারপর আরো কিছু দর্শনীয় দেখা শেষ করে হোটেলে ফিরলাম।

বাইরে এলে আমার মন এক জায়গায় স্থির থাকে না। নারকোণ্ডার দূরত্ব

সিমলা থেকে চল্লিশ মাইলের মতো। তিব্বত সীমান্তের এই জায়গাটি সাগরপৃষ্ঠ থেকে ৯১০০ ফুট ওপরে। এই পথটুকু যেমন সুন্দর, তেমনই মনোরম। কখন যে পেরিয়ে এলাম, বুঝতে পারলাম না। যেন সমস্ত পথটা আমরা সম্মোহিত হয়ে ছিলাম।

যতবার আমি পাহাড়দেশে এসেছি, ততবার মনের মধ্যে আমার একটি চিন্তাই এসেছে, যদি কখনো নিশ্চিন্ত অবসর পাই, তাহলে আমি আসবো এই পাহাড়-দেশে। কোন নির্জন বাংলোয় বসে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাবো।

কিন্তু সে স্বপ্ন আমার কল্পনার মধ্যেই মিশে রইলো।

ফিরে এসেছি কলকাতায়। আবার সেই কাজের মধ্যে মিশে থাকা।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য আকাদেমির নিজস্ব ভবনের ভিত্তি স্থাপনা করলেন ১৮ই মে। এইদিন যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

দিনগুলো চলছে একরকম। এই চল্‌তি দিনের মধ্যে ১৩ই জুন আমাকে প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যথা পেতে হল। ডঃ শচীন বসু মারা গেলেন এইদিন। ইনি আমার কন্যা মীরার শ্বশুর।

আত্মীয়বিয়োগে ব্যথা পাওয়াই তো স্বাভাবিক, তারপর এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তবুও এ ব্যথা বুক পেতে নিতে হয়।

শচীনবাবু মারা গেলেন ১৩ই জুন, আর ২০শে জুন গেল সুপ্রভা মুখার্জী। অভিনেত্রী সুপ্রভা মুখার্জীর পরিচয় নতুন করে দেবার নেই।

শ্রীরঙ্গমের মৃত্যু, কোন ব্যক্তির মৃত্যু নয়—তবু একটি নামের মৃত্যু। যদিও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস শ্রীরঙ্গম বাংলাদেশের নাট্যশালার ইতিহাসে একটি অবিনশ্বর নাম। আর এই মঞ্চের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন যে মানুষটি, তিনি তো আর কেউ নন,—শিশির ভাদুড়ী। যিনি বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে এক অপ্রতিহত পুরুষ।

শ্রীরঙ্গম নামটি উঠে গেল। নতুন নামের ফলক সেখানে যুক্ত হল। সে নাম 'বিশ্বরূপা'। বিশ্বরূপার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের তারিখ ২২শে জুলাই।

এই তো কিছুদিন আগে শ্রীরঙ্গমে শিশিরবাবুর সঙ্গে রাতের পর রাত অভিনয় করেছি। আজ সেই নামটাই হারিয়ে গেল!

পৃথ্বীরাজ কাপুর ভারতের একজন জনপ্রিয় অভিনেতা। পৃথ্বীরাজ কলকাতায় এলেন। ২৬শে জুলাই তাঁকে এবং সঙ্গের অভিনেত্রীদের আপ্যায়িত করা হল থিয়েটার সেণ্টারে।

অনেকদিন পরে কলকাতায় নিউ এম্পায়ারে পৃথ্বীরাজ তাঁর নাটক অভিনয়ের আয়োজন করলেন ২৭শে জুলাই। পৃথ্বীরাজ কলকাতার নাট্যামোদীদের কাছে একটি প্রিয় নাম।

বেতারে নাটক প্রচারে এতদিন যে ব্যবস্থা চালু ছিল, সে ব্যবস্থা তো আছেই, এবারে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নাটক প্রচারের ব্যবস্থা হল। এই ব্যবস্থার প্রথম নাটক 'প্রফুল্ল'। এর সঙ্গে একটি মুখবন্ধও যুক্ত হয়েছিল। সেটি ছিল আমারই। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এটি প্রচারিত হয়েছিল।

এই দীর্ঘ স্মৃতিচারণে আমার জন্মদিন নিয়ে কিছু বলেছি বলে মনে হয় না। আমার জন্মদিন ২১শে শ্রাবণ। এই দিনটিকে স্মরণ করেছি আমার ব্যক্তিগত পরিবেশে। জন্মদিন নিয়ে মনের মধ্যে এমন কোন দুর্বলতা আমার নেই, যেটা ফলাও করে ভাবতে হবে। প্রতিদিনের মতো জন্মদিনও ভাবতে আবার চলে যায়।

কিন্তু এবারে এই দিনটিও আকাদেমির ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে নিয়ে ঘরোয়া একটা অনুষ্ঠান করবে। এটি ছিল আমার ৬০তম জন্মদিন।

নাটকের মানুষ আমি, কত বদলে গিয়েছি। মনের দিক থেকে সত্যিই আমি সরে এসেছি মঞ্চ-চিত্রের মায়া ত্যাগ করে। তবু একথা বলবো না, আমি মঞ্চের বাইরের মানুষ। মনে-প্রাণে আজও আমি মঞ্চের অভিনেতা। এ যোগসূত্রটা অনেক পুরনো। ছিন্ন হবার নয়।

নানা অনুষ্ঠানে আমাকে যোগ দিতে হয়, সেকথা তো আগেই বলেছি।

অভিনেতৃ-সঙ্ঘ 'দুই পুরুষ' অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন রঙমহল মঞ্চে। তারিখটা ছিল ৭ই আগস্ট। অভিনয়ের আগেই একটি দুঃসংবাদ এল। রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় কেবল সরকারী প্রধান হিসেবে নয়—তাঁর আসল পরিচয় একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী হিসেবে,—যে মানুষ শিক্ষার জন্যে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী এই মানুষটি বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেবার মধ্যে যদি কিছু গৌরব থাকে, তবে সে গৌরবের অধিকারী ছিলেন স্বর্গত মুখোপাধ্যায়।

যাই হোক, অভিনেতৃ-সঙ্ঘের নাটক সেদিন অভিনীত হয়েছিল, তবে স্বর্গত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন সেদিনের শিল্পী এবং দর্শকেরা। এই প্রসঙ্গে বলি, রাজ্যপালের মৃত্যুসংবাদ শুনে দর্শকদের একটি অংশ আসনে বসেই ছিলেন। আর এক দল সংবাদ শুনেই উঠে চলে গিয়েছিলেন। আমি

সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বলেছিলাম, দর্শকেরা যদি চান, অভিনয় বন্ধ হবে ; আর যদি না চান তাহলে অভিনয় হবে।

বলেছি তো, আমার জন্মদিন এবারেই প্রথম উদযাপিত হল। ১২ই আগস্ট তারিখে 'চিত্রবাণী' ও রঙমহল 'অহীন্দ্র জয়ন্তী' উদ্‌যাপিত করলে রঙমহল মঞ্চে। সে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'চিত্রবাণী' পত্রিকা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনোজ বসু, তারাশঙ্কর, দেবকী বসু, শচীন সেনগুপ্ত, হরেন মুখার্জী ছাড়াও আরো অনেকে। এই অনুষ্ঠানে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন বীরেন ভদ্র, ফণী বিত্থাবিনোদ প্রমুখ। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আমার অনেক সহশিল্পী এবং সহযোগী বন্ধুবান্ধবের হাত থেকে ফুলের মালা নিতে সেদিন সত্যি আমি অভিভূত হয়েছিলাম। সেদিন সত্যি মনে হয়েছিল, আমি যদি কিছু পেয়ে থাকি, তবে তা হল বন্ধুজনের ভালবাসা। আর এইটাই তো জীবনের পরম পাওয়া।

সেদিনের অনুষ্ঠানে অতীনলালের নৃত্যনাট্য 'কুমারসম্ভবম্' পরিবেশিত হয়েছিল।

জীবনে অনেক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি, কিন্তু সেদিনের অনুষ্ঠান ছিল স্বতন্ত্র। যেখানে উপলক্ষ আমি।

কিন্তু এতো চাইনি। অথচ এসব কি আরম্ভ হল আমাকে নিয়ে!

ক'দিন যেতে না যেতে আবার এমনি আর এক অনুষ্ঠানে আমাকে সম্বর্ধনা জানান হয়। অনুষ্ঠানটি ছিল প্রদেশ কংগ্রেসের। কংগ্রেস তাঁদের 'গুণীজন-সম্বর্ধনা' পর্যায়ের অনুষ্ঠানে আমাকে সম্বর্ধনা জানায়। চৌরঙ্গীতে কংগ্রেসের মণ্ডপে অজস্রের ভিড়ে আমাকে সম্বর্ধনা জানান হয়।

জানি না কেন, আমি যেন বিব্রত বোধ করতাম এই জাতীয় অনুষ্ঠানে, যেখানে কেন্দ্রবিন্দুতে আমার নাম।

দিন কাটছে প্রত্যহের নিয়মে। এর মধ্যে আবার বাইরে যাবার ভাবনা আছে। ভাবছি, অক্টোবরে যাব। কলকাতার বাইরে।

কিন্তু অক্টোবর আসতে তখনো দেরি।

ছেলের খবরের জন্যে মাঝে মাঝে ব্যস্ত হতাম। খবর পেলাম, সে সুইজারল্যাণ্ড থেকে লণ্ডন হয়ে নিউইয়র্ক রওনা হয়েছে। দূর থেকেই শুভ কামনা করলাম। সে যেন নির্বিঘ্নে পৌছয় নিউইয়র্কে।

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী চলচ্চিত্র শিল্পের নির্বাক যুগের একজন। চলচ্চিত্র শিল্পে এই মানুষটির অবদান কম নয়। যাঁকে আমরা 'গাঙ্গুলী মহাশয়' বলতাম। ইনি মারা

গেলেন ১২ই সেপ্টেম্বর। তার কিছুদিন বাদেই অক্টোবরের প্রথম দিকে বিখ্যাত কৌতুক-শিল্পী আশু বোসও লোকান্তর গমন করলেন। আশু বোস চরিত্রগুণে সবারই প্রিয় ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়।

এক এক করে কতজন চলে যাচ্ছে আমার সামনে থেকে! অথচ আমি আছি—হয়তো এখনো অনেকদিন থাকতে হবে। যে ক'দিনের মেয়াদ নিয়ে এসেছি, সে ক'দিন থাকতে হবে পৃথিবীতে। এইটাই তো প্রকৃতির নিয়ম।

আবার বাইরে যাবার দিন এসে গেল। অক্টোবরের ৯ তারিখে কলকাতা ছাড়লাম। এবারে যাব ভূপালের দিকে।

পূজোর আগেই চলেছি কলকাতা ছেড়ে। বোম্বে মেলযোগে আমরা রওনা হয়েছি।

যাত্রাপথে একটি বিচিত্র চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছিলাম মোগলসরাই স্টেশনে। চরিত্রটি একটি বিবাহিতা তরুণীর। জানি না সে কেমন করে আমার সন্ধান পেয়েছে। এসেই জানালো, সে কলকাতায় সঙ্গীত-নাটক আকাদেমিতে ভর্তি হতে চায়। এখানে সে থাকবে না।

মেয়েটিকে বললাম, তুমি এমন চিন্তা করছো কেন? বরং এখানে থেকেই চর্চা কর। জীবনে নতুন ঘর বেঁধেছো, এখন কি এসব শোভা পায়!

তবুও মেয়েটি শুনতে চায় না। শেষপর্যন্ত আমি বলতে বাধ্য হলাম, এসব চিন্তা ছাড়ো।

জানি না মেয়েটি আমার সম্পর্কে কী ধারণা করেছিল।

ভূপালের পথে ইটারসি এসে পৌছলাম। একটু দেরিতেই পৌছেছে আমাদের ট্রেন। ভূপালগামী ট্রেন স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল।

ভূপালে এসে ঘটনাচক্রে একটা বাজে হোটেলে এসে উঠতে হল। গাইড জানালো, সার্কিট হাউসে জায়গা নেই। সরকারী লোকদের নিয়ে সার্কিট হাউস পূর্ণ। সুতরাং এই রুবি হোটেলই ভরসা।

যাই হোক, আপাততঃ এখানে থেকেই ভূপাল দেখতে বাধ্য হলাম। একটা গাড়ী ঠিক করলাম শহর পরিক্রমার জন্যে। শহর, শহরতলী, পাহাড়ী পরিবেশ, হ্রদ—সবকিছুর ওপর দৃষ্টিপাত করা গেল এই পর্যন্ত। আরো কিছু সময় ঘোরার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হল না। আকাশে তখন জমাট-বাঁধা মেঘ।

পরদিন ১২ই অক্টোবর ট্যাক্সিযোগে বিখ্যাত 'সাঁচী স্তূপ' দেখতে গেলাম। যে সাঁচী স্তূপের প্রধান তোরণটি স্থাপত্যশিল্পের একটি দৃষ্টান্ত—সেটি এবারে প্রত্যক্ষ করলাম।

বিরাট স্তূপটির সঙ্গে অতীতের মুখর ইতিহাস জড়িয়ে আছে। চারদিকে চারটি প্রবেশ-পথ—স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম নিদর্শন। নিবিষ্ট মনে দেখলাম। ভাল লাগল।

ভোজ রাজাদের প্রাসাদ নেই, আছে তার ধ্বংসাবশেষ। সেই ধ্বংসচিহ্ন থেকে অতীতকে খুঁজে বার করা যাক-না-যাক—আজ একথা ঠিকই, এসব দেখেই মনে হয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক সম্পদই আছে।

কিন্তু সটপূজার মিছিল আমাকে দস্তুরমতো বিস্মিত করল। এই লৌকিক শোভাযাত্রা দেখবার মতো।

ভূপাল থেকে উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী দেখা আমার অনেক দিনের বাসনা।

উজ্জয়িনী নামের মধ্যে একটা ধ্রুপদী স্বর লুকিয়ে আছে। জানিনা এই নগরীর নামকরণ কে করেছিল, তবে এটা ঠিকই যে, এমন নামকরণ যার, নিশ্চয়ই তার মধ্যে কবিমনের অস্তিত্ব ছিল।

কাব্যে, গাথায় পড়েছি শিপ্রা নদীতটে উজ্জয়িনীর কথা, পড়েছি মহাকাল সেই মন্দিরের কথা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কটি লাইন তো মনের মধ্যে অপূর্ব এক মূর্ছনা জাগাতো। সেই শিপ্রা নদীতটে 'মহাকাল মন্দিরের মাঝে' যে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজতো—সেই স্বর অহরহ আমার মনের মধ্যে বেজেছে।

আজ চোখে দেখলাম শিপ্রানদীর তীরে উজ্জয়িনীর সেই মহাকাল মন্দির। শুনলাম আরতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি। কিন্তু কোথায় সেই স্বপ্নের প্রেয়সী 'মালবিকা'!

উজ্জয়িনীর আরো কত মন্দির, আরো কত দেবতা—সর্বত্রই একটা ধ্রুপদী পরিবেশ। সর্বত্রই একটা প্রাচীনত্বের ছাপ। যত দেখি, ততই বিস্ময় জাগে। মনে হয়, এই তো আমাদের ভারতবর্ষ, এই তো আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পুণ্যপীঠ।

দেখলাম, ঐতিহাসিক গোয়ালিয়র প্রাসাদ, যেখানে বিচিত্রভাবে বাঁক নিয়েছে শিপ্রা। দেখলাম অক্ষয় বট, ভোজগুম্ফা, দেখলাম কালিকা মন্দির—আর অতীতের আরো কত স্বাক্ষর। উজ্জয়িনীর টাঙ্গাগুলির মধ্যেও কত বৈচিত্র্য। মনে হয় যেন পুরনো যুগের রথের কোন সংস্করণ।

দিনের সঙ্গে কত বদলে গেছে। নতুন করে শহর আর জনপদের পত্তন হয়েছে এই সব জায়গায়। ভূপাল তো এখন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। কিন্তু প্রাচীন ইন্দোর শহর—যেখানকার নগর-জীবনের ধারাটি প্রাচীন হলেও সুন্দর। রক্ষণশীলতার মধ্যেও প্রগতিশীলতা থাকে—ইন্দোর না দেখলে সে কথা বিশ্বাস করা যায় না।

ইন্দোর থেকে ধর, আবার ধর থেকে মাণ্ডু—সর্বত্রই গেলাম দু'টি খোলা চোখ নিয়ে। মনের দরজাও খুলে রেখেছি—যদি কিছু পাই মনের মধ্যে ভরে রাখবো।

পথে যখন আসি, তখন কাঙালের মন নিয়ে আসি। যা কিছু পাই, মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখি। ভাবি, এই তো আমার ভবিষ্যতের পাথেয়। এই নিয়েই আমার দিন কাটবে।

কতদিন হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো দু'চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই, শিপ্রা নদী-তটে ঘাটে ঘাটে পদচারণা করছি আমি। সেই রামঘাট, গদাঘাট, ভর্তৃঘাট—সেই পাথরের সোপান বেয়ে শিপ্রার জল স্পর্শ করা।

যেমন নামের মাধুর্য উজ্জয়িনীর, তেমনি শিপ্রা নামের মধ্যে একটি রূপদী মধুরতা লুকিয়ে আছে।

শিপ্রা আমার কাছে স্বপ্নের নদী।

নানা দিক থেকে ধর এবং মাণ্ডু আমাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়। ইতিহাসের নানা স্মৃতি এখানে ছড়িয়ে আছে। আলমগীর গেটের কাছে দাঁড়ালে মনে হ'ত, কালের সঙ্গে ইতিহাসের ধারা কত বদলে গেছে। পাহাড় আর নিবিড় অরণ্যস্পর্শে জায়গাটির প্রাকৃতিক শোভাও অপরূপ হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু জাহাজ মহল, আর দুর্গ, কিংবা আগমগীর গেট—যাই দেখি না, সব দেখার স্মৃতি মন থেকে হারিয়ে যায়, যখন শুনি রূপমতী আর বাজবাহাদুরের কথা। যে প্রেমের বিয়োগান্ত কাহিনী আজও শ্রোতার মনকে অভিভূত করে।

ইতিহাসের আরো কত কাহিনী-স্মৃতির স্বাক্ষর এখানে ছড়িয়ে আছে। রাণা কুম্ভ, সম্রাট আকবর, হোসেন শা—এইসব ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনের কত কথা এখানকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

ক'দিনের ভ্রমণে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। শরীরটা তেমন ভাল চলছিল না। বেশ বুঝতে পারি, পথের এই ধকল আর দেহ সহ্য করতে পারে না। শুধু মনের জোরেই চলি।

এই দুর্বল শরীরেই উজ্জয়িনী ত্যাগ করলাম ১৭ই অক্টোবর।

চলতি পথে ট্রেনে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। সুধীরা আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বললাম, চিন্তা কোরো না। দু'দিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

উজ্জয়িনী থেকে এবারে চলেছি বম্বের দিকে। বম্বেতে ক'দিন বিশ্রাম নেবো ভেবেছি।

বম্বে সেণ্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছেই অজিত বিশ্বাসকে পেলাম। অজিত একসময় আমার ছোট ভাই পঙ্কুর সহকর্মী ছিল। এয়ার লাইন্সের হোটেলে যাবার সময় সে আমাদের সঙ্গেই ছিল।

শরীর আরো দুর্বল মনে হল। সেই সঙ্গে মনটাও। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র দিলেন। এদিকে সুধীরাও বলতে লাগলো, শরীর খারাপ হয়েছে, দু'দিনেই সেরে যাবে। মনের জোর হারিও না।

তবুও যেন মনের জোর ফিরে পাই না। মনে হয়, এবারে সত্যিই হয়তো অশক্ত হয়ে পড়বো।

এই অবস্থার মধ্যেও একেবারে চুপচাপ হয়ে থাকতে পারিনি। নানা কাজের চিন্তাও ছিল মনের মধ্যে। এসেছি আকাদেমির কাজে। যে সব ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পাবে, তাদের ইণ্টারভিউ নেওয়াই হল কাজ। আমি ছাড়া অন্ধের অভিনেতা বন্দো কনক লিঙ্গেশ্বরও এসেছিলেন।

ডাক্তারের নির্দেশ, তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যাওয়ার। তবুও কলকাতায় যাওয়ার আগে একবার মাথিরা যেতে হল। রেলপথটি পাহাড়ের পাকদণ্ডী পথে উঠেছে।

পাহাড়ের ওপর মনোরম পরিবেশে বেশ কয়েকটি বাংলো, কিছু বাড়ী-ঘর। আমরা উঠেছি রাগবী হোটেলে। এখানে তিন-চারদিন থাকবো। যদি কিছু দেখার থাকে, দেখবো। তারপর বম্বে হয়ে কলকাতায় ফিরে যাবো এই ইচ্ছে।

এখানে যদি সুন্দর কিছু দেখে থাকি, তবে তা হল ক্যাথিড্রাল হিল। দেখতে বড় সুন্দর লাগে। ঠিক যেন একটি ক্যাথিড্রাল। হ্রদটিও সুন্দর। এখান থেকে জল সরবরাহ করা হয়।

তবে পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার মুহূর্তটা অবিস্মরণীয়। সূর্যের অস্ত যাবার সঙ্গে চারদিকের দৃশ্যপট এক অপরূপ শোভা নেয়—যা শুধু দু'টি চোখকে নয়, মনকেও ভরিয়ে দেয়।

দুর্বল অশক্ত শরীর নিয়েও মনের এ দাবিটুকু আমি অপূর্ণ রাখিনি।

আবার ফিরে এসেছি বম্বের তাজমহল হোটেলে। এখনো ক'দিন থাকতে হবে। বিশ্ব থিয়েটার সম্মেলনে যোগ দিতে হবে আমাকে। শরীর দুর্বল হলেও যোগ দিলাম। বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ বিনিময় হল।

এরই মধ্যে একদিন বলবন্ত রাও গার্গী ও কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধ এসেছিল আমাকে কিছু বক্তব্য রাখবার জন্যে। আমার বক্তব্যও আমি সেমিনারে পাঠ করেছিলাম।

এই সেমিনারে ভারতের অনেক বিদগ্ধজনের সান্নিধ্যে এসেছিলাম। ক'দিন বেশ ভালই কেটেছিল। যদিও শরীর আমার তেমন ভাল ছিল না।

নভেম্বরের প্রথমদিনে আমরা বম্বে থেকে নাগপুরের পথ ধরে কলকাতার পথে রওনা হলাম।

কলকাতায় ফিরে আগে যেমন সিনেমা, থিয়েটারের চিন্তাটা বড় হয়ে উঠতো, এখন আর তা হয় না। এখন চিন্তা আকাদেমি নিয়ে।

জীবনের পটভূমিকা কত বদলে গেছে! ছিলাম অভিনেতা, হলাম আচার্য। এক জীবন থেকে আর এক জীবনে আসা।

তবুও মাঝে মাঝে অভিনয় যে করিনি, তা নয়। কিছু ছবির কাজ বাকি ছিল, সেগুলো করতে হচ্ছে। এগুলো শেষ হলে একেবারে ছুটি।

আকাদেমি তো আছেই। তারপর আর একটি কাজ সভা-সমিতি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া।

চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই কলকাতায় এলে তাঁকে পরিষদ ভবনের প্রাঙ্গণে যে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল, তাতেও যোগ দিলাম। প্রজাতান্ত্রিক চীনের বিপ্লবী নায়ককে দেখলাম।

আবার এর ক'দিন বাদেই চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে আগত প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা সভাতেও যেতে হল।

আমার জীবনের পটভূমিকা বিস্তৃত কিনা জানিনা, তবে এইটুকু বলতে পারি—জীবনে আমি একটা বিরাট পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করেছি—যেখানে, যে পৃথিবীতে, আমি একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছু নই।

দেখতে দেখতে কত বছর পেরিয়ে এলাম। সেই জন্মের দিন থেকে আজ—দীর্ঘকাল জীবনের পথ-পরিক্রমা করেছি। কী পেয়েছি, হিসেব করে দেখিনি, কী পাইনি, তা-ও জানি না। চাওয়া-পাওয়ার হিসেব তো একদিনেই মিটে যাবে—জীবনের শেষের দিনটিতে। কিন্তু তার আগে তো ঋণমুক্ত হবার চিন্তা। পৃথিবীর কাছে অনেক ঋণ করেছি আমি—যা থেকে মুক্ত হতে চাই। পরক্ষণে ভাবি, থাক না এই ঋণ। হয়তো এরই জন্যে আবার আমাকে এই সুন্দর পৃথিবীতে আসতে হবে। এই মাটি, জলের সুন্দর পৃথিবীতে।

কত ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ে পিছনের দিকে তাকালে। সেই ঘটনার মধ্যে থেকে নিজের পুরনো দিনগুলোকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি। ভাবি, যে-আমি বাবার কাছে 'বাঁশী কিনে দাও' বলে আবদার করেছিলাম, সেই-আমি এখনো যেন এই আমার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে।

যেদিন এ কথাগুলো চিন্তা করছিলাম, সেদিন ছিল আমার বাবার জন্ম-

শতবার্ষিকী। বাবা নেই—পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে চলে গেছেন অমর ধামে। কিন্তু আমার অস্তিত্বের মধ্যে আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করি।

পিতৃদেবের শতবার্ষিকীর দিনে আমার মধ্যে সেই পুরনো শিশুটা ফিরে এসেছিল। বলেছিলাম অনুচ্চারিত কণ্ঠে, 'আমায় একটা বাঁশী কিনে দেবে বাবা?'

মুহূর্তের চিন্তা, মুহূর্তেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

শেষ হল উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সাল। এক এক করে জীবনের ওপর দিয়ে কতগুলো বছর পার হয়ে গেল। ভাবলাম, এমনি করে জীবনের আয়তনটাও সীমিত হয়ে আসছে।

তবুও চিরকালের নিয়মে স্বাগত জানালাম নতুন বৎসরটিকে। স্বাগত উনিশ শ' সাতান্ন।

আজ প্রায় অবসর নিয়েছি বলতে গেলে। কয়েকটি ছবির কাজ হাতে ছিল, সেগুলো করছি। নয়তো মঞ্চ ছেড়েই দিয়েছি প্রায়। তবুও অভিনয়ের কথা ভাবি, নাটকের কথা ভাবি।

দিনপঞ্জীর পৃষ্ঠাও শূন্য থাকে না। প্রতিদিনের যা কিছু লিখে রাখি। স্টার থিয়েটার শীততাপনিয়ন্ত্রত হল, সে কথাও লিখতে ভুলিনি। তাছাড়া বাংলাদেশের মঞ্চের কাছে এটা তো গর্বের বিষয়। একটি মঞ্চ সুন্দর হল—একটি মঞ্চ দর্শক-সাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের সবরকমের ব্যবস্থা করলো, এর চেয়ে ভাল কথা মঞ্চপ্রেমিকদের কাছে আর কি আছে।

আজকাল নাটকে অংশ নেওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। তবু অংশ নিলাম, বেতার নাটক 'সাজাহান'-এ। যে নাটকটি আজকাল আর শোনানো হয় না। নাটকটি রেকর্ড করা হল ৯ই জানুয়ারী। আমি অংশ নিয়েছিলাম নাম-ভূমিকায়, ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায় ছিলেন নীতিশ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া নরেশ মিত্র, সন্তোষ সিংহ, জীবন বোস, সরযূবালা-প্রমুখ বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ নাটকে অংশ নিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, আজকাল আমাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। এই তো সেদিন সোভিয়েট চিত্র প্রতিনিধিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে দমদম বিমান বন্দরে যেতে হলো। সেখানে উপাচার্য নির্মল সিদ্ধান্ত, বি. এন. সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান, বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশনের রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সাউথ ক্লাবে। বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন। সেদিন অনেক সহকর্মী,

সহধর্মীর সঙ্গে দেখা হল। আনন্দ পেলাম। মনে আছে, সেদিন অনুষ্ঠান শেষে বিখ্যাত পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে পথ হেঁটে এসেছিলাম চৌরঙ্গী পর্যন্ত। উদ্দেশ্য ছিল একটা ট্যাক্সি ধরা। ঐদিনই কথাপ্রসঙ্গে জ্যোতিষবাবুর কাছে শুনলাম, বাকুলিয়া হাউসের বিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন কাশীধামে। শুনে মনটা খারাপ হল।

কিন্তু তবু তো জীবন থেমে যায় না। এক-জীবনে কত পরিচিত মানুষকে চোখের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখলাম। কী হবে, এসব কথা ভেবে। আজ আমি আছি, একদিন আমিও থাকবো না—এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই।

অবসর চেয়েছিলাম। পেয়েছি। আর সেই উচ্চগ্রামে-বাঁধা জীবন নয়—এখন পুরনো দিনের স্মৃতি নিয়ে এগিয়ে চলা।

আমার অভিনীত চিত্রের মধ্যে 'নীলাচলে মহাপ্রভু' শেষ ছবি। এরপর আর কোন ছবিতে অভিনয় করিনি। সংকল্প করেছিলাম, আর নতুন করে কোন ছবিতে অভিনয় করবো না। 'নীলাচলে মহাপ্রভু' মুক্তিলাভ করলো ২৮শে জুন।

জীবনে প্রথম ছবি বলে চিহ্নিত হয়ে আছে 'সোল অব এ স্লেভ'। আর শেষ ছবি 'নীলাচলে মহাপ্রভু'।

এবারে পুরোপুরি মন দিয়েছি আকাদেমির কাজে। আকাদেমি নিয়ে যত চিন্তা। ভাবি, যদি কিছু ছাত্রকে তৈরী করে যেতে পারি, যদি তাতে আগামী দিনের নাট্যমঞ্চের কিছু কাজ হয়। অথচ পড়ানোর পথে নানা বাধা। না আছে তেমন পাঠক্রম, না আছে পাঠ্যপুস্তক। এ-ব্যাপারে অনেক বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে হচ্ছে। দেশ-বিদেশের নানা ধরনের বই। মনে আছে, একদিন একটা বই পড়ছিলাম, বইটার নাম বোধহয় 'থিয়েটার অব দি ইস্ট'। বইটাতে অনেক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তার মধ্যে এক জায়গায় দেখলাম, বাংলাদেশের থিয়েটার সম্পর্কে মন্তব্য। অবাস্তব আর বিসদৃশ মনে হল। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে অনেকখানি বলা হয়েছে, শিশিরবাবুর সম্পর্কেও। আমার নামেও বেশ কয়েকটি ছত্র রয়েছে। আর অভিনেত্রীর কথা। দু'টি নাটকের কথাও বলা হয়েছে, একটি 'শ্যামলী', অপরটি 'রামপ্রসাদ'।

বইখানি পড়ার পর মনে হয়, এ-ধরনের বই পড়ে বাংলা দেশের নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে বিদেশীদের কী ধারণা হবে না-জানি!

যাইহোক, এই রকম ধরনের অজস্র বই আমাকে পড়তে হচ্ছিল আকাদমির জন্যে।

এমনি করে দিনগুলো চলছে। নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ। আকাদেমির জীবন সত্যি আমার মনে নতুন করে সৃষ্টির উন্মাদনা এনে দিয়েছে।

তবুও এক-একবার পিছনে ফিরে চাই। এই তো সেদিন আমি মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় দাঁড়িয়ে অভিনয় করেছি; এই তো সেদিন নিজের রূপটাই বদলে দিয়েছি বিচিত্র রূপসজ্জায়। আর আজ আমি কতো স্বাভাবিক! মুখে কোন রঙের প্রলেপ নেই, পোশাকে সে রাজকীয় আড়ম্বর নেই, নেই আমার সামনে নানা রঙের আলোর ইশারা, নেই সেই বিমুগ্ধ দর্শকের ভিড়।

এখন আমার পরিচয় আমি শিক্ষক, আমি ছাত্র পড়াই। 'রবীন্দ্রভারতী'র সেই ক্লাশ-রুমে শিক্ষকের ভূমিকায় আমি, আর সামনে কয়েকজন ছাত্র—যারা নিবিষ্টমনে শোনে আমার কথা। আর আমি এদের মুখের দিকে চেয়ে ভাবি, এরা আমার ছাত্র। এরা বড়ো হোক, এদের মধ্যেই আমি আমার ভবিষ্যৎকে খুঁজে পাবো।

এরই মধ্যে এলো একদিন যে দিনটি আমার জীবনের স্মরণীয় দিন।

মনে আছে, একদিন অভিনেত্রী-সংঘের সভায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল জহর গাঙ্গুলী ও আরো অনেকের সঙ্গে। জহরবাবু আমাকে বলেছিলেন, দাদা—এ কী রকম হল, একেবারে নিঃশব্দে অভিনয় ছেড়ে দিলেন?

বলেছিলাম, আর পারি না। তাছাড়া আমি তো নিঃশব্দেই অভিনয় জগতে এসেছিলাম, আবার নিঃশব্দেই যজ্ঞ থেকে প্রস্থান করলাম।

জহরবাবু বলেছিলেন, সে হবে না। হতে দেব না। অন্ততঃ একদিন আমাদের সঙ্গে অভিনয় করুন—আপনার কাছে না হোক, আমাদের কাছে, সেই দিনটার অনেক দাম।

জহরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম।

তারপর আরো পরিচিতজনের কাছ থেকে একই অনুরোধ এল। অভিনেত্রী সরযূবালাও সেই একই অনুরোধ করলো।

এবারে আর 'না' করতে পারিনি। অনেক ভাবনা-চিন্তার শেষে বলেছিলাম, বেশ—তবে তাই হোক। একটা দিন তোমাদের সঙ্গে অভিনয় করি।

এরপর কথা হল নাটক নিয়ে। কথা হল প্রথমে 'মিশরকুমারী' নিয়ে। কিন্তু জহরবাবু আর সরযূকে বললাম, ছাখো—'মিশরকুমারী'তে আবনের ভূমিকায় অভিনয় করার ক্ষমতা আর আমার নেই। তার চেয়ে 'সাজাহান' করতে পার—চেষ্টা করলে 'সাজাহান' হয়তো করতে পারবো।

জহর গাঙ্গুলী সরযূবালা, ওরা তাতেই রাজী হলেন। জহরবাবু বললেন, আপনার যে নাটক ইচ্ছে তাই হবে।

—কিন্তু একটা কথা, আমি কিন্তু আপনাদের মুখ থেকে শুনতে চাই, যে আর আমাকে অভিনয়ের জন্য অনুরোধ করবেন না।

তাই হবে।

শুধু জহরবাবু নয়, সরযূও কথা দিলে যে ওরা আমাকে আর অনুরোধ করবে না অভিনয়ের জন্যে।

ঠিক হল 'সাজাহান'-ই হবে। আর একথাও ঘোষণা করা হবে—এই আমার শেষ অভিনয়।

শেষ অভিনয়!

কথাটা ভাবতেই বিস্মিত হলাম। এরই মধ্যে শেষ!

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে এর চেয়ে সত্যি কিছু নেই,—সত্যি আজ আমি ক্লান্ত, অবসন্ন। সত্যিই আমি অমিত-যৌবনের দিন পেরিয়ে এসেছি। পেরিয়ে এসেছি, জীবনের সূর্য-ঝরা পথ। এবারে অপরাহ্ণের পালা। সায়াহ্নের সূর্যের জন্যে প্রতীক্ষা করা।

শেষ অভিনয়ের দিন এগিয়ে এল। ১১ই সেপ্টেম্বর।

সেদিন দিন শুরু হল এক বিচিত্র অবসাদের মধ্যে। মনে হল অশক্ত আমি। বয়সের ভারে নুয়ে-পড়া একটি মানুষ। আমি কি পারবো আজ মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ 'সাজাহান'-এর চরিত্রকে রূপ দিতে?

যে বিশ্বাস নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলাম, আজও সেই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করলাম।

যথাসময়ে মিনার্ভায় এসে পৌঁছেছি। মঞ্চের ভিতরে বাইরে তখন অগণিত নর-নারীর ভিড়। বহু দর্শক টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়েছে।

আমি তো জানি, টিকিটের জন্যে আজ আমাকেই কতজনকে সুপারিশ করতে হয়েছে। যাঁরা ভালবাসেন, আমার অভিনয় যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছেন—তাঁরা যখন আমার কাছে আমার অভিনয় দেখার জন্যে টিকিট চাইতে এসেছেন, তখন আমি কি সুপারিশ না করে পারি! কিন্তু তবুও কি সবার অনুরোধ রাখতে পেরেছি! আর তা সম্ভবও নয়।

যাই হোক, মিনার্ভায় আসতে দেখলাম, মঞ্চের বাইরে অজস্র মানুষ ভিড় করে আছে। আর ভিড় সামলাতে পুলিশদলও বেষ্টনী সৃষ্টি করে রেখেছে।

নিঃশব্দে সাজঘরে এসেছি। বসেছি দর্পণের সামনে। দেখছি আপন প্রতিবিম্ব।

সেই আমি—আমার নাম অহীন্দ্র চৌধুরী। পরিচয়—অভিনেতা।

কতোদিন হয়ে গেল, মঞ্চে এসেছিলাম। দেখতে দেখতে কতোদিন পেরিয়ে গেল। বছর, যুগ—দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কত পরিবর্তন। কিন্তু তার মধ্যে

অভিজ্ঞতার জীবন যেন অপরিবর্তিত। সেদিনেও যার পরিচয় ছিল অভিনেতা, আজও সে সেই পরিচয় নিয়ে মিনার্ভার সাজঘরে।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়েছে আজকের অভিনয়ের কথা। কিন্তু একটি বাড়তি কথা যুক্ত হয়েছে সেখানে। আজ আমার শেষ অভিনয়। এর পর এই পরিচিত অভিনেতাকে আর মঞ্চে দেখা যাবে না।

সাজঘরে বসে আছি, একটু যেন উন্মনা।

'সাজহান'-এর রূপসজ্জায় আমি। দর্পণের সামনে দাঁড়ালাম। এখন আমি আর অহীন্দ্র চৌধুরী নামে চিহ্নিত একজন মানুষ নই—আমি ভারত-সম্রাট সাজাহান।

এই মুহূর্তে নিজেকে কেমন দুর্বল মনে হল। মনে হয়, হয়তো আজ আমি হেরে যাব ।

কিন্তু না।

সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। মনটাকে ফিরিয়ে আনলাম। বিশ্বাসের মধ্যে। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। যে বিশ্বাস নিয়ে একদিন মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

সময় হয়ে এল।

মঞ্চের পর্দা উঠলো। সম্রাট 'সাজাহান' শায়িত। দারা পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান।

'তাই তো, এ-বড়ো দুঃসংবাদ দারা' নাটকের প্রথম সংলাপ উচ্চারণ করলো সম্রাট সাজাহান। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম।

না—সাজাহান অশক্ত নয়, এখনো মনে তার অমিত শক্তি।

শুরু থেকে শেষ। জানি না, কখন শেষ হল। জানি না, কখন যবনিকা পড়লো।

যবনিকা পড়লো আমার অভিনয়-জীবনের। সাজাহানের রূপসজ্জা থেকে আসল মানুষটা বেরিয়ে এল। যার মুখের ওপর এখনো রঙের অস্পষ্ট রেখা।

আজ অভিনয়ের আগে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হয়েছিল। যে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। এ-ছাড়া বিমলচন্দ্র সিংহ প্রমুখ আরো কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সেদিন একজন নাট্যোৎসাহী বক্তা আমার কথা বলতে, বলেছিলেন —'এবারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নটসূর্য বিদায় নিচ্ছেন মঞ্চ থেকে'। ডাক্তার রায় বলেছিলেন—'সূর্য কখনো অস্ত যায় না। পৃথিবীর এক গোলার্ধে তার অস্ত, অন্য গোলার্ধে তার উদয়। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনয়-জীবন থেকে বিদায় নিলেন, কিন্তু

আর এক ক্ষেত্রে পদ-সঞ্চার করছেন তিনি। এখন তিনি নাট্যজগতের আচার্য—আকাদেমি তাঁর ক্ষেত্র।'

সাজঘরে দাঁড়িয়ে আরো ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, অগণিত দর্শকের কথা। যাঁরা আমার শেষ অভিনয়ের সাক্ষী হয়ে রইলেন।

সাজঘরের আয়নায় শেষবারের মত নিজেকে দেখলাম। বড় ভাল লাগলো। নিজেকে এমন করে কোনদিন তো দেখিনি!

তারপর হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে পেলাম। তাড়াতাড়ি সরে এলাম আয়নার সামনে থেকে।

এবারে শেষ বিদায়ের মুহূর্ত। সহ-অভিনেতা, মঞ্চের কলাকুশলী—সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মঞ্চের বাইরে এলাম।

বাইরে তখন অগণিত জনতার ভিড। অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীকে বিদায়-অভিনন্দন জানাতে এসেছে।

রঙ্গালয়ের বাইরের উজ্জ্বল আলোগুলো তখন নিবে গেছে। এ-দিকটা কেমন যেন অন্ধকার। নীরবে যন্ত্র-চালিতের মত আসছি বাইরে। দু'ধারে অগণিত নর-নারী দাঁডিয়ে আছে। আমি এগিয়ে যেতে হঠাৎ তারা হাততালি দিয়ে উঠলো। হাতজোড় করে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করলাম।

রাস্তার কাছে এসে দেখলাম, বিপরীত ফুটপাথে আধো-অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য দর্শক। স্পষ্ট দেখছি না, তবুও স্পষ্ট। ওরা দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্যে। হয়তো শেষবারের মতো অভিনেতা-কে দেখতে চায়।

হাতজোড় করে নমস্কার জানাই দর্শকদের উদ্দেশে। কামনা করি আশীর্বাদ। যেন আমি জীবনের বাকি দিনগুলো শান্তিতে কাটাতে পারি। ঈপ্সিত শান্তি।

নীরবে গাড়ীতে এসে উঠলাম। এখনো আমার দৃষ্টিটা অপেক্ষমান জনতাকে স্পর্শ করছে।

দেখতে দেখতে অপসৃয়মান ছায়ার মত সবকিছু সরে গেল।

গাড়ী বিডন স্ট্রীট পেরিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এ পড়লো।

আমার মনের মধ্যে তখন একটি সুরই ভেসে চলেছে। মঞ্চ থেকে বিদায়ের সুর।

জীবনে চেয়েছিলাম, অভিনেতা হব। হয়েছি। অভিনয় করেছি কত না চরিত্রে। তার মধ্যে সাজাহান যেন আমার সবকিছু।

সাজাহান আমাকে অনেক দিয়েছে। মানুষ যা চায়—সব। খ্যাতি, প্রতিপত্তি,

অর্থ—সব কিছুই পেয়েছি আমি। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমি যেন কিছুই করতে পারিনি। চেষ্টা করলে হয়তো আরো সার্থক রূপ দিতে পারতাম সাজাহানের। শুধু সাজাহানে কেন—হয়তো আমার অভিনীত চরিত্রগুলির জন্যে অভিনেতা হিসাবে আরো কিছু করতে পারতাম, যা আমি পারিনি।

চিন্তাটা আবার সাজাহানে ফিরে এল। আমার জীবন-মন যেন মিশে আছে ওই ঐতিহাসিক চরিত্রটির সঙ্গে।

সাজাহান আমাকে এতো দিয়েছে, কিন্তু আমি কি দিলাম ?

কখন যেন চোখের জল, বিন্দু হয়ে ঝরে পড়লো।

সাজাহানের জন্যে এই দু' ফোঁটা চোখের জল দিলাম। আর অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করলাম, 'গুড নাইট স্যুইট প্রিন্স'।

তবু একবার পিছনে ফিরে চাইলাম। যে পথ পিছনে রেখে এলাম।

কিন্তু পরমুহূর্তে দৃষ্টি প্রসারিত করি সামনের পথে। সামনে ছড়িয়ে আছে চৌরঙ্গীর আলোক-সরণি।

যে আলোক-সরণি ধরে আমি বিদায় নিয়ে চলেছি, সেই পথ ধরে আসবে আগামীকালের পথিক অভিনেতা।

—